ভূতগুলো
সব
ভয়
দেখায়
সম্পাদনা
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ভূতগুলো সব ভয় দেখায়

ভূতগুলো সব ভয় দেখায়

সম্পাদনা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পাবলিশিং প্লাস
২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

দু—চার কথা

'ভূত' নিয়ে নতুনকরে আর বিশেষ কিছু বলার নেই! আমার রচিত ভূতেরা ভয় দেখায় না; তারা ভয়াবহও নয়, নিতান্তই মজার ভূত তারা—বরং কখনোসখনো উপকারীও। তাই আমার ভূতদের ক্ষেত্রে 'গা—ছমছমে' এই বিশেষণ কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়িই। তবে সংকলনের বাকি সব ভূতের ক্ষেত্রে তো একথা প্রযোজ্য নয়—তাদের কাণ্ডকারখানাও ভিন্নরকম, আর তারা সকলেই ঠিক নির্দোষ এবং মজাদারও নয়। কারণ, ভূত বলে কথা! আর ভূত মানেই তো ভয়—ভয়। তাই আমার লেখা ভূতের গল্প পড়ে যাদের বেজায় ভূতের ভয় বেজার হয়ে বিদায় নিয়েছে; এই বইটি পড়ে তারা আবার ফিরে আসতেও পারে। কারণ বেশকিছু হারিয়ে—যাওয়া ভৌতিক কাহিনির সঙ্গে সাম্প্রতিক রোমহর্ষক কিছু রচনাকেও স্থান দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। আর সব গল্পই যেকোনো বইতে সহজে পাওয়া যাবে না! বিস্তর পরিশ্রম করে, মাথা ঘামিয়ে তাঁদের জোগাড় করেছেন তরুণ সহযোগী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়; তাঁকে সবিশেষ ধন্যবাদ। বাকিটা রসিকজনের ওপর, দেখা যাক, তাঁদের প্রতিক্রিয়া কী হয়!

কোন ভূত কোথায়

পূজার ভূত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায় ভয়ঙ্কর বাড়ি

আমার নাম তারক। কলিকাতায় আমি বোর্ডিংয়ে থাকি। পূজার সময় আমি বাড়ি আসিয়াছি। আমার নিজের বাড়ি নয়, মামার বাড়ি। মামার বাড়িতেই আমরা মানুষ হইয়াছি। আমি ও আমার ভগিনী প্রভা। শামীমাসি আমাদিগকে মানুষ করিয়াছে। আমার মাকেও সে মানুষ করিয়াছিল। শামীমাসি সদগোপের মেয়ে।

সন্ধ্যার সময় আমরা শামীমাসিকে ঘিরিয়া বসিলাম। আমি, প্রভা, আর আমার মামাতো ভাই ও ভগিনীগণ। আমি বলিলাম, 'শামীমাসি, আজ তোমাকে একটি গল্প বলিতে হইবে। কেমন মেঘ করিয়াছে দেখ। কেমন অন্ধকার হইয়াছে। কেমন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আর বাতাসের একবার জোর দেখ। গাছের পাতার ভিতর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া চলিতেছে। যেন রাগিয়া কি বলিতেছে। এই অন্ধকারে এমন দুর্যোগের সময় ভূত—প্রেত সব বাহির হয়। বাপ রে! গা যেন শিহরিয়া উঠে।'

শামীমাসি বলিল, 'এই পূজার সময়—এইরূপ দুর্যোগের সময় তোমার মাকে লইয়া আমি বড়ো বিপদে পড়িয়াছিলাম। এখনও সে কথা মনে করিলে ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হইয়াছিল শামীমাসি?'

শামী উত্তর করিল, 'না, সে কথা এখন তোমাদিগকে আমি বলিব না। তোমরা ছেলেমানুষ। সে কথা শুনিলে তোমাদের ভয় করিবে।'

আমরা সকলেই বলিলাম,—'সে কথা শুনিলে আমাদের ভয় করিবে না।'

যাহা হউক, অনেক জেদাজেদির পর শামীমাসি সে গল্প বলিতে সম্মত হইল। শামীমাসি বলিল, 'তারক ও প্রভার মায়ের নাম সীতা ছিল। সীতার মা, অর্থাৎ তোমাদের মাতামহীর নাম তারামণি ছিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে বলিয়া যান, 'শামী! আমার কাছে তুই সত্য কর যে সীতাকে তুই কখনো ছাড়িয়া যাবি না। সীতা পাঁচ বৎসরের শিশু, পৃথিবীতে তাহার আর কেহ নাই।'

সীতাকে আমি দিদিমণি বলিয়া ডাকিতাম। আমি বলিলাম, 'মাঠাকরুণ! দাদাবাবু (অর্থাৎ তোমাদের মা—র ভাই) ও দিদিমণি কোথায় কাহার কাছে থাকিবে, তাহা আমি জানি না। দিদিমণি যাহাদের কাছে থাকিবে, তাহারা যদি আমাকে ছাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি? কিন্তু তাহারা যদি আমাকে রাখে, তাহা হইলে তোমার গায়ে হাত দিয়া আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, দিদিমণিকে আমি কখনো ছাড়িব না।'

তোমাদের মাতামহীর মৃত্যু হইল, তোমাদের মামা, যাঁহার এই বাড়ি, তিনি তখন বালক। লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত একজন আত্মীয় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। সীতা তাহার মামার বাড়িতে গেল। সীতার মামা আমাকে ছাড়াইলেন না। আমি দিদিমণিকে মানুষ করিতে লাগিলাম।

দিদিমণির মামারা একসময়ে খুব বড়োমানুষ ছিলেন। শুনিলাম যে, তাহার মাতামহ জগমোহন রায়চৌধুরী একজন দুর্দান্ত লোক ছিলেন। দিদিমণিকে লইয়া আমি যখন তাঁহার বাড়িতে যাইলাম, তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। দিদিমণির মামাও দেশে থাকিতেন না, পশ্চিমে কোথায় কর্ম করিতেন। দিদিমণিকে বাড়িতে রাখিয়া তিনি সে স্থানে চলিয়া গেলেন। সে বাড়ী কী ভয়ঙ্কর! তিনমহল বাড়ি, বাহির—বাড়িতে, মাঝের—বাড়িতে, ভিতর—বাড়িতে, একতলায় দোতলায় কত যে ঘর, তাহা গণিতে পারা যায় না। কিন্তু সব ভোঁ ভোঁ, দেখিলেই যেন ভূতের বাড়ি বলিয়া মনে হয়; বাহিরের বাড়িতে কি মাঝের বাড়িতে জনপ্রাণী বাস করে

না। এতবড়ো বাড়িতে আমরা কেবল ছয়জন রহিলাম; (১) তোমার মায়ের পিসি অলক ঠাকরুণ, তাঁহার বয়স প্রায় আশি হইয়াছিল, আর তিনি সম্পূর্ণ কালা ছিলেন। (২) আর একজন ব্রাহ্মণী, তাঁহার নাম সহচরী, তাঁহারও বয়স বড়ো কম হয় না। তিনি রন্ধন করিতেন। (৩) একজন চাকর, তাহার নাম পিতেম। (৪) পিতেমের স্ত্রী, তাহার নাম বিলাসী। (৫) তাহার পর আমি ও (৬) তোমাদের মা, আমার দিদিমণি, সীতা। বাড়ির ভিতর দোতলায় তিনটি ঘরে আমরা ছয়জনে বাস করিতে লাগিলাম। প্রথম অলক ঠাকরুণ ও সহচরীর ঘর; তাহার পার্শ্বে আমার ও দিদিমণির ঘর। তাহার পার্শ্বে পিতেম ও বিলাসীর ঘর। পশ্চিমদিকে এই তিনটি ঘর ছিল। উত্তর ও পূর্ব দিকে অনেক ঘর পড়িয়াছিল। বিলাসীর ঘরের পার্শ্বে আর একটি ঘর লইয়া আমি দিদিমণির খেলাঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। বাটীর চারিদিকে অনেকদূর পর্যন্ত আঁব, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি নানা গাছের বাগান ছিল। বাগানের ভিতর চারি—পাঁচটি পুকুর ছিল। উত্তরদিক ভিন্ন বাটীর আর চারিদিকে গ্রাম ছিল। কিন্তু সে মিথ্যা গ্রাম, ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবে অনেক লোক মরিয়া গিয়াছে; অনেক লোক ঘরদ্বার ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। বাটীর উত্তরদিকে মাঠ, যতদূর দেখিতে পাই, ততদূর মাঠ ধূ ধূ করিতেছে।

শ্মশানের ন্যায় সেই বাড়িতে গিয়া আমি মনে করিলাম, ওমা! এ বাড়িতে আমি কি করিয়া থাকিব, ভয়েই মরিয়া যাইব!

যাহা হউক, যেখানে আমার দিদিমণি, সেখানে সব ভালো—সেইখানে আলো— সেইখানেই সুখ। দিদিমণির দৌড়াদৌড়ি, দিদিমণির খেলা, দিদিমণির কথা, দিদিমণির হাসিতে সেই শ্মশানভূমি যেন স্বর্গতুল্য হইল। এমন যে অলক ঠাকরুণ, যাঁহার গোমড়া মুখ দেখিলে ভয় হয়, দিদিমণিকে দেখিলে তাঁহারও মুখ যেন একটু উজ্জ্বল হইত, তাঁহারও মুখে যেন একটু হাসি দেখা দিত। দিদিমণির যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তেমন ফুটফুটে, দুধে—আলতার রং আমি আর কোনো মেয়ের দেখি নাই। কেমন পুরন্ত গাল দুইটি, কেমন ছোট্ট হাঁ—টুক। কেমন টুকটুকে ঠোঁট, কেমন পটলচেরা ঢুলু ঢুলু উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন কালো কালো চক্ষুর পাতা, কেমন সরু সরু চকচকে রেশমের মতো নরম চুল! হা কপাল! সে দিদিমণিকে ছাড়িয়া এখনও আমি প্রাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছি। তারপর দিদিমণি যখন কথা কহিত, তখন প্রাণ যেন শীতল হইত, প্রাণের ভিতর দিদি আমার যেন সুধা ঢালিয়া দিত।

দিদিমণিকে লইয়া আমি সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম। একবার এই সময় ঘোরতর দুর্যোগ করিয়াছিল। বাহিরে বাতাস হুহু করিয়া বহিতেছিল। দিদিমণিকে লইয়া আমি শুইয়া আছি। সহসা বাহির—বাড়িতে বেহালার শব্দ হইল। রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম যে, এত রাত্রিতে আমাদের বাহির—বাড়িতে বেহালা বাজায় কে? বাহির—বাড়িতে তো কেহ বাস করে না!

পরদিন আমি বাহির—বাড়িতে গিয়া চারিদিক দেখিলাম। জনপ্রাণীকেও সে স্থানে দেখিতে পাইলাম না। পোড়ো ভাঙা বাড়ির যেরূপ অবস্থা হয়, বাহির—বাড়ির সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

সেদিন বিলাসীকে একবার একেলা পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বিলাসী কাল রাত্রিতে বাহির—বাটীতে বেহালা কে বাজাইতেছিল?'

আমার কথা শুনিয়া বিলাসীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। আমতা আমতা করিয়া সে উত্তর করিল, 'বেহালা! বেহালা আবার কে বাজাইবে? ও বাতাসের শব্দ।'

বিলাসীর কথায় আমার প্রত্যয় হইল না। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, সে আমার নিকট কোনো বিষয় গোপন করিতেছে।

বিলাসী পুনরায় বলিল, 'যাহা হউক, দিদিমণিকে তুমি সদর—বাড়িতে যাইতে দিয়ো না। সাপ—খোপ কি আছে না আছে, কাজ কি ওদিকে গিয়া।'

আরও কিছুদিন গত হইয়া গেল। একবার নয়, আরও অনেকবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। যখনই রাত্রিকালে বাদলা ও দুর্যোগ হয়, তখনই বাহির—বাড়িতে কে যেন প্রাণপণে বেহালা

বাজায়। কেবল বেহালা নহে, সে বৎসর পূজার সময় মহা—অষ্টমীর রাত্রিতে বাহির—বাড়িতে আমি শাঁক—ঘণ্টার শব্দও শুনিয়াছিলাম, ধূপ—ধূনার গন্ধও পাইয়াছিলাম। বলিদানের সময় যেমন একজন ভক্ত বিকট স্বরে মা মা বলিয়া চীৎকার করে, সে শব্দ শুনিয়াছিলাম। এ সমুদয় ব্যাপারের অর্থ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত বৃদ্ধা সহচরীকে, পিতেমকে, বিলাসীকে আমি বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমাকে বলে নাই। 'ও কিছু নয়', এই কথা বলিয়া সকলে প্রকৃত তত্ত্ব আমার নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

এইরূপে সে স্থানে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। কত শতবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। পুনরায় পূজার সময় আসিল। মহাষ্টমীর দিন দুই প্রহরের সময় দিদিমণি পিতেম ও বিলাসীর সহিত গ্রামের ভিতর পূজা দেখিতে গিয়াছিল। আমি বিদেশি লোক, আমাকে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই, সেজন্য আমি তাহাদের সঙ্গে যাই নাই। পূজা দেখিয়া বেলা পাঁচটার সময় দিদিমণি ফিরিয়া আসিল। বিলাসী আমাকে বলিল, 'যদু ভড়ের বাড়ি পূজার এবার খুব ধূম। আহা! কি চমৎকার প্রতিমা করিয়াছে। আর শামীদিদি, ভড়গিন্নি তোমাকে অনেক করিয়া যাইতে বলিয়াছে।'

এই কথা শুনিয়া আমি ভড়েদের বাড়ি ঠাকুর দেখিতে যাইলাম। ভড়গিন্নি আমাকে অনেক আদর করিলেন। অনেকগুলি খই—মুড়কি; নারিকেল—সন্দেশ, রসকরা—আরও কত কি আমার কাপড়ে বাঁধিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিতে আমার সন্ধ্যা হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায় আয় না ভাই

বাড়ি আসিয়া তাড়াতাড়ি আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। দিদিমণিকে সে স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

বিলাসী বলিল, 'বোধহয় অলক ঠাকরুণের ঘরে আছে।' রুদ্ধশ্বাসে সে ঘরে আমি দৌড়িয়া যাইলাম। অলক ঠাকরুণ ও সহচরী দুইজনেই তখন সে ঘরে ছিল। দিদিমণিকে দেখিতে না পাইয়া সহচরীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সহচরী উত্তর করিলেন, 'কৈ! সীতা তো এ ঘরে আসে নাই।'

এই কথা শুনিয়া প্রাণ আমার উড়িয়া গেল। পুনরায় আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বিলাসীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম।

বিলাসী কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল, 'এইমাত্র আমার ঘরের বারান্দায় সে খেলা করিতেছিল। ঘরের ভিতর আমি কাজ করিতেছিলাম। বোধহয়, অন্য কোনো ঘরে সে খেলা করিতেছে।'

এমন সময় পিতেম আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার কান্না ও বিলাসীকে ভর্ৎসনার শব্দ শুনিয়া সহচরীও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রদীপ হাতে লইয়া সকলে মিলিয়া আমরা বাড়ি আতিপাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম। ভিতর—বাড়ি খুঁজিয়া মাঝের—বাড়ি, তাহার পর সদর—বাড়ির সকল ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম; কিন্তু কোনো স্থানে দিদিমণিকে দেখিতে পাইলাম না। মাথা খুঁড়িয়া বুক চাপড়াইয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে, হয় গহনার জন্য দিদিমণিকে কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে, কিংবা পুষ্করিণীতে পড়িয়া সে ডুবিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ি ওলট—পালট করিয়া অবশেষে আমরা বাগান ও পুকুরের ধারগুলি মনোযোগের সহিত দেখিলাম। কিন্তু কোনোস্থানে দিদিমণির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। শেষে পিতেম আমাকে বলিল—'তোমাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার মন কেমন করিয়াছিল, তোমাকে খুঁজিবার নিমিত্ত নিশ্চয় সে পূজা—বাড়ির দিকে গিয়াছে। আমি এখনই তাহাকে আনিতেছি।' এই কথা বলিয়া পিতেম গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

কিন্তু তা বলিয়া আমরা নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিলাম না। পূর্বেই বলিয়াছি যে আমাদের বাড়ি ও বাগানের উত্তর দিকে দূর পর্যন্ত মাঠ ছিল। দিদিমণিকে খুঁজিবার নিমিত্ত বিলাসী ও আমি সেই মাঠের দিকে যাইলাম। মেঘ করিয়াছিল, খুব অন্ধকার হইয়াছিল। তাহার উপর এখন আবার বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে সম্মুখে আমরা একপ্রকার সাদা কি দেখিতে পাইলাম। বিলাসীর বড়ো ভয় হইল। সে বলিল, 'দিদি, ঐ দেখ একটি শাকচূর্ণী আসিতেছে। এখনি আমাদের খাইয়া ফেলিবে। আর গিয়া কাজ নাই। এসো, বাড়ি ফিরিয়া যাই। এতক্ষণে দিদিমণি বাড়ি আসিয়া থাকিবে।'

কোনো উত্তর না দিয়া বিলাসীর আমি হাত ধরিলাম, আর সেই সাদা জিনিসের দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলাম। সেও অন্য দিক হইতে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। বিলাসী তাহাকে চিনিতে পারিল। সে আমাদের প্রতিবেশী একজন কৃষক! কাপড় ঢাকা তাহার বুকের উপর কি ছিল। আমরা কোনো কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সে বলিল, 'তোমাদের মেয়েটি মাঠের মাঝখানে গাছতলায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। কী করিয়া সে মাঠের মাঝখানে আসিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি দেখিতে পাইয়া এখন তোমাদের বাড়ি লইয়া যাইতেছি।'

তাড়াতাড়ি দিদিমণিকে আমি তাহার কোল হইতে আপনার কোলে লইলাম। কিন্তু দিদিমণির সর্ব শরীরই ঠান্ডা দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি ভাবিলাম, সে মরিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি তাহার নাকে ও বুকে হাত দিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে নাক দিয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে। আর বুক অল্প অল্প ধুক—ধুক করিতেছে। তাহা দেখিয়া আমার প্রাণে কতকটা আশা হইল। তাড়াতাড়ি মাঠ পার হইয়া আমরা বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অনেক তাপসেঁক করিতে করিতে দিদিমণির চেতনা হইল। সেই চন্দ্রমুখে মধুর হাসি দেখা দিল, সুধামাখা দুই একটি কথা দিদিমণির মুখ হইতে বাহির হইল। অল্প গরম দুধ আনিয়া সহচরী তাহাকে খাইতে দিলেন। তাহার সেই পদ্মচক্ষু দুইটি ঘুমে বুজিয়া গেল। সে রাত্রিতে দিদিমণিকে আমরা কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

দূরে মাঠের মাঝখানে একেলা সে কী করিয়া গিয়াছিল, পরদিন সেই কথা দিদিমণিকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। দিদিমণি বলিলেন, 'বারান্দায় আমি খেলা করিতেছিলাম। তাহার পর যে ঘরে আমার খেলাঘর আছে, আমি তাহার ভিতর যাইলাম। সেই ঘরের জানালার ধারে যেই দাঁড়াইয়াছি, আর দেখি না ঠিক তাহার নীচেতে বাগানে একটি মেয়ে রহিয়াছে। মেয়েটি আমার মতো বড়ো, কিন্তু খুব সুন্দর। উপর দিকে আমার পানে চাহিয়া সে বলিল, 'সীতা! নেমে আয় না ভাই, আমরা দুইজনে খেলা করি।' আমি বলিলাম, 'না ভাই। এখন আমি নীচে নামিয়া যাইতে পারিব না। সন্ধ্যা হইয়াছে, এখন নীচে নামিবার সময় নয়। বিলাসী আমাকে বকিবে, তাহার পর শামী আসিয়া আমাকে বকিবে। কাল সকালবেলা তুমি আসিয়ো, দুইজনে তখন অনেকক্ষণ খেলা করিব।' মেয়েটি বলিল, 'এখনও তেমন সন্ধ্যা হয় নাই, এখনও অনেক আলো রহিয়াছে। এই দেখ আমার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, তবুও দেখ আমি খেলা করিতেছি। আয় না ভাই।'

'তবুও আমি নামিলাম না। নীচে নামিতে মেয়েটি আমাকে বারবার বলিতে লাগিল। শেষে সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল, বসিয়া হাপুসনয়নে কাঁদিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। নীচে নামিয়া বাড়ির বাহির হইয়া আমি তাহার কাছে যাইলাম। কিছুক্ষণ বাগানের ভিতর আমরা দুইজনে খেলা করিলাম। এক স্থানে অনেকগুলি রজনিগন্ধা ফুল ফুটিয়াছিল, তাহা আমরা তুলিলাম। সাদা টগর ফুল ফুটিয়া আর একটি গাছে আলো করিয়াছিল। নীচে হইতে যত পারিলাম, সেই টগর ফুলও আমরা তুলিলাম। কেমন করিয়া জানি না, তাহার পর বাগান পার হইয়া আমরা মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেমন করিয়া জানি না, সেই মেয়েটির সঙ্গে অনেক পথ চলিয়া ক্রমে মাঠের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে একটি গাছ ছিল। সেই গাছতলায় একটি মেয়েমানুষ বসিয়া কাঁদিতেছিল। আমার মাকে স্বপ্নের ন্যায় আমার মনে পড়ে। সে মেয়েমানুষটি ঠিক আমার মায়ের মতো। সেই রকম রং, সেই রকম মুখ, সেই রকম চুল, সেই রকম কথা। আদর করিয়া তিনি আমাকে কোলে লইলেন, আমার মুখে তিনি হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর কী হইল, আর আমার মনে নাই।'

তৃতীয় অধ্যায় বালিকা ভূত

দিদিমণির এই কথা শুনিয়া সহচরী পিতেমকে চক্ষু টিপিলেন। তাহার পর তিনি বিলাসীর গা টিপিলেন। ইহার মানে আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে মেয়েটি কে? সে তো বড়ো দুষ্ট মেয়ে দেখিতেছি। তাহাকে আর বাগানে আসিতে দেওয়া যাইবে না।'

আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়া সহচরী বলিলেন, 'এ বিষয় অলক ঠাকরুণকে জানাইতে হইবে। তিনি যেরূপ বলেন, সেইরূপ করিতে হইবে।' এই কথা বলিয়া সহচরী সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে, পিতেমকে ও বিলাসীকে অলক ঠাকরুণের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দিদিমণিকে কোলে লইয়া আমি পিতেম ও বিলাসীর সঙ্গে সেই ঘরে যাইলাম। অলক ঠাকরুণ থুড়থুড়ে বুড়ি হইয়াছিলেন। তিনি অধিক কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হইয়া সহচরী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'অলক ঠাকরুণ তোমাকে বলিতে বলিলেন যে, সে মেয়েটি মানুষ নহে। তাহার মা, যাঁহাকে সীতা গাছতলায় দেখিয়াছিল, তিনি অলক ঠাকরুণের ভাইঝি, সীতার মাসি। অনেকদিন হইল তিনি ও তাঁহার কন্যা অপঘাত—মৃত্যুতে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গতি হয় নাই, এখন তাঁহারা এরূপ হইয়া আছেন। তাঁহারা সর্বদা, বিশেষত ঝড়—বাতাস—বাদলার দিনে, আর এই পূজার সময়, বাড়ির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। পিতেম, বিলাসী আর তুমি শামী, তোমাদের সকলকে অলক ঠাকরুণ বলিতেছেন যে, সীতাকে তোমরা খুব সাবধানে রাখিবে, নিমিষের নিমিত্ত তোমরা তাহাকে চক্ষের আড় করিবে না। সে মেয়েটা এবার যদি সীতাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আর তোমরা সীতাকে পাইবে না।'

এই কথা শুনিয়া আমার আত্মপুরুষ উড়িয়া গেল। কী করিয়া মেয়েকে ভূতের হাত হইতে বাঁচাইব, সেই ভাবনায় আমি আকুল হইয়া পড়িলাম। তোমার মামার তখনও কর্ম—কাজ হয় নাই, একদিন গিয়া দাঁড়াই, একবেলা এক মুঠা কেহ যে ভাত দেয়, এমন স্থান ছিল না। কাদায় গুণ ফেলিয়া দিদিমণিকে লইয়া কাজেই আমাকে সেই ভয়ানক বাড়িতে থাকিতে হইল। কিন্তু সেই দিন হইতে দিদিমণিকে আমরা নিমেষের জন্যও চক্ষুর আড় করিতাম না। হয় আমি, না হয় বিলাসী, না হয় পিতেম, কেহ না কেহ সর্বদা তাহার কাছে থাকিত। কিন্তু মাঝে মাঝে জানালার দ্বারে দাঁড়াইয়া দিদিমণি আমাদিগকে বলিত, 'ওই সেই মেয়েটি আসিয়াছে, ওই আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। শামী, তুই আমাকে সুন্দর বলিস, কিন্তু ওর পানে একবার চাহিয়া দেখ। আহা! কি চমৎকার রূপ। কেবল ওর পানে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। ওই দেখ, আবার আমাকে ডাকিতেছে। আমি যাইতেছি না বলিয়া আহা! মেয়েটি ওই দেখ, কতই না কাঁদিতেছে। তাহার কাপড় সে আমাকে দেখাইতেছে, তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, টস টস করিয়া তাহার কাপড় হইতে জল পড়িতেছে। এ আবার কি? হাত দিয়া সে আপনার মাথা আমাকে দেখাইতেছে। আহা! মেয়েটির মাথায় কে মারিয়াছে, মাথা হইতে গাল বাহিয়া রক্ত পড়িতেছে। শামী! একবার আমাকে ছাড়িয়া দে। আমি উহার কাছে যাই, উহাকে বাড়ির ভিতর ডাকিয়া আনি। তুই উহার মাথায় ঔষধ দিয়া দিবি। আমার ওই কাপড়খানি আমি উহাকে পরিতে দিব। যাই ভাই, যাই!'

এইরূপ বলিলে তাড়াতাড়ি আমি তোমার মাকে গিয়া কোলে লইতাম। উপর হইতে বাগানের দিকে আমি চাহিয়া দেখিতাম, কিন্তু আমি দেখিতে পাইতাম না। কী করিব। ঘরের দ্বার—জানালা বন্ধ করিয়া মেয়েকে কোলে লইয়া, ভয়ে জড়সড় হইয়া আমি বসিয়া থাকিতাম।

এইরূপ অতি কষ্টে আমরা সেই বাড়িতে দিনপাত করিতে লাগিলাম। পুনরায় পূজার সময় আসিল। এই সময় দিদিমণি সেই মেয়েটাকে ঘন ঘন দেখিতে লাগিল। বাগানের দিকে জানালা এখন আমি সর্বদাই বন্ধ করিয়া রাখিতাম। তথাপি দিদিমণি বলিত, 'শামী! জানালা খুলিয়া দে। মেয়েটি নীচে আসিয়াছে, সে আমাকে ডাকিতেছে। শামী! তোর পায়ে পড়ি, একবার জানালা খুলিয়া দে, একবার তাহাকে আমি দেখি।'

মহাষ্টমীর দিন মেয়েকে লইয়া আমি বড়োই বিব্রত হইলাম। সেদিন ভয়ানক দুর্যোগ হইয়াছিল। সীতাকে কোলে লইয়া আমি ঘরে বসিয়া ছিলাম। এখন আর বাহিরে নয়, সেদিন দিদিমণি সেই মেয়েটিকে বাড়ির ভিতরেই দেখিতে লাগিল। আমি দ্বার বন্ধ করিয়া ছিলাম, তথাপি দিদিমণি বলিতে লাগিল, 'ও শামী! মেয়েটি আজ বাড়ির ভিতর আসিয়াছে, ঘরের বাহিরে আমাদের ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। ছাড়িয়া দে শামী। আমি একবার তাহার কাছে যাই। একবার তাহাকে না দেখিলে মরিয়া যাইব।'

এই বলিয়া দিদিমণি হাপুসনয়নে কাঁদিতে লাগিল। কি যে করি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মেয়ে লইয়া আমি অলক ঠাকরুণের ঘরে যাইলাম। সে স্থানে সহচরী উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম—'আজ বাছা, আমাদের খাওয়া—দাওয়াতে কাজ নাই। সকলে মিলিয়া এসো, আজ আমরা মেয়েকে ঘিরিয়া থাকি। তা না করিলে, দিদিমণিকে আজ আমরা বাঁচাইতে পারিব না, সেই দুষ্ট মেয়েটা আসিয়া দিদিমণিকে নিশ্চয় আজ লইয়া যাইবে।'

সহচরী অলক ঠাকরুণকে সকল কথা বলিলেন। অলক ঠাকরুণ আমার কথায় সম্মত হইলেন। পিতেম ও বিলাসীকে ডাকিয়া দ্বার—জানালা বন্ধ করিয়া দিদিমণিকে ঘিরিয়া, সকলে আমরা অলক ঠাকরুণের ঘরে বসিয়া রহিলাম।

বলা বাহুল্য যে, ইতিপূর্বে এই বিড়ম্বনা নিবারণের জন্য অনেক প্রতিকার করা হইয়াছিল। গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, শান্তি—স্বস্ত্যয়ন করা হইয়াছিল, রোজা আনিয়া ঝাড়ানো ও ভূত নামানো হইয়াছিল, দিদিমণির অষ্টাঙ্গে কবচ, মাদুলি ও নেকড়ার পুঁটলি বাঁধা হইয়াছিল। কিছু কিছুতেই কিছু হয় না।

চতুর্থ অধ্যায় বিষম মহাষ্টমী

সকলে ঘিরিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সেই মহাষ্টমীর সমস্ত দিন দিদিমণি বড়োই ছটফট করিয়াছিল। 'ওই সেই মেয়েটি আসিতেছে, সে আমাকে ডাকিতেছে, তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে; দাও আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তাহার কাছে যাই।' এই বলিয়া দিদিমণি বার বার কাঁদিতেছিল, আর আমার কোল হইতে উঠিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া বার বার বাহিরে পলাইতে চেষ্টা করিতেছিল। অতি কষ্টে আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতেছিলাম।

সন্ধ্যার পর দিদিমণি ঘুমাইয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার বুঝি আমাদের বিপদ কাটিয়া গেল, আর বুঝি কোনো উপদ্রব হইবে না। কিন্তু আমরা কেহ নিদ্রা যাইলাম না, ঘরে দুইটা আলো জ্বালাইয়া সকলে জাগিয়া বসিয়া রহিলাম।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। এমন সময় সহসা বাহির—বাটীতে সেই বেহালা বাজিয়া উঠিল। কেবল বেহালা নহে, তাহার সঙ্গে ঢাক—ঢোল, শাঁক—ঘণ্টা, কাঁসর—ঘড়িও বাজিয়া উঠিল। সেই সকল বাজনা ছাপাইয়া বলিদানের সেই ভয়ানক 'মা মা' চিৎকারে আমাদের যেন কানে তালা লাগিতে লাগিল, আতঙ্কে আমাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে আমাদের শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। হতভম্ব হইয়া আমরা বসিয়া আছি, এমন সময় ধড়মড় করিয়া দিদিমণি উঠিয়া বসিল। আমরা কিছু বলিতে না বলিতে চোঁৎ করিয়া সে দ্বারের নিকট গিয়া খিল খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর আমরা তাহাকে ধরিতে না ধরিতে রুদ্ধশ্বাসে বাহির—বাড়ির পূজার দালানের দিকে সে দৌড়িল। 'ও মা, কি হইল, সর্বনাশ হইল।' এই কথা বলিতে বলিতে অলক ঠাকরুণ ছাড়া আর সকলেই আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। দিদিমণি আমাদের আগে আগে গিয়া বাহির—বাড়ির পূজার দালানে উপস্থিত হইল। সে স্থানের অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা জ্ঞানহারা হইলাম। এখন আর সে ভাঙ্গা জনশূন্য বাড়ি নাই। খুব ধূমধামের দুর্গোৎসব হইলে যেরূপ হয়, সে স্থানে এখন সেইরূপ হইয়াছে। দালানের মাঝখানে প্রতিমা রহিয়াছে—বৃহৎ প্রতিমা, নানা সাজে সুসজ্জিত। প্রতিমার চারিদিকে নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার আয়োজন রহিয়াছে। সম্মুখে পুরোহিতগণ বসিয়া আছেন। এক পার্শ্বে একজন চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। সমুখের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, ধূপ—ধূনার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে। দালানে, উঠানে, সকল স্থানে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ফলকথা, এমন ধূমধামের পূজা আমি কখনও দেখি নাই।

দিদিমণি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দালান পার হইয়া দালানের পূর্বদিকে চলিয়া গেল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দালানের পূর্বদিকে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপর একজন বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। তাঁহার বাম হাতে বেহালা, আর দক্ষিণ হাতে যাহা

দিয়া বাজায় তাহাই ছিল। একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক মাটিতে বসিয়া বৃদ্ধের পা দুইখানি ধরিয়া কি বলিতেছেন। সেই স্ত্রীলোকের পার্শ্বে সাত—আট বৎসরের এক বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল।

দিদিমণি বরাবর গিয়া সেই ঘরের দ্বারে এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। খপ করিয়া আমি গিয়া দিদিমণির হাত ধরিয়া ফেলিলাম। তাহার পর আমরা সকলেই সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যে স্ত্রীলোক বৃদ্ধের পা ধরিয়া ছিলেন, তিনি এখন কাঁদ—কাঁদ মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন, 'বাবা, অপরাধ করিয়াছি সত্য! কিন্তু আমি তোমার কন্যা। শত অপরাধ করিলে কন্যাকে ক্ষমা করিতে হয়! এই মেয়েটিকে লইয়া আমি এখন কোথায় যাই?'

বৃদ্ধ অতি নিষ্ঠুর ভাষায় বলিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তোর আমি মুখ দেখিব না। কালামুখ লইয়া এ বাড়ী হইতে এখনই দূর হইয়া যা।'

স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন, 'বাবা! আমি কোনোরূপ দুষ্কর্ম করি নাই, স্বামীর ঘরে গিয়াছি, এই মাত্র।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'তুই দূর হ, আমার সম্মুখ হতে দূর হ।' স্ত্রীলোকটি অবশেষে বলিলেন, 'আচ্ছা বাবা, আমি দূর হইতেছি কিন্তু আমার কন্যাটি তো কোনো অপরাধ করে নাই। ইহাকে আমি তোমার নিকট রাখিয়া যাইতেছি। পাতের হাতের দুইটি ভাত দিয়া ইহাকে প্রতিপালন করিয়ো।'

সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, 'তোর ঝাড় আমার এ বাড়িতে থাকিতে পারিবে না। দূর দূর, এখনি দূর হ।'

স্ত্রীলোক ও তাঁহার কন্যা সত্বর দূর হইতেছে না, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ রাগে অন্ধ হইয়া পড়িলেন। ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া তিনি সেই বেহালার বাড়ি কন্যার মাথায় মারিয়া বসিলেন। কন্যার মাথা হইতে দর দর ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। গাল বাহিয়া সেই রক্ত মাটিতে পড়িল।

এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া সেই স্ত্রীলোক তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার যেন আগুনের ফিনকি বাহির হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'বাবা! তুমি এ কাজ করিলে!!! যাহা হউক, আমি তোমাকে কিছু বলিব না। কিন্তু আজ হইতে তোমার লক্ষ্মী ছাড়িল।'

এই কথা বলিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকটি সেই ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাহার পর দালানের ভিতর দিয়া উঠানে গিয়া নামিলেন। তাহার পর উঠান পার হইয়া বাড়ির বাহির চলিয়া গেলেন।

যেই তিনি বাড়ির বাহির হইলেন, আর বৃদ্ধ ভয়ানক চিৎকার করিয়া সেই তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন। সেই সময় ঝাড়লণ্ঠন সব নিবিয়া গেল। প্রতিমা, পুরোহিত, লোকজন সব অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ঢাকঢোলের কলরব সব থামিয়া গেল।

অন্ধকারে আমি পিতেমের কথা শুনিতে পাইলাম। পিতেম বলিল, 'শামী! সীতা তোমার কাছে আছে?'

আমি উত্তর করিলাম, 'হাঁ, আমি তাহাকে ধরিয়া আছি।'

পিতেম পুনরায় বলিল, 'তবে চল, ঘরে চল।'

পঞ্চম অধ্যায় পূর্ব—বিবরণ

সকলে পুনরায় অলক ঠাকরুণের ঘরে যাইলাম। সীতা তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে আর কোনো উপদ্রব হইল না।

কিন্তু সে রাত্রিতে আমাদের নিদ্রা হইল না। আমরা সকলে বসিয়া রহিলাম। পিতেম তখন আমাকে সকল কথা বলিল। পিতেম বলিল—

'ওই যে বৃদ্ধ দেখিলে, উনি বাড়ির কর্তা ছিলেন। উঁহার নাম জগমোহন রায়চৌধুরী ছিল। উনি বড়ো দুর্দান্ত লোক ছিলেন। একবার যাহা বলিতেন তাহাই করিতেন, তা সে ভালোই হউক আর মন্দই হউক। পৃথিবীতে তাঁহার কেবল একটি শখ ছিল। বেহালা বাজাইতে তিনি বড়ো ভালোবাসিতেন। সময় নাই, অসময় নাই, সর্বদাই তিনি বেহালা বাজাইতেন। বিশেষত ঝড় বাতাস বাদলার রাত্রিতে তাঁহার শখটি কিছু প্রবল হইত। অলক ঠাকরুণ তাঁহার ভগিনী। জগমোহন রায়ের এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। পুত্র সীতার মামা, যিনি এখন

পশ্চিমে কাজ করেন। বড়ো কন্যার নাম ছিল রামমণি, যাঁহার ভূতকে সীতা মাঠের মাঝখানে গাছতলায় দেখিয়াছিল। ছোটো মেয়ের নাম ছিল তারামণি, তিনি সীতার মা। রায়চৌধুরী বড়োমানুষ লোক, কোন পুরুষে কন্যা শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতেন না। কিন্তু রামমণির এক তেজস্বী পুরুষের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, 'ঘর—জামাই হইয়া আমি কিছুতেই থাকিব না।' আপনার স্ত্রীকে তিনি নিজের বাড়ি লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু কর্তা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শ্বশুর—জামাতায় ঘোর বাদ—বিসম্বাদ বাধিয়া গেল। অবশেষে কর্তা একদিন রামমণিকে ডাকিয়া জামাতার সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ইহাকে চাও—না আমাকে চাও।' রামমণি উত্তর করিলেন, 'বাবা! তুমি পিতা বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পতিই সর্বস্ব।' এই উত্তর শুনিয়া কর্তা ঘোরতর রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, 'বটে! তবে এখনি আমার বাড়ি হইতে দূর হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ হইতে আমি তোমার মুখ দেখিব না।' রামমণি শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। নয়—দশ বৎসর স্বামীর ঘর করিলেন। তাঁহার একটি কন্যা হইল। পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত তিনি একটি পয়সাও রাখিয়া যান নাই। রামমণি ঘোর বিপদে পড়িলেন।

পিতাকে কয়েকখানি পত্র লিখিলেন। পিতা কোনো উত্তর দিলেন না। অবশেষে ভাবিলেন, 'পূজার সময় লোকের মন নরম হয়। এই পূজার সময় বাবার পায়ে গিয়া পড়ি, তাহা হইলে তিনি বোধহয় ক্ষমা করিবেন।' পূজার সময় কন্যাকে লইয়া রামমণি পিতার বাটীতে আসিলেন। তাহার পর তোমরা এইমাত্র যাহা দেখিলে, অষ্টমীর দিন সত্য সত্যই সেই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। কন্যার হাত ধরিয়া রামমণি চলিয়া গেলেন। পক্ষাঘাত রোগ হইয়া কর্তা তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ পরে তুমুল ঝড় উঠিল, সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। পরদিন সকলে দেখিল যে, রামমণি ও তাঁহার কন্যা দুজনেই মাঠের মাঝখানে গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া আছেন। কর্তা আরও কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতেই আর তিনি কথা কহিতে পারেন নাই, কী উঠিয়া বসিতে পারেন নাই। সেই তাঁহার লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল। জমিদারি, টাকাকড়ি কীরূপে কোথায় যে উড়িয়া গেল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ঘরজামাই রাখার অহঙ্কারও সেই সঙ্গে দূর হইল। সেজন্য সীতার মাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে আর কোনো আপত্তি রহিল না। কর্তা রামমণি ও তাঁহার কন্যা—তিনজনেই এখন ভূত হইয়া আছেন। কতবার গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোনো ফল হয় নাই।'

পরদিন প্রাতঃকালে আমি ভাবিলাম যে, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, সেও স্বীকার; তবু সীতাকে লইয়া সে বাড়িতে আর আমি থাকিব না। সীতার ভাই, তোমার মামাকে আমি পত্র লিখিলাম। ভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁহার একটি কর্ম হইয়াছিল। তিনি আসিয়া আমাকে ও সীতাকে তাঁহার নিজের বাড়িতে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সীতার বিবাহ হইল। তাহার পর তুমি ও প্রভা হইলে। কিছুদিন পরে তোমার পিতার কাল হইল। অল্পদিন পরে দিদিমণিও তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে গেলেন। দিদিমণিকে হারাইয়া কী করিয়া আমি যে প্রাণ ধরিয়া আছি তাহাই আশ্চর্য। যাহা হউক, তোমাদের দুইজনকে পাইয়া আমি শোক অনেকটা নিবারণ করিতে পারিয়াছি। মা দুর্গা তোমাদিগকে আর যত ছেলেপিলেকে বাঁচাইয়া রাখুন।'

সে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুপে এসে জিগেস করলে, দাদামশাই, তুমি তো বললে শনিবারে সে আসবে তোমার নেমন্তন্নে। কী হল।
সবই ঠিক হয়েছিল। হাজি মিঞা শিককাবাব বানিয়েছিল, তোফা হয়েছিল খেতে।
তার পরে?
তার পরে নিজে খেলুম তার বারো—আনা আন্দাজ, আর পাড়ার কালু ছোঁড়াটাকে দিলুম বাকিটুকু। কালু বললে, দাদাবাবু, এ—যে আমাদের কাঁচকলার বড়ার চেয়ে ভালো।
সে কিছু খেল না?
জো কী।
সে এল না?
সাধ্য কী তার।
তবে সে আছে কোথায়?
কোত্থাও না।
ঘরে?
না।
দেশে?
না।
বিলেতে?
না।
তুমি যে বলছিলে, আণ্ডামানে যাওয়া ওর এক রকম ঠিক হয়ে আছে। গেল নাকি?
দরকার হল না।
তা হলে কী হল আমাকে বলছ না কেন।
ভয় পাবে কিংবা দুঃখ পাবে, তাই বলি নে।
তা হোক, বলতে হবে।
আচ্ছা, তবে শোনো। সেদিন ক্লাস—পড়াবার খাতিরে আমার পড়ে নেবার কথা ছিল 'বিদগ্ধ— মুখমণ্ডন'। এক সময় হঠাৎ দেখি, সেটা রয়েছে পড়ে, হাতে উঠে এসেছে 'পাঁচুপাকড়াশির পিসশাশুড়ি'। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাত হবে তখন আড়াইটা স্বপ্ন দেখছি, গরম তেল জ্বলে উঠে আমাদের কিনি বামনির মুখ বেবাক গিয়েছে পুড়ে; সাত দিন সাত রাত্তির হত্যে দিয়ে তারকেশ্বরের প্রসাদ পেয়েছে দু'কৌটো লাহিড়ি কোম্পানির মুনলাইট স্নো; তাই মাখছে মুখে ঘ'ষে ঘ'ষে। আমি বুঝিয়ে বললুম, ওতে হবে না গো, মোষের বাচ্ছার গালের চামড়া কেটে নিয়ে মুখে জুড়তে হবে, নইলে রঙ মিলবে না। শুনেই আমার কাছে সওয়া তিন টাকা ধার নিয়ে সে ধর্মতলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে। এমন সময় ঘরে একটা কী শব্দ শোনা গেল, কে যেন হাওয়ার তৈরি চটিজুতো হূস হূস করে টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধড়ফড় করে উঠলেম, উসকে দিলেম লণ্ঠনটা। ঘরে একটা—কিছু এসেছে দেখা গেল কিন্তু সে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়ফড় করছে, তবু জোর গলা করে হেঁকে বললুম, কে হে তুমি। পুলিস ডাকব নাকি।

অদ্ভুত হাঁড়িগলায় এই জীবটা বললে, কী দাদা, চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার পুপেদিদির সে। এখানে যে আমার নেমন্তন্ন ছিল।

আমি বললুম, বাজে কথা বলছ, এ কী চেহারা তোমার!

সে বললে, চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছ? মানে কী হল।

মানেটা বলি। পুপেদিদির ঘরে ভোজ, সকাল—সকাল নাইতে গেলেম। বেলা তখন সবেমাত্র দেড়টা। তেলেনিপাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে কষে মুখ মাজছিলুম; মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এল যে, ঢুলতে ঢুলতে ঝুপ করে পড়লুম জলে; তার পরে কী হল জানি নে। উপরে এসেছি কি নীচে কি কোথায় আছি জানি নে, পষ্ট দেখা গেল আমি নেই।

নেই!

তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—

আরে আরে, গা ছুঁতে হবে না, বলে যাও।

চুলকুনি ছিল গায়ে; চুলকতে গিয়ে দেখি, না আছে নখ, না আছে চুলকনি। ভয়ানক দুঃখ হল। হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলুম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে হাউহাউটা বিনা মূল্যে পেয়েছিলুম সে গেল কোথায়। যত চেঁচাই চেঁচানোও হয় না, কান্নাও শোনা যায় না। ইচ্ছে হল, মাথা ঠুকি বটগাছটাতে ; মাথাটার টিকি খুঁজে পাই নে কোথাও। সব চেয়ে দুঃখ—বারোটা বাজল, 'খিদে কই' 'খিদে কই' বলে পুকুরধারে পাক খেয়ে বেড়াই, খিদে—বাঁদরটার চিহ্ন মেলে না।

কী বকছ তুমি, একটু থামো।

ও দাদা, দোহাই তোমার, থামতে বোলো না। থামবার দুঃখ যে কী অ—থামা মানুষ সে তুমি কী বুঝবে। থামব না, আমি থামব না, কিছুতেই থামব না, যতক্ষণ পারি থামব না।

এই বলে ধুপধাপ ধুপধাপ করে লাফাতে লাগল, শেষকালে ডিগবাজি খেলা শুরু করলে আমার কার্পেটের উপর, জলের মধ্যে শুশুকের মতো।

করছ কী তুমি।

দাদা, একেবারে বাদশাহি থামা থেমেছিলুম, আর কিছুতেই থামছি নে। মারধোর যদি কর সেও লাগবে ভালো। আস্ত কিলের যোগ্য পিঠ নেই যখন জানতে পারলুম, তখন সাতকড়ি পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে করে বুক ফেটে যেতে চাইল, কিন্তু বুক নেই তো ফাটবে কী। কই—মাছের যদি এই দশা হত তা হলে বামুনঠাকুরের হাতে পায়ে ধরত তাকে একবার তপ্ত তেলে এপিঠ ওপিঠ ওলটাতে পালটাতে। আহা, যে পিঠখানা হারিয়েছে সেই পিঠে পণ্ডিতমশায়ের কত কিলই খেয়েছি, ইঁট দিয়ে তৈরি খইয়ের মোয়াগুলোর মতো। আজ মনে হয়, উঃ—দাদা, একবার কিলিয়ে দাও খুব করে দমাদম—

বলে আমার কাছে এসে পিঠ দিলে পেতে।

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, যাও যাও, সরে যাও।

ও বললে, কথাটা শেষ করে নিই। একখানা গা খুঁজে খুঁজে বেড়ালুম গাঁয়ে গাঁয়ে। বেলা তখন তিন পহর। যতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা হচ্ছি নে, এই দুঃখটা যখন অসহ্য এমন সময় দেখি, আমাদের পাতুখুড়ো মুচিখোলার বটগাছতলায় গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র। মনে হল, তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হয়ে ব্রহ্মতালুর চুড়োয় এসে জোনাক—পোকার মতো মিটমিট করছে। বুঝলুম, হয়েছে সুযোগ। নাকের গর্ত দিয়ে আত্মারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলুম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগরা জুতোর ভিতরে যেমন করে পা'টা ঠেসে গুঁজতে হয়। সে হাঁপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় বলে উঠল, কে তুমি বাবা, ভিতরে জায়গা হবে না।

তখন তার গলাটা পেয়েছি দখলে; বললুম, তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি।

সে গোঁ গোঁ করতে করতে বললে, অনেকখান বেরিয়েছি, একটু বাকি। ঠেলা মারো।

দিলুম ঠেলা, হুস করে গেল বেরিয়ে।

এ দিকে পাতুখুড়োর গিন্নি এসে বললে, বলি, ও পোড়ারমুখো।

কান জুড়িয়ে গেল। বললুম, বলো বলো, আবার বলো, বড়ো মিষ্টি লাগছে, এমন ডাক যে আবার কোনোদিন শুনতে পাব এমন আশাই ছিল না।

বুড়ি ভাবলে ঠাট্টা করছি, ঝাঁটা আনতে গেল ঘরের মধ্যে। ভয় হল, পড়ে—পাওয়া দেহটা খোয়াই বুঝি। বাসায় এসে আয়নাতে মুখ দেখলুম, সমস্ত শরীর উঠল শিউরে। ইচ্ছে করল ঝাঁদা দিয়ে মুখটাকে ছুলে নিই।

গা—হারার গা এল, কিন্তু চেহারা—হারার চেহারাখানা সাত বাঁও জলের তলায়, তাকে ফিরে পাবার কী উপায়।

ঠিক এই সময়ে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর খিদেটাকে পাওয়া গেল। একেবারে জঠর জুড়ে। সব কটা নাড়ি চোঁ চোঁ করো উঠেছে একসঙ্গে। চোখে দেখতে পাই নে পেটের জ্বালায়। যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা। উঃ কী আনন্দ।

মনে পড়ল, তোমার ঘরে পুপুদিদির নেমন্তন্ন। রেলভাড়ার পয়সা নেই। হেঁটে চলতে শুরু করলুম। চলার অসম্ভব মেহন্নতে কী যে আরাম সে আর কী বলব। স্ফূর্তিতে একেবার গলদঘর্ম। এক এক পা ফেলছি আর মনে মনে বলছি, থামছি নে, থামছি নে, চলছি তো চলছিই। এমন বেদম চলা জীবনে কখনো হয় নি। দাদা, পুরো একখানা গা নিয়ে বসে আছ কেদারায়, বুঝতেই পার না কষ্টতে যে কী মজা। এই কষ্টে বুঝতে পারা যায়, আছি বটে, খুব কষ্টে আছি, ষোলো—আনা পেরিয়ে গিয়ে আছি।

আমি বললুম, সব বুঝলুম, এখন কী করতে চাও বলো।

কার্তিক—পুজোর ভূত

হেমেন্দ্র কুমার রায়

নতুন মেস—বাড়ি। খাওয়া—দাওয়ার ব্যাপারে এখনও ব্যবসাদারির গন্ধ বিকটভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি। এখনও মাছের ঝোলে কেবল আঁশ বা কাঁটার বদলে সত্যিকার মৎস্য পাওয়া যায়, এখনও ডাল বলতে বোঝায় না কেবল ঘোলাটে জল এবং এখনও আলুর দম বা কালিয়ায় তৈলের ব্যবস্থা হয়নি ঘৃতাভাবে।

তেতলায় পাশাপাশি তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে তিন বন্ধুতে দিব্য আরামে হাত—পা ছড়িয়ে বাস করছিল। তিন বন্ধু—অর্থাৎ অটল, পটল ও নকুলের কথা বলছি। কিন্তু একটু গোলমাল বাধল। চাঁদের আলো এবং ফুলের গন্ধের মতন মানুষের সুখ—শান্তিও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ভগবানের সৃষ্টির এই সব অসংগতি ও অপূর্ণতা নিয়ে অটল, পটল ও নকুল একসঙ্গে বিলক্ষণ মাথা ঘামিয়েছে, কিন্তু সংগত কারণ খুঁজে পায়নি।—ব্যাপারটা এই।

সেদিন সকালবেলায় মেসের কর্তার ঘরে বসে অটল, পটল ও নকুল চা—পান ও হালুয়া ভক্ষণ করছে, এমন সময় একটি নতুন লোকের আবির্ভাব।

লোকটির মাথায় বাবরি—কাটা চকচকে চুল, গোঁফটির দুই প্রান্ত সুচারুরূপে পাকানো, গায়ের পালতা ফিনফিনে পাঞ্জাবির তলা থেকে রাঙা গেঞ্জির রং ফুটে বেরুচ্ছে, পায়েও রঙিন মোজা ও বাহারি জুতো। কিন্তু বেচারার শৌখিনতা প্রকাশের এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে একটিমাত্র কারণে। তার ডান চোখটি কাণা!

কিন্তু তার সেই একটিমাত্র চক্ষু যেমন তীক্ষ্ন, তেমনি চটুল ও চটপটে। ঘরে ঢুকেই বোধ হয় আধ—সেকেন্ডের মধ্যেই সেখানে বিরাজমান চার মূর্তির আপাদমস্তক সে ভালো করে দেখে নিলে।

মেসের কর্তা শুধোলেন, 'মশাই কি চান?'

—'আমার নাম ননীনাথ নাগ। এই মেসে বাসা বাঁধতে চাই। এখানে আগেও একবার বাসা বেঁধেছিলুম।'

—'তা কী করে হবে? আমার এ—মেসের জন্ম হয়েছে মোটে একমাস।'

—'তা হতে পারে। কিন্তু এখানে আগেও একটি মেস ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে তিন বৎসর।'

—'ও, বটে বটে? এ—খবরটা আমি জানতুম না।'

—'মশাই তাহলে নতুন মালিক? বেশ, বেশ! বলি, এখানে একখানা ঘর—টর খালি পাওয়া যাবে?'

—'দোতলার সব ঘর ভরতি। তেতলার একখানা ঘর খালি আছে—'

ননী একেবারে আঁতকে উঠে একটিমাত্র চক্ষুকে দুইগুণ বাড়িয়ে তুলে বললে, 'ওরে বাপরে, তেতলায়? অসম্ভব!'

—'অসম্ভব? কি অসম্ভব?'

—'তেতলায় থাকা।'

—'কেন?'

—'আগে এখানকার তেতলায় কেউ থাকত না। অর্থাৎ থাকতে চাইত না।'

—'কেন?'

—'আগে তেতলায় ওঠবার সিঁড়ির দরজায় লাগানো থাকত তালা—চাবি।'

—'কেন মশাই, কেন?'

—'আগে সন্ধের পর কেউ এখানে তেতলার নাম পর্যন্ত মুখে আনত না।'

—'আরে মশাই,—কেন, কেন কেন? নিজের মনে খালি বকবকই করে যাচ্ছেন, আসল কথা বলবার নাম নেই!'

ননী মালিকের মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে একটিমাত্র চক্ষু মুদে বললে, 'নিতান্তই শুনবেন তাহলে?'

—'নিশ্চয় শুনব। আলবত শুনব! না শুনে আপনাকে ছাড়ব না। এমন খাসা তেতলার চারিদিক—খোলা ঘর, কেন এখানে কেউ থাকত না?'

ননী কণ্ঠস্বর নামিয়ে, অদ্বিতীয় চক্ষুটিকে প্রাণপণে বিস্ফারিত করে বললে, 'আজ্ঞে, তেতলায় যে একজন আছেন!'

অটল চায়ের পেয়ালা নামিয়ে এতক্ষণ পর বললে, 'একজন আছেন মানে?'

পটল বললে, 'কে বলে একজন? আমরা হচ্ছি তিনজন।'

ননী হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'ভালো কাজ করেননি।'

মালিক খাপ্পা হয়ে বললেন, 'এসব কথার মানে? আপনি কি আমার মেসের লোক ভাঙাতে এসেছেন?'

—'তাতে আমার লাভ?'

—'তবে এত বাজে বকছেন কেন?'

—'বেশ মশাই, আমি আর কিছু বলতে চাই না। একতলার কোনো ঘর যদি খালি থাকে তো বলুন। না থাকে, পোঁটলা—পুঁটলি নিয়ে ধুলো—পায়েই প্রস্থান করব।'

—'একতলার তিনখানা ঘর খালি আছে, আপনি যেখানা খুশি নিতে পারেন।'

অটল বললে, 'কিন্তু মহাশয়, আপনি আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করেছেন। আমাদের কৌতূহল আবার যতক্ষণ না নিদ্রিত হয়, ততক্ষণ আপনাকে এইখানেই বন্দি হয়ে থাকতে হবে।'

পটল বললে, 'তেতলা আপাতত আমাদের অধিকারে। সুতরাং আসল কথা জানবার অধিকার আমাদের আছে।'

নকুল মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'তেতলায় একজন আছেন মানে কী?'

ননী একখানা 'মোড়া' টেনে নিয়ে বসে পড়ে নাচার ভাবে বললে, 'তবে সব কথাই শুনুন মশাই। এর মেস—বাড়ির তেতলায় বাস করেন গদাধর গাঙ্গুলী।'

মালিক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি পাগল?'

অটলও বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'গদাধর গাঙ্গুলী! তিনি থাকেন তেতলায়, অথচ আমরা কেউ জানি না। আমাদের তিন—জোড়া চোখ কি অন্ধ?'

ননী বললে, 'লক্ষজোড়া চর্মচক্ষু থাকলেও গদাধর গাঙ্গুলীকে দেখা যায় না। তিনি অশরীরী।'

পটল ও নকুল চমকে উঠে বললে, 'কী বললেন?'

—'তিনি অশরীরী। আহা, একদা তিনিও শরীরী ছিলেন। তিন বছর আগে আমি যখন এই মেসে ছিলুম, তার কিছু আগেই তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন।'

অটল, পটল ও নকুলের দেহ রীতিমতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

মালিক হতভম্বের মতো কেবল বললেন, 'মানে?'

ননী বললে, 'মানে হচ্ছে এই। আমি এই মেসে আসবার কিছুকাল আগে তেতলার একটি ঘরে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে গদাধর গাঙ্গুলী নামে একটি ভদ্রলোক আফিম খেয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন।'

মালিক বললেন, 'এতক্ষণ পরে তবু কিছু হদিস পাওয়া গেল। তারপর?'

—'তারপর কিন্তু দেহত্যাগ করেও গদাধরবাবু এই মেসের তেতলার ঘরের মায়া ত্যাগ করতে পারেননি। অনেকেই তাঁকে তেতলার ছাদে বেড়িয়ে বেড়াতে দেখেছে—এমনকী তাঁর শখের গান গাইতেও শুনেছে।'

—'শখের গান?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমিও দোতলা থেকে তাঁর শখের গানটি শুনেছি।'

—'সেই শখের গানটি কী?'

ননী সুরে বললে—

'বাজে তালি, বাজে ধামা।
ওরে যদু! আরে মধু!
শোন গাই সা—রে—গা—মা!
ধেড়ে—কেটে, তেড়ে—কেটে—লেগে যায় তাক!
মোর গীতে ভেঙে যায় দুনিয়ার জাঁক!
দীপকের তা—না—না—না,
শুনে যাও মামী—মামা!
গিটকিরি শুনে ডেকে ওড়ে কাক—চিল,
উৎসাহে নিধু মারে যাকে—তাকে কিল!
ছোটে গাধা, ছোটে ধোপা,
ছোটে খোকা দিয়ে হামা।'

মালিক অভিভূতের মতন বললেন, 'আহা, কী গান! শুনলে অশ্রুবর্ষণ করা অনিবার্য।'

অটল করুণভাবে বললে, 'নিশ্চয়। আমারও পাষণ্ড চক্ষু সজল হবার চেষ্টা করছে। কারণ আমি ওই তেতলাতেই থাকি।'

পটল সায় দিয়ে বললে, 'আমারও ওই অবস্থা—যদিও এখনও গদাধরবাবুর নিজের মুখের গান শোনবার সৌভাগ্য হয়নি।'

নকুল ম্রিয়মাণ ভাবে বললে, 'বোধ হয় তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমরা রাত দশটা বাজবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি।'

ননী বললে, 'ঠিক আন্দাজ করেছেন! যাঁরা পৃথিবীর দেহত্যাগ করেও পৃথিবীতে বাস করেন, রাত বারোটা বাজবার আগে তাঁদের দেখা পাওয়া অসম্ভব।'

অটল বললে, 'তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি কিছুমাত্র ব্যাকুল নই।'

ননী বললে, 'ব্যাকুল না হতে পারেন, কিন্তু আমি শুনেছি গদাধরবাবু প্রতি বৎসরে একদিন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে জোর করে আলাপ করবার চেষ্টা করেন। সেদিন নাকি ইচ্ছা করলেই সবাই তাঁকে দেখতে পায়।'

মালিক বললেন, 'মানে?'

—'গঙ্গাধরবাবু প্রতি বৎসরে একরাত্রে তাঁর বাৎসরিক কর্তব্যপালন করতে আসেন।'

—'মানে?'

—'যে তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, প্রতি বৎসরে ঠিক সেই তারিখেই গদাধরবাবু আবার চর্মচক্ষুগোচর দেহ ধারণ করেন। আবার আফিম খান। আবার আর্তনাদ করেন এবং তারপর আবার মরেও মারা পড়েন।'

মালিক বললেন, 'রাত বারোটার পরে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'রাত বারোটার পরে কলকাতার কোনো আফিমের দোকান খোলা থাকে না।'

—'মশাই, এসব হচ্ছে পরলোকের কথা। পরলোকে কোন দোকান কখন বন্ধ হয়, আমি তা কেমন করে বলব? ইহলোকের সমস্ত নখদর্পণে—কোন পাড়ায় ক—টা গাঁজা—আফিমের দোকান আছে তাও বলে

দিতে পারি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরলোক সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।'

মালিক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'এইসব গাঁজাখুরি গল্প বলে আপনি কি আমার মেসবাড়ির দরজা বন্ধ করতে এসেছেন?'

ননীও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'গাঁজা? আমি ভদ্রলোক। গাঁজার দোকানের ঠিকানা জানি বটে, কিন্তু গাঁজা কাকে বলে জানি না। আমি এসেছি মেসের একখানি ঘর নিতে। একতলায় একখানি ঘর পেলেই আমি খুশি হব।'

মালিক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন। কিন্তু আপনাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি আগাম টাকা চাই।'

ননী বললে, 'তাই নিন না। এ—বাড়ির তেতলার ঘর ছাড়া আর সব ঘরেই যেতে আমি প্রস্তুত। বিশেষ আজকের রাত্রে।'

মালিক বললেন, 'আজকের রাত্রে? মানে?'

ননী বললে, 'গদাধরবাবু মরদেহ ত্যাগ করে নাকি কার্তিক পুজোর রাত্রে। তিনি বাৎসরিক ব্রত পালন— অর্থাৎ আবার আফিম খেয়ে দেহত্যাগ করতে আসেন, ঠিক সেই রাত্রেই। এটা তাঁর কি খেয়াল জানি না, কিন্তু শুনেছি, কার্তিক—পুজোর রাত্রে তিনি আবার একবার দেহত্যাগ করবার অভিনয় না করে থাকতে পারেন না। অনেকটা সাপের খোলস ত্যাগের মতনই আর কি। চলুন মশাই, এসব বাজে কথা থাক। একতলায় আমাকে একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসবেন চলুন।'

ননীকে নিয়ে মালিক প্রস্থান করলেন।

অটল কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শিস দিতে দিতে হঠাৎ থেমে বললে, 'আজই কার্তিক—পুজো।'

পটল দুঃস্বপ্নাভিভূতের মতন বললে, 'কিন্তু গদাধরবাবু যে কোন ঘরে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে আফিম খেয়ে তাঁর বাৎসরিক ব্রত পালন করেন, সে কথা তো জিজ্ঞাসা করা হল না।'

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে নকুল বললে, 'জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। যতটুকু শুনেছি, তাই—ই যথেষ্ট। আজ যদি সৌভাগ্যক্রমে গদাধরবাবুর সঙ্গে দেখা না হয়, তাহলে কালকেই এ বাসাকে নমস্কার করে সরে পড়ব।'

অটল ও পটল একসঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞের মতন বললে, 'হ্যাঁ।'

সে—রাত্রে অটল, পটল ও নকুল এক—একখানা ঘরে একলা থাকা যুক্তিসংগত বা নিরাপদ বলে মনে করল না। পটল ও নকুল আপন আপন ঘর ত্যাগ করে অটলের বিছানায় ডান ও বাম পাশে নিজেদের বিছানা পেতে নিলে।

গদাধরবাবুকে বাধা দেবার জন্যে অটল ঘরের সমস্ত দরজা—জানালা ভালো করে বন্ধ করে দিতে লাগল।

পটল বললে, 'অটল, ননীর কাহিনি বিশ্বাস করলে বলতে হয়, গদাধরবাবু হচ্ছেন সূক্ষ্মদেহধারী। সূক্ষ্মদেহের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, ইট—কাঠ—পাথরও ভেদ করে আনাগোনা করা যায়।'

নকুল বললে, 'পটল, স্তব্ধ হও। সাবধানের মার নেই।'

নিজের বিছানার উপর এসে বসে অটল বললে, 'ঘড়িতে দেখছি রাত দশটা বাজে। ঘুমোবার সময় হল। কিন্তু আজ আমরা কি করব? ঘুমবো? না গদাধরের আগমন—প্রতীক্ষা করব?'

নকুল হাই তুলে বললে, 'রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। মারাত্মক বললেও চলে।'

পটল লেপের ভিতর ঢুকতে—ঢুকতে বললে, 'আমারও ওই মত। গদাধরবাবুর বাৎসরিক অভিনয় দেখবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি ঘুমিয়ে তাঁকে ফাঁকি দিতে চাই।'

অটল বললে, 'আমার বিশ্বাস, গদাধরবাবুর কথা হচ্ছে রীতিমতো উপকথা। উপদেবতার কথা মাত্রই উপকথা। সুতরাং অকারণে জেগে থেকে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। আলো নেবাও—ঘুমিয়ে পড়।'

মিনিট—পাঁচেক পরেই তিনটে তন্দ্রা—পুলকিত নাসা—যন্ত্রের প্রচণ্ড ঘড়র—ঘড়র—মন্ত্রে একান্ত সন্ত্রস্ত হয়ে দেওয়ালবাসী টিকটিকিরা পর্যন্ত ভেন্টিলেটারের ভিতর দিয়ে বাইরে পলায়ন করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারা এতদিন একা অটলের নাসিকা—ধ্বনিকে কোনোক্রমে সহ্য করে ছিল। কিন্তু একসঙ্গে অটল—পটল

—নকুলের তর্জনগর্জনময় নাসা—ভাসা! এ হচ্ছে দস্তুরমতো মেছোহাটার কোলাহল! যেকোনো জীবের পক্ষেই সহ্য করা অসম্ভব।

কার্তিক মাসের শেষ—তারিখের ভিজে হিমেল—হাওয়া। কনকন কনকন। পটলের ঘুম গেল ছুটে। ধড়মড় করে উঠে বসে সে বলে উঠল, 'ওরে বাপ রে বাপ! কী ঠান্ডা!'

সবচেয়ে বেশি শীত—কাতুরে নকুল এর আগেই জেগে উঠেছিল। সে লেপের মাঝখানে ঢুকে গিয়ে ঘুম—জড়ানো স্বরে বললে, 'আমার মনে হচ্ছে, আমি এভারেস্টের সর্বোচ্চ শিখরের উপরে আরোহণ করে আছাড় খেয়েছি।'

পটল বাক্যব্যয় করলে না। এপাশ থেকে ওপাশে ফিরে শুলো।

অটল বললে, 'বিস্মিত, হতভম্ব স্বরেই বললে, 'কিন্তু হাওয়া আসে কোত্থেকে? আমি নিজের হাতেই সব জানালা বন্ধ করে দিয়েছি!'

নকুল একটিমাত্র চক্ষু উন্মোচন করে বললে, 'সার্সিহীন পুরোনো জানলা, আলগা ছিটকিনি—হয়তো জোর—হাওয়া লাগলেই খুলে যায়।'

—'হতে পারে। কিন্তু এর আগে ওই উত্তুরে জানলাটা এমন অসময়ে আর কখনো খুলে যায়নি'—এমনি গজ গজ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে অটল সশব্দে আবার জানলাটা বন্ধ করে দিলে।

তারপর পুনর্বার ত্রিনাসিকা মুখর হয়ে উঠল—এবং খানিক পরে আবার ভালো করে ঘুমোতে না ঘুমোতেই ভেঙে গেল তাদের ঘুম। সেই ঠান্ডা হাড়—কাঁপানো বাতাস! উত্তরের জানলাটা আবার খুলে গিয়েছে।

অটল চিন্তিত ভাবে বললে, 'ব্যাপারটা ভালো বলে বোধ হচ্ছে না।'

পটল বললে, 'রীতিমত সন্দেহজনক! জানলার এমন ব্যবহারের কল্পনা করা যায় না।—নকুল, উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো তো?'

নকুল দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'লেপের বাইরে যাবার ইচ্ছে আমার নেই।'

অটল বললে, 'নকুল, তুমি দেখছি মহা কাপুরুষ! একটা জানলা বন্ধ করবার সাহসও তোমার নেই? রাবিস!' সে শয্যাত্যাগ করবার উপক্রম করছে, এমন সময়ে গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজল।

নকুল শীতার্ত কণ্ঠে বললে, 'বারোটা!'

পটল ম্রিয়মাণ স্বরে বললে, 'প্রেত—নগরের সিংহদ্বার এইবারে খুলে গেল।'

অটল জানলা বন্ধ করবার জন্যে আর শয্যাত্যাগ করবার চেষ্টা করলে না। ঝাঁ—ঝাঁ রাতে ডাকছে খালি ঝিঁঝিঁ পোকারা। শহরের আর সব শব্দই যেন ভয়ে চুপ মেরে গিয়েছে। কিন্তু নীরবতার বক্ষ ভেদ করে একটা সুর শোনা যাচ্ছে না?

সুরটা আরও একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল। কে যেন বাইরে ছাদের কোণ থেকে গুন—গুন করে গাইছে—

'বাজে তালি, বাজে ধামা!
ওরে যদু! আরে মধু!
শোন গাই সা—রে—গা—মা।'

অটল আড়ষ্টভাবে বললে, 'ইস, এ যে গদাধরবাবুর গান!'

পটল বললে, 'নকুল, ভাই আমার! চটপট জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো তো।'

নকুল বললে, 'পাগল! গদাধরবাবু এসে আমাকে টানাটানি করলেও আমি আর লেপের ভেতর থেকে বেরুব না।'

গান থামল। ছাদের উপরে শোনা গেল কার পায়ের শব্দ।

অটল ক্ষীণ স্বরে বললে, 'আমার মনে হচ্ছে, গদাধরবাবু এই ঘরে এসেই আফিম খেতে চান।'

পটল আর নকুল একেবারে বোবা হয়ে গেল,—বোধ হয় তারা ভাবলে, বোবার শত্রু নেই।

পায়ের শব্দ থেমে গেল। খানিকক্ষণ সব নিঃসাড়। তারপরই একটা নতুনরকম ভয়াবহ শব্দ—ঠক, ঠক, ঠক! শব্দ হচ্ছে ঘরের ভিতরেই—পূর্বদিকে! এ যেন মাংসহীন অস্থিসার পায়ের শব্দ!

অটলের মাথার চুলগুলো তখন খাড়া হয়ে উঠেছে এবং দেহ হয়েছে অসম্ভব রকম রোমাঞ্চিত। তবু সে বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার করে ফস করে একটা কাঠি না জ্বেলে থাকতে পারলে না।

ঘরের কোথাও কেউ নেই। পটল আর নকুল দুজনেই লেপের তলায় অদৃশ্য।

দেশলাইয়ের কাঠি নিবে গেল। তারপর আবার ঘরের ভিতরে শব্দ হল ঠক, ঠক, ঠক! ঠক ঠকাঠক, ঠকাঠক, ঠকাঠক!

শীতেও ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে অটল ভাবতে লাগল, অতঃপর কি করা উচিত?—হঠাৎ তার মনে পড়ল প্রেততত্ত্ববিদদের কথা। প্রেতেরা নাকি প্রায়ই শব্দের সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করে। গদাধরবাবুও কি শব্দ করে কোন কথা বলতে চাইছেন?

অত্যন্ত কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে অটল বললে, 'এ—ঘরে যদি কেউ এসে থাকেন, তাহলে দয়া করে শুনুন। আমি প্রশ্ন করি, আপনি উত্তর দিন। আমার প্রশ্নের উত্তরে একবার শব্দ হলে বুঝব—'হ্যাঁ, আর দুবার শব্দ হলে বুঝব—'না'!

ঠক, ঠক, ঠক, ঠক, ঠক, ঠক!

—'মশাই', অত—বেশি শব্দ করে ভয় দেখালে মারা পড়ব। শুনুন। আপনি কি গদাধরবাবু?'

একবার শব্দ হল—ঠক! অর্থাৎ—'হ্যাঁ'।

—'আপনি কি বেঁচে আছেন?'

দুবার শব্দ হলে—ঠক, ঠক! অর্থাৎ—'না'।

দুই হাতে চেপে নিজের হৃদকম্প থামাবার চেষ্টা করে অটল বললে, আপনি কি এখানে আফিম খেতে এসেছেন?'

—ঠক। 'হ্যাঁ'।

—'আপনি কি আজ আফিম না খেয়ে থাকতে পারবেন না?'

—ঠক, ঠক। 'না'।

—'আমরা এখানে থাকলে আপনি কি রাগ করবেন?'

—ঠক। 'হ্যাঁ'।

—'আপনি নিশ্চয় আমাদের আক্রমণ করতে চান না?'

—ঠক। 'হ্যাঁ'।

পরমুহূর্তেই অটলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাত—পা—ওয়ালা মস্ত একটা দেহ। অটল বিছানা থেকে ছিটকে মেঝেয় গিয়ে পড়ে হাঁউ—মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল! এবং তার পরমুহূর্তেই পটল বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাপরে, গদাধর আমার ঘাড়ে চেপেছে রে!'

তারপরেই দড়াম করে খুলে গেল ঘরের দরজা এবং সেই অবস্থাতেই অটল বেশ বুঝতে পারলে যে, পটল ও নকুল চ্যাঁচাতে—চ্যাঁচাতে দুমদাম শব্দে ছাদের উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, সেও তৎক্ষণাৎ গদাধরবাবুকে ফাঁকি দিয়ে শুয়ে শুয়েই সরীসৃপের মতন সড়াৎ করে দরজার কাছে সরে গেল, তারপর উঠেই বাইরের ছাদের দিকে মারলে এক লম্বা লাফ।

অটল, পটল আর নকুল হুড়মুড় করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বারান্দার উপর নেমে দেখলে, এত রাতে সাত—পাড়া কাঁপানো গোলমাল শুনে মেসের সমস্ত লোক এসে জড়ো হয়েছে। সকলেই ব্যস্ত কণ্ঠে একই জিজ্ঞাসা—ব্যাপার কী, ব্যাপার কী?'

বারান্দার উপরে তিনজোড়া পা ছড়িয়ে বসে পড়ে তিন—মূর্তি হাঁপাতে লাগল তিনটে হাপরের মতো। মেসের মালিক শুধোলেন, 'ও অটলবাবু, কী হয়েছে বলুন না!'

অটল বাধো—বাধো গলায় বললে, 'গদাধরবাবু আমার ওপরে লাফিয়ে পড়েছিলেন।'

পটল বললে, 'না অটল। ভয়ের চোটে তোমার ওপরে ঝাঁপ খেয়েছিলুম আমিই। আর গদাধরবাবু লাফ মেরেছিলেন আমার পিঠের ওপরেই। আমার প্রতি তাঁর এই অন্যায় পক্ষপাতিতার মানে হয় না।'

নকুল বললে, 'না পটল। পালাতে গিয়ে তোমার ওপরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম আমিই। অন্ধকারে তুমি বুঝতে পারোনি।'

মালিক অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হা—হা করে হেসে বললেন, 'এরই নাম রজ্জুতে সর্পভ্রম! গদাধরবাবু হচ্ছেন গাঁজাখুরি গল্পের নায়ক। যান মশাই, যে—যার ঘরে যান। মিথ্যেই আমাদের ঘুম ভাঙালেন।'

অটল প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললে, 'মাপ করতে হল মশাই! কে ঘরে যাবে? সেখানে গদাধরবাবু এতক্ষণে হয়তো আফিম গুলতে শুরু করেছেন।'

মালিক বিপুল বিস্ময়ে বললেন, 'মানে?'

অটল বললে, 'হতে পারে দুরাত্মা পটল নির্বোদের মতন আমার ওপরে ঝাঁপ খেয়েছিল, কিন্তু—'

পটল বললে, 'হতে পারে কাপুরুষ নকুল ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আমার ওপরে হোঁচট খেয়েছিল, কিন্তু—'

নকুল বললে, 'কিন্তু আমাদের এই ভ্রমের দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তেতলায় গদাধরবাবু নেই। কারণ আমরা সবাই স্বকর্ণে তাঁর মার্কা—মারা গান, তাঁর পায়ের শব্দ আর ঠক ঠক ভাষায় তাঁর কথা শুনেছি।'

মালিক মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তাই তো, শুনেছেন নাকি?'

অটল বললে, 'নিশ্চয়! শুনেছি বলেই তো ভয় পেয়েছি।'

মেসের আর কেউ ননীর গল্প শোনেনি। সকলের কণ্ঠে একই প্রশ্ন জাগল—গদাধরবাবু কে?

মালিকের ইচ্ছা নয় যে, গদাধরবাবুর কাহিনি আর কারোর কর্ণগোচর হয়। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'গদাধরবাবু হচ্ছেন আমার পিসেমশাই, তাঁকে নিয়ে আপনাকের কারোর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অটলবাবু, পটলবাবু, নকুলবাবু আপনারা আমার ঘরেই আসুন। পিসেমশাই এত রাত্রে আপনাদের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আফিমের মৌতাত মাথায় চড়লে পিসেমশাইয়ের আর কোনো জ্ঞান থাকে না,—আরে ছোঃ!'

সকালের আলো দেখে তাদের পলাতক সাহস আবার প্রত্যাগমন করলে। মেসের মালিককে নিয়ে অটল নিজের ঘরে এসে ঢুকল, পটল এবং নকুলও গেল নিজের ঘরে! বলাবাহুল্য, বাৎসরিক ব্রত পালন করে গদাধরও তখন অদৃশ্য হয়েছেন।

অটল কৌতূহলী ভাবে ঘরের এদিকে ওদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে, এমন সময় পটল ঝড়ের মতন ছুটে এসে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে! আমার দরজার তালা ভাঙা! ট্রাঙ্কের তালা ভাঙা! আমার দশখানা দশ টাকার নোট চুরি গিয়েছে।'

তারপরে—প্রায় তার পিছনে—পিছনেই ছুটে এসে নকুলও সমাচার দিলে, তার বাক্সের ভিতর থেকে উধাও হয়েছে একশো পনেরো টাকা আট আনা।

অটল চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তার চাবির তোড়া থাকত মাথার বালিশের নীচে। বালিশ তুলে দেখা গেল, চাবি নেই—কিন্তু একখানা চিঠি আছে।

চিঠিখানা এই :

অটল—পটল—নকুলবাবু—

কাল সকালে গদাধর—কাহিনি বলে আমি বেশ একটি ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছিলুম—নয়? তারপর সেই আবহ রাত্রে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল দুই—দুইবার খোলা জানালা দেখে,—কি বলেন?

কিন্তু একটু কম—ভীতু হলে আপনারা অনায়াসেই অনুমান করতে পারতেন যে, বাহির থেকে অনায়াসেই খড়খড়ির পাখি তুলে হাত দিয়ে ছিটকিনি সরিয়ে জানালা খোলা যায়।

এ—ঘরের 'ভেন্টিলেটারে'র ছ্যাঁদা বড়ো হওয়াতে আমার ভারি সুবিধা হয়েছে।ওই পূর্বদিকের মাঝের জানালার উপরকার 'ভেন্টিলেটারে'র ফাঁক দিয়ে 'টোন'—সুতোর ডগায় একখণ্ড নুড়ি বেঁধে বাহির থেকে আমি ঘরের ভিতরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলুম, আর সুতোর অন্য প্রান্ত ছিল আমার হাতে। এই হচ্ছে ঠকঠক আওয়াজের গুপ্ত কারণ! বাহির থেকে কান পেতে আমিই সুতোয় টান মেরে অটলবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

গদাধরবাবুর গানটি এই অধীনেরই রচনা। ওটি কোনো মাসিকপত্রে ছাপিয়ে দিতে পারবেন?

আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের তেতলা থেকে তাড়ানো। কেন, তা বলা বাহুল্য।

আর বোধ হয় মহাশয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না—বিদায়।

ইতি—

আপনাদের শ্রীননী

ঘাড় বেঁকা পরেশ

মনোজ বসু

পরেশকে দেখেছেন? একবার দেখলে আর ভোলা যাবে না। ঘাড় বাঁদিকে বাঁকানো—বাঁ—হাত বাঁ—পায়ের সমসূত্রে। ভালো সার্জেন দিয়ে অপারেশন করিয়েছে। একবার নয়, তিন তিনবার। বাঁকা ঘাড় সোজা হয়নি। হবে না, জানা কথা। কিন্তু মন বোঝে না—অকারণ অর্থনষ্ট। শুনুন বলি, সোজা ঘাড় কেমন করে বাঁকল।

বউ বনেদি ঘরের মেয়ে। ভাই নেই, চার বোন তারা। মায়ের যা ছিল, চার বোন ভাগ করে নিয়েছে। সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে পরেশের বউ হঠাৎ মারা গেল। রোগের শুরু থেকেই অচেতন—মরার আগে একটি কথাও বলে যেতে পারেনি।

দুই ছেলে, এক মেয়ে। বিধবা দিদি আছেন সংসারে—দিদির উপর ছেলেমেয়েদের ভার চাপিয়ে পরেশ হিমালয়ে বেরুল। লোকে বলছে, আহা রে, পত্নী শোকে বিবাদী হয়ে বেরিয়ে গেল। হৃষিকেশের কাছে এক আশ্রমে আস্তানা নিয়েছে। পাহাড়—পর্বতে, বনে—জঙ্গলে অহরহ ঘুরে বেড়ায়—সাধু—সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষের খবর পেলেই চলে যায় সেখানে, যতদূর যত দুর্গমই হোক সে জায়গা। সৎপ্রসঙ্গ হয়, পরলোক—ঘটিত ব্যাপারগুলো পরেশ বেশি করে জানতে চায়। একটা সন্ধান পেতে চায় সে বউয়ের কাছ থেকে। মণিমাণিক্যখচিত পুরোনো জড়োয়া হার একটা, লক্ষাধিক টাকা দাম, শাশুড়িঠাকরুণ চুপিচুপি তাকে দিয়েছিলেন। অন্য সবকিছু পাওয়া গেল, কিন্তু জড়োয়া হার বউ যে কোথায় রেখে মারা গেছে—ঘরবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও মিলল না। বের করে দিয়ে যাক একবার এসে। আসা নিতান্তই যদি অসম্ভব হয়। জিনিসটা কোথায় আছে জানিয়ে দিক পশু—পাখি কিংবা পেতনি—শাকচুন্নির মারফতে (মানুষ কদাপি নয়—ঋষিতপস্বী হলেও নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে পাচার হবার সম্ভাবনা থেকে যায়)।

ত্রিকালদর্শী এক মহাসাধুর বৃত্তান্ত শুনে পরেশ তাঁর খোঁজে চলল। ভারী দুর্গম জায়গায় থাকেন তিনি। রাত থাকতে বেরিয়েছে, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পাহাড় জঙ্গল কত যে পার হল অবাধ নেই। অধ্যবসায়ীর অসাধ্য কিছু নেই, অপরাহ্ন বেলা অবশেষে পৌঁছে গেল। দর্শনও মিলল। ভক্তি গদগদ হয়ে সে সাধুমহারাজের পাদবন্দনা করল। এবং একতাল মিছরি ও রকমারি ফলমূল মিষ্টান্ন পাদপদ্মে নিবেদন করে যুক্ত করে বসে আছে আশীর্বাদ লাভের প্রত্যাশায়। পরেশের পানে মহারাজ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, শব্দসাড়া দেন না কিছু। অবস্থা দৃষ্টে আখড়ার দু—নম্বর সাধু চোখ টিপে পরেশকে কাছে ডেকে বললেন, মৌনীবাবা—সারাদিন সারা রাত্তির ধন্না দিয়ে থেকেও সিকিখানা কথা বের করতে পারবে না বাপু।

পরেশ হাহাকার করে ওঠে : আমি যে বিস্তর আশা নিয়ে বহুদূর থেকে এসেছি—

তার জন্যে ভাবনা নেই। মহারাজ অন্তর্যামী—মনের আশা খুলে বলতে হবে কেন, উনিই মন থেকে টেনে বের করে যথাবিহিত ব্যবস্থা করছেন। করা হয়েই গেছে হয়তো এতক্ষণে।

এ হেন পাইকারি আশ্বাসে পরেশ তৃপ্তি পায় না। বহুদর্শী দু—নম্বর বুঝলেন সেটা। জমিয়ে গল্প আরম্ভ করলেন। মহারাজ—বাবার ইহলোক ও পরলোক ঘটিত বিবিধ তাজ্জব ক্রিয়াকর্ম। দস্তুর মতো রোমাঞ্চক। বিশ্বাস কর চাই না—কর, গল্পের সমাপ্তির আগে কার সাধ্য উঠে পড়ে।

কতক্ষণ কেটে গেছে, পরেশের হুঁশ নেই। গুম—গুম—গুম—মেঘগর্জন। সচকিত হয়ে সে উপরমুখো তাকায়। সর্বনাশ, মেঘে আকাশ ঢেকে গেছে। পালা, পালা—

দ্রুত নামছে পাকদণ্ডীর পথ ধরে। উঠতে সময় লেগেছে—নেমে পড়তে কষ্ট কম, সময়ও কম লাগবে। ঘোর অন্ধকার—সে এমন, পথ তো পথ—নিজের হাত—পাগুলো চেনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃষ্টি নামল ছড়ছড় করে, সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। ক্ষণে ক্ষণে গাছতলায় আশ্রয় নেয়, বৃষ্টি কমলে আবার হাঁটে। কতক্ষণ ধরে যাচ্ছে এমনই—শঙ্কা জাগল, দুর্যোগের মধ্যে পথ ভুল করেনি তো? জনপ্রাণী দেখা যায় না যে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

বৃষ্টি থামল অবশেষে। অন্ধকারও চোখে সয়ে এসেছি—চারিদিকে আবছা রকম নজর চলে। হঠাৎ দেখা যায়, সামান্য দূরে দীর্ঘদেহ একজন। অতি দ্রুত চলেছে।

পরেশ যেন হাতে স্বর্গ পেল। ডাকছে : ও মশায়, শুনছেন, হৃষীকেশ আর কদ্দূর?

সেই দীর্ঘদেহী খিক—খিক করে উৎকট হাসি হেসে উঠল : এদিকে কোথা হৃষীকেশ? পাহাড়ের একেবারে উলটোদিকে। সারারাত হেঁটেও হৃষীকেশ পাবিনে।

পরেশ আর্তনাদ করে উঠল : মশায় গো, পথ হারিয়ে ফেলেছি। মারা পড়ব, একটা আশ্রয় কোথায় পাই বলে দিন।

যাবি কোথা?

পরেশ বলে, অ্যান্টিবায়োটিক কারখানার কাছাকাছি গেলেই সেখান থেকে চিনে আমি আপন ডেরায় যেতে পারব।

সেই লোক বলে, আমি ওইদিকেই যাচ্ছি। চলে আয় আমার পিছু পিছু।

থেমে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, আবার সে চলল। চলা মানে রীতিমতো দৌড়ানো। পাহাড়—জঙ্গল ভেঙে দৌড়াচ্ছে—কিছুই যেন তার গায়ে লাগে না।

পরেশ কাতর হয়ে বলে, আস্তে চলুন মশায়। অত জোরে পেরে উঠিনে আমি।

জোরে কে বলল? আস্তেই তো যাচ্ছিরে। জোরে যাওয়া দেখতে চাস?

পরেশ তাড়াতাড়ি বলে, আজ্ঞে না। যা দেখছি, এতেই চক্ষু ছানাবড়া। বয়স হয়ে গেছে, ছুটোছুটি পেরে উঠিনে।

বয়স—কত বয়স তোর শুনি।

পরেশ বলল, আজ্ঞে, পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করেছি।

তিন পঞ্চাশং দেড়শো বছর—আমার বয়স তা—ও ছাড়িয়ে গেছে। থপথপিয়ে চলিস—সেটা বয়সের জন্য নয়। গুচ্ছের হাড়—মাংস—চর্বি বয়ে বেড়াচ্ছিস, দেহখানি পাল্লায় তুলে দিলে ওজনে দেড় মণ দু—মণ দাঁড়াবে। এত বোঝা চেপে থাকলে ছুটোছুটি হয় না। যখন বেঁচে ছিলাম, আমারও ওইরকম ছিল রে—বাতে ধরেছিল, হাঁটতেই পারতাম না; খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতাম। মরে গিয়ে কত সুখ এখন দেখ। বাতাসের মতন হালকা হয়েছি, যেখানে খুশি পলকে চলে যাই।

তারপর আবদারের ঢঙে আদুরে গলায় ভূত বলে, মরবি? হাঙ্গামা নেই, গলা টিপে এক সেকেন্ডে শেষ করে দিচ্ছি। দেখতে পাবি, কী মজা তখন। মর না রে!

সভয়ে পরেশ বলে, আজ্ঞে না। একবার মরে তারপরে যদি ইচ্ছা হয়, আবার তো বাঁচতে পারব না।

ভূত বলে, তা পারবি নে বটে। কিন্তু ইচ্ছেই হবে না—নিজের অভিজ্ঞতায় বলে দিচ্ছি। বেঁচে থাকার ঝঞ্ঝাট কত! দেহ বয়ে বেড়ানোর মুটেগিরি তো আছেই, আবার যা দিনকাল—ওই দেহটা ধারণ করে থাকাই বড়ো চাট্টিখানি কথা নয়। মাছ—তরকারি চাল—ডাল অগ্নিমূল্য। আমরা বাতাসে বুড়ো আঙুল নাচাই : চালের কুইন্টাল হাজার টাকা হোক না—আমাদের এই কলা!

পরেশ কেঁদে পড়ল : মরার মজা বুঝে নিয়েছি ভূতমশায়। কিন্তু তিন ছেলে—মেয়ে আমার পায়ের শিকল। আমি নিজে স্ফূর্তিতে থাকব, কিন্তু বাচ্চারা ভেসে যাবে একেবারে। মরাটা এখন মুলতুবি থাক। দয়া করে আপনি হৃষীকেশের কাছ বরাবর পৌঁছে দিন, চিরকাল আমি কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

ভূত তখন সদয় হয়ে বলে, চল তবে। এমনি ছুটে পারবিনে, আমি তোর হাত ধরে, ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

ধরতে গিয়ে ভূত তিড়িং করে পিছিয়ে গেল : উ—হু—হু তোর পায়ে লোহা আছে নাকি রে বেটা? হাত পুড়ে গেল আমার।

গলায় গুচ্ছের মাদুলি—পরেশের খেয়াল হল। একটা তার মধ্যে লোহারই বটে। লোহার মাদুলি ছিঁড়ে ফেলে দিল সে। ভূত বলে, লোহায় আমাদের ভয়। লোহা ছুঁলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগে। আর একটা জিনিস তোকে মানা করে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে যতক্ষণ আছিস, সামনে ছাড়া কোনো দিকে তাকাবি নে। ডাইনে বাঁয়ে পিছনে—কোনো দিকে নয়। খবরদার।

যেই না ভূত মশায় হাত এঁটে ধরেছে—পরমাশ্চর্য ব্যাপার, পরেশ সঙ্গে সঙ্গে পাখির মতন হালকা। ভূত হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে ঘন জঙ্গল ভেদ করে আবেশে চলেছে—গাছপালা গায়ে বাধে না, শক্ত পাথরের ঘা লাগে না। ঝরনা পথে পড়লে দুই পা একত্র করে ভাসতে ভাসতে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায়। মরা—লোকে একখানি মাত্র হাত ধরেছে তাতেই এমন, আর নিজে মরবার পরে না জানি আরও কত সুখ।

সাঁ—সাঁ করে ভূত এক উঁচু পাহাড়ের উপর নিয়ে এল। নীচে আঙুল দেখায়—আলোর সারি সেখানে। বলে, চিনতে পারছিস, হৃষীকেশের অ্যান্টিবায়োটিক কারখানা। এবারে যেতে পারবি তো?

যে আজ্ঞে। বড্ড বাঁচিয়ে দিলেন আপনি আজ—

কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হয়ে পরেশ ভূতের পদধূলি নিতে যায়। কিন্তু পা কোথায়—খানিকটা ছায়া মাত্র। ছায়ায় ধুলো লাগে না। পায়ের কোনো স্পর্শই পেল না। ভূত বলে, ওই হয়েছে। নেমে যা এইবারে। আমিও বাড়ি এসে গেছি। ঢুকে পড়ব।

পরেশ শুধায় : কোথায় আপনার বাড়ি?

এই পাহাড়ের নীচে—তোর কী দরকার—তুই চলে যা।

হাত ছেড়ে দিল ভূত। পরেশ তরতর করে নেমে যাচ্ছে। হঠাৎ চড়—চড়—চড়াৎ—পিছনে প্রচণ্ড আওয়াজ। দুনিয়া চুরমার হয়ে গেল বুঝি। ঘাড় ফিরিয়ে পরেশ দেখল, যেখানটা এইমাত্র দাঁড়িয়ে কথা বলছিল—সেই পাহাড় দুদিকে দুই খণ্ড হয়ে হাঁ করে পড়েছে। ফাঁকের ভিতর দিয়ে পাতাল তল অবধি নজর যায়—পথঘাট ঘরবাড়ি সেখানে, লোকজন কিলবিল করছে। টুপ করে ভূত তার মধ্যে গিয়ে পড়ল। আর, ঝিনুক যেমনধারা মুখ বন্ধ করে, ফাটা—পাহাড় দু—পাশ দিয়ে এসে বেমালুম জুড়ে গেল। জঙ্গল, পাথর, ঝরনা,—ঠিক আগেকার মতোই। গভীর রাত্রে নির্জন পাহাড়ে এই কাণ্ড ঘটে গেল, সামান্য মাত্র নিদর্শনও আর পড়ে নেই। নীচে অদূরে অ্যান্টিবায়োটিক কারখানা বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে। কারখানার পাশ দিয়ে থপ থপ করে পা ফেলে একলা পরেশ আস্তানায় ফিরছে।

পাহাড় ফাটার আওয়াজে পাশে সেই যে ঘাড় ফিরিয়েছিল, ভূতের মানা মনে ছিল না তার—সেই ঘাড় কিছুতে আর সোজা হল না। পরেশের মুখ বাঁদিকের ফেরানো—বাঁ কাঁধের সমসূত্রে।

রাত তখন এগারোটা

বিমল মিত্র

ঘটনাটি ঘটল রাত এগারোটার সময়।

কলকাতা থেকে দেশে যাচ্ছি। দেশ বলতে যেখানে আমি জন্মেছি। কলকাতা থেকে ট্রেনে যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

সকাল পাঁচটায় একটা ট্রেন আছে। তাতে গেলে মাজদিয়া রেলস্টেশনে সকাল আটটা—সাড়ে আটটা বেজে যায়। স্টেশনে নেমে আরও পাঁচ ক্রোশ হাঁটা। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলেও তাতে সময় লাগে আরও দু—ঘণ্টা।

তারপর আর একটা ট্রেন আছে। সেটা ছাড়ে সকাল ন—টায়। তারপরে দুপুর দুটোয়। তারপর সন্ধে ছটায়।

সন্ধে ছটার ট্রেনে গেলে রাত ন—টায় পৌঁছতে পারা যায় মাজদিয়া স্টেশনে। কিন্তু তাতে গেলে বাড়ি পৌঁছতে রাত এগারোটা বেজে যায় বলে সাধারণত সে ট্রেনে যাই না।

তখন আমি কলকাতার একটা মেসে থেকে পড়াশুনা করি। প্রত্যেক শনিবার দিন দুপুর দুটোর ট্রেনে বাড়ি যাই। তাতে সুবিধে খুব। ট্রেনে ভিড়ও কম থাকে। আর সন্ধের আগেই বাড়িতে পৌঁছানো যায়।

কিন্তু সবসময় সে ট্রেনে যাওয়া সুবিধে হয় না। লেখাপড়া ছাড়া ফুটবল খেলার নেশা ছিল। রবিবার দিনটায় দেশে না কাটিয়ে কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কাটাতে বেশি ভালো লাগে।

কোনো শনিবার বাড়িতে না গেলে বাবার চিঠি আসে। লেখেন—'তুমি গত শনিবারে বাড়ি আস নাই কেন? আমরা তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলাম। তোমার শরীর খারাপ হইল কিনা ভাবিয়া খুবই চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ উত্তর দিবে...' ইত্যাদি...

আমি বাবার একই সন্তান। বাবার বয়স হয়েছে। আমাকে নিয়েই তাঁর যত ভাবনা—চিন্তা—স্বপ্ন সব কিছু। আমি বড়ো হব, আমি মানুষ হব, আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করব।

কিন্তু ততদিনে আমারও একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠেছে। দেশের চেয়ে কলকাতার আকর্ষণই আমার কাছে বেশি। আমার জন্যে বাবা মোটা হাত—খরচ পাঠান। সেই টাকা দিয়ে আমি ময়দানে ফুটবল খেলা দেখি, ক্রিকেট খেলা দেখি, আবার কখনো—কখনো বা সিনেমা দেখতে যাই। কলকাতার জীবন গ্রামের জীবনের মতো একঘেয়ে নয়। সেখানে চারদিকে এঁদো পানা—পড়া পুকুর আর কেবল খেত—খামার আর বন—জঙ্গল। আমাদের মতো যাদের অবস্থা ভালো নয় তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কেবল বারোয়ারি—তলায় বটগাছের ছায়ায় হারু মুদির দোকানের মাচায় বসে আড্ডা মারে। তাস খেলে। আর আমি গেলে তারা আমার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। কারোর কোনো কাজ নেই। বাড়ির অবস্থা খারাপ বলে তারা কলকাতায় আসতে পারে না। সে—পয়সা তাদের নেই। তাই আমাকে তারা একটু—একটু হিংসেও করে। আমার চালচলন, জামা—প্যান্ট দেখে তারা অবাক হয়ে যায়।

আমার জুতো, আমার চুল—ছাঁটা, আমার সাবান—মাখা দেখে তাদের তাক লেগে যায়। কারণ আমাদের গ্রাম এমন এক গ্রাম যেখানে শহরের কোনো সভ্যতা ঢোকবার সুযোগ পায়নি।

আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন নসুকাকা। আসল নাম বোধহয় ছিল নৃসিংহ ভট্টাচার্য। বাবা তাঁকে নসু বলে ডাকতেন। তিনি গ্রামে গ্রামে যজমানদের বাড়িতে গিয়ে পুজো করে বেড়াতেন। বড়ো ভালো লোক।

আমি দেশে গেলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বলতেন, 'কী রকম লেখাপড়া হচ্ছে বাবা? ভালো তো?'

আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম। বলতাম, 'হ্যাঁ।'

তিনি বলতেন, 'হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করবে বাবা। এখন দিনকাল খুব খারাপ আর কলকাতা শহরে যে—রকম গাড়ি—ঘোড়া—ট্রাম—বাস শুনেছি, খুব সাবধানে চলাফেরা করবে।'

নসুকাকা আমাদের দেশের নামকরা পুরুতমশাই। তিনি না হলে কারোরই কোনো পুজোআচ্চা হত না। কেউ হাতেখড়ি দেবে তাতেও যেমন তাঁর ডাক পড়ত, আবার তেমন কারও বাড়িতে ছেলের অন্নপ্রাশন হবে তাতেও তাঁকে চাই। তারপর আছে বারোয়ারিতলার দুর্গাপুজো, কালীপুজো থেকে আরম্ভ করে তিন ক্রোশ দূরে জমিদারবাবুদের বাড়িতে যত উৎসব, যত বিয়ে, ব্রত—উদযাপন, সবেতেই তাঁর ডাক পড়ত।

তা এই আবহাওয়াতেই আমি মানুষ। কিন্তু এই আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও যে ঘটনাটা ঘটল তার কথাই বলি।

কলকাতার তখন আমার স্কুলের পরীক্ষা চলছিল। তিন সপ্তাহ দেশে যেতে পারিনি। বাবাকে সে—কথা লিখে দিয়েছিলাম যে, আমি তিন সপ্তাহের জন্যে দেশে যেতে পারব না।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হল সেদিন শনিবার। মেসে এসে ভাবলাম দুটোর ট্রেন ধরব। কিন্তু কয়েকদিন ধরে রাত জেগে পড়বার পর বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা। আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম দেয়াল—ঘড়িতে বেলা সাড়ে তিনটে। আমার বন্ধু, যে আমার পাশের বিছানায় শুত, সেও দেখলাম অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

মনে হল, সর্বনাশ! দুটোর গাড়ি তো কখন ছেড়ে দিয়েছে। এর পরে তো সেই সন্ধে ছটার আগে দেশে যাবার আর কোনো গাড়ি নেই। সে—গাড়িতে গেলে দেশের বাড়িতে পৌঁছতে তো সেই রাত এগারোটা বেজে যাবে।

কিন্তু শেয়ালদা স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়তেই সেদিন কেন জানি না আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম ট্রেনটা হয়তো একটু দেরি করেই মাজদিয়াতে পৌঁছবে। তার মানে যখন পাঁচ ক্রোশ হেঁটে বাড়ি পৌঁছব তখন রাত বারোটা বেজে যাবে।

বাবা হয়তো বকাবকি শুরু করে দেবেন। বলবেন—দুপুর দুটোর ট্রেনে আসতে পারলে না?

কিন্তু না, ট্রেনটা ঠিক সময়েই মাজদিয়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। এদিককার প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে টিকিট দেখিয়ে গেট পার হলাম। গেটের বাইরেই বাজার। অত রাত বলেই বাজারে লোকজনের ভিড় বেশ পাতলা। তাড়াতাড়ি বাজার ছাড়িয়ে বড়োরাস্তায় গিয়ে পৌঁছলাম। ভেবেছিলাম একটা সাইকেল রিকশা ভাড়া করে বাড়ি পৌঁছব।

কিন্তু কোনো রিকশাওয়ালাই অত দূরে যেতে চাইলে না। বেশি টাকার লোভ দেখিয়েও কাউকে রাজি করাতে পারলাম না।

সবাই—ই এক কথা বললে—অত দূরে সওয়ারি নিয়ে গেলে ফিরে আসতে রাত একটা বেজে যাবে।

আমি বললাম—আমি তোমাদের ডবল ভাড়া দেব।

তবু কেউ যেতে রাজি হল না।

অগত্যা হাঁটতে শুরু করলাম। হাতে অনেক জিনিস ছিল আমার। বাবা কাশির ওষুধ কিনে নিতে লিখেছিলেন। শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছবার আগে ওষুধের দোকান থেকে তা কিনে নিয়েছিলাম। মা—র জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম হাজার মলম! মা—র পায়ে হাজা হয়েছিল। তারপর গামছা কিনেছিলাম একটা বাবার জন্যে। আরও অনেক খুচরো—খুচরো জিনিস কিনেছিলাম—যা যা বাবা কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

রাস্তা দিয়ে একলা—একলা হেঁটে চলেছি। চারদিকে নিশুতি অন্ধকার। রাতে গ্রামের লোকজন সকাল—সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ ভোর—ভোর উঠতে হয় সকলকে। বড়ো বড়ো গাছগুলোকে দূর থেকে অন্ধকারের পাহাড় বলে মনে হচ্ছে!

খানিক দূর গিয়েই পিচের রাস্তা শেষ হয়ে গেল। অমাবস্যার রাত। আকাশে শুধু তারাগুলো জ্বলছে মাথার ওপর। মাঝে মাঝে শেয়ালের হুক্কা—হুয়া কানে আসছে। দু—একটা কুকুর আমাকে দেখে ঘেউ—ঘেউ করে ডেকে উঠল। কিন্তু আমাকে চিনতে পেরে আবার চুপ করে গেল। তবু আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। কিন্তু কিসের যে ভয় বলতে পারব না।

একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকে কয়েকটা বড়ো—বড়ো বটগাছ ডালপালা ছড়িয়ে জায়গাটিকে ঢেকে রেখেছে। শনি—মঙ্গলবার ওই জায়গাটায় হাট বসে। হাট বেলাবেলি শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে দু—চারটে ছোটোখাটো দোকান। তারাও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে তখন যে যার বাড়ি চলে গেছে।

বহুদিন আগে ওই বটগাছের ডালে একজন মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল! সে ছোটোবেলাকার ঘটনা। কিন্তু তখন থেকেই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেই দিনের বেলাতেও কেমন গা—ছমছম করত। আর তখন তো রত সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

মনে পড়ল, বাবা—মা বোধহয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে রাত হয়ে গেল। তাঁরা ভাবছেন আমি আর আসব না। মা আমার জন্যে ভাত রান্না করে বসে ছিল।

বাবা বলছেন—আর কেন বসে আছ, খোকা আজকে বোধহয় এল না, তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

মাও বোধহয় তখন খেয়ে নিয়েছে। তারপর আমার কথা ভাবতে—ভাবতেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই সব কথা ভাবতে—ভাবতেই হেঁটে চলেছি। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। রাস্তাটা গিয়ে নলগাড়ির নাবালে গিয়ে মিশেছে। আগে এখানে একটা নদী ছিল। আগে যখন নদীতে জল ছিল তখন খেয়া নৌকোয় এবার—ওপার করতে হত। কিন্তু এখন নদীটা শুকিয়ে গিয়েছে। সেখানে ঢালু জমিতে এখন চাষ—বাস হয়। তারই একপাশ দিয়ে গোরুর গাড়ি যাবার রাস্তা হয়েছে। বর্ষার পর গরম পড়াতে রাস্তায় আবার ধুলো জমেছে। এখানকার লোক তাই ও—জায়গাটার নাম দিয়েছে, 'নলগাড়ির নাবাল'।

আমি ঢালু রাস্তায় নামতে লাগলাম। তারপর সামনের দিকে নজর পড়তেই যা দেখলাম তাতে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল।

দেখলাম ওপারের রাস্তা দিয়ে একটা দাড়িওয়ালা মূর্তি ঢালু রাস্তা দিয়ে আমার দিকে নেমে আসছে। রাস্তায় তার পা নেই, শুধু হাওয়ায় ভাসতে—ভাসতেই এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমি আর এগোলাম না। এগোতে ভয় করল। ও কি তবে সেই লোকটার মূর্তি যে একদিন বটগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। তখন কত লোকের মুখে শুনতে পেতুম যে, সে নাকি এই অঞ্চলে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়! কিন্তু আমি নিজের চোখে কখনো দেখিনি।

হঠাৎ আমাকে লক্ষ করে মূর্তিটা কথা বলে উঠল।

বললে, 'কে ওখানে?'

আমি কী জবাব দেব বুঝতে পারলাম না। শুধু একটু থেমে বললাম, 'আমি।'

'আমি কে?'

বলতে বলতে মূর্তিটা আমার দিকে আরও এগিয়ে আসতে লাগল।

সামনে মুখের কাছে এসে বললে, 'কে, কে তুমি?'

আমি ভয়ে শিউরে উঠেছি তখন। কিছুই জবাব দিতে পারলাম না সেই মুহূর্তে।

মূর্তিটা জিজ্ঞেস করলে, 'ও, তুমি! বিমল! ধীরেশদার ছেলে?'

আমার তখন যেন জ্ঞান ফিরে এল! চিনতে পারলাম মূর্তিটাকে। আমার নসুকাকা।

বললাম, 'নসুকাকা, আপনি?'

নসুকাকা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি। তা তোমার আসতে এত দেরি হল যে?'

বললাম, 'দুপুর দুটোর ট্রেনটা ধরতে পারিনি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই সন্ধে ছটার ট্রেন ধরে আসছি।'

নসুকাকা বললেন, 'তা, আজকে এই অমাবস্যার রাতে না এলেই পারতে। এই রাতবিরেতে কি আসা ভালো? আমাদের গাঁয়ে যে পরশুদিন বাঘ বেরিয়েছিল। তারপর কদিন আগে বাবুদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল—।'

বললাম, 'তা, আপনি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছেন?'

নসুকাকা বললেন, 'জমিদারবাবুর স্ত্রী হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর বড়ো ছেলের খুব অসুখ, আমাকে সেখানে গিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করতে হবে। যত রাতই হোক আমাকে যেতেই হবে। তাঁর বড়ো ছেলের এখন—যায়—তখন—যায় অবস্থা। তাই খেয়ে নিয়েই দৌড়াচ্ছি। আমাকে যে ডাকতে এসেছিল তাকে বলেছি, তুমি এগিয়ে যাও, আমি খেয়ে উঠেই যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে রাস্তায় কোনো লোকের দেখা হয়নি।'

আমি বললাম, 'কই, না তো—।'

নসুকাকা বললেন, 'তা রাত্রির বেলা হয়তো ঠাহর হয়নি তোমার। তা, তুমি বাবা একলা এত রাত্রিরে এসে ভালো করোনি। চলো, আমি তোমাকে গাঁ পর্যন্ত পৌঁছে দিই।'

বললাম, 'আপনি আবার কেন এত কষ্ট করতে যাবেন! আর আপনারাও তো তাড়াতাড়ি আছে।'

নসুকাকা বললেন, 'সে কী কথা! এই এত রাতে তোমাকে কি এই অবস্থায় একলা ছেড়ে দিতে পারি? শুনলে ধীরেশদা যে আমার ওপর রাগ করবে। বলবে, তুমি খোকাকে ওই অবস্থায় একলা ফেলে কী করে চলে গেলে।'

কী আর করা যাবে! ওদিকে জমিদারবাবুর বাড়িতে তাঁর বড়ো ছেলের এখন—যায়—তখন—যায় অবস্থা, আর তিনি কিনা নিজে আমাকে আমার বাড়ি পৌঁছে দিতে চান?

রাস্তায় যেতে—যেতে নসুকাকা বলতে লাগলেন, 'তুমি তিন সপ্তাহ বাড়ি আসনি, সেজন্য ধীরেশদা খুব ভাবছিলেন। কলকাতায় থাক তুমি, তোমার বয়েস হয়েছে। তোমার যত পড়াশোনাই থাক, হপ্তায় একদিনের জন্যে বাবা—মাকে দেখতে আসতে পার না? তুমি যখন বড়ো হবে, আর নিজে বাবা হবে, তখন বুঝবে ছেলেকে দেখতে না পেলে বাপের মনে কী কষ্ট হয়।'

আমি নসুকাকার কথা শুনে কোনো জবাব দিতে পারলাম না, চুপ করে নসুকাকার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। তারপর যখন বাড়ির কাছাকাছি এসেছি তখন নসুকাকা বললেন, 'ওই দেখ, তোমাদের বাড়ি, এবার আর কোনো ভয় নেই, আমি চলি, আমার খুব তাড়া আছে।'

বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি আমাদের বাড়ির সদর দরজায় কড়া নেড়ে ডাকতে লাগলাম, 'বাবা বাবা, বাবা।'

বাবা আমার ডাক শুনেই ধড়ফড় করে জেগে উঠেছে। মা—ও জেগে উঠেছেন।

তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে আমাকে দেখে বললেন, 'খোকা, তুমি এসে গেছ? কোন ট্রেনে এলে? দুপুরের ট্রেনে আসতে পারলে না?'

বললাম, 'দুপুবেলা পরীক্ষা দিয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই—'

বাবা বললেন, 'তা বলে সন্ধের ট্রেনে আসতে হয়? জানো বাড়ি পৌঁছোতে রাত এগারোটা বেজে যাবে। তা ছাড়া গাঁয়ে পরশুদিন বাঘ বেরিয়েছিল, তা জানো? ক—দিন আগে বাবুদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল—'

আমি বললাম, 'আমি তো তা জানতুম না। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল নসুকাকার সঙ্গে, তিনিই আমাকে নিজে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।'

'নসু? নসুকাকা?'

বললাম, 'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে নলগাড়ির নাবালে দেখা হয়ে গেল। তিনি জমিদারবাবুদের বাড়ি যাচ্ছিলেন, তাদের বড়ো ছেলে মরো—মরো, তাই তিনি শান্তিস্বস্ত্যয়ন করতে সেখানে যাচ্ছিলেন।'

বাবা আমার দিকে হতবাকের মতো চেয়ে রইলেন।

মা—ও অবাক।

বাবা বললেন, 'তুমি ঠিক দেখেছ? তোমার নসুকাকা? তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন? তুমি কী সব আবোল—তাবোল বকছ?'

আমি বললাম, 'বা রে, আমি ভুল দেখব কেন? আমি নসুকাকাকে চিনতে পারব না?'

বাবা বললেন, 'কিন্তু তোমার নসুকাকা যে পরশুদিন মারা গিয়েছেন, আমরা যে নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর সৎকার করে এলুম—'

খুঁটি দেবতা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘোষপাড়ার দোলের মেলায় যাইবার পথে গঙ্গার ধারে মঠটা পড়ে।

মঠ বলিলে ভুল বলা হয়। ঠিক মঠ বলিতে যাহা বুঝায়, সে ধরনের কিছু নয়। ছোটো খড়ের ঘর খান চার—পাঁচ মাঠের মধ্যে। একধারে একটা বড়ো তেঁতুল গাছ। গঙ্গার একটা ছোটো খাল মাঠের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে—জোয়ারের সময়ে তবুও খালটা কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে। ঠিক সেই সময়ে জেলেরা দোয়াড়ি পাতিয়া রাখে। জোয়ারের তোড়ের মুখে মাছ খালে উঠিয়া পড়ে, ভাটার টানে নামিবার সময় দোয়াড়ির কাঠিতে আটকাইয়া আর বাহির হইতে পারে না। কাছেই একটু দূরে শঙ্করপুর বলিয়া ছোটো গ্রাম।

কিছুকাল পূর্বে রেল কোম্পানি একটা ব্র্যাঞ্চ লাইন খুলিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা জমি সার্ভে করাইয়া মাটির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিলেন, কোনো কারণে লাইন বসানো হয় নাই। মাঠের উত্তর—দক্ষিণে লম্বা প্রকাণ্ড উঁচু রেলওয়ে বাঁধটার দুই পাশের ঢালুতে নানাজাতীয় কাঁটা গাছ, আকন্দ ও অন্যান্য বুনো গাছপালা গজাইয়া বন হইয়া আছে। আকন্দ গাছটাই বেশি।

খুঁটি দেবতার অপূর্ব কাহিনি এইখানেই শুনিয়াছিলাম।

গল্পটা বলা দরকার।

শঙ্করপুর গ্রামের পাশে ছিল হেলোঞ্চা—শিবপুর। এখন তাহার কোনো চিহ্ন নাই। বছর—পনেরো পূর্বে গঙ্গায় লাটিরা গিয়া মাঝগঙ্গায় ওই বড়ো চরটার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্বস্থলীর চৌধুরী জমিদারদের সহিত ওই চরার দখল লইয়া পুরোনো প্রজাদের অনেক দাঙ্গা ও মকদ্দমা হইয়াছিল। শেষপর্যন্ত প্রজারাই মামলায় জেতে বটে, কিন্তু চরটা চিরকালই বালুকাময় থাকিয়া গেল, আজ দশ বৎসরের মধ্যে চাষের উপযুক্ত হইল না। পাঞ্জা আসিলেও চরটা প্রজাদের কোনো উপকারে লাগে না, অনাবাদি অবস্থায় পড়িয়াই থাকে। আজকাল কেহ—কেহ তরমুজ, কাঁকুড় লাগাইতেছে দেখা যায়।

এই গ্রামে রাঘব চক্রবর্তী পূজারি বামুন ছিলেন।

রাঘব চক্রবর্তীর কেহ ছিল না। পৈতৃক আমলের খড়ের বাড়িতে এক বাস করিতেন, একাই নদীর ঘাট হইতে জল আনিয়া, বনের কাঠ কুড়াইয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইতেন। গায়ে শক্তিও ছিল খুব, পিতামহের আমলের সেকেলে ভারী পিতলের ঘড়া করিয়া দুটি বেলা এক পোয়া পথ দূরবর্তী গঙ্গা হইতে জল আনিতেন। ক্লান্তি বা আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না।

রাঘব চক্রবর্তী পয়সা চিনতেন অত্যন্ত বেশি। বাঁশের চটার পালা তৈয়ারি করিয়া কুড়ি দরে ডোমেদের কাছে ঘোষপাড়ার দোলে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন। আবার সময় সময়ে—ঝুড়ি, কুলো, ডালা বুনিয়া বিক্রয় করিতেন। মাটির প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। উলুখড়ের টুপি, ফুল—ঝাঁটা তৈয়ারি করিতেন। সুন্দর কাপড় রিপু করিতে পারিতেন। এসব তাঁহার উপরি আয়ের পন্থা ছিল। সংসারে কেহই নাই, না স্ত্রী, না ছেলে মেয়ে—কে তাঁহার পয়সা খাইবে, তবুও রাঘব টাকা জমাইয়া যাইতেন। একটা মাটির ভাঁড়ে পয়সাকড়ি রাখিতেন, সপ্তাহে একবার বা দুইবার ভাঁড়টি উপুড় করিয়া ঢালিয়া সব পয়সাগুলি সযত্নে গুনিতেন। ভাঁড়ের মধ্যে যাহা রাখিতেন পারতপক্ষে তাহা আর বাহির করিতেন না। গ্রামের সবাই বলিত, রাঘব চক্রবর্তী হাতে বেশ দু—পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন।

একদিন দুপুরে পাক সারিয়া রাঘব আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একখানা ছই—ঘেরা গোরুর গাড়ি আসিয়া তাঁহার উঠানো থামিল। গাড়ি হইতে একটি পঁচিশ—ছাব্বিশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল। রাঘব চিনিলেন, তাঁহার দূর—সম্পর্কীয় ভাগিনেয় নন্দলাল।

নন্দলাল আসিয়া মামার পায়ের ধুলা লইল।

রাঘব বলিলেন—এসো বাবা। ছইয়ের মধ্যে কে?...

নন্দলাল সলজ্জ মুখে বলিল—আপনার বউমা।

—ও! তা কোথায় যাবে? ঘোষপাড়ার দোল দেখতে বুঝি?

নন্দলাল অপ্রতিভের সুরে বলিল—আজ্ঞে না, আপনার আশ্রয়েই—আপাতত—মানে বামুনহাটির বাড়ি—ঘর তো সব গিয়েছে। গত বছর মাঘ মাসে বিয়ে—তা এতদিন বাপের বাড়িতে ছিল—সেখান থেকে না আনলে আর ভালো দেখাচ্ছে না। তাই নিয়ে আজ একেবারে এখানেই...

রাঘব বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি চিরকালই একা থাকিয়া আসিয়াছেন, একা থাকিতেই ভালোবাসেন। এ আবার কোথা হইতে উপসর্গ আসিয়া জুটিল, দেখ কাণ্ড!

যাহা হউক, আপাতত বিরক্তি চাপিয়া তিনি ভাগিনেয়—বধূকে নামাইয়া লইবার ও পুবদিকের ভিটার ছোটো ঘরখানাতে আলাদা থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে নিয়ে তো এলে, হাতে কিছু আছে—টাছে তো? আমার এখানে আবার বড়ো টানাটানি। ধান অন্যবার যা হয় এবার তার সিকিও পাইনি। যজমানদেরও অবস্থাও এবার যা...

নন্দ এ কথার কিছু সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিল না।

রাঘব বলিলেন—বউমার হাতে কিছু নেই?

—ও কোথায় পাবে। তবে বিয়ের দরুন গয়না কিছু আছে। ওর ওই হাতবাক্সটাতে আছে যা আছে।

—জায়গা ভালো নয়। গয়নাগুলো বাক্সে রাখাই আমি বলি বেশ। পাঁচজন টের না পায়। আমি আবার থাকি গাঁয়ের এক কোণে পড়ে—আর এই তো সময় যাচ্ছে। ওগুলো আরও সাবধান করা দরকার।

দিন—দুই পরে নন্দলাল মামাকে বলিল—আমাকে আজ একবার বেরুতে হচ্ছে মামা। একবার বীজপুরে যাব। লোকো—কারখানায় একটা সন্ধান পেয়েছি—একটু দেখে আসি।

নন্দলাল ইতিপূর্বেও বীজপুরের কারখানায় কাজ খুঁজিয়াছে, কিন্তু তেমন লেখাপড়া জানে না বলিয়া কাজ জোটাইতে পারে নাই। বলিল—লোকো কারখানায় যদি মুগুর ঠাঙাতে পারি তবে এক্ষুনি কাজ জোটে। ভদ্দর লোকের ছেলে, তা তো আর পেরে উঠি নে। এই আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়তো মহেন্দ্র, তারা জেতে মুচি। সেই বাইসম্যানি করছে, সাড়ে সাত টাকা হপ্তা পায়—দিব্যি আছে। কিন্তু ওদের ওসব সয়। আমাকে বলেছিল হেডমিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাবে, তা আমার দ্বারা কি আর হাতুড়ি পিঠানো চলবে?

পরদিন খুব ভোরে নন্দলাল বাটি আসিবে। সে রাত্রেই স্টেশনে নামিয়াছিল, কিন্তু অন্ধকারে এতটা পথ আসিতে না পারিয়া সেখানে শুইয়া ছিল, শেষ রাত্রের দিকে জ্যোৎস্না উঠিলে রওনা হইয়াছে।

নন্দলাল বাড়ি ফিরিয়া দেখিল তখনও মামা ওঠেন নাই, পুবের ভিটার ঘরে স্ত্রীও তখন ঘুমাইতেছে। স্ত্রীকে জাগাইতে গিয়া দেখিল, গহনার বাক্স ঘরের মধ্যে নাই। স্ত্রীকে উঠাইয়া বলিল—গহনার বাক্স কোথায়?

স্ত্রী অবাক হইয়া গেল। বলিল—আরে ঠাট্টা করা হচ্ছে বুঝি? এই তো শিয়রে এইখেনে ছিল। লুকিয়েছ বুঝি?...

কিছুক্ষণ পরে স্বামী—স্ত্রী দুজনেই মাথায় হাত দিয়া বসিল। ঘরের কোথাও বাক্স নাই। খোঁজাখুঁজি অনেক করা হইল। মামাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। চুরির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বাক্সের বা চোরের খোঁজ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরাও আসিল, থানাতেও খবর গেল—কিছুই হইল না।

নন্দলালের স্ত্রীর বয়স কুড়ি একুশ। রং টকটকে ফরসা, মুখ সুশ্রী, বড়ো শান্ত ও সরল মেয়েটি। তার বাপের বাড়ির অবস্থা বেশ ভালো। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া তার বাবা পূর্ব দুই পক্ষের সন্তান—সন্ততিদিগকে এখন আর দেখিতে পারেন না। বিবাহের সময় এই গহনাগুলি তিনিই মেয়েকে দিয়াছিলেন এই হিসাবে যে, গহনাগুলি লইয়া মেয়ে যেন বাপের বাড়ির উপর সকল দাবিদাওয়া ত্যাগ করে। পিতার কর্তব্য এইখানেই তিনি শেষ করিলেন।

নন্দলালের অবস্থা কোনোকালেই ভালো নয়, বিবাহের পর যেন তাহা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। ওই গহনা—কখানি দাঁড়াইল সংসারের একমাত্র সম্বল। গহনাগুলির উপর নন্দলাল বার—দুই ঝোঁক দিয়াছিল—একবার পাটের ব্যবসা ফাঁদিতে, আর একবার মুদির দোকান খুলিতে শিমুরালির বাজারে। কিন্তু নন্দলালই শেষ পর্যন্ত কি ভাবিয়া দুইবারই পিছাইয়া যায়। বউও বলিয়াছিল—দ্যাখো ওই তো পুঁজিপাটা, আর তো নেই কিছু—যখন আর কোনো উপায় থাকবে না, তখন ওতে হাত দিও। এখন থাক।

গহনার বাক্স চুরি যাওয়ার দিন পাঁচ—সাত পরে একদিন বোরে উঠিয়া দেখিল, স্ত্রী বিছানায় নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বউ ঘরের ছাইগাদা ঘাঁটিয়া কী দেখিতেছে। স্বামীকে দেখিয়া কেমন এক ধরনের হাসিয়া বলিল—ওগো, এসো না গো, একটু খোঁজো না এর মধ্যে। তুমি উত্তর দিকটা থেকে দ্যাখো।

নন্দলাল সস্নেহে স্ত্রীকে ধরিয়া দাওয়ায় আনিয়া বসাইল। পাতকুয়ার ঠান্ডা জল দিয়া স্নান করাইয়া দিল, নানারকমে বুঝাইল, কিন্তু সেই যে বউটির মস্তিষ্ক—বিকৃতি শুরু হইল—এ আর কিছুতেই সারানো গেল না। পাছে স্বামী বা কেহ টের পায় এই ভয়ে যখন কেউ কোনো দিকে না থাকে, তখন চুপি—চুপি ছাইগাদা হাতড়াইয়া খুঁজিয়া কি দেখিতে থাকিবে। এই একমাত্র ব্যাপার ছাড়া তাহার মস্তিষ্ক—বিকৃতির কিন্তু অন্য কোনো লক্ষণ ছিল না। অন্যদিকে সে যেমন গৃহকর্মনিপুণা সেবাপরায়ণা কর্মিষ্ঠা গৃহস্থবধূ তেমনই রহিল।

একদিন সে মামাশ্বশুরের ঘরে সকালে ঝাঁট দিতে ঢুকিয়াছে, মামাশ্বশুর রাঘব চক্রবর্তী তখন ঘরে ছিলেন না; ঘরের একাটা কোণ পরিষ্কার করিবার সময় সে একখানা কাগজ সেখানে কুড়াইয়া পাইল। কে যেন দলা পাকাইয়া কাগজখানাকে কোণটাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কাগজখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। এ যে তার গহনার বাক্সের তলায় পাতা ছিল। পাতলা বেগুনি রঙের কাগজ, সেকরারা এই কাগজে নূতন—তৈয়ারি সোনার গহনা জড়াইয়া দেয়। —এ কাগজখানাও সেইভাবে পাওয়া, স্যাকরার দোকান হইতে আসিয়াছিল, সেই হইতে তাহার গহনা—বাক্সের তলায় পাতা থাকিত—সেই কোণ—ছেঁড়া বেগুনি রঙের পাতলা কাগজখানি!...

বউমাটি কাহাকেও কিছু বলিল না—স্বামীকেও নয়। মনের সন্দেহ খুলিয়া কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে তাহার খুব অসুখ হইল। জ্বর অবস্থায় নির্জন ঘরে একা বিছানায় শুইয়া তক্তপোশের একটা বাঁশের খুঁটিকে সম্বোধন করিয়া সে করজোড়ে বার বার বলিত—ওগো খুঁটি, আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করছি, তুমি এর একটা উপায় করে দাও, পায়ে পড়ি তোমার! একটা উপায় তোমায় করতেই হবে! আর কাউকে বলতে পারি নে তোমাকেই বলছি...

বাঁশের খুঁটিটা ছাড়া তার প্রাণের এ আগ্রহ—ভরা কাতর আকুতি আর কেহই শুনিত না। কতবার রাত্রে, দিনে নির্জনে খুঁটিটার কাছে এ নিবেদন সে করিতো—সে—ই জানে।

তাহাদের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড মাঠ গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ভরা। তারপরেই খাড়া পাড় নামিয়া গিয়া জল ছুঁইয়াছে। জল সেখানে অগভীর, চওড়াতেও হাত দশ—বারো মাত্র। পরেই গঙ্গার বড়ো চরটা। সারাবছরেই চরায় জলচরপক্ষীর ঝাঁক চরিয়া বেড়ায়। চরার বাহিরের গভীর বড়ো গঙ্গার দিকে না গিয়া তারা গঙ্গার এই ছোটো অপরিসর অংশটা ঘেঁসিয়া থাকে। কন্টিকারীর বনের চরার বালি প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বারো মাস বেগুনি ফুল ফুটিয়া নির্জন বালির চরা আলো করিয়া রাখে। মাঠে কোনো গাছপালা নাই। ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের মতো সমতল ও তৃণাবৃত; দক্ষিণে ও বাঁয়ে একদিকে বড়ো রেলওয়ে—

বাঁধটা ও অন্যদিকে দূরবর্তী গ্রামসীমার বনরেখার কোল পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই—এক সারি তালগাছ এখানে ওখানে ছাড়া এই বড়ো মাঠটাতে অন্য কোনো গাছ চোখে পড়ে না কোনো দিকে।

এই বিশাল মাঠে প্রতিদিন সকাল হয়, সূর্য মাঝ—আকাশে দুপুর আগুন ছড়ায়, বেলা চলিয়া বৈকাল নামিয়া আসে, গোধূলিতে পশ্চিম দিক কত কী রঙে রঞ্জিত হয়। চাঁদ ওঠে—সারা মাঠ, চরা, রেলওয়ে বাঁধ, ওপাশের বড়ো গঙ্গাটা, জ্যোৎস্না প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু কখনো কোনো কালে রাঘব চক্রবর্তী বা তাঁহার প্রতিবেশীরা ওই সুন্দর পল্লিপ্রান্তরের প্রকৃতির লীলার মধ্যে কোনো দেবতার পুণ্য আবির্ভাব কল্পনা করেন নাই, প্রয়োজন বোধও করেন নাই—সেখানে আজ সর্বপ্রথম এই নিরক্ষরা বিকৃতমস্তিষ্কা গ্রাম্য বধূটি বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা বিদূষীর মতো মনে প্রাণে খুঁটি— দেবতার আবাহন করিল।...

আমি এই মাঠেই বৈকালে দাঁড়াইয়া কথাটা ভাবিতেছিলাম। কথাটার গভীরতা সেদিন সেখানে যতটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এমন আর বোধহয় কোথাও করিব না।

নন্দলাল স্ত্রী অবস্থা দেখিয়া বড়ো বিব্রত হইয়া পড়িল। সে স্ত্রীকে ভালোবাসিত, নানারকম ঔষধ, জড়িবুটি, শিকড়—বাকড় আনিয়া স্ত্রীকে ব্যবহার করাইল। তিরোলের পাগলি—কালীর বালা পরাইল, যে যাহা বলে তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। একটা সুফল দেখিয়া সে খুশি হইল যে, আজকাল স্ত্রী সকালে উঠিয়া ছাইগাদা হাতড়াইতে বসে না। তবুও সংসারের কাজকর্মগুলি অন্যমনস্কাভাবে করে, ভাত বা তরকারি পুড়াইয়া ধরাইয়া ফেলে, নয় তো ডালে খানিকটা বেশি নুন দেয়, ভালো করিয়া কথা বলে না—ইহাই হইল তাহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ।

মাস—দুই কাটিয়া গেল। শ্রাবণ মাস। বর্ষার ঢল নামিয়া বড়ো গঙ্গা ও ছোটো গঙ্গা একাকার করিয়া দিল। চরা ডুবিয়া গেল। কূলে কূলে গেরিমাটির রঙের জলে ভরতি। এই সময় নন্দলালের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিল। হাতে পূর্বে যাহা কিছু ছিল, সবই খরচ হইয়া গিয়াছে—এদিকে চাকরিও জুটিল না।

রাঘব চক্রবর্তী ভাগিনেয়কে ডাকিয়া বলিলেন—কোনো কিছু একটা দেখে নিতে পারলে না। তা দিনকতক এখন বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে তুমি কলকাতার দিকে গিয়ে কাজকর্মের ভালো করে চেষ্টা কর, নইলে আর কী করে চালাই বলো। এই তো দেখছ অবস্থা—ইত্যাদি।

নন্দলাল পড়িয়া গেল মহা বিপদে। না আছে চাকরি, না আছে সম্বল—ওদিকে অসুস্থা তরুণী বধূ ঘরে। বীজপুরের কারখানায় কয়েকবার যাতায়াতের ফলে একজন রঙের মিস্ত্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে বলিয়া কহিয়া তাহার বাসায় বউকে লইয়া আপাতত তুলিল। দুইটি মাত্র ঘর, একখানা ঘরে মিস্ত্রি একলা থাকে, অন্য ঘরখানি নন্দলালকে ছাড়িয়া দিল। মিস্ত্রি গাড়িতে অক্ষর লেখে—সে চেষ্টা করিয়া সাহেবকে ধরিয়া নন্দলালের জন্য একটা ঠিকা কাজ জুটাইয়া দিল। একটা বড়ো লম্বা রেক আগাগোড়া পুরোনো রং উঠাইয়া নূতন রং করা হইবে, নন্দলাল জমির রং করিবার জন্য এক মাসের চুক্তিতে নিযুক্ত হইল।

রাঘব চক্রবর্তী কিছুকালের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি অনেক জনমজুর ধরিয়া বাড়ির উঠান পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন, ভালো করিয়া একজোড়া হরিণের চামড়ার জুতো কিনিয়া আনিলেন, এমনকী পূজার সময় একবার কাশী বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিয়া ফেলিলেন।

আশ্বিনের প্রথম বর্ষা একটু কমিল। রাঘব চক্রবর্তী বাড়ির চারিধারে পাঁচিল গাঁথিবার মিস্ত্রি খাটাইতেছিলেন, সারাদিন পরিশ্রমের পর গঙ্গায় গা ধুইয়া অসিয়া সন্ধ্যার পরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

অত পরিশ্রম করিবার পর তিনি শুইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুম আদৌ আসিল না। ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টায় সারারাত্রি ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে উঠিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। দিনমানেও দুপুরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই ঘুম হইল না। সারাদিনের মজুর খাটাইবার পরিশ্রমের ফলে শরীর যা গরম হইয়াছে; সেদিনও যখন ঘুম আসিল না, তখন পাঁচিল গাঁথার জনমজুরকে বলিয়া দিলেন—এখন দিন—দুই কাজ বন্ধ থাকুক।

পরদিন রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া ঠান্ডা জল মাথায় দিয়া ও হাত—পা ধুইয়া সকাল—সকাল শুইয়া পড়িলেন। প্রথমটা ঘুম না আসাতে ভাবিলেন, ঘুমের সময় এখনও ঠিক হয় নাই কিনা, তাই ঘুম আসিতেছে না। এ—পাশ ও—পাশ করিতে লাগিলেন। দশটা...এগারোটা...বারোটা...রাঘব প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন, নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুইয়া দেখিলেন—ঘুম এখনও আসে না কেন? আরও ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল—ঘুমের চিহ্নও নাই। চাঁদ ঢলিয়া পড়িল, জানালা দিয়া যে বাতাস বহিতেছে তাহা আগেকার অপেক্ষা ঠান্ডা। ...রাঘবের কেমন ভয় হইল—তবে বোধহয় আজও ঘুম হইবে না। ভাবিতেও বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। আজ রাত্রে না ঘুম হইলে কার তিনি বাঁচিবেন কী করিয়া? উঠিয়া মাথায় আর একবার জল দিলেন—আবার শুইলেন, আবার প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই ভাবিয়া তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—ঘুম...ঘুম যদি না আসে? তাহা হইলে?...রাত্রি ফরসা হইয়া কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল, তখনও হতভাগ্য রাঘব চক্রবর্তী বিছানায় ছটফট করিতে করিতে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন।

ঠিক এইভাবে কাটিয়া গেল আরও আট দিন। এই আট দিনের মধ্যে কি দিনে, কি রাতে রাঘবের চোখে এতটুকু ঘুম আসিল না পলকের নিমিত্ত। রাঘব পাগলের মতো হইলেন—যে যাহা বলিল তাহাই করিয়া দেখিলেন। ডাব খাইয়া ও পুকুরের পচা পাঁক মাথায় দিন—রাত দিয়া থাকিতে থাকিতে নিউমোনিয়া হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বাঁশবেড়ের মনোহর ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আরও দিন ছয়—সাত কাটিয়া গেল। রাঘব সন্ধ্যার পরেই হাত পা ধুইয়া মন স্থির করিয়া শুইতে যান। কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকের মধ্যে গুরু গুরু করে—আজও বোধহয় ঘুম ...বাকিটা আর রাঘব ভাবিতে পারেন না।

রাজমিস্ত্রির দল কাজ না শেষ করিয়াই চলিয়া গেল। উঠানে জঙ্গল বাঁধিয়া উঠিল। রাঘব স্নানাহার করিতে চান না, চলাফেরা করিতে চান না, সব সময়েই ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তামাক খাইবার রুচিও ক্রমে হারাইয়া ফেলিলেন। লোকজনের সঙ্গে ভালো করিয়া কথাবার্তা কহিতে ভালোবাসেন না, পয়সার ভাঁড় উপুড় করিয়া গনিয়া দেখিবার স্পৃহাও চলিয়া গেল।

চিকিৎসা তখনও চলিতেছিল। গ্রামের বৃদ্ধ শিব কবিরাজ বলিলেন—তোমার রোগটা হচ্ছে মানসিক। ঘুম হবে না এ—কথা ভাবো কেন শোবার আগে? খুব সাহস করবে, মনে মনে জোর করে ভাববে—আজ ঘুম হবে, নিশ্চয়ই হবে, আজ ঠিক ঘুমুবো—এরকম করে দেখ দিকি? আর, সকাল—সকাল শুতে যেও না—যে সময় যেতে, সেই সময় যাবে।

কবিরাজের পরামর্শ মতো রাঘব সন্ধ্যার পর পুরোনো দিনের মতো রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। দাওয়ায় বসিয়া গুনগুন করিয়া গানও গাহিলেন। তারপর ঠান্ডা জলে হাত পা ও মাথা ধুইয়া শয়ন করিতে গেলেন। মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করিলেন—আজ তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন—নিশ্চয়ই।

কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। ঘুম যদি না হয়?...পরক্ষণেই মন হইতে সে—কথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—নিশ্চয়ই ঘুম হইবে। পাশ ফিরিয়া পাশ—বালিশটা আঁকড়াইয়া শুইলেন। ঘরের দেওয়ালের একখানা বাঁধানো রাধাকৃষ্ণের ছবি বাতাস লাগিয়া ঠকঠক শব্দ করিতেছে দেখিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিয়া সেখানি নামাইয়া রাখিলেন। পুনরায় শুইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন। আধঘণ্টা...একঘণ্টা...এইবার তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন...বুকের মধ্যে গুর—গুর করিতেছে কেন?...না, এইবার ঘুমাইবেনই।

দুই ঘণ্টা...তিন ঘণ্টা। রাত একটা, গ্রাম নিশুতি, কোনোদিকে সাড়াশব্দ নাই—কাওড়া—পাড়ায় এক—আধটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া।

না—রাত বেশি হইয়াছে, আর রাঘব জাগিয়া থাকিবেন না, এইবার ঘুমাইবেন। বাঁদিকে শুইয়া সুবিধা হইতেছে না। হাতখানা বেকায়দায় কেমন যেন মুচড়াইয়া আছে। ডানদিকে ফিরিয়া শুইবেন। ছারপোকা...না,

ছারপোকা তো বিছানায় নাই?...যাহা হউক জায়গাটা একবার হাত বুলাইয়া লওয়া ভালো।—যাক এইবার ঘুমাইবেন। এতোক্ষণে নিশ্চিত হইলেন। রাত দুইটা!

কিন্তু নিশ্চিত হইতে পারিলেন না। একটা হাট কি মেলা কোথায় যেন বসিয়াছে। রাঘব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সব লোক চলিয়া গেল, তবুও দু—দশজন এখনও হাটচালিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুঁটকি চিংড়ি মাছের দর কষাকষি করিতেছে—ইহারা বিদায় হইলেই রাঘব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবেন। একটা লোক চলিয়া গেল—দুইটা—তিনটা—এখনও জন—সাত লোক বাকি। রাঘব তাহাদের নিকট গিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ করিতেছেন, অনুনয় বিনয় করিতেছেন, হাত জোড় করিতেছেন—তিনি এইবার একটু ঘুমাইবেন। দোহাই তাহাদের, তাহারা চলিয়া যাক। এখনও জন—তিনেক বাকি। ...রাঘবের মনে উল্লাস হইল, আর বিলম্ব নাই। ....এখনও দুইজন। এই দুইজন চলিয়া গেলেই ঘুমাইবেন। আর একজন মাত্র! ...মিনিট পনেরো দেরি—তাহা হইলেই ঘুমাইবেন!

হঠাৎ রাঘব বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। হাট তো কোথাও বসে নাই? কিসের হাট? কোথাকার হাট? ...এসব কি আবোলতাবোল ভাবিতেছেন তিনি? ঘুম তাহা হইলে বোধহয়....

রাঘব কথাটা ভাবিতেও সাহস করিলেন না।

কত রাত? ...ওটা কিসের শব্দ? ...বীজপুরের কারখানায় ভোরের বাঁশি বাজিতেছে নাকি? ... সে তো রাত চারটায় বাজে। এখনই রাত চারটা বাজিল? অবসম্ভব! যাক, যথেষ্ট বাজে কথা ভাবিয়া তিনি রাত কাটাইয়াছেন। আর নয়। এইবার তিনি ঘুমাইবেন।

অল্প একটু ঘোর আসিয়াছিল কি না কে জানে? ভোরের ঠান্ডা বাতাসে তা তো একটু আসিতেও পারে। কিন্তু রাঘবের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এতটুকু ঘুমান নাই—চোখ চাহিয়াই ছিলেন। হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল। বিস্মিত রাঘব দেখিলেন, তাঁহার খাটের পাশের বাঁশের খুঁটিটা যেন ধীরে ধীরে একটা বিরাটকায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল, ব্যঙ্গের সুরে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল—মূর্খ! ঘুমাইবার ইচ্ছা থাকে তো কালই গহনার বাক্স ফেরত দিস। ভাগ্নে—বউয়ের গহনা চুরি করেছিস, লজ্জা করে না?...

বীজপুরের কারখানার বাঁশির শব্দে রাঘবের ঘোর কাটিয়া গেল। ফরসা হইয়া গিয়াছে। রাঘবের বুক ধড়ফড় করিতেছে, চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা যেন বোঝা, শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। না, তিনি একটুও ঘুমান নাই—এতটুকু না। বাঁশের খুঁটি—টুঁটি কিছু না— ও সব মাথা গরমের দরুন ....

কিন্তু ঠিক একই স্বপ্ন রাঘব পর—পর দুইদিন দেখিলেন। ঠিক একই সময়ে—ভোর রাত্রে, বীজপুরের কারখানার বাঁশি বাজিবার পূর্বে। ...ঘুমাই নাই, তবে স্বপ্ন কোথা হইতে আসিবে?

বীজপুরের বাসায় অন্য কেহ তখন ছিল না। নন্দলাল কাজে বাহির হইয়াছে, নন্দলালের স্ত্রী সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল। হঠাৎ রুক্ষ চুল, জীর্ণ চেহারার মামাশ্বশুরকে বাসায় ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত মুখে একবার চাহিয়া লজ্জায় ঘোমটা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলো। রাঘব চক্রবর্তী একবার চারিদিকে চাহিয়াই কাছে আসিয়া ভাগিনেয়—বধূর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—মা তুমি মানুষ নও, তুমি কোনো ঠাকুর—দেবতা হবে। ছেলে বলে আমায় মাপ কর!

তারপর পুঁটুলি খুলিয়া সব গহনাগুলি ভাগিনেয়—বধূর হাতে প্রত্যার্পণ করিলেন, কিন্তু বাসায় থাকিতে রাজি হইলেন না।

—নন্দলালের কাছে কিছু বলবার মুখ নেই আমার। তুমি মা—তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, বুঝলে না? কিন্তু তার কাছে...

ইহার মাস ছয় পরে রাঘব চক্রবর্তীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া নন্দলাল সস্ত্রীক গোরুর গাড়ি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। ইহারা যাইবার দিন সাতেক পরে রাঘবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার যাহা কিছু জমিজমা সব উইল করিয়া ভাগিনেয়—বধূকে দিয়া গেলেন। কিছু পোঁতা টাকার সন্ধানও দিয়া গেলেন।

নন্দলালের স্ত্রীকে কাছে বসাইয়া নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া গেলেন। বলিলেন—এই যে দেখছো ঘর, এই যে বাঁশের খুঁটি, এর মধ্যে দেবতা আছেন মা? বিশ্বাস করো আমার কথা....

ভাগিনেয়—বধূ শিহরিয়া উঠিল। সেই ঘর, সেই বাঁশের খুঁটি! ...

রাঘবের মৃত্যুর পর ষোলো—সতেরো বছর নন্দলাল মামার ভিটাতে সংসার পাতাইয়া বাস করিয়াছিল। বধূটি ছেলেমেয়েদের মা হইয়া সচ্ছল ঘরকন্নার গৃহিণীপনা করিতে করিতে প্রথম জীবনের দুঃখকষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে খুঁটি দেবতার কথাও ভুলিয়াছিল। হয়তো দুঃখের মধ্য দিয়া যে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগকে জীবনে একবার মাত্র লাভ করিয়াছিল, আর কখনো জীবন পথে তাহার সন্ধান মেলে নাই। ...

বছর সতেরো পরে নন্দলালের স্ত্রী মারা গেল। নন্দলালের বড়ো ছেলের তখন বিবাহ হইয়াছে ও বধূ ঘরে আসিয়াছে। বিবাহের বৎসর চারেকের মধ্যে এই বউটি দুরন্ত ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ক্যানসার হইল জিহ্বায়, ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে লাগিল—কতরকম চিকিৎসা করা হইল, কিছুতেই উপকার দেখা গেল না। সে শুইয়া যন্ত্রণায় ছটপট করিত। ইদানীং কথা পর্যন্ত কহিতে পারিত না। তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া সকলে তাহার মৃত্যু কামনা করিত।

কিন্তু বছর কাটিয়া গেল—মৃত্যুর কোনো লক্ষণ নাই, অথচ নিজে যন্ত্রণা পাইয়া, আরও পাঁচজনকে যন্ত্রণা দিয়া সে জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া রহিল।

বউটি শাশুড়ির কাছে খুঁটি—দেবতার গল্প শোনেও নাই, জানিতও না। একদিন সে সারা রাত রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। শ্রাবণ মাস। শেষরাতের দিকে ভয়ানক বৃষ্টি নামিল, ঠান্ডাও খুব, বাহিরে জোর বাতাসও বহিতেছিল। মাথার শিয়রে একটা কাঁসার ছোটো ঘটিতে জল ছিল, এক চুমুক জল খাইয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইতেই একটু তন্দ্রামতোত আসিল।

তাহার মনে হইল, পাশের খুঁটিটা আর খুঁটি নাই। তাহাদের গ্রামে শ্যামরায়ের মন্দিরের শ্যামরায় ঠাকুর যেন সেখানে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ছেলেবেলা হইতে কতবার সে শ্যামরায়কে দেখিয়াছে, কতবার বৈকালে উঠানোর বেলফুলের গাছ হইতে বেলফুল তুলিয়া মালা গাঁতিয়া বৈকালীতে ঠাকুরের গলায় দিয়াছে। শ্যামরায়ের মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়—তেমনি সুন্দর, সুঠাম, সুবেশ, কমনীয়, তরুণ দেবমূর্তি। ...

বিশ্বাসে মানুষের রোগ সারে, হয়তো বধূটির তাহাই ঘটিয়াছিল। হয়তো সবটাই তার মনের কল্পনা। রাঘব চক্রবর্তী যে বিরাটকায় পুরুষ দেখিয়াছিলেন সে—ও তাঁহার অনিদ্রা—প্রসূত অনুতাপবিদ্ধ মনের দৃষ্টিমাত্র হয়তো—কারণ খুঁটির মধ্যে দেবতা সেই রূপেই তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছিলেন, যার পক্ষে যে রূপের কল্পনা স্বাভাবিক।

সত্য মিথ্যা জানি না—কিন্তু খুঁটি—দেবতা সেই হইতে এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

রামাই ভূত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

লাভপুর। বীরভূম জেলার লাভপুর। আমার বাড়ি সেখানে। লাভপুরে চারখানা দুর্গাপুজো হয়, বারোখানা কালীপুজো হয়। শিব আছেন কয়েক গণ্ডা। এ ছাড়া বুড়ো শিব আছেন। এঁদের সঙ্গে অনেক ভূতের আসা—যাওয়া। তবে তারা আসে আবার চলে যায় দেব—দেবীর সঙ্গে। এ ছাড়াও অন্য ভূত, যারা এখানে বিশেষ পরিচিত, তারাও কম নয়, সংখ্যায় তারাও অনেক। এদের মধ্যে লালুকচাঁদা পুকুরের পাড়ে বটগাছটায় যে পেতনিটা থাকত তার নাম তো সেই ছেলেবয়েস থেকে শুনে আসছি। সে বটের ডালে দাঁড়িয়ে ডালটা দুলিয়ে দোল খেত। চট্টরাজদের বাড়িতে একটা ভূত ছিল সেটার কাজ ছিল সমস্ত রাত্রি বাড়ির ঘুমন্ত লোকগুলির পায়ে বগলে সুড়সুড়ি কাতুকুতু দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া। প্রথম প্রথম মানুষেরা চমকে উঠে 'কে কে' বলে জেগে উঠলেই সে খিলখিল শব্দে খোনা হাসি হেসে আরও সুড়সুড়ি দিত। শেষপর্যন্ত লোকে ভয় না করে গায়ে পায়ে হাত ঠেকলেই হাত—পা ছুঁড়ে ভূতটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিত। তখন সে আবার অন্য পথ ধরে জ্বালাতন করত, বাবলার কাঁটা ভেঙে এনে ফুটিয়ে দিয়ে জ্বালাতন করত। বৈরিগীতলার বষ্টুম ভূত ছিল। এখানে বৈরিগীদের একটা খুব ভালো আখড়া ছিল। সেখানে উৎকৃষ্ট বেলগাছ ছিল। লোকে বলত বাদশাহি বেল। এই বেলের লোভে অনেক বষ্টুম ভূত আসত। সকলকে তাড়িয়ে এখানে পাকাপোক্ত মোহন্ত ভূত হয়েছিলেন তিনি এক বষ্টুম পণ্ডিত ভূত। তিলক ফোঁটাকাটা মোটা চৈতনওয়ালা মহাপণ্ডিত। শুনেছি তাঁর মতো বৈষ্ণব শাস্ত্রে—সাহিত্যে পণ্ডিত দেশে দু—চারটের বেশি ছিল না। ক র গ চ শব্দগুলো শুনলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। ক—য়ে কৃষ্ণ, র—য়ে রাধা, গ—য়ে গৌরাঙ্গ—গোবিন্দ, চ—য়ে চৈতন্য। মৃত্যুর পর রথ এসেছিল তাঁকে নিতে, কিন্তু তিনি যাননি। বলেছিলেন—ওহে সারথি, তুমি বাবু রথ নিয়ে ফিরে যাও। আমার কিছু কাজ বাকি আছে, মানে গোটাকতক মামলা চলছে আদালতে। সে—কটা শেষ না—হওয়া পর্যন্ত যেতে আমি পারব না। রথ ফিরে গিয়েছিল। বৈষ্ণবপতি জীবনকালে শুধু বৈষ্ণবশাস্ত্র নিয়েই কারবার করেননি—তাঁর আইনজ্ঞান, মামলাজ্ঞান ছিল টনটনে। এ চাকলায় ফৌজদারি দেওয়ানি যে মামলাই হোক পণ্ডিত মোহন্ত তার একপক্ষের তদ্বিরে থাকতেনই। বৈষ্ণব শাস্ত্র নিয়ে কথা না বললে তাঁর বুক ধড়ফড় করত, মাথা ধরত। আর মামলা নিয়ে কোনো দিন যদি আলাপ আলোচনা না হত তা হলে তাঁর পেট কামড়াত এবং যা খেতেন তার একটি দানাও হজম হত না। সুতরাং মৃত্যুর সময় তাঁর হাতে চার—চারটে মামলা, এ খুব বেশি ব্যাপার নয়। বৈষ্ণবপণ্ডিত ভূত হয়ে দীর্ঘকাল থেকেছিলেন; থাকতেন ওই যে বেলবন, ওই বেলবনের মধ্যে একটা বকুলগাছে। বেলগাছের কাঁটা ফুটত বলে বেলগাছে থাকতেন না। প্রায় রোজই যাতায়াত করতেন সিউড়ি—রামপুরহাট। আদালতের সামনে একটা খোলা জায়গা সর্বত্র আছে এবং সেখানে বটগাছ আছে। সেই বটগাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতেন; কেউ যদি আইনের পরামর্শ চাইত তা হলে তিনি কূট পরামর্শ দিতেন; ফি সামান্যই, সামান্য বাতাসা—টাতাসা দিলেই হত। প্রতি বৎসর তাঁর মৃত্যুদিনে রথ আসত কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিয়ে বলতেন—আসছে বছর এসো। তাঁকে তাড়িয়েছিল গঙ্গাতীরের ভূতের দল এসে।

একবার শুনেছি গঙ্গাতীর থেকে এক ঝুড়ি বা চুপড়ি বোঝাই হয়ে ভূত এসেছিল আমাদের গ্রামে। ব্যাপারটা হল এই : আমাদের এখানে 'বৈরাগী আখড়া' বলে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে গৌরাঙ্গ—নিত্যানন্দের সেবা ছিল। আর ছিল গোবিন্দ—সেবা। এঁদের চারপাশে ছিল ঝুড়িখানেক শালগ্রাম শিলা।

মানেটা সেকালে সহজ ছিল, একালে ঠিক সহজ নয়। সেকালের ব্রাহ্মণদের বহুজনের বাড়িতে শালগ্রাম নারায়ণ—সেবা ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কালে লোকেরা দেখলে এই গোল নুড়িগুলো 'কুছ কামকা নেহি'; কেবল পুজো ভোগের ঝঞ্ঝাট বাড়ায়; শালগ্রাম নিয়ে আর ব্যবসা চলে না; লোকে সত্যনারায়ণ করায় না, যাগযজ্ঞি করায় না, তখন তারা লুকিয়ে শালগ্রাম শিলাগুলি এনে এই আখড়ায় নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। আখড়া থেকে নিয়ম ছিল যে শালগ্রাম শিলা পেলে ওই শালগ্রাম শিলার সারিতে বসিয়ে রাখবে, দিনান্তে ছিটিয়ে দেবে কুশের ডগায় গঙ্গাজল, তুলসীর পাতা আর আতপের কণা। আখড়ায় এ জন্য জমি ছিল। এই বৈষ্ণব পণ্ডিতের পরামর্শে সেবাইত একদিন শিলাগুলি ঝুড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিলে। ব্যস নিশ্চিন্ত। কিন্তু অদৃষ্টের বিপাক, সেইখানে ছিল একটা বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের ডালে ঝুলত অনেক বাদুড়। চ্যাঁ চ্যাঁ করে চ্যাঁচাত আর উড়ত। এদের মধ্যে ছিল অনেক চামচিকে। এরা কিন্তু আসলে বাদুড় চামচিকে নয়, এরা আসলে হল গঙ্গাতীরে মরতে এসে যারা গঙ্গা পায়নি তাদেরই অশান্ত অতৃপ্ত আত্মা, ভূত হয়ে ঝুলছে ডালে ডালে। শালগ্রাম শিলা ফেলে দিতে ঝুড়িটা যেই না খালি হল অমনি ঝুপঝুপ করে একঝুড়ি বোঝাই হবার মতো চামচিকে খসে পড়ল। মানে একঝুড়ি ভূত।

সেই একঝুড়ি—বোঝাই ভূত ওই বৈরাগীর মাথায় চেপে এল আমাদের লাভপুর। এবং বৈরাগী আখড়ায় পৌঁছবামাত্র ফরফর শব্দে উড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলে বকুলগাছে। বকুলগাছের ডালে বেশ শয্যা রচনা করে ওই পণ্ডিতজি তখন ওই নাকহীন মুখের নাসিকাগহ্বরে বাতাস টেনে নাক ডাকাচ্ছিলেন। এবং স্বপ্ন দেখছিলেন যে শালগ্রাম শিলাগুলো গেল, ঝঞ্ঝাট কমল, ওই অনাথ শালগ্রাম সেবার জন্যে যে জমিটা ছিল সেটার আয় থেকে এবার যুৎসই করে মালপো খাওয়া যাবে।

গোবিন্দ হে! কোথায় মালপো! কোথায় সুখ! দু—চারশো চামচিকে পণ্ডিতকে চিঁচিঁ শব্দ করে নখ দাঁত দিয়ে আক্রমণ করলে।

পণ্ডিত সেই যে সেদিন পালালেন আর ফেরেননি। এ চামচিকে আকারের ভূতগুলো একবার ঝড়ে ওই বকুলগাছের ডাল ভেঙে পড়ায় চাপা পড়ে চেপটে লেপটে ফুস ধা হয়ে গেছে।

এ ছাড়াও অনেক অনেক ভূত আছে।

সে সব এখন থাক। এখন আমি যম দত্তের ছকে দেওয়া লাইনে গবেষণা করব। সকলেই জানেন, রিসার্চ ওয়ার্কের নিয়মই তাই, একজনের অধীনে থেকে তাঁরই পরামর্শ এবং নির্দেশমতো রিসার্চ করতে হয়। আমার গবেষণা হল যম দত্ত মহাশয়ের অধীনে। তাঁর নির্দেশ হল রামাই ভূতের সূত্র ধরে কাজ আরম্ভ করো।

রামাই ভূতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সে আজকের কথা নয়—আমার ঠাকুরদাদারা তখন ছেলেপুলে মানুষ। সে ধরুন গিয়ে একশো চল্লিশ বছর আগের কথা। সে সময় রামাই ভটচাজ ছিলেন একেবারে ভরাভরতি জোয়ান; ভটচাজ বাড়ির এই জোয়ান ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল 'নিশি'তে। নিশিও একরকম ভূত। তারা রাত্রে মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় চেনা মানুষের গলায় ঘুমন্ত মানুষের নাম ধরে ডাকে। ঘুমন্ত মানুষ ঘুম ভেঙে উঠে বেরিয়ে এসে দেখতে পায় একটু দূরে তার একজন চেনা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সে চলতে থাকে, এ লোকটিও চলে। অনেক দূর এসে কোনো খালে বা বিলে ডুবে কিংবা শক্ত মাটিতে কি পাথরে আছাড় খেয়ে এবং পড়ে মরে ভূত হয়। রামাইয়ের নিশি ভয়ানক নিশি, সে থাকত গোয়াল ঘরে। রামাই তার ডাকে বেরিয়ে এসে গোয়াল ঘরে ঢুকে গোরুর দড়ি গোয়ালের সাঙায় বেঁধে তাইতে গলায় ফাঁস পরে মরেছিল। অতঃপর রামাই আমাদের অলঙ্ঘনীয় শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভূত হল। এবং নিজের বাড়িতেই তার বাসা গাড়লে। উঠানে একটি নিমগাছ ছিল, সেই গাছ হল তার বৈঠকখানা, বাড়ির বড়ো ঘরের চালের সাঙায় হল তার শোয়ার ঘর। ভূত হয়েও সে বাড়িরই একজন হয়ে রইল। রামাইকে নাকি দিনে রাত্রে যখন তখন দেখা যেত। শুনেছি আমার ঠাকুরদাদারাও তাকে দেখেছেন। তাঁরা বলতেন, রামাইদাদা, আমাদের ভয় দেখিয়ো না। রামাই বলত—নাঁ—নাঁ। চঁলে যাঁ। নিঁর্ভয়ে চঁলে যাঁ। আমাঁর দিঁকে তাঁকাস নাঁ। আঁমি কাঁজ কঁরছি। রাত্রে সে গোরুদের খেতে

দিত। ঘরদোর ঝাঁট দিত। বাড়ির দোরে একটা কলকে ফুলের গাছ ছিল, সেটায় চড়ে টাটকা কলকে ফুল তুলে চুষে চুষে মধু খেত। বড়ো যে নিমগাছটা ছিল উঠোনে, সেই গাছটার নীচের একটা ডালে দাঁড়িয়ে সেই ডগার একটা ডাল ধরে 'হেঁইয়ো মারি হেঁইয়ো মারি' বলে দোল খেত।

বড়দাদা নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের স্ত্রীর কোলে তখন খোকা হয়েছে। বাড়িতে মেয়েছেলে বলতে নবকৃষ্ণের স্ত্রী মানদা এবং বিধবা বোন চণ্ডীদাসী; একজন রান্না করত, অন্যজন ঘরে শালগ্রাম—সেবার কাজ থেকে অন্য সব পাটকাম করত। ছেলেটি ঘরে কি দাওয়ায় বিছানায় শুয়ে ঘুমুত। হঠাৎ ঘুম তার ভাঙত, হয়তো গায়ে দুধের বা তেলের গন্ধ পেয়ে পিঁপড়ে এসে কামড়াত, নয়তো ছোটো মাদুর বা বিছানায় উঠে—থাকা কোনো কাঠির খোঁচা লাগত, নয়তো দেয়ালা করার মধ্যে স্বপ্নে ভয় পেয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠত। মায়ের আসতে দেরি লাগত কারণ ভটচাজ বাড়িতে লোকের কাজ থেকে দেবতার কাজ বেশি। তারপর গোরুবাছুর আছে। মায়ের ছুটে আসা সম্ভবপর হত না। তখন রামাই নিমগাছের ডাল বা ঘরের সাঙা বা কলকে ফুলের গাছ বা গোয়াল ঘর যেখানেই থাকত সেখান থেকে দুই হাত লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে (সাঁতারুরা যেমন ভাবে ডাইভ করে তেমনি ভাবে আর কী!) সাঁ করে এসে হাজির হত ছেলেটির কাছে এবং ওপরের সাঙায় বসে লম্বা হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে তুলে নিত। বাচ্চা কচি ছেলে তার ভূতের ভয় ছিল না। ভূত আর মানুষে ঠিক তফাত করতে পারত না—সে কোল পেয়ে চুপ করত। রামাই তাকে দোলা দিতে দিতে আদর করে ফিসফিস খোনা আওয়াজে বলত—আ হা রে জিঁভে আমার জল সঁরছে, কঁচি কঁচি মাংস তাঁজাতাঁজা রক্ত, ইঁচ্ছে কঁরে ঘাড় মটকে চুষে খেঁয়েনি। কিন্তু দাঁদার ছেঁলে বংশধর, পিণ্ডি দিবি আমাকে, তোঁর ঘাড় কী কঁরে ভাঙি!

ছেলেটা এর মানে বুঝত না ফিকফিক করে হাসত।

বউদি এসে দেখত বিছানায় ছেলে নেই—ছেলে সাঙার কাছে শূন্যে দোল খাচ্ছে। রামাইকে সে দেখতে পেত না। অনুমানে বুঝত রামাই দোলাচ্ছে। তখন বলত, ঠাকুরপো, খোকাকে নামিয়ে দাও ভাই। ওর খিদে পেয়েছে দুধ খাওয়াবো।

রামাই সুড়সুড় করে নামিয়ে দিত ছেলেটিকে।

রামাই একটি শর্ত করিয়ে নিয়েছিল বউদিকে। শর্ত করিয়ে নিয়েছিল এই—ছেলে যেন বড়ো হয়ে কখনো গয়া না যায়।

বউদি জিজ্ঞেস করেছিল—কেন ঠাকুরপো?

খোনা আওয়াজে রামাই বলেছিল—ন্যাঁকা আমার! জাঁনো না বুঝি?

কী জানি না?

জানো না গয়ায় পিণ্ডি দিলে ভূতজন্ম থেকে মুক্তি হয়?

তা তো ভালো গো!

ভালো? তাহলে তো মানুষের মরণও ভালো! মুক্তি হয়! দোঁব নাকি তোমার ঘাড়টা ভেঙে?

ভয় পেয়ে বউদি বলত—দোহাই ভাই তোমার পায়ে পড়ি।

পায়ে পড়ি! কেন—মানুষজন্মে কত হাঙ্গামা বলো তো? খাওয়া—দাওয়া, বিষয়—সম্পত্তি করা, চাষবাস, পুজো—আর্চা, ঝগড়াঝাঁটি—

না ভাই। তবু মনুষ্যজন্ম সুখের—

রামাই ধমক দিয়ে উঠত—চুঁ—প বঁলছি! ভূঁতজন্ম আঁরও সুঁখের। স্বঁগগেও এত সুঁখ নাই। হুঁ—হুঁ

বলেই নাকি রামপ্রসাদী সুরে গান ধরে দিত—

মঁন, তুঁমি আঁসল খঁবর জাঁনো না—

ভূঁতজন্ম, সুঁখ—জন্ম, বিনি আঁবাদে ফঁলে সোঁনা!

গাঁছের ডাঁলে ঘঁরের কোঁণে

শ্মঁশানে মঁশানে বঁনে—

বাঁসা বাঁধো রাঁন্না রাঁধো
শুঁধু লঁঙ্কাতে সঁম্বরা দিঁয়ো না,
যেঁথায় খুঁশি সেঁথায় যেঁয়ো,
শুঁধু অ্যাঁযোধ্যার ধাঁরে যেঁয়ো না।

গানটাই শোনা যেত, রামাইয়াকে দেখা যেত না, দেখা যেত ভটচাজ বাড়ি থেকে খাড়া পশ্চিম দিকে প্রায় শ পাঁচেক হাত দূরে শা পুকুরের পাড়ের উপর যে শ খানেক হাত উঁচু শিমুলগাছটা আছে সেই গাছটার মগডালটা বিনা বাতাসে একেবারে ভেঙে পড়বার মতো ঝাপটা খেল কিছুর। সেকালের লোকে এর মানে বুঝত। তারা বলত—রাম রাম রাম রাম। কেবল রামাইয়ের বউদি জানত, এ হল রামাই। মনের আনন্দে এখান থেকে একলাফে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে গাছটার উপর। গাছটা হল গ্রামটার মধ্যে ভূতেদের একটা পার্ক বা বেড়াবার, হাওয়া খাবার জায়গা!

বউদির সঙ্গে বনত রামাইয়ের কিন্তু বোনের সঙ্গে বনত না। বোন চণ্ডীদাসী বালবিধবা। ভূতকে সে অপবিত্র ভাবত—ঘেন্না করত, বলত—মহাপাপী ছিলি, ছোড়দা তুই। রাত্রে বিছানায় শুয়ে চণ্ডীদাসীর কথা বলবার অবকাশ হত। চণ্ডী থাকত মেঝেতে শুয়ে রামাই থাকত সাঙায়—অবশ্য তাকে দেখা যেত না।

রামাই ধমক দিত—চুঁ—প।

কেন? চুপ করব কেন? পাপ না করলে ভূত হলি কেন তুই?

সেঁ গঁলায় দঁড়ি দেঁওয়ার জন্যে।

তাই বা দিলি কেন?

নিঁশি ভূঁতে দেঁওয়ালে যেঁ?

তুই দিলি কেন?

বঁললে যে খুঁব মজা হঁবে।

মজা হবে! দেখছিস মজা?

দেঁখছি না? তুঁই দেঁখছিস না?

কী দেখব? দেখবার কী আছে?

তঁবে দেঁখ।

কী?

দেঁখ না ওঁপরের দিকে চেঁয়ে!

চণ্ডীদাসী দেখত—সাঙার ওপর থেকে থামের মতো একখানা পা আস্তে আস্তে নেমে আসছে তার বুক বরাবর। কিন্তু চণ্ডীদাসী ভয় পায় না, সে দিব্যি সেই থামের মতো পা—খানাকে বলে—নাম নাম—নাম দেখি! এই পা!

পা কিন্তু নামতে পারে না। থেমে যায়।

সাঙার ওপর থেকে কথা ভেসে আসত—ওঁরে চঁণ্ডী, ওঁরে মুঁণ্ডী, তোঁর মঁতো বঁদমাশ আঁমি দেঁখিনি। মঁনে মঁনে সেই দঁশরথ রাঁজার বেটার নাম কঁরছিস!

পা—খানাকে সে সজোরে দোলাতে থাকত। সে দোলায়মান পা—খানার এক লাথি খেলে চণ্ডীদাসী যে চেপটে যাবে এতে কোনো সন্দেহ থাকবার কথা নয়।

বউদি বলত—ও চণ্ডী, ক্ষমা চা ভাই। ও চণ্ডী!

কাকে বলেছে? চণ্ডী সেই কথা শুনবার মেয়ে! সে কী করত, এই মস্ত হাঁ করে দাঁত বেলে বিছানায় উঠে বসত এবং বলত কামড়াব তোর পায়ে।

আঁ—!

পা—খানা সড়াৎ করে গুটিয়ে যেত ফুটো হয়ে যাওয়া লম্বা বেলুনের মতো। চণ্ডীদাসী খিলখিল করে হাসত। তবে মধ্যে মধ্যে অতর্কিতে ছরছর শব্দে বালি ছিটিয়ে দিয়ে কিংবা কখনো পিঠের ওপর গুম করে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে অথবা চণ্ডীর মাথায় গোবরের তাল ফেলে দিয়ে তাকে জব্দ করত রামাই।

রামাই ভয় করত আর খাতির করত দাদাকে। দাদা যজমান বাড়ি থেকে ফিরত চাল কথা মিষ্টি মণ্ডা ফলমূল বেঁধে নিয়ে; পিছন পিছন রামাই পাহারা দিয়ে নিয়ে আসত বাড়ি। তবে দাদার সামনে কখনো যেত না। দাদা তাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াবার সময় বাখারি দিয়ে পিটত। এবং বরাবর পিছন থেকে হঠাৎ কান চেপে ধরত। ওই ভয়ে সামনে আসত না রামাই।

দাদা একলা মানুষ, চাষের সময় বলত—রামাই, মাঠের খোঁজ একটু রাখিস। একলা মানুষ। এবার টানের বছর, দেখিস যেন চুরি করে জল কেটে না নেয়।

রামাই সারারাত্রি জমির চারধারে ঘুরে বেড়াত। একবার চাষি সদগোপদের ভীমের মতো জোয়ান বহুবল্লভ, ভটচাজদের জমির জল চুরি করে কেটে নিতে এসে দেখেছিল—সেখানে একটা আচমকা তালগাছ দাঁড়িয়ে! আচমকা মানে অচেনা অর্থাৎ তালগাছ সেখানে ছিল না; আচমকা অচেনা তালগাছটাকে দেখে বহুবল্লভ থমকে দাঁড়িয়েছিল। এ তালগাছ এল কোত্থেকে?

তালগাছটাই উত্তর দিয়েছিল—আঁয় নেঁ, জঁল কাঁট!

বহুবল্লভ সাহসী এবং বলবান। সে বলেছিল—কে রে তুই?

আঁমি রাঁমাই!

এবার বহুবল্লভ চোঁচা দৌড় দিয়েছিল। রামাই তার বাড়ি পর্যন্ত 'ধঁর ধঁর ধঁর' বলে ছুটে এসেছিল পিছন পিছন।

লোকে বলে রামাই নয়। এটা ছিল ওর ওই দাদা নবকৃষ্ণের কাজ। রামাই ভূত হয়েছে এই কথা রটনা যখন হল তখন সে মধ্যে মধ্যে তেলকালি মেখে ভূত সেজে এইভাবে মাঠে নিজের জল রক্ষাও করত আবার পরের জল চুরি করেও নিত।

তা বলুক লোকে। সে লোকেরা নিন্দুক লোক। নাস্তিক লোক। ও কাজ রামাইয়ের! রামাই ছিল অসাধারণ ভূত। বাড়ির হিতৈষী ভূত। তার প্রমাণ আছে। রামাই একবার বউদি আর বোন চণ্ডীদাসীর অনুরোধে রাসের সময় কান্দীর রাজবাড়ি থেকে একঝুড়ি মালপো, একঝুড়ি মেঠাই, একঝুড়ি রাধাপ্রসন্ন—কৃষ্ণপ্রসন্ন মিষ্টি এনে খাইয়েছিল। ব্যাপারটা বলতে হয় নইলে পরিষ্কার হবে না। সে বছর রাসের দিন দুই ননদ ভাজে গল্প করছিল কান্দীর রাজবাড়ির রাসের খাওয়ার সমারোহের।

কান্দী রাজবাড়িতে রাধাবল্লভ ঠাকুরের নিত্যভোগেই এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন একান্ন পদের ব্যবস্থা; সেই অবস্থার উপর বিশেষ ব্যবস্থা রাসযাত্রা পর্বে। দীয়তাম ভুজ্যতাম ব্যাপার। খেতে বসে পদের পর পদ খেতে খেতে লোকের পেট ভরে উঠে এমন চড়চড় করে যে হেউঢেউ শব্দে চারিদিক ভরে যায়। দু—দশজন 'ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি মাম পুণ্ডরীকাক্ষ' বলে গড়াগড়ি খায়।

বউটির বাপের বাড়ি কান্দীর কাছে, সে—ই গল্প করছিল। বলছিল—এমন মালপো, মনোহরা আর রাধাপ্রসন্ন—কৃষ্ণপ্রসন্ন মেঠাই আর কোথাও হয় না ভাই ঠাকুরঝি। প্রতি বার বাবা রাসের সময় কান্দীর রাজবাড়ি থেকে ছাঁদাতে নিয়ে আসত।

চণ্ডীদাসী বলেছিল—আমি ভাই কখনো খাইনি।

বউ বলেছিল—আমি খেয়েছি, আরও খেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কে খাওয়াবে বলো? তোমাকে কী বলব, মনে পড়ে নোলা সপসপ করছে।

ঘরে সাঙার ওপরে চালের নীচে এক টুকরো খোনা হাসি বেজে উঠেছিল—হিঁ—হিঁ—হিঁ!

চণ্ডী বলেছিল—এই! কী হাসছিস তুই ছোড়দা! ভারি তো ভূত হয়েছিস! শুধু ঝুঁটি ধরে টানতেই পারিস! কই খাওয়া না দেখি! মনোহরা, মালপো, ফেষ্টফসন্ন—টসন্ন না কী বলছে বউ সেই মিষ্টি।

কেষ্ট কি প্রসন্ন নাম করতে পেত না চণ্ডী; কেষ্টদাসী নাম ছিল চণ্ডীর শাশুড়ির আর প্রসন্নকুমার নাম ছিল স্বামীর! তাই বলেছিল ফেষ্টফসন্ন। যাক সে কথা। এখন যা হয়েছিল তাই বলি। ঘরের ভিতরে যেন একটা দমকা বাতাস উঠল এবং ঘরের দরজা দড়াম শব্দে ঠেলে খুলে বেরিয়ে গেল; হাওয়াটা পাকাতে পাকাতে নিমগাছটার গোড়ায় গিয়ে গাছটার কাণ্ডটাকে ঘিরে পাক দিয়ে ডালপালায় ঝড়ের মতন ঝটপটানি জাগিয়ে, একেবারে গোড়া থেকে সেই মগডালে উঠে সেখান থেকে মাথার ওপরে আকাশ কাঁপিয়ে (আজকালকার জেট প্লেনের মতো) একটা গোঙানি শব্দ তুলে ঝপাং শব্দে গিয়ে পড়ল শিমুলগাছের মগডালে—সেখান থেকে আর একটা শব্দ।

চণ্ডীদাসী বলেছিল—মরণ! রকম দেখ। ভূতের কি সবই বিটকেল, যাচ্ছে তারই বিটকেলেমি দেখ তো!

এই বিটকেলেমি তো যেমন তেমন। এরপর যে বিটকেলেমি করলে রামাই তা শুনেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। আধঘণ্টা হবে, তারপরই চালের ওপর সে যেন চার চারটে বীর হনুমানের সমান ওজন নিয়ে দমাস শব্দে লাফ খেয়ে পড়ল। পড়ল—তো পড়ল একেবারে আচমকা পড়ল। চণ্ডীদাসীদের গল্প তখন সদ্য শেষ হয়েছে। চুপ করেছে। এই শব্দে দুজনেই চমকে উঠে—বু—বু—বু—বু শব্দে কেঁদে উঠেছিল।

চালের ওপর তখন মচমচ শব্দ উঠতে শুরু করেছে। চাল যেন ভেঙে পড়বে। তারপরই তাদের চোখে পড়ল চাল থেকে ঠিক মধ্যি—উঠোনে এসে নামছে একটি গোদা পা, তা পা—খানা প্রায় নিমগাছের ডালের মতো বা তালগাছের মতো তো হবেই। তারপরই আর একটা পা, ক্রমে দুটো পায়ের ওপর গোটা একটা মূর্তি। মূর্তিটা একেবারে মিশকালো। তবে গায়ে অসংখ্য জোনাকি পোকা লেগে রয়েছে এবং শরীরের রেখায় রেখায় লেগে দিপদিপ করছে। পূর্ণিমার রাত্রি—জ্যোৎস্নায় সব ফটফট করছে—তারই মধ্যে জোনাকি পোকা—খচিত ওই অপূর্ব কালো মূর্তিটা উঠোনে দাঁড়াল; তার মাথার ওপর ঝুড়ির গন্ধমাদন—চার চারটে ঝুড়ি থাকবন্দি সাজানো। আর থেকে কী সুবাসই না উঠছে! আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! মূর্তিটা ক্রমে খাটিয়ে গুটিয়ে মানুষের মতো হল এবং চারটে ঝুড়ি মাথায় বয়ে ঘরে এসে ঢুকে নামিয়ে দিলে—নেঁ—খাঁ। এঁকেবাঁরে টাঁটকা। উঁনোন থেঁকে নেঁমেছে আঁর তুঁলে এনেছি। খাঁ। বলেই চণ্ডীদাসীর ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে দুম শব্দে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে লাফ মেরে ঘরের সাঙার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে খোনা গলায় গান ধরে দিয়েছিল।

মাঁ গোঁ আঁমায় বাঁচিয়ে রাঁখো।
এই ভূঁতজন্মে মাঁ—জঁন্মে জঁন্মে চিঁ—র জঁন্ম বাঁচিয়ে রাঁখো।
ইঁন্দ্র—চঁন্দ্র দেঁবতা থেঁকে মাঁনুষ দেঁখলাম লাঁখো লাঁখো—
সব ফেলে মা ভূতভাবনের বুকেই তুমি দাঁড়িয়ে থাকো—
মা গো আমায় বাঁচিয়ে রাখো—এই ভূতজন্মে!
ভূতের কত সুখ বলো মা—দুখ নাইকো তিন সীমানায়
অমাবস্যার ভূতের নাচন—নাচছি দেখো মা আজকে রাস পূর্ণিমায়,
ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং—নাচ—ছি দেখো পূর্ণিমায়।

সে গান সে দিন সকলে শুনেছিল এ গ্রামের। এমন খোনা মিষ্টি গলা আর কেউ কখনো শোনেনি। শুনেছিল আর দেখেছিল নিমগাছটার ডালে পাতায় জোনাকি পোকাগুলো ছুটে গিয়ে নিভে যাচ্ছে। তার মানে রামাই জোনাকি পোকাগুলো ধরে ধরে খাচ্ছিল।

চণ্ডীদাসী জিজ্ঞাসা করেছিল—ওগুলো খাচ্ছিস কেন? মা গোঃ!

রামাই বলেছিল—জোনাকি পোকা ভূতের জিভে ভারি মিষ্টি আর জোনাকি পোকা খেলে ভূতের রং ফরসা হয়।

চণ্ডীদাসী বলেছিল—তার চেয়ে জোনাকি পোকা দিয়ে গয়না করে পরিস সেই তো ভালো।

রামাই বলেছিল—তুই গলায় দড়ি দিয়ে মর পেতনি! আমি তোকে জোনাকি পোকার গয়না গড়িয়ে দেব।

টিকটিকির ডিম

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতের সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন ক্লাবে বসিয়া রাজনৈতিক আলোচনা করিতেছিলাম যদিও ক্লাবে বসিয়া উক্তরূপ আলোচনা করা ক্লাবের আইনবিরুদ্ধ। বেহার প্রদেশে বাস করিয়া বাঙালির ক্লাব করিতে হইলে ওইরকম গুটিকয়েক আইন খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

আলোচনা ক্রমশ দুইজন সভ্যের মধ্যে বাগযুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। আমরা অবশিষ্ট সকলে মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলাম।

পৃথ্বী বলিল যাই বল, গান্ধীটুপি পরলেই দেশভক্ত হওয়া যায় না।

গান্ধীটুপি পরিহিত চুনী বলিল, হওয়া যায়। বাংলাদেশের সাতকোটি লোক যদি গান্ধীটুপি পরে তাহলে অন্তত এককোটি গজ খদ্দর বিক্রি হয়, তার দাম নিদেন পক্ষে ত্রিশ লক্ষ টাকা। ওই টাকাটা দেশের লোকের পেটে যায়।

পৃথ্বী বলিল, হতে পারে। কিন্তু টুপি পরলে বাঙালির বিশেষত্ব নষ্ট হয়, তা সে যে—টুপিই হোক। 'লাঙ্গা শির' হচ্ছে বাঙালির বিশেষত্ব।

চুনী চটিয়া উঠিয়া বলিল, কেবল ওই বিশেষত্বের জোরে যদি বাঙালি বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে তার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।

দূরে টেবিলে এক কোণে বরদা কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করিল, টিকটিকিকে হাসতে দেখেছ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তার্কিক দু—জনে কিছুক্ষণের জন্য গুম হইয়া গেল; তারপর সবাই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে বরদা বলিল, হাসির কথা নয়। মিথ্যে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলি আমার একটা দুর্নাম আছে; সেটা কিন্তু নিন্দুকের অখ্যাতি। স্রেফ গান্ধীটুপি পরলে দেশ উদ্ধার হয় কিনা বলতে পারি না কিন্তু গয়ায় পিণ্ডি দিলে যে বদ্ধ জীবাত্মার মুক্তি হয় তার সদ্য সদ্য প্রমাণ চাও তো আমি দিতে পারি।

সকলেই বুঝিল একটা গল্প আসন্ন হইয়াছে। অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এইবার গাঁজার শ্রাদ্ধ হবে, আমি বাড়ি চললুম—। দরজা পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দেখ, তোমরা ভালো চাও তো বরদাকে ক্লাব থেকে তাড়াও বলছি; নইলে শুদ্ধ গাঁজার ধোঁয়ায় এ ক্লাব একদিন বেলুনের মতো শূন্যে উড়ে যাবে, বলিয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বরদা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যি কথা যারা বলে তাদের এমনিই হয়, যিশুকে তো ক্রুশে চড়তে হয়েছিল। যাক, হৃষী, একটা সিগার দাও তো।

হৃষী বলিল, সিগার নেই। বিড়ি খাও তো দিতে পারি।

বরদা আর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, থাক, দরকার নেই। দেখি যদি আমার পকেটে—

নিজের পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া সযত্নে ধরাইয়া বরদা বলিতে আরম্ভ করিল,—ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে বলতে আমারই সংকোচ বোধ হচ্ছে । কিন্তু তোমরা যখন শুনবে বলে ঠিক করেছ তখন বলেই ফেলি। দেখ, শুধু যে মানুষ মরেই ভূত হয় তা নয়, পশুপক্ষী এমন কী কীটপতঙ্গ পর্যন্ত মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। তার প্রমাণ আমি একবার পেয়েছিলুম।

এই তো সেদিনের কথা, বড় জোর বছর—দুই হবে।

ছুটির সময়, কাজের তাড়া নেই, তাই নিশ্চিন্ত মনে গী—দ্য মোপাসরি গল্পগুলো আর একবার পড়ে নিচ্ছি। আমাদের দেশের অকালপক্ক তরুণ সাহিত্যকেরা দ্য মোপার্সের দোষটি ষোলো আনা নিয়েছেন কিন্তু তার গুণের কড়াক্রান্তিও পাননি। যাকে বলে, বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপোনা চক্কর।

সে যাক। সে—রাত্রে টেবিলে বসে একমনে পড়ছি, কেরোসিনের বাতিটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। হঠাৎ এক সময় চোখ তুলে দেখি একটা প্রকাণ্ড টিকটিকি কখন টেবিলের ওপর উঠে পোকা ধরে খাচ্ছে। টিকটিকিটার স্পর্ধা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম।

জগতে যতরকম জানোয়ার আছে, আমার বিশ্বাস তার মধ্যে সবচেয়ে টিকটিকি বীভৎস। মাকড়শা, আরশোলা, শুঁয়োপোকা, কচ্ছপ, এমনকী ব্যাং পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু টিকটিকি। জানো, টিকটিকির এক কানের ভেতর দিয়ে আর এক পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। তার ল্যাজ কেটে দিলে ল্যাজটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনাআপনি লাফাতে থাকে? মোট কথা, টিকটিকি দর্শন মাত্রেই আমার প্রাণে একটা অহেতুক আতঙ্কের সঞ্চার হয়, পেটের ভেতরটা কেমন যেন খালি হয়ে যায়, শিরদাঁড়া শিরশির করতে থাকে। হাসির কথা মনে হচ্ছে কিন্তু তা নয়; ডিউক অফ ওয়েলিংটনের বেড়াল দেখলে ওইরকম হত।

যা হোক, টিকটিকিটাকে আমার টেবিলের ওপর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেখেই আমি তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম, তারপর দূর থেকে তাকে একটা তাড়া দিলুম। সে ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে কটমট করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সব দাঁতগুলো বার করে একবার হেসে নিলে।

তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করছিলুম যে টিকটিকিকে হাসতে দেখেছ কিনা। কুকুরের হাসি, বেড়ালের হাসি, শিম্পাঞ্জির হাসি সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পড়েছি কিন্তু টিকটিকি সম্বন্ধে এরকম একটা জনশ্রুতি পর্যন্ত কোথাও শুনেছি বলে স্মরণ হয় না।

এই টিকটিকিটার মুখে বোধহয় পঞ্চাশ হাজার দাঁত ছিল, তার হাসিটা নিরতিশয় অবজ্ঞার হাসি। সে হাসির অর্থ—দেখেই তো চেয়ার ছেড়ে পালালে, দূর থেকে বীরত্ব ফলাতে লজ্জা করে না।

বড়ো রাগ হল। একটা টিকটিকি—হোক না সে ছয় ইঞ্চি লম্বা, আমারই টেবিলের ওপর উঠে আমাকেই কিনা তুচ্ছ—তাচ্ছিল্য করে? ভারী দেখে একটা অভিধান, বোধহয় সেটা ওয়েবস্টারের, হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে তাই দিয়ে টেবিলের কোণায় দমাস করে এক ঘা বাসিয়ে দিলুম। টিকটিকিটা বিদ্যুতের মতো ফিরে গোল গোল চোখ পাকিয়ে আমার পানে চেয়ে রইল প্রায় দু—মিনিট। তারপর আবার সেই পঞ্চাশ হাজার দাঁত বার করে হাসি।

আমার গিন্নি পর্দা ফাঁক করে পাশের ঘর থেকে আমাদের এই শব্দভেদী যুদ্ধ দেখেছিলেন, চুড়ির শব্দে চেয়ে দেখি তিনিও নিঃশব্দ হাসছেন। টিকটিকি সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা তিনি আগে থেকেই জানতেন।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। অভিধানখানা হাতেই ছিল, দু—হাতে সেটা তুলে ধরে দিলুম টিকটিকি লক্ষ্য করে টেবিলের ওপর ফেলে।

হুলস্থুল কাণ্ড। ল্যাম্পটা উলটে গিয়ে ডোম—চিমনি ঝন ঝন শব্দে ভেঙে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। মা রান্নাঘর থেকে শব্দ শুনে রান্না ফেলে ছুটে এলেন; আমার ছোটো ভাই পাঁচুর হিন্দুস্থানি মাস্টার বাইরের ঘরে বসে পড়াচ্ছিল, 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' করে চেঁচাতে লাগল।

আমি চিৎকার করে ডাকলুম, রঘুদা জলদি একঠো লণ্ঠন লে আও।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেবলি ভয় হচ্ছিল পাছে টিকটিকিটা টেবিল থেকে নেমে এসে আমার পায়ে উঠতে আরম্ভ করে।

রঘুয়া উর্ধ্বশ্বাসে লণ্ঠন নিয়ে হাজির হল। তখন দেখা গেল, ভাঙা কাচের মাঝখানে, বিরাট অভিধানের তলা থেকে টিকটিকিটা মুণ্ডটা কেবল বেরিয়ে আছে, ধড়টা পিষে ছাতু হয়ে গেছে। মুণ্ডটা একেবারে অক্ষত,

যেন অভিধানের তলা থেকে গলা বাড়িয়ে আমাকে দেখছে আর অসংখ্য দাঁত বার করে একটা অত্যন্ত পৈশাচিক হাসি হাসছে।

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দু—চার বার শিউরে উঠল। বীভৎস মৃত দেহটাকে ফেলে দেবার হুকুম দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম। সে রাত্রে আর ভাত খাবার রুচি হল না।

সমস্ত রাত্রি ঘুমের মধ্যে কতকগুলোর দুঃস্বপ্ন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, সেগুলোকে চেতনা দিয়ে ধরাও যায় না অথচ কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। সকালে যখন বিছানা ছেড়ে উঠলুম তখন শরীর মনে প্রফুল্লতার একান্ত অভাব।

বিরস মনে বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ চোখ পড়ল টেবিলের ওপর। দেখি, দুটি ছোটো ছোটো ডিম পাশাপাশি রাখা রয়েছে। দেখতে ঠিক খড়ি—মাখানো করমচার মতো। ইতিপূর্বে টিকটিকির ডিম কখনো দেখিনি কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না যে এ দুটি সে বস্তু। হাঁকাহাঁকি করে চাকরদের জেরা করলুম কে এখানে ডিম রেখেছে? কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলে না, এমনকী প্রহারের ভয় দেখিয়েও তাদের কাছ থেকে কোনো কথা বার করা গেল না। তখন পেঁচোর ওপর ঘোর সন্দেহ হল। পেঁচোকে নিয়ে পড়লুম, সে শেষপর্যন্ত কেঁদে ফেললে, কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলে না। শাস্তি—স্বরূপ তাকে ডিম দুটো বাইরে ফেলে দেবার হুকুম দিলুম।

এ—যে আমাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে কোনো লোকের বজ্জাতি এই কথাই গোড়া থেকে আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চাবি—দেয়া দেরাজ খুলেও যখন দেখলুম তার মধ্যে সাদা সাদা ক্ষুদ্রাকৃতি দুটি ডিম বিরাজ করছে তখন কেমন ধোঁকা লাগল। তাইতো। এখানে ডিম কে রাখে?

তারপর দেখতে দেখতে বাড়িময় যেন টিকটিকির ডিমের হরির লুঠ পড়ে গেল। যেদিকে তাকাই, যেখানে হাত দিই, সেইখানেই দুটি করে ডিম। হঠাৎ যেন জগতের যত স্ত্রী—টিকটিকি সবাই সংকল্প করে আমার চারিপাশে ডিম পাড়তে শুরু করে দিয়েছে।

এমনি ব্যাপার দু—দিন ধরে চলল। মন এমন সন্ত্রস্ত এবং বিভ্রান্ত হয়ে উঠল যে, সহসা কোনো একটা জায়গায় হাত দিতে পর্যন্ত ভয় করতে লাগল, পাশে সেখান থেকে টিকটিকির ডিম বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু সাধারণ পাঁচজনের কাছে এ ব্যাপার এতই অকিঞ্চিৎকর যে মনের কথা কাউকে খোলসা করে বলাও যায় না। টিকটিকির ডিম দেখেছে তার আর হয়েছে কি? এ প্রশ্ন করলে তার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। আমিও নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বিশেষ ফল হল না। বরঞ্চ সর্বদা মনের মধ্যে এই কথাটাই আনাগোনা করতে লাগল যে, এ ঠিক নয়, স্বাভাবিক নয়, কোথাও এর একটা গলদ আছে।

কিন্তু একটা টিকটিকিকে অপঘাত মেরে ফেলার ফলেই এই সমস্ত ব্যাপার ঘটছে সহজ বুদ্ধিতে একথাও মেনে নেওয়া যায় না। তবে কি এ? অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলুম, সম্ভবত যে টিকটিকিকে সেদিন অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বধ করেছিলুম তারই গর্ভবতী বিধবা বিরহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেবলি ডিম পেড়ে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়া আর যে কি হতে পারে তা ভেবে পেলুম না।

বাড়িতে যখন মন অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা ভাবলুম—যাই ক্লাবে। ছুটির সময়, তোমরা কেই এখানে ছিলে না, ক্লাব একরকম বন্ধ, তবু চাকরটাকে দিয়ে ঘর খুলিয়ে আলো জ্বালিয়ে এই ঘরেই এসে বসলুম। টেবিলের ওপর পাতলা একপুরু ধুলো পড়েছে, অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই—এর কাঠিটা অ্যাশট্রেতে ফেলতে গিয়ে দেখি, ছাই পোড়া সিগারেটের কুচির মধ্যে দুটি ডিম।

তৎক্ষণাৎ উঠে বাড়ি চলে এলুম।

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, হাঁ রে, ক—দিন থেকে তোর মুখখানা কেমন শুকনো শুকনো দেখছি—শরীর কি ভালো নেই?

আমি বললুম, হ্যাঁ—ওই একরকম, বলে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলুম।

ব্যাপার যে ক্রমে ঘনীভূত হয়ে আসছে তাতে আর সন্দেহ নেই। টিকটিকি—বধূর অতি—প্রসবিতা বলে উড়িয়ে দেওয়া আর অসম্ভব। এ আর কিছু নয়—ভূত, ডিমভূত! সেই প্রতিহিংসাতপরায়ণ টিকটিকিটা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে; এবং ওই ডিম ছাড়া আর কিছুতেই যে আমি ভয় পাবার লোক নয়, তা সে তার ভৌতিক বুদ্ধি দিয়ে ঠিক বুঝেছে।

ইতর প্রাণীর ওপর কেন যে আমাদের শাস্ত্রে দয়া—দাক্ষিণ্য দেখাতে আদেশ করে গেছেন এবং কেন যে বুদ্ধদেব সামান্য ছাগলের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন, আমার দৃষ্টান্ত দেখেও সে জ্ঞান যদি তোমাদের না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের অদৃষ্টে কুম্ভীপাক নরক অনিবার্য। আসল কথা, আমার মনে ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হয়েছিল; অনুতপ্ত হয়ে সে দংষ্ট্রাবহুল গতাসু টিকটিকিকে উদ্দেশ্য করে কেবলি বলছিলুম, হে প্রেত! হে নিরালম্ব বায়ুভূত! যথেষ্ট হয়েছে, এইবার তোমার ডিম্ব সম্বরণ কর।

কিন্তু সম্বরণ করে কে? রাত্রে খেতে বসে ভাত ভেঙেই দেখলুম ভাতের মধ্যে দুটি সুসিদ্ধ ডিম্ব। কম্পিত কলেবরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। মা বললেন, কী হল, উঠলি যে?

শরীরের প্রবল কম্পন দমন করে বললুম, খিদে নেই—

বিছানায় শুয়ে শুনতে পেলুম মা বধূকে তিরস্কার করছেন, বোকা মেয়ে, করমচা কখনো ভাতে দিতে আছে, ওর যা ঘেন্নাটে স্বভাব, দেখেই হয়তো না খেয়ে উঠে গেল।

রাত্রে এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখলুম। অপূর্ব এই হিসেবে যে, তার পূর্বে কখনো অমন স্বপ্ন দেখিনি এবং পরেও আর দেখবার ইচ্ছে নেই।

স্বপ্ন দেখলুম যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছি। শোবামাত্র বুঝতে পারলুম যে, বিছানায় চাদর পাতা নেই—তার বদলে আগাগোড়া টিকটিকির ডিম দিয়ে ঢাকা। আমার শরীরের চাপে ডিমগুলো ভেঙে যেতে লাগল আর তার ভেতর থেকে কালো কালো কঙ্কালসার সরীসৃপের মতো লক্ষ লক্ষ টিকটিকির ছানা বেরিয়ে আমার সর্বাঙ্গে চলে বেড়াতে লাগল। প্রাণপণে উঠে পালাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু স্বপ্নে পালানো যায় না। যেইখানে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলুম আর সেই ধেড়ে টিকটিকিটা—যাকে আমি মেরে ফেলেছিলুম—আমার ঘাড় বেয়ে নাকের ওপর উঠে বসে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইল।

গিন্নির ঠেলায় ঘুম ভেঙে দেখলুম, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে এবং তখনও যেন টিকটিকির বীভৎস ছানাগুলো গা—ময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

ভাই, অনেক রকম দুঃস্বপ্ন আজ পর্যন্ত দেখেছি এবং আরও অনেক রকম দেখব সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা, এমনটি যেন আর দেখতে না হয়।

ভয়ের যে বস্তুটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, যার ভয়ানকত্ব যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায় না এবং যার হাত উদ্ধার পাবার কোনো জানিত উপায় নেই, সেই বস্তুই বোধ করি জগতে সব চেয়ে ভয়ংকর। ভূতের ভয় ওই জাতীয়। তাই প্রাণের মধ্যে আমার বিভীষিকা যতই বেড়ে চলল তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পন্থাটাও আমার কাছে তেমনি অজ্ঞাত রয়ে গেল। কী করব, কোথায় যাব—যেন কোনো দিকেই কিছু কিনারা পেলুম না।

এইরকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন ডাকে একখানা চিঠি এল। শুভেন্দু গয়া থেকে লিখেছে, চিঠি এমন কিছু নয়, 'তুমি কেমন আছ, আমি ভালো আছি' গোছের, কিন্তু হঠাৎ যেন আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। মনে হল এ চিঠি নয়—দৈববাণী।

তৎক্ষণাৎ শুভেন্দুকে 'তার' করে দিলুম। আজই যাচ্ছি।

তারপর যথাকালে গয়ায় পৌঁছে টিকটিকির প্রেতাত্মার সদগতি সংকল্প করে পিণ্ডি দিলুম। গয়াতে আজ পর্যন্ত টিকটিকির পিণ্ডদান কেউ করেছে কি না জানি না, কিন্তু সেই থেকে আমার ওপর আর কোনো উপদ্রব হয়নি।

সেই মায়ামুক্ত জীবাত্মা বোধ করি এখন দিব্যলোকে বৈকুণ্ঠের দেয়ালে উঠে পোকা ধরে ধরে খাচ্ছেন।

মারাত্মক ঘড়ি

প্রমথনাথ বিশী

পিন্টুদের বাড়িতে মস্ত একটা গোল দেওয়াল ঘড়ি ছিল। বাইরের ঘরে দেওয়ালের অনেকটা জুড়ে ঘড়িটা কায়েমি অধিকার করে বিরাজ করে। ঘড়িটা যে কতদিনের পুরোনো সে ইতিহাস গবেষণার বিষয়। এ বাড়িতে তার প্রথম আবির্ভাব এখন কিংবদন্তি, সে কিংবদন্তিও আবার নানা রকম। পিন্টু বন্ধুদের কাছে বলে বাবার ঠাকুরদা সাহেববাড়ির নিলামে ঘড়িটা কিনেছিলেন। পিন্টুর কাকারা বার লাইব্রেরিতে গল্প করেন যে বাবার প্রপিতামহ একটা ডুবোজাহাজের মাল নিলাম হতে দেখে নামমাত্র মূল্যে ঘড়িটা কিনে এনেছিলেন। এ থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে ঘড়িটার খ্যাতি অনেক দূর ছড়িয়েছে। পিন্টুর বন্ধুমহল জানে, পিন্টুর দুই কাকাই ব্যারিস্টার, কাজেই বার লাইব্রেরির সভ্যগণও জানেন আর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব তো অবশ্যই জানে। যাই হোক ঘড়িটার বয়স যে অন্তত দেড়শো বছর এ বিষয়ে সকলে একমত। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে ঘড়ির মধ্যে যে কোম্পানির নাম লিখিত ছিল তা অনেকদিন মুছে গেলেও ঘড়িটা কখনো অচল হয়নি। সপ্তাহে একবার করে দম দিতে হত, যেমন সব দেওয়াল ঘড়িতে দিতে হয়। ওই দমটুকুর ওপর নির্ভর করে বশংবদ ঘড়িটা আজ তিন—চার পুরুষ সময় জ্ঞাপন করে আসছে পিন্টুদের বাড়িতে।

চন্দ্র সূর্য যেমন আকাশের নিত্য বস্তু, ঘড়িটাও তাই। চন্দ্র সূর্য বলা বোধ করি ঠিক হল না, কারণ তারা আকাশে নড়েচড়ে বেড়ায়; গ্রহ উপগ্রহ বলাও ঠিক হবে না, ঘড়িটার অচল অটল অবস্থা দেখে নক্ষত্র বলাই উচিত। তবে ঘড়ি না নড়লেও তার কাঁটা দুটোর কখনো নড়তে ভুল হয় না। দামি দামি হালফ্যাশনের হাতঘড়িগুলোতেও কখনো কখনো দু—এক মিনিটের তারতম্য ঘটলেও ওই পুরোনো বুড়ো ঘড়িটা সময় নির্দেশে কখনো ভুল করে না। আরও মজা হচ্ছে এই যে ঘড়িটা কখনো মেরামত হয়েছে এমন কেউ জানে না। পিন্টুর কাকার বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতেন ঘড়িটা বামুনের গোরু, খায় কম—দুধ দেয় বেশি। তবে এহেন ঘড়িটা পিন্টুদের বাড়ির একটি দর্শনীয় ঐশ্বর্য। পিন্টুর কাকাদের বন্ধুরা ওটা কোন কোম্পানির তৈরি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, জানতে পারলে সেই কোম্পানি থেকে ঘড়ি কিনি। কিন্তু জানবার উপায় কী? ভিতরে এক সময়ে নিশ্চয় কোম্পানির নাম লেখা ছিল, বর্তমানে তা সম্পূর্ণ লুপ্ত। আতস কাচ দিয়ে এমন কী মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করেও তাঁরা সফল হননি। তাঁরা বলাবলি করতেন, ও ঘড়িটা স্বয়ম্ভু। হয় আকাশ থেকে পড়েছে নয় সমুদ্র থেকে উঠেছে।

এখন এই ঘড়িটা সম্বন্ধে আর একটা কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল, যা নাকি ভারি রহস্যময়। আর যা কিছু রহস্যময়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন তাকে সংক্ষেপে 'গাঁজা' বলে উড়িয়ে দিতে অভ্যস্ত। কিংবদন্তিটা রহস্যময় আর বড়ো মারাত্মক। বাড়িতে কারও মৃত্যু হবার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে ঘড়িটা নাকি আপনিই থেমে যায়। অবশ্য পিন্টুর বাবা, কাকা প্রভৃতি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেননি, তবে শোনা যায় যে পিন্টুর ঠাকুরমার মৃত্যুর আগে ওইভাবে ঘড়িটা থেমে গিয়েছিল। কিন্তু তার দুই ব্যারিস্টার কাকা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেন, বলেন যে মা—র মৃত্যু ঘটেছিল বিরানব্বই বছর বয়সে, তাঁর অসুখের চিকিৎসা ও সেবা নিয়ে সকলে ব্যস্ত ছিল, কাজেই সময়মতো ঘড়িটাতে দম না দেওয়াতে থেমে গিয়েছিল। এর মধ্যে আর রহস্যের কি থাকতে পারে? কিন্তু হঠাৎ একদিন এমন একটা দলিল আবিষ্কৃত হল যাকে অত সহজে ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পিন্টুর বাবা একদিন পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটছিলেন। এমন সময়ে একখানা জীর্ণ কাগজ তাঁর চোখে পড়ল। বাজে কাগজ বলে সেটা যখন ফেলে দিতে যাবেন, হঠাৎ নীচে স্বাক্ষর দেখলেন রামজয় শর্মা। রামজয় শর্মা তাঁর পিতামহ, কাজেই পিন্টুর প্রপিতামহ। কৌতূহলী হয়ে কাগজখানা তুলে নিয়ে পড়লেন যে তাতে লেখা আছে 'দেওয়াল ঘড়িটা দেখছি বড়োই অদ্ভুত। কোনোদিন থামে না, পরশু সকালে উঠে দেখি তার কাঁটা দুটো অচল হয়ে রয়েছে। ভাবলাম সময়মতো দম দেওয়া হয়নি, তাই এই অবস্থা। তখন তাড়াতাড়ি দম দিলাম, ঘড়ি চলতে আরম্ভ করল। তারপরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বাবা হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন। তখনও মনে কোনো সন্দেহ হয়নি। কিন্তু আবার পাঁচ ছয় বছর পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঘড়িটা সন্ধ্যাবেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাবার মৃত্যুর আগে যে বন্ধ হয়েছিল সে কথা তখন মনে হয়নি। কিন্তু তারপরে যখন চব্বিশ ঘণ্টা না যেতেই দাদা তেতলার ছাদ থেকে পা ফসকে পড়ে মারা গেলেন তখন চমকে উঠলাম। একই বাড়িতে কয়েক বছরের মধ্যে দু—জনের মৃত্যু হল আর ঠিক তার চব্বিশ ঘণ্টা আগে দু—দু—বার ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেল এ কী কাকতালীয় না আর কিছু? ভাবছি ঘড়িটা বেচে দেব।' নীচে নাম স্বাক্ষর রামজয় শর্মা। শোনা যায় যে ঘড়িটা বেচবার তিনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত পুরোনো বলে কেউ কেনেনি। অগত্যা যেখানকার ঘড়ি সেখানেই রয়ে গেল।

পিন্টুর বাবা এই কাগজপত্র নিয়ে তাঁর ভাইদের দেখালেন। তাঁরা ব্যারিস্টার, দলিল দস্তাবেজ পড়া আর তার ভুল বের করা তাঁদের ব্যবসা। কাজেই ওই কাগজখণ্ডের লেখাগুলোকে আইনের ফাঁকে উড়িয়ে দিলেন। সর্বোপরি বললেন যে ঠাকুরদা মশাইয়ের আফিং খাওয়া অভ্যেস ছিল, তাছাড়া ঠিক সেই সময়ে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তর বেরোচ্ছে। তিনি এক নূতন কমলাকান্ত লিখে গিয়েছেন। স্রেফ গাঁজা। কিন্তু পিন্টুর বাবা আইনজীবী নন। পেশাতে ইস্কুল মাস্টার। তাঁর মন থেকে খটকা দূর হল না। দুই ভাই তাঁকে বোঝালেন—দাদা তোমার মন কুসংস্কারে পূর্ণ, তাই ওইরকম ভাবছ। আচ্ছা এবার আমরা লক্ষ্য রাখলাম, দেখি ঘড়ি ব্যাটা কেমন করে থামে। আর যদি না থামে, তখনই তাকে মেরামত করতে দিয়ে আসব। ব্যাপারটা ওইখানেই মিটে গেল।

হঠাৎ বছরখানেক পরে একদিন দুপুরবেলা দেখা গেল ঘরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ। তখন পিন্টুর বড়োকাকা বসে সংবাদপত্র পড়ছিলেন, তিনি চমকে তাকিয়ে দেখলেন ঘড়িটা থেমে গিয়েছে। অজ্ঞাতসারে তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভাবলেন—এ ব্যাটা থামল কেন? সবে কালকে আমি নিজের হাতে দম দিয়েছি। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে দাদার কুসংস্কারের প্রতিকারার্থে দম দেবার ভার দুই ব্যারিস্টার ভাই স্বহস্তে গ্রহণ করেছিল। তিনি তখনই ঘড়িটা খুলে নিয়ে মোটরে করে ঘড়ি মেরামতি দোকানে গিয়ে দিয়ে এলেন। দাদা সমস্ত শুনে বললেন, ঘড়ি না হয় সরালে, বাড়ির প্রাণীগুলো তো বাড়িতেই থাকল। ছোটো ভাই বলল, দাদা তোমার ওই ইস্কুল মাস্টারি মনোভাব ছাড়ো তো। পরদিন খুব ভোরবেলা গিয়ে ঘড়িটা নিয়ে এলেন। দোকানির সঙ্গে সেইরকম কথাই ছিল। দোকানি মেরামতি বলে কিছু নিল না, বলল বাবু আপনার ঘড়ি ঠিকই ছিল, একটু হাত দিতেই চলতে শুরু করল। ওর জন্য আর কী নেব? তিনি ঘড়ি নিয়ে সগৌরবে বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন যে একটা শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বাড়ির দু—পুরুষের পোষা বুড়ো কাকাতুয়াটি মারা গিয়েছে। পিন্টুর বাবা বলে উঠলেন, দেখলে তো রসিক, ঘড়ির সতর্কবাণী ঠিক হল কিনা। রসিক অর্থাৎ পিন্টুর বড়োকাকা বললেন, কাকাতুয়াটা কি বাড়ির অধিবাসীদের একজন? আর তাছাড়া ওর যা বয়স হয়েছিল আমাদের প্রতি দয়ামায়া থাকলে ওর আগেই মরা উচিত ছিল। বসে বসে কেবল ছোলা ছাতু ধ্বংস করা। পিন্টুর বাবা বললেন, বল কি রসিক? ও অবশ্যই বাড়ির অধিবাসীদের একজন। আজ দু—পুরুষ এ বাড়িতে আছে, অধিবাসী ছাড়া আর কি? ও বাড়ির মস্ত পাহারা ছিল। অন্য বাড়ির কুকুর, বেড়াল, দুরন্ত ছেলেগুলো এসে উপদ্রব করতে সাহস করত না। যাক, কী আর হবে, বলে তিনি কাকাতুয়াটির সৎকারের ব্যবস্থা করলেন। ঘড়িটা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়ে আবার টিকটিক করতে লাগল।

ঘড়িটা টিকটিক করতে করতে চলেছে, আর দিন মাস বছরগুলো চলেছে সেই সঙ্গে নিঃশব্দে। এমন বছর কয়েক গেল। পিন্টুর বয়স তখন বছর পনেরো হবে। ঘড়ি সম্বন্ধে সমস্ত কিংবদন্তি সে তখন জানে। মাঠে খেলতে গেলে বন্ধুরা শুধায়, কিরে তোদের ঘড়ি চলছে, না আর কেউ টাসবে তোদের বাড়িতে? সে বলে, ব্যাটার আর থামবার উপায় নেই। বড়োকাকা এমনি দম দিয়েছেন যে চলতেই হবে। বন্ধুরা চাপা গলায় বলে, কিসের দম? গাঁজার না আলুর? শুনতে পেলে পিন্টু বেজায় রাগ করত, হয়তো সেদিন না খেলেই ফিরে আসত।

সেদিনটার কথা তার বেশ মনে পড়ে। পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে, মাথায় নানারকম প্ল্যান, সর্বপ্রথম সিনেমায় যাবে। পরীক্ষার অজুহাতে অনেকদিন সিনেমা দেখা বন্ধ। সকালবেলাতেই টিকিট কিনে এনেছিল। সাড়ে ছ—টায় শো আরম্ভ। দাদা বলে দিয়েছে ঠিক ছ—টায় সময় বেরুবে, এক মিনিট আগে নয়। সে ভিতরে গিয়ে কোনোরকমে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। দাদার হাতঘড়িটা টেবিলের ওপরে ছিল, চেয়ে দেখল তাতে ছ—টা বেজেছে। কোনোরকমে জুতো পায়ে দিয়ে রওয়ানা হবার উদ্দেশ্যে বাইরের ঘরে আসতেই নজর পড়ল দেওয়াল ঘড়িটার দিকে। এ কী! এ যে ছ—টার কাছে এসে কাঁটা থেমে গিয়েছে! কান পেতে শুনল সত্যি থেমে গিয়েছে। না হচ্ছে শব্দ, না নড়ছে কাঁটা। কেমন অজানা ভয়ে তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। সে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল ঘড়িটার দিকে। এমন সময়ে তার কাকারা কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে এসে ঘরে ঢুকলেন। পিন্টুকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে, শুধালেন— কী রে, তোর না সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল? এখনও বসে আছিস। দাদা বাড়িতে না থাকলেই তোকে আর পেরে উঠবার উপায় থাকে না। আসুন দাদা কাশী থেকে ফিরে। তখন একটা রীতিমতো ব্যবস্থা করতে হবে। নে ওঠ এখন, যাবি তো যা।

পিন্টু কিছু না বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ঘড়িটা।

ঘড়িটা কাঁটা ছ—টার কাছে অচল দেখে দু—জনে সমস্বরে বলে উঠলেন, তাই তো, ঘড়িটা থেমে গেছে দেখছি। এই বলে তাঁরাও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ঘড়িটার দিকে।

ভোর রাতে টেলিগ্রাম এল পিন্টুর মা সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ মারা গিয়েছেন কাশীধামে।

বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা না মিললেও সংস্কার তার দাবি ছাড়ে না, কাজেই বাড়িতে একটা ভয়ের আবহাওয়া কায়েম হয়ে বসল। সবাই যেন ফিসফিস করে কথা বলে, পায়ের শব্দও কম। কিংবা এমনও হতে পারে সবাই আগের মতো কথাবার্তা বলছে এবং চলাফেরা করছে, কেবল মনে হচ্ছে আগের মতো নয়। পিন্টুর বড়ো কাকা রসিক দাদা কাশী থেকে ফিরে এলে তাকে বলল, দাদা এই অলক্ষুণে ঘড়িটা বিদেয় করে দিই। তিনি সংক্ষেপে বললেন, মন্দ নয়।

রসিক পরদিন গিয়ে ঘড়িটা এক পুরোনো ঘড়ির দোকানে দিয়ে এল। বলল, যা হয় কিছু দাম দিয়ে এটা নিয়ে নিন।

দোকানি বলল, এসব পুরোনো ঘড়ি আজকাল কেউ কিনতে চায় না, তবে রেখে দিচ্ছি যদি কেউ নেয় আমাদের কমিশন কেটে নিয়ে দাম আপনাকে দিয়ে আসব।

ঘড়িটা বাড়ি থেকে বিদেয় হতে সকলেরই মন বেশ হালকা হল। ক্রমে আবার সহজ ভাব ফিরে এল বাড়িতে। রসিকের ছোটো ভাই হরিশ আমুদে লোক। সে তো রীতিমতো একটা ঘড়ি বিদায় উৎসবের আয়োজন করল, খাওয়াদাওয়া গান—বাজনার কিছুরই অভাব হল না। মনের ওপর থেকে ওই ঘড়ির ভারটা নেমে গিয়ে সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মাঝে মাঝে রসিক গিয়ে খোঁজ করে আসত ঘড়িটা কেউ নিল কিনা। দোকানি প্রত্যেকবার ওই একই কথা বলত, পুরোনো ঘড়ি কেউ নিতে চায় না। তবে বিক্রি হওয়া মাত্র কমিশন বাদে দাম পাবেন। রসিক একবার প্রস্তাব করেছিল তুমিই না হয় কিছু দাম ধরে দিয়ে ঘড়িটা নিয়ে নাও। সে বলল, বাবু, আমরা তো কিনি না, বিক্রি করি। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বাড়ি যান।

ঘড়িটা যে এখনও সশরীরে বহাল আছে সেটা ভালো লাগত না পিন্টুদের বাড়ির কারোরই। পিন্টু একদিন সাহস করে বলল, কাকা ওটাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও না, আর তা যদি না পারো আমাকে দাও হাতুড়ি মেরে গুঁড়ো করে দিই, বালাই যাক। বলা বাহুল্য তার কোনো প্রস্তাব কেউ কানে তুলল না।

বছর দুই পরে একদিন সেই ঘড়ির দোকানি রিকশা করে এসে উপস্থিত, কোলের ওপর ঘড়িটা। ঘড়িটা দেখে পিন্টুর বাবা কাকা প্রভৃতি বাড়ির সকলে চমকে উঠল।

রসিক শুধাল, কী হল হে!

দোকানি বলল, ঘড়িটা ফিরিয়ে দিতে এলাম। আজ তিন বছর হয়ে গেল কেউ নিল না, খামাকা জায়গা জুড়ে আছে। তাছাড়া ঘড়িটা বড়োই বেয়াড়া। আজ আনব বলে খুলতে গিয়ে দেখি দশটা বেজে বন্ধ হয়ে আছে। ভাবলাম চালিয়ে নিয়ে যাই। পুরো দম দিলাম, কিন্তু যেখানকার কাঁটা সেখানেই রয়ে গেল। এ ঘড়ি কোন খদ্দেরে নেবে বাবু? আপনাদের জিনিস আপনারাই রাখুন—এই বলে সে ঘড়িটা ফরাশের ওপরে নামিয়ে দিল।

তখন ঘরের মধ্যে পিন্টুর বাবা আর দুই কাকা ছিল। তারা সব ব্যাপার দেখে পাথর হয়ে গিয়েছিল। দোকানিকে রিকশা ভাড়া দেওয়া বা সময়োচিত দুটো কথা বলা হয়ে উঠল না। দোকানিও ভাড়ার প্রত্যাশা না করে ফিরে রওনা হল। এমন সময়ে হঠাৎ রসিকের সংবিৎ হল। সে শুধাল, ওহে ঘড়িটা যে দশটায় বন্ধ হয়েছে, সেটা দিন দশটা কি রাত দশটা বলতে পার?

লোকটা বলল, সে তো খেয়াল করিনি বাবু। দেওয়ালে কত ঘড়ি ঝুলছে, কোনটার দিকে তাকাব। তবে এটাকে ফিরিয়ে দেব বলে দম দিতে গিয়ে দেখি দশটায় বন্ধ হয়ে আছে। রাত কি দিন কেমন করে জানব। এই বলে সে উত্তরের প্রত্যাশা না করে চলে গেল। তিনজনই সমস্বরে বলে উঠল, রাত দশটা না দিন দশটা।

মুখে না বললেও তিনজনের ভাবনাই এক সূত্রে চলছিল। রাত দশটা হলে আর ঘণ্টা দশেক সময় আছে, দিন দশটা হলে কিছু বেশি। সেদিন রবিবার ছিল, আপিস আদালত না থাকায় তিনজনে বসে গল্প করছিল, বেলা তখন বারোটা। তিনজনেরই মনে ওই একই চিন্তা। ঘড়ি থেমে গেলে চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র সময় পাওয়া যায়। ঘড়িটা রাতে থেমেছে না দিনে থেমেছে স্থির করতে না পারায় সময়ের মেয়াদও সেই পরিমাণে কমে এসেছে। তিনজনেই মনে মনে ভাবছিল এবারে না জানি কার পালা। ঘড়ির মস্ত কাচে ঢাকা গোলকখানা অন্তর্যামীর তৃতীয় নেত্রের মতো রহস্যময় দৃষ্টিতে তাদের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল। নিস্তব্ধ ঘরে তিনজনের নিশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল।

কতক্ষণের মেয়াদ? কার পালা?

পালানো যায় না

বনফুল

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সমস্ত প্রকৃতি যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রলয়ের প্রতীক্ষা করছে। শাখাপ্রশাখাময় একটা বিদ্যুৎ আকাশকে দীর্ণ—বিদীর্ণ করে দেবার পরই প্রচণ্ড শব্দ করে বজ্রপাত হল। তারপর আবার সব চুপচাপ। তারপরই সোঁ সোঁ শব্দ করে ঝড় এল। কামান—গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হল যেন। সোনাটুপি গ্রামের প্রান্তে যে অরণ্যটা আছে তার গাছগুলো হাহাকার করতে লাগল। অরণ্যের পাশেই প্রকাণ্ড প্রান্তর। দুটো শেয়াল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। কাক—বক উড়তে লাগল বিভ্রান্ত হয়ে। তারপর বৃষ্টি নামল। মেশ মুষলধারে। ঝড়—বৃষ্টি দুটোই সমানে চলতে লাগল। অন্ধকারও ঘনিয়ে এল ক্রমশ। গাছের ডালপালা ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মাঠে। মনে হল মৃত সৈনিকের দল আছড়ে আছড়ে পড়ছে যেন। ঝড়—বৃষ্টি আর অরণ্য মিলে শব্দেরও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল একটা। কখনো মনে হচ্ছিল কেউ যেন অট্টহাস্য করছে, পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল কাঁদছে। আর্তনাদের সঙ্গে খিকখিক হাসি, হাসির সঙ্গে হাততালি, হাততালির সঙ্গে ডম্বরু নিনাদ যে পরিবেশ সৃষ্টি করল তা আতঙ্কজনক। এতক্ষণ কোনো মানুষ দেখা যায়নি। কিন্তু এইবার দেখা গেল। বনোয়ারি বেরুল জঙ্গল থেকে। ছুটে বেরুল। যেন পালাচ্ছে। অদ্ভুত তার চেহারা। মুখময় গোঁফ—দাড়ি। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। কাঁধে প্রকাণ্ড বোঁচকা। হাতে ব্যাগ। ফুল প্যান্টের উপর লম্বা ঝোলা কোট পরেছে একটা, পায়ে বুট জুতো। মাঠের মধ্যে পড়ে সে ছুটতে লাগল আর মাঝে মাঝে পিছু ফিরে চাইতে লাগল। তার পিছনে কেউ ছুটছিল না, কিন্তু বনোয়ারির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, তার যেন আশঙ্কা হচ্ছে কেউ তাড়া করে আসছে তাকে পিছুপিছু। মাঠের অপরপ্রান্তে ঘর ছিল একটা। পোড়ো—বাড়ি। বনোয়ারি সেইদিকে দৌড়তে লাগল।

... পোড়ো—বাড়িটা নীলকুঠি ছিল এককালে। এখন ওটা স্থানীয় জমিদারের সম্পত্তি। জমিদার কলিকাতায় থাকেন, সুতরাং বাড়িটা পোড়ো—বাড়িই হয়ে গেছে। কিন্তু সেকালের বাড়ি রেকতার গাঁথুনি, একেবারে পড়ে যায়নি। দেয়ালগুলো খাড়া আছে। কপাট—জানালাগুলোও আছে। পশ্চিমদিকের ঘরের কপাট—জানালা চোরে খুলে নিয়ে গেছে, কিন্তু উত্তরদিকের ঘরটা, দক্ষিণদিকের ঘরটা আর পূর্বদিকের ঘরটা ঠিক আছে। পূর্বদিকের ঘরটাই বড়ো। 'হলে'র মতো। তার সামনে একটা চওড়া বারান্দা। বারান্দার উত্তরে আর দক্ষিণে ঘর।

বনোয়ারি ছুটতে ছুটতে এসে পূর্বদিকের ঘরের সামনের চওড়া বারান্দাতে উঠে হাঁপাতে লাগল। আর একবার পিছু ফিরে চেয়ে দেখল, তারপর ঢুকে পড়ল পূর্বদিকের বড়ো ঘরটাতে। ঢুকেই ঘরের কপাট বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে ঝড়—বৃষ্টির তুমুল গর্জন হচ্ছিল, কিন্তু বনোয়ারি তা শুনছিল না, সে শোনবার চেষ্টা করছিল, কারও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। গত সাত দিন ধরে সে ওই পায়ের শব্দটাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। সোনাটুপির জঙ্গলে ঢোকবার পর সে শব্দটা শুনতে পায়নি। কিন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়েই সে ছপ ছপ শব্দ শুনেছিল। নির্ঘাত শুনেছিল, তার ভুল হয়নি। কিন্তু একবার মাত্রই শুনেছিল, আর শোনেনি। সে আশা করবার চেষ্টা করছিল, তবে কি হাড়গিলা তাকে রেহাই দিলে?

খুট খুট করে শব্দ হল বারান্দায়। চমকে উঠে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল বনোয়ারি, তার শরীরের সমস্ত পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর শব্দ শোনা গেল না। কেবল ঝড়—জলের দাপাদাপি, আর

কোনো শব্দ নেই। অনেকক্ষণ কান পেতে রইল বনোয়ারি, ছরছর করে জল পড়ছে বারান্দায়, আর কোনো শব্দ নেই। ছাগলের ডাকের মতো ওটা কি শোনা যাচ্ছে? এই ঝড়ে—বৃষ্টিতে কারও ছাগল মাঠে বেরিয়ে পড়েছে নাকি! কিন্তু একটা ছাগল তো নয়। অনেক ছাগলের ডাক। তারপর বনোয়ারি বুঝতে পারল ব্যাং ডাকছে। আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর তার মনে হল সমস্ত রাত তো কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না।

ভিতরে ঢুকে সে পিঠের বোঁচকা আর ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে খুলে গেল কপাটটা আর ছপ ছপ ছপ ছপ শব্দও হল একটা বাইরে। বনোয়ারি দৌড়ে গিয়ে কপাটটা বন্ধ করে দিলে আবার। আবার কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হাড়গিলার চেহারাটা স্পষ্ট ফুটে উঠল তার মনে। ওর আসল নাম দনদন। ভালো নাম ছিল দনুজারি। কিন্তু তার চেহারার জন্যে সবাই ওকে হাড়গিলা বলে ডাকত। হাড়গিলার মতোই দেখতে। লম্বা লিকলিকে, কোমরের উপর থেকে মাথা পর্যন্ত এক সরলরেখায় নয়। দু—বার বেঁকেছে। কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত একটা বাঁক, হঠাৎ মনে হয় কুঁজো (এই বাঁকটার উপরই ছুরি মেরেছিল বনোয়ারি), আর দ্বিতীয় বাঁকটা ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত। কিন্তু এ বাঁকটা উলটো রকম। লম্বা ঘাড়টা ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে আর গলার দিকটা বেরিয়ে পড়েছে সামনের দিকে। মনে হয় কেউ যেন ওর ঘাড়ে লাথি মেরে সামনের দিকে বাঁকিয়ে দিয়েছে গলাটা। গলাটা অসম্ভব লম্বাও। সাঁকিটাও বেশ উঁচু। খাঁড়ার মতো নাকের সঙ্গে সেটা যেন পাল্লা দিয়ে বড়ো হয়েছে। গায়ের রং ফরসা, ঠিক ফরসা নয়, হলদে। কপাল উঁচু, চোখ দুটো কটা, মনে হয় যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভুরু নেই। চোখমুখে কেমন যেন একটা বকের ভাব। এরকম লোক যে কি করে ঝুমকোর মতো মেয়েকে পটাতে পেরেছিল, তা বনোয়ারি বুঝতে পারেনি। হাড়গিলা অবশ্য ঝুমকোর প্রেমে পড়েনি, সে ঝুমকোর সঙ্গে ভাব করেছিল তার গয়না আর গিনিগুলো হাতাবার জন্যে, কিন্তু ঝুমকো তো পড়েছিল। তা না পড়লে ভিতরের অত খবর কি হাড়গিলা জানতে পারত? সে কোন বাক্সে গিনিগুলো রাখত, আলমারির কোনখানটায় তার গয়নাগুলো আছে সব কি বলত হাড়গিলাকে? ভালো না বাসলে বলত না। হাড়গিলাই বনোয়ারিকে নিয়ে গিয়েছিল ঝুমকোর কাছে। একা তো অতবড়ো জোয়ান মেয়েকে খুন করা যায় না, একজন সহকারী চাই। আর হাড়গিলা ছোরাছুরি বা গোলাগুলির পক্ষপাতী ছিল না। সে বলত ও সব বড়ো গোলমেলে জিনিস, ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে। তার চেয়ে টুঁটি টিপে শেষ করে দেওয়াই নিরাপদ। বনোয়ারি জাপটে ধরেছিল ঝুমকোকে, আর হাড়গিলে টুঁটি টিপেছিল....বনোয়ারির চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। বারান্দায় কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মট করে একটা শব্দ হল....ঠিক এমনি শব্দ ঝুমকোর গলা থেকেও বেরিয়েছিল।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বনোয়ারি। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল তার পকেটে টর্চ আছে। তার ঝোলার মধ্যে লণ্ঠনও আছে একটা। টর্চটা ভিতরের পকেটে ছিল। খুব বেশি ভেজেনি। জ্বালা গেল। জ্বেলেই নিশ্চিত হল বনোয়ারি। কপাটে খিল, ছিটকিনি দুই আছে। তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিল দুটোই। তারপর ঝোলাটার ভিতর থেকে লণ্ঠনটা বার করল। আলাদা একটা বোতলে কেরোসিন তেলও ছিল। গত পনেরো দিন থেকে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কত অজানা জায়গায় রাত কাটাতে হয়েছে, আরও কত রাত কাটাতে হবে তার ঠিক নেই, তাই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি, বিশেষ লণ্ঠন আর কেরোসিন তেল, টর্চ, দেশলাই আর মোমবাতি সে সংগ্রহ করে রেখেছে। কপাট বন্ধ করে সে লণ্ঠন, তেলের শিশি বার করলে, টর্চের আলো জ্বেলে জ্বেলে। দেশলাইটা খুঁজে বার করতে একটু দেরি হল। নানাবিধ কাপড়—জামার জটিলতায় হারিয়ে গিয়েছিল। সব বার করে ফেললে সে বোঁচকাটা থেকে। অনেক রকম কাপড়—জামা ছিল। প্যান্ট, হাফ—প্যান্ট, ঝোলা—পাজামা, ধুতি, শার্ট, কোট, হাওয়াই—শার্ট হরেক রকমের, রঙিন চশমা দু—তিন জোড়া। বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজে গিয়েছিল। বনোয়ারি ক্রমাগত পোশাক বদলে বদলে বেড়াচ্ছিল। তার ধারণা হয়েছিল পুলিশ তো বটেই হাড়গিলার প্রেতাত্মাও পোশাক বদল করলে বোধ হয় তাকে চিনতে পারবে না। যদিও সে বারবার

নিজের সঙ্গে তর্ক করছিল যে ভূতটূত সব কুসংস্কার, মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না, কিন্তু তবু সে সাবধানতা অবলম্বন করতে ছাড়েনি। তার্কিক বনোয়ারির পিছনে বসে আর একজন কানে কানে বলছিল—সাবধানের বিনাশ নেই। তুমি একটা শব্দ যখন শুনেছ, তা যাই হোক, সাবধান হও। বনোয়ারি ক্রমাগত পালাচ্ছিল আর পোশাক বদলাচ্ছিল। কখনো সাহেবি পোশাক, কখনো পেশোয়ারি, কখনো পাঞ্জাবি, কখনো মিলিটারি। চোখে কখনো গগলস, কখনো সাদা চশমা, কখনো নীল...ভিজে কাপড়—জামার মধ্যে দেশলাইটা পাওয়া গেল অবশেষ। একদম ভিজে গেছে। টর্চের আলোতেই তাড়াতাড়ি লণ্ঠনে তেল ভরে ফেলল সে। টর্চের আলোটাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। টর্চটা নিবিয়ে রেখে দিল। একটু আলোর সম্বল রাখা ভালো। দেশলাইটা জ্বলবে কি? বড্ড ভিজে গেছে। তবু সে চেষ্টা করতে ছাড়ল না। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে একটা কাঠিও জ্বলল না। আবার শুরু করল সে। খচ খচ খচ খচ খচ খচ, অন্ধকারে শব্দটা অদ্ভুত শোনাতে লাগল, কেউ যেন হাঁচছে। হাঁচছে? না, হাসছে? পাগলের মতো কাঠির পর কাঠি ঘষতে লাগল বনোয়ারি। একটাও জ্বলল না। সব কাঠি ফুরিয়ে গেল। টর্চটা জ্বেলে ছড়ানো কাঠিগুলোর দিকে সভয়ে চেয়ে রইল সে। টর্চের আলোটাও বেশ লাল হয়ে গেছে। আর বেশিক্ষণ টিকবে না। আবার নিবিয়ে দিলে টর্চটা।

চতুর্দিক কাঁপিয়ে বজ্র পড়ল একটা। মনে হল এই বাড়িতেই পড়ল। থর থর করে কেঁপে উঠল বাড়িটা। বনোয়ারির মনে হল—সমস্ত রাত অন্ধকারে কি করে কাটাব এখানে? আলোটা যদি জ্বালাতে পারতুম! আলো থাকলে কারও পরোয়া করতাম না। হঠাৎ ডান দিকে খিক খিক খিক খিক করে শব্দ হল। তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল বনোয়ারি! ঠিক যেন ব্যঙ্গ করে কে হাসল। যে দিক থেকে হাসিটা এল টর্চটা জ্বেলে সেই দিকে দেখল চেয়ে। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, এইবার দেখতে পেল একটা খোলা জানালা রয়েছে, ওদিকের দেয়ালে। এগিয়ে গেল সে—দিকে। টর্চ ফেলে দেখল বাইরের বারান্দায় দু—তিনটে শেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরাই খ্যাক খ্যাক শব্দ করছে সম্ভবত। ফিরে এল আবার। টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর গোঁফ—দাড়িগুলো খুলে ফেললে। জলে ভিজে পরচুলাগুলো থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছিল একটা। তারপর ব্যাগের ভিতর হাত পুরে একটা পাঁউরুটি বার করে ছিঁড়েছিঁড়ে খেতে লাগল। খুব খিদে পেয়েছিল। ভাগ্যে পাঁউরুটিটা সঙ্গে এনেছিল! খেতে খেতে নিজের মনেই নিজের সঙ্গেই কথা শুরু করে দিল। নিজের কণ্ঠস্বরই যেন সঙ্গী হল তার সেই নির্জন অন্ধকার ঘরে। 'হাড়গিলে এ তুই কী করলি বল তো! তোর সঙ্গে কথা ছিল তুই আধা—আধি বখরা দিবি আমাকে। ছিল না? কিন্তু মাত্র কুড়িটি টাকা দিয়ে আমাকে তুই বিদেয় করে দিলি কোন আক্কেলে? আমি কি কুলি? আমি সাপটে না ধরলে তুই ওর গলা টিপতে পারতিস? আর আমাকেই কলা দেখালি। কেমন মজাটা টের পাইয়ে দিলুম। ছুরির একটি ঘায়ে তো কাৎ হয়ে পড়লি। আমার সঙ্গে চালাকি! গয়না, গিনি সব পুঁতে রেখে এসেছি। পুলিশ ঘুণাক্ষরে জানতে পারবে না। দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে ফিরে যাব আবার।'

বাইরে আবার ছপ ছপ শব্দ শোনা গেল, তার সঙ্গে সেই খিক খিক হাসি।

'আঃ, শেয়ালগুলো জ্বালালে তো! হাড়গিলে, তুই ভাবছিস আমি ভূতের ভয়ে কাঁপছি? মোটেও না। তুই শেষ হয়ে গেছিস। তোকে আর ভয় নেই। লণ্ঠনটা জ্বালাতে পারলে কারো পরোয়া করতাম না। অন্ধকারে বলেই গাটা ছমছম করছে—'

টক করে একটা শব্দ হল।

মেঝেতে কী যেন পড়ল একটা ওপর থেকে।

টর্চটা মুঠোয় চেপে ধরে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বনোয়ারি। তারপর জ্বালল টর্চটা। যা দেখলে তাতে তার মুখটা 'হাঁ হয়ে গেল একটু। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার মতন হল। মেঝের মাঝখানে একটা দেশলায়ের বাক্স পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তুলে নিলে সেটাকে। শুকনো খটখটে নতুন দেশলাই একবাক্স, দু—দিকের কাগজ পর্যন্ত ঠিক আছে। কোত্থেকে এল এটা? কে দিলে? টর্চটা ছাতের ওপর ফেলে দেখবার চেষ্টা করল একটু। কিচ্ছু দেখা গেল না। খিক খিক হাসিটা আবার শোনা গেল বাইরে। আর সঙ্গে

সঙ্গে টর্চটা নিভে গেল। তার ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছিল। বনোয়ারি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে তুলে নিলে দেশলাইটা। প্রথম কাঠিটাই জ্বলে উঠল।

লণ্ঠনটা জ্বেলে বেশ করে গুছিয়ে বসেছিল বনোয়ারি। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধ্বনি, আকাশের গুরু গুরু শব্দ আর ঝড়ের তাণ্ডব চলছিল। আর তার মধ্যে মাঝে মাঝে সেই ছপ ছপ ছপ ছপ শব্দ আর খিক খিক হাসি। এইটেই শুনছিল বনোয়ারি একাগ্র হয়ে। শেয়ালগুলো ওরকম করছে? তাই নিশ্চয়। এই বিশ্বাসেই অনড় হয়ে বসেছিল সে। কিন্তু একটু পরেই এ বিশ্বাস আর টিকল না। খিক খিক শব্দটা কানের খুব কাছে শোনা গেল। নিশ্বাসের স্পর্শও যেন গালে লাগল। আর মনে হতে লাগল ঘরের ভিতরেই যেন কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'চোপরাও, খবরদার—'

টপ করে ব্যাগ থেকে ছোরাটা বার করে চিৎকার করে উঠল বনোয়ারি। শব্দটা থেমে গেল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে বসে রইল সে। অনেকক্ষণ কোনো শব্দ হল না। তারপর হঠাৎ সে দেখতে পেল ঘরের কোণে ছায়ামূর্তির মতো কী যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা। ঠিক যেন হাড়গিলার ছায়া পড়েছে। বোঁ করে ছোরাটা সেই দিকে ছুড়ে দিলে সে। ছায়াটা সট করে যেন ওপরের দিকে মিলিয়ে গেল, আর ছোরাটা গেঁথে গেল দেওয়ালে। বনোয়ারি উঠে গেল দেওয়াল থেকে ছোরাটা খুলে নেবার জন্যে। কিন্তু পারলে না। ছোরাটা দেওয়ালে এমন গেঁথে বসে গিয়েছিল যে খোলা গেল না। টানাটানি ধস্তাধস্তির চরম করল বনোয়ারি, কিন্তু কিছুতেই তুলে নিতে পারলে না ছোরাটা। মনে হল ভিতর থেকে ছোরাটাকে কে যেন শক্ত করে ধরে রেখেছে। ছোরাটা ছেড়ে দিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল বনোয়ারি। ছোরার বাঁটটা কাঁপতে লাগল, বনোয়ারির মনে হল যেন বলছে—না, না, পারবে না। ছেড়ে দাও। ঠিক এই সময়ে খিক খিক হাসিটা আবার কানের পাশে শুনতে পেল সে। লাফিয়ে সরে গেল একধারে। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ছোরাটার দিকে। আর একবার চেষ্টা করল, দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে টানতে লাগল। টানতে টানতে হঠাৎ হাত ফসকে গেল তার, দড়াম করে নিজেই পড়ে গেল মেঝের ওপর। ছোরার বাঁটটা দুলে দুলে বলতে লাগল— না, না না, না। আর সঙ্গে সঙ্গে খিক খিক হাসি। মেঝে থেকে উঠে কপাট খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল বনোয়ারি বাইরে। দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে তার কাপড়চোপড় উড়িয়ে ছড়িয়ে দিলে ঘরের মেঝের চারদিকে। লণ্ঠনের শিখাটা কাঁপতে লাগল, কিন্তু নিবল না। তার আগেই বনোয়ারি ঘরে বসে ঢুকল প্রকাণ্ড লম্বা একটা গাছের ডাল টানতে টানতে।

'পিটিয়ে লম্বা করে দেব হারামজাদাকে—' উচ্চকণ্ঠে এই স্বগতোক্তি করে কপাটটা আবার ভালো করে বন্ধ করে দিলে সে। তারপর লম্বা ডালটা রাখল একধারে। কাপড়চোপড়গুলো গুছিয়ে বোঁচকায় পুরে ফেলল। তারপর ঘরের মাঝখানে গুম হয়ে বসে রইল ভ্রুকুঞ্চিত করে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। কোনো সাড়া—শব্দ নেই। ক্রমশ ঘুম পেতে লাগল তার। ঢুলতে লাগল। হঠাৎ চমকে উঠল একবার। মনে হল ঘরের আর একটা কোণে ফিসফিস করে কথা কইছে যেন কারা। লম্বা ডালটা তুলে তেড়ে গেল সেদিকে। কেউ নেই। তারপর তার মনে হল সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে তার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে বোধ হয় তাই ও—সব আজগুবি জিনিস দেখছে আর শুনছে। একটু ঘুমুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভূত? হুঁঃ, যত সব বাজে কথা। বোঁচকাটা মাথায় দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে মেঝের উপর। চোখ বুঁজে রইল খানিকক্ষণ। কিন্তু ঘুম এল না। তবু চোখ বুজে রইল। তারপর একটা অদ্ভুত ছোট্ট শব্দ হল। চু—চু—চু। বনোয়ারি চোখ খুলে দেখলে ছাতের ওপর থেকে কালো মতন কী একটা ঝুলছে। ঝুল নাকি? পুরোনো বাড়িতে ঝুল থাকা অসম্ভব নয়। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে দিকে। মনে হতে লাগল ক্রমশ সেটা বড়ো হচ্ছে। নীচের দিকে লম্বা হচ্ছে। সাপ নয় তো? বনোয়ারি উঠে সেই লম্বা ডালটা তুলে সেটার নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। ডালটা খুব লম্বা, নাগাল অনায়াসেই পাওয়া যেত। কিন্তু ওটা ক্রমশ সরে সরে যেতে লাগল। আর ক্রমশ লম্বা হয়ে নামতে লাগল মেঝের দিকে। বনোয়ারি শেষে পাগলের মতো ঘোরাতে লাগল ডালটা। তারপর অপ্রত্যাশিত এক

কাণ্ড হল। হঠাৎ কে যেন পিছন দিক থেকে জাপটে ধরল তাকে। নরম দুটো হাত, ঠিক যেন মেয়েমানুষের হাত, পিঠের ওপর স্তনের স্পর্শও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিছু। বনোয়ারির হাত থেকে ডালটা পড়ে গেল। আর ছাত থেকে সেই কালো বস্তাটা নামতে লাগল ক্রমশ। বনোয়ারি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল সে দিকে। দেখতে দেখতে সেটা তার চোখের সামনে নেমে এল। বনোয়ারি দেখলে সেটা ঝুল নয়, সাপও নয়, আঙুল একটা, বিরাট মোটা রোমশ আঙুল, প্রকাণ্ড নখ রয়েছে রাতে। আঙুলটা মেঝের কাছে আসতেই চড়াৎ করে শব্দ হল একটা, মেঝেটা ফেটে গেল। সেই ফাটলের ভিতর থেকে বেরুল হাড়গিলার মুণ্ডটা।

'কে, বনোয়ারি এসো, এসো, ভয় পাচ্ছ কেন। ঝুমকো এবার ছেড়ে দাও ওকে। ও আসবে এবার। ঝুমকো আমার গলাটাকে কামড়ে ছ্যাতরাখ্যাতরা করে দিয়েছে একেবারে। দেখতে পাচ্ছ?'

বনোয়ারি দেখতে পেয়েছিল। হাড়গিলার গলার সাঁকিটা নেই, তার জায়গায় একটা গর্ত। গর্তের ভিতর দিয়ে মেরুদণ্ডের হাড় দেখা যাচ্ছে।

'ঝুমকো ছেড়ে দাও ওকে। ও এইবার আসবে। বনু এসো—'

অদৃশ্য হাতের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। অদৃশ্য এবার দৃশ্যও হল। বনোয়ারি ঘাড় ফিরিয়ে এবার দেখতে পেল ঝুমকো দাঁড়িয়ে আছে। তার ঘাড়টা ওদিকে বেঁকে গেছে, জিবটা বেরিয়ে ঝুলছে, মুখময় ফেনা, চুলগুলো এলোমেলো। তারপর বনোয়ারি অনুভব করল হাড়গিলা তার হাত থরে টানছে আর ঝুমকো ঠেলছে তাকে পিছন থেকে। বনোয়ারি গর্তে ঢুকে পড়ল।

ফেরারি আসামি বনোয়ারির মৃতদেহ সাতদিন পরে পুলিশ আবিষ্কার করল ওই ঘরের মধ্যে। মৃতদেহটি ঘরের মেঝেতে একটা ফাটলের মধ্যে আটকে ছিল।

গোলদিঘির ভূত!

শিবরাম চক্রবর্তী

ভূতের কথা বলতে গেলে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। বছর কয়েক আগের কথা। তখন সবে এক দৈনিক পত্রিকার আপিসে সাংবাদিকের কাজে ঢুকেছি।

নামমাত্র কাজ। রবিবারের কাগজে একটুখানি লিখতে হয়—ফি হপ্তায়। আমার একটা আলাদা স্তম্ভ ছিল, তাইতেই লিখতাম।

লেখার কাজ এমন কিছু না, কিন্তু পড়ার কাজটাই ছিল ভারী! সপ্তাহে একবার ওই একটুখানি লেখার জন্য এত বেশি আমাকে পড়তে হত—এত রকমের দৈনিক, সাপ্তাহিক আর সাময়িক পত্র ঘাঁটতে হত যে বলবার না। ভূত না হলেও, বলতে কি, সেই একটা বিভীষিকা ছিল।

এইরকম কাগজপত্র ঘাঁটবার কালে একদিন একটা খবর আমার চোখে পড়ল। দৈনিকটির প্রেরিত পত্রের স্তম্ভে একজনের একখানা চিঠি। চিঠিখানি স্তম্ভিত করবার মতোই।

পত্রদাতা লিখেছেন, 'সম্পাদকমশাই, আমরা গোলদিঘি এলাকার বাসিন্দা। কিছুদিন থেকে ভূতের উপদ্রবে বড়োই উৎপীড়িত হচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে অশরীরী ভদ্রলোক তেমন কষ্টদাতা না হলেও যখন—তখন যেখানে—সেখানে তাঁর অবাঞ্ছনীয় আবির্ভাব আর অন্তর্ধানে এ অঞ্চলের সকলেই আমরা বিশেষ কাহিল হয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা আমাদের প্লীহার পক্ষে খুব হিতকর নয়, এমনকী, হার্টের পক্ষেও। হার্ট যদিও পিলের মতন সহজে চমকাবার ছেলে না, কিন্তু তাহলেও, ছেলের মতো ফেল করতে পারে তো!—যাই হোক, আপনাদের বিশ্ববিশ্রুত পত্রিকার সংখ্যাহীন পাঠক—পাঠিকার কারও যদি এই ভৌতিক দুর্যোগের কোনো প্রতিকার জানা থাকে, যদি দয়া করে আপনার পত্রিকার মারফতে তিনি জানান তাহলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হব। ইতি—ইত্যাদি।'

কলকাতার বুকের ওপর ভূত! একটু অভূতপূর্ব কাণ্ডই বই কী! এ কি কখনো সম্ভব হতে পারে?

'কী ভাবছেন মশাই অমন গালে হাতে দিয়ে?'

আরেকজনের কথায় আমার চমক ভাঙল। এই কার্যালয়েরই, আমার এক সহযোগী। আমার মতোই আরেকজনা।

'এই, ভূতত্ব।' আমি বললাম—'ভূতত্ব নিয়েই ভাবছিলাম।'

'ও, ভূতত্ব? আজকের ভূমিকম্পের কথা বলছেন? জাপানের সমুদ্রকিনারের তিনটি শহর ধসে গেছে, কত ঘর—বাড়ি গেছে, মরেছে যে কত হাজার—ইয়ত্তা নেই তার। বাস্তবিক, এই ভূমিকম্পগুলো কেন যে হয়, তার রহস্য আবিষ্কার করা—'

'আজ্ঞে, সে ভূতত্ব নয়, আমি ভাবছি ভূতত্ত্ব'—বাধা দিয়ে বলতে গেলাম।

'একই কথা। ভূতত্ব আর ভূমিকম্পের তত্ত্ব এক। একই সূত্রে গাঁথা। একটার যদি আমরা কিনারা করতে পারি—'

'আহা, তা নয়। তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিনে মশাই, আমি ভাবছি ভূত নিয়ে। ভূত আছে কি না, ভূতের অস্তিত্ব—নাস্তিত্ব এই সব নিয়ে। যেমন মহৎ থেকে মহত্ত্ব, আমসৎ থেকে আমসত্ব, তেমনি ভূত থেকে

ভূতত্ব। ভূমিকম্পের সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই।'

ব্যাকরণমতে আরও উদাহরণমালা জোগাতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে সম্পাদকের ঘর থেকে তলব এল।

যেতেই সেই কাগজটার ভূতপূর্ব অংশটা তিনি পড়তে দিলেন—'পড়ে দেখ।'

'দেখেছি।'

সম্পাদক বললেন, 'আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা আসেননি আজ, কেন কে জানে! তুমি একবার যাও দেখি। গোলদিঘির এই ভূতুড়ে ব্যাপারটার সবিশেষ জেনে এসো তো! খবরটা কালকের কাগজে সবিস্তারে ছাপাতে পারলে বেশ চাঞ্চল্যকর হবে। কাগজ কাটবে খুব।'

'আজ্ঞে, মাপ করবেন আমায়। ভূত আমি বিশ্বাস করিনে।' আমি জানালাম—'ভূতে আমার ভারি ভয়।'

'বিশ্বাস করো না তো ভয় কিসের আবার?' অবাক হলেন সম্পাদকমশাই।

'আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো। ওদের মোটেই বিশ্বাস নেই, ভূত ভারি ভয়ঙ্কর জীব।'

'আহা, তোমাকে কি ভূতের সঙ্গে মুলাকাত করতে বলেছি? অমূলক ভয় তোমার। আরে, তাদের কি পাত্তা মেলে? যাদের বাড়ি উপদ্রব হচ্ছে সেখানে যাবে, পত্রদাতার সঙ্গে দেখা করবে। করে বিস্তারিত সব জেনে, ফলাও করে লিখে আনবে—কাজ তো এই!'

'কিন্তু পত্রদাতার ঠিকানা তো কাগজে দেয়নি।' আমি দেখালাম—'চিঠিতে লেখা নেই।'

'আসল চিঠিতে আলবৎ ছিল, নইলে এ—চিঠি ছাপত না। কিন্তু সে—ঠিকানা তো ওই কাগজের দপ্তর থেকে জানা চলে না। তাহলে যে ব্যাপারটা ওরা টের পেয়ে যাবে। আমরা যা করতে যাচ্ছি, মালুম পেয়ে নিজেরাই করে বসবে আগে। সব মাটি হবে তাহলে।'

'তাহলে?' আমার প্রতিধ্বনি হয়।

'একটুখানি জায়গা তো গোলদিঘি। অঞ্চলটায় ঘোরো গে। যাকে দেখবে একটু ভীত, ভাবিত, সন্ত্রস্ত—পাকড়াবে অমনি। মুষড়ে—পড়া কী ম্রিয়মাণ কেউ যদি তোমার নজরে পড়ে, ছেড়ো না তাকে। যদি কাউকে দেখ খুব বিচলিত, বুঝবে সেই তোমার এই পত্রদাতা, কিংবা এই পত্রদাতার মতোই অপর কেউ, ভূতের উৎপাতে প্রপীড়িত। বুঝেচো? আলাপ করে ভাব জমিয়ে আসল কথা আদায় করবে তার কাছ থেকে। এমন কি শক্ত কাজ?'

তিনি তো আমায় চাঙ্গা করতে চাইলেন, কিন্তু আমার প্রাণ ঠান্ডা হয়ে এল। 'নিজস্ব সংবাদদাতার' পরস্মৈপদী বেগার ঠেলতে—বিশেষত, যার পেছনে এত ঠ্যালা—মোটেই আমার ভালো লাগে না। তা ছাড়া, ভূতের ব্যাপারে উৎসাহ—এক কথায় ভূৎসাহ—চিরকালই আমার কম। ভূতত্বে আগ্রহ কোনোদিনই আমার নেই। ভূতের ত্রিসীমানায় আমি বিরল। আনাচে—কানাচে ভূতের গন্ধ পেলেই আমার ভোঁ—দৌড়!

'আমি কি পারব?' তবুও আমি গাঁইগুঁই করি।

'পারবে হে, পারবে। তুমি তুখোড় ছেলে—তাই তো তোমাকেই এই গুরুভার চাপাচ্ছি...'

'আজ্ঞে, আমার দ্বারা কি এই দুঃসাধ্য কাজ—'

'হবে হে, হবে। অবশ্যি, চালাক তুমি তেমন নও, কিন্তু তা না হলেও, তোমার লাক আছে। তোমার ভাষাতেই বললাম কথাটা। তোমার ভাষা সহজে তুমি বুঝতে পারবে। সাদা বাংলায় কথাটা এই, এধারে—ওধারে একটু ঘুরে—ফিরে দেখবে, চোখ—কান খোলা রেখে। চাই কি, দৈবক্রমে একটু চেষ্টা না করতেই, হয়তো তোমার সঙ্গে লোকটার দেখা হয়ে যেতে পারে। এই নাও...'

এই বলে তিনি পকেট হাতড়াতে লাগলেন। তাঁর নিজের পকেট। হাতড়ে—টাতড়ে খুচরো—খাচরায় যা মিলল আমার হাতে সমর্পণ করলেন—

'এই নাও টাকা দু—আড়াই হবে। কাজটা সারার পর কফি—হাউসে গিয়ে—গোলদিঘির কাছেই তো কফি—হাউস! কফি—টফি যা হয় খেয়ো প্রাণ ভরে।'

এতক্ষণে কাজটায় আমার গা লাগে। 'যে আজ্ঞে' বলে বেরিয়ে পড়ি। বউবাজার থেকে একেবারে বইয়ের বাজারে। কলেজ স্কোয়ারেই সটান!

অলিগলি ধরে ট্যাং ট্যাং করে তো পৌঁছলাম গোলদিঘি। দিঘিটার চার কোনায় দু—চক্কর মারা যাক একবার। দেখি কাউকে ভীত ভাবিত বিচলিত বিড়ম্বিত দেখা যায় কিনা!

বিকেল থেকেই মেঘলা লেগেছিল আজ। এখন আবার টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। সন্ধে উৎরে গেছে কখন! গোলদিঘির গ্যাসবাতিগুলো টিম টিম করে জ্বলছে! আর আমি চক্কর মারছি তখনও গোলদিঘির চক্রান্তে।

একটা একটা করে বাদামের খোলা ভাঙছি, গালে ফেলছি, আর ভালো করে তাকাচ্ছি। না, বাদামের দিকে নয়, লোকগুলোর দিকে। কাউকে যদি আমার সম্মুখে ভূতগ্রস্ত দেখতে পাই!

কিন্তু দেখব কি, ভালো করে দেখতে—না—দেখতেই গোলদিঘি ফাঁকা হয়ে গেল। জলটাও একটু জোরে এল আবার। টিপ টিপ থেকে টপ টপ শুরু করল। এতক্ষণ যারা ঘুরপাক খাচ্ছিল এখানে, দেখতে দেখতে গেল কোথায়? জলের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল নাকি? অ্যাঁ, ভূত নয় তো এরা সব? আমার গা ছমছম করে।

ভদ্রলোক বলেছিলেন কাজ সারা হলে কফি—হাউসে যেতে। আড়াই টাকা পকেটে নিয়ে আগেই আমি সেখানে পা বাড়ালাম। যদি সেখানেই সম্পাদক—কথিত, সম্প্রতি কফি—ত সেই ভদ্রলোকের পাত্তা মেলে আমার!

কফি—হাউসও ফাঁকা। বাদলার ধাক্কা এখানেও লেগেছে। এই বর্ষায় যে যার ঘরে বসে চা খেয়ে চাঙ্গা হচ্ছে, কফি—হাউসে হানা দেবার গরজ বোধ করেনি।

বসলাম গিয়ে কাফের এক কোণে। আর একজন মাত্র ছিল সেই টেবিলে। হাফশার্ট গায়ে, আধাবয়সি ভদ্রলোক। লোকটিকে কেমন যেন মুহ্যমান মনে হল!

মনে হল ইনি যেন ভূত—টুত দেখেছেন। অন্তত সেইরকম মুখের ভাবখানা। তাঁর কাছেই বসলাম তাই।

বয় আসতেই এক পেয়ালা গরম কফি আর এক প্লেট পটাটো—চিপসে হুকুম দিয়েছি।

'হঠাৎ কি বিশ্রী বাদলা করল বলুন তো!' ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করি।

'ভারি বিচ্ছিরি সত্যিই।' ভদ্রলোক সায় দিলেন।

'এরকম আবহাওয়ায় চানাচুর আর ভূতের গল্প বেশ জমে, কী বলেন?' কায়দা করে লোকটাকে পথে আনবার প্রয়াস পাই।

'ভূতের গল্প? ভূতের আবার গল্প কি?' ওঁর তেমন উৎসাহ দেখা যায় না।

কফি আর চিপস এসে পড়ল আমার। চিপস—এর পাত্রটা এগিয়ে দিলাম ওঁর দিকে—যদি পটাটো দিয়ে পটানো যায় একটু।

চিপস উনি ছুঁলেন না, বয়কে বললেন আইসক্রিম আনতে! আইসক্রিমও এসে গেল দেখতে দেখতে।

'আপনি তো এই গোলদিঘির এলাকারই লোক, তাই না? এ অঞ্চলে আছেন অনেক দিন! প্রবীণ ব্যক্তি; দেখেছেন শুনেছেন অনেক। ভূত অদ্ভুত অনেক কিছুই আপনার চোখে পড়েছে—নয় কি?...'

'ভূত? গোলদিঘিতে ভূত? না, মশাই না, ভূত—টুত কিছু নেই এখানে। সাতজন্মে না।' ভদ্রলোক আরেক পাত্র আইসক্রিমের হুকুম দিলেন।

আইসক্রিম খেতে পারে বটে লোকটা। এমন ক্রিমখোর জীবনে আমি দেখিনি। কৃমি হয়ে না মারা যায় শেষটায়।

আমি এক এক চুমুক কফি খাই, আর উনি গেলাসের পর গেলাস গেলেন। প্রায় সতেরো গেলাস আইসক্রিম সারলেন ভদ্রলোক, ততক্ষণে আমি মাত্র তিন পেয়ালা কফি টানতে পেরেছি—আর প্লেট দুয়েক

আলু—ভাজা, ব্যস! কিন্তু এতক্ষণ ধরে এত চেষ্টা করেও একটুকরো ভূতের খবর ওঁর মুখ থেকে খসাতে পারলাম না! ওঁকে ভূৎসাহিত করার সমস্ত অধ্যবসায় আমার ব্যর্থ হল।

যতই আমি ভূতের কথা পাড়তে যাই ততই উনি ঘাড় নাড়তে থাকেন—'না না না! গোলদিঘিতে ভূত থাকে? এত গোলমালের মধ্যে? ভূত কখনো তিষ্ঠোতে পারে কলকাতায়? ভূত—টুত যা ছিল এখানে, সব ইহলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। মরে মানুষ হয়ে গেছে সব! ক—বে!'

সতেরো গেলাস আইসক্রিম সাবাড় হল, কিন্তু ভূ—শব্দটি ওঁর মুখ থেকে বার করা গেল না।

অগত্যা উঠতে হল আমায়। কফি—হাউসের মায়া কাটাতে হল অবশেষে। কাফের দরজা বন্ধ হবার সময় হয়েছিল। উঠে কাউন্টারে দাম দিতে গেলাম।

কিন্তু বিল দেখে তো আমার চক্ষু চড়ক! পনেরো টাকা বিল!

'পনেরো টাকা কেন? আমি তো মোটে তিন পেয়ালা কফি আর দু—প্লেট চিপস খেয়েছি—তার জন্যে পনেরো টাকা?' প্রবল কণ্ঠে আমি প্রতিবাদ করি।

'আর সতেরো গ্লাস আইসক্রিম, সেটা খেল কে?' কফি—হাউসের কর্মকর্তা শুধোন।

'সে তো আরেক জন।' জানাই আমি।

'আমরা কি কানা? ঘাস বেচতে বসেছি? চালাকি পেয়েছেন নাকি? আপনার টেবিলে আপনি ছাড়া আর অন্য কোনও লোক ছিল না।'

'কেন, ওই ভদ্রলোক?' আঙুল দিয়ে দেখাতে গিয়ে দেখলাম উনি নেই। উঠে গেছেন কখন! কিন্তু এর মধ্যেই সরে পড়লেন কোথায়?

ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকল না। আমি বললাম, 'দেখুন মশাই, এইসব রসিকতা আমার ভালো লাগে না। পকেটে সম্বল আমার মোট আড়াই টাকা, সেই আন্দাজে আমি খেয়েছি। পনেরো টাকা আমি পাব কোথায়? আমাকে বাঁধা রাখলেও অত টাকা দিয়ে খালাস করতে আসবে না কেউ।'

'তাহলে তো পুলিশ ডাকতে হয়। বেওয়ারিশ মাল থানায় জমা দেওয়াই দস্তুর।'

ইঙ্গিতের অপেক্ষাই ছিল শুধু! তাঁর কথা না খসতেই বেয়ারাটা কোত্থেকে একটা পাহারাওয়ালা এনে খাড়া করেছে! যদ্দূর বেয়াড়া কাজ হতে হয়।

ব্যাপারটা আমি আরও পরিষ্কার করে বোঝাতে যাচ্ছি, পাহারাওয়ালাটা আমায় বাধা দিল। বলল, 'চলিয়ে থানামে।'

'থানামে? থানামে কেন যাব? কেয়া কিয়া? কফি খায়া, উসকো দাম দেদিয়া, চুক গিয়া। ফিন থানা কাহে?'

কিন্তু কে শোনে! পাহারাওলাটা আমার ঘাড় পাকড়াল। টেনে নিয়ে চলল আমায়।

এমন সময় দেখি সেই ভদ্রলোক! এগিয়ে আসছেন মালকোঁচা মেরে। আমাকে সাহায্য করতেই—এতক্ষণে!

কিন্তু আমাকে না, পাহারাওলাকেই। পাহারাওলাটা আমার গলদেশ ধরেছিল, তিনি এসে আমার তলদেশ ধরলেন। দুজনে মিলে চ্যাংদোলা করে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে লাগলেন আমাকে।

'তুমলোক কেয়া করতা বলতো? হামকো পা ছোড় দেও না। থানামে কি আমি নিজে হেঁটে যেতে জানিনে?' আপত্তির সুরে আমি বলি। রাষ্ট্র—বাংলায় জগাখিচুড়ি বানিয়ে একাকার করি।

'তুমহারা পায়ের পাকড়া কৌন হো? হাম তো গর্দান লিয়া। দুসরে তো হিঁয়া কোই নেহি!'—পাহারাওলার আওয়াজ কানে আসে।

কিন্তু ততক্ষণে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়েছি!

রক্তের ফোঁটা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল অনিমেষ। মুহূর্তে রেলিংটা ধরে ফেলে সামলাল নিজেকে।

নীচের দিকে তাকাল। কই কিছুই পড়ে—টড়ে নেই তো! কলার খোসা, আমের চোকলা, নারকেলের ছোবড়া—কিছু নেই তো! জলও তো নেই এক ফোঁটা! শুকনো খটখটে সিঁড়ি। জুতোর তলাটাও দেখল একবার। সেখানেও কিছু লেগে নেই।

মনে মনে হাসল অনিমেষ। খুব তাড়াতাড়ি করছিল বলেই হয়তো পা বেচাল হয়ে পড়েছিল। ছন্দ রাখতে পারেনি ঠিকমতো।

চক্ষের পলকে কী দুর্ঘটনাই না হতে পারত। ভাঙতে পারত হাড়গোড়, মাথা, মেরুদণ্ড। এতক্ষণে তাহলে রেল স্টেশনের পথে না হয়ে হাসপাতালের পথে। ট্যাক্সিতে না হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে। সত্যি, এক চুলের ফারাক একটা সুতোর এদিক—ওদিক।

এত তাড়াহুড়োর কোনো মানে হয় না। অনিমেষের এখন বয়স হয়েছে। তার ধীর—স্থির হওয়া উচিত।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ঠিক সময়ে, সমর্থ হাতে রেলিংটা ধরে ফেলতে পারল। ঠিক অত দূরে রেলিং, পড়বার সময় হাতের হিসেব থাকল কী করে? মনে হল কে যেন হাতের কাছে রেলিংটা এগিয়ে এনে দিয়েছে।

কিছু বলেনি, তবু ট্যাক্সিটাও ছুটছে প্রাণপণ। যেন ড্রাইভারেরও ভীষণ তাড়া। কিন্তু বেগে ছুটলেই আগে পৌঁছুনো যায় না সব সময়।

মনে হচ্ছিল, ট্যাক্সিটাই অ্যাকসিডেন্ট করে বসবে। হয় কাউকে চাপা দেবে নয়তো হুমড়ি খেয়ে পড়বে কোনো গাড়ির উপর, নয়তো কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষ। অত শত না হয়, নির্ঘাৎ জ্যাম হবে রাস্তায়। ট্যাক্সিটা পৌঁছুতে পারবে না। ট্রেন ছেড়ে দেবে।

যেন এত সুখ সহ্য করবার নয়। ভাগ্য ঠিক বাদ সাধবে। বাগড়া দেবে। না, হন্তদন্ত ট্যাক্সি শেষ পর্যন্ত পৌঁচেছে। ট্রেনটা ছাড়েনি। কামরার খোলা দরজার উপর অনীতা দাঁড়িয়ে।

'বাবাঃ আসতে পারলে!' অনীতা খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

'কত বাধা, কত বিপদ—'

'বাঃ, আর বাধা—বিপদ কোথায়! সব তো খোলসা হয়ে গিয়েছে!' অনীতা নির্মুক্ত মনে হাসল: 'এখন তো ফাঁকা মাঠ।'

'যাকে বলে, লাইন ক্লিয়ার।' অনিমেষও হাসল স্বচ্ছন্দে।

হঠাৎ ইঞ্জিনটা হুইসল দিয়ে উঠল।

অনিমেষ বুঝি উঠতে যাচ্ছিল, অনীতা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, 'আর উঠে কি হবে? গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।'

না, ওটা অন্য প্ল্যাটফর্মের ইঞ্জিন।

'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল!' বললে অনিমেষ।

'তোমার সবতাতেই ভয়।' একটু—বা ব্যঙ্গ মেশাল অনীতা।

'না, ভয় আর কোথায়?' কামরাতে উঠল অনিমেষ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সামান্য কয়েক মিনিট বাকি আছে। বললে, 'কিছুক্ষণ বাকি।'

'কিন্তু কতক্ষণ?'

'ধরো এক বছর।' কথাটাকে অন্য অর্থে নিয়ে গেল অনিমেষ।

'না না, অতদিন কেন? এ কি আমরা ডিভোর্সের পর বিয়ে করতে যাচ্ছি যে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে?'

'না, তা নয়, তবে'—অনিমেষ আমতা—আমতা করতে লাগল।

'তবে—টবে নয়।' অনীতা অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'শ্রাদ্ধ—শান্তি হয়ে গিয়েছে, এখন আর তোমার দ্বিধা কী!'

'তবু লোকে বলে, এক বছর অপেক্ষা করা ভালো।'

'ছাই বলে! কেউ বলে না। আমি কত বছর অপেক্ষা করে আছি বলো তো!' কণ্ঠস্বরে অভিমান আনল অনীতা : 'আর আমি দেরি করতে প্রস্তুত নই।'

'কিন্তু চলেছ তো কলকাতার বাইরে!'

'কী করব! হঠাৎ বদলি করে দিল। তাতে কী হয়েছে, তুমি দিনক্ষণ ঠিক করে চিঠি লিখলেই আমি ঝপ করে চলে আসব।' লঘুভার হাসল অনীতা : 'বিয়ে করতে আর হাঙ্গামা কী!'

'শুনছি আমাকেও নাকি বাইরে ঠেলে দেবে।'

'দিক না। তাহলে মফস্সলে যাব। আর যদি না দেয়, কলকাতায়ই থাকো, চলে আসব এখানে। মোট কথা', চোখে তীক্ষ্ন আকৃতি নিয়ে তাকাল অনীতা : 'শুভস্য শীঘ্রম।'

'লোকে কী বলবে!'

'লোকের কথা ছেড়ে দাও।'

'লোকে বলবে বউ মারা যাবার এক মাস পরেই বিয়ে করল।'

'এক বছর পরে করলেও বলবে।' একটু—বা তপ্ত হল অনীতা : 'লোকের হাতে সৃষ্টি—স্থিতি—প্রলয়ের ভার নেই। লোকে কি জানে আমার তপস্যার কথা!'

'তপস্যা?'

'হ্যাঁ, প্রতীক্ষা আর প্রার্থনাই তপস্যা।' অনীতা ঘড়ির দিকে তাকাল : 'তোমার বিয়ের প্রায় দু—বছর পর আমাদের দেখা। তুমি আমাকে বললে, তুমি আমারপরম হয়ে এলে তো প্রথম হয়ে এলে না কেন? সেই থেকেই প্রার্থনা করছি, প্রতীক্ষা করে আছি, কবে সে চরম দিন আসবে, কবে পথ পরিষ্কার হবে। তিন বছরের পর সেই সুযোগ আজ এল। এই তিন বছর সমানে আকাঙ্ক্ষা করে এসেছি আমাদের স্বাধীনতা।'

অর্থাৎ গত তিন বছর ধরেই অনীতা সুরভির মৃত্যুকামনা করে এসেছে।

বুকের মধ্যে একটা ঘা মারার শব্দ শুনল অনিমেষ। সে শব্দ কি তারও আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি!

না, তা কি করে হয়! সুরভি বেঁচেছিল বলেই তো অনীতার প্রতি তার আকর্ষণ এত জ্বলন্ত ছিল, জীবন্ত ছিল। সুরভি আজ বেঁচে নেই, তাই কি অনীতাও আজ স্তিমিত, নিষ্প্রভ?

'এ কী, ট্রেন ছাড়ছে না কেন?' সময় কখন হয়ে গেছে, তবু ছাড়বার নাম নেই। ছাড়বার ঘণ্টা পড়লেই তো অনিমেষ নেমে যেতে পারে। রুমাল নেড়ে দিতে পারে বিদায়।

কী একটা গোলমালে ট্রেনটা থেমে আছে, ছাড়ছে না। দীর্ঘতর হচ্ছে এই নিষ্ফল সান্নিধ্য।

সব ট্রেনই ছাড়ে, ছেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অনীতারটাও ছাড়ল।

নামতে গিয়ে অনিমেষ আবার পড়ল নাকি পা হড়কে? না, সে অত অপোগণ্ড নয়। তার পায়ের নীচে মোলায়েম প্ল্যাটফর্ম কে ঠিক পৌঁছে দিয়েছে।

মফস্সলে বদলি হয়ে এসেছে অনিমেষ।

ভালোই হয়েছে। বদল হয়েছে পরিবেশের। মেঝেতে পায়ে—পায়ে আলতার দাগ ফেলা নেই, নেই আর স্মৃতির রক্তাক্ত কণ্টক।

ছোটো ছাতওলা বাড়ি, উপরে দু—খানা মোটে ঘর। একটা শোবার আরেকটা বসবার। নীচে বাবুর্চি—চাকর। এর চেয়ে আরও ছোটো হলে চলে কি করে? তবু অনিমেষের যেন কীরকম ফাঁকা—ফাঁকা লাগে। এদিক—ওদিক প্রতিবেশীদের বাড়িঘরগুলি কেমন দূর—দূর মনে হয়। মনে হয় বাড়িটাকে ঘিরে যেন অনেক গাছপালা, অনেক হাওয়া, অনেক অন্ধকার। গাড়িঘোড়ার আওয়াজ অনেক পর—পর শোনা যায়, ফিরিওয়ালারা এদিকে কম আসে। অথচ নদী কত দূরে, মধ্যরাত্রে একটু হাওয়া উঠলেই শোনা যায় গোঙানি।

কাজে—কর্মে লোকজন আসে কিন্তু তাদেরও আসার মানেই হচ্ছে চলে যাওয়া। সমস্ত ভিতর—বার আশ—পাশ একটা শূন্যতার শ্বাস দিয়ে ভরা।

না, আসুক অনীতা। ঘরদোর ভরে তুলুক।

আশ্চর্য! সেই রকম চিঠি লিখেছে অনীতা। এই মফস্সল শহরেই সে একটা উচ্চতর চাকরির জন্যে আবেদন করেছে। ক—দিন পরেই ইন্টারভিউ।

হ্যাঁ, কোথায় আর উঠবে, অনিমেষেরই অতিথি হবে অনীতা।

চিঠি লিখে বারণ করল অনিমেষ। তুমি এসো, থাকো, চাকরি করো কিন্তু আমার বাড়িতে উঠো না। অন্তত এখন নয়, একেবারে আজকেই নয়। জানোই তো, আমার বাড়িতে মেয়েছেলে কেউ নেই। তোমার অসুবিধে হবে। তা ছাড়া আমি দুর্বার একা।

আগে অধিষ্ঠিত হও, পরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পাল্টা জবাব দিল অনীতা। প্রায় তিরস্কারের ভঙ্গিতে। লিখলে, আমি একজন সম্ভ্রান্ত, পদস্থ শিক্ষিকা, একটা চাকরির সম্পর্কেই তোমার কাছে একদিনের সাময়িক আশ্রয় চাইছি, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। আর, নিজেকে অত দুর্বার বলে স্পর্ধা করো না। ভাববে আমার প্রতিরোধও দুঃসাধ্য। অন্তত যতক্ষণ আমি সম্ভ্রান্ত, পদস্থ শিক্ষিকা।

না, তুমি এসো। ঝগড়াঝাঁটির কী দরকার! তুমি এলে কত গল্প করা যাবে। কত হাসা যাবে মন খুলে। স্তব্ধতাকেও কত মনে হবে রমণীয়।

আজ সন্ধের ট্রেনে আসবে অনীতা। শুধু রাতটুকু থাকবে। কাল সকালে ইন্টারভিউ দিয়েই দুপুরের ট্রেনে ফিরে যাবে নিজের জায়গায়।

সকাল থেকেই মেঘ—মেঘ বৃষ্টি—বৃষ্টি। দুপুরে ঘনঘোর করে বর্ষা নেমেছে। সন্ধের দিকে তোড়টা কমলেও হাওয়াটা পড়েনি। চলেছে জোলো হাওয়ার ঝাপটা।

স্টেশনে এসে অনিমেষ শুনল গাড়ি তিন ঘণ্টার উপরে লেট।

ভীষণ দমে গেল শুনে। বাইরে দুর্যোগ থাকলেও অন্তরে বুঝি একটা আগুনের ভাণ্ড ছিল। সেটা নিবে গেল ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে।

রাস্তায় জনমানব নেই। দোকানপাট বন্ধ। শুধু একলা এক পথহারা হাওয়া এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সাইকেল রিকশা করে বাড়ি ফিরল অনিমেষ।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখল, এ কী! তার শোবার ঘরে আলো জ্বলছে! দরজা তালাবন্ধ। হাওয়ার দাপটে দরজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়েছে, তারই মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলো। তবে কি ঘর বন্ধ করে বেরোবার আগে ভুলে সুইচটা অন করে রেখেছিল? তাই হবে, নইলে আলো জ্বলে কী করে? পথে আসতে দেখছিল, স্টেশনেও তাই, ঝড়ের উৎপাতে সারা শহরের কারেন্ট অফ হয়ে গিয়েছিল। কে জানে, কারেন্ট হয়তো ফিরে এসেছে এতক্ষণে। বারান্দার সুইচটা টিপল, আলো জ্বলল না। হয়তো বারান্দার বালবটা ফিউজ হয়ে গিয়েছে।

দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই ঘরে আর আলো নেই।

মুখস্থ জায়গায় হাত রেখে সুইচ পেল অনিমেষ। সুইচ টিপল। আলো জ্বলল না। না, আসেনি কারেন্ট। কিংবা এসে এখন আবার অফ হয়েছে।

হাতের টর্চ টিপল অনিমেষ। মনে হল ঘরের মধ্যে অন্ধকার যেন নড়ছে—চড়ছে, ঘোরাঘুরি করছে। অন্ধকার কোথায়! একটা লোক।

'কে?' ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল অনিমেষ।

দরজা খোলা পেয়ে লোকটা পালিয়ে গেল বুঝি! অনিমেষ প্রবল শক্তিতে দরজা বন্ধ করল। প্রায়ই কারেন্ট বন্ধ হয় বলে ক্যান্ডেল আর দেশলাই হাতের কাছে মজুত রাখে। তাই জ্বালাল এখন। হোক মৃদু, একটা স্থির অবিচ্ছিন্ন আলো দরকার।

কই, লোকটা যায়নি তো! খাটের বাজু ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে!

'এ কে?' একটা বোবা আতঙ্ক অনিমেষের গলা টিপে ধরল। 'এ যে সুরভি!'

পরনে কস্তাপাড় শাড়ি, সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর, খালি পায়ে টুকটুকে আলতা, ঠোঁট দুখানি চুনে—খয়েরে রঙিন করা—সুরভি ডান হাতে তর্জনী তার ঠোঁটের উপর রাখল। যেন ইঙ্গিত করল, অনিমেষ যেন না চেঁচায়, না কথা বলে।

তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে দেয়ালের দিকে সরে গেল সুরভি। সরে গেল যেখানে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। একটা তারিখের উপর আঙুল রাখল। দুই চোখে ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনা পুরে তাকাল অনিমেষের দিকে।

সেই চিহ্নিত তারিখে টর্চের আলো ফেলল অনিমেষ। দেখল, আঙুলের ডগায় করে এক ফোঁটা রক্তের দাগ রেখেছে তারিখে।

কোন তারিখ? এ তো আজকের তারিখ। বাংলা আঠাশে আষাঢ়। বেস্পতিবার।

আঠাশে আষাঢ় কী? আঠাশে আষাঢ় অনিমেষ—সুরভির বিয়ের দিন। একদম ভুলে গিয়েছিল। আর আর বছর সুরভিই মনে করিয়ে দিত, এবারও তেমনি মনে করিয়ে দিতে এসেছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে হাসছে সুরভি। কেমন মজা। যেতে না যেতেই মুছে দিয়েছ মন থেকে! মুছে দিয়েছ দেয়াল থেকে! ঘুরে ঘুরে চারদিকের দেয়ালের দিকে তাকাতে লাগল। আমার একটা ছবিও কোথাও রাখনি!

'সুরভি!' তাকে ব্যাকুল হাতে ধরতে গেল অনিমেষ।

হা—হা—হা করে একটা বাতাস ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। বন্ধ দরজা—জানলা ঝরঝর ঝরঝর করে উঠল। সিঁড়িতে শোনা গেল নেমে যাবার পায়ের শব্দ। শুধু যেন সুরভি একা নয়, তার সঙ্গে আছে আরও অনেকে। একসঙ্গে নেমে যাচ্ছে। কেবল নেমে যাচ্ছে। ভারী পায়ে ক্লান্ত পায়ে নেমে যাচ্ছে।

ভয়ে আপাদমস্তক ঘেমে উঠল অনিমেষ।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। মনে হল এ আলো নয়। কে যেন সহসা হেসে উঠেছে খিলখিল করে।

তাড়াতাড়ি অল্প—স্বল্প খেয়ে শুয়ে পড়ল অনিমেষ। টর্চ, ছাতি, ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে চাকরকে পাঠাল স্টেশনে। যত টাকা লাগুক যেন রিকশা ঠিক রাখে। যত দেরিই হোক, ঠিকমতো আসতে পারে যেন অনীতা।

ঘড়িতে রাত বেশি হয়নি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনন্ত রাত। গাছগাছালির মধ্যে বাড়িটাকে মনে হচ্ছে যেন রুদ্ধশ্বাস কবরের স্তূপ। কেবল বাতাসের হা—হা, ডালপালার কাতরতা।

বিছানায় জেগে বই পড়ছে অনিমেষ। জাগ্রত সমর্থ বন্ধুর মতো আলোটা রয়েছে চোখের উপর।

খট—খট খট—খট। দরজায় কে আঙুলের শব্দ করল।

চমকে উঠল অনিমেষ। নিশ্চয় মানুষ! অন্য কেউ হলে আলো নিবে যেত, হাওয়া উঠে দরজা—জানলা কাঁপাত, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হত, নয়তো কুকুর কোথাও কাঁদত মরাকান্না। মানুষ বলেই বারান্দার আলোটাও নেবেনি।

ভয়ের জন্যে লজ্জা হতে লাগল অনিমেষের। বালিশের নীচে হাত দিয়ে রিভলবারটা একবার অনুভব করল।

ধীরে ধীরে খুলে দিল দরজা।

'এ কী! তুমি—অনীতা?'

'উঃ, কী ভীষণ লেট তোমাদের গাড়ি। আর তারপর কী জঘন্য বৃষ্টি!'

'তোমার জন্যে স্টেশনে চাকর পাঠিয়েছিলাম, সে কোথায়?'

'কই কারোর সঙ্গে দেখা হয়নি তো! একাই চলে এলাম।' ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অনীতা।

'তোমার মালপত্র কোথায়?'

'সব স্টেশনে পড়ে আছে। শোনো, আমি ভীষণ ক্লান্ত। এক গ্লাস জল খাব।'

টেবিলের উপর ঢাকা গ্লাসে জল ছিল, তাই ঢক ঢক করে খেয়ে নিল অনীতা। বললে, 'শোবার জায়গা করেছ কোথায়?'

'পাশের ঘরে।'

'আমি যাই, শুয়ে পড়ি গে। দাঁড়াতে পারছি না।' ম্লানরেখায় হাসল অনীতা : 'নিদারুণ ঘুম পেয়েছে।'

'বাঃ, সে কী! খাবে না?'

'না, পথে অনেক খাওয়া হয়েছে। আচ্ছা আসি।' পাশের ঘরে গিয়ে দ্রুত হাতে দরজায় খিল চাপাল অনীতা।

তবু দরজায় মুখ রেখে বলল অনিমেষ, 'ঘরের আলোটা জ্বেলে রেখো। আর দেখো, নতুন জায়গায় যেন ভয় পেয়ো না। ভয় পেলে আমাকে ডেকো।'

অনীতার যেন কিছুতেই ভয় নেই, তার বুঝি অনিমেষকেই ভয়।

কেন, কেন দুজনে আজ ঝড়ের রাতে একসঙ্গে এক ঘরে থাকবে না? থাকলে জীবন্ত লোকের সংস্পর্শে পরস্পরের আর ভয় থাকত না। আর যে ভয়ের কথা অনীতা ভেবেছে সে যে কত অবাস্তব গায়ের উত্তাপে বুঝিয়ে দিত।

তখন কত রাত কে জানে? দু—ঘরের মাঝের দরজায় টুক করে একটা শব্দ হল। সে শব্দ স্পষ্ট চিনল অনিমেষ। সে খিল খোলার শব্দ।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বিছানায় বসে রইল অনিমেষ।

কই অনীতা এল না এ ঘরে!

না, অনিমেষকেই ডাকছে অনীতা। এক নির্জনতা ডাকছে এক নিঃসঙ্গতাকে। এক ভয় আরেক ভয়কে।

পা টিপে টিপে অনিমেষই উঠে গেল। খোলা দরজায় ঠেলা দিয়ে ঢুকল ওঘরে।

দেখল, আলোতে দেখল, একি, অনীতা কোথায়? তার বদলে খাটে পাতা বিছানায়, বিলোল ভঙ্গিতে সুরভি শুয়ে আছে!

'অনীতা, অনীতা কোথায়?' চিৎকার করে উঠল অনিমেষ। টলে পড়ে গেল মাটিতে।

পরদিন সকালে হাসপাতালে অনিমেষের জ্ঞান হল। একটু সুস্থ হলে শুনল গতরাত্রে ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে অনীতা মারা গেছে আর ক্যালেন্ডারের তারিখে যে রক্তবিন্দুটা দেখেছিল সেটা আসলে লালকালির চিহ্ন, মরবার অনেক আগেই তারিখটা দাগিয়ে রেখেছিল সুরভি।

দিন—দুপুরে

বুদ্ধদেব বসু

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, বেলা দুপুর। বালিগঞ্জের ট্রাম আর আসে না, এদিকে ভাদ্রমাসের রোদ্দুর পিঠে চড় চড় করে ফুটছে আলপিনের মতো। ওই এতক্ষণে কালীঘাটের পুল থেকে আস্তে আস্তে নামতে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত ট্রামকে।

এমন সময় রাস্তা পার হয়ে ছোটো একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'আপনি কি ডাক্তার?'

ভাবতেই পারিনি মেয়েটি আমাকে কিছু বলছে, তাই কথাটা শুনেও গ্রাহ্য করলুম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মেয়েটি সোজা আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন, আপনি কি ডাক্তার?'

খুব অবাক হলুম, একটু যেন খুশিও—'কী করে বুঝলে?'

'ওই যে আপনার পকেটে বুক দেখার যন্ত্র। দেখুন, আমার মা—র বড়ো অসুখ, আপনি কি একবার একটু দেখে যাবেন?'

মেয়েটি এমনভাবে কথাটা বলল যেন এটা মোটেও অদ্ভুত কি অসাধারণ কিছু নয়। আমি তো কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে ট্রাম এসে গেছে, একটা ট্রাম ফসকালে এই দারুণ রোদ্দুরে আবার হয়তো পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

মেয়েটি ভাঙা—ভাঙা গলায় কাতরভাবে আবার বলল, 'চলুন না, যাবেন?'

ওসব কথায় কান না দিয়ে ট্রামে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হত সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়ে পা বাড়াতেই পারলাম না। ট্রামটা মোড় ঘুরে আমার চোখের ওপর দিয়ে ঘটর ঘটর করতে করতে বেরিয়ে গেল।

'কোথায় তোমার বাড়ি?'

'চেতলায়— এই কাছেই।'

'কী হয়েছে তোমার মা—র?'

'কী হয়েছে, জানি না তো। বড়ো অসুখ।'

'কদ্দিন অসুখ?'

'অনেক দিন। ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন তো?'

মেয়েটির ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হল। ভাবলুম যাই না, দেখে আসি ব্যাপারটা।

'ডাক্তারবাবু, আপনাকে তো টাকা দিতে পারব না'— মেয়েটি আরও কী বলতে গিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেল।

'আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্য ভেবো না', আমি তাড়াতাড়ি বললুম।

নতুন পাশ করে বেরিয়েছি, আত্মীয় বন্ধুমহলে ডাক—খোঁজ পড়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু ভিজিট দশ টাকা যে মাসে পাই, সেই মাসেই খুব খুশি। এই তো বন্ধুর ছেলের নিরানব্বুই বুঝি জ্বর হয়েছে, ট্রামের পয়সা খরচ করে এসে তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে এতক্ষণ আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরছিলুম। তবু এই মেয়েটি যা হোক টাকার কথাটা মুখে আনল।

হেঁটে চললুম মেয়েটির সঙ্গে কালীঘাট পুলের দিকে। জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার মাকে আর কোনো ডাক্তার দেখেননি?'

'ডাক্তার? না। মা বলেন, ডাক্তার দিয়ে কী হবে, এমনিই আমি ভালো হয়ে যাব। টাকা পাব কোথায়—'

'তুমি কি আজ ডাক্তার খুঁজতেই বেরিয়েছিলে? আর কেউ নেই তোমার বাড়িতে?'

'নাঃ, কে আর থাকবে? এক দাদা ছিল আমার, সে তো চটকলে কাজ করতে গিয়ে রেলে কাটা পড়ল। সেই থেকে আমি আর মা। বেশ ছিলুম আমরা— এর মধ্যে কেন অসুখ করল মা—র? ডাক্তারবাবু মা কদ্দিনে ভালো হবেন?'

আমি ডাক্তারি ধরনে হেসে বললুম, 'সে এখন কী করে বলি?'

'ডাক্তারবাবু, আজ সকাল থেকে মা যেন কেমন হয়ে আছেন— একবারও চোখ মেলে তাকান না। দেখুন বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এতদূরে এসেছি, যদি কোনো ডাক্তার খুঁজে পাই, যদি আমার ওপর কোনো ডাক্তার দয়া করেন। ওই তো সব ওষুধের দোকান, ভেতরে পাতলুন পরা ডাক্তাররা বসে— আমার তো সাহস হয় না ভেতরে ঢুকতে। রাস্তার এদিক—ওদিক কেবলই ঘুরছি, এমন সময় আপনাকে দেখেই মনে হল আপনি আমাকে দয়া করবেন। মা সেরে উঠলে আপনি একদিন এসে খাবেন আমাদের বাড়ি। কী চমৎকার লাউয়ের পাতা দিয়ে মটরডাল রান্না করেন মা— ছি ছি, এটা কী বললুম, আপনারা কেন গরিবের বাড়িতে খেতে আসবেন? ডাক্তারবাবু, আপনার দয়া আমি কোনোদিন ভুলবো না।'

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু, আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?'

'কিছু না। চলো।'

মুখে বললুম বটে, কিন্তু কালীঘাট পুল পর্যন্ত আসতে আসতেই মনে হতে লাগল এই মহৎ কাজের ভারটা না নিলেই পারতুম। এমন কত গরিব দুঃখী আছে। বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে, না খেয়ে তাদের সবার উপকার করতে গেলে নিজেরই—

পুল থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলুম, 'আর কতদূর?'

আমার প্রশ্নে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মেয়েটি বললে, 'এই তো— আর একটুখানি। আমার পয়সা নেই, তা হলে নিশ্চয়ই আপনাকে গাড়ি করে নিতুম। ওঃ, কত কষ্ট হল আপনার।'

'বাঃ, এইটুকু হাঁটতে পারব না?'

অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলুম। কলকাতার এ অঞ্চলে কোনোদিন আর আসিনি। সত্য বলতে, জায়গাটা ঠিক কলকাতাই নয়। একেবারেই পাড়া গাঁ, পুকুর, বন—জঙ্গল, কিছু পাকা বাড়ি, কিছু বা খড়ের ঘর। একটা অতি জীর্ণ শ্যাওলা ধরা, চুন বালি খসে পড়া একতলা পাকাবাড়ির সামনে মেয়েটি এসে বলল, 'এই।'

ভিতরে ঢুকে দেখি, মেঝের ওপর মলিন বিছানায় একজন স্ত্রীলোক নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছে। চোখ তার আধো বোজা। খানিক পর—পর নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

মেয়েটি তার কানের কাছ মুখ নিয়ে ডাকলে, 'মা মা।'

কোনো জবাব এল না।

'মা মা, তোমার জন্য ডাক্তার নিয়ে এসেছি, চেয়ে দেখো। মা, এই ডাক্তারবাবু তোমাকে ভালো করবেন।'

চোখ দুটো একবার পলকের জন্য খুলেই আবার বুজে এল, একখানা হাত বুঝি একটু ওঠাবার চেষ্টা করল, অস্ফুট একটু আওয়াজ হয়তো বেরোলো গলা দিয়ে।

মেয়েটি বলল, 'ডাক্তারবাবু, ভালো করে দেখুন, মাকে আজই ভালো করে দিন।'

কিছু দেখবার ছিল না। আর একটু পরেই নাভিশ্বাস শুরু হবে। তবু আমরা সব সময় একবার শেষ চেষ্টা করে থাকি।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'তুমি একটু বসো, আমি আসছি।'

মেয়েটি বলল, 'ডক্তারবাবু, আপনি আবার আসবেন তো? আমার মা ভালো হবেন তো?'

'এক্ষুনি আসছি ওষুধ নিয়ে,' বলে আমি বেরিয়ে গেলুম।

ফেরবার সময় রাস্তাটা বোধ হয় একটু গোলমাল হয়েছিল। একটু ঘুর পথে এসে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম। রোদ্দুরে ছুটোছুটি করে তখন আমি কানে পি পি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু ডাক্তারের নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভাববার তখন সময় নয়। ভিতরে ঢুকতে ঠিক যেন পা সরছিল না, কে জানে গিয়ে কী দেখব। দরজাটা খোলা দেখে ঢুকলুম, কিন্তু ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

তবে কি আমি ভুল বাড়িতে এলুম? না, ওই তো সেই পুকুর, সেই সুরকির রাস্তা, ওই সুপারিগাছ। দেড় ঘণ্টা আগে এই ঘরটাতেই তো এসেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে, কিন্তু মেয়েটি কোথায় তার মুমূর্ষু মা—ই বা কোথায় গেল? ঘরে জিনিসপত্র অবশ্য খুব কমই ছিল, কিন্তু যে ক—টা ছিল, সে ক—টাই বা কোথায়?

তবে কি ওর মা এর মধ্যেই মারা গেল, আর ওর মাকে নিয়ে চলে গেল কেওড়াতলাতে? এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে হতে পারে? ঘরে জিনিসপত্র অবশ্য কমই ছিল, একটা লন্ঠন, দু—একটা থালা—বাটি, সেগুলো...?

আস্তে আস্তে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তবে কি সমস্ত জিনিসটাই আমার চোখের ভুল... মনের ভুল? এই রোদ্দুরে কি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল? এই তো আমি ঠিক দাঁড়িয়ে, আমার পকেটে ইনজেকশন, সব ঠিক আছে— নাকি আমি ভুল করে অন্য বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি?

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। মাথার ওপরে যে আগুন ঝরছে সে খেয়ালও নেই। চারদিকে ছবির মতো সব চুপচাপ। হঠাৎ দেখি টাকপড়া একটি আধ—বয়সি লোক আমার পাশে এসে কখন দাঁড়িয়েছে। কোনোখানে কেউ ছিল না, হঠাৎ কি লোকটা মাটি ফুঁড়ে উঠে এল? তার দিকে তাকাতেই সে বলল, 'কি মশাই বাড়িখানা কিনবেন নাকি?'

'আপনার বাড়ি বুঝি?'

লোকটা ঠোঁট উলটিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আইনত আমারই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে? কোথাকার এক বিধবা পিসি, জন্মে দু—বার চোখে দেখিনি মশাই— সংসারে কেউ কোনোখানে নেই। আইনের প্যাঁচে ঘুরতে ঘুরতে বাড়িখানা এসে পড়ল আমারই ঘাড়ে, আর বলেন কেন, এমন কপাল নিয়েও আসে মানুষ। পিসে টেঁসলেন তিরিশ বছরে, কুড়ি বছরের ছেলেটা রেলে কাটা পড়ল। পিসি যখন স্বগগে গেলেন, ভাবলুম ভালোই হল। একটা মেয়ে ছিল— 'হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্যরকম সুরে লোকটা বলল, 'ওসব লোকের কথায় কান দেবেন না মশাই, একদম বাজে কথা।'

আমি কথা বলার জন্য হাঁ করলুম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবার আগেই লোকটা বলে চলল, 'ওই তো এক ফোঁটা বারো বছরের মেয়ে, তা মা—টা যেদিন অক্কা পেল, পরদিন ও দিব্যি কড়িকাঠ থেকে ঝুলো পড়ল। একখানাই শাড়ি ছিল পরনে, সেটা দিয়ে কর্ম সারল। কী ডেঁপো মেয়ে মশাই! থাকলে আমরা একটা বিয়ে—টিয়ে দিয়ে দিতুম। বাড়িখানা ছিল তিন পুরুষের, একরকম চলে যেত। তা লোকে যা বলে সব বাজে কথা মশাই— হ্যাঁ, ভূত না হাতি! আপনি তো এডুকেটেড লোক, আপনিই বলুন, এসব কথায় কি কান দিতে আছে? নিতে চান তো বাড়িটা খুব সস্তায় ছাড়তে পারি। সবসুদ্ধ পাঁচশো টাকা। আচ্ছা, হরে দরে চারশোই দেবেন, যান। জলের দলে পাচ্ছেন, জমিটুকু তো রইল, আপনি ইচ্ছেমতো বাড়ি তৈরি করে নেবেন।'

অতি ক্ষীণস্বরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ক—দিনের কথা এটা?'

'কোনটা? এই পিসির... তা দু—বছর হবে। পিসির জন্য কোনো ভাবনা ছিল না মশাই, মেয়েটার জন্য বাড়িটার এমন বদনাম হয়েছে যে, পাঁচ টাকাতেও কেউ ভাড়া নেয় না। এদিকে ট্যাক্সো তো গুণতে হচ্ছে আমাকেই। কী বিপদে পড়েছি, গিলতেও পারি নে, উগরাতেও পারি নে। আমি গরিব মানুষ আমার ওপরে এ জুলুম কেন? থাকি কাঁচড়াপাড়ায়। রোজ রোজ এসে যে তদবির করব তারও উপায় নেই। আপনি নিন না বাড়িটা কিনে। আচ্ছা, কী দেবেন আপনিই বলুন... বলুন না।'

ভূতুড়ে বই

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মানুষের জীবনে এমন—সব ঘটনা ঘটে, যার কোনো মানে পাওয়া যায় না। ভাবতে গেলে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। কেন ঘটল কে জানে—বলে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই।

সেরকম ঘটনা যে সকলের জীবনে সব সময়েই ঘটছে তা নয়। কদাচিৎ কখনো কারও কারও জীবনে হয়তো ঘটে থাকে। আমার জীবনে মাত্র একবার ঘটেছে।

গল্পটা বলি শোনো।

বর্ষাকাল। দিবারাত্র ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। কলকাতার পথ—ঘাট সব কাদায় কাদায় একাকার হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরোবার উপায় নেই।

সেদিন বিকালে বৃষ্টি একটু ধরেছিল। কয়েকদিন ধরে দিবারাত্র কেমন যেন অন্ধকার মেঘলা—মেঘলা আকাশ আর কুয়াশার মতো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি দেখে দেখে প্রাণ যেন একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে! হঠাৎ যেন একটুখানি সূর্যের আলো দেখা গেল। ছাতি হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় যাব তার কোনো স্থিরতা নেই। মোটরের চাকায় কাদা ছিটকে একদিন আমার ফরসা কাপড়—জামা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেকথা আমি আজও ভুলিনি। তাই যথাসম্ভব কাপড়—জামা সামলে ফুটপাথের একপাশ ঘেঁসে চলেছি তো চলেইছি। এমন উদ্দেশ্যহীনের মতো কতক্ষণই বা ঘুরব?

পথের ধারে উঁচু একটা রকের ওপর সারি সারি পুরোনো বইয়ের দোকান। গত কয়েকদিনের বাদলের জন্যে দোকান তারা খুলতে পারেনি, আজ আকাশের অবস্থা একটু ফরসা দেখে ভরসা করে আবার তারা বই সাজিয়ে বসেছে।

ভাবলাম, ভালো বই কিছু থাকে তো দেখাই যাক। বই দেখবার জন্যে দাঁড়ালাম। এটা—সেটা উলটে—পালটে দেখছি। বাজার ক—দিন ধরে ভারি মন্দা গেছে। দোকানদার যা হোক একটা—কিছু বই কেনাবার জন্যে একেবারে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভালো বই একটাও নেই।

আকাশটা মনে হল আবার যেন অন্ধকার হয়ে এসেছে। গুড় গুড় করে একবার মেঘও ডেকে উঠল। ভাবলাম, কাজ নেই আর বই দেখে। বাড়ি ফিরে যাই।

ফেরবার জন্যে যেই পিছন ফিরেছি, এমনি অদৃষ্ট, আমার হাতের ছাতিটার খোঁচা লেগে রকের ওপর সারি—সারি সাজানো বইয়ের থাক থেকে একখানা বই হঠাৎ ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে গেল। ছি ছি, করলাম কী!

বইখানা রাস্তা থেকে তুলতে গিয়ে দেখি—জলে—কাদায় কয়েকটা পাতা তার নষ্ট হয়ে গেছে! দোকানদার হায় হায় করতে লাগল। দেখলাম, এ অবস্থায় বইখানি দোকানদারের হাতে ফেরত দিয়ে চলে যাওয়া আমার উচিত নয়। বইখানা নষ্ট হল যখন আমারই দোষে, দামটা অন্তত তার দিয়ে দেওয়া ভালো।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত দাম?'

দোকানদার বললে, 'দাম তো বাবু বেশি নয়, চার আনা দাম, কিন্তু আজ চারদিন ধরে একটি পয়সার বেচা—কেনা হয়নি!'

বেচারার মুখের অবস্থা দেখে দয়া হল।

পকেট থেকে চার আনা পয়সা বের করে তার হাতে দিলাম। দেখলাম লোকটি বেশ খুশি হয়ে উঠেছে। তৎক্ষণাৎ বইখানি সে তার কাপড় দিয়ে বেশ করে মুছে একখানি কাগজ জড়িয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে, 'নিন বাবু।'

ও নিয়ে আর আমি কী করব! বললাম, 'রেখে দাও তোমার কাছে, কেউ নিতে চায় তো তাকে বিক্রি করে দিয়ো।'

দোকানদার কিন্তু রাজি হল না। বইয়ের দাম সে পেয়ে গেছে, সুতরাং বইখানি সে আমাকে গছিয়ে দেবেই। দেখলাম, বইয়ের নাম 'ধর্ম্ম ও জীবন'।

—দূর ছাই! ও বই নিয়ে আমিই—বা কী করব?

কিন্তু বাধ্য হয়ে নিতে হল। ভাবলাম—দেব কোথাও রাস্তার মাঝখানে ফেলে।

এইবার সে এক ভারি মজার কাণ্ড!

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বইখানি হাতে নিয়ে চলেছি। খানিক দূর গিয়েই রাস্তার ধারে বইখানা ছুড়ে ফেলে দিলাম।

ফেলে দিয়ে আর সেদিক পানে তাকালাম না। না তাকিয়েই এগিয়ে চললাম। কিন্তু কিছু দূর যেতে—না—যেতেই দেখি, পিছন থকে একটি ছোকরা ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে বললে, 'মশাই, শুনুন।'

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমায় ডাকছ?'

ছোকরাটি সেই কাগজ—মোড়া বইখানি আমার হাতে দিয়ে বললে, 'বইখানা আপনার হাত থেকে পড়ে গেল—আপনি বুঝতে পারেননি!'

বইখানা আমি ইচ্ছা করেই ফেলে দিয়েছিলাম, সে—কথা আর বলতে পারলাম না। আবার সেখানি হাতে নিয়েই চলতে লাগলাম।

যেতে যেতে বাঁহাতি একটা বাড়ির সুমুখে দেখলাম, রকটা ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই, বইখানি ধীরে—ধীরে রকের ওপর নামিয়ে দিলাম। ভাবলাম, যার খুশি সে নিয়ে যাবে, আমার ও বইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এবারেও ঠিক তাই!

লোকজন কেউ কোথাও ছিল না, অথচ কয়েক পা যেতে—না—যেতেই দেখি—ছোট্ট একটি ছেলে বইখানি হাতে নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'বইখানি আপনি ফেলে যাচ্ছিলেন!'

কী আর করি, হাত পেতে নিলাম বইখানি। নিয়ে ভাবলাম এবার একে এমন জায়গায় ফেলব, যেখান থেকে কেউ আর তা দেখতে পাবে না।

পাশের একটা গলির ভেতর ঢুকলাম।

রাস্তায় লোকজন খুব কম। ভালোই হয়েছে। এবার আর কেউ দেখতে পাবে না। কোথায় ফেলি, কোথায় ফেলি, ভাবতে ভাবতে চলেছি। হঠাৎ দেখি—রাস্তার পাশেই প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি, তার পরেই বাগানের মতো কী যেন একটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এদিক—ওদিক তাকিয়ে দেখলাম—কেউ কোথাও নেই। এই উপযুক্ত সময় ভেবে প্রাচীরের ওপর বইখানি হেলাফেলা করে তুলে দিলাম। কিন্তু হাত ছেড়ে দিতেই ওদিকে টিপ করে শব্দ হল, বুঝলাম—বইখানি প্রাচীরের ওপারে পড়ে গেছে।

আঃ, বাঁচলাম! এবার বোধ হয় নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে!

নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ নারী—কণ্ঠস্বরে একটুখানি চমকে পিছনে ফিরলাম। দেখি—একটি বারো—তেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে হাসতে হাসতে আমার দিকেই ছুটে আসছে। কাছে আসতেই অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, তারও হাতে আমার সেই বই!

মেয়েটি বললে, 'দোতলার জানালায় আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম, বইখানি আপনি পাঁচিলের ওপর রাখলেন, ওপাশে পড়ে গেল বলে আর খোঁজ করলেন না বুঝি?'

কী আর বলব, মৃদু হেসে বইখানি তার হাত থেকে নিলাম।

সর্বনাশ! আচ্ছা ভূতুড়ে বই তো! ভাবলাম, আমার কাছ থেকে এ যখন কিছুতেই যাবে না, তখন থাক আর একে ফেলে কাজ নেই, বাড়িতেই নিয়ে গিয়ে রাখি।

সেলফের ওপর অনেক বই জড়ো হয়েছে, তারই একপাশে তাকেও দিলাম রেখে। মনে—মনেই বললাম, যেতে যখন চাইলে না কিছুতেই, তখন থাকো।

মা ডাকলেন, 'চা খাবি আয়।'

পাশের ঘরে চা খেতে গেলাম। চা খেতে—খেতেই সন্ধে হল। বাইরে তখন ঝমঝম করে আবার বৃষ্টি নেমেছে। আমার ঘরে এসে সুইচ টিপে আলো জ্বালালাম। ভাবলাম, এই বাদলের দিনে বসে বসে কিছু পড়া যাক।

বই নেবার জন্যে সেলফের কাছে এগিয়ে যেতেই বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালাম! দেখলাম, সেই বইখানা আমার টেবিলের ওপর খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হল—এইমাত্র কে যেন পড়তে পড়তে উঠে গেছে! কিন্তু আমার এ—ঘরে এ—সময় কেই—বা আসবে? বাড়িতে শুধু মা আর আমি। একটা বোন আছে, সেও তো বোর্ডিং—এ। বাড়িতে একটা চাকর পর্যন্ত নেই। তবে কি বোর্ডিং থেকে অণিমাই এল নাকি? মা—র কাছে ছুটে গেলাম। মা বললেন, 'কই না, অণিমা তো আসেনি।'

সেলফ থেকে বইখানা কি পড়ে গেল?—বেড়াল ফেলে গেছে? কিন্তু তারও কোনো সম্ভাবনা দেখলাম না; সেলফের যে জায়গায় বইখানা ছিল, সেখান থেকে বেড়ালে ফেলতে পারে না। তা ছাড়া ফেললে সেখান থেকে সেটা মেঝেতেই পড়ত; টেবিলটা ছিল দূরে, তার ওপর পড়তে যাবে কেন?

বইটায় হাত না দিয়ে ভালো করে দেখবার জন্যে তার ওপর ঝুঁকে পড়লাম। কেনবার সময় তখনও দেখেছিলাম, এখনও দেখলাম—বইখানি কে যেন লাল পেনসিলের দাগ দিয়ে অতি যত্নে পড়েছে!

বইয়ের যে পাতাটা খোলা, তারই নীচের দিকে যে জায়গাটা লাল পেনসিলের দাগ দেওয়া ছিল, অন্যমনস্কের মতো সেই লাইন ক—টা পড়ে ফেললাম।

লেখা রয়েছে—'মানুষের মৃত্যুর কোনও স্থিরতা নাই। যে কোনও মুহূর্ত্তে তুমি মরিয়া যাইতে পার। সুতরাং তাহার পূর্ব্বে তোমার ঋণ তুমি পরিশোধ করিও। তাহা না হইলে...'

সত্যিই ভাবিয়ে তুললে। কার কাছে আমার কী কী ঋণ আছে, আমি ভাবতে বসলাম। মনে পড়ল—আমার এক বন্ধুর কাছে পাঁচটি টাকা আমি একবার ধার নিয়েছিলাম। দিচ্ছি দিচ্ছি করে আর দেওয়া হয়নি। সে আজ প্রায় পাঁচ—ছ'মাস হয়ে গেল। বন্ধুর সঙ্গে আমার আর দেখাও হয়নি, তার কোনো খবরও নিতে পারিনি। টাকার কথা আমার মনেই ছিল না।

তৎক্ষণাৎ ড্রয়ার থেকে পাঁচটি টাকা বের করে পকেটে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। শ্যামবাজারে বন্ধুর বাড়ি।

গিয়ে দেখি—বন্ধু আজ দু—মাস ধরে শয্যাগত। ধরতে গেলে একরকম মৃত্যুশয্যায়। এমনি রুগণ কঙ্কালসার হয়ে গেছে যে, দেখলে আর চেনবার জো নেই। বিকারগ্রস্ত রুগি, আমায় দেখে সে চিনতেই পারলে না।

তার বিধবা দিদি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলাম, চোখ দুটি তাঁর ছলছল করছে। আসবার সময় টাকা পাঁচটি তার দিদির হাতেই দিলাম। বললাম, 'অজিত পেত আমার কাছে।'

দিদির মুখখানি কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল! আর সঙ্গে সঙ্গে দুইচোখের কোণ বেয়ে দুটি অশ্রুর ধারা গড়িয়ে এল। ঠোঁট—দুটো একবার চেপে প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে দিদি বললেন, 'কী উপকার যে তুমি আমাদের করলে ভাই—পাঁচটি টাকার কথাই আজ আমি সারাদিন ভেবেছি। ডাক্তার বলে গেছেন, টাকা না পেলে তিনি আর ইনজেকশন দেবেন না।'

তারপর খবর পেয়েছি, অজিত সেরে উঠেছে। মৃত্যুর মুখ থেকে একরকম বেঁচে ফিরে আসাই বলতে হবে।

দিদি বলেন, আমার দেওয়া সেই পাঁচটি টাকা না পেলে বোধহয় সে বাঁচত না। কিন্তু তার এই বাঁচার সঙ্গে আমার সেই ভূতুড়ে বইটারও কি কোনো সম্বন্ধ আছে?

আছে কি না সে—কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি।

ভেবে কোনো কূলকিনারা পাই না।

নিশুতিপুর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নিশুতিপু—র! নি—শু—তি—পুর!

রাণু ধড়মড়িয়ে বাঙ্কের ওপর উঠে বসল। এইখানেই নামবার কথা না? সঙ্গে মালপত্র তো কিছু নেই! সুতরাং নেমে পড়লেই তো হয়। যেমনই মনে হওয়া, তেমনই বাঙ্ক থেকে কামরার মেঝেতে, আর কামরার মেঝে থেকে একেবারে প্ল্যাটফর্মে।

কী ঘুটঘুটে অন্ধকার রে বাবা! এমন অখদ্যে স্টেশন তো কখনো দেখিনি। ব্ল্যাক—আউট তো উঠে গেছে। স্টেশনে এখনও একটা আলো দিতে পারে না? দূরে যদি—বা একটা মিটমিটে আলো দেখা গেল, সেটা জ্বলে উঠেই আবার গেল নিভে।

এখন কী করা যায়? ট্রেনটাও ঠিক স্টেশনের মতোই অন্ধকার, দেখতে দেখতে সেটাও যেন অন্ধকার কুয়াশার সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

কার সঙ্গে যেন রাণুর দেখা করবার কথা। কে যেন তাকে নিয়ে যেতে আসবে বলে কথা দিয়েছিল। কিন্তু কোথায় কে!

দূরে ওখানে ক—টা টিমটিমে আলোর জটলা দেখা যাচ্ছে না? ওদিকে এগিয়ে খবর নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী! রাণু সেদিকেই পা বাড়াল দোনামনা হয়ে।

'এই যে!'

রাণু থমকে দাঁড়াল। গলাটা সে যেন চেনে।

'তোমাকেই খুঁজতে এসেছিলাম।'

রাণু অন্ধকারে একটা ঝাপসা চেহারা দেখতে পেয়ে বললে, 'কিন্তু আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!'

'দাঁড়াও, আলোটা একটু জ্বালছি!'

মিটমিটে একটা ছোট্ট কুপির মতো আলো এবার জ্বলে উঠলে রাণু ছেলেটিকে দেখতে পেল। তার বয়সিই হবে। ছেলেটি লাজুকের মতো একটু হেসে বলল, 'আমি তামসকুমার।'

'তামসকুমার!'

রাণুর মনে হল, তামসকুমারেরই যেন তার জন্যে স্টেশনে আসবার কথা।

তামসকুমারের সঙ্গে পরিচয়ও যেন তার অনেক দিনের। শুধু এখন সব কথা মনে পড়ছে না।

আলোটা কিন্তু ইতিমধ্যে আবার নিভে গিয়েছে। আবার সেই গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে। এ অন্ধকারে কতক্ষণ এমনই করে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! কোথাও যাবার উপায়ও তো নেই। পথই তো চেনা যাবে না।

'তোমার আলোটা আবার নিভে গেল নাকি?' রাণু এবার জিজ্ঞেস করল।

'না, নিভিয়ে দিলাম।' বলল তামসকুমার।

'নিভিয়ে দিলে!' এ আবার কী অদ্ভুত কথা! শখ করে কেউ এই অন্ধকারে থাকে নাকি! রাণু একটু বিমূঢ় হয়েই বলল, 'কেন, তেল নেই নাকি বাতিতে?'

'তেল? না, তেল একেবারে নেই এমন নয়। তবে—' তামসকুমারের কেমন যেন একটু কুণ্ঠিত ভাব।

'তবে কী?'

'কী তা তো তুমিও জানো ভাই।' তামসকুমার একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল।

বলে কী তামসকুমার! রাণু তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না।—অথচ—অথচ তার যেন বোঝা উচিত, মনের ভেতর এরকম একটা সন্দেহও হচ্ছে।

যাই হোক, বোকা বলে ধরা দিতে রাণু সহজে রাজি নয়। একটু ভারিক্কিভাবেই বলল, 'তা কি আর জানি না, তবে একটু জ্বাললে দোষ কী? কেউ তো আর ধরে নিয়ে যাবে না!'

'ধরে নিয়ে যাবে না! বলো কী! আর তা হলে ধরবে কীসে?' তামসকুমার সবিস্ময়ে বলে উঠল।

না, মাথাটা একেবারে গুলিয়ে দিয়ে ছাড়লে! আলো জ্বাললে ধরে নিয়ে যায়—এ আবার কোন মগের মুল্লুক?

মনে যাই হোক, বাইরে নিজের চাল বজায় রাখবার জন্যে রাণু গম্ভীরভাবে বলল, 'আহা, ঠাট্টা করছিলাম, বুঝতে পারছ না? তবে যদি আলোটা একটু জ্বালতে ভাই, একটু খুঁজে নিতাম।'

'কিছু হারিয়েছে নাকি! কী খুঁজতে চাও?' তামস উদবিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তেমন কিছু নয়, নিজের হাত—পাগুলো আছে কি না একটু খুঁজে দেখতাম।'

তামস একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা, এত করে যখন বলছ তখন একটুখানি না হয় জ্বালছি। তবে বুঝতেই তো পারছ, যতখানি পারা যায়, তেল আজ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেই মুহূর্তটির জন্যে যার যত আলো সব দরকার।'

ও বাবা! ধাঁধা যে ক্রমশ আরও ঘোরালো হয়ে উঠছে।—এ আবার কোন মুহূর্তের কথা বলে! যাই হোক, আলোটা তো জ্বলুক! অন্ধকারে বুদ্ধিটাও যেন কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে।

কিন্তু আলো জ্বালা আর হয়ে উঠল না। তামসকুমার দেশলাই না চকমকি—পাথর কী একটা ঠোকাবামাত্র অদূরেই লোহা—বাঁধানো জুতোর আওয়াজের সঙ্গে বাজখাঁই গলার হাঁক শোনা গেল—'কৌন হ্যায়। বত্তি জ্বালাতা কৌন?'

চোখের পলক পড়তে—না—পড়তে তামসকুমার সেই হাঁক শুনেই রাণুকে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে টেনে দৌড়।

হোঁচট খেয়ে হাত—পা ছড়ে অনেকদূর গিয়ে যখন সে থামল তখন দুজনেই বেশ হাঁফাচ্ছে।

'আর একটু হলেই ধরে ফেলেছিল আর কী!' তামস বলল।

চালাক সেজে থাকা বুঝি আর চলে না। তবু কায়দা করে ব্যাপারটা জানবার ফিকিরে রাণু একটু বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলল, 'ধরে ফেলত! ধরে আর করত কী?'

'ধরে আর কী করত!' তামসকুমার সত্যি যেন স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'তুমি কি সব ভুলে গেছ নাকি? ধরলে জেলে পুরে দিত না! আমার কি আলোর লাইসেন্স আছে।'

'আলোর লাইসেন্স?' রাণুর মুখ দিয়ে আপনা থেকেই কথাটা বেরিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, আলোর লাইসেন্স নেবার মতো টাকা আমার কোথায়! এ তো আমার চোরাই আলো।'

রাণুর মুখ দিয়ে এবার আর কোনো কথা বেরোল না—সে সত্যি তাজ্জব বনে গেছে।

তামসকুমারই আবার বলল, 'শুধু আজকের জন্যে, কত কষ্টে যে এই চোরাই আলো জোগাড় করেছি, কী বলব।'

'কিন্তু আজকে—' রাণু কথাটা ইচ্ছে করেই শেষ করল না। এখনও সে একেবারে ধরা দিতে প্রস্তুত নয়।

'বাঃ, আজকেই তো শ্রাবণের অমাবস্যা—মহামহিমের অভিষেক তিথি তো আজই।'

'ওঃ, তাও তো বটে! ভুলেই গেছলাম।' নিজের মর্যাদা রাণু এখনও বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

'সেই কথাটাই ভুলে গেছলে? তাহলে এসেছ কী করতে?' তামসকুমার বেশ যেন ক্ষুণ্ণ।

কী করতে এসেছে তা কী ছাই সে নিজেই জানে! কিন্তু এসে যখন পড়েছে ব্যাপারটা না বুঝে সে যাবে না। আপাতত কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে রাণু বলল, 'আচ্ছা, আমারও তো চোরাই আলো একটা হলে হত। কোথায় এখন পাওয়া যায়, বল তো!'

তামস এবার উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'চোরাই আলো চাই? তা বলোনি কেন এতক্ষণ?' চোরাই আলোর অনেক আড্ডা আছে। তবে পুঁথি—পাড়াতে যাওয়াই সবচেয়ে সুবিধে।'

'কেন?' রাণু সোজাসুজি এবার জিজ্ঞেস করে ফেলল।

'ওদের আলো ভারি মজার। ফুঁ দিয়ে নেভে না, জলে ডোবালেও জেগে থাকে। আর লুকিয়ে নিয়ে বেড়াবার ভারী সুবিধে। চৌকিদাররা সহজেই চিনতে পারে না। তা ছাড়া ও আলোর কখনো ক্ষয় নেই। বিনা তেলেই যুগযুগান্ত জ্বলে। চল, ওই পাড়াতেই যাই।' তামস রাণুর হাত ধরে এগিয়ে চলল।

দু—পাশে আবছা সব বাড়ি অমাবস্যার অন্ধকারে যেন বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে! কোনোটা একেবারে অন্ধকার, কোনোটার বন্ধ জানালার ভেতর দিয়ে অতি ক্ষীণ একটু আলোর রেখা যেন ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছে।

এই অন্ধকারের ভেতর রাস্তার একটা মোড় ঘুরে হঠাৎ দূরে এক প্রকাণ্ড উজ্জ্বল ঝলমলে বাড়ি দেখে রাণু একবারে অবাক হয়ে গেল।

'ওটা কী?'

'বাঃ, ওটাই তো জেলখানা। এতদিন যেখানে যে—কেউ বে—আইনি আলো জ্বেলেছে। সকলের হয়ে আলো জ্বালবার অধিকারের জন্যে যারা লড়াই করেছে, সবাই ওই জেলখানায় বন্দি। সারাবছর ওরা নীরবে সব সয়ে যায়, শুধু বছরে এই একটিবার ওরা বিদ্রোহ করে। ও তো ওদের বিদ্রোহেরই আলো! দেখতে পাচ্ছ না, এরই মধ্যে জমাদারেরা সব নিভিয়ে ফেলছে। ও আলোর দিকে চাওয়াও যে অপরাধ।'

সত্যি! দেখতে দেখতে সে আলো নিভে গেল। আবার সেই জমাট অন্ধকার।

পুঁথি—পাড়ার দিকে বেশিদূর কিন্তু আর তাদের যেতে হল না। রাস্তার ধারে হঠাৎ একটা আলো তারা কুড়িয়ে পেল।

তামসকুমার তার হাতে আলোটা তুলে দিতে রাণু অবাক হয়ে বলল, 'এ আলো এখানে এমনভাবে পড়ে ছিল কী করে?'

'হয়তো কেউ ধরা পড়ার ভয়ে ফেলে গেছে, কিংবা কেউ হয়তো আমাদের মতো কারও হাতে পড়বার আশাতেই এ আলো এখানে রেখে গেছে। নিজের জীবন দিয়ে কতজন এমন আলোর আয়োজন করে রেখে যায় ভবিষ্যতের জন্যে।'

তামসের কথা শেষ হতে—না—হতেই দূরে মাঝ রাতের প্রহর বাজছে শোনা গেল। যেখানে যা সামান্য আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিল সব এবার একেবারে গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে। সঙ্গে সঙ্গে কাছেই কোথায় অশরীরী কণ্ঠে না বেতারে, বজ্রগম্ভীর ঘোষণা শোনা গেল—'জয় তিমিরেশ্বরের জয়, যিনি আদি, যিনি অনন্ত, যিনি শাশ্বত, সেই তিমিরেশ্বরকে আমরা প্রণাম করি।'

'হে আমার নিশুতিপুরের ভক্ত প্রজাবৃন্দ—'

রাণু ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, 'এ আবার কী ভাই?'

এই স্বর শুনেই তামসকুমার কীরকম যেন হয়ে গেছে।

কেমন যেন অভিভূতভাবে সে বলল, 'চুপ চুপ! মহামহিমের আহ্বান—বুঝতে পারছ না।'

রাণু হতভম্ব হয়ে একেবারে নীরব হয়ে গেল। মহামহিম তখন বলে যাচ্ছেন—'আমার অভিষেক—তিথির এই সাংবাৎসরিক উৎসবে তিমিরেশ্বরের পদতলে দাঁড়িয়ে সেই কথাই আবার আমি তোমাদের জানাই—আলোক আমাদের পরম শত্রু, আমাদের জীবনের অভিশাপ। সমস্ত অমঙ্গল, সমস্ত অশান্তি, সমস্ত বিপ্লব বিপর্যয়ের মূল—এই আলো। যার চোখ একবার আলোর স্পর্শ পেয়েছে, সমস্ত জীবন তার অভিশপ্ত—দেহ—মন তার চিরদিনের মতো বিষাক্ত, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আলোর তৃষ্ণায় জীবনে কোনোদিন সে আর শান্তি পায় না। আলোক—পিপাসার এই সংক্রামক ব্যাধি অন্যের মধ্যেও সে ছড়িয়ে দেয়।

আলোকের এই অমঙ্গল থেকে চিরদিন আমি তোমাদের রক্ষা করে এসেছি, চিরদিন রক্ষা করব। এখনও এদেশ সম্পূর্ণ নিরালোক করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু ভ্রান্ত, ধর্মভ্রষ্ট, সমাজদ্রোহী যে সমস্ত পাষণ্ড আলোকের মাদকতার দ্বারা ভুলিয়ে এই পরম শান্তি ও সুখের রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করতে চায়, তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে কোনোদিন আমি ত্রুটি করিনি। আমাদের একমাত্র উপাস্য, তিমিরেশ্বরকে প্রণাম করে আবার আমি বলি, চির—স্নিগ্ধ, চিরমধুর, চির—কল্যাণময় অন্ধকার আমাদের আচ্ছাদিত করে রাখুক, এ রাজ্য থেকে সমস্ত আলো নির্বাপিত হয়ে যাক।'

'জয়, তিমিরেশ্বরের জয়!'

'জয়, তিমিরেশ্বরের জয়!' বলে হঠাৎ তামসকুমারকে তার হাতের আলোটা ফেলে দিতে দেখে রাণু অবাক হয়ে বলে উঠল, 'ও কী করছ কী?'

তামসকুমার কাতরভাবে বলে উঠল, 'না, না, আমি পাপী, আমি পাষণ্ড। হে তিমিরেশ্বর, আমার অপরাধ তুমি মার্জনা কর।'

তামসকুমার সেইখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর কী! তার ঘাড় ধরে বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রাণু বলল, 'দেখতে পাচ্ছ, ওদিক দিয়ে কারা আসছে?'

'কারা আসছে?' তামস যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। অবাক হয়ে বলল, 'সত্যিই তো, ওই তো বিদ্রোহী আলোর মিছিল চলেছে পাহাড়ের ওপর তিমিরেশ্বরের মন্দিরে। অন্ধকার যাঁর চিরদিনের আবরণ সেই আদর্শনীয় মহামহিমকে ওরা স্বচক্ষে দেখবে। নিজের মুখে তাঁকে জানাবে নিজেদের নিবেদন।'

ফেলে—দেওয়া আলোটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সে আবার বলল, 'কিছু মনে কোর না ভাই, কিছুক্ষণ কেমন যেন বেহুঁশ হয়ে গেছলাম। মহামহিমের স্বর শুনলেই কেমন যেন আমার সমস্ত দেহমন অবশ হয়ে যায়। কিন্তু আর ভয় নেই—এই মিছিলে যোগ দিতেই তো আমরা এসেছি, চল!'

তারা কয়েক পা যেতে—না—যেতেই কিন্তু চারিদিকে ভয়ংকর কাণ্ড বেধে গেল। কোথা থেকে যমদূতের মতো বিশাল মিশমিশে কালো সব প্রহরী এসে আলোর মিছিলের ওপর নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব দল। একে একে সবাই বুঝি বন্দি হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত আলো যাচ্ছে নিভে।

রাণুর শরীরের ভেতর দিয়ে যেন একটা আগুনের শিখা লাফ দিয়ে উঠল। মিছিলের একজনের হাত থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল তুলে নিয়ে তামসকে টানতে টানতে ঝড়ের বেগে সে সমস্ত প্রহরীদের এড়িয়ে একেবারে সেই তিমিরেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে থামল।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। কিন্তু রাণুর আর তামসকুমারের গায়ে এখন যেন শত হস্তীর বল। দুজনের ধাক্কায় মন্দিরের দরজা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। মশাল হাতে মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ে এদিক—ওদিক চারিদিকে ব্যাকুল চোখ বুলিয়ে তারা অবাক। কোথায় বা তিমিরেশ্বরের মূর্তি, কোথায় বা মহামহিম! তাদের কোনো চিহ্নই নেই। শুধু কয়েকটা ধেড়ে ইঁদুর আলো দেখে সভয়ে চারিদিকে দুড়—দাড় করে ছুটে পালাল।

হঠাৎ একদিকে চোখ পড়তে তারা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না। আমসির মতো শুকনো আর কোলা ব্যাঙের মতো ধুমসো গুটি পাঁচেক লোক একদিকে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁপছে। তাদের কারও কাছে মুখে দিয়ে চেঁচাবার চোং, কারও হাতে পুজোর ঘণ্টা, কারও বা বাটখারা, কারও বা গায়ে শ্যামলা, কারও মাথায় ঝলমলে জরির পাগড়ি। রাণু আর তামসকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা কাঁপতে কাঁপতে চাদর সরিয়ে বেরিয়ে এসে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'দোহাই বাবা, আমাদের প্রাণে মেরো না, তোমরা যত খুশি আলো জ্বাল, আর আমরা কিছু বলব না। যত তেল লাগে কেনা দামে তোমাদের দেব!'

'ও, তোমরাই তা হলে এতদিন ফাঁকি দিয়ে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এসেছ! আচ্ছা, দাঁড়াও!'

কিন্তু সে কিছু করবার আগেই যমদূতের মতো সেই সব প্রহরীরা মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ে তাদের জাপটে ধরল। একজন রাণুর হাত থেকে মশালটা কেড়ে নিয়ে মন্দিরের জানলা দিয়ে নীচে ছুড়ে ফেলে দিল। অন্যেরা তখন পিছমোড়া করে তাদের বাঁধছে।

রাণু প্রাণপণে তাদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে উঠল, 'বুজরুকি, তোমাদের সব বুজরুকি আমি ফাঁস করে দেব।'

হঠাৎ নীচে থেকে তাকে নাড়া দিয়ে মামাবাবু বললেন, 'আরে পড়ে যাবি যে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে কুস্তি করছিস?'

রাণু ধড়মড় করে ওপরের বাঙ্কে উঠে বসল। আরে—কোথায় নিশুতিপুর, কোথায় তিমিরেশ্বর, আর কোথায় মহামহিম! সে তো মামাবাবুর সঙ্গে ট্রেনে মধুপুর যাচ্ছে।

কিন্তু নীচে ডানদিকের বেঞ্চিতে ওই চিমসে রোগা আর ধুমসো মোটা লোক দুটিকে চেনা—চেনা লাগছে না!

তিমিরেশ্বরের মন্দিরে এদেরই দেখেছিল না কি?

পাশের বাড়ি

লীলা মজুমদার

ইচ্ছে না হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া অবিশ্বাস করতে পার, স্বচ্ছন্দে বলতে পার আমি একটা মিথ্যাবাদী ঠগ জোচ্চোর। তাতে আমার কিছুই এসে যাবে না, যা যা ঘটেছিল সে আমি একশো বার বলব। আসলে আমি নিজেও ভূতে বিশ্বাস করি না।

বুঝলে, মার মেজো মাসিরা হলেন গিয়ে বড়োলোক; বালিগঞ্জে বিরাট বাড়ি, তার চারদিকে গাছপালা, সবুজ ঘাসের লন, পাতাবাহারের সারি। মস্ত—মস্ত শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো ঘর, তার সাজসজ্জা দেখে তাক লেগে যায়। তা ছাড়া মেজো মাসিদের ক্যায়সা চাল, হেঁটে কখনো বাড়ির বার হন না, জলটা গড়িয়ে খান না। কিন্তু কী ভালো সব টেনিস খেলেন, পিয়ানো বাজান। আর কী ভালো খাওয়া—দাওয়া ওঁদের বাড়িতে। আসলে সেই লোভেই আজ গিয়েছিলাম, নইলে ওঁদের বাড়িতে এই খাকি হাফপ্যান্ট পড়ে আমি! রামঃ!

যাই হোক, ওঁদের পাশের বাড়িটার দারুণ দুর্নাম। কেউ ওখানে পঁচিশ—ত্রিশ বছর বাস করেনি, বাগান—টাগান আগাছায় ঢাকা, দেয়ালে অশ্বত্থগাছ, আস্তাবলে বাদুড়ের আস্তানা। দিনের বেলাতেই সব ঘুপসি অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, আর তার উপর সন্ধেবেলায় নাকি দোতলার ভাঙা জানালার ধারে একজন টাকওয়ালা ভীষণ মোটা ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তার চেহারা নাকি অবিকল এখনকার মালিকদের ঠাকুরদাদার মতো দেখতে। অথচ সে বুড়ো তো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মরে—ঝরে সাবাড়! আর মালিকরা থাকে দিল্লিতে।

নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ ভয়ের চোটে কেউ আর ও—বাড়িমুখো হয় না। আমার কথা অবিশ্যি আলাদা। আমি ভূতে—টুতে বিশ্বাস করি না। রাতে একা অন্ধকারে ছাদে বেড়িয়ে আসি। সত্যি কথা বলতে কী ওই এক বেড়াল ছাড়া আমি কিছুতেই ভয় পাই না। শুধু বেড়াল দেখলেই কীরকম গা—শির শির করে।

যাই হোক, বিকেলে সকলে মিলে ওঁদের দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ার—টেবিলে বসে মাংসের শিঙাড়া, মুরগির স্যান্ডউইচ, ক্ষীরের পান্তুয়া, গোলাপি কেক আরও কত কী যে সাঁটালাম তার হিসেব নেই। কিন্তু তারপরেই হল মুশকিল। কোথায় এবার গুটিগুটি বাড়ি যাব, তা নয়। গান, বাজনা, নাচ, কবিতা বলা শুরু হল। হাঁপিয়ে উঠি আর কী! শেষটায় কি না আমাকে নিয়ে টানাটানি। আমিও কিছুতেই রাজি হব না! মা—র মেসোমশাই আবার ঠাট্টা করে বললেন, 'ওঃ গান—বাজনা হল গিয়ে মেয়েদের কাজ, আর উনি ভারি লায়েক হয়েছেন। আচ্ছা দেখি তো তুই কেমন পুরুষ বাচ্চা; যা তো দেখি একলা একলা ওই ভূতের বাড়িতে, তবেই বুঝব কত সাহস!' আর সবাই তাই শুনে হ্যা হ্যা করে হেসেই কুটোপাটি!

শুনলে কথা! রাগে আমার গা জ্বলে গেল, উঠে বললাম, 'কি ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? ভূত—ফুত আমি বিশ্বাস করি না। এই দেখ গেলাম।' বলেই বাগান পার হয়ে টেনে দৌড় মারলাম। এক মিনিটে পাঁচিল টপকে ওবাড়ি!

হাঁটু ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই মনে হল ভূত না মানলেও, কাজটা ভালো হয়নি। কীরকম যেন থমথমে চুপচাপ। দুষ্টু লোকদেরপক্ষেও ওইখানে লুকিয়ে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়।

যাই হোক টিটকিরি আমার কোনোকালেই সহ্য হয় না, কাজেই না এসে উপায়ও ছিল না। গুটিগুটি এগুলাম। তখনও একেবারে অন্ধকার হয়নি, একটু একটু আলো রয়েছে। দেখলাম দরজা জানলা ভেঙে ঝুলে রয়েছে, শ্বেতপাথরের সাদা—কালো মেঝে ফুঁড়ে বটগাছ গজিয়েছে, চারদিকে সাংঘাতিক মাকড়সার জাল।

তার উপর আবার কীরকম একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছে, ভাঙা দরজা জানলা খটখট করছে, মাকড়সার জাল দুলছে, দোতলা থেকে কী অদ্ভুত সব আওয়াজ আসছে মানুষ হাঁটার মতো, বাক্সপ্যাঁটরা টানাটানি করার মতো। অথচ মস্ত কাঠের সিঁড়িটা ভেঙে নীচে পড়ে আছে। এদিক দিয়ে ওপরে উঠবার জো নেই। চাকরদের ঘোরানো সিঁড়িও ভাঙা।

মিথ্যা বলব না, বুকটা একটু ঢিপঢিপ করছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে আবার বাইরে এলাম। এমন সময় দেখি চাকরদের সিঁড়িটার পাশেই একাট গাছ—ছাঁটা কাঁচি হাতে একজন উড়ে মালি। উঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তা হলে বাড়িটা একদম খালি নয়, জানলায় হয়তো ওকেই দেখা যায়, আঁকড়ে—মাকড়ে হয়তো দোতলায় ওঠে।

মালি কাছে এসে হেসে বলল, 'কি খোকাবাবু ভয় পেলে নাকি? আমার নাম অধিকারী, হেথায় কাজ করি।' আমি বললাম, 'দূর, ভয় পাব কেন? কিসের ভয় পাব? সে বলল, 'না ভয়ের চোটে কেউ আজকাল এই পাশে আসেই না, তাই বললাম।' আমি হেসে বললাম—'যাঃ, আমি ভূত—টুত বিশ্বাস করি না।' অধিকারী লোকটা ভারি ভালো, আমাকে সমস্ত বাড়িটা দেখাল। দুঃখ করতে লাগল কর্তারা আসে না, সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ঝাড়লণ্ঠনগুলো ভেঙে পড়ছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেহগিনি কাঠের আসবাবে সব পোকা ধরেছে, রোদে জলে মস্ত—মস্ত ছবিগুলোর রং চটে যাচ্ছে। বাস্তবিক কিছুই আর বাকি নেই দেখলাম। একা একজন মালি আর কত করতে পারে!

বাগানেও সব হিমালয় থেকে আনা ধুতরো ফুলগুলোতে আর ফুল হয় না, কুর্চিগাছ মরে গেছে, আমগাছে ঘুণ ধরেছে, বলতে বলতে অধিকারী কেঁদে ফেলে আর কী—'কেউ দেখতেও আসে না।'

শেষে উঠোনের কোণে ওর নিজের ঘরে নিয়ে গেল। পরিষ্কার তকতকে দাওয়ায় বসিয়ে ডাব খাওয়াল, ভাবছিলাম লোকেরা যে কি ভীতুই হয়! কী দেখে যে ভূত দ্যাখে ভেবে হাসিও পাচ্ছিল। তারার আলোয় চারদিক ফুটফুট করছিল। আমার পাশে বসে অধিকারী বলল, 'কেউ এ বাড়ি আসে না কেন বল দিকিনি? সেকালে কত জাঁকজমক ছিল। গাড়িতে গাড়িতে ভিড় হয়ে থাকত, গাড়োয়ানরা, সইসরা এখানে বসে ডাব খেত, তামাক খেত, চারদিক গমগম করত।' আমি তাকে বললাম, 'ওরা বলে কি না এ বাড়িতে ভূত আছে তাই ভয়ের চোটে আসে না।' শুনে অধিকারী বেজায় চটে গেল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভূত? এ বাড়িতে আবার ভূত কোথায়? নিজের বাড়ির জানলায় বড়োকর্তা নিজে দাঁড়ালেও লোকে ভূতের ভয় পাবে? বললেই হল ভূত! আমি তোমাকে বলছি খোকাবাবু, একশো বছর ধরে এবাড়ির কাজ করছি, একদিনের জন্যও দেশে যাইনি, কিন্তু কই একবারও তো চোখে ভূত দেখলাম না?' বলে একবার চারদিকে চেয়ে বলল, 'যাই, আমার আবার চাঁদ উঠবার পর আর থাকবার জো নেই।' বলেই, সে তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, লোকটা আমার চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। দেশলাই কাঠিতে ফুঁ দিলে আগুনটা যেমন মিলিয়ে যায়, ঠিক সেইরকম করে। চারদিকে বাতাস বইতে লাগল, দরজা—জানালা দুলতে লাগল, পুবদিকে চাঁদ উঠলে লাগল, আর আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ভাঙা সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই দেখ এখনও হাঁপাচ্ছি।

চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখা

আশাপূর্ণা দেবী

আগ্রা স্টেশনে নেমেই ঘনরামবাবু এদিক—ওদিক তাকিয়ে দূরে বসে থাকা একটা টাঙাওয়ালাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

সাঁটু তো হাঁ।

এ কী মামা! এতো ট্যাক্সি থাকতে ওই বিচ্ছিরি গাড়িটাকে ডাকছ কেন?

ঘনরামবাবু ভাগ্নের দিকে একটু ঘনগভীর দৃষ্টি ফেলে বললেন, আগ্রায় এসে ট্যাক্সি? কেন? কলকাতায় ট্যাক্সি চড়ার অভাব আছে? গাড়িটা বিচ্ছিরি হল কিসে?

সাঁটু হাত ওলটালো, কিসে নয়? বডিটা ভাঙা ঝরঝরে, ঘোড়াটা মড়াখেকো, ঘোড়ার সাজগুলো 'ভাঙা লোহা বিক্কিরিও' ছোঁবে না, আর টাঙাওয়ালার গায়ে চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচার গন্ধ।

সাঁটুর কথা মিথ্যে নয়, টাঙাটা এসে পৌঁছবার আগেই টাঙাওয়ালার গন্ধ এসে পৌঁছে গেছে। ভাগ্যিস সাঁটুর পকেটে সেন্ট লাগানো রুমাল ছিল! তাই না খানিকটা রক্ষে পেল সাঁটু। রুমাল চাপা নাকে সাঁটু বলল, মামা, মনে হচ্ছে ওর গাড়ি ঘোড়া সাজসজ্জা সবকিছু সাজাহানের আমলের। জানি না, মানুষটাও তাই কিনা?

ঘনরামবাবু তাতে উৎসাহ বাড়ে বই কমে না। ঠিক! ঠিক এই দেখেই আমি ওকে চয়েস করলাম। হিস্টোরিক্যাল স্পট দেখতে হলে, তার অ্যাটমোসফিয়ারটাও পাওয়া দরকার। যতটা পাওয়া যায়। নে উঠে পড়।

উঠে পড়া ছাড়া গতিই বা কী? ইত্যবসরে টাঙাওয়ালা মামা—ভাগ্নের মালপত্র সব টাঙাজাত করে ফেলেছে। চেহারাটা তার নিজের ঘোড়ার মতোই মড়াখেকো হলেও গায়ে বিলক্ষণ জোর আছে। চটপট তুলে ফেলল সব।

অগত্যাই উঠে পড়ে সাঁটু বলে, 'একঠো আচ্ছা বলা হোটল মে লে যাও গাড়োয়ান।'

সাঁটুদের ইস্কুলে হিন্দি 'অবশ্যপাঠ্য', অতএব 'আচ্ছা বালা টালা' বেশ শিখে ফেলেছে সাঁটু।

কিন্তু সাঁটু তার মামাকে এখনো পড়েশুনে শিখে ফেলতে পারে নি। ধারণাই করতে পারে নি মামা আরও উচ্চাঙ্গের হিন্দিতে বলে উঠবেন, হোটেল? আচ্ছাবালা? আ, ছি ছি! তাজমহল দেখনেসে আয়েগা হোটেল? নেহি নেহি টাঙাওয়ালা, তুম একঠো বহোৎ পুরানা বালা ধরমশালামে লে কে চলো। বহোৎ পুরানা! সমঝা?

জী!

টাঙাওয়ালা ছপাৎ করে ঘোড়ার পিঠে ছপটি লাগায়। ঘোড়া তড়বড়িয়ে ছুটতে শুরু করে।

সাঁটুর মনে হয় এক্ষুনি উলটে—পালটে তালগোল পাকিয়ে দুই মামা—ভাগ্নের আগ্রার মাটিতেই সমাধি রচিত হবে। কী সাংঘাতিক ঝাঁকুনি। হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে গেল।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর মামা যখন বলেছিল, 'এখন তো লম্বা ছুটি, আর আমার অফিস থেকে চিরছুটি হয়ে গেল, চল কোথাও বেড়িয়ে—টেরিয়ে আসি।' তখত আহ্লাদে প্রাণ নেচে উঠেছিল সাঁটুর। আহা, মামা না দেবতা। মামার মুখে তখন সাঁটু দিব্যজ্যোতি দেখতে পেয়েছিল, মাথার পিছনে আলোর চাকতি।

তা ছাড়া, সবে রিটায়ার করে অফিস থেকে টাকার বান্ডিল নিয়ে বেরিয়েছে মামা।

সেটাও রোমাঞ্চকর।

শুনে অবধি মনে মনে সাঁটু ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনের কামরার গদি আঁটা সিটে বসে হিল্লি—দিল্লি ঘুরেছে, ভালো ভালো হোটেলের ঘরে থেকেছে, ট্যাক্সি চেপে শত শত মাইল পাড়ি দিয়েছে আর দিন গুনেছে। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে এসে দেখল, মামা কুলিদের হাঁ—হাঁ করে বলছেন, 'নেহি নেহি। ফাস্টো কিলাস মে নেই হ্যায়।'

অনেক যুদ্ধ করে অবশেষে একটা থার্ডক্লাস কামরায় বসে পড়ে ঘনরাম তাঁর ভাগনে সীতারামের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললেন, 'থার্ডক্লাস রেলে না—চড়লে বেড়ানোটা ঠিক এনজয় করা যায় না বুঝলি? স্টেশনে স্টেশনে ভাঁড়ের চা খাবো, খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে চিনেবাদাম খাবো, কৌটো খুলে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা লুচি আলুচচ্চড়ি খাবো, তবে না বেড়ানো। ...স্টুডেন্ট লাইফে এরকম কত বেড়িয়েছি। কিন্তু এই তাজমহলটি দেখা হয়নি। মামা—ভাগ্নেতেই দেখা যাবে। 'প্রাতে তু ষোড়শ বর্ষে ভাগ্নে মিত্র বদ সম।'

কী আর করবে সাঁটু? জিজ্ঞেস করতেও সাহস হল না 'বদ সম' মানে কী মামা?

তবু ভরসা ছিল রেলগাড়ির 'থার্ডক্লাস'ও এনজয়টা করে নিয়ে মামা পরবর্তী ভারটা সাঁটুর ইচ্ছের ওপরেই ছেড়ে দেবেন। হায় ভগবান!

শুধু ধর্মশালা নয়, আবার 'বহোৎ পুরানা' ধরমশালা!

হাড়গোড়গুলো নাচতে নাচতে এক সময় যখন নাচেতেই রপ্ত করে ফেলেছে, তখন সাঁটু বেজার মুখে বলে উঠল, মামা, পুরোনো ধর্মশালা কেন?'

কেন?

ঘনরাম উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন, 'কেন তা বুঝতে পারলি না? ভ্যাপসা ভ্যাপসা পুরোনো পুরোনো বাড়ির আবহাওয়াটা আমাদেরকে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে নিয়ে যাবে। মনে হবে যেন নূরজাহানের কালেই রয়ে গেছি। আমরা যখন তিন বন্ধুতে বৃন্দাবনে গেছিলাম—'

'মামা, নূরজাহান কেন?'

ঘনরাম ভুরু কুঁচকে বলেন, 'নূরজাহান কেন কী রে? যাঁর জন্যে তাজমহল, তাঁকেই মনে পড়ছে না?'

সাঁটুর মেজাজ খারাপ তাই হেসে ফেলে না, বেজার মুখেই বলে, 'তাজমহল বানানো হয়েছে নূরজাহানের জন্যে নয়, মমতাজ বেগমের জন্যে।'

ঘনরাম বিচলিত হন না, অগ্রাহ্যভরে বলেন, 'ও একই কথা? যার নাম ভাজা চাল, তার নামই মুড়ি।' ...এই টাঙাওলা, কিধারসে লে যাচ্ছো ভাই? এৎনা ঘুমতে ঘুমতে—

টাঙাওয়ালা আবার ঘোড়ার গায়ে ছপটি লাগায়। আবার ঝাঁকুনির চোটে তোলপাড়। তার মধ্যেই টাঙাওয়ালা হড়বড়িয়ে যা বলে তা থেকে আন্দাজে বোঝা যায়, পুরোনো জায়গায় যেতে হলে গলি ঘুঁজি তো ঘুরতেই হবে। ঘনরাম যা চান তাই জুটিয়ে দেবে।

ক্রমশই বোঝা যায় লোকটা সত্যভাষী! ঘনরাম যা চেয়েছিলেন তাই পাইয়ে দিল সে। গলির পর গলি, তারপর গলি! দিনে বাতি নিয়ে পথ হাঁটতে হয়। এই রকম বিদঘুটে বিদঘুটে সব গলি পার হয়ে টাঙাওয়ালা একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে গলার ঘাম মুছতে মুছতে জানাল, গাড়ি আর ভিতরে ঢুকবে না, থোড়া হেঁটে যেতে হবে।

ঘনরাম নিজে নেমে পড়ে বললেন, সাঁটু নাম।

সাঁটু ভয়ে ভয়ে মামার পাঁজর চেপে ধরে বলে, মামা, এর মধ্যে থাকতে হবে?

ঘনরাম উল্লাসিত গলায় বলেন, এই তো মার্ভেলাস জায়গা রে! লোকটাকে বকশিস করতে হবে। কী রকম একখানা আবিষ্কার! মনে হচ্ছে পাঁচশো বছর পিছনে চলে গেছি। কেমন একখানা ভ্যাপসা ভ্যাপসা স্যাঁতা স্যাঁতা গন্ধ, কেমন জরাজীর্ণ সব দেওয়াল। বাড়িগুলোর দরজা—জানালা দেখেছিস? যেন ঐতিহাসিক চিত্র দেখেছিস! আধুনিক সভ্যতার কোনো ছোঁওয়াচ পায় নি। নাঃ, বাস্তবিক একটা জায়গা বটে। তোদের সত্যজিৎ রায় এ—রকম জায়গার সন্ধান পেলে লুফে নেবে।

কিন্তু সাঁটু কি সত্যজিৎ রায়?

আশ্চর্য, এ—রকম জায়গায়ও জায়গার অভাব।

ঘর খালি নেই।

অন্ধকার একটা প্যাসেজ পার হয়ে একখানা চৌকো উঠোন মতো জায়গায় পড়ে দেখা গেল, সেটাকে ঘিরে চারিদিকেই দোতলা ঘরের সারি, এবং সেই চৌকোটুকুর মাথায় যেখান থেকে আকাশটা এই ঘুটঘুটে বাড়িটার দিকে একটু উঁকি মারতে পারে, সেইখানটায় তারের জাল চাপা। বোধ হয় বাঁদরের প্রবেশাধিকার রোধ করতে। তা সেটা হয়তো রোধ হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে আকাশের চোখ ফেলাও রোধ হয়েছে। কারণ তারের জালের উপর অনন্তকালের ঝড়ে উড়ে এসে পড়া শুকনো পাতা, ময়লা কাগজের টুকরো, ছেড়া চুলের নুটি এবং তাদের সঙ্গে লম্বা হয়ে নেমে আসা দড়া দড়া ঝুল, প্রায় ঢালাই ছাদের কাজ করছে। অবধারিত যে বৃষ্টি পড়লে এ উঠানে জল পড়ে না।

* * *

ঘেরা দাওয়ার ওপর যে সারি সারি ঘর, তার প্রত্যেকটির দরজায় একটি করে সিঁদুর মাখা গণেশের ছাঁচ তোলা। ধর্মশালার প্রতিষ্ঠাতা নিশ্চয়ই গাণপত্য ছিলেন।

কিন্তু একী দরজা রে বাবা!

লম্বা লোক তো দূরের কথা, নিতান্ত বেঁটে লোককেও মাথা নীচু করে ঘাড় হেঁট করে ঢুকতে হবে। ... আর তার প্রস্থ?

মনে মনে হেসে ফেলে সাঁটু।

এখানের বিশাল ভুঁড়িদার সব লোকেরা কী করে ঢোকে? কোনো দরজাটাই তো দু—ফুটের বেশি চওড়া নয়। অথচ ঘরগুলো সবই মানুষে ভরতি এবং বিশাল ভুঁড়িদার মানুষেই।

ধর্মশালার কেয়ারটেকার ঘনরামকে আর সাঁটুকে নিয়ে দরজায় দরজায় উঁকি মেরে মেরে খোঁজ নিতে থাকে কোনো ঘর খালি আছে কিনা, কিন্তু নেই, নেই। এই অন্ধকূপ মার্কা ঘরগুলোও জমজমাট। ঘরের মেঝেয় ছড়ানো চকচকে করে মাজা পেতলের ঘটি কাঁসি থালা গামলাদের নিজস্ব আলোতেই বোঝা যাচ্ছে এর মধ্যে ঘর গেরস্থালি বসে গেছে।

জিজ্ঞেস করতে করতে একটি মহিলা একটা হাত হাতে নিয়ে দরজার কাছে সরে এসে খিঁচিয়ে উঠে বললেন, কিঁ ওঁ?

টাঙাওয়ালার ঘাড়ে বিছানা, হাতে সুটকেস, সেই অবস্থাতেই কাতর গলায় বলল, 'রুম হ্যায়?'

রুম?

মহিলা চোখ ছানাবড়া করে অদ্ভুত কৌশলে পাশ ফিরে দু—মণী ভুঁড়িটাকে কেৎরে বার করে নিয়ে সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে বাজখাঁই গলায় বলে উঠলেন, রুম!!

চোখ বিস্ফারিত, আঁচল বিদলিত।

সাঁটু কাতর বচনে চুপি চুপি বলে, মামাগো এখান থেকে বেরিয়ে চলো। এখানে কখনো থাকা যায়?

ঘনরাম তখন মহানন্দে অট্টালিকাটির প্রাচীনত্ব নিরীক্ষণ করছেন চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে।

আহা! নির্ঘাত বাবরের আমলের বাড়ি।

দেয়ালে দেয়ালে কী চমৎকার ভূষো পড়া পড়া কুলুঙ্গী! যেন শত শত বছর ধরেত ওর মধ্যে প্রদীপ বসিয়ে বসিয়ে রেখে জ্বালা হয়েছে। পাথুরে ইটের দেওয়াল, কিন্তু কী পাতলা পাতলা ইট। এত পাতলা পাথুরে ইটের চলন ছিল কোন যুগে? —ভাবছেন ঘনরাম।

ভাগ্নের কথায় চমকে উঠে বলেন, 'বলিস কী? এমন একখানা জায়গা আবিষ্কার করে তাকে ত্যাগ করে চলে যাব? পাগল না খ্যাপা! এ বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাস! বাতাসে বাতাসে হারিয়ে যাওয়া—'

'মামা, বাতাস কোথায়?'

'ওই হল বাবা! সব কথায় তোর ইয়ে। ... মেনেজার দাদা, একঠো কামরা হামকো জরুর দে দেগা ভাই! আপকো খৈনি খানেকো কিছু দিয়ে দেব।'

'কেয়া বোলতা?'

ম্যানেজার অথবা কেয়ারটেকার রেগে বলে ওঠে, 'ই ধরমশালা হ্যায় জনতা নেই?'

টাঙাওয়ালা ক্রমশ অধৈর্য হয়, হড়বড় করে কী সব বলে, ম্যানেজারের সঙ্গে কী যেন রফা হয়, তারপর বলে, 'চলিয়ে।'

এবার ওই সারিরই একটা কোণের দিকের খালি ঘরে নিয়ে যায়, মালপত্তর নিয়ে ঢুকিয়ে ফেলে সেই ঘরের মধ্যে। অবশ্য তাকে যদি 'ঘর' বলা হয়। জানালা বলে কোনো বস্তু নেই, পিছনে দেওয়ালে শুধু গোটাকয়েক ঘুলঘুলি। সামনের দুফুট বাই সাড়ে তিন ফুট দরজাটি বন্ধ করলে শুধু ওই ক—টিই ভরসা।

মেজেটা যে একদা কিসের ছিল জানবার উপায় নেই, বোধ হয় পাথরেরই তবে সবটাই ক্ষতবিক্ষত।

টাঙাওয়ালা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কথাবার্তায় বোঝা গেল এই ঘরটুকুই মাত্র খালি আছে, ম্যানেজারের নিজের। নেহাতই সাঁটু কোম্পানির বিপদগ্রস্ত অবস্থা দেখে এঁরা দয়া করে—

ঘনরাম বিশুদ্ধ হিন্দিতে বললেন, চমৎকার, চমৎকার। আমরা দুজনই তেমন লম্বা নই, একটু পা গুটিয়ে শুলেই যাবে। কী বলিস সাঁটু? তবে অ্যাডভেঞ্চারটা তো জব্বর হবে।

সাঁটু এর উত্তরে বলে, 'মামা, কিছু খাওয়া—দাওয়া হবে?'

'খাওয়া!'

ঘনরাম চমকে ওঠেন, 'এখন খাওয়া কীরে? আগে তাজমহল দেখে আসি।'

'এখন? এই বেলা বারোটার সময় তুমি তাজমহল দেখবে?'

ঘনরাম বললেন, আরে বাবা, একী দেখার মতো দেখা? যাকে বলে 'ঝাকি দর্শন!' যেমন পুরী গিয়ে ধুলো পায়ে জগন্নাথ দর্শন করতে হয়। ওহে টাঙাওলা, 'ফিন হামকোদের লে চলো বাবা। আভি তাজমহল দেখেগা।'

'আভি? আভি তাজমহল দেখেগা।'

লোকটা ভাঙা গলায় হো—হো করে হেসে ওঠে।

ঘনরাম কিন্তু দমেন না, আত্মস্থ গলায় বলেন, 'আরে বাবা, তাজ কো তো বহোৎ দফা দেখনে হোগা। দিনে ভি রাতে ভি, সানলাইটে ভি। চলিয়ে চলিয়ে।'

ঘনরাম পকেট থেকে একটা তালাচাবি বার করে দরজাটায় লাগাতে গিয়ে দেখেন, দরজায় কড়াও নেই শেকলও নেই। তাহলে?

তাহলে আর কী? চেপে ভেজিয়ে রেখে চলে যাওয়া ছাড়া কী করার আছে?

সাঁটু চুপি চুপি বলে মামা, টাকাগুলো সুটকেস থেকে বার করে সঙ্গে নিলে হত না?

ঘনরাম আরও চুপিচুপি বলেন, এমন নইলে বুদ্ধি। টাঙাওয়ালাটা প্যাটপেঁটিয়ে তাকিয়ে আছে না? বার করে নিয়ে ওর টাঙায় গিয়ে উঠি, আর ও খানিকদূর গিয়ে ছোরা বসিয়ে কেড়েফেড়ে নিক!

শুনে সাঁটুর বুকের মধ্যে গুর গুর করতে থাকে, সাঁটুর মাথা ঝিমঝিম করে। সাঁটু একলা কলকাতায় ফিরে যাবে সাঁটুর আর মামার সঙ্গে ভ্রমণে দরকার নেই।

* * *

আবার সেই গলির গোলকধাঁধা।

আবার সেই ডাইনে আর বাঁয়ে—বাঁয়ে আর ডাইনে। কোনো কোনোখানে টাঙার দু—পাশ দু—ধারের বাড়ির গায়ে ঘষটে গিয়ে এমন ঝনঝন ঝড়াং শব্দ হচ্ছে যে প্রাণের মধ্যে হাঁকপাক করে উঠছে সাঁটুর।

* * *

অবশেষে বড়ো রাস্তায় পড়া গেল।

তারপর কত কত রাস্তা ঘুরুনি খেয়ে তাজমহল।

কিন্তু এখন কে পাবে ঢুকতে? এই দুপুর রোদ্দুরে? গেট বন্ধ। খোলা হবে বেলা চারটেয়।

মামা, ততক্ষণের মধ্যে তো আমাদের খেয়ে নিলে হত! পেটের মধ্যে যে ইঞ্জিন চলছে। কাতর ক্রন্দন সাঁটুর।

ঘনরামের এতক্ষণে চমক ভাঙে। বলেন, ও হ্যাঁ, তাই ভালো। কিন্তু চান—টান না করে—

চান কোথায় করবে?

ঘনরাম বলে ওঠেন, কেন ধর্মশালায়? সেখানেই তো তেল সাবান তোয়ালে সব। এই টাঙাওয়ালা ভাই—

সাঁটু এবার আর পারে না, রেগে উঠতে গিয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলে। মামা! আবার সেখানে? আমায় কলকাতা যাবার রেলে চাপিয়ে দাও। আর বেড়াতে চাই না।

কেন? কেন? কী হল?

ঘনরাম অনুতপ্ত অথচ ছেলেভোলানো গলায় বললেন, সেরেছে। খুব খিদে পেয়ে গেছে তাই না? তবে বাবা চল, শুধু হাত—মুখ ধুয়েই কোনো হোটেল থেকে খেয়ে নিই। সে—রকম জল পাওয়া যাবে বোধ হয়? অ্যাঁ?

* * *

কিন্তু টাঙাওয়ালা আর এক পাও যেতে নারাজ। চেঁচামেচি করে যা বলে তার অর্থ, এ—রকম বোকা সওয়ারি সে জীবনে দেখে নি। ইচ্ছে করে পচা পুরোনো ধর্মশালায় গিয়ে ওঠে, চান খাওয়া না করেই আবার বেরোয়, ফের আবার গাড়ি চড়াতে বলে। ওঃ, পাগল না কি? তাকে নগদ পঞ্চাশটি টাকা গুনে দেওয়া হোক, সে চলে যাবে।

পঞ্চাশ টাকা!

ঘনরাম রেগে কাঁই। মগের মুলুক পায়েগা? পঞ্চাশ রুপেয়া খোলামকুচি হ্যায়?

কিন্তু কতটুকু চেঁচামেচিই বা ঘনরাম করতে পারেন? কতই বা দম তাঁর?

রোগা হাড়গিলে টাঙাওয়ালাটি মস্তানদের ফাংশানের 'ওপনিং সঙের মাইক'—এর ভূমিকা নেয়, এবং পুরো পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে তবে ছাড়ে। তবু ঘনরাম তাকে খোসামোদ করেন একটা 'খানেবালা' হোটেলে নিয়ে যাবার জন্যে। না হয় তাকেও খাইয়ে দেবেন।

অগত্যাই গজগজ করতে করতে আবার গাড়িয়ে ওঠে সে। মামা—ভাগ্নেও। আর উঠে বসেই আসল সমস্যা ফাঁস করে বসেন ঘনরাম। তুই তো এক মস্ত ফ্যাসাদ বাধালি সেঁটো! এখন কী হয়?

আমি? আমি আবার কী ফ্যাসাদ বাধালাম?

সাঁটু উত্তেজিত।

আহা, তুইই তো চান করতে ধর্মশালায় ফিরতে চাইলি না। অথচ টাকাপত্তর সেখানে পড়ে। পকেটে যা ছিল সব তো টাঙাওয়ালা ব্যাটা সব ফরসা করে দিল।

তার মানে পেটও ফরসা রাখতে হবে।

শুনে সাঁটুর ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হয়। চোখ দিয়ে প্রায় জল গড়িয়ে পড়ে।

ঘনরাম বলেন, আহা, থাক, থাক, হচ্ছে। তা তোর কাছে কিছু আছে—টাছে? পরে দিয়ে দেব বাবা, থাকে তো দে! নাকি সেও সুটকেসে?

এ কথা শুনেও সাঁটুর মুখ শুকিয়ে যায়।

'আছে' বলতেও কষ্ট, 'নেই' বলতেও বিবেকের কামড়। আসার আগে মা পঞ্চাশটি টাকা দিয়েছিলেন ইচ্ছে মতন হাত খরচ করবার জন্যে।

বলেছিলেন মামা সবই করবেন জানি, তবু নেহাত কিছু ইচ্ছে হলে—

মলিন মুখে বলে, কাছেই আছে।

কত টাকা?

পন চা—স।

ওঃ, তাতেই হবে, তাতেই হবে

ঘনরাম মহোৎসাহে সাঁটুর টাকাটা নিয়ে হোটেলে তিনজনের খাবারের অর্ডার দেন এবং তিন দশে তিরিশ টাকার রুটি, মাংস আর ডাল খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বললেন, চল, এবার ফেরা যাক। আবার তো সন্ধের আগেই বেরুতে হবে। চাঁদের আলোয় না দেখলে তো তাজ দেখাই বৃথা।

* * *

কিন্তু আর কে নিয়ে যাবে?

সে টাঙাওয়ালা তো খেয়ে—দেয়ে লম্বা দিয়েছে।

ঘনরাম বলেন, গেল তো বয়ে গেল, সে ব্যাটা তো, গলাকাটার ছুরি। টাঙার অভাব আছে নাকি? ওই তো ওখানে দুটো দাঁড়িয়ে।

কথাটা ঠিক এই 'হোটেল গুলবাগ'—এর কাছেই টাঙার স্ট্যান্ড।

* * *

মামা তুমি রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

ঘনরাম বুক পকেটে একটু হাত চাপড়ে আত্মস্থ গলায় বলেন, চেনাবার চাবিকাঠিটি সঙ্গে আছে রে বাবা! তোর মামার চারদিকে চোখ—কান। ম্যানেজার না কেয়ারটেকার, তার কাছ থেকে ঠিকানাটি লিখিয়ে নিয়েছি।

* * *

হ্যাঁ, হুঁশিয়ার ঘনরামবাবু ঠিকানাটি লিখিয়ে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ঠিকানা পড়বে কে? টাঙাওয়ালা? একটির পর একটি টাঙাওয়ালা ধরেন, তারা কাগজটা দেখে অথবা না দেখে অবজ্ঞাভরে চলে যায়। ময়লা ময়লা এক টুকরো কাগজে 'কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং' অক্ষরগুলো যেন ঘনরামের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ হাসি হাসে।

* * *

পথচারী লোক, হোটেলের মালিক থেকে চাকর পর্যন্ত কাউকে দেখাতে বাকি রাখলেন না ঘনরাম সে কাগজ। কিন্তু নাঃ, কোনো কাজ হল না। কেউ পাঠোদ্ধার করতে পারল না।

ওদিকে বিকেল পড়ে এসেছে, আর একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। আকাশে চাঁদ উঠবে।

ঘনরাম বীরদর্পে বলেন, ঠিকানা কেউ না পড়তে পারুক, পুলিশকে দিয়ে পড়াব। পুলিশ শহরের সব রাস্তা চিনতে বাধ্য। এখন চাঁদ উঠতে না উঠতে তাজে পৌঁছে যাই চল।

আগে কখনো সাঁটু মামার কথার প্রতিবাদ করত না, কিন্তু মামার সঙ্গে তাজ দেখতে এসে সাঁটুর স্বভাব বদলে যাচ্ছে। সাঁটু বিদ্রোহের গলায় বলে ওঠে, মামা, তাজমহল তো পালিয়ে যাচ্ছে না! কাল দেখা হবে। আমাদের তো সাত দিন থাকার কথা!

কাল!

ঘনরাম হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলেন, ইয়াং ছেলে হয়ে এই বললি সাঁটু? আজ এসে তাজ দেখবি কাল? ফার্স্ট নাইটেই যদি না দেখলি তো বিবেককে কী জবাব দিবি? বন্ধুবান্ধবকে কী বলবি? আর রাতে ঘুম হবে কী করে?

তোমার ওই সাধের ধর্মশালার ঘরে ঘুম তো হবে না মামা। এদিকে আমার তো দারুণ বাথরুম পেয়ে গেছে!

ঘনরাম অবাক গলায় বলেন, তা সেইখানে তুই বাথরুমের আশা করছিস? বাবরের আমলে কেউ 'বাথরুম' শব্দটা শোনে নি বাপ! ও এখন সামলে থাক, পরে যা হয় হবে।

ঠিক আছে। গিয়ে যখন দেখবে জিনিসপত্তর সব চুরি হয়ে গেছে দেখবে মজা!

চুরি!

ঘনরাম হা—হা করে হেসে ওঠেন, চোরের ঠাকুরদার সাধ্যি আছে ওই গোলকধাঁধা পার হয়ে চুরি করে পালাবে?

বাইরের চোর কেন? ওরাই চুরি করবে।

ঘনরাম আহত হন ভাগ্নের নীচ কথায়।

বলেও ফেলেন, ছি ছি সেঁটো, এ—রকম মীন মাইন্ডের মতো কথা বললি? জায়গাটা 'ধর্মশালা' তা মনে রাখিস! দেখলি খৈনি খেতে বকশিশ পর্যন্ত নিল না!

সাঁটু মনে মনে গজগজ করে, তা নেবে কেন। একেবারে যথাসর্বস্বই নেবে তো! চেনা নেই, জানা নেই, চাবি পর্যন্ত দেওয়া নেই, সেইখানে সাঁটুর যথাসর্বস্ব পড়ে। আসার আগে দু—দুটো ভালো ভালো প্যান্ট করানো হয়েছে, দু—তিনটে শার্ট কেনা হয়েছে। তা ছাড়া তোয়ালে, জীবনে যা কখনো ব্যবহার করতে পায়নি সাঁটু। গামছাতেই জীবন কাটছে।

সব থাকবে সাঁটু, সব থাকবে। ঘনরাম বলেন, কবি কালিদাসের সেই কবিতাটি পড়িস নি? 'তোমার মহা বিশ্বে কিছু হারায় না কো কভু—', চল বাবা, চল, চাঁদ উঠে গেল।

সাঁটু ঠিক করেছে আর মামার কথার প্রতিবাদ করবে না। কবি কালিদাসেরও না।

অতএব আবার একটা টাঙাওয়ালাকে ডেকে উঠে পড়েন ঘনরাম। বলেন জোরে চালাতে। বলেন, তাজমহল মে জায়েগা। রাস্তা জানতা হ্যায়?

টাঙাওয়ালা অবজ্ঞার ভাবে ঘোড়ার পিঠে ছপটি মারে।

না, এমন কোনো টাঙাওয়ালা নেই আগ্রায় যে তাজের রাস্তা চেনে না।

* * *

চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখলেন ঘনরাম!

ঘাসের ওপর বসে, চত্বরের ওপর উঠে দূর থেকে, কাছে থেকে। দেখেন আর বলতে থাকেন, সেঁটো দেখেছিস? সেঁটো দেখেছিস? আহা, এতো দিনে সেই গানটার মানে বুঝতে পারছি, 'তাজমহলের মর্মরে গাঁথা কবির অশ্রুজল।' আরও একটা কী ছিল, 'নেমে এল শুভ্র মেঘের দল' না কি। আহা! সেঁটো বুঝতে পারছিস কেন আমি পুরোনো ধর্মশালা চেয়েছি। এই দেখার পর হোটেল বাড়ির চড়া আলো, কড়া অ্যাটমোসফিয়ার আর আধুনিক প্যাটার্নের মধ্যে গিয়ে পড়ে এই দেখার রেশটুকু মনে ধরে রাখতে পারা যাবে? সব রেশ মুছে যাবে। ধর্মশালার সেই ঘরখানা ভাব? মিটমিটে বাতি জ্বেলে শুয়েছি, মনে হবে সেই সাজাহান নূরজাহানের আমলে পৌঁছে গেছি।

মামা, নূরজাহান নয়, মমতাজ।

আচ্ছা বাবা, তাই, তাই।

ঘনরাম বলেন, তা সাজাহান'টা তো আর ভুল নয়? 'কালের কপালতলে সাদা সমুজ্জ্বল, এক ফোঁটা নয়নের জল! ওঃ, কী লাইন! অবিস্মরণীয়!'

ঘনরাম ভাবগম্ভীর মুখে তাকান ভাগ্নের দিকে, পড়েছিস এ কবিতা? ভারতঈশ্বর সাজাহান?

হ্যাঁ, পড়েছি।

সাঁটুও গম্ভীর গলায় বলে, 'কপাল' নয় মামা, কপোল, 'সাদা' নয় শুভ্র, 'ফোঁটা' নয় বিন্দু।

হয়েছে বাবা, হয়েছে। সব সময় পড়া ধরা। ভবিষ্যতে মাস্টারি তোর উপযুক্ত পেশা হবে। যাক, এইবার ওঠা যাক। তুই যা ব্যস্ত হয়েচিস। নইলে এই দৃশ্য ছেড়ে কি আর উঠে যেতে ইচ্ছে করে রে?

রাত্তিরে খাওয়ার প্রশ্ন নেই।
ঘাসের ওপর বসে থাকা ঘুঘনিওলার কাছ থেকে এক পেট করে ছোলার ঘুগনি নেওয়া হয়েছে।
এখন টাঙা।
গেটের বাইরে অনেক টাঙা। সারি সারি।
ভাঙা আস্ত। রংদার, রংজ্বলা।
টাঙাওয়ালাও জোয়ান, মাঝারি, বুড়োহাবড়া।
ঘনরাম প্রসন্ন হাসি হাসেন, এরা এই ঠিকানটা ঠিক বুঝবে।
কিন্তু কোথায়?
কেউ বুঝতে পারে না, মাথা নাড়ে লেখাটার ভাষাটা নাকি হিন্দিই নয়।
নাঃ এদের কর্ম নয়।
ঘনরাম বলেন, তার মানে সেকেলে হিন্দি। দেখি তো ওই বুড়োটাকে। সেই থেকে দেখছি গাছতলায় বসে ঘুমোচ্ছে।
হ্যাঁ, বসেই ঘুমোচ্ছিল লোকটা, হাঁটুতে মাথা গুঁজে। ঘনরামের ডাকে মাথা তুলে তাকাল। সেই তাকানো দেখে সাঁটুর বুকটা কেমন গুরগুরিয়ে উঠল। মনে হল লোকটা যেন অনন্তকালের ঘুম ভেঙে চোখ খুলেছে।
ঘনরাম হাত মুখ নেড়ে এবং তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দিতে অবস্থাটা বুঝিয়ে কাগজটুকু ধরে দেন তার সামনে।
লোকটা প্রথমে ভুরু কুঁচকে তাকায়, তারপর আস্তে আস্তে ভুরুটা ফ্ল্যাট হয়ে যায়। অতঃপর ওই জরাজীর্ণ বুড়োটার মুখে ফুটে ওঠে একটি ভয়াবহ অলৌকিক হাসি।
দেখে সাঁটুও চোখ বুজে ফেলে।
উঠে দাঁড়ায়, মাথার টুপি ঠিক করে।
ঘনরাম বলেন, সমঝা?
লোকটা ওপর নীচে মাথা নাড়ে।
উঠে বসে বলে ওঠেন ঘনরাম, দেখলি তো সেঁটো, কেমন করে এক নজরে আসল লোককে চিনে ফেললাম! চোখ থাকলে চৌখোস হয় নারে। চোখের মতন চোখ থাকা চাই। চলিয়ে ভাই।

* * *

এখন রাত প্রায় নটা, তাজের গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারিদিক ঝিমঝিমে। হাওয়া বইছে কেমন একরকম উড়ো উড়ো প্রাণ কেমন করা। মায়ের জন্যে মনটা হু—হু করে ওঠে সাঁটুর।
টাঙা চলার পেটেন্ট ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দটা ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। রাস্তাও জনবিরল।
সাঁটুর যেন হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসে।
সাঁটু মামার হাঁটুতে হাত ঠেকিয়ে আস্তে বলে, মামা, কোন দিকে যাচ্ছি আমরা?
এতক্ষণে যেন ঘনরামেরও ভয় ভয় করে।
তাই তো। এ কোন রাস্তা? রাস্তাই বা কোথা? মাঠের মাঝখান। আর আশেপাশে সামনে পিছনে শুধু কবর আর কবর। ছোটো বড়ো মাঝারি ফরসা কালো মেটে। প্রখর চাঁদের আলো, তাই এতোটা দেখা যাচ্ছে। ধর্মশালা কোন দিকে?
দুপুরবেলা তো সেই ধর্মশালা থেকেই তাজমহলে আসা হয়েছিল, কই এমন ভয়াবহ দৃশ্যতো চোখে পড়ে নি।
মামা, মনে হচ্ছে সকালের সেই গাড়িটা আর সেই ঘোড়াটা। ঠিক সেই রকম ভাঙা আর মড়াখেকো।
দূর পাগল!
শুকনো গলায় বলেন ঘনরাম।
আমি বলছি। আমার রুমালটা তখন হারিয়ে গিয়েছিল, এখন দেখছি সিটের খাঁজে গোঁজা! মামা!

ঘনরাম আরও শুকনো গলায় বলেন, কী যে বলিস।

তারপর আরও শুকনো গলায় বলেন, টাঙাওয়ালা, আউর কেতনা দূর?

টাঙাওয়ালা নিরুত্তর।

জবাব দেতা নেই কাহে? ও টাঙাওয়ালা, এ কোন সড়কমে লে যায়েগা ভাই?

টাঙাওয়ালা নীরব।

লোকটা কি আবার তখনকারের মতো ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? কিন্তু ঘোড়া তো ছুটছে! যেন অনন্তকাল ধরেই ছুটে চলেছে খোঁচা খোঁচ, পাঁজরে ভাঙা লোহার 'সাজ'গুলোর ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ তুলে। ওই মড়াখেকো দেহ নিয়ে এত ছুটছেই বা কী করে? বিশাল কবরখানার ওপর চাঁদের আলোর ছাউনি, তার মধ্যে দিয়ে ঘোড়াটা ছুটে চলেছে যেন একটা ভূতুড়ে যন্ত্রের মতো।

* * *

ঘনরামের সব জারিজুরি লোপাট।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, এই টাঙাওয়ালা, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের?

ভাঙাচোরা আতঙ্কে কাঁপা গলায় শব্দে টাঙাওয়ালাটাও হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, হা—হা—হা! হা—হা—হা! হা—হা—হা। থামতেই চায় না।

যতক্ষণে থামল, ততক্ষণে মামা—ভাগ্নে দুজনের নাড়ির গতি প্রায় থেমে গেছে। শুধু বাতাসে একটা আর্তনাদের রেশ যেন থেমেও রয়ে গেছে 'আঁ আঁ আঁ আঁ।'

* * *

নাড়ির গতি ফিরল, যখন সকালের রোদ চোখে মুখে এসে লেগেছে। কথা বলার শক্তি নেই, সাহসও বুঝি নেই। ঘনরাম আস্তে হাত বাড়িয়ে সাঁটুর গায়ে হাত ঠেকালেন।

মামা! তুমি বেঁচে আছ?

ডুকরে উঠল সাঁটু।

সেঁটো, তুই আছিস তাহলে?

ডুকরে উঠলেন ঘনরাম।

তারপর উঠে বসলেন দুজনে। দেখলেন বিরাট একটা কবরখানার মধ্যে পড়ে রয়েছেন তাঁরা। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল। কিন্তু এখানে রাস্তা কোথায়? মাঠ কোথায়? সামনে পিছনে এপাশে—ওপাশে তো শুধু কবর আর কবর! বড়ো ছোটো মাঝারি, ময়লা, মেটে ধূলি—ধূসর। 'কালে'র ঝড় কতকাল ধরে বয়ে চলেছে এদের উপর দিয়ে কে জানে? ঘোড়াটা তবে গাড়ি আর সওয়ারি নিয়ে ছুটে চলেছিল কোনখান দিয়ে?

শূন্য দিয়ে?

তবে ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠছিল কী করে? যে শব্দ এখনো সাঁটুর বুকের মধ্যে বেজে চলেছে খটাখট খটাখট!

মামা বুঝতে পারছে টাঙাওয়ালা মানুষ নয়।

সাঁটুর গলার মধ্যে যেন গোবি মরুভূমির সমস্ত বালি।

ঘনরাম বিজবিজ করে 'রাম রাম' জপতে জপতে বলেন, 'সাঁটু, আমার গায়ে চিমটি কেটে দেখতো, আমিও মানুষ আছি কিনা!'

তা গুরুজনের আজ্ঞা, অবহেলা করে না সাঁটু, জোর চিমটিই কাটে। 'রাম চিমটি'।

হয়েছে, হয়েছে'!

ঘনরাম গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'ভূতের হাতে পড়েও আমরা বেঁচে উঠেছি কিসের জোরে বুঝতে পারছিস? নামের জোরে। তুই সীতারাম আমি ঘনরাম। ডবল রামনাম।

'মামা, মামদো ভূতেরা রামনামের ধার ধারে?

ধারে না তো দেখলি? ভূতের কি আর জাত ধর্ম থাকে রে? তারা একটাই জাত 'ভূত'। আর তাদের একটাই ধর্ম, মানুষকে বেকায়দায় পেলেই নিজেদের জাতে ভরতি করে ফেলার চেষ্টা! নেহাত নামের গুণে তরে গেলাম। এখন দেখা যাকে এখান থেকে বেরোবার পর কোথায়?

চারিদিকে তো উঁচু পাঁচিল মামা।

আহা, গেট তো একটা আছেই।

আছেই। কিন্তু কোথায় আছে সেটাই সমস্যা! কবরদের পাশ কাটিয়ে গা ঘষটে গোলক ধাঁধার পথ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে স্ট্যাচু হয়ে যান ঘনরাম। শুধু অস্ফুটে বলেন, সেঁটো?

হ্যাঁ, সেঁটোও দেখেছে বইকি।

গেট পাওয়া গেছে। চৌকো একটা ঘেরা জায়গাটার বাইরের মুখে শতবর্ষের জং ধরা একটা লোহার গেট। সেই চৌকো ঘেরা জায়গাটার মাথাটা একটা তারের জালে মোড়া, সেই জালের উপর অনন্তকালের ঝড়ে উড়ে পড়া শুকেনা পাতা, কুচো কাগজ, ছেঁড়া চুলের নুড়ো আর লম্বা লম্বা দড়া দড়া ঝুল প্রায় ঢালাই ছাদের কাজ করছে। এখানে যদি দারোয়ান থাকে, কখনোই বৃষ্টির সময় ভিজে যাবে না।

সাঁটু জম্পেস করে মামাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মামাগো, আমার পেট গুলোচ্ছে।

পেট! চুলোয় যাক। ভারি তো জিনিস! আমার যে মাথার মধ্যে চরকিপাক—

মামাগো, আমাদেরও তাহলে এইখানেই কবর?

সাঁটুরে। কী মুখে আনছিস? আমরা যে হিঁদুর ছেলে?

মামা! তখন তো আমরা ভূত হয়ে যাব! আমাদের কী জাত, ধর্ম বলে কিছু থাকবে?

সাঁটু দুঃসময়ে ফাজলামি করিস না।

ফাজলামি কীগো মামা? এই বাঁচন—মরণের মুখে দাঁড়িয়ে ফাজলামি করব?

তোরা একেলের ছেলেরা সব পারিস! তবু যাই ভাগ্যিস চাঁদের আলোয় তাজটা দেখা হয়ে গেছে! নইলে চিত্রগুপ্তের কাছে কী জবাব দিতাম বল? তোর গোঁয়ারতুমিতে কান দিয়ে এনজয়টা কালকের জন্যে তুলে রাখলে কী হত?

মামা, ও কথা রাখো। ভাবো, মা বাবা দিদি বড়দা কেউ জানতেও পারবে না আমরা এইখানে দুজনে একলা পড়ে পড়ে শুকিয়ে শুকিয়ে পরছি।

ঘনরাম একটা ঘনায়িত নিশ্বাস ফেলেন।

তারপর বলেন এত সহজে হাল ছাড়ব নারে সেঁটে, অঅয় সমবেত চেষ্টায় গেটটায় ধাক্কা দিই। দেখি যদি জীর্ণ লোহা ঝুরঝুরিয়ে ঝরে পড়ে।

আয়, হেঁইয়ো মারি হেঁইয়ো।

* * *

আচ্ছা, ধাক্কা কি দিতে হল?

হল না তো। কাছে গিয়েই তো দেখতে পাওয়া গেল বিরাট গেটটার মাঝখানে, সচরাচর যেমন থাকে, একটা কাটা দরজা। সেটার পাল্লা ঠেলতেই খুলে গেল!

কিন্তু তারপর?

তারপর, সঙ্গে সঙ্গেই ঘনরাম আর সীতারাম, এই দুই রামের হাড়ের জোড়গুলোও খুলে খুলে পড়তে শুরু করল। কারণ দু—জনেরই যে গায়ের সব রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে সামনের দৃশ্য দেখে! আর রক্তরা সব জমে বরফ হয়ে যাওয়ার জন্যে মাথার চুলেরা সব পুরো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

কিন্তু এত সবরে ধাক্কায় 'রামে'রা নিজেরা আর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কাল থেকে এত বিপর্যয়ে যা না হয়েছিল তাই হল। দুটো মানুষেই তালগোল পাকিয়ে গড়গড়িয়ে গড়িয়ে মুখ গুজড়ে পড়ে গেল গোঁ—গোঁ শব্দ করতে করতে!

* * *

তারপর? তারপর কী হল বলা শক্ত।

মানুষরই নার্ভ তো?

আচ্ছা, কী সেই দৃশ্য?

ভৌতিক? রাক্ষসিক? শয়তানিক? পৈশাচিক? নাকি ব্যাঘ্রিক? বদন ব্যাদান করা 'রয়েল বেঙ্গল?'

* * *

মোটেই না।

সে সবের কিছু না। অতি সাধারণ অতিনিরীহ একটি দৃশ্য, যা হামেশাই দেখতে পাওয়া যায় রেলগাড়িতে, রেলের প্ল্যাটফর্মে, হোটেলে, ধর্মশালায়, এখানে—সেখানে।

একত্রে জড় করা দুটি হালকা বেডিং দুটি মাঝারি সুটকেস, দুটি বিগ সাইজের ওয়াটার বটল আর ভেরি ভেরি বিগ সাইজের একটি ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের টিফিন কৌটো! মাত্র এই তা ছাড়া জিনিসগুলো দুজনেরই একেবারে প্রাণের পরিচিত।

ভয় ও ভূত

সুকুমার সেন

সত্য ঘটনা। নিজেদের অভিজ্ঞতা। সুতরাং নামধাম ঢাকবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আর বিমলেন্দু ইস্কুলের ফিফথ ক্লাসে—এখনকার ক্লাস সিক্সথে তিন—চার দিন আগে—পিছে ভরতি হয়েছিলুম। ও এসেছিল পাড়া—গাঁ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে শহরের ইস্কুলে পড়তে। আমি তো বর্ধমান শহরেই থাকতুম।

দু—চার মাসের মধ্যেই বিমলেন্দুর সঙ্গে আমার প্রগাঢ় ভাব হয়ে গেল। এ ভাব বরাবর অটুট ছিল। বর্ধমানে দুজনে একই ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করি, একই কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করি। তারপর কলকাতায় এসে আমাদের কলেজ ভিন্ন হল। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হয় না।

আমি এমএ পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে থাকি। বিমলেন্দু এমএ পাশ করে ভারত গভর্নমেন্টের হায়ার সার্ভিসের পরীক্ষা দেয় ও আয়কর বিভাগে কাজ পায়। প্রথমে কয়েক বছর ও কলকাতাতেই ছিল। যদিও ওর চাকরি বদলির। বিমলেন্দু চাকরি নিলে, আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলুম উপযুক্ত কোনো চাকরির সন্ধান না পেয়ে। আমাদের দুজনের মেলামেশা আগেকার মতোই অক্ষুণ্ণ চলতে লাগল।

যেদিনের কথা বলতে যাচ্ছি তখন বিমলেন্দুর বিয়ে হয়েছে, তবে তখন ওর স্ত্রী বাপের বাড়িতে ছিল। কলকাতায় তখন তার বাসা ছিল বাগবাজার অঞ্চলে। সংসারে তখন বিমলেন্দু ও তার মা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি থাকি গোয়াবাগানে মামার বাড়িতে।

একদিন কথা হল, শনিবার সন্ধ্যায় কর্নওয়ালিস থিয়েটারে সিনেমা দেখবার। আমি বিকেলে বিমলেন্দুর বাড়ি যাব। সেখান থেকে ছটার শোয়ে ছবি দেখে বাসায় ফিরব। সেদিন বিকেলের আগেই বিমলেন্দু আমার কাছে এসে হাজির আপিস—ফেরতা। বললে, 'সন্ধ্যার শোয়ের টিকিট পাইনি তাই রাত্রির শোয়ের টিকিট কিনেছি। সেই কথা তোকে জানাতে এলুম।'

আমি বললুম, 'এখানে সাপারের যে বন্দোবস্ত তাতে রাত্রির শোতে যেতে অসুবিধা হবে।'

বিমলেন্দু বললে, 'তার ভাবনা কী? তুই আমার কাছে খাবি। তারপর ছবি দেখে বাড়ি ফিরব। যা, ভিতরে গিয়ে বলে আয়।'

আমি মামিমাকে বলে এলুম রাত্রিতে বিমলেন্দুর বাড়িতে খাব। তারপর বিমলেন্দুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম।

ওর বাড়ির গলিতে ঢুকে মনে হল, শনিবারের বিকেলের পক্ষে বড়ো নির্জন বোধ হচ্ছে। বিমলেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলুম। ও বললে, 'আমার বাসার সামনাসামনি যে ভদ্রলোক থাকতেন তিনি রাত্রিতে মারা গেছেন। তিনি পাড়ার একজন চাঁই ছিলেন।'

তারপর রাত্রি সাড়ে—আটটার সময় খাওয়া—দাওয়া করে নটার শো দেখতে গেলুম কর্নওয়ালিস থিয়েটারে। শো ভাঙতে পৌনে বারোটা বেজে গেল।

রাস্তায় নেমে বিমলেন্দু বললে, 'রাস্তা তো খুব ফাঁকা দেখছি। দুজনের তো একলাএকলা যেতে হবে দুদিকে। তার চেয়ে চল আমার সঙ্গে। ওখানে রাত কাটিয়ে সকালে গোয়াবাগানে ফিরবি। ওঁরা তো জানেন যে আমার কাছে এসেছিস। তাই ভাবনা চিন্তা করবেন না।'

আমি সায় দিলুম। একটা রিকশ করে দুজনে বাগবাজারে ফিরে এলুম।

বিমলেন্দুর বাসায় ওপরে তিনটি ঘর ও ফালি বারান্দা। একটি ঘর মায়ের, একটি ঘর বিমলেন্দুর বসবার আর একটি ঘর তার শোবার।

বিমলেন্দু এসেই বললে, 'একটু চা খাওয়া যাক।' চা দুধ চিনি জল স্টোভ কেটলি কাপ ডিশ ছাঁকনি সবই ছিল তার শোবার ঘরে এক পাশে। প্রাইমাস স্টোভ জ্বালিয়ে সে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। চা হল, আমি আধ কাপ খেলুম। তারপর দুজনে শুয়ে পড়লুম। আমাকে ও শোয়ালে খাটের ওপর আর নিজে সে শুল মেজেতে একটা মাদুর পেতে আর বালিশ পাশ—বালিশ নিয়ে। এমনি করেই ও শুতে ভালোবাসত।

শুয়ে শুয়ে কিছু কথাবার্তা হতে হতে বিমলেন্দু পড়ল ঘুমিয়ে, আর আমার চোখে ঘুম আসে না। এটা একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমিই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি, বিমলেন্দু নয়। ভাবলুম নতুন জায়গা, 'ঠাঁই নাড়া' হয়েছে বলে ঘুম আসছে না। যাই হোক, অনেকক্ষণ পরে ছেঁড়া—ছেঁড়া রকম ঘুম এল। কিন্তু হঠাৎ কিছু শব্দ শুনে তড়াক করে ছেঁড়া ঘুমের স্বপ্নতন্তু ছিঁড়ে গেল। আমি মুহূর্তমধ্যে সজাগ হলুম আর মনে পড়ল সামনের বাড়ির মৃত্যুর কথা। অমনি ভয়ের প্রস্রবণ আমাকে আচ্ছন্ন করলে। আমি অনড় হয়ে কান পেতে আছি সে অস্ফুট শব্দের জন্য। শব্দ শুনলুম, একটুক্ষণ করে বাদ দিয়ে কয়েক বারই শুনলুম। মনে হল, শব্দটা মেটালিক, কিন্তু বাসন মাজার শব্দ নয়, টিন কাটার শব্দ নয়, শান দেবার শব্দ নয়। কিসের শব্দ?

ভয়ে অভিভূত হয়ে মনে হল বিমলেন্দুকে জাগিয়ে দিই। কিন্তু প্রচণ্ড ভয় পেলেও আমার সুবিবেচনা একেবারে লোপ পায়নি। একে ওর ঘুম কম, তাতে যদি কাঁচা ঘুমে উঠিয়ে দিই তবে ওর আর ঘুম হবে না। তা ছাড়া ও যদি আমাকে ভয়কাতুরে বলে উপহাস করে, তা আমি সইতে পারব না।

তখন মনের রাশ জোর করে ধরে ভাবতে লাগলুম শব্দটা আসছে গলির দিক থেকে নয়, আসছে ভিতরের বারান্দার দিক থেকে। এই সিদ্ধান্তে ভূতের ভয় এক ডিগ্রি কমে গেল। বারান্দার কথা কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল, এই ঘরেরই কাছে বারান্দার শেষে করোগেটের পার্টিশন আছে এবং সেই পার্টিশনের গায়ে জলের কল লাগানো আছে। এইটুকু মনে পড়তেই চড়াং করে ভয়ের সমাধান হয়ে গেল। দিনের বেলায় তাপে সিসের নল একটু বেড়ে ওঠে, শেষরাত্রিতে ঠান্ডা পড়ায় সে বাড়টুকু কমে যায় এবং সিসের নল সংকুচিত হওয়ার দরুন করোগেট টিনে একটু ঘষড়ানি হয়। সেই শব্দই আমি শুনেছি। ঠিক হোক চাই নাই হোক, এই ব্যাখ্যা আমার মনে ওঠায় ভয় জল হয়ে গেল। আমি দু—এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালের আগে আর ঘুম ভাঙেনি।

আমার এই অভিজ্ঞতার সারমর্ম হল, ভয় ঠেকালে ভূত ঠেকানো যায়।

তারপর বিমলেন্দুর যে অভিজ্ঞতার কথা বলছি তা ঘটেছিল বছর সাত—আট পরে। বিমলেন্দু তখন বর্ধমানে আয়কর অফিসার। তার উপর বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার ভারও আছে। এসব জেলার কাজের জন্য তাকে মাঝে গমাঝে ট্যুর করতে হয়। এইরকম এক ট্যুরেই ব্যাপারটা ঘটেছিল।

বিমলেন্দু বর্ধমানে আছে, আমি সপ্তাহান্তিকে বর্ধমানে যাই। শনি রবি সোম তিন দিন সেখানে থাকি, বিমলেন্দুর সঙ্গ পাই। দিন বেশ ভালোই কাটে।

এক সপ্তাহে বর্ধমানে গিয়ে শুনলুম, বিমলেন্দু ট্যুরে গেছে। সেবারে দেখা হল না। পরের সপ্তাহে দেখা হল। তার কাছে শুনলুম সেই ট্যুরের আক আশ্চর্য কাহিনি। সে কথা আমি বিমলেন্দুর জবানিতেই লিখছি।

'গিয়েছিলুম বাঁকড়ো জেলার গহনে এক গণ্ডগ্রামে। সে গ্রামে কিছু আড়তদার ব্যবসাদার আছে। ডাকবাংলো আছে। সুতরাং ওখানে গিয়ে তদন্ত করতে অফিসারদের কোনো অসুবিধা হয় না। এই সব বুঝে আমি গেলুম সেখানে এনকোয়ারিতে কাগজপত্র ও সেরেস্তাদারকে সঙ্গে নিয়ে।

'বেলা তিনটের সময় ডাকবাংলোয় পৌঁছলুম। অভ্যর্থনা করতে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা এসেছিলেন। বাংলোটি মন্দ নয়। বেশ নির্জন, একটু যেন বেশি নির্জন বলে মনে হল। গ্রাম সেখান থেকে অন্তত আধ মাইল দূরে। গাঁ আর বাংলোর মধ্যিখানে কোনো বসতি নেই, জঙ্গল আর মাঠ।

'হাতমুখ ধুয়ে ডাকবাংলোর সর্দারকে চা করে আনতে বললুম। সে চা করে এনে দিল। চা খেতে খেতে তাকে নির্দেশ দিলুম রাত্তিরের খাবারের। সর্দার বিনীতভাবে বললে, 'হুজুর, আপনার রাত্তিরের খাবার গাঁয়ে গিয়ে খাবেন। এখানে কেউ রাত্তিরের খাবার খায় না। আমরা সবাই সন্ধের পর এখান থেকে গাঁয়ে চলে যাই। হুজুরও যাবেন।'

'আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী ব্যাপার, কী পাগলামি বকছ তুমি?'

'ও বললে, 'হুজুর সন্ধের পর এখানে ভূতের উপদ্রব হয়, কেউ তিষ্ঠুতে পারে না।' সর্দারের সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে আমি সেরেস্তাদারকে ডাকলুম। তাঁকে সর্দারের কথা বললুম। সেরেস্তাদার ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'স্যার, সব কথা সত্যি। এখানকার ভদ্রলোকেরা এসেছেন আপনাকে রাত্রিবেলাতে গাঁয়ে থাকবার ও খাবার জন্যে বলতে।' এই বলে সেরেস্তাদারবাবু জন তিন চার ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন। তাঁরাও সকলে নির্বন্ধ করতে লাগলেন সন্ধের পর ডাকবাংলোতে না থাকবার জন্য। আমার রাগ হল। সে রাগ দমন করে আমি বললুম, 'এখান ছেড়ে রাত্রিতে আমি কোথাও যাব না।' সেরেস্তাদারবাবুকে বললুম, 'আপনি সর্দারকে বলুন আমার রাত্তিরের খাবার সন্ধের আগেই যেন তৈরি করে রেখে দিয়ে যায়। যখন ইচ্ছে হবে তখন খাব। আপনিও চলে যেতে পারেন। তবে সকালে যথাসময়ে আসবেন। ঠিক নটার সময় আপিসের কাজ করতে হবে।'

'খানিকক্ষণ গাঁইগুঁই করে আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে সকলে চলে গেলেন। সন্ধের সময় সর্দার আমার খাবার তৈরি করে ঢাকা দিয়ে রেখে চলে গেল। তারপর কেউ কোথাও নেই দেখে আমি বাংলোর দরজায় খিল দিয়ে বই পড়তে বসলুম। সর্দার সব ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিল। যথাসম্ভব নিরুদ্বেগে রাত কাটল। সূর্য ওঠার আগে বাংলোর বাইরে এসে খোলা হাওয়ায় পায়চারি করছি এমন সময় সর্দার এসে হাজির। আমাকে সুস্থ শরীরে দেখে তার যে আনন্দ হয়েছে তা তার মুখ দেখে বুঝতে পারলুম। কোনো কথা না বাড়িয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে পার্স বার করে তার থেকে একটা টাকা দিয়ে বললুম, 'দৌড়ে যাও, চায়ের দুধ আনোগে।'

'গাঁয়ের লোক সর্দারের মুখে আমার কিছু হয়নি জেনে খুশি হয়েছিল কি না বলতে পারি না। তবে সেদিন বিকেলেও আমাকে গাঁয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল।'

'তিনদিন পুরোদমে সারকারি কাজ চালিয়ে শেষ করলুম। সন্ধেবেলায় সেরেস্তাদারকে বলে দিলুম কাগজপত্র সব ভালো করে গুছিয়ে নিতে। আমরা কাল সকালে নটার আগেই রওনা হব।'

'সকালে আটটা নাগাদ গ্রামের লোক আমাকে বিদায় দিতে এসেছেন। কারো মুখে রা নেই। বুঝলুম আমার ওপর এঁদের একটু বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মেছে ভূতের রোজা মনে করে।'

'আমি কাউকে কোনো কথা না বলে যখন ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসছিলুম, তখন চৌকাট ডিঙোতে ডিঙোতে সামনে গাঁয়ের একজন চাঁইকে দেখে বললুম, 'এই তো চার রাত এখানে একটা কাটিয়ে গেলুম, কই আপনাদের ভূতের টিকিটিও তো দেখা গেল না।'

'এই কথা বলতে বলতে দেখি চৌকাটের ওপর থেকে ঝুরঝুর করে বালি পড়ছে। আমি একবার ওপরপানে চেয়ে নিয়ে তারপর পা চালিয়ে বারান্দা পেরিয়ে সটান গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। ও—বিষয়ে এই তোর কাছে প্রথম মুখ খুলছি। তুই কি বলিস?'

আমি বললুম, 'কেস দু—তরফেই সমানভাবে লড়া যায়। ঝুরঝুর বালি পড়া স্বাভাবিকভাবে ঘটতে পারে, ভূতের কাজও হতে পারে। তবে বেনিফিট অব ডাউটের খাতিরে ভূতের পক্ষেই রায় দিই।'

আমার অভিজ্ঞতায়— ভয় তাড়িয়ে ভূত ঠেকানো যায়। আমার বন্ধুর অভিজ্ঞতায়— ভয় ঠেকালেও ভূত ঠেকানো যায় না।

সত্য হয়তো দুই অভিজ্ঞতার মাঝামাঝি কিছু। কে জানে!

তৃষ্ণা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্যাট মেনডোনসা! এই ঘরে তুমি এসেছ আমি বুঝতে পারছি। আমি আর খুঁজব না, আমার ক্ষমতা ফুরিয়েছে — তুমি যা চাও তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাই ভয় হচ্ছে। তুমি সামনে এসে দাঁড়াও, তোমার কাকে ভয়?

ঘরে যে কটি প্রাণী ছিল সকলে চমকে উঠেছিল। এমনকী অমন নামজাদা ডাক্তারও। রোগের ঘোরে অনেকে অনেক রকম প্রলাপ বকে, সেটা অসংলগ্ন হয়, জড়তা থাকে। কিন্তু এ যেন কেউ সবরকমভাবে হার মেনে ক্লান্ত বিষণ্ণ থমথমে গলায় স্পষ্ট করে শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। অনেকের কানে সেটা নিজের মৃত্যু ঘোষণার মতো লাগল।

অসুখের ঘোরে রোগী আগেও অনেকবার ভুল বকেছে, বিকারগ্রস্ত দুই চোখ টান করে অনেকবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর এমন স্পষ্ট হয়ে কানে লেগে থাকেনি কারও, সেই চাউনি এত স্পষ্ট স্বচ্ছ মনে হয়নি। তাতে নিজেকে আগলে রাখার ব্যাকুলতা ছিল, সেই দৃষ্টিতে অব্যক্ত দুর্বোধ্য যাতনা ছিল। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইনজেকশন আর ঘুমের ওষুধ দিয়ে তখন রোগীকে ঘুম পাড়িয়েছেন। আজ ছ—দিন ধরেই তাই করছেন। দেহগত লক্ষণ তিনি সুবিধের দেখছেন না। অথচ আরও দুজন সতীর্থ চিকিৎসকের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেও সঠিক রোগের হদিশ পেয়েছেন বলে মনে হয় না। এক একবার ভেবেছেন হাসপাতালে এনে ফেলা দরকার। আবার মনে হয়েছে এই অবনতির লক্ষণ মোটামুটি স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার দরুণ। ধরাছোঁয়ার মধ্যে কোনো রোগ যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন তেমন ভয়ের কিছু নেই বোধহয়। স্নায়ু সেরকম বিকল হয়ে দেহের অন্যান্য লক্ষণও তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

তিনি শুনেছেন রোগীর প্রকৃতি ভাবপ্রবণ। এর উপর বড়ো রকমের মানসিক বিপর্যয়ের যে কারণ ঘটেছে তাও শুনেছেন। তিনি বিশ্বাস করেননি, সম্ভব অসম্ভবের চিন্তাও তাঁর মাথায় আসেনি। সুস্থ বাসনার একটা বিকৃত প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ভাবেননি তিনি। শোনা যায় না। কিন্তু চ্যাটার্জীর মনে হল সে বলছে, প্যাট মেনডোনসা... প্যাট মেনডোনসা...!

ঘরের মধ্যে সব থেকে বেশি অস্বস্তি বোধ করছে চ্যাটার্জী। এই দুদিনে অনেকবার যে কথা মনে হয়েছে কোটটার দিকে চেয়েও আবার সেই কথাই মনে হল। দিয়ে যখন দিয়েই ছিল, এই কোটটা নরিস আর ফিরিয়ে না আনলেই পারত। এই আনাটাই যেন ভুল হয়েছে। কী ভুল, কেন ভুল চ্যাটার্জীও জানে না। অথচ তার সামনেই তো ওটা ফিরিয়ে এনেছে নরিস, চ্যাটার্জী নির্বাক দাঁড়িয়েছিল— অস্বস্তি বোধ করেছিল, কিন্তু বাধা দেবার কথা মনে হয়নি।

ডাক্তার আবার ঔষধ খাওয়ালেন, ইনজেকশন দিলেন।

বাইরে এসে এক বন্ধু ভেবেচিন্তে চ্যাটার্জীকে বলল, দেখো, এক কাজ করো, উৎসবের পরদিন পর্যন্ত তোমারও মাথা খুব সাফ ছিল না বুঝতে পারছি, তোমাদের কাগজে প্যাট মেনডোনসার নামে একটা বিজ্ঞাপন দাও—ফিলিপ নরিসের এই অবস্থা জানিয়ে অতি অবশ্য তার সঙ্গে এসে দেখা করতে লেখো—এই বোম্বাই শহরে প্যাট মেনডোনসা হয়তো দুই বেরুবে, কোথায় কার সঙ্গে লটঘট বাঁধিয়ে রেখেছে কে জানে—বিজ্ঞাপন চোখে পড়লে যে আসবার ঠিক এসে হাজির হবে 'খন দেখে নিও। তোমরা যে ঠিকানায়

গেছিলে সেটা একটা যোগাযোগ হতে পারে আর তার আগের রাত থেকে ফিলিপেরও মাথার গোলমাল ঘটে থাকতে পারে—সে তো বেসামাল কথাবার্তাই বলছিল তখন, কেউ কি এক বর্ণও বিশ্বাস করেছে!

করেনি সত্যি। চ্যাটার্জী নিজেই করেনি। কিন্তু তারপরে যা সে দেখেছে অবিশ্বাস করবে কি করে। তবু নিজেরই তার বার বার ধাঁধাঁ লাগছে, ধোঁকা লাগছে। ফিলিপের না—হয় মাথার গন্ডগোল হয়েছিল, কিন্তু তারও কি হয়েছিল? বন্ধুর কথামতো কাগজে বিজ্ঞাপন যে রাতের কথা শুনেছেন সেই রাতে ছোকরা যে প্রকৃতিস্থ ছিল না তাতেও ডাক্তারের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আজকালকার রোমান্স সর্বস্ব দুর্বলচিত্ত অতি আধুনিক ছেলেছোকরাদের জানতে বাকি নেই তাঁর। যে কাররেই হোক বড়ো রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছে, সেটা সামলে ভালো কোনো মানসিক চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ হতে পারে ভাবছিলেন তিনি।

কিন্তু লক্ষণ দেখে ভিতরে ভিতরে তিনিও শঙ্কা বোধ করছেন এখন।

রোগীর এই শেষ কথা শুনে আর তার এই চাউনি দেখে সব থেকে বেশি চমকে উঠেছিল খবরের কাগজের চ্যাটার্জী। বন্ধুদের মধ্যে আরও দুই একজন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। চ্যাটার্জীর কাছ থেকেই তারাও ঘটনার কিছু কিছু আভাস জেনে ছিল। আর সাতদিন আগে উৎসবের সেই রাত্রি শেষে একটা মজার প্রহসনে তারা জর্জরিত করেছে নরিসকে, হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলি? সঙ্গে ঢুকলি না। তোর মতো হাঁদা প্রেমিককে কলা দেখাবে না তো কি, কোটের শোক করতে করতে এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমোগে যা—।

ঠাট্টা যারা করছিল, ফিলিপ নরিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু খবরের কাগজের চ্যাটার্জীও তাদের একজন।

ফিলিপ নরিসের এই কণ্ঠস্বর শুনে আর এই চাউনি দেখে ঘরের অনেকেই নিজেদের অজ্ঞাতে দরজার দিকে তাকালো। মনে হল, এই কথার পর, এই আত্মসমর্পণের পর দ্বার প্রান্তে বুঝি সত্যই কোনো রমণীর নাটকীয় আবির্ভাব ঘটবে। তা ঘটল না। রোগীর দৃষ্টি ধরে চ্যাটার্জীর চোখ যেদিকে ফিরল ঘরের সেখানটায় আলনা! আলনার হ্যাঙ্গারে গরম কোট ঝুলছে একটা। ফিলিপ নরিস সেদিকেই চেয়ে আছে, বিকারের চাউনি জানে, কিন্তু বড়ো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। যেন সেদিকে চেয়ে সত্যিই কাউকে দেখেছে সে, ঠোঁট দুটো নড়ছে। বিড় বিড় করে বলছে কিছু। একটা দিয়েই দেখবে? পর মুহূর্তে কি আবার মনে পড়েছে। না ভুল কিছু হয়নি যারা জানে না তাদের এ—রকম ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু চ্যাটার্জী ভাববে কী করে? এ যদি ভুল হয় তা হলে তার এই মুহূর্তের অস্তিত্বও ঠিক কিনা সন্দেহ।

থাক, এ নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশও আর কিছু থাকল না। ডাক্তারের ওষুধ আর ইনজেকশনে—ফিলিপ নরিস চোখ বুজেছে। সেই চোখ মেলে আর তাকায়নি। তার সেই রাতের ঘুম আর ভাঙেনি। কখন শেষ নিশ্বাস ফেলেছে নার্সও টের পায়নি। বন্ধুরাও পরদিন এসে তাকে মৃত দেখেছে।

* * *

এবারে আগের ঘটনাটুকু যোগ করলেও কাহিনি সম্পূর্ণ হবে কিনা বলা শক্ত।

ঘটনাস্থল বোম্বাইয়ের এক মস্ত নামজাদা ইঙ্গ—ভারতীয় ধাঁচের ক্লাব। নামজাদা ক্লাব না বলে নামজাদা সংস্থা বললেই বোধকরি ঠিক হবে। অনিবার্য কারণে নাম অনুক্ত থাক। এই ক্লাব বা ক্লাবের নিজস্ব প্রাসাদ সৌধ সেখানকার সকলেই চেনেন। মেম্বাররা সর্ব ভারতীয় এবং কিছুটা সর্বদেশীয়। তবে একক সংখ্যার বিচারে গোয়ান মেয়ে পুরুষের সংখ্যাই বোধ করি বেশি। এই গোয়ানদের মধ্যে আবার জাতের রেষারেষি আছে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ—ক্রিশ্চিয়ান গোয়ানদের মাথা উঁচু—সামাজিক ব্যাপারে অধস্তন গোয়ানদের সঙ্গে সচরাচর তারা আপস করে না। কিন্তু এই ক্লাব অনেকটা শ্রীক্ষেত্রের মতো। এখানে জাত বর্ণের খোঁজ বড়ো পড়ে না।

এখানে প্রবেশের প্রধান ছাড়পত্র আর্থিক সংগতি। যার টাকা আছে আর তারুণ্যের পিপাসা আছে। তার কাছে ক্লাবের দ্বার অবারিত। বহু লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক। নবীন সভ্য—সভ্যাদের টাকার জোরের থেকে দিল—এর জোর বেশি। টাকার থেকেও তাদের বড়ো মূলধন আনন্দ

আহরণের উৎসাহ আর উদ্দীপনার ফলেই সাধারণ সংস্থার মুরুব্বীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যায়। এখানে ইচ্ছার বেগই প্রধান। এখানে এসে হিসেবের খাতায় পাতা খোলে না।

চ্যাটার্জী এখানে ভিড়তে পেরেছে টাকার জোরে নয়, তার কাগজের জোরে। আর কিছুটা তার সুপটু যোগাযোগের ফলে। সুমার্জিত কৌশলে সব—জান্তার আসরে যে নামতে পারে, দুনিয়া উলটে—পালটে গেলেও খুব একটা কিছু যায় আসে না এমনি নির্লিপ্ত মাধুর্যে যে অবকাশ যাপন করতে পারে—এখানে তারই কদর বেশি, সেই হিসেবে চ্যাটার্জী প্রিয়পাত্র এখানকার। ফিলিপ নরিসের বিশেষ গুণ হল সে টাকা যা রোজগার করে তার থেকে বেশি খরচ করতে জানে। নিজের গতিবিধি আচার—আচরণ সরল, সংযত—অথচ বন্ধুবান্ধব তার বেশিরভাগই বেপরোয়া, সদা মুখর। কারও টাকার দরকার হলে অসংকোচে হাত পাতো ফিলিপ নরিসের কাছে, হাতে থাকলে সে তক্ষুনি দিয়ে দেবে। না থাকলে, আর টাকার প্রয়োজন যার সে প্রিয় পাত্র হলে, ধার করে এনে দেবে। দিয়ে অনুগ্রহ করবে না, নিজেই অনুগৃহীত হবে। ব্যাঙ্কে মোটামুটি ভালোই চাকরি করে, ব্যাচিলার, তাই ভালো হোটেলে আলাদা একখানা ঘর নিয়ে থাকার সংগতি আছে।

তাহলে ফিলিপ নরিস ক্লাবের প্রথম সারির কেউ নয়। অর্থাৎ চ্যাটার্জীর মতো নিজের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত নয়। সকল সভ্য বা সভ্যরা ভালো করে চেনেও না তাকে। তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির দরুন সভার আলো উজ্জ্বল না স্তিমিত হয় না। তার মতো সদাদামাটা সভ্য—সংখ্যা শতকের ওপর। দু—দশজনের কাছে, যেটুকু খাতির সে পায় তাও চ্যাটার্জীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার দরুন। এই জন্যই চ্যাটার্জীর প্রতি সদা কৃতজ্ঞ সে। কৃতজ্ঞতার আরও কারণ আছে, চ্যাটার্জীর সক্রিয় সহযোগিতায় তার কাগজে নরিসের দুই একটা আমেগমুখর প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে। তিরিশ টাকা দক্ষিণা পেলে আনন্দাতিশয্যে ষাট টাকা খরচ করে বসেছে সে, তবু চ্যাটার্জীর ঋণ শোধ হয়েছে ভাবেনি।

গুণমুগ্ধ দুই একটি ভক্ত সকলেই পছন্দ করে। চ্যাটার্জীরও ভালো লাগে ফিলিপ নরিসকে।

ক্লাবের বার্ষিক উৎসবের রাত সেটা। গোটা প্রাসাদ আলোয় আলোয় একাকার! দু—মাস আগে থেকেই এই একটা রাতের প্রতীক্ষা করে থাকে সকলে। এই রাতের উৎসবে কত হাজার টাকা খরচ হয় সে—প্রসঙ্গ অবান্তর! সভ্য এবং অতিথি—অভ্যাগতদের গাড়ির ভিড়ে প্রাসাদসৌধের সামনের দুটো বড়োবড়ো রাস্তার অনেকটাই আটকে থাকে।

সমস্ত রাতের উৎসব—খাওয়া—দাওয়া নাচগানের ঢালা ব্যবস্থা। যে সময়ের ঘটনা, বোম্বাই শহর তখন 'ড্রাই' নয়, অতএব বহুরকম রঙিন পানীয়ের ব্যবহারেও ত্রুটি ছিল না কিছু। রাত বারোটার পরে ডান্স হলে যখন নাচের ডাক পড়ল, নিজের নিজের দুটো পায়ের ওপর তখন অনেকেরই খুব আস্থা নেই।

.... সেই মেয়েটির দিকে আবার চোখ পড়ল ফিলিপ নরিসের—এই নিয়ে বার কয়েক চোখ গেল তার দিকে। খুব রূপসী না হলেও সুশ্রী। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বয়স। এই উৎসবে এই বয়সের সঙ্গীহীন মেয়ে বড়ো দেখা যায় না। ডান্স হলের দরজার ওধারে দেয়াল ঘেঁষে কেমন যেন বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একা। সকলেই যে নাচছে তা নয়, কিন্তু ওই মেয়েটির মতো একা কাউকে মনে হল না নরিসের। মুখখানা মিষ্টি কিন্তু বড়ো শুকনো—এক ধরনের বিষণ্ণ ঘুম—জড়ানো চোখ—মুখ, চাউনি। এই পরিবেশে মেয়েটির পরিচিত নয় খুব—মনে হল সেই থেকে সে যেন কাউকে খুঁজছে। অন্যমনস্কের মতো নাচ দেখছে এক একবার আবার শ্রান্ত দৃষ্টিটা এদিক ওদিক ফিরিয়ে আগন্তুকদের মুখ দেখে নিচ্ছে।

এখানে বিশেষ করে এই সময়ে কারও দিকে কারও চোখ নেই। সকলেই যে যার সঙ্গী—সঙ্গিনী বা বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব্যস্ত। এই রাতের মতো রাতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী থাকার কথা নয় ফিলিপ নরিসেরও। সে নাচতে একটু আধটু জানে বটে কিন্তু এগিয়ে এসে কাউকে ডেকে নিতে জানে না। সে মদও সচরাচর খায় না, তবে আজ সামান্য খেয়েছে আর তাতেই বেশ একটু আমেজের মতো লাগছে। ভালো লাগছে। একটু আনন্দ করার ইচ্ছে তার মধ্যেও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে! কিছু সহজাত সংকোচে কারও দিকে এগোতেও পারছে না। আর এগোবেই বা কার দিকে, সকলেই ব্যস্থ, আনন্দমগ্ন!

মেয়েটির বিষণ্ণ ঠান্ডা দৃষ্টিটা ফিলিপ নরিসের মুখের উপরেও আটকালো দু—একবার। লোকটিও তাকে দেখছে মনে হতেই দৃষ্টিটা চট করে সরে গেলনা মুখ থেকে।

ফিলিপ নরিস উঠে মেয়েটির কাছে এল একসময়! সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কারও অতিথি এখানে?

সামনে এসে মেয়েটির চোখমুখ আরও নিষ্প্রভ। বিষণ্ণ মনে হল নরিসের। কেমন এক ধরনের আত্মবিস্মৃত জড়তার ভাব। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত চেয়েই রইল! তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। অস্ফুট শ্রান্ত স্বরে বলল, না...আমি কেমন করে যেন এসে পড়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ নরিস উদার হয়ে উঠল, বলল, বেশ করেছেন, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম মাদাম, দয়া করে নিজেকে আপনি আমার অতিথি ভাবুন। আগে কী খাবেন বলুন? মেয়েটি নিঃশব্দে চেয়েই আছে তেমনি। অথচ নরিসের মনে হল সে যেন কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছে। বলল, না কিছু খাব না। একটু থেমে আবার বলল, দেখো, আমি সেই থেকে একজনকে খুঁজছি, পাচ্ছি না...ভাবলাম এখানে থাকতেও পারে। তুমি কি বলতে পারবে....

হঠাৎ 'তুমি' শুনে নরিস রীতিমতো অবাক। অথচ মেয়েটি যে খেয়াল না করেই বলেছে তাতেও ভুল নেই। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখানকার মেম্বার? কী নাম?

নরিস বিস্মিত। কী নাম তাও চট করে মনে করতে পারছে না, স্মরণের চেষ্টা। বেশি মাত্রায় মদটদ খেয়েছে কিনা নরিসের সেই সন্দেহ হল একবার। না, তাহলে টের পেত। মনে পড়েছে। মনে পড়ার দরুনই যেন মেয়েটির শ্রান্ত মুখখানা উজ্জ্বল দেখালো একটু। অস্ফুটস্বরে বলল, ডিসুজা...মার্টিন ডিসুজা....চেনো?

নরিস মাথা নাড়ল, চেনে না।

মেয়েটির বিষণ্ণ মুখখানা বড়ো অদ্ভুত লাগছে নরিসের। রাজ্যের অন্যমনস্কতার দরুন সে যেন খুব কাছে নেই। একটা লোকের সন্ধানে এখানে এসে পড়েছে তাও কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কোথায় থাকে ডিসুজা, কী করে তাও স্মরণ করতে পারল না। নরিসের কেমন মনে হল, মেয়েটি যে কারণেই হোক বড়ো অসুখী, তাই খুব প্রকৃতিস্থ নয়। কিছু মানসিক রোগ থাকাও বিচিত্র নয়। যার নাম করছে তার কাছ থেকেই হয়তো বা বড়োরকমের কোনো আঘাত পেয়েছে।

নরিস বলল, দেখো এটা আনন্দের হাট, এই আনন্দের টানেই তুমি এসে পড়েছ—বি চিয়ারফুল অ্যান্ড হ্যাপি, আমাকে তোমার বন্ধু ভেবে নাও, নাচবে একটু?

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ফুটল একটু। ঘুম জড়ানো ভাবটা কাটিয়ে উঠছে যেন। দেখছেই তাকে। এত কী দেখছে নরিস ভেবে পেল না। তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বিস্মরণের ধাপগুলো উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করছে।

মাথা নাড়ল। নাচবে।

ডান্স হল। তারা আস্তে আস্তে নাচছে! বাহু স্পর্শ করে নরিসের মনে হয়েছে মেয়েটি বড়ো দুর্বল, হয়তো অনেকটা পথ পার হয়ে নিজের অগোচরে এখানে চলে এসেছে। সহৃদয় সুরে বলল, আগে কিছু খেয়ে নাও না, এই উৎসব সমস্ত রাত ধরে চলবে।

তার চোখের আত্মবিস্মৃত দৃষ্টি এখন আরও একটু বদলেছে। নাচের ফাঁকে নরিসের মুখখানাই দেখছে ঘুরে ফিরে, এই চোখ ঈষৎ প্রসন্ন। মেয়েটির তাকে পছন্দ হয়েছে বোঝা যায়। মাথা নেড়ে জানালো খাবার ইচ্ছে নেই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কী?

নরিস...ফিলিপ নরিস। তোমার?

প্যাট মেনডোনসা। ...তুমি খুব ভালো ...ডিসুজার মতোই দরদি....তুমি কি ব্রাহ্মিণ ক্রিশ্চিয়ান?

নরিস হঠাৎ এ প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝল না। —না, কেন বলো তো?

নয় শুনে প্যাট মেনডোনসার চোখে মুখে খুশির আভাস। জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল একটু বাদে বলল, আমার কেমন শীত শীত করছে।

নরিস কী করতে পারে। আধঘণ্টার আলাপে মেয়েটির প্রতি মায়া অনুভব করছে কেন জানে না। আর কোনো মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কখনো আসেনি বলেও হতে পারে। এ যেন এরই মধ্যে তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আর একটু কাছে টেনে আনল, নাচের গতি বাড়িয়ে দিল। সঙ্গী এত সদয় বলেই যেন প্যাট মেনডোনসা কৃতজ্ঞ, সে কাছে ঘেঁসে এসেছে, মন্থর পায়ে নাচছে, আর প্রসন্ন চোখে দেখছে তাকে।

বিশ্রামের জন্য দুজনে একটা নিরিবিলি কোণে গিয়ে বসল একটু। আর তখন প্যাট মেনডোনসা অস্ফুট ক্লান্ত সুরে বলল, আমার ভয়ানক শীত করছে। আমি আর থাকতে পারছি না...

জামার ওপর তার কাঁধে হাত রেখে নরিস বিচলিত হল একটু। গাটা সত্যি বড়ো বেশি ঠান্ডা। আবারে আগের মতোই শ্রান্ত আর ক্লান্ত মনে হল তাকে। তাড়াতাড়ি উঠে নরিস নিজের দামি গরম কোটটা নিয়ে এসে তার গায়ে পরিয়ে দিল। বলল, তোমাকে খুব সুস্থ লাগছে না, আর রাত না করে তুমি একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি চলে যাও, বাড়ি কোথায়?

বান্দ্রা ....।

বেশি দূর নয় তা হলে। প্যাট মেনডোনসার গায়ে তার নিজের কোটের পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ আর কলম বার করল। পলকে কি ভেবে সে দুটো তার দিকেই বাড়িয়ে দিল। —তোমার বাড়ির ঠিকানা লিখে দাও, কাল সকালে গিয়ে আমি কোটটা নিয়ে আসব'খন।

এ—রকম বিদায়টা যেন খুব পছন্দ নয় মেয়েটির, মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে নাম, বাড়ির নম্বর আর ঠিকানা লিখে দিল। কাগজটা নিজের পকেটে রেখে নরিস বলল, চলো তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসি।

দোতলার সিঁড়ির কাছে আসার আগেই সামনের লম্বা প্যাসেজের দিকে চোখে পড়তে মেনডোনসা দাঁড়াল। —ও দিকটা কী?

বাথ...

অস্ফুট স্বরে বলল, আমি যাব, দেখিয়ে দাও—

প্যাসেজ ধরে পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়ে নরিস দাঁড়াল। প্যাট মেনডোনসা হালফ্যাশানের মস্ত বাথরুমের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, গভীর ক্লান্ত দুটো চোখ আবার নরিসের মুখে এসে আটকালো। মাথা নেড়ে ডাকল তাকে।

ঈষৎ বিস্মিত মুখে সে কাছে আসতে বলল, তুমিও এসো।

হঠাৎ হতভম্ব বিমূঢ় নরিস। বলে কী! এ কার পাল্লায় পড়ল সে। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে উঠল, না না কিছু ভয় নেই, তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।

রমণীর নিষ্পলক দুই চোখ তার মুখের থেকে নড়ছে না। এই মুখে আর চোখে একটা কঠিন ছায়া পড়ছে। শান্ত ঠান্ডা গলায় আবার বলল, তুমিও এসো।

প্রায় আদেশের মতো শোনালো। নরিস ঘাবড়েই গেল। কপালে ঘাম দেখা দিল। এ কি সাংঘাতিক মেয়ে। ভয় নেই, সংকোচ নেই—নাকি এও মানসিক রোগ কিছু। বিস্ময়ে সংবরণ করে এবারে জোর করেই মাথা ঝাঁকাল মরিস, বলল, আঃ! কেউ এসে পড়লে কী ভাববে। বলছি তুমি যাও, আমি এখানে দাড়াচ্ছি—

প্যাট মেনডোনসা চেয়েই আছে। চেয়েই আছে। তারপর আস্তে আস্তে বাথরুমের দরজা খুলল সে। ভিতরে ঢুকল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল নরিসের। ... ভালোয় ভালোয় এখন ট্যাক্সিতে উঠলে হয়।

জানালায় ঠেস দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সে। অদ্ভুত মেয়েটার কথাই ভাবছে।

হঠাৎ সচকিত। একটা আস্ত সিগারেট শেষ হয়ে গেল, আর একটা কখন ধরিয়েছে এবং আধাআধি শেষ করেছে খেয়াল নেই—অথচ প্যাট মেনডোনসা এখনও বেরোয়নি। বাথরুমের দরজা বন্ধ।

দ্বিতীয় সিগারেট শেষ হল। নরিস পায়চারি করছে। কিন্তু দরজা খোলার নাম নেই।

তারপর আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। নরিস বিলক্ষণ ঘাবড়েছে। দরজা ঠেলেছে, দরজায় মৃদু আঘাত করেছে, ডেকেছে—কিন্তু ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারপর একটা করে মিনিট গেছে আর নরিসের ভয় বেড়েছে। গোড়া থেকেই কেমন লাগছিল মেয়েটাকে—ভিতরে অজ্ঞান—টজ্ঞান হয়ে গেল, না কি কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসল!

ঘড়ি দেখল! সাড়ে তিনটে বেজে গেছে রাত্রি। তার মানে এক ঘণ্টার ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেজে! বিমূঢ় নরিস কী করবে দিশা পেল না। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিল কয়েকবার। মজবুত দরজা একটু কাঁপল শুধু।

নরিস দৌড়লো হঠাৎ। আধভাঙা আসর থেকে চ্যাটার্জীকে খুঁজে বার করল। চ্যাটার্জী প্রকৃতিস্থই আছে বটে, কিন্তু নিজের হাত পায়ের ওপর দখল খুব নেই। তাকে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে এল নরিস। চ্যাটার্জী পিছু পিছু আর দুই একজন উৎসুক বন্ধুও এল। খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা শুনে তারাও অবাক। খানিকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করল তারাও।

শেষে কেয়ারটেকারের তলব পড়ল। বেগতিক দেখে কেয়ারটেকার পুলিশে ফোন করল। পুলিশ এসে ভাঙল যখন তখন প্রায় সকাল।

ভিতরে কেউ নেই।

এক সঙ্গে বহু জোড়া বিস্মিত দৃষ্টির ঘায়ে নরিস বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। বাহ্যচেতনা লোপ পাবার উপক্রম তার।

সুরার ঝোঁকে দুই একজন ঠাট্টা করল, নরিসের প্রেয়সী বাথরুমের জানালা দিয়ে নিশ্চয় পাখি হয়ে উড়ে পালিয়ে গেছে। নইলে ভিতর থেকে উধাও হবার আর কোনো পথ নেই।

কেয়ারটেকার বা পুলিশের লোকেরও ধারণা হল, নরিস বেসামাল হয়েছিল হয়তো, ভিতরে যে ঢুকেছিল সে কখন বেরিয়ে চলে গেছে খেয়াল করেনি—আর বাইরে থেকে দরজার হ্যান্ডেল টানাহেঁচড়ার ফলে হোক বা অন্যকোনো অস্বাভাবিক কারণে হোক ভিতরের ল্যাচ আটকে গেছে। বাইরে থেকে টানাহেঁচড়া করে বা কোনোরকম অস্বাভাবিক কারণে এই দরজার ল্যাচ আটকে যেতে পারে কিন—এই দিনের এই সময়ে তা নিয়ে গবেষণা করার মতো ধৈর্য কারও নেই।

চ্যাটার্জী হতভম্ব নরিসকে একদিকে টেনে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, রাত্তিরে কতটা খেয়েছিলে?

নরিস সত্যি কথাই বলল, কিন্তু চ্যাটার্জীর সংশয় গেল না।

বলল অভ্যেস নেই—ওইটুকুতেই গন্ডগোল হয়েছে।

তাকে বিশ্বাস করানোর ঝোঁকে পকেট থেকে চিরকুট বার করল নরিস, ওই দ্যাখো, আমার কোট গায়ে দিয়ে গেছে, নিজের হাতে নাম বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছে—

চ্যাটার্জী দেখল। রাতের ধকলে তার মাথাও খুব পরিষ্কার নয়। তবু একমাত্র সংগত মন্তব্যই করল সে। বলল, তাহলে তুমি যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট খাচ্ছিলে তখনই বেরিয়ে চলে গেছে সে, তুমি টের পাওনি। নিশ্চয় তোমার মতলব ভালো মনে হয়নি তার তাই—

নরিস তখন আদ্যোপান্ত ব্যাপারটাই বলল তাকে। মতলব যে কার ভালো ছিল না তাও গোপন করল না। শুনে চ্যাটার্জী হা করে চেয়ে রইল তার দিকে—বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেল না।

এদিকে চ্যাটার্জীর ওই শেষের যুক্তিই সম্ভবপর মনে হয়েছে নরিসের। সে যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা তার অলক্ষ্যে তখনই চলে গিয়ে থাকবে। এ ছাড়া কী আর হাতে পারে! তার অনভ্যস্ত জঠরে ওই সামান্য সুরাই হয়তো কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাকে। আর, মেয়েটা যে রুষ্ট হয়েছিল সে তো বোঝাই গেছে—তাই কোনোরকম বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে গেছে।

ঘণ্টা তিনেক নরিসের ঘরেই ঘুমালো চ্যাটার্জী, তারপর নরিস ঠেলে তুলল তাকে। তাকে নিয়ে সে প্যাট মেনডোনসার বাড়ি যাবে কোট আনতে।

ঘুম তাড়িয়ে নরিসের সঙ্গ নিল চ্যাটার্জী। যে মেয়ে ওভাবে নিজেকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল, তাকে একবার দেখার কৌতূহলও ছিল। চিরকুটের নম্বর মিলিয়ে বান্দ্রার বাড়ির ঠিকানায় এসে দাঁড়াল তারা। কড়া নাড়তে এক বৃদ্ধা দরজা খুলে দিলেন।

নরিস প্যাট মেনডোনসার খোঁজ করতে বৃদ্ধটি খানিক চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কে?

নরিস জানালো তারা কে এবং কেন এসেছে। গতরাতের ফাংশনে শীত করছিল বলে প্যাট মেনডোনসা তার কোট গায়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, সেই কোটটা ফেরত নিতে এসেছে তারা। নাম—ঠিকানা লেখা চিরকুটটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল নরিস।

বৃদ্ধা দেখলেন। গম্ভীর। বললেন আচ্ছা, আপনারা বসুন একটু—

ভিতরে চলে গেলেন তিনি। একটু বাদে বাঁধানো একটা ফোটো হাতে ফিরলেন। সেটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখুন তো এর মধ্যে কেউ কাল আপনার কোট নিয়ে এসেছিল কি না।

বৃদ্ধের ব্যবহারে এরা দুজনেই মনে মনে বিস্মিত। সামনে আট দশটি নারী পুরুষের বড়ো গ্রুপ ফোটো একটা। সেটার দিকে একনজর তাকিয়ে আঙুল দিয়ে প্যাট মেনডোনসাকে দেখিয়ে দিল নরিস। বলল, ইনি —

দু—চোখ টান করে বৃদ্ধা নরিসের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। নরিস জিজ্ঞাসা করল, ইনি কি এ বাড়িতে থাকেন না?

থাকত। এখন থাকে না। আমার এই মেয়ে দু—বছর আগে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

নরিস আর তার সঙ্গে চ্যাটার্জীও কি সত্যি শুনছে, নাকি এখনও রাতের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে! সত্যিই কোথায় তারা?

চেতনারহিতের মতো আরও একটু খবর শুনল। বৃদ্ধ জানালেন, বাড়ির সব থেকে সেরা মেয়ে ছিল এই প্যাট মেনডোনসা—মার্টিন ডিসুজা নামে এক ছেলেকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সকলে ধরেও নিয়েছিল বিয়ে হবে। কিন্তু ডিসুজার বাপ মা—র বড়ো গর্ব তারা ব্রাহ্মিণ ক্রিশ্চিয়ান—বিয়ে হতে দিল না। বিয়ে হবে না শুনে মেয়েটার মাথাই বিগড়ে গিয়েছিল, নিজে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল ডিসুজার বাড়ি থেকে—দাদারে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট হল—তক্ষুনি শেষ। অ্যাকসিডেন্টের খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল।

অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটাল নরিস। চ্যাটার্জী ঠেলে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারল না! মুখে কথা নেই। কেমন যেন হয়ে গেছে। খানিক বাদে ফুল কিনল এক গোছা, চ্যাটার্জীকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল :

সমাধি ক্ষেত্র। নিঃশব্দে খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছে দুজনে। বেশি খুঁজতে হল না। হঠাৎ একদিক চোখ পড়তে নিস্পন্দ কাঠ দুজনেই। ওই ছোটো সমাধি একটা। সমাধির ওপর ক্রস। ক্রস—এ ঝুলছে নরিসের সেই কোট। সমাধির গায়ে নামের হরফ—প্যাট মেনডোনসা।

নির্বাক স্তব্ধ দুজনেই। অভিভূতের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সমাধির সামনে হুঁশ নেই।

নরিস ফুল দিল। ক্রস—এর উপর থেকে কোটটা হাতে তুলে নিল। বলল, চলো—

ফিলিপ নরিসের হাতে কোটটা দেখে কি এক অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করছিল চ্যাটার্জী। কিন্তু বলা হয়নি, ওটা থাক।

কুয়াশা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মহীতোষের ডায়েরির কয়েকটা পৃষ্ঠা। সেই ডায়েরি থেকে থানার দারোগা ইউসুফ তাঁর এক বন্ধুকে যেমনটি বলেছিলেন তার জবানিতে :

ভয়ে গা—টা একেবারে কাঁটা দিয়ে উঠল মহীর।

তার সহজ বুদ্ধি—বিবেচনা ও বিচার দিয়ে বুঝতে পারছে, এমনটি হতে পারে না, হওয়া সম্ভবও নয়। তথাপি দু—চক্ষু দিয়ে একটু আগে যা সে দেখেছে, সেটাকে অস্বীকারই বা করে কী করে? এবং একেবারে ভূতুড়ে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়েই বা দেয় কী করে?

কিন্তু আশ্চর্য! ভাবতে গেলে এখনও গা—টা যেন শিরশির করে উঠছে; গায়ের লোমগুলো সোজা হয়ে উঠছে। টেবিলের উপরে রক্ষিত টেবিলল্যাম্পের শিখাটা আরও একটু উসকিয়ে দিল মহী। আলোর শিখাটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই উজ্জ্বল আলোয় তীক্ষ্ন প্রখর অনুসন্ধানী চোখে আরেকবার মহী ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, ঘরের প্রতিটি বস্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নাঃ, নেই কিচ্ছু। অথচ এই একটু আগেও দেখেছে সে স্পষ্ট।

যদিও ঘরের আলোটা ঈষৎ কমানো ছিল, তবু সেই কম আলোতেই সে স্পষ্ট দেখেছে। চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। আলোটা চোখে লাগছিল বলে সামান্য একটু কমিয়ে ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইটা পড়ছিল মহী।

সুন্দর কমনীয় চুড়িপড়া দু—খানি হাত কে যেন তারই ঠিক পাশে টেবিলের ওপর রাখল।

চুড়ির মিষ্টি মৃদু আওয়াজেই তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। একদৃষ্টে কতকটা গভীর বিস্ময়ের সঙ্গেই তার সামনে টেবিলের 'পরে ন্যস্ত চুড়িপরা হাত দুটির দিকে তাকিয়ে ছিল মহী। কী সুঠাম হাত দুটি, টেবিলের পরে ন্যস্ত হয়ে আছে! যেন কোনো দক্ষ শিল্পীর সাদা ক্যানভাসের ওপরে অঙ্কিত দুটি বঙ্কিম রেখা। কিন্তু চোখ তুলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই মহী যেন বিস্ময়ে ও ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কেউ নেই তার সামনে—পার্শ্বে, পশ্চাতে বা ঊর্ধ্বে।

একা সে ঘরের মধ্যে আলোর সামনে বসে আছে। আশ্চর্য, তবে এই একটু আগে সে কার দুটি হাত দেখেছিল তারই সামনে টেবিলের ওপর ন্যস্ত?

এতক্ষণে তার মনে পড়ে, বাড়িটা চমৎকার খোলামেলা দেখে অথচ কম ভাড়ায় সে যখন ভাড়া নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, দু—খানা বাড়ির পরের বাড়িটাতে যিনি থাকেন, রাধানাথবাবু—তখন বারবার করে মহীকে বলেছিলেন, 'ও বাড়ি ভাড়া নেবেন না মহীবাবু, অনেকদিন থেকেই বাড়িটা অমনি খালি পড়ে আছে—'

'কেন বলুন তো?' বাড়িটা তো দেখলাম চমৎকার!'

'হ্যাঁ, বাড়িটা দেখতে শুনতে চমৎকার সন্দেহ নেই, তবে—' রাধানাথবাবু কেমন যেন ইতস্তত করতে থাকেন।

'তবে কি মশাই?'

'মানে বাড়িটা সম্পর্কে নানারকমের কথা শোনা যায়। এর আগেও দু—একজন এসেছেন, তবে টিকতে পারেননি এক রাত্রের বেশি।'

'তাই বুঝি অমন জায়গায় চমৎকার বাড়িটা আজও খালিই পড়ে আছে?' হাসতে হাসতে মহী বলে, 'কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কী বলতে পারেন? ভূতের উপদ্রব আছে বুঝি বাড়িটায়?'

'জানি না মশাই। তবে বছর দুই অমনি 'ভেকেন্ট'ই পড়ে আছে এবং পূর্বে যে দু—চারজন ভাড়াটে এসে উঠেছিল, তারা এক রাত্রির বেশি থাকতে পারেনি—'

হাসতে হাসতে মহী জবাব দিয়েছিল, 'দেখুন রাধানাথবাবু, গত একমাস ধরে বাড়ি খুঁজে খুঁজে আমি সারাটা শহর প্রায় চষে ফেলেছি, কিন্তু আমারও পক্ষে মানানসই হয়—একটু হাওয়া—বাতাস পেয়ে হাত—পা মেলে থাকতে পারি, এমন একটি বাড়ি আজ পর্যন্ত দেখলাম না, যা ভাড়া পাওয়া যাবে। অথচ আমার ও আমার বুড়ি মা—র পক্ষে ওপরে—নীচে চারখানা ঘরওয়ালা ওই বাড়িটা একেবারে ঠিক যেমনটি খুঁজছিলাম, তেমনি। ভূতের ভয়ই থাক আর যাই থাক, এ সুযোগকে হারাতে আর যেই পারুক, আমি পারব না।'

'কিন্তু—'

'না রাধানাথবাবু, ভূতের ভয় তেমন আমার নেই।' মহী হাসতে হাসতে বলে, 'তা ছাড়া সাতাশ বয়স হল, আজ পর্যন্ত বহুকথিত ওই জীবটির দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটেনি, বাড়ি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সৌভাগ্যটা যদি একান্তভাবে উপস্থিত হয়, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাটাও সেই সঙ্গে মিটে যাবে।'

এমনকী বাড়ির মালিক কান্তিবাবুও মহীর বাড়ি ভাড়া নেওয়া সম্পর্কে এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করেননি এবং ভাড়ার কথা বলতে বলেছেন, 'দেখুন আগে আপনার বাড়িটা সুট করে কিনা, তারপর ভাড়ার কথা না হয় ঠিক করা যাবে।'

প্রত্যুত্তরে মহী বলেছে, 'না কান্তিবাবু, সেটি ঠিক হবে না। শেষকালে হয়তো একটা অসম্ভব ভাড়া হেঁকে বসবেন—যা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না!'

'না, না, ভয় নেই আপনার। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি। যদি আপনার থাকা হয়ই, যা ন্যায্য ভাড়া মনে করেন, তাই না হয় দেবেন—'

'মনে থাকে যেন—'

'থাকবে।'

সমস্ত বিচার—বিবেচনা—বুদ্ধি—শক্তি যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে মহীর।

একটু আগে যা সে স্পষ্ট দেখেছে, কোনোমতেই সেটাকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে পারছেই বা কই?

আবার মহী বইটা খুলে বসল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আবার তার মন বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে নিমগ্ন হল। আধঘণ্টাও বোধ হয় হয়নি, মহী আবার দেখল, চুড়িপরা পেলব হাত দুটি এবারে ডান দিকে টেবিলের ওপরে ন্যস্ত হল।

এবার কিন্তু মহী চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ন্যস্ত হাত দুটির দিকে। কী সুন্দর চাঁপার কলির মতো হাতের আঙুলগুলো! বাম হাতের অনামিকায় একটি রক্তপ্রবালের অঙ্গুরীয়। কী সুন্দর নখাগ্র! যেন নখাগ্রগুলোতে কে চন্দনের প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে।

অনিমেষ তাকিয়েই থাকে মহী।

'কী দেখছেন অমন করে? ভয় করছে না আপনার?' সুমিষ্ট মেয়েলি কণ্ঠে প্রশ্ন এল।

তথাপি মহী চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করে না। কী জবাব দেবে ভাবছে। চোখ তুলে চেয়ে দেখবে নাকি?

'কী দেখছেন, বললেন না তো?'

মহী চোখ তুলে তাকাতে লাগল। নাঃ, কেউ নেই। তবে কি সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা ভৌতিক? অবিশ্বাস্য?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত দেড়টা বাজে।

মহীর কেমন যেন একটা রোখ চেপে গেছে মাথার মধ্যে। আবার সে পড়বার ভান করে, কিন্তু পড়ায় মা আর বসে না। দু—চক্ষুর দৃষ্টি তার অধীর অপেক্ষায় টেবিলের দিকে নিবদ্ধ।

তৃতীয়বার। পূর্ববৎ হাত দুটি ন্যস্ত হল টেবিলের ওপরে এবং এবারে বাম দিকে প্রথমবারের মতো।

'আশ্চর্য, আপনি এখনও ঘরের মধ্যে রয়েছেন! ভয় পাননি?' সেই মেয়েলি কণ্ঠ।
'ভয়! ভয় কেন পাবো?' মহী এবারে জবাব না দিয়ে পারে না।
'ভয় পাবেন না মানে? আচমকা এমনি দুটো হাত দেখলে সবাই তো ভয় পায়! তা ছাড়া—'
'তা ছাড়া কী?'
'আমার হাত দুটিই যে আপনার ওই কণ্ঠদেশকে মৃত্যুক্ষুধায় টিপে ধরবে না, কেমন করে জানলেন?'
এবার আর মহী না হেসে থাকতে পারে না। হেসে ওঠে।
'হাসছেন যে? বিশ্বাস হল না বুঝি আমার কথা? জানেন, এই হাতে আমি গলা টিপে আমার স্বামীকে হত্যা করেছি? চেয়ে দেখুন, দেখুন আমার আঙুলের বাঁকানো ধারালো নখরে এখনও রক্তের দাগ শুকিয়ে আছে—'
চমকে উঠল মহী। তবে কি নখাগ্রেও রক্তের দাগ? চন্দন নয়—রক্তচন্দন নয়?
আবার মুখ তুলে তাকাল মহী এবং পূর্ববৎ এবারেও দেখলে যে ঘর শূন্য।
এবং হঠাৎ ঠিক সেই মুহূর্তে দপদপ করে বারকয়েক কেঁপে উঠে টেবিলল্যাম্পটা নিভে গেল। ঘরটায় ভরে উঠল নিশ্ছিদ্র আঁধার। একটা চাপা বিষাক্ত নিশ্বাস যেন অন্ধকার ঘরটার মধ্যে জমাট বেঁধে উঠছে।
'কেন বার বার আমাকে দেখবার চেষ্টা করছেন? আমাকে দেখা যায় না। দেখতে পাবেন না আমাকে, কেবল আমার হাত দুটি ছাড়া। স্বামী—হত্যাকারিণীর মুখ দেখাও যে পাপ, জানেন না এ কথাটা? শোনেননি?'
অন্ধকার যেন কথা বলে উঠল।
'কিন্তু আপনি যেই হোন—ভূত, প্রেতযোনি—জানবেন ভয় দেখিয়ে আমাকে এ—বাড়ি থেকে সরাতে পারবেন না!' মহী এবার বলে ওঠে।
'তাড়াব কেন, থাকুন না। তা আপনাকে একা দেখছি? বিয়ে—থা করেননি বুঝি?'
'আপনারা যে লোকে বাস করেন শুনি, সবকিছুই তো আপনারা দেখতে পান, জানতে পারেন। এ কথাটা জানেন না?'
'কে বললে আপনাকে, আমরা সব কিছু জানতে পারি? আমাদের গতিবিধি শক্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। তার বেশি একচুলও এদিক—ওদিক আমরা এগোতে পারি না।'
'তাহলেও বায়ুর জগতে শুনি লোকে বলে আপনারা বায়বীয় দেহ ধরে বাস করেন, সেদিক থেকে গতি আপনাদের যত্র—তত্র হওয়ারই তো কথা।'
'সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। সব কিছুই আমাদের বায়বীয় হলে কি হয়, সুখ—দুঃখ, ব্যথা—বেদনা, হিংসা—ক্রোধ সবগুলো অনুভূতিই ঠিক আপনাদের মতোই আমাদের বর্তমান।'
কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।
হঠাৎ আবার মহী প্রশ্ন করে : 'এই যে একটু আগে বলছিলেন, আপনি আপনার স্বামীকে হত্যা করেছেন, কিন্তু কেন বলুন তো?'
'সকলকেই যে একঘেয়ে পতিব্রতা হতে হবে, তারই বা কি মানে আছে? তাই পতিঘাতিনী হয়েছি আমি।
'অদ্ভুত যুক্তি আপনার!'
'অদ্ভুত কিনা জানি না, তবে একজন পুরুষকে হত্যা করে আমার আশ মেটেনি—'
'বলেন কি?'
'হ্যাঁ, আপনাকেও হত্যা করবার আমার ইচ্ছে হচ্ছে!'
'সর্বনাশ! আপনার ইচ্ছাটি তো ভালো নয়!'
'তাই বলে ভয় পাবেন না যেন। এতক্ষণ ধরে আপনার মতো কেউ এর আগে আমার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায়নি—'

'না পাওয়াটাই স্বাভাবিক, নয় কি?'

'কিন্তু আর নয়, ভোর হয়ে এল। এবারে আমি আজকের রাতের মতো আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব। কিন্তু সকালে উঠেই পালাবেন না তো?'

'পালাব কেন? পালাবার কোনো কারণই ঘটেনি!' মৃদু হেসে মহী বলে।

পরের দিন সকালে সারাটা রাত্রি জাগরণের পর একটু বেশি বেলা পর্যন্তই মহী ঘুমিয়েছিল। বাড়িওয়ালা কান্তিবাবুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল তার।

কান্তিবাবুও একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন, পরম নিশ্চিন্তে মহীকে ঘরের মধ্যে এত বেলা অবধি ঘুমোতে দেখে।

'ব্যাপার কী? এত সকালে?'

'সকাল কোথায় মহীবাবু? বেলা দশটা বাজে যে! এখনও উঠছেন না দেখে—'

'ভয় নেই কান্তিবাবু, আপনার ভূতের সঙ্গে কাল রাত্রে বেশ আমার, যাকে বলে ভাবই জমে গেছে। বেশ বাড়িটি আপনার। শুধু খোলামেলাই নয়, চমৎকার একটা রোমান্সও এ বাড়িটার সঙ্গে আপনার জড়িত আছে।'

প্রচুর যেন হাসির কথা বলেছে মহী, এইভাবে সে হাসতে লাগল।

কিন্তু পরের দিন রাত্রি সওয়া একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন কারও দর্শন পাওয়া গেল না, কতকটা যেন হতাশার সঙ্গে মহী শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিল এবং গত রাত্রের সেই অদ্ভুত অভিসারিণীর কথাই ভাবতে ভাবতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ একটা শ্বাসরোধকারী আসোয়াস্তি ও বেদনায় ঘুমটা ভেঙে গেল। কঠিন হাতের দশ আঙুল দিয়ে কে যেন শায়িত তার গলা টিপে ধরেছে। উঃ, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে!

তাড়াতাড়ি দু—হাত দিয়ে আততায়ীর হাত দুটো ছাড়াবার চেষ্টা করতেই মহী চমকে উঠল। চুড়ি—পরা দুটি হাত লৌহবেষ্টনীতে তার গলা চেপে ধরেছে। নিয়মিত বারবেল—মুগুর ভাঁজার হাত মহীর। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও অদৃশ্য আততায়ীর লৌহবেষ্টনী হতে নিজেকে যেন মুক্ত করতে পারে না সে।

একি! ক্রমে শ্বাসবন্ধ হয়ে আসছে যে! একটু হাওয়া! একটা গোঁ গোঁ শব্দ মহীর কণ্ঠ হতে বের হবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ এমন সময় সেই অদৃশ্য হস্তের লৌহবেষ্টনী গলার ওপর থেকে শিথিল হয়ে গেল এবং শোনা গেল একটা সুমিষ্ট হাসি। খিল খিল করে আনন্দে কে যেন হাসছে।

টনটন করছে ব্যথায় এখনও মহীর গলাটা।

'কেমন লাগল?' গত রাত্রের সেই নারীকণ্ঠ।

মহীর গলা দিয়ে কোনো স্বর তখনও বের হয় না।

পুনরায় নারী—কণ্ঠে প্রশ্ন হল, 'রোমান্সটা উপভোগ করলেন কেমন? নারীর পেলব বাহুতে চিরদিন আপনারা পুরুষের কামনার পরশই পেয়ে এসেছেন, মৃত্যুর পরশটা পেলব হাতে কেমন লাগল?'

মহী তথাপি কোনো জবাব দেয় না। চুপ করেই থাকে।

'কী ভাবছেন?'

'ভাবছি বিংশ শতাব্দীর নারী আপনি, না সেই আদিম প্রস্তর যুগের বন্য নারী আপনি—'

'বিংশ শতাব্দীর তন্বী নারীও তো সেই আদিম যুগেরই প্রবাহিকা। সেই রক্ত—মাংস, সেই সব—কেবল মাঝখানে হাজার হাজার বছরের একটা ব্যবধান মাত্র।'

'আপনি রাক্ষসী!'

'তবু নারী। এই নারীর জন্যই কি যুগে যুগে হ্যাংলা পুরুষ আপনারা আমাদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াননি? এবং এখনও বেড়াচ্ছেন না? যাকগে সে কথা, গলায় আপনার হাত বুলিয়ে দেব?'

'রক্ষে করুন, যে নমুনা একটু আগে দেখিয়েছেন, আর হাত বুলিয়ে কাজ নেই!'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

'ঠিক এমনি—এমনি ব্যথা লেগেছিল আমার, জানেন? আমাকেও যে গলা টিপে হত্যা করেছিল!'

'কে? কে হত্যা করেছিল আপনাকে?'

'কে আবার! আপনার মতো এক পুরুষ। কিন্তু আমিও তাকে হত্যা করেছি। প্রতিশোধ নিয়েছি। অনেক আশা করে সে এ—বাড়ি করেছিল। ভেবেছিল, আমাকে হত্যা করে আমারই অর্থে তৈরি এই বাড়িতে তার মনোমতো বিবাহিত প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে সুখে বসবাস করবে। নর্তকী—অভিনেত্রীর ভালোবাসা নাকি ভালোবাসাই নয়। কিন্তু নর্তকী—অভিনেত্রী করেছিল অর্থের লোভে কে আমাকে? বিবাহিত স্ত্রীকে অর্থের লালসায় রঙ্গমঞ্চে ঠেলে দিয়েছিল কে?'

'আপনার কাহিনিটা শোনবার বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে।'

'আমার কাহিনি! কোনো নতুনত্ব নেই তাতে। বাংলাদেশে অনেক হতভাগিনীরই জীবনে অমন ঘটনা ঘটেছে। কী শুনবেন সে পুরাতন কথা!'

'কিন্তু তা যেন হল, আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি, তবে আমার পেছনে আপনি লেগেছেন কেন?'

'সব পুরুষই সমান—গোত্র এক।'

'তাহলে আপনি চান যে, এ—বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাই?'

'তা কেন যাবেন? থাকুন না!'

'কিন্তু যেভাবে একটু আগে আজ আমাকে আপনি অভ্যর্থনা করেছিলেন, তার পরে আর থাকতে যে সাহস হচ্ছে না!'

'এই না আপনার ভূতের ভয় নেই বলছিলেন?'

'ভূতের ভয় যে নেই, সে তো আপনি বুঝতেই পারছেন। কিন্তু আপনার মতো পেতনিকে এড়িয়ে চলাই মঙ্গল নয় কি?'

'আমি পেতনি! জানেন, একদিন আমাকে একটিবার রঙ্গমঞ্চে চোখের দেখা দেখবার জন্যে প্রেক্ষাগৃহ ভরে যেত?'

'তখন তো আপনি পেতনি ছিলেন না।'

'ভারি দুঃসাহস তো আপনার! এখুনি যদি আবার আপনার গলা টিপে ধরি?'

'সত্যি সত্যিই ধরবেন নাকি?'

'অসম্ভব নয় কিছু।'

'শুনুন তাহলে, আমি এইমাত্র মনে মনে একপ্রকার স্থির করেছি কি জানেন?'

'কী?'

'এ বাড়ি আমি ছাড়ব না—'

'আমার হাতে মরতে চান নাকি?'

'ক্ষতি কি! সে একটা বিচিত্র নাটকীয় মৃত্যুই হবে। একদিন—না—একদিন মরতে তো হবেই।' তারপর প্রসঙ্গটা পালটে মহী প্রশ্ন করে, 'ঘরটা বড়ো অন্ধকার, আলোটা জ্বালাব?'

'আলো জ্বাললেই আমাকে চলে যেতে হবে—'

'তাই তো আমি চাই।'

'কেন, আমাকে কি আপনি সহ্য করতে পারছেন না?'

'না।'

'বেশ, তবে আমি চললাম—'

মহী বাড়িটা ছেড়ে গেল না বটে কিন্তু তার যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল।

রাত্রি হলেই তার মধ্যে কেমন যেন একটা আত্মহত্যা করবার দুর্নিবার প্রচেষ্টা জাগে। আচমকা ঘুমের মধ্যে নিজের গলা দু—হাতে টিপে ধরে নিজেকে হত্যা করবার চেষ্টা করে।

মা এসেছেন।

তিনি বার বার ছেলেকে বলছেন, এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কোথাও যেতে, কিন্তু মহী কোনোমতেই রাজি হয় না। দিনের বেলাতে সে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, কোনো কিছু বোঝবার উপায় নেই। রাত্রি হলেই বাড়ে তার অস্থিরতা। অধীর আগ্রহে ঘরের দরজা বন্ধ করে কার জন্য যেন প্রতীক্ষা করে। কাউকে সহ্য করতে পারে না।

'এমনি করে কতদিন তুমি এখানে থাকবে?'

মহী জবাব দেয়, 'যতদিন না তুমি আমাকে হত্যা করছ—'

'কিন্তু তোমার এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।'

'তবে আমাকে হত্যা করো। আমিও আর সহ্য করতে পারছি না—'

'বেশ, তবে তাই হোক। তোমাকে হত্যাই আমি করব।'

'হ্যাঁ, তাই করো; আমাকে মুক্তি দাও।'

কিন্তু পারে না সে মহীকে হত্যা করতে।

প্রতি রাত্রের প্রতিজ্ঞা, পরের রাত্রে শিথিল হয়ে যায়।

একজন করে প্রতিজ্ঞা, একজন করে চেষ্টা।

কাহিনির শেষে দেখা গেল। একদিন প্রত্যুষে মহীর হিমশীতল মৃতদেহটা তার ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। গলায় দশ আঙুলের সুস্পষ্ট দাগ।

গলা টিপে শ্বাসরোধ করে কেউ তাকে হত্যা করেছে।

কিন্তু কে?

তার ঘরে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল এবং টেবিলের ড্রয়ারে তার ডায়েরিটা পাওয়া গিয়েছিল।

বাড়িটা আর ভাড়া হয়নি।

ভূতচরিত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভূত নেই বলি কী করে?

এতদিন বুক ফুলিয়ে বন্ধুবান্ধবদের আসরে, সভা—সমিতিতে বলে এসেছি, ভূত শুধু মানুষের ভয়ের ছায়া, দুর্বল মানুষের অসুস্থ কল্পনা।

ভূতে বিশ্বাসী কয়েকজন বন্ধু তর্ক করেছে।

পৃথিবীতে তোমার চেয়ে অনেক পণ্ডিত, বিজ্ঞ লোকেরা ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তুমি চিৎকার করে সে অস্তিত্বে ফাটল ধরাতে পারবে না। সবিনয়ে তাদের বলছি, ভাই পণ্ডিতদেরও ভুল হয়, বিজ্ঞজনেরা প্রমাদমুক্ত নন। বিখ্যাত চিকিৎসকের ভুলের জন্য কত রোগী খতম হয়েছে, প্রথমশ্রেণির উকিলদের ভুলে কত নিরীহ লোক ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছে, তার ঠিক আছে। কাজেই তোমাদের ও প্রমাণ আমি মানতে রাজি নই। যতক্ষণ না আমি নিজের চোখে দেখছি।

বন্ধুরা মারমুখী হয়ে উঠেছে।

তার মানে তোমার স্থূল দেখাটাই আসল। তুমি নিজের চোখে—

তাদের বাধা দিয়ে বলেছি।

তোমরা কি বলবে জানি। আমেরিকা আমি দেখিনি বলে, আমেরিকা নেই? আমার ঠাকুরদার বাবাকে আমি চাক্ষুষ দেখিনি, কাজেরই তাঁরও অস্তিত্ব নেই, এই তো? কিন্তু আমেরিকা ফেরত অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তারা আমেরিকা দেখেছে। আর ঠাকুরদাকে আমি দেখেছি, তাই বৈজ্ঞানিক কারণে তাঁর বাবাও নিশ্চয় ছিলেন। কিন্তু তোমরা কেউ ভূত দেখেছ? এমন কাউকে আমার সামনে হাজির করতে পার, যিনি স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন?

বন্ধুরা আমার মতন নাস্তিক সম্বন্ধে হতাশ হয়ে তর্ক বন্ধ করেছে।

নাস্তিক। কারণ তাদের মতে, ভূত যে মানে না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার বিশ্বাস না থাকাই স্বাভাবিক।

আমি নিজে কিন্তু কম চেষ্টা করিনি।

যেখানে ভূতের গন্ধ পেয়েছি, সেখানে ছুটেছি। পোড়ো বাড়িতে, জলা জায়গায়, তেপান্তরের মাঠে, গোরস্থানে, শ্মশানে, কিন্তু ভূতের দেখা পাইনি।

এমনই করে স্কুল জীবন কাটল। কলেজ জীবনের কিছুটা।

একদিন ক্লাস ছিল না। কমনরুমে বসে গল্প করছিলাম!

নানা ধরনের কথাবার্তা। দেশবিদেশের কথা, চাকরির অবস্থা, সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে ধর্মহীনতার প্রসার! শেষকালে শুরু হল ভূতের কাহিনি।

আমার এক সতীর্থ বলল, মানুষ যত সভ্য হচ্ছে, শহরের প্রসার হচ্ছে, ততই ভূত সরে যাচ্ছে।

আমি হেসে বললাম, ভূত ছিলই না, কোনোদিন, কাজেই সরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না!

আমার কথা শেষ হবার আগেই গুরুগম্ভীর কণ্ঠ কানে এল।

বল কি হে, ভূত নেই?

চমকে ফিরে দেখলাম।

একটু দূরে আর একটা চেয়ারে একজন ছাত্র। বয়সে আমাদের চেয়েও বড়ো। এক মুখ গোঁফ আর দাড়ি। চোখে পুরু পাওয়ারের চশমা।

জানতাম, ছাত্রটির নাম আনন্দমোহন। দর্শনে এমএ. পড়ে।

ভূত দেখবার সাহস আছে?

দলের সবাই চুপচাপ। কেবল আমি বললাম, হ্যাঁ আছে।

আনন্দমোহন চেয়ারটা টেনে আমার পাশে বসল। অনলবর্ষী দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ আমাকে দেখল, তারপর বলল, কিছু হলে আমাকে দায়ী করতে পারবে না।

হেসে বললাম, নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি সাবালক। আপনার কোনো দায় থাকবে না।

বেশ, শোন তাহলে, ক্যানিং লাইনে চেপে চাঁপাটিতে নামবে। ভালো নাম চম্পাহাটি। সেখান থেকে দু—মাইল দূরে খালেশ্বরীর মন্দির। তার পাশেই শ্মশান। অমাবস্যার রাতে সেই শ্মশানে গিয়ে রাত কাটিয়ে ফিরে আসতে হবে, অবশ্য যদি তোমার বরাতে ফিরে আসা থাকে।

এরকম ভয় দেখানো কথা আগেও অনেক শুনেছি। অন্য শ্মশানে অন্ধকারে রাতও কাটিয়েছি। কিছু দেখতেও পাইনি। আমার কোনো ক্ষতিও হয়নি।

তাই বললাম, কিন্তু আমি যে সত্যি খালেশ্বরী মন্দিরের শ্মশানে গিয়েছি, তা আপনার কাছে প্রমাণ করব কী করে?

আনন্দমোহন মাথা নাড়ল, তার উপায় আছে। খালেশ্বরী মন্দিরের পাঁচিলে অদ্ভুত পরগাছা আছে। মানুষের আঙুলের মতন লম্বা পাতা। পাঁশুটে রঙের ফুল হয়। এ ধরনের গাছ অন্য কোথাও দেখিনি। তা ছাড়াও আর এক ব্যাপার আছে। সেই পরগাছার পাতায় পাতায় চিতার ধোঁয়ার গন্ধ! মড়া পোড়ানোর চামড়ার আঁশটে গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। সেই গাছের পাঁচটা পাতা তুলে আনতে হবে।

ঠিক আছে, আমি রাজি।

আনন্দমোহন আমার সঙ্গে চম্পাহাটি পর্যন্ত যাবে। সেখানে তার এক মাসির বাড়ি। রাত হলে আমি চলে যাব শ্মশানে। পরগাছার পাতা নিয়ে ভোরবেলা ফিরে আনন্দমোহনের সঙ্গে দেখা করব।

যদি পারি, আনন্দমোহন পেট পুরে 'কলেজ কেবিনে' খাওয়াবে তা ছাড়া করকরে দশ টাকার একটা নোট দেবে।

আনন্দমোহনের মেসো অনেক বারণ করল।

বাবা, ওসব গোয়ার্তুমি করতে যেয়ো না। জায়গাটা খুবই খারাপ। তান্ত্রিকরা উপাসনা করেন। অমাবস্যায় নির্ঘাৎ ওঁদের আবির্ভাব হয়।

হেসে উত্তর দিলাম, ওঁদের সঙ্গে মোলাকাত করতেই তো যাচ্ছি।

আমি যখন নাছোড়বান্দা, তখন আনন্দমোহনের মেসো একটা রুদ্রাক্ষ নিয়ে হাতে বেঁধে দিয়ে বলল, রাম রাম। বিপদে পড়লে রামনাম জপ করবে। আর কী বলব বাবা, এসব সর্বনেশে খেলায় মেতো না। কোনোদিন মুশকিলে পড়ে যাবে।

রাত আটটায় খাওয়া—দাওয়া সেরে শ্মশানের দিকে রওনা হলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভালো করে পথ দেখাই যায় না। ঝোপে ঝোপে জোনাকির ঝাঁক। কয়েকবার বিশ্রী সুরে পেঁচা ডেকে উঠল। ঝিঁঝির আওয়াজ।

এসবে আমি অভ্যস্ত। এর আগে বাজি রেখে বার তিনেক নানা জায়গার শ্মশানে গিয়েছি। মড়ার খাট থেকে গাঁদা ফুলের মালা ছিঁড়ে এনেছি।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর শ্মশানে পৌঁছলাম। এতটা সময় লাগার কথা নয়। মনে হয় পথ হারিয়েছিলাম।

শ্মশানের কাছাকাছি আসতেই তীব্র মাংসল গন্ধে বমি আসতে লাগল।

বুঝতে পারলাম বোধহয় মড়া পোড়ানোর গন্ধ।

অথচ কাছে গিয়ে কোনো চিতা দেখতে পেলাম না।

একটু ঘোরাঘুরি করেই বুঝতে পারলাম, উগ্র গন্ধ আসছে খালেশ্বরী মন্দিরের দিক থেকে।

কাছে গিয়ে টর্চ জ্বালালাম। গন্ধের জন্য নাকে রুমাল চাপা দিলাম।

এই সময় এলোমেলো হাওয়া উঠল। পরগাছাগুলো শিরশির করে কেঁপে উঠল।

কী আশ্চর্য, ঠিক যেন আঙুল নেড়ে আমাকে কাছে ডাকছে।

ভোরবেলা ফেরার সময় এই পরগাছার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে যাব।

আবার শ্মশানের দিকে ফিরলাম।

স্থির জোনাকির মতন অনেকগুলো আলো। বুঝতে অসুবিধা হল না, ওগুলো শিয়ালের চোখ। তাদের রাজত্বে আমার অনাহূত উপস্থিতিতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কাছে যেতেই ছুটে পালাল।

অদ্ভুত একটা শোঁ শোঁ শব্দ। মড়ার খুলির মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হলে এ ধরনের শব্দ হয়।

আর একটু এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

উঁচু ঢিবির ওপর বাঁশের খাট। তার ওপর একটা মড়া। মুখ ঢাকা। ধারেকাছে কোনো লোক দেখতে পেলাম না।

সরে এলাম। এদিকটা অনেকগুলো গাছের জটলা। তার তলায় মিটমিট করে লণ্ঠন জ্বলছে।

যাক সম্ভবত কোনো লোক আছে ওখানে। শ্মশানে সারাটা রাত একলা থাকতে হবে না।

কাছে গিয়ে দেখলাম, লণ্ঠন মাঝখানে রেখে দু—জন লোক চুপচাপ বসে আছে। পরনে গেঞ্জি আর ধুতি। বিস্ফারিত চোখ। গালের চোয়াল প্রকট।

কে আপনারা?

বার দুয়েক প্রশ্ন করতে উত্তর মিলল।

আমরা মড়া পোড়াতে এসেছি।

শুধু দুজন?

আরও দুজন গাঁয়ে গেছে কাঠ কিনতে। অনেকক্ষণ গেছে ফিরছে না কেন কে জানে। নেশা করে কোথাও পড়ে নেই তো।

আমি তাদের কাছে বসে পড়লাম। যাক, সারাটা রাত অন্তত মুখ বুজে থাকতে হবে না। কথা বলবার লোক পাব।

একজন আমার দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল।

আপনি এখানে কেন?

বললাম, বেড়াতে এসেছি।

উত্তর শুনে দুজনেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল।

শ্মশানে বেড়াতে? ভালো, ভালো। বেড়াবার আর জায়গা পেলেন না?

মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, ভূত দেখতে এসেছি।

আবার সেই খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি।

খাঁচা এনেছেন?

খাঁচা? খাঁচা কী হবে?

কেন, ভূত দেখতে পেলে ধরে নিয়ে যাবেন।

বুঝলাম ঠাট্টা করছে। কোনো উত্তর দিলাম না।

কিন্তু কতক্ষণই বা চুপচাপ থাকা যায়!

এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কে মারা গেলেন?

আমাদের দাদা।

আবার চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পর একজন আরেকজনকে বলল, এ তো মুশকিল হল। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকব। এত দেরি তো হবার কথা নয়।

চল, একটু এগিয়ে দেখি।

লণ্ঠন তুলে নিয়ে ওরা উঠে দাঁড়াল।

আপনি বসে বসে শ্মশানে হাওয়া খান মশাই। আমরা গাঁয়ের দিকে একটু এগিয়ে দেখি।

বসে বসে দেখলাম লণ্ঠনের ম্লান দীপ্তি গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। হাওয়ায় গড়াতে গড়াতে পায়ের কাছে কি একটা ঠেকল। হাতে করে তুললাম।

নরমুণ্ড! কী আশ্চর্য, হাতে করতেই যেন নড়ে উঠল। জীবন্ত বস্তুর মতো। মাটিতে ফেলে দিতেই আবার গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল।

বুঝতে পারলাম মনের ভুল। মনের ভুল, না মনের ভয়।

ভয় ঝেড়ে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

হাঁটতে হাঁটতে ডোবার ধারে গিয়ে হাজির।

ধারে একটা হিজলগাছ। তাতে হেলান দিয়ে বসলাম।

বোধহয় তন্দ্রা এসে গিয়ে থাকবে, গায়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে চমকে জেগে উঠলাম।

টর্চের আলোয় হাতঘড়ি দেখলাম। রাত তিনটে। তার মানে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আর ঘণ্টাখানেক। চারটের সময় এখান থেকে রওনা হলে ছ—টা নাগাদ আনন্দমোহনের মাসির বাড়ি পৌঁছে যাব।

তার আগে পরগাছার পাতাগুলো ছিঁড়ে নিই।

আবার মন্দিরের কাছে এলাম। হাত বাড়িয়ে পাতা ছিঁড়তে গিয়েই বিপদ। কিছুতেই ছিঁড়তে পারলাম না। কী শক্ত পাতা।

শুধু তাই নয়। মনে হল কে যেন আমাকে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করছে, বাধা দিচ্ছে। কিছুতেই পাতা ছিঁড়তে দেবে না।

মনে পড়ে গেল, পকেটে ছুরি আছে।

ছুরি বের করে পাঁচটা পাতা কেটে নিলাম। ঠিক মনে হল, মানুষের দেহের ওপর যেন ছুরি চালাচ্ছি।

তারপরই অবাক কাণ্ড। কাটা পাতা থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল।

রক্ত মানে লাল রঙের রস।

পাতা পাঁচটা রুমালে বেঁধে শ্মশানে ফিরে এলাম।

মিট মিট করে লণ্ঠন জ্বলছে। তাহলে, লোকগুলো বোধহয় ফিরে এসেছে। লণ্ঠনের কাছে গিয়েই চমকে উঠলাম।

সারি সারি তিনটে খাটিয়া।

কিন্তু লোকজন কোথায়? এরা এলই বা কখন।

টর্চের আলো ফেললাম খাটিয়ার ওপর, তারপর মনে হল পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা একটা শিহরন। আমার সমস্ত শরীর টলতে লাগল।

এ কী করে হল!

তিনটে খাটিয়াতে এক মড়া। এক বয়স, একরকম দেখতে।

লণ্ঠন নিযে যে দুজন বসেছিল, এখন মনে পড়ল, তাদের দুজনেরও একরকম চেহারা। সেই চেহারা খাটিয়ার ওপর।

এবার বুঝতে পারলাম, বেশ একটু ভয় ভয় করছে।

কোনো যুক্তি দিয়েই মনকে বোঝাতে পারলাম না। এরকম কী করে হতে পারে।

শ্মশানে থাকতে সাহস হল না।

চম্পাহাটির দিকে রওনা হলাম।

পিছন ফিরতেই মনে হল কারা যেন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। নাকিসুরে বলে উঠল, খাঁচা এনেছেন? ভূত নিয়ে যাবেন কিসে?

সেবার বাজি জিতেছিলাম বটে, আনন্দমোহনের প্রশংসাও পেয়েছিলাম, কিন্তু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে রইল।

ভূত যদি নেই, তাহলে একই চেহারার তিনটে মড়া পাশাপাশি দেখলাম কী করে। বিশেষ করে যে দুজনকে কিছুক্ষণ আগে জীবন্ত দেখেছি, কথা বলেছি, তারাই মড়া হয়ে খাটিয়ায় শুয়ে!

ভৌতিক না হলেও, অলৌকিক তো বটেই।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। ভূতের কথা ভাববার আর অবসর পাইনি। ডাক্তারি পড়া নিয়ে প্রাণান্ত। পাঁচ বছরের কোর্স, শেষ হল সাত বছরে। পরীক্ষার মুখে ঠিক একটা করে ঝঞ্ঝাট।

তারপর হাসপাতালে এক বছর। হাউস সার্জেন হিসাবে।

জীবনের বীভৎস দিকটার সঙ্গে পরিচিত হলাম। সেই সময় সারা শহরে খুনোখুনির রাজত্ব। সময় নেই, অসময় নেই, গাদা গাদা মড়া মর্গে এসে পৌঁছাতে লাগল। বোমায় কারও হাত—পা উড়ে গেছে, ছোরার আঘাতে কারও পেটের নাড়িভুঁড়ি বাইরে এসে পড়েছে। আবার পথ—দুর্ঘটনার বলিও আছে। লরি কিংবা বাসের তলায় থেঁতলানো দেহ।

এইসব মড়া চিরে রিপোর্ট দিতে হত। এই কাজে আমার সহায় মাধাই ডোম। সেই অর্ধেকের বেশি কাজ করে দিত।

খালেশ্বরীর সেই পরগাছার গন্ধে একদিন নাকে রুমাল চাপা দিতে হয়েছিল, কিন্তু এখন স্তূপীকৃত মড়ার গাদার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে কোনো গন্ধ পাই না।

এক রাতে ঘুমে অচেতন ছিলাম, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা।

ডাক্তার সাহেব। ডাক্তার সাহেব।

অল্প ডাকেই ইদানীং ঘুম ভেঙে যেত। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেখলাম মাধাই ডোম দাঁড়িয়ে।

কী খবর জানাই ছিল, তবু জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার?

একটা মড়া এসেছে হুজুর।

তাড়া কীসের। কাল সকালেই হবে।

না, আপনি একবার আসুন।

আশ্চর্য লাগল। মাধাই ডোমের এক আগ্রহ দেখিনি এর আগে।

পোশাক বদলে মর্গে চলে এলাম।

মেঝের ওপর স্ট্রেচারে শোয়ানো রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ঘুমাচ্ছে।

বছর উনিশ কুড়ির বেশি নয়। একমাথা ঢেউখেলানো চুলের রাশ। কালো চুলের মাঝখানে পদ্মের মতো ঢলঢলে একটি মুখ। মুখে কোনো বিকৃতি নেই, একটু কুঞ্চন নয়।

কে নিয়ে এল?

পুলিশ।

মারা গেল কীসে?

উত্তরে মাধাই ডোম দেহটা উপুড় করে দিল।

পিঠের দু—জায়গায় গভীর ক্ষত চিহ্ন। মনে হল ধারালো ছোরা দিয়ে দু—বার আঘাত করা হয়েছে।

মাধাই ডোম আজকাল অনেক বিজ্ঞ হয়েছে। গম্ভীর গলায় বলল।

পার্টির ব্যাপার হুজুর। আজকাল যা হয়েছে।

নিজের কাজ শুরু করলাম। ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগল না। রিপোর্ট লেখাও শেষ।

মাধাই ডোমকে জিজ্ঞাসা করলাম।

বডি নিতে কেউ এসেছে?

না হুজুর, এখনও হয়তো সর্বনাশের খবরই পায়নি।

তা ঠিক। কাল খোঁজ পড়বে।

পরের দিনও কেউ এল না। পুলিশ মৃতদেহের ফোটো নিয়েছিল। তার ফোটোও ছাপিয়ে দিয়েছিল বড়ো বড়ো খবরের কাগজে।

দিন চারেক পার হয়ে গেল। দেহ নিতে তবুও কেউ এল না।

ওষুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে মৃতদেহ ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। যাতে গন্ধ না বের হয়, কিন্তু দেহ আটকে রাখবার একটা সীমা আছে।

মাধাই ডোম এসে তাগাদা দিতে লাগল।

হুজুর, আর কতদিন আটকে রাখব? হুকুম দিন, গাদায় পুড়িয়ে দিই।

মাধাই ডোমের উদ্দেশ্যও ছিল।

অনেক হাড়ের ব্যবসায়ী চড়া দামে কঙ্কাল কিনতে চায়। বেওয়ারিশ লাশ তাদের পাচার করে দেওয়া খুব লাভজনক।

যখন ভাবছি কী করব, তখন একজন ছাত্র এসে খবর দিল, স্যার একটি ছোকরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

এরকম অনেকেই আসে। আত্মীয়স্বজনকে হাসপাতালে ভরতি করতে চায়, কিংবা মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। ওষুধ গছাতে উৎসাহী।

দুটো ব্যাপারেই আমার কোনো হাত ছিল না। তবু ছোকরাকে ডেকে পাঠালাম। মাধাই ডোমকে বললাম, পরে দেখা করতে।

ছোকরা আমার ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠলুম।

চেহারায় এমন মিল হয়? মৃতা মেয়েটির সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য। মুখ, চোখ, রং একরকম। মেয়েটিই যেন পুরুষের বেশ পরে এসেছে।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম।

কী চাই?

আমার বোন আভার বডিটা নিতে এসেছি। ছোরা মারার কেস।

এত দেরি হল আপনার?

আমি অনেক দূর থেকে আসছি। খবরের কাগজে ফোটো দেখে চিনতে পেরেছি।

কথাগুলো বলার সময়ে ছোকরার গলা অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল।

মৃদুকণ্ঠে বলল, দেশ থেকে এ হানাহানি কবে যে শেষ হবে!

আমি বলেই ফেললাম।

আপনার সঙ্গে আপনার বোনের চেহারার কিন্তু অদ্ভুত মিল।

ছোকরা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে দেখল, তারপর বলল।

সত্যি কথা বলতে কী, আমরা যমজ। আমি আভার চেয়ে সাত সেকেন্ডের বড়ো।

বডি ছেড়ে দেবার জন্য যা প্রয়োজন করে দিলাম।

মনে একটু সান্ত্বনা পেলাম, যাক মেয়েটির দেহের সদগতি হবে।

ব্যাপারটা ঘটল ঠিক পরের দিন।

কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে হাসপাতালে ঢুকছি, মাধাই ডোমের সঙ্গে দেখা।

হুজুর, আর একটা লাশের খদ্দের এসেছে।
কে? কোন লাশের?
সেই ছোরা মারার কেস হুজুর। অল্পবয়সি মেয়েটার।
বলিসনি, কাল তার ভাই লাশ নিয়ে গেছে?
বলেছি হুজুর। ভদ্রলোক একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।
বিরক্তিকর। বললাম, আসতে বল।
ভদ্রলোক ঢুকল। প্রৌঢ়। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা। খুব গম্ভীর চেহারা।
আমি বললাম, আপনি ডোমের কাছে শোনেননি?
হ্যাঁ, শুনেই তো আপনার কাছে এসেছি? সত্যি কথাটা জানতে।
এ আর সত্যি মিথ্যে কি? ভাই এসে লাশ নিয়ে গেছে। যমজ ভাই।
সামনে রাখা চেয়ারে ভদ্রলোক বসে পড়ে বলল, যমজ ভাই? মানে, অঞ্জু এসে বডি নিয়ে গেছে?
নাম মনে নেই। খাতায় লেখা আছে, দেখতে পারেন। আপনি কে?
আমি আভার বাবা।
বাবা?
হ্যাঁ। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে রেবতীপুরে থাকি। রেবতীপুর অজ পাড়াগাঁ। বর্ধমান থেকে ত্রিশ মাইল। আমার মেয়ে আভা এখানে কী করত আমি জানি না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। শুনেছি বাজে লোকের খপ্পরে পড়েছিল। চালের চোরাকারবার করত!
ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে ভাঁজ করা খবরের কাগজ টেনে বের করল।
কাল কাজে বর্ধমান এসেছিলাম। কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন। জিনিস কিনে গাঁয়ে ফিরছি। সেই কাগজের মোড়কে আভার ছবি। অবাধ্য হোক, যাই হোক, মেয়ে তো। সকালেই ছুটে চলে এলাম।
কিন্তু আপনাকে তো বললাম, আপনার ছেলে এসে বডি নিয়ে গেছে।
তা কী করে হয়?
ভদ্রলোক অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখল।
না হবার কী আছে। আপনার মতন তিনিও খবরের কাগজ দেখে চলে এসেছেন।
কিন্তু, ভদ্রলোক ধরা গলায় বলল, অঞ্জু তো আজ পাঁচ বছর মারা গেছে। বাস দুর্ঘটনায়।
এবার আমি সোজা হয়ে বসলাম, সেকি?
সেইজন্যই তো আশ্চর্য লাগছিল। অঞ্জু আসবে কী করে।
অনুভব করতে পারলাম, শরীরের রক্ত মুখে এসে জমল। অনেক বছর আগে খালেশ্বরীর মন্দিরের পাশে শ্মশানের সেই অভিজ্ঞতা মনকে আচ্ছন্ন করল।
দুটো ঘটনাই তো আমার নিজের চোখে দেখা।
কী করে অস্বীকার করব! কোন যুক্তিতে!

পুষ্করা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হাজরা তর্করত্ন কালীপুজোয় বসেছিলেন।

শুক্লা চতুর্দশীর রাত। আশ্বিনের জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশ। কোথা থেকে রাশি রাশি কালো মেঘ এসে সে শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সন্ধ্যায় নদীর যে জল গলানো রুপোর মতো ঝলমল করছিল, তার রং এখন কালো আর পিঙ্গলে মিশে যেন হিংস্রতার রূপ নিয়েছে। আর একবার খানিকটা কারণ গলাধঃকরণ করে তর্করত্ন ভয়ার্ত বিহ্বল চোখে তাকালেন। ওপরের বন—জঙ্গলগুলো রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন আর আকারহীন বিভীষিকার মতো জেগে রয়েছে। বাতাসে শীতের আভাস। তর্করত্নের মনে হল, তবুও তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে আগুন জ্বলছে, রোমকূপের রন্ধ্রপথে আগুনের কণার মতো বেরিয়ে আসছে ঘামের বিন্দু।

শুক্লা চতুর্দশী। রাতে কালীপুজো—কথাটা শুনতে অশোভন আর অশাস্ত্রীয় ঠেকছে। কিন্তু এ সাধারণ কালীপুজো নয়! আশেপাশে দশখানা গ্রাম জুড়ে মড়ক দেখা দিয়েছে, কলেরার মড়ক। আর সে কি মৃত্যু! ছ—মাসের শিশু থেকে ষাট বছরের বুড়ো—দিব্যি আছে কোনো রোগব্যাধির বালাই নেই, হঠাৎ কাটাত কই মাছের মতো ধড়ফড় করে মরে যাচ্ছে। তাই দেবীর কোপ শান্ত করবার জন্যে শ্মশানে শ্মশানে কালীপুজোর আয়োজন। অসহায় বিপন্ন মানুষ তিথি—নক্ষত্রের দোষ মানে না।

পাশেই একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। তার সাদা দীপ্তিটা যেন নীলাভ হয়ে আসছে, তেল ফুরিয়ে গেছে বোধ হয়। আলোটার ওপরে নীচে নানা জাতের ছোটো—বড়ো পোকা এসে জমেছে স্তূপাকারে। তারই অদূরে বসে কাশী কুমোর গাঁজা খাচ্ছে গায়ের ওপর থেকে পোকা তাড়াচ্ছে ক্রমাগত।

মুখ থেকে গাঁজার কলকে নামিয়ে কাশী কুমোর বললে, এল?

অসহায় কাতর দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে তর্করত্ন বললেন, নাঃ, কোনো পাত্তাই তো দেখছি না।

কাশী বললে, রাত তো কাবার। ভোগ হয়ে গেছে কতক্ষণ। ও আজ আর আসবে না।

—আসবে না? আসবে না মানে?—বীরাসনে বসেও রক্তবস্ত্রধারী তর্করত্নের আপাদমস্তক থর থর করে কেঁপে উঠল।

—না এলে কী হবে জানিস? পুষ্করা হবে। কারও রক্ষা থাকবে না, তোর নয়, আমার নয়—শ্মশানকালীর খাঁড়ায় কেটে কুটে একসা হয়ে যাবে সমস্ত। একটি মানুষেরও আর বাঁচবার জো থাকবে না।

কাশী কুমোরের হাত থেকে গাঁজার কলকে খসে পড়ে গেল।

—ডাকো না ঠাকুর, ভালো করে মাকে ডাকো। এতকাল পুজো—আচ্চা করলে, এতবড়ো পণ্ডিত তুমি, আর দেবীকে ভোগ খাওয়াতে পারলে না? ডাকো ডাকো, প্রাণপণে ডাকো।

শুকনো মুখে তর্করত্ন বললেন, ডাকছি তো, কিন্তু—

একটু দূরে আধো অন্ধকারের মধ্যে বড়ো একখানা কলাপাতায় স্তূপাকারে লুচি সাজানো আর খানিকটা মাংস। তার ওপরে বড়ো একটা জবাফুল, পেট্রোম্যাক্সের আলোতে চাপাবাঁধা খানিকটা রক্তের মতো দেখাচ্ছে। সেদিকে দু—খানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তর্করত্ন আবেগ—ভরা কম্পিত গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন, দেবি, প্রসন্ন হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করো, জগৎকে রক্ষা করো—

কিন্তু কোথায় দেবী!

নিশিরাজের শ্মশান। শুধু শ্মশান বললে কম বলা হয়— এ মহাশ্মশান। অগভীর আর পঙ্কস্রোতা নদীর ধারে ধারে প্রায় তিন মাইল জুড়ে এই শ্মশান ছড়িয়ে পড়ে আছে, কত যে মড়া এখানে পুড়তে আসে, তার হিসেব দেওয়া দুঃসাধ্য। আধপোড়া হাড়, মানুষের মাথা, চিতার পয়লা, পোড়া বাঁশ আর রাশি রাশি ভাঙা কলশী, প্রতি বছর বানের সময় নদীর পাড় ভাঙে : মুছে নিয়ে যায় অসংখ্য চিতার অঙ্গার—চিহ্ন, মড়ার মাথা আর পোড়া হাড়ের টুকরোয় তার গর্ত ভরাট হয়ে ওঠে। তার পরেই আবার নতুন চিতা এলে লকলকে আগুনের শিখা প্রতিফলিত হয় অস্বাস্থ্যকর লালচে জলের ওপর, শ্মশান ক্রমশ এগিয়ে আসে লোকালয়ের কোল পর্যন্ত। আগে যেখানে মড়া নিয়ে যেতে হলে তিনখানা পর পর পোড়ো জমি মাঠ পেরিয়ে যেতে হত, এখন সেখান থেকে হরিধ্বনি দিলে গ্রামের ঘরে ঘরে তার সাড়া জেগে ওঠে।

তর্করত্ন পেছন ফিরে তাকালেন। নিঃশব্দ ঘুমন্ত গ্রাম। আতঙ্কে মূর্ছিত—মৃত্যুতে অসাড়। যে বাড়িতে সাতটি লোক ছিল তার চারটিই হয়তো মরে শেষ হয়ে গেছে, একজনের হয়তো ভেদবমি ধরেছে আর বাকি দু—জন খুব সম্ভব শহরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। শুক্লা চতুর্দশীর রাতকে কালো মেঘ অমাবস্যার মুখোশ পরিয়েছে—এক কোণে থেকে থেকে বিদ্যুতের সর্পিল চমক; একটা নিষ্ঠুর রক্তাক্ত হাসির মতো নদীর কালো জলকে উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে।

—দেবী, প্রসীদ, প্রসীদ—

কাতর আর্তকণ্ঠে তর্করত্ন আহ্বান করছেন। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলেছে রাত্রির প্রহর, একপাশে রাখা টাইম—পীসটার কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে আড়াইটের ঘরে। তর্করত্নের হৃৎপিণ্ডে উচ্ছলিত রক্তের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘড়ির কাঁটার তাল পড়ছে—টিক টিক টিক। রাত যদি ভোর হয়ে যায়, দেবী যদি শিবাভোগ গ্রহণ না করেন, তা হলে—তা হলে—তর্করত্ন আর ভাবতে পারছে না! অনিবার্য পুষ্করা। আর তার ফলে শুধু এই গ্রাম নয়, সমস্ত দেশ শ্মশানকালীর কোপে শ্মশান হয়ে যাবে। পুরোহিত, কুমোর কারও রক্ষা নেই। টাকার লোভে বিদেশে এসে শেষে তার সর্বনাশ হয়ে গেল।

গাঁজার ঝোঁকে কাহী কুমোর ঝিমুচ্ছে। কেশব ঢুলী ঢাকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কেমন করে ওরা ঘুমুচ্ছে—আশ্চর্য! গ্রামের দিক থেকে মাঝে মাঝে এক—একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে —নিজের রক্তের মধ্যেও যেন তর্করত্ন শুনতে পাচ্ছেন সেই কান্নার প্রতিধ্বনি। বাতাসে পচা পোড়ার গন্ধ ভাসছে—মুখে আগুন ছুঁইয়েই গ্রামের লোক মড়া ফেলে গেছে এখানে ওখানে। নদীর দুর্গন্ধ আবদ্ধ জলে সাদা মতন ওটা কী ভাসছে; একটা মানুষ যে অমন অতিকায়ভাবে ফুলে উঠতে পারে এ যেন কল্পনাই করা যায় না! ঝোপে—ঝোপে শেয়ালের ডাক উঠেছে, আর তার জবাব দিচ্ছে মড়াখেকো শ্মশান কুকুরের একটানা কান্নার মতো অস্বাভাবিক আর্তনাদ!

চারিদিকে এত শেয়াল, অথচ দরকারের সময় একটার দেখা নেই!

শিবাভোগ। শেয়াল এসে ভোগ গ্রহণ না করলে পুজো ব্যর্থ হয়ে যাবে। তর্করত্ন বৈজ্ঞানিক যুগের চিন্তাধারার মানুষ নন; তিনি শাস্ত্র বিশ্বাস করেন, দেবীর মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন। সারাজীবন এই করেই তাঁর কেটেছে। পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি আছে, নানা জায়গা থেকে ক্রিয়াকর্মে তাঁর ডাক আসে; বাংলা দেশের বহু বড়োলোকের বাড়ি থেকে সসম্মানে বিদায় পান তিনি। তিনশো টাকা দক্ষিণার লোভ দেখিয়ে গ্রামের সমৃদ্ধ মহাজন আর তালুকদার বলাই ঘোষ তাকে ডেকে এনেছে দেবীর কোপ শান্ত করবার জন্যে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার নিজের হাতে কামড় খেতে ইচ্ছে করছে, সমস্ত চেতনা চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চাচ্ছে। এমন বিপদে তিনি জীবনে আর পড়েননি।

বলাই ঘোষও সামনে নেই। তাকে পুজোয় বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়িতে গিয়ে বোধ হয় ঘুম লাগিয়েছে, হয়তো ভেবেছে আর ভাবনা নেই! তর্করত্নের মতো সিদ্ধপুরুষ, পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে যিনি দৈনন্দিন কালীপুজো করেন, তিনি অনায়াসেই গ্রাম থেকে সমস্ত মড়ক আর আদিব্যাধির বালাই দূর করে দিতে পারবেন। কিন্তু তর্করত্ন যে কী সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে বলির পশুর মতো কাঁপছেন, একথা বলাই ঘোষের

ভাববারও ক্ষমতা নেই। একবার বলাই ঘোষকে সামনে পেলে—তর্করত্ন হিংস্রভাবে ভাবতে লাগলেন—বলাই ঘোষকে সামনে পেলে তিনি পইতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিতেন: সবংশে দেবীর উদরে যাও তুমি, তুমি উচ্ছন্নে যাও!

ঝিমুতে ঝিমুতে কাশী কুমোর হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

—কী ঠাকুর, কী খবর?

—খবর আবার কী? যা কপালে আছে, তাই হবে।—কথার শেষদিকটা কান্নায় কাঁপতে লাগল।

—শেয়াল এল না?

—নাঃ। —তর্করত্নের চোখে এবার অশ্রু ছলছল করে উঠল।

—ও আর এসেছে। কত মড়া পাচ্ছে খেতে, খিদে তেষ্টা তো নেই। আর তাজা মানুষের রক্তেই দেবীর পেট ভরছে। তোমার ওই শুকনো চিমসে লুচি আর পোয়াটাক বোকা পাঁঠার মাংস খেতে তো বয়েই গেছে তাদের।

—তুই থাম হারামজাদা—বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন তর্করত্ন : যা বুঝিসনে, তার ওপর কেন কথা কইতে যাস?

হে—হে—হে—নির্বোধ শব্দ করে কাশী কুমোর হেসে উঠল। গাঁজার নেশায় তার ভয়—ডর ভেঙে গেছে। —আচ্ছা, থামলাম। ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয়। আমার তো সবই ওলা—দেবীর পেটে গেছে। বউ ব্যাটা সমস্তই। পুষ্করাই লাগুক আর ঘোড়ার ডিমই লাগুক—ওতে আমার কী হবে ঠাকুর।

তা বটে, তার কিছুই হবে না। কিন্তু তর্করত্নের তো তা নয়। তাঁর ঘর আছে, সংসার আছে, ছেলেপিলে আছে। তিনি মরলে তাদের খেতে দেবে এমন কেউ নেই। তিনশো টাকা তাদের বাঁচিয়ে রাখবে ক—দিন। আর এই দুর্ভিক্ষের বাজার। মৃত্যু যেন চারদিক থেকে কালো হাত বাড়িয়ে মানুষকে তেড়ে আসছে—একেবারে সমস্ত গ্রাস না করে তার খিদে আর মিটবে না। না খেয়ে মরছে, খেয়ে কলেরা হয়ে মরছে। পুষ্করার বাকি আছে কোথায়।

সামনে কালী মূর্তি। কাঁচা কালো রং জ্বলজ্বল করছে, ঘামের মতো টপটপ করে তার দু—এক বিন্দু ঝরে পড়ছে দেবীর পায়ের তলায়—মহাদেবের সমস্ত মুখে এঁকে দিয়েছে বিষাক্ত ক্ষতের চিহ্ন। সমস্ত মূর্তিটা যেন জীবন্ত—চোখ দুটো রক্তে মাখা! এ মূর্তিও সাধারণ নয়, তৈরি করতে হয় শ্মশানে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয় শ্মশানচিতার কয়লা, তারপর রাতারাতি বিসর্জন দিতে হয়। তাড়াতাড়িতে তৈরি করতে গিয়ে কাশী কুমোর দেবীর মূর্তিকে ঠিক দেবী করে গড়ে তুলতে পারেনি, সবটা মিলিয়ে একটা পৈশাচিক বীভৎসতার সৃষ্টি হয়েছে। পেট্রোম্যাক্সের আলোয় তার একটা দীর্ঘ ছায়া পেছনে নদীর জলে গিয়ে পড়েছে স্রোতের টানে সেই ছায়াটা কাঁপছে—পচা পোড়ার দুর্গন্ধে যেন নিশ্বাস আটকে আসছে তর্করত্নের।

কাশী কুমোর আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ঢোলের ওপর মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছে কেশব ঢাকী। কী আশ্চর্য রকম নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ওরা। সমস্ত শ্মশান, সমস্ত দিক প্রান্তর যেন কার মন্ত্র বলে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শেয়াল ডাকছে না—গ্রামের দিক থেকে মড়া—কান্নাটা গেছে থেমে। শুধু মাথার ওপর শুক্লা চতুর্দশীর আকাশ মেঘের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে আতঙ্কে যেন থমথম করছে।

হাওয়ায় অল্প অল্প শীতের আমেজ। পরনের খাটো রক্ত বস্ত্রে শরীরের সবটা ঢাকা পড়ছে না। ভয়ের সঙ্গে শীতের শিহরন মিশে গিয়ে তর্করত্ন কাঁপতে লাগলেন, কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল : দেবী, প্রসীদ, প্রসীদ—

দূরে কলাপাতার ওপর শিবাভোগ শীতের স্পর্শে ঠান্ডা আর বিবর্ণ হয়ে আসছে। আর একপাত্র তীব্র কারণ গলায় ঢেলে নিলেন তর্করত্ন মুহূর্তে সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেল। দেবী আসবে না? নিশ্চয় আসবে আসতেই হবে তাকে। সারাজীবন ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে দেবীর আরাধনা করছেন তিনি; সাধারণ পূজারি যেখানে

এগিয়ে যেতে সাহস করে না, সেই তান্ত্রিক পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে তিনি নিত্যপূজা করেন। তাঁর আহ্বান দেবীকে শুনতে হবে—শুনতেই হবে।

ঘড়ির কাঁটায় রাত তিনটে। তা হোক।

তর্করত্ন নিজের মধ্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

কতক্ষণ ধ্যান করছিলেন খেয়াল নেই, হঠাৎ এক সময়ে চমকে জেগে উঠলেন তিনি। দপ—দপ—দপ। আকস্মিকভাবে খানিকটা উগ্র দীপ্তিতে শিখায়িত হয়ে উঠেই পেট্রোম্যাক্সটা নিভে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকের অন্ধকার যেন হুড়মুড় করে এসে ভেঙে পড়ল বিরাট একটা বন্যাস্রোতের মতো। গুঁড়োয় গুঁড়োয় জলের কণা ছড়িয়ে পড়ছে, বৃষ্টি নামল নাকি?

উঠে আলোটা জ্বালাবার একটা প্রেরণা বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে তর্করত্ন নিঃসাড় হয়ে গেলেন। বৃথা হয়নি, মিথ্যে হয়নি তাঁর সকাতর প্রার্থনা। দেবী এসেছেন। কালির মতো কালো অন্ধকারেও তর্করত্ন ভীত রোমাঞ্চিত দেহে দেখলেন শিবাভোগের সামনে দুটো চোখ আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দু—হাতে সে শিবাভোগ গো—গ্রাসে খাচ্ছে, তার দাঁতে লুচি আর মাংস চিবোনোর একটা হিংস্র শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে তর্করত্নের কানে ভেসে এল।

কিন্তু দু—হাতে? দু—হাতে কীরকম। তর্করত্ন আবার তীব্র চমক অনুভব করলেন নিজের মধ্যে। শেয়ালের তো হাত থাকে না। তা হলে—দেবী কি নিজের মূর্তি ধরেই তাঁর ভোগ গ্রহণ করতে এসেছেন?

নিজের মূর্তি ধরেই? ভয়ে যেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথা থেকে ঠেলে উঠল একটা দুঃসহ আনন্দের জোয়ার। সারাজীবন ধরে যে সাধনা তিনি করেছেন, আজ তা সম্পূর্ণ সার্থক হল। এই মহাশ্মশানে আর মৃত্যুর বিরাট উৎসবের মধ্যে দেবী এবার মূর্তি ধরেই নেমে এসেছেন। বিস্ফারিত চোখ মেলে তর্করত্ন দেখতে লাগলেন কী ক্ষুধার্তভাবে চোখদুটো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি নিশাচরের মতো তীক্ষ্ণতা পেয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রং অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড় মড় করে ভেঙে যাচ্ছে।

শিউরে উঠে তর্করত্ন চোখ বুজবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। কে যেন সে দুটোকে জোর করে টেনে ধরে রেখেছেন; কাশী কুমোর আর কেশব ঢুলি বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, দেবীকে স্বচক্ষে দেখবে এত পুণ্য ওরা করেনি। চারিদিকে রন্ধ্রহীন কালো অন্ধকার, পচা মড়ার গন্ধ, আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় কালো বৃষ্টি গলে পড়ছে।

—দেবী, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করে, মারীভীতদের রক্ষা করো। প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও—

ভীত শুকনো গলায় উচ্চারিত হতে লাগল ক্ষীণ প্রার্থনা। কিন্তু এত নিঃশব্দে যে তর্করত্ন নিজেই তা শুনতে পেলেন না।

ঘড়ির কাঁটায় তাল পড়ছে—টিক—টিক—টিক। তর্করত্নের বুকের মধ্যেও তার প্রতিধ্বনি। কালো অন্ধকারের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে সময় যেন এগিয়ে যেতে পারছে না, বার বার করে থমকে দাঁড়াচ্ছে। হাড় চিবোনোর শব্দটা তারই মধ্যে ক্রমাগত কানে আসছে। তর্করত্নের গলা শুকিয়ে আসছে, সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। আর একবার একপাত্র কারণ খেয়ে নিতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু নড়বার সাধ্য নেই, কে যেন তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে অসাড়—অনড় করে দিয়েছে।

—হি—হি—হি—

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড তীক্ষ্ন হাসিতে শ্মশানটা থর থর করে কেঁপে উঠল। তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল দিক দিগন্তে! মরা নদীর জল আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল, ওপারের ন্যাড়া শিমুল গাছে ডুকরে উঠল শকুনের বাচ্চা। তর্করত্নের হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে গলার কাছে উঠে এসেই আবার ধড়াস করে আছড়ে পড়ে গেল।

কাশী কুমোর আর কেশব ঢুলি চমকে চমকে জেগে আর্তনাদ করে উঠল। অমানুষিক ভয়ে বুজে—আসা চোখ দুটো খুলে তর্করত্ন দেখতে পেলেন, সে মূর্তি অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে, আর যেন দূর থেকে ভেসে আসছে একটা দ্রুত বিলীয়মান লঘু পদধ্বনি।

—জয় মা শ্মশানকালী, জয় মা—তর্করত্ন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—ওরে বাজা, বাজা। আর ভয় নেই, দেবী নিজে এসেছিলেন, তাঁর ভোগ নিজেই গ্রহণ করে গেছেন। বাজা—বাজা। জয় মা শ্মশানকালী।

আবার পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলে উঠল। শিবাভোগ নিঃশেষিত। এমন হাতে হাতে প্রত্যক্ষ ফল সচরাচর দেখা যায় না। কেশব ঢুলি প্রাণপণে ঢাকে ঘা লাগাল। কারণের বাকিটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করলেন তর্করত্ন। কাশী কুমোর গাঁজার কলকেটা নতুন করে সাজতে বসল।

রাত ভোর হয়ে আসছে। সাড়ে চারটে। মাথার ওপর থেকে কালো মেঘ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, তার একপাশ দিয়ে অস্তগামী চাঁদের উজ্জ্বল আলো এতক্ষণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল। যেন মৃত্যুর যবনিকা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে শ্মশানকালী প্রসন্ন হাসিতে হেসে উঠেছেন।

ভোরের আগেই এই অদ্ভুত ঘটনার কথা গ্রামের ঘরে ঘরে আলোড়ন জাগিয়ে নিল। শ্মশানকালী নিজে এসে ভোগ গ্রহণ করেছেন, কলিযুগে দেবীর এমন প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের কথা আর শোনা যায় না। এখন আর ভয় নেই, এবার গ্রাম রক্ষা পাবে, দেশ রক্ষা পাবে। মারী থাকবে না, মন্বন্তর থাকবে না। মৃত্যুমগ্ন গ্রামের ওপর উল্লাসের তরঙ্গ জেগে উঠল। তর্করত্নের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। তাঁর সাধনা এতদিন সফল হয়েছে—দেবী এসে সশরীরে তাঁকে দর্শন দিয়েছেন।

বেলাবেলিই স্টেশনে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তর্করত্নের। কিন্তু গ্রামের লোক তাঁকে যেতে দিলে না। বলাই ঘোষ তো গলায় কাপড় জড়িয়ে সারাদিনই তাঁর পদতলে পড়েই রইল। ধুলো দিতে দিতে পায়ের এক পর্দা চামড়াই উঠে গেল তর্করত্নের। আর সমবেত জনতার কাছে সত্যি—মিথ্যের রং চড়িয়ে ব্যাপারটাও ফলাও করতে লাগল কাশী কুমোর।

—মাকে দেখবার পুণ্যি তো করিনি, তাই পাপচোখে কী মোহ নিদ্রাটাই নেমে এল। সবই তাঁর লীলে। আর সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেই মা নিজেই নেমে এসে শিবাভোগ খেলেন। গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খাঁড়া, জিভ দিয়ে টস টস করে পড়ছে রক্ত তারপর সে কি ভয়ানক হাসি। শুনলে যেন পেটের পিলে ফুসফুস একসঙ্গে চড়াৎ করে ফেটে যায়। চমকে তাকিয়ে দেখি—

সমবেত জনতার উদগ্রীব ভয়ার্ত মুখের দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুরু করলেন: চমকে তাকিয়ে দেখি—সন্ধ্যায় পরে তর্করত্ন গোরুর গাড়িতে চেপে স্টেশনে যাত্রা করলেন। শেষরাতে ট্রেন ধরতে হবে। তারপর শহর।

গাড়ির অর্ধেকটা দানে আর দক্ষিণায় বোঝাই। কলা, মুলো, নারকেল, কাপড়—আরও কত কী। এদিক দিয়ে বলাই ঘোষের কার্পণ্য নেই, ধানের ব্যবসা করে সে মেলা টাকা কামিয়েছে এবারে। তা ছাড়া ঘোষপাড়া গ্রামটাই তালুকদার আর মহাজনের দেশ। যুদ্ধের বাজারে তারা মুঠো মুঠো টাকা কুড়িয়ে নিয়েছে। দক্ষিণার অঙ্কে তিনশো টাকার জায়গায় তারা পাঁচশো টাকা তুলে দিয়েছে তাঁর হাতে। তর্করত্ন প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন। পাঁচশো টাকা একটা কালীপুজোর দক্ষিণা। যুদ্ধে দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি না হলে এমন কথা কি কেউ ভাবতে পারত।

অত্যন্ত প্রসন্ন মনে তর্করত্ন একটা বিড়ি ধরালেন। গাড়ি চলেছে মন্থর গতিতে। আজ কোজাগরী লক্ষ্মী—পূর্ণিমা। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আলো দিয়ে চমৎকার চাঁদ উঠেছে। কালকের মেঘাচ্ছন্ন শ্মশানের সঙ্গে এর কত তফাত! শহরের অনেকগুলো লক্ষ্মীপুজো আজ তর্করত্নের নষ্ট হয়ে গেল—তা যাক, বলাই ঘোষ অনেক বেশি পরিমাণে তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে।

দু—পাশে দূর—বিস্তৃত মাঠ। মাঠে উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দিক দিগন্তে ধানের শীষ দুলছে—চমৎকার ফলন হয়েছে এবার। মাঝে মাঝে এক—একটা দীর্ঘ তালের গাছ প্রহরীর মতো কালো ছায়া ফেলেছে। পথের দু—পাশে কাঠমল্লিকার ফুল যেন গন্ধের মায়া বিস্তার করে দিয়েছে। এখানে ওখানে গ্রাম; এত শস্য—এত জীবনের মধ্যেও মৃত্যু আর মন্বন্তরের স্পর্শে নিস্তব্ধ।

—হঃ—হঃ—হঃ—

জিহ্বা—তালু সংযোগে একটা প্রবল শব্দ করে গাড়োয়ান গাড়িটাকে থামিয়ে দিলে।

—কী হল রে?

তর্করত্ন চমকে উঠলেন। এই নির্জন মাঠের মধ্যে—ডাকাত নয় তো? সঙ্গে পাঁচশো নগদ টাকা, বিস্তর জিনিসপত্র। বড়ো ভরসাও নেই।

—রাস্তার ওপর ডোমপাড়ার পাগলিটা পড়ে আছে বাবু!

—কে ডোমপাড়ার পাগলি? কী হয়েছে?

—ওই—গাড়োয়ানের স্বরে বেদনার আভাস লাগল: অকালে ওর তিনটে বেটা আর সোয়ামি না খেয়ে মরে গেছে বাবু। তাই পাগল হয়ে গেছে। রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে, যমে ধরেছে বোধ হয়।

তর্করত্ন সভয়ে গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন।

—থাক, থাক যেতে দে। পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁকিয়ে চলে যা। যে রোগ, বিশ্বাস নেই বাবা।

গাড়ি চলতে লাগল। কোজাগরী পূর্ণিমার রাশি রাশি জ্যোৎস্না—সাঁওতাল পাড়ায় মাদলের মৃদু—গম্ভীর শব্দ, ওরাও কি লক্ষ্মীপুজো করে নাকি? কোজাগরী। লক্ষ্মী ঘরে ঘরে ডাক দিয়ে যান—কে জাগে? চাঁদের দুধে ধানের শীষ পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে। ফসলের ভরা খেতের মধ্যে থেকে থেকে একটি করে প্রদীপের শিখা। শস্য লক্ষ্মীকে আহ্বান করেছে মাটির মানুষেরা, তাঁর পায়ের ছোঁয়া লেগে খেতের ধান সোনা হয়ে যাবে। কাঠ—মল্লিকার সুরভিতে কি তাঁরই শ্রীঅঙ্গের পদ্মগন্ধ?

তর্করত্নের মনটা হঠাৎ বিহ্বল হয়ে উঠল। দু—হাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দোহাই শ্মশানকালী, কৃপা করো মা। পুষ্করা কেটে যাক, মানুষ আবার বেঁচে উঠুক। মা মহাকালী তুমি মহালক্ষ্মী হয়ে এসে দেখা দাও।

এত ধান, এত ফসল, পুষ্করা কেটে যাবে বইকি। কিন্তু একটা জিনিস তর্করত্ন বুঝতে পারেননি। তাঁর শ্মশানকালী এসেছিল ওই ডোমপাড়ার পাগলিটার রূপ ধরেই—আর এখনও পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু—যন্ত্রণায় ছটফট করছে—কালীর মতো জিভ মেলে হাঁপাচ্ছে এক ফোঁটা জলের জন্য। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ সে সহ্য করতে পারেনি।

কিন্তু তবুও পুষ্করা কেটে যাবে। মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই তো নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।

ডুব

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অতীনদা সবরকম লেখা লিখতে পারেন। প্রেমের গল্প বলেন তো প্রেমের গল্প। অ্যাডভেঞ্চার বলেন তো অ্যাডভেঞ্চার। খেলাধুলোর গল্প? মনে হবে, তার মতো তুখোড় খেলোয়াড় আর দর্শক জন্মায়নি। তাঁর মতো ভালো রেফারি জন্মায়নি। অলিম্পিকের রেকর্ড তাঁর মুখস্থ। আর গান? রবীন্দ্র—সংগীত? রবীন্দ্রনাথ কত গান লিখেছিলেন, অতীনদা এক নিশ্বেসে বলে দেবেন। অতুলপ্রসাদ? গড় গড় করে আবৃত্তি করার মতো, অথচ গুনগুন করে গেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আপনাকে তাঁর গান শুনিয়ে যাবেন।

অতএব খবরের কাগজে জার্নালিস্ট হবার, যাকে বলে কোয়ালিফিকেশন, সবটাই তাঁর আছে। কিন্তু কোথাও চাকরি তিনি করেন না।

লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা, যশ—সব কিছুই তিনি পেয়েছেন। কিন্তু টাকাকড়ি যতটা পাবার কথা তার সিকি ভাগও পাননি। বরং তার জন্য যে কোনোরকম দুঃখ তাঁর আছে—তাঁর সঙ্গে মিশলে সেটা বোঝা যায় না।

কোনোদিন কারোর নিন্দে তাঁর মুখে শোনা যায়নি। যদি বলেন, অমুক লেখকের অমুক লেখা খুব খারাপ—তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, সেই লেখকের সেই লেখাটা পড়েননি?

অর্থাৎ, এক কথায়, সবাইকার ভালোর দিকটা তিনি দেখেন। না বললেও বুঝি—তিনি বলতে চান, মানুষের মন্দ দিক, মানুষের নিন্দে করার মতো লোকের অভাব নেই। তিনি, সেই সব লোকদের দলে কেন যোগ দিতে যাবেন?

আমাদের সেই অতীনদাকে সন্ধেবেলায় সস্তার একটা চায়ের দোকানে আমরা ধরে বসলাম, 'দাদা, আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন?'

তিনি বললেন, 'মানুষের মধ্যে ভগবানকে বিশ্বাস করি।'

'ভগবানের মধ্যে মানুষকে?'

'জানি না।'

'মানুষের মধ্যে ভূতকে?'

'জানি না।'

'ভূতে বিশ্বাস করেন?'

'জানি না।'

'আপনি তো সবরকম লেখায় সিদ্ধহস্ত—'

'সবরকম লেখায় কেউ সিদ্ধহস্ত হতে পারে নাকি? এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া? আর কোন দেশে কোন সেঞ্চুরিতে ক—টি করে রবীন্দ্রনাথ জন্মান— বল তো?... তবে হ্যাঁ, নানারকম লিখেছি। শুধু আধুনিক কবিতা ছাড়া।'

'কেন?'

'কারণ আধুনিক কবিতা লিখতে শিখতে হয়। সেটা আমি শিখতে পারিনি। কিন্তু ছোট্ট একটি আধুনিক কবিতা আমাকে এমন নাড়া দেয়, যেটা হাজার পাতার ক্লাসিক্সও আমাকে নাড়া দেয় না।'

'কিন্তু যেকোনো পত্রিকা খুললেই তো কবিতা দেখি, যাকে বলে আধুনিক কবিতা। মনে হয় তো, আধুনিক কবিতা লেখার মতো সহজ কাজ নেই—'

অতীনদা খুব যত্ন করে কড়া একটা বর্মা চুরুট ধরালেন। চুরুটের আগায় ভালো করে আগুন ধরেছে কিনা ঘুরিয়ে—ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর লম্বা একটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে, চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে, চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আপন মনেই হাসতে লাগলেন।

আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল, 'অতীনদা, হাসছেন কেন?'

'হাসছি তোমাদের হাসির কথা শুনে।—কতবার তোমাদের বোঝাব যে, কবিতার দুটো লাইন মিললেই যেমন কবিতা হয় না, তেমনি কোনো লাইন না মিললেই কবিতা হয় না—না আধুনিক, না অনাধুনিক। আসল কথা মনে রেখ, সব জিনিসেরই ব্যাকরণ আছে। কুমোর যে মাটির খুরি, গেলাস, ভাঁড় বানায়, তাকে কুমোরের চাকার ব্যাকরণ শিখতে হয়। ধুনুরি, যে তুলো ধোনে, তাকে শিখতে হয় ধুনুরির ধনুকের ব্যাকরণ। তেমনি জেলেকে, চাষিকে, ঘাস—কাটিয়েকে। আর্টিস্টকে, কবিকে, অভিনেতাকে, সাহিত্যিককে।—যারা এখন আধুনিক কবিতা লিখছে বলে মনে করে—আমার তো মনে হয়, তাদের অধিকাংশরই আধুনিক কবিতার অক্ষর—পরিচয় হয়নি—ব্যাকরণ তো দূরের কথা।

আমরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলাম, 'অতীনদা, আপনি ভারি সিরিয়াস ডিসকাশনে চলে যাচ্ছেন—'

চুরুটে আর এক টান দিয়ে, চায়ের পেয়ালা শেষ করে, আর এক পেয়ালা কড়া গরম চায়ের অর্ডার দিয়ে তিনি বললেন, 'সেটা তো তোমাদেরই দোষ। একটা সিরিয়াস সাবজেক্ট তোমরা পড়েছ। সেটার তো সিরিয়াস ডিসকাশন দরকার!—যাকগে, কোনো লাইট টপিক তোল। তাহলে লাইট ডিসকাশনে আসতে পারি।'

আমাদের একজন বলল, 'অতীনদা, আপনি তো বহু গল্প লিখেছেন, কিন্তু আপনার কোনো ভূতের গল্প তো পড়িনি! সব গল্পের মধ্যেই তো প্রেমের কথা—'

অতীনদার মেজাজের তখনও যে সিরিয়াস ডিসকাশনের ঘোর কাটেনি, সেটা তাঁর উত্তর শুনেই আমরা বুঝলাম।

তিনি বললেন, 'আসলে কি জানো, আসলে প্রেমের গল্পও যা, ভূতের গল্পও তাই। মানুষকে ভূতে না পেলে প্রেমে পড়ে না, আর প্রেমে না পড়লে মানুষ কখনো ভূত হয় না—'

আমি বললাম, 'দোহাই অতীনদা! সন্ধের আড্ডাটা মাটি করবেন না। আমাদের একটা ভূতের গল্প বলুন।'

অতীনদার চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। বিরক্ত হয়ে সেটা ছাইদানে রেখে আর একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে তিনি বললেন, 'প্রেমের গল্প লেখার চেয়ে ভূতের গল্প বানানো অনেক কঠিন। সত্যিকারের ভূতের গল্প লিখতে হলে এডগার অ্যালন পো হতে হয়। তিনি আবার অনেক বিখ্যাত কবিতাও লিখেছেন। আমি কবি নই, এডগার অ্যালান তো নই—আমি কী করে ভূতের গল্প বানাই? তবে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। এখনও সে ঘটনার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। কারণ কোনো যুক্তিতর্ক দিয়ে সেটার কোনো সলিউশন খুঁজে পাই না। সেটাকে ভূতের গল্প বলতে চাইলে ভূতের গল্পও বলতে পার।'

'বলুন, বলুন।' চারদিক থেকে শোরগোল উঠল।

আড্ডা জমেছে দেখে চায়ের দোকানের মালিক আমাদের সবাইকার জন্য আবার এক রাউন্ড চা পাঠিয়ে দিলেন।

অতীনদার চুরুটটা ততক্ষণে বেশ ভালো করে ধরেছে। সেটা টানবার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বলে চললেন—

'জানো তো, যারা বইয়ের ব্যবসা করে, তারা সবাইকে নগদ পয়সা মিটিয়ে দেয়। কাগজওয়ালা টাকা না দিলে কাগজ দেয় না। প্রেস টাকা না পেলে ছাপে না। দপ্তরি টাকা না পেলে বই বাঁধে না। কিন্তু মজার কথা, প্রকাশকদের যাদের নিয়ে ব্যবসা, যাদের বই তারা ছাপে—তাদের প্রাপ্য টাকা দিতে গেলেই প্রকাশকদের মনে হয় খুব একটা বাজে খরচ হচ্ছে।'

তখন আমার খুবই দৈন্যদশা। সবে আমার নতুন উপন্যাসটার বেশ নাম—ডাক হয়েছে। সেটার নাম 'জানলার আয়না'। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার এক প্রকাশক সাতশো টাকা দেবে বলে উপন্যাসটা ছাপিয়েছে।

শুনেছিলাম, বইটা হু—হু করে কাটছে। তাই, যেদিন আমাকে প্রথম কিস্তির দরুন দুশো টাকা দেবার কথা, সেদিন এগারোটা নাগাদ কলেজ স্ট্রিটের পাড়ায় গিয়েছিলাম।

যে বুড়ো লোকটি দোকান খোলে—আমারই মতোই দুঃখী লোক সে। দেখি, দোকান বন্ধ। মালিক তখনও আসেনি।

সেই বুড়ো লোকটি বলল ঘণ্টাখানেক বাদে আসতে।

কলেজ স্ট্রিটে ঘুরে কোথায় বেড়াই? কফি হাউসে গেলে অন্তত এক পেয়ালা কফি খেতে হয়। বসন্ত কেবিনে গেলে এক পেয়ালা চা। প্যারাগনে গেলে এক গেলাস শরবত।

কিন্তু কফি—চা—শরবত কিনলে টালিগঞ্জে ফেরার বাসভাড়া থাকে না।

তাই বিনা খরচায় সময় কাটাবার একমাত্র যেটা উপায় তাই করলাম। মরচে পড়া লোহার গেট ঠেলে ঢুকলাম কলেজ স্কোয়ার পুকুরের এলাকায়।

দেখি সেখানেও রয়েছে আমারই মতো দুঃখী মানুষের ভিড়। কেউ ছেলে, কেউ বুড়ো। কেউ—এক কালে যে মেয়ে ছিল, এখন হাঁটু পর্যন্ত তোলা কাপড় আর ছেঁড়া আঁচলে আব্রু রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে যে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

একটা পাগল ঘাসে গড়াগড়ি দিতে দিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে পরমানন্দে হাসছে।

লুঙ্গি—পরা একটা লোক—তার বাঁ—পা'টা কী করে কাটা পড়ে ছিল জানি না—ক্রাচ—এ ভর দিয়ে পুকুরের রেলিঙের পাশে এসে তার ক্রাচ দুটো রেলিঙে ঠেসান দিয়ে রেখে, অদ্ভুত দক্ষতায় রেলিঙ টপকে নেমে, একটা গামছা পরে পুকুরে নামল।

আর একজনের গায়ে দগদগে ঘা। সেও গামছা পরে পুকুরে নামল।

একটা ঘেয়ো কুকুর—সেটাও জলে নামল।

আর পুবদিকে দেখি কচি—কচি ছেলেরা সাঁতার কাটছে। দক্ষিণের দিকে দেখি কচি—কচি মেয়েরা সাঁতার কাটছে। মাঝ—পুকুরে দেখি পুকুরতলায়—গাঁথা, জলের ওপর মাথা—উঁচিয়ে—থাকা ক্ষয়ে যাওয়া পোস্ট ধরে সাঁতরাবার ফাঁকে দম নেবার জন্যে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে।

আমার মাথার মধ্যেটা ঝাঁ—ঝাঁ করে উঠল। এটা কি সুইমিংপুল? যেখানে নানা দুরারোগ্য অসুস্থ লোক স্নান করছে, সেখানকার জলে সাঁতার কাটছে কচি বয়সের ছেলেমেয়েরা। সেখানকার জলে কুলকুচো করছে। জলে নেমে কেউ জলবিয়োগ করছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। এবং তাদের আমি কোনো দোষ দিই না। কারণ পঁচিশ বছর স্বাধীনতার পর আমরা, সত্যি বলতে কী, কিছুই বানাতে পারিনি। বড়ো বড়ো কথা শুনি—ডিভিসি ময়ূরাক্ষী, কত কী? কিন্তু অতশত বড়োসড়ো প্রোজেক্টের কথা থাক; তোমরা সবাই তো জানো, সেগুলোর কোনোটাই একশো ভাগের এক ভাগও কাজ করে না। কিন্তু পঁচিশ বছর স্বাধীনতার পরও কলকাতার লোকেদের জলবিয়োগ করার জায়গা কেন থাকে না, বলতে পার? লাটসাহেবের বাড়ির সামনে পুলিশদেরও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ কীর্তি করতে দেখেছি।

যাক, এটা ভূতের গল্প, রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়।

কিন্তু এখন দেখছি, রাজনীতি থেকে ভূত ছাড়াবার লোক কেউ নেই।

যাকগে সিরিয়াস ডিসকাশন। যে ঘটনার কথা বলব বলেছিলাম, সেটাই বলি।

কলেজ স্কোয়ারের বসবার যেসব বেঞ্চি, সেগুলোর অত্যন্ত দৈন্যদশা। অধিকাংশ বেঞ্চিরই পিঠের দিকে ঠেসান দেবার জায়গাটা কে বা কারা কবেই খসিয়ে নিয়ে গেছে। অনেক বেঞ্চির বসবার কাঠটাও নেই। দেখি যেসব বেঞ্চিতে বসবার কাঠ রয়েছে, সেগুলোয় লোক শুয়ে। কারোর পরনে লুঙ্গি, কারোর বা হাফ—প্যান্ট আর জাঙিয়া। বেশিরভাগ লোকেরই আদুল গা। কারোর—কারোর গায়ে কুটিকুটি গেঞ্জি। কুটকুটে ময়লা।

বসবার জায়গা পেলাম না। অগত্যা কলেজ স্কোয়ারের চারপাশে ঘুরতে শুরু করলাম। মনে মনে হিসেব করছি, ক—বার চক্কর দিলে ঘণ্টাখানেক সময় কাটে।

এমন সময় হঠাৎ দেখি ডাইভ দেবার কংক্রিটের জায়গাটার উলটোদিকের একটা বেঞ্চি ছেড়ে এক আধবুড়ো লোক আড়মোড়া ভেঙে উঠল। তার মাথার নীচেকার পুঁটলি হাতড়ে একটা বিড়ি বার করল। তারপর অনেক হাতড়াতে লাগল। বুঝলাম দেশলাই খুঁজছে। দেশলাই সে খুঁজে পেল না। তাই আমার দিকে এগিয়ে এসে সে বলল, 'ছ্যার, মাচিস আছে?'

আমিও তার ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই ফাঁকা বেঞ্চিতে বসে বললাম, 'এই নিন।'

দেশলাইটা তাকে বাড়িয়ে দিলাম।

আমি আমার হাতের খবরের কাগজটা খুললাম। তখন চৈত্র মাসের শেষ। ভারি কড়া রোদ্দুর! আমার ছাতা নেই। খালি মাথায় কলেজ স্কোয়ার দু—বার চক্কর দেওয়ায় মাথাটাও কীরকম যেন ঘুরপাক খাচ্ছিল।

সেই ডাইভ দেবার জায়গাটার সামনের বেঞ্চিতে তো বসলাম। তারপর খবরের কাগজটা খুলে ধরলাম।— আজকালকার খবরের কাগজে সবকিছু ছাপা হয়। শুনি লাখে লাখে বিকোয়। কিন্তু পড়া যায় না। পাঠ্যবস্তুর অভাবের জন্য নয়, ছাপার জন্য।

চড়চড়ে রোদে খালি মাথায় কয়েকবার কলেজ স্কোয়ার পাক দেওয়ায় আমার মাথাটাও পাক খাচ্ছিল।

খবরের কাগজের লাইনগুলো চোখের সামনে যেন নাচছিল। এমন সময় হঠাৎ সামনের পুকুরে ঝুপ করে একটা শব্দ শুনলাম।

তাকিয়ে দেখি, জলের ওপর গোলচে ধরনের ছোট্ট একটা তরঙ্গ উঠেছে। বুঝলাম কেউ একজন ডাইভ কেটেছে। সেই গোলচে তরঙ্গ ক্রমশ বড়ো হতে লাগল। তারপর পুকুরের কিনারায় বার কয়েক ছলাৎ ছলাৎ করে মিলিয়ে গেল।

আমি তাকিয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু কী সর্বনাশ! কোন মানুষ জল থেকে উঠে এল না!

ভাবলাম, আমারই হয়তো ঝুপ করে শব্দ শোনাটা ভুল।

ঘড়িতে দেখি দুপুর বারোটা। অতএব সেই এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেছে। তাই প্রকাশকের দোকানে গেলাম। প্রকাশকমশাই বললেন, 'দুশো দেব বলেছিলাম। কিন্তু বাজার ভারি খারাপ। এই নিন ষাট টাকা; সামনের মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় আসবেন। দেখি কি করতে পারি—'

মনে হল যেন কৃপা ভিক্ষে করতে এসেছি! মনে হল, কলম না চালিয়ে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে শিখলে অনেক ভালো হত!

কিন্তু ইংরেজিতে একটা কথা আছে—বেগার্স আর নো চুসার্স। অর্থাৎ যারা ভিক্ষুক, তাদের ভালো—লাগা, মন্দ—লাগার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সেদিনই প্রথম বুঝেছিলাম, ভিক্ষুকদের চেয়েও লেখকরা অনেক বেশি অসহায়। ভিক্ষুকরা তো হাত পেতে সোজা ভিক্ষে চায়। লেখকরা তো চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতে পারে না।

সেই মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় আবার গেলাম কলেজ স্ট্রিট। প্রকাশকের দোকান বন্ধ। সেই বুড়ো লোকটি আমাকে আবার বলল, ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসতে।

আবার তাই কলেজ স্কোয়ার। প্রচণ্ড রোদ। ঘুরতে ঘুরতে সেই ডাইভ দেবার জায়গাটার সামনের বেঞ্চি থেকে হুবহু সেই আধ—বুড়ো লোকটা আড়মোড়া ভেঙে উঠে তার পুঁটলি থেকে দেশলাই খুঁজে পেল না। বিড়িটা দাঁতে চেপে আমার কাছে এসে বলল, 'ছ্যার, মাচিস আছে?'

রোদে—রোদে খালি মাথায় ঘোরার মধ্যে যেন একটা নেশা আছে। সেই নেশার ঘোরেই লোকটাকে দেশলাই দিলাম। তার খালি জায়গায় বসলাম। তারপর কী যেন মনে হওয়ায় খবরের কাগজটা না খুলে সোজা তাকিয়ে রইলাম ডাইভ দেবার সেই কংক্রিটের স্ট্রাকচারটার দিকে।

সেদিন আমার দেখার কোনো ভুল হয়নি। সব কিছু স্পষ্ট দেখলাম। মই বেয়ে একটা লোক উঠে সবচেয়ে উঁচু জায়গা থেকে ডাইভ দেবার জন্যে তৈরি হয়েছে।

সবচেয়ে উঁচু পাটাতনের কিনারে গিয়ে লোকটা দাঁড়াল। তারপর একবার বাঁ হাত দিয়ে ডান দিকের ঘাড় আর বুক, আর ডান হাত দিয়ে বাঁদিকের ঘাড় আর বুক ঘষতে লাগল।

মানুষটা খুব একটা লম্বা—চওড়া গোছের নয়। মনে হল, ছোট্টখাট্ট ধরনের হলেও বেশ গাঁট্টাগোট্টা। তার চোখ মুখ খুব খুঁটিয়ে দেখতে না পারলেও—একটা জিনিস স্পষ্ট দেখলাম। সেটা তার বাঁদিকের বুক থেকে ডানদিকের বুক পর্যন্ত একটা ক্ষতের দাগ। মনে হল, অতীতে কোনো একদিন সে—জায়গাটায় মস্ত বড়ো একটা অপারেশন করা হয়েছিল। দাগটা সেই অপারেশনের স্টিচ করার দাগ।

লোকটাকে আমি যেরকম খুঁটিয়ে দেখছিলাম—দেখি, সেও আমাকে সেরকম খুঁটিয়ে দেখছে।

তারপর লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা হাসি হাসল। কেন জানি না, শিরশির করে উঠল আমার মাথার চুল থেকে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ পর্যন্ত।

আর তারপরেই লোকটা নিখুঁত ডাইভ কাটল।

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের মতো সেই ডাইভ। মনে হল, শানানো একটা ছুরির মতো তার দেহ কলেজ স্কোয়ারের জলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। আর ছোট্ট গোল একটা তরঙ্গ জলের ওপর উঠে ক্রমশ বড়ো হতে হতে মিলিয়ে গেল পুকুরপাড়ে।

লোকটার ভেসে ওঠার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। লোকটা কিন্তু ভেসে উঠল না।

যে—ছেলেটি জুতো পালিশ করে বেড়ায়, তাকে প্রশ্ন করলাম, কাউকে ডাইভ কাটতে সে দেখেছে কিনা। ছাতি—মাথায় এক বুড়ো পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকেও প্রশ্ন করলাম।

তারা এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন আমি একটা ডিলিরিয়ামের ঘোরে কথা বলছি। গ্রীষ্মকালের কাঠফাটা রোদ্দুরে লোক স্নান করতে আসতে পারে। কিন্তু ডাইভিং—বোর্ড থেকে নিখুঁত ডাইভ কাটার শখ কারোর থাকে না।—এ ধরনের কীসব কথা যেন তারা বলছিল।

আবার গেলাম প্রকাশকের দোকানে। আবার ষাট টাকা যেন ভিক্ষে করে পেলাম! শুনলাম, বইয়ের বাজার খারাপ। পরের সপ্তাহে আবার আসতে বলল।

আবার পরের সপ্তাহ।

আবার প্রকাশকের দোকান বন্ধ।

আবার কলেজ স্কোয়ার। আবার সেই ডাইভিংয়ের কংক্রিটের স্ট্রাকচার। সবচেয়ে উঁচু জায়গা থেকে আবার সেই লোকটার ডাইভ কাটা—সেই নিখুঁত ডাইভ কাটা। আবার আমার সেই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করা—লোকটার ভেসে ওঠার জন্যে।

কিন্তু সেবারেও লোকটা ভেসে উঠল না।

সেই চড়চড়ে রোদে দাঁড়িয়ে জীবনে সেইবারই প্রথম মনে হল, যে—লোকটা জলে ঝাঁপায় আর তারপর জল থেকে ওঠে না, সে মানুষ হতেই পারে না। নির্ঘাৎ সে ভূত! কিন্তু কলেজ স্কোয়ারে ভূত? কেউ কবে এমন কথা শুনেছে? কে বিশ্বাস করবে? বলতে গেলেই তো লোকে আমার দিকে এমনভাবে তাকাবে যাতে মনে হবে—আমার থাকার জায়গা কলকাতা নয়, রাঁচির কাঁকে—তে।

তারপর গ্রীষ্ম শেষ হল।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি প্রকাশকের কাছে মোটামুটি টাকা আদায় হল।

আমার আর একটা উপন্যাস বাজারে বেরোল শরৎকালের গোড়ায়। বেশ একটা হইচই পড়ে গেল। আমার নতুন উপন্যাসের জন্য নানা প্রকাশক তখন আমার বাড়িতে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছে। যারা আগে আমায় চিনেও চিনতে পারত না, দেখি তারা আমার বাড়ি আসতে শুরু করেছে। অর্থাৎ নতুন—নামকরা লেখকের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বলে জানাতে অনেকেই চায়।

অর্থাৎ ধরো, আমি যেন সেই ডাইভ—কাটা লোক। পুকুরে ডাইভ কাটি। অর্থাৎ লিখি। সামান্য তরঙ্গ ওঠে। ব্যস—তার বেশি নয়। ভেসে উঠতে পারি না।

কিন্তু তখন আমি রীতিমতো ভেসে উঠেছি। আর সত্যিই যে ভেসে উঠেছি, তার প্রমাণ পেলাম আমার এক ইস্কুলের সহপাঠীকে আমার বাড়িতে এসে নিমন্ত্রণ করতে দেখে। তার মামার কৃপায়—মামা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের নামজাদা মন্ত্রী—আমার সঙ্গে বিএ পাশ করার পরেই ইউনেস্কোতে বেশ মোটা একটা চাকরি সে বাগিয়েছিল। আমেরিকায় তার আপিস। তিন বছর ছাড়া—ছাড়া সপরিবারে একবার আসে কলকাতায়। আগেও অনেকবার এসেছে। কিন্তু আমার খোঁজ করেনি।

কিন্তু এবার আমার বাড়িতে সস্ত্রীক তারা এসে হাজির। কারণ বোধহয়, কাগজে—টাগজে আমার নাম—ডাক হয়েছে শুনে। তারা বলল, পরের সপ্তাহেই তাদের আমেরিকা যেতে হচ্ছে। যাবার আগে তাদের বাড়িতে একটা পার্টির আয়োজন করেছে। ছেলেবেলার অনেক বন্ধু আসবে। আমাকে যেতেই হবে। কারণ, অমি নাকি—ইত্যাদি, ইত্যাদি—

গেলাম তাদের পার্টিতে। সে এক এলাহি কাণ্ড! খাবার—দাবার অঢেল। আর দামি—দামি স্কচ হুইস্কির যেন ফোয়ারা বইছে।

টেবিলে আমার পাশে যে—লোকটা বসেছিল, সে খুব একটা লম্বা—চওড়া গোছের নয়। মনে হল, ছোট্টখাট্ট হলেও বেশ গাঁট্টাগোট্টা।

মুখটা যেন খুব চেনা—চেনা। কোথায় যেন দেখেছি।

বুঝতেই পারছ— লোকটা সেই কলেজ স্কোয়ারে ডাইভ—কাটা লোক। যে জলে ঝাঁপ দিত কিন্তু ভেসে উঠত না।

শুনলাম, আমরা বন্ধুর সঙ্গে পরের সপ্তাহে একই প্লেনে যে যাচ্ছে আমেরিকা। সেখানেই সে নাকি একটা রেস্তোরাঁ চালায়। জমজমাট ব্যবসা।

লোকটাকে একেবারে পাশের চেয়ারে দেখে খুঁটিয়ে তাকে দেখবার সুযোগ পেলাম। তার মুখটা যে খুব একটা খারাপ, তা নয়। বরঞ্চ ভালোই বলতে হবে। কিন্তু তার মুখের মধ্যে একটা কী যেন নেই।

স্যুপ শেষ করে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে আমার দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে আগে কখনো পরিচয় হয়েছিল? আপনার মুখ খুব চেনা—চেনা....'

আমি বললাম, 'আপনাকেও আমার খুব চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু যদি মনে না করেন, তাহলে একটা প্রশ্ন করি—আপনার বাঁ দিকের বুক থেকে ডান দিকের বুক পর্যন্ত একটা ক্ষতের দাগ আছে কি?

চমকে উঠে লোকটা বলল, 'কী করে জানলেন? আমেরিকায় এক সুইমিং পুলে ডাইভ কাটতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে যাই। জ্ঞান হলে দেখি, হাসপাতালে। বুক—পিঠে প্লাস্টার। পাক্কা ছ—মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল, স্টিচের দাগ এখনও মেলায়নি।

সে—রাতে আমার একেবারেই ঘুম হল না। কেবলই মনে হতে লাগল, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কেমন যেন অশুভ একটা ইঙ্গিত আছে।

তার পরের দিন ভোরেই আমার সেই বন্ধুর বাড়ি ছুটলাম। তাকে আর তার স্ত্রীকে সব ঘটনার কথা বললাম।

আমার বন্ধু তো হেসেই সব কথা উড়িয়ে দিতে চাইল।

কিন্তু বন্ধুর স্ত্রী ভীতু মানুষ। রেস্তোরাঁর সেই মালিকের সঙ্গে এক প্লেনে কিছুতেই সে যেতে রাজি হল না।

ফলে আমার বন্ধু আমার ওপর বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে ফ্লাইট ক্যানসেল করে দু—দিন পরের ফ্লাইট বুক করল। আর রেস্তোরাঁর সেই মালিক প্লেনে উঠল তার আগেকার বুকিং অনুযায়ী।

সেই প্লেনটা দমদম থেকে রানওয়ে দিয়ে ছুটতে গিয়ে খানিক উঠে কী একটা মেকানিক্যাল ডিফেক্টের দরুন মাটিতে আছড়ে ফেটে চৌচির হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

কাগজে তার কথা তোমরা পড়েছিলে নিশ্চয়ই।

কিন্তু এই সব ঘটনার কোনো মানেই আজ পর্যন্ত বুঝতে পারি না।

এটা কি ভৌতিক ব্যাপার?
নাকি ভবিতব্য?
ভূত আমি মানি না, ভবিতব্যও মানি না। তাহলে এটা কী?

অতীনদা আর একটা কড়া চুরুট ধরিয়ে আর এক রাউন্ড চায়ের অর্ডার দিলেন।

ফ্রিৎস

সত্যজিৎ রায়

জয়ন্তর দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে তাকে প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

'তোকে আজ যেন কেমন মনমরা মনে হচ্ছে? শরীর—টরীর খারাপ নয় তো?'

জয়ন্ত তার অন্যমনস্ক ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে একটা ছেলেমানুষি হাসি হেসে বলল, 'নাঃ! শরীর তো খারাপ নয়ই, বরং অলরেডি অনেকটা তাজা লাগছে। জায়গাটা সত্যিই ভালো।'

'তোর তো চেনা জায়গা। আগে জানতিস না ভালো?'

'প্রায় ভুলে গেসলাম।' জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'অ্যাদ্দিন বাদে আবার ক্রমে ক্রমে মনে পড়ছে। বাংলোটা তো মনে হয় ঠিক আগের মতোই আছে। ঘরগুলোরও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ফার্নিচারও কিছু কিছু সেই পুরোনো আমলেরই রয়েছে বলে মনে হয়। যেমন এই বেতের টেবিল আর চেয়ারগুলো।

বেয়ারা ট্রেতে করে চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। সবে চারটে বাজে, কিন্তু এর মধ্যেই রোদ পড়ে এসেছে। টি—পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কদ্দিন বাদে এলি?'

জয়ন্ত বলল, 'একত্রিশ বছর। তখন আমার বয়স ছিল ছয়।'

আমরা যেখানে বসে আছি সেটা বুন্দি শহরের সার্কিট হাউসের বাগান। আজ সকালেই এসে পৌঁছেছি। জয়ন্ত আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা এক স্কুলে ও এক কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। এখন ও একটা খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি করে, আর আমি করি ইস্কুল মাস্টারি। চাকুরি জীবনে দুজনের মধ্যে ব্যবধান এসে গেলেও বন্ধুত্ব টিকে আছে ঠিকই। রাজস্থান ভ্রমণের প্ল্যান আমাদের অনেকদিনের। দুজনের একসঙ্গে ছুটি পেতে অসুবিধা হচ্ছিল, অ্যাদ্দিনে সেটা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ লোকেরা রাজস্থান গেলে আগে জয়পুর—উদয়পুর— চিতোরটাই দেখে—কিন্তু জয়ন্ত প্রথম থেকেই বুন্দির উপর জোর দিচ্ছিল। আমিও আপত্তি করিনি, কারণ ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'বুঁদির কেল্লা' নামটার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, সে কেল্লা এতদিনে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হবে সেটা ভাবতে মন্দ লাগছিল না। বুন্দি অনেকেই আসে না; তবে তার মানে এই নয় যে এখানে দেখার তেমন কিছুই নেই। ঐতিহাসিক ঘটনার দিক দিয়ে বিচার করলে উদয়পুর, যোধপুর, চিতোরের মূল্য হয়তো অনেক বেশি, কিন্তু সৌন্দর্যের বিচারে বুন্দি কিছু কম যায় না।

জয়ন্ত বুন্দি সম্পর্কে এত জোর দিয়ে বলাতে প্রথমে একটু অদ্ভুত লেগেছিল; ট্রেনে আসতে আসতে কারণটা জানতে পারলাম। সে ছেলেবেলায় একবার নাকি বুন্দিতে এসেছিল, তাই সেই পুরোনো স্মৃতির সঙ্গে নতুন করে জায়গাটাকে মিলিয়ে দেখার একটা ইচ্ছে তার মনে অনেকদিন থেকেই ঘোরাফেরা করছে। জয়ন্তর বাবা অনিমেষ দাশগুপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে কাজ করতেন, তাই তাঁকে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়াতে হত। এই সুযোগেই জয়ন্তর বুন্দি দেখা হয়ে যায়।

সার্কিট হাউসটা সত্যিই চমৎকার। ব্রিটিশ আমলের তৈরি, বয়স অন্তত শ—খানেক বছর তো বটেই। একতলা বাড়ি, টালি বসানো ঢালু ছাত, ঘরগুলো উঁচু—উঁচু, ওপর দিকে স্কাইলাইট দড়ি দিয়ে টেনে ইচ্ছেমতো খোলা বা বন্ধ করা যায়। পুবদিকে বারান্দা। তার সামনে প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডে কেয়ারি করা বাগানে গোলাপ ফুটে রয়েছে। বাগানের পিছন দিকটায় নানারকম বড়ো বড়ো গাছে অজস্র পাখির জটলা। টিয়ার তো ছড়াছড়ি। ময়ূরের ডাকও মাঝে মাঝে শোনা যায়, তবে সেটা কম্পাউন্ডের বাইরে থেকে।

আমরা সকালে পৌঁছেই আগে একবার শহরটা ঘুরে দেখে এসেছি। পাহাড়ের গায়ে বসানো বুন্দির বিখ্যাত কেল্লা। আজ দূর থেকে দেখেছি, কাল একেবারে ভিতরে গিয়ে দেখব। শহরে ইলেকট্রিক পোস্টগুলো না থাকলে মনে হত যেন আমরা সেই প্রাচীন রাজপুত আমলে চলে এসেছি। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা, বাড়ির সামনের দিকে দোতলা থেকে ঝুলে পড়া অদ্ভুত সব কারুকার্য করা বারান্দা, কাঠের দরজাগুলোতে নিপুণ হাতের নকশা—দেখে মনেই হয় না যে আমরা যান্ত্রিক যুগে বাস করছি।

এখানে এসে অবধি লক্ষ করেছি জয়ন্ত সচরাচর যা বলে তার চেয়ে একটু কম কথা বলছে। হয়তো অনেক পুরোনো স্মৃতি তার মনে ফিরে আসছে। ছেলেবেলার কোনো জায়গায় অনেকদিন পরে ফিরে এলে মনটা উদাস হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আর জয়ন্ত যে সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি ভাবুক সেটা তো সকলেই জানে।

চায়ের পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে রেখে জয়ন্ত বলল, 'জানিস শঙ্কর, ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত। প্রথমবার যখন এখানে আসি, তখন মনে আছে এই চেয়ারগুলিতে আমি পা তুলে বাবু হয়ে বসতাম। মনে হত যেন একটা সিংহাসনে বসে আছি। এখন দেখছি চেয়ারগুলো আয়তনেও বড়ো না, দেখতেও অতি সাধারণ। সামনের যে ড্রয়িংরুম, সেটা এর দ্বিগুণ বড়ো বলে মনে হত। যদি এখানে ফিরে না আসতুম, তাহলে ছেলেবেলার ধারণাটাই কিন্তু টিকে যেত।'

আমি বললাম, 'এটাই তো স্বাভাবিক। ছেলেবেলায় আমরা থাকি ছোটো; সেই অনুপাতে আশপাশের জিনিসগুলোকে বড়ো মনে হয়। আমরা বয়সের সঙ্গে বাড়ি, কিন্তু জিনিসগুলো তো বাড়ে না!'

চা খাওয়া শেষ করে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে জয়ন্ত হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে বলে উঠল—'দেবদারু।'

কথাটা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম। জয়ন্ত আবার বলল, 'একটা দেবদারু গাছ—ওই ওদিকটায় থাকার কথা।'

এই বলে সে দ্রুতবেগে গাছপালার মধ্যে দিয়ে কম্পাউন্ডের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ একটা দেবদারু গাছের কথা জয়ন্ত মনে রাখল কেন?

কয়েক সেকেন্ড পরেই জয়ন্তর উল্লসিত কণ্ঠস্বর পেলাম—'আছে! ইটস হিয়ার! ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই—'

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'গাছ যদি থেকে থাকে তো সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। গাছ তো আর হেঁটে চলে বেড়ায় না!'

জয়ন্ত একটু বিরক্তভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'সেখানেই আছে মানে এই নয় যে আমি ভেবেছিলাম এই ত্রিশ বছরে গাছটা জায়গা পরিবর্তন করেছে। সেইখানে মানে আমি যেখানে গাছটা ছিল বলে অনুমান করেছিলাম, সেইখানে।'

'কিন্তু একটা গাছের কথা হঠাৎ মনে পড়ল কেন তোর?'

জয়ন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে গাছের গুঁড়ির দিকে চেয়ে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা এখন আর কিছুতেই মনে পড়ছে না। কী একটা কারণে জানি গাছটার কাছে এসেছিলাম—কী একটা করেছিলাম। একটা সাহেব...'

'সাহেব?'

'না, আর কিছু মনে পড়ছে না। মেমারির ব্যাপারটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত...'

এখানে বাবুর্চির রান্নার হাত ভালো। রাত্রে ডাইনিংরুমে ওভাল—শেপের টেবিলটায় বসে খেতে খেতে জয়ন্ত বলল, 'তখন যে বাবুর্চিটা ছিল, তার নাম ছিল দিলওয়ার! তার বাঁ গালে একটা কাটা দাগ ছিল, ছুরির দাগ—আর চোখ দুটো সব সময় জবাফুলের মতো লাল হয়ে থাকত। কিন্তু রান্না করত খাসা।'

খাবার পরে ড্রয়িংরুমের সোফাতে বসে জয়ন্তর ক্রমে আরও পুরোনো কথা মনে পড়তে লাগল। তার বাবা কোন সোফায় বসে চুরুট খেতেন, মা কোথায় বসে উল বুনতেন, টেবিলের উপর কী কী ম্যাগাজিন পড়ে থাকত—সবই তার মনে পড়ল।

আর এইভাবেই শেষে তার পুতুলের কথাটাও মনে পড়ে গেল।

পুতুল বলতে মেয়েদের ডল পুতুল নয়। জয়ন্তর এক মামা সুইৎজারল্যান্ড থেকে এনে দিয়েছিলেন দশ—বারো ইঞ্চি লম্বা সুইসদেশীয় পোশাক পরা একটা বুড়োর মূর্তি। দেখতে নাকি একেবারে একটি খুদে জ্যান্ত মানুষ। ভেতরে যন্ত্রপাতি কিছু নেই, কিন্তু হাত পা আঙুল কোমর এমনভাবে তৈরি যে ইচ্ছামতো বাঁকানো যায়। মুখে একটা হাসি লেগেই আছে। মাথার ওপর ছোট্ট হলদে পালক গোঁজা সুইস পাহাড়ি টুপি। এ ছাড়া পোশাকের খুঁটিনাটিতেও নাকি কোনোরকম ভুল নেই—বেল্ট বোতাম পকেট কলার মোজা—এমনকী জুতোর বকলসটা পর্যন্ত নিখুঁত।

প্রথমবার বুন্দিতে আসার কয়েকমাস আগেই জয়ন্তর মামা বিলেত থেকে ফেরেন, আর এসেই জয়ন্তকে পুতুলটা দেন। সুইৎজারল্যান্ডের কোনো গ্রামে এক বুড়োর কাছ থেকে পুতুলটা কেনেন তিনি। বুড়ো নাকি ঠাট্টা করে বলে দিয়েছিল, 'এর নাম ফ্রিৎস। এই নামে ডাকবে একে। অন্য নামে ডাকলে কিন্তু জবাব পাবে না।'

জয়ন্ত বলল, 'আমি ছেলেবেলায় খেলনা অনেক পেয়েছি। বাপ—মায়ের একমাত্র ছেলে ছিলাম বলেই বোধহয় তাঁরা এই ব্যাপারে আমাকে কখনো বঞ্চিত করেননি। কিন্তু মামার দেওয়া এই ফ্রিৎস—কে পেয়ে কী যে হল—আমি আমার অন্য সমস্ত খেলনার কথা একেবারে ভুলে গেলাম। রাতদিন ওকে নিয়েই পড়ে থাকতাম; এমনকী শেষে একটা সময় এল যখন আমি ফ্রিৎস—এর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিব্যি আলাপ চালিয়ে যেতাম। এক তরফা আলাপ অবিশ্যি, কিন্তু ফ্রিৎস—এর মুখে এমন একটা হাসি, আর ওর চোখে এমন একটা চাহনি ছিল, যে মনে হত যেন আমার কথা ও বেশ বুঝতে পারছে। এক এক সময় এমনও মনে হত যে আমি যদি বাংলা না বলে জার্মান বলতে পারতাম, তাহলে আমাদের আলাপটা হয়তো একতরফা না হয়ে দু—তরফা হত। এখন ভাবলে ছেলেমানুষি পাগলামি বলে মনে হয়, কিন্তু তখন আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল ভীষণ 'রিয়েল'। বাবা—মা বারণ করতেন অনেক, কিন্তু আমি কারোর কথা শুনতাম না। তখনও আমি ইস্কুল যেতে শুরু করিনি, কাজেই ফ্রিৎসকে দেবার জন্য সময়ের অভাব ছিল না আমার।'

এই পর্যন্ত বলে জয়ন্ত চুপ করল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত সাড়ে ন—টা। বুন্দি শহর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমরা সার্কিট হাউসের বৈঠকখানায় একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে আছি।

আমি বললাম, 'পুতুলটা কোথায় গেল?'

জয়ন্ত এখনও যেন কী ভাবছে। উত্তরটা এত দেরিতে এল যে আমার মনে হচ্ছিল প্রশ্নটা বুঝি ওর কানেই যায়নি।

'পুতুলটা বুন্দিতে নিয়ে এসেছিলাম। এখানে নষ্ট হয়ে যায়।'

'নষ্ট হয়ে যায়?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'কীভাবে?'

জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'একদিন বাইরে বাগানে বসে চা খাচ্ছিলাম আমরা। পুতুলটাকে পাশে ঘাসের উপর রেখেছিলাম। কাছে কতকগুলো কুকুর জটলা করছিল। তখন আমার যা বয়স, তাতে চা খাবার কথা নয়, কিন্তু জেদ করে চা নিয়ে খেতে খেতে হঠাৎ পেয়ালাটা কাত হয়ে খানিকটা গরম চা আমার প্যান্টে পড়ে যায়। বাংলোয় এসে প্যান্ট বদল করে বাইরে ফিরে গিয়ে দেখি পুতুলটা নেই। খোঁজাখুঁজির পর দেখি আমার ফ্রিৎসকে নিয়ে দুটো রাস্তার কুকুর দিব্যি টাগ—অফ—ওয়ার খেলছে। জিনিসটা খুবই মজবুত ছিল

তাই ছিঁড়ে আলগা হয়ে যায়নি। তবে চোখ মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে জামাকাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ আমার কাছে ফ্রিৎস—এর আর অস্তিত্বই ছিল না। হি ওয়াজ ডেড।'

'তারপর?' ভারি আশ্চর্য লাগছিল জয়ন্তর এই কাহিনি।

'তারপর আর কী? যথাবিধি ফ্রিৎস—এর সৎকার করি!'

'তার মানে?'

'ওই দেবদারু গাছটার নীচে ওকে কবর দিই। ইচ্ছে ছিল কফিন জাতীয় একটা কিছু জোগাড় করা—সাহেব তো! একটা বাক্স থাকলেও কাজ চলত, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পেলাম না। তাই শেষটায় এমনিই পুঁতে ফেলি।'

এতক্ষণে দেবদারু গাছের রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হল।

দশটা নাগাদ ঘুমোতে চলে গেলাম।

একটা বেশ বড়ো বেডরুমে দুটো আলাদা খাটে আমাদের বিছানা। কলকাতায় হাঁটার অভ্যেস নেই, এমনিতেই বেশ ক্লান্ত লাগছিল, তার উপর বিছানায় ডানলোপিলো। বালিশে মাথা দেবার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে গেল।

রাত তখন ক—টা জানি না, একটা কীসের শব্দে জানি ঘুমটা ভেঙে গেল। পাশ ফিরে দেখি জয়ন্ত সোজা হয়ে বিছানার ওপর বসে আছে। তার পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে, আর সেই আলোয় তার চাহনিতে উদবেগের ভাবটা স্পষ্ট ধরা পড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে আমাকে একটা পালটা প্রশ্ন করল—'সার্কিট হাউসে বেড়াল বা ইঁদুর জাতীয় কিছু আছে নাকি?'

বললাম, 'থাকাটা কিছুই আশ্চর্য না। কিন্তু কেন বলো তো?'

'বুকের উপর দিয়ে কী যেন হেঁটে গেল। তাই ঘুমটা ভেঙে গেল।'

আমি বললাম, 'ইঁদুর জিনিসটা সচরাচর নর্দমা—টর্দমা দিয়ে ঢোকে। আর খাটের ওপর ইঁদুর ওঠে বলে তো জানা ছিল না।'

জয়ন্ত বলল, 'এর আগেও একবার ঘুমটা ভেঙেছিল, তখন জানালার দিক থেকে একটা খচখচ শব্দ পাচ্ছিলাম।'

'জানালায় যদি আওয়াজ পেয়ে থাকিস তাহলে বেড়ালের সম্ভাবনাটাই বেশি!'

'কিন্তু তাহলে...'

জয়ন্তর মন থেকে যেন খটকা যাচ্ছে না। বললাম, 'বাতিটা জ্বালার পর কিছু দেখতে পাসনি?'

'নাথিং। অবিশ্যি ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই বাতিটা জ্বালিনি। প্রথমটা বেশ হকচকিয়ে গেসলাম। সত্যি বলতে কী, একটু ভয়ই করছিল। আলো জ্বালার পর কিছুই দেখতে পাইনি।'

'তার মানে যদি কিছু এসে থাকে তাহলে সেটা ঘরের মধ্যেই আছে?'

'তা...দরজা যখন দুটোই বন্ধ...'

আমি চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের আনাচে—কানাচে, খাটের তলায়, সুটকেসের পিছনে একবার খুঁজে দেখে নিলাম। কোথাও কিছু নেই। বাথরুমের দরজাটা ভেজানো ছিল; সেটার ভেতরেও খুঁজতে গেছি, এমন সময় জয়ন্ত চাপা গলায় ডাক দিল।

'শঙ্কর!'

ফিরে এলাম ঘরে। জয়ন্ত দেখি তার লেপের সাদা ওয়াড়টার দিকে চেয়ে আছে। আমি তার দিকে এগিয়ে যেতে সে লেপের একটা অংশ ল্যাম্পের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা কী দ্যাখ তো।'

কাপড়টার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখি তাতে হালকা খয়েরি রঙের ছোটো ছোটো গোল গোল কীসের জানি ছাপ পড়েছে। বললাম, 'বিড়ালের থাবা হলেও হতে পারে।'

জয়ন্ত কিছু বলল না। বেশ বুঝতে পারলাম কী কারণে জানি সে ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এদিকে রাত আড়াইটে বাজে। এত কম ঘুমে আমার ক্লান্তি দূর হবে না, তা ছাড়া কালকেও সারাদিন ঘোরাঘুরি আছে। তাই, আমি পাশে আছি, কোনো ভয় নেই, ছাপগুলো আগে থেকেই থাকতে পারে, ইত্যাদি বলে কোনোরকমে তাকে আশ্বাস দিয়ে বাতি নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার কোনো সন্দেহ ছিল না যে জয়ন্ত যে অভিজ্ঞতার কথাটা বলল সেটা আসলে তার স্বপ্নের অন্তর্গত। বুন্দিতে এসে পুরোনো কথা মনে পড়ে ও একটা মানসিক উদবেগের মধ্যে রয়েছে, আর তার থেকেই বুকে বেড়াল হাঁটার স্বপ্নের উদ্ভব হয়েছে।

রাত্রে আর কোনো ঘটনা ঘটে থাকলেও আমি সে বিষয়ে কিছু জানতে পারিনি, আর জয়ন্তও সকালে উঠে নতুন কোনো অভিজ্ঞতার কথা বলেনি। তবে তাকে দেখে এটুকু বেশ বুঝতে পারলাম যে রাত্রে তার ভালো ঘুম হয়নি। মনে মনে স্থির করলাম যে আমার কাছে যে ঘুমের বড়িটা আছে, আজ রাত্রে শোবার আগে তার একটা জয়ন্তকে খাইয়ে দেব।

আমার প্ল্যান অনুযায়ী আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে ন—টায় বুন্দির কেল্লা দেখতে গেলাম। গাড়ির ব্যবস্থা করা ছিল আগে থেকেই। কেল্লায় পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে গেল প্রায় সাড়ে ন—টা।

এখানে এসেও দেখি জয়ন্তর সব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে তার পুতুলের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যি বলতে কী, জয়ন্তর ছেলেমানুষি উল্লাস দেখে মনে হচ্ছিল সে বোধহয় পুতুলের কথাটা ভুলেই গেছে। একেকটা জিনিস দেখে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—'ওই যে গেটের মাথায় সেই হাতি! ওই যে সেই গম্বুজ! এই সেই রুপোর খাট আর সিংহাসন! ওই যে দেওয়ালে আঁকা ছবি!...'

কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে—না—যেতেই তার ফুর্তি কমে এল। আমি নিজে এত তন্ময় ছিলাম যে প্রথমে সেটা বুঝতে পারিনি। একটা লম্বা ঘরের ভিতর দিয়ে হাঁটছি আর সিলিং—এর দিকে চেয়ে ঝাড় লণ্ঠনগুলো দেখছি, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল জয়ন্ত আমার পাশে নেই। কোথায় পালাল সে?

আমাদের সঙ্গে একজন গাইড ছিল, সে বলল বাবু বাইরে ছাতের দিকটায় গেছে।

দরবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি জয়ন্ত বেশ খানিকটা দূরে ছাতের উলটোদিকে পাঁচিলের পাশে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে আপন চিন্তায় এমনই মগ্ন যে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেও তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হল না। শেষটায় আমি নাম ধরে ডাকতে সে চমকে উঠল। বললাম, 'কী হয়েছে তোর ঠিক করে বল তো। এমন চমৎকার জায়গায় এসেও তুই মুখ ব্যাজার করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবি—এ আমার বরদাস্ত হচ্ছে না।'

জয়ন্ত শুধু বলল, 'তোর দেখা শেষ হয়েছে কি? তাহলে এবার...'

আমি একা হলে নিশ্চয়ই আরও কিছুক্ষণ থাকতাম, কিন্তু জয়ন্তর ভাবগতিক দেখে সার্কিট হাউসে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

পাহাড়ের গা দিয়ে বাঁধানো রাস্তা শহরের দিকে গিয়েছে। আমরা দুজনে চুপচাপ গাড়ির পিছনে বসে আছি। জয়ন্তকে সিগারেট অফার করতে সে নিল না। তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ করলাম যেটা প্রকাশ পাচ্ছিল তার হাত দুটোর অস্থিরতায়। হাত একবার গাড়ির জানালায় রাখছে, একবার কোলের উপর, পরক্ষণেই আবার আঙুল মটকাচ্ছে, না হয় নখ কামড়াচ্ছে। জয়ন্ত এমনিতে শান্ত মানুষ। তাকে এভাবে ছটফট করতে দেখে আমার ভারি অস্বস্তি লাগছিল।

মিনিট দশেক এইভাবে চলার পর আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, 'তোর দুশ্চিন্তার কারণটা আমায় বললে হয়তো তোর কিছুটা উপকার হতে পারে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, 'বলে লাভ নেই, কারণ বললে তুই বিশ্বাস করবি না।'

'বিশ্বাস না করলেও, বিষয়টা নিয়ে অন্তত তোর সঙ্গে আলোচনা করতে পারব।'

'কাল রাত্রে ফ্রিৎস আমাদের ঘরে এসেছিল। লেপের উপর ছাপগুলো সব ফ্রিৎসের পায়ের ছাপ।'

একথার পর অবিশ্যি জয়ন্তর কাঁধ ধরে দুটো ঝাঁকুনি দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার থাকে না। যার মাথায় এমন একটা প্রচণ্ড আজগুবি ধারণা আশ্রয় নিয়েছে, তাকে কি কিছু বলে বোঝানো যায়? তবু বললাম, 'তুই নিজের চোখে তো দেখিসনি কিছুই।'

'না—তবে বুকের উপর যে জিনিসটা হাঁটছে সেটা যে চারপেয়ে নয়, দু—পেয়ে, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।'

সার্কিট হাউসে এসে গাড়ি থেকে নামার সময় মনে মনে স্থির করলাম জয়ন্তকে একটা নার্ভ টনিক গোছের কিছু দিতে হবে। শুধু ঘুমের বড়িতে হবে না। ছেলেবেলার সামান্য একটা স্মৃতি একটা সাঁইত্রিশ বছরের জোয়ান মানুষকে এত উদব্যস্ত করে তুলবে—এ কিছুতেই হতে দেওয়া চলে না।

ঘরে এসে জয়ন্তকে বললাম, 'বারোটা বাজে, স্নানটা সেরে ফেললে হত না।'

জয়ন্ত 'তুই আগে যা' বলে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

স্নান করতে করতে আমার মাথায় ফন্দি এল। জয়ন্তকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বোধ হয় এই একমাত্র রাস্তা।

ফন্দিটা এই—ত্রিশ বছর আগে যদি পুতুলটাকে একটা বিশেষ জায়গায় মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়ে থাকে, আর সেই জায়গাটা কোথায় যদি জানা থাকে, তাহলে সেখানে মাটি খুঁড়লে আস্ত পুতুলটাকে আগের অবস্থায় না পেলেও, তার কিছু অংশ এখনও নিশ্চয়ই পাবার সম্ভাবনা আছে। কাপড় জামা মাটির তলায় ত্রিশ বছর থেকে যেতে পারে না, কিন্তু ধাতুর জিনিস—যেমন ফ্রিৎসের বেল্টের বকলস বা কোটের পেতলের বোতাম—এসব জিনিসগুলো টিকে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। জয়ন্তকে যদি দেখানো যায় যে তার সাধের পুতুলের শুধু ওই জিনিসগুলোই অবশিষ্ট আছে, আর সব মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তাহলে হয়তো তার মন থেকে এই উদ্ভট ধারণা দূর হবে। এ না করলে প্রতিরাত্রেই সে আজগুবি স্বপ্ন দেখবে, আর সকালে উঠে বলবে ফ্রিৎস আমার বুকের উপর হাঁটাহাঁটি করছিল। এইভাবে ক্রমে তার মাথাটা বিগড়ে যাওয়া অসম্ভব না।

জয়ন্তকে ব্যাপারটা বলতে তার ভাব দেখে মনে হল ফন্দিটা তার মনে ধরেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সে বলল, 'খুঁড়বে কে? কোদাল কোথায় পাবে?'

আমি হেসে বললাম, 'এতবড়ো বাগান যখন রয়েছে তখন মালিও একটা নিশ্চয়ই আছে। আর মালি থাকা মানেই কোদালও আছে। লোকটাকে কিছু বকশিস দিলে সে মাঠের এক প্রান্তে একটা গাছের গুঁড়ির পাশে খানিকটা মাটি খুঁড়ে দেবে না—এটা বিশ্বাস করা কঠিন।'

জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ রাজি হল না। আমিও আর কিছু বললাম না। আরও দু—একবার হুমকি দেবার পর সে স্নানটা সেরে এল। এমনিতে খাইয়ে লোক হলেও, দুপুরে সে মাত্র দু—খানা হাতের রুটি আর সামান্য মাংসের কারি ছাড়া আর কিছুই খেল না। খাওয়া সেরে বাগানে দিকের বারান্দায় গিয়ে বেতের চেয়ারে বসে রইলাম দুজনে। আমরা ছাড়া সার্কিট হাউসে আর কেউ নেই। দুপুরটা থমথমে। ডানদিকে নুড়ি ফেলা রাস্তার ওপাশে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে কয়েকটা হনুমান বসে আছে, মাঝে মাঝে তাদের হুপ হুপ ডাক শোনা যাচ্ছে।

তিনটে নাগাদ একটা পাগড়ি পরা লোক হাতে একটা ঝারি নিয়ে বাগানে এল। লোকটার বয়স হয়েছে। চুল, গোঁফ গালপাট্টা সবই ধপধপে সাদা।

'তুমি বলবে, না আমি?'

জয়ন্তর প্রশ্নতে আমি তার দিকে আশ্বাসের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে ইশারা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা চলে গেলাম মালিটার দিকে।

মাটি খোঁড়ার প্রস্তাবে মালি প্রথমে কেমন জানি অবাক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বোঝা গেল এমন প্রস্তাব তাকে এর আগে কেউ কোনোদিন করেনি। তার 'কাহে বাবু?' প্রশ্নতে আমি তার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললাম, 'কারণটা না হয় নাই জানলে। পাঁচ টাকা বকশিস দেব—যা বলছি করে দাও।'

বলা বাহুল্য মালি তাতে শুধু রাজিই হল না, দন্ত বিকশিত করে সেলাম—টেলাম ঠুকে এমন ভাব দেখাল যেন সে আমাদের চিরকালের কেনা গোলাম।

বারান্দায় বসা জয়ন্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। সে চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলে। কাছে এলে বুঝলাম তার মুখ অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আশা করি খোঁড়ার ফলে পুতুলের কিছুটা অংশ অন্তত পাওয়া যাবে।

মালি ইতিমধ্যে কোদাল নিয়ে এসেছে। আমরা তিনজনে দেবদারু গাছটার দিকে এগোলাম।

গাছের গুঁড়িটার থেকে হাত দেড়েক দূরে একটা জায়গার দিকে হাত দেখিয়ে জয়ন্ত বলল, 'এইখানে।'

'ঠিক মনে আছে তো তোর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

জয়ন্ত মুখে কিছু না বলে কেবল মাথাটা একবার নাড়িয়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল।

'কতটা নীচে পুঁতেছিলি?'

'এক বিঘত তো হবেই।'

মালি আর দ্বিরুক্তি না করে মাটিতে কোপ দিতে শুরু করল। লোকটার রসবোধ আছে। খুঁড়তে খুঁড়তে একবার জিজ্ঞেস করল মাটির নীচে ধনদৌলত আছে কিনা, এবং যদি থাকে তাহলে তার থেকে তাকে ভাগ দেওয়া হবে কিনা। একথা শুনে আমি হাসলেও, জয়ন্তর মুখে কোনো হাসির আভাস দেখা গেল না। অক্টোবর মাসে বুন্দিতে গরম নেই, কিন্তু কলারের নীচে জয়ন্তর শার্ট ভিজে গেছে। সে একদৃষ্টে মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে। মালি কোদালের কোপ মেরে চলেছে। এখনও পুতুলের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কেন?

একটা ময়ূরের তীক্ষ্ন ডাক শুনে আমি মাথাটা একবার ঘুরিয়েছি এমন সময় জয়ন্তর গলা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেয়ে আমার চোখটা তৎক্ষণাৎ তার দিকে চলে গেল। তার নিজের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পরক্ষণেই তার কম্পমান ডান হাতটা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিয়ে তর্জনীটাকে সোজা করে গর্তটার দিকে নির্দেশ করল। আঙুলটাকেও স্থির রাখতে পারছে না সে।

তারপর এক অস্বাভাবিক শুকনো ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন এল—

'ওটা কী!'

মালির হাত থেকে কোদালটা মাটিতে পড়ে গেল।

মাটির দিকে চেয়ে যা দেখলাম তাতে ভয়ে, বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে আপনা থেকেই আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

দেখলাম, গর্তের মধ্যে ধুলোমাখা অবস্থায় চিৎ হয়ে হাত—পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একটি দশ—বারো ইঞ্চি ধপধপে সাদা নিখুঁত নরকঙ্কাল!

অমলা

বিমল কর

আমাদের বন্ধু নীলুর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলেই কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। ঘাটশিলায় গিয়ে মিহির হাত ভেঙেছিল, যশিডিতে যেবারে গেলাম, সেবারে শরৎ টাঙ্গা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় বেশ চোট পেয়েছিল। আর একবার তো আমরা রাঁচির রাস্তায় বাস উলটে মরে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছি। অবশ্য এসব ঘটনার জন্য নীলুকে পুরোপুরি দায়ী করা উচিত নয়। তার এইমাত্র অপরাধ, সে ঘাটশিলায় সুবর্ণরেখার পেছল পাথরে পা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাবার পথটা আমাদের দেখিয়েছিল। কিংবা যশিডিতে যে টাঙ্গাটা চাকা ভেঙে রাস্তার মধ্যে কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে, সে টাঙ্গাটা নীলুই ভাড়া করেছিল। রাঁচির বাস সম্পর্কেও একই কথা, নীলুই আমাদের সন্ধের বাস ধরার জন্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এইসব ঘটনাকে আমরা নীলুর সঙ্গে একটা যোগসূত্র জড়িয়ে দিলেও সেটা নিতান্তই পরিহাস। যে ঘটনা স্বাভাবিক দুর্ঘটনা হিসেবে ঘটতে পারত, তার সঙ্গে নীলুকে জড়ানো অনুচিত। তবু আমরা ঠাট্টা করেই বলতাম, নীলু একটা অপয়া। নীলু এসব কথায় কান করত না, রাগও করত না।

সেবার ঘটনাটা অন্যরকম ঘটেছিল, এর জন্যে নীলু কতটা দায়ী বা কতটা দায়ী নয়, তাও আমি জানি না। কিন্তু যা ঘটেছিল, তার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নীলুর ভূমিকাই ছিল মুখ্য।

ক্রিসমাসের দিন চার—পাঁচ ছুটির মুখে নীলু এসে বলল, 'চল কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসি।' মিহির আর শরৎ ভাবছিল, শীতের দিনে হরিহরদের গালুডি থেকে বেড়িয়ে আসবে। শরৎ বলল, 'কাছাকাছি জায়গাটা কোথায়?' নীলু বলল, 'ভেরি নীয়ার। সীতারামপুর থেকে মাত্র কয়েকটা স্টেশন।' আমি বললাম, 'সেখানে কী আছে?' নীলু বলল, 'সাঙ্ঘাতিক লোনলি; এন্তার ফাঁকা মাঠ, শীতের ঠান্ডায়, হিমে জমে বরফ হয়ে থাকে! ফার্স্ট ক্লাস মুরগি...আর শুনেছি, টেরিফিক চমচম পাওয়া যায়। শরৎ ফাঁকা মাঠের ভক্ত, কাব্যে তার মতি আছে। মিহির মুরগি রাঁধে চমৎকার। কিন্তু এসব কথা নয়, দু—চার দিনের জন্যে শীতের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে আসায়, আমরা সকলেই উৎসাহী ছিলাম। অতএব যথাসময়ে যাত্রা করা গেল।

রেলের টাইমটেবিলে এই স্টেশনের নামটি আছে কিনা আমি জানি না। হয়তো আছে, কিন্তু তার নাম আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমরা ট্রেন থেকে নেমেছিলুম সন্ধের পর। ফাঁকা স্টেশনে দু—একটা বাতি টিমটিম করে জ্বললেও হালকা জ্যোৎস্না। এবং ঘন কুয়াশার মধ্যে স্টেশনের সাইনবোর্ড আমাদের চোখে পড়েনি। জায়গাটি আশ্চর্যরকম নিরিবিলি, মনে হয় যেন জগৎ—সংসারের স্থূল স্পর্শ থেকে একপ্রান্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। ছায়ার মতো একটি দুটি রেল কোয়ার্টার, টিলার মতো উঁচু জায়গায় ছোটো স্টেশন ঘর, বাইরে দু—চারটে খাপরা ছাওয়া দোকান, টিমটিমে লণ্ঠনের আলো। গাড়ি—ঘোড়ার কোনো চিহ্ন কোথাও ছিল না। নিজেদের বিছানা, সুটকেশ নিজেরাই বয়ে প্রায় সিকি মাইলটাক পথ এগিয়ে আমরা যে বাড়িটায় ঢুকলাম, সে বাড়িতে মানুষ ছিল। মোটামুটি আমাদের পক্ষে চলনসই বাড়ি। মাথার ওপর টালি, মাঝারি মাপের একখানি ঘর, সামনে বারান্দা, অল্প উঠোন; বাড়ির বাইরে কুয়াতলা। যে মানুষটি আমাদের অভ্যর্থনা করল তার বয়স হয়েছে, এ বাড়িরই রক্ষক, অর্থাৎ মালি বলা যায়। বাড়ির ব্যবস্থা নীলুই করেছিল আগে।

নীলু জনতা স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। ঘরটা মোটামুটি পরিষ্কারই ছিল, গোটা দুই পুরোনো তক্তপোশ, তক্তপোশ জুড়ে আমাদের বিছানা পাতা হয়ে গেল। মোম আর লণ্ঠনের আলোয় হাতমুখ ধুয়ে আমরা যখন কম্বল পায়ে চাপিয়ে বসলাম, তখন মোটামুটি আরামই লাগছিল। চা আর সিগারেট খেতে খেতে

শরৎ বলল, 'রিয়েলি ইট ইজ উইন্টার।' মিহির বলল, 'মস্ত ভুল হয়ে গেল, একটা হুইস্কি আনা উচিত ছিল।' আমি বললাম, 'কম্বলে শীত কাটলে হয়।' নীলু চায়ের পর টিফিন কেরিয়ারে বয়ে আনা খাবারগুলো একে একে গরম করে নিল। তারপর গল্পগুজবে আরও খানিকটা রাত হলে আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম। বাইরের বারান্দায় বালতি ভরা জল ছিল, মুখ ধুতে গিয়ে মিহির যখন কুলকুচো করছে আর শরৎ তার হাতের টর্চের আলোটা এপাশ ওপাশ দোলাচ্ছে, তখনই হঠাৎ তার নজরে পড়ল বারান্দার এক কোণে একটা টিনের সাইনবোর্ড। টর্চের আলোটা সাইনবোর্ডে পড়তেই শরৎ তার হাত আর নড়াতে পারল না। একইভাবে আলো ফেলে রেখে হঠাৎ সে বলল, 'আরে!'

তার 'আরে' বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভালো করে তাকালাম, তাকিয়ে দেখি সাইনবোর্ডে একটি মেয়ের মুখ। স্পষ্ট করে তার চোখ মুখ দেখা যাচ্ছিল না। না দেখা যাবার কারণ রঙের বিবর্ণতা ততটা নয়, যতটা মেয়েটির মুখের ভঙ্গির জন্যে। মুখটা একপাশে হেলানো, একটিমাত্র চোখ নাক এবং এলানো চুলের গুচ্ছ চোখে পড়ছিল। একপাশে বড়ো বড়ো করে লেখা 'অমলা স্টোর্স'। সাইনবোর্ডটা দেখতে দেখতে আমি বললাম, 'আশ্চর্য!'

নীলু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, মিহিরের মুখ ধোওয়া শেষ। মিহির বলল, 'কী আশ্চর্য?' আমি বললাম, 'ওদিকে দেখ।'

মিহির সাইনবোর্ডটার দিকে তাকাল, শরৎ তখনও সমানে টর্চের আলো সেদিকপানে ধরে রেখেছে। মিহির কেমন যেন চমকে উঠে বলল, 'মাই গড!'

নীলু আমাদের ঘাড়ের পাশে এসে গিয়েছিল, বলল, 'কী রে?' বলে সে নিজেই সাইনবোর্ডটার দিকে তাকাল। তাকিয়ে আছে তো আছেই। আচমকা সে বলল, 'স্ট্রেঞ্জ!'

এই যে আমরা চার বন্ধু অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ডের আঁকা অর্ধবিবর্ণ মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে যে যার মতো অবাক আর বিহ্বল হয়ে গেলাম, তার নিশ্চয় কোনো কারণ ছিল। কিন্তু কারণটা কী তখন বোধহয় কেউই স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারছিলাম না। কেন যেন আমরা খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে মুখ ধুয়ে নিলাম।

মিহির বলল, 'সেই বুড়োটা কোথায় গেল?'

নীলু বলল, 'ওর বাড়িতে গিয়েছে। কাছেই বাড়ি।'

আমরা হাত—মুখ মুছতে মুছতে ঘরে চলে এলাম। শরৎ দরজা বন্ধ করে দিল।

মিহির বিছানার ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে দিল। আমরা চার বন্ধু পর পর সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

সিগারেটে মস্ত টান দিয়ে শরৎ শেষে বলল, 'এখানে ওই সাইনবোর্ড কী করে এল?'

নীলু বলল, 'মানে? নিশ্চয় কেউ এনে রেখেছে!'

শরৎ বলল, 'এরকম ঘটনা আমি জীবনে দেখিনি। অবাক কাণ্ড মাইরি।'

মিহির বলল, 'আমিও থ মেরে গিয়েছি।'

আমি বললাম, 'কি করে এমন হয়, আমার মাথায় ঢুকছে না।'

নীলু মুঠো পাকিয়ে সিগারেট টানছিল, ছাদের দিকে মাথা তুলে বিড়বিড় করে বলল, 'এ শালা যেন ভূতের কারবার।'

আমরা চারজনেই অবাক হয়ে গিয়েছি অমলা স্টোর্সের বিজ্ঞাপনের মেয়েটিকে দেখে, কিন্তু কেন হয়েছি তা আরও কিছুক্ষণ কেউ প্রকাশ করতে পারলাম না।

তক্তপোশের ওপর ঢালাও জোড়া বিছানায় চার বন্ধু চুপচাপ বসে প্রথম সিগারেটটা শেষ করে ফেললাম। ঘরের মধ্যে এক কোণে লণ্ঠনটা জ্বলছে মিটমিট করে। ঘরের মধ্যেই শীত এত প্রবল যে বাইরে বোধহয় পশু—পাখিও নেই। কোথাও কোনো শব্দ আমরা শুনছিলাম না। একটা কুকুর পর্যন্ত কোথাও ডাকছে না।

শরৎ তার কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সাধুবাবার মতন করে বসল। বলল, 'ভাই, ওই যে বাইরে অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ডে মেয়েটার মুখ দেখলাম ওই মুখ আমি আগে দেখেছি। এগজ্যাক্টলি দ্যাট ফেস।'

মিহির বলল, 'আরে, ওই মেয়ের মুখ আমারও চেনা।'

আমি আর নীলু একই কথা বললাম।

আমরা চার বন্ধু একই মেয়েকে চিনি এটা কিছু অসম্ভব নয়। এরকম পাঁচ—সাত জনের নাম করে দেওয়া যায়, যেমন কলেজে নীলিমাকে, যদিও নীলিমা আমার আর শরতের সঙ্গে পড়লেও মিহিরদের সঙ্গে পড়ত না। মিহির আর নীলু আলাদা কলেজে পড়ত। আমাদের কলেজে আড্ডা মারতে এসে নীলিমাকে দেখেছে। ইউনিভার্সিটিতে হাসির বেলায়ও সেইরকম। সে মিহিরদের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে ছিল, কিন্তু আমরা তাকে দেখেছি। নিরুপমা বউদি, মিহিরদের পাড়ার সেই স্কুল—টিচার আভা মৈত্র—এইরকম কত মেয়ে আছে যারা আমাদের পরিচিত। কিন্তু সে পরিচয় সমষ্টিগতভাবে, একক নয়। অমলা স্টোর্সের মেয়েটির বেলায় আমাদের তেমন কোনো ঘটনা মনে পড়ছিল না। মেয়েটিকে আমরা যেন চিনি—কিন্তু একা একা, কোনোদিন একসঙ্গে দুজনেও তাকে দেখিনি।

নীলু শরৎকে বলল, 'তুই ওকে কোথায় দেখেছিস?'

শরৎ বলল, 'ভাই, আমি চুঁচড়োয় একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলাম, বেশি দিনের কথা নয়, গত বর্ষায়, বোধ হয় শ্রাবণ মাসে। আমার মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে বরযাত্রী। সেখানে প্রথম মেয়েটিকে দেখি। কন্যাপক্ষের মেয়ে, মানে পাত্রীর দিদি, বোধ হয় মাসতুতো দিদি—টিদি হবে। সত্যি বলতে কী, বিয়েবাড়িতে যত মেয়ে ছিল তার মধ্যে এই মেয়েটি নজর টানে সবার আগে। কেন নজর টানে, সেকথা আমায় জিজ্ঞেস কোরো না। আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না। ওর অসম্ভব একটা চার্ম ছিল। লম্বা, শ্যামলা, ছিপছিপে চেহারা, শ্যামলা রং যে অত সুন্দর দেখায় আমি জীবনে দেখিনি। শরীরের গড়ন নিখুঁত, যেমন চোখ—মুখ তেমনি হাত—পা। স্পেশালি চোখ, লোকে বলে পাখির পালকের মতন টানা—টানা চোখ নাকি হয়, আমি সেই প্রথম দেখলাম, সত্যিই পাখির পালকের মতন চোখ, মণি দুটো কালো কুচকুচ করছে, দাঁত কী অদ্ভুত সাদা আর ঝকঝকে। একটাই শুধু অবাক কাণ্ড, বিয়েবাড়িতে মেয়েটি তার মাথার চুল একেবারেই এলো রেখেছিল, খোঁপা নয়, বিনুনি নয়, একটা রিবন পর্যন্ত তার মাথায় ছিল না। এমন চমৎকার চুল মেয়েদের দেখাও যায় না আজকাল। যেমন ঘন, তেমনি কালো, সামান্য কোঁকড়ানো, আর কম করে কোমর ছাড়ানো চুল। আমাদের ধারণা হয়েছিল, মেয়েটি তার মাথার চুল দেখাবার জন্যে এইভাবে রয়েছে। বিয়েবাড়িতে মেয়েরা অন্য পাঁচ ভাবে মাথার চুল দেখায়, কিন্তু এভাবে নয়। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলিও করেছি। মেয়েদের বাড়ির তরফেও কেউ কেউ দেখলাম, একই কারণে অখুশি। কিন্তু আমাদের খুঁতখুঁতুনিতে কী আসে যায়। মেয়েটির চুলও তার চার্ম। বলতে নেই, আমি এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে বিয়ে—ফিয়ে ভুলে সারাক্ষণ ওকে দেখেছি, যতক্ষণ পেরেছি। আলাপের চেষ্টা করার একটা সুযোগও জুটেছিল। দু—চারটে কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছি, মেয়েটি শুধু হেসেছে। আমি শালা, টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি, প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে এমন করে নাড়া দিয়েছিল মেয়েটি কী বলব।... পরের দিন আবার কলকাতা থেকে ছুটলাম, নিজে যেচেই বলতে পারিস, বর—বউ আনতে চুঁচড়োয়। গিয়ে দেখি—মেয়েটি নেই, ভোরবেলায় তার বাড়ি ফিরে গেছে। মন—টন খারাপ হয়ে গেল, যাঃ শালা, যেজন্যে যাওয়া সেটাই বরবাদ। তারপর আমি মেয়েটি সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেছি। শুনেছি, ওরা বর্ধমানের লোক। এর বেশি কোনো খবর পাইনি। আমার ভাই এবং ভাইয়ের বউ আমায় আর কিছু বলতে পারেনি বা বলেনি। আজ এতদিন পরে একেবারে অবিকল সেই মেয়েটির মুখ আমি ওই ছবির মধ্যে দেখলাম। হয়তো চোখের ভুল। কাল সকালে একবার দেখব। তবে, আমি ও মুখ ভুলে যাব, এমন আমার মনে হয় না। এখানে কী করে, কার হাতে ওই মুখের ছবি ফুটে উঠল বুঝতে পারছি না। দোকানের সাইনবোর্ডে অমন সুন্দর মেয়ের মুখ কেউ আঁকে নাকি? ছি ছি।'

শরৎ যখন কথা বলছিল, মিহির খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন কিছু প্রতিবাদ করে বলতে চায়। শরৎ তার কথা শেষ করা মাত্র মিহির ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'তা কী করে হবে? আমি যে ওকে নিজের চোখে চোরবাগানে দেখেছি।'

'চোরবাগানে?' আমি শুধোলাম।

'আলবাৎ চোরবাগানে। চোরবাগানে আমার মেজদিরা থাকে। মানে মেজদির শ্বশুরবাড়ি চোরবাগানে। ভাই—সে এক কাহিনি। আমার মেজদির এক ভাসুর বরাবরই পাগলা গোছের, মাথায় ছিট—ফিট আছে। কিন্তু খুব পণ্ডিত লোক। এনশেন্ট হিস্ট্রির নামকরা ছাত্র ছিলেন এককালে, কলেজে পড়িয়েছেনও কিছুকাল। খ্যাপা টাইপের লোক, চাকরি—বাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিয়ে—থা করেননি। আমরা তাঁকে বিলাসদা বলেই ডাকতাম। নাম ছিল বিলাস। একদিন এক কাণ্ড হল। আমাদের বাড়িতে খবর এল, বিলাসদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিলাসদা বাচ্চা নন, ছেলেমানুষ নন, পলিটিক্যাল পার্টির লোক নন যে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাবা বললে, একবার মেজদির বাড়ি যা, গিয়ে দেখ কী ব্যাপার। মেজদির চোরবাগানের বাড়িতে গিয়ে দেখি, একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড চলছে। বিলাসদা দিন দুয়েক আগে দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ওরকম তো রোজ যান—কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি। রাত পর্যন্ত বিলাসদা ফিরছেন না দেখে বাড়ির লোক বেশ চিন্তিত হয়ে ওঠে। খোঁজখবর নিতে শুরু করে। খ্যাপা লোক, কোথায় গেছেন কী করছেন বোঝাও মুশকিল। সে—রাতটা কাটার পর সকাল থেকে ছুটোছুটি লেগে গেল। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি, বন্ধুবান্ধবের ডেরা, হাসপাতাল, পুলিশ—কোথাও কোনো ট্রেস নেই। লোকটা তবে গেল কোথায়? কলকাতা ছেড়ে বিলাসদা পালিয়ে গেলেন নাকি? কোথায় গেলেন? এইরকম একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থায় আমি মেজদির বাড়ি গিয়েছিলাম সকালে। যাওয়াই সার, কোনো কাজে এলাম না। মেজদি বলল, তুই বিকেলে একবার আসিস। আবার বিকেলে গেলাম, গিয়ে দেখি বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছে। বিলাসদার রাস্তার মধ্যে সেরিব্র্যাল অ্যাটাক হয়। রাস্তাতেই পড়ে যান। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর, এমারজেন্সির বাইরে ফেলে রাখা হয়েছিল। পরে বেডে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো একটা দিন কমপ্লিট অজ্ঞান ছিলেন, তারপর মারা যান। বিলাসদার কাছে এমন কিছু ছিল না—তাঁকে ট্রেস করা যায়। অনেক কাঠ—খড় পুড়িয়ে ট্রেস করা গেল যখন, তখন শুনলাম মর্গ থেকে ডেডবডি আনতে হবে। সেই বডি আনতে লোক গেছে।... বুঝতেই পারো, আমি কী অবস্থায় পড়েছি তখন। বিলাসদা মারা যাবার খবর পেয়ে বাড়িতে অনেক লোক এসে গেছে, আসছে একে একে, তার মধ্যে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছাড়াও বিলাসদার পুরোনো ছাত্রছাত্রীরাও ছিল। কান্নাকাটি, কেউ খাট আনছে, কারা যেন ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল কিনে আনল। ঠিক এই সময় আমি একটি মেয়েকে দেখলাম। মেয়ে দেখার অভ্যেস আমার চিরকালের। কিন্তু ভাই, সত্যি বলছি, এরকম মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। আশ্চর্য দেখতে, তার পুরো চেহারার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ ছিল যা বুঝিয়ে বলা যায় না। ছিপছিপে চেহারা, মাথায় লম্বা চুল, সুন্দর কোমর, ঘাড়—পিঠে নিখুঁত। মুখখানিও ভারি মিষ্টি, মোলায়েম, অথচ অভিজাত। সাদা খোলের একটা শাড়ি, কালো পাড়, গায়ের জামাও সাদা। মাথার চুল একেবারে এলো। বিষণ্ণ, শান্ত, উদাস চোখ মেলে সে বারকয়েক বারান্দায় আর বাইরে এল গেল। আমি যতক্ষণ পারি তাকে দেখতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল, ও যেন চোখের আড়ালে না যায়। বাড়িতে এত লোকজন যে কে কার আত্মীয়, কার কী পরিচয়, ওই দুঃখের অবস্থায় কাউকে জিজ্ঞেস করার কথা নয়। তবু আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল, জানি না। আমি গিয়েছি বিলাসদার শ্মশানযাত্রায় শোকযাত্রী হতে, অথচ একটি মেয়েকে দেখে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে তাকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। বিলাসদার দেহ এল। বাড়িতে নামানো হল। কান্নাকাটি, ফুল, অগুরু—কত কী হল—আমি শুধু মেয়েটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর দেখছি। তারপর যখন বিলাসদাকে নিয়ে আমরা বেরোচ্ছি সন্ধেবেলা, হরিবোল শুরু হয়েছে, মুখ ফিরিয়ে দেখি—সেই মেয়েটি। নিবিড়, বিষণ্ণ, উদাস চোখে চেয়ে আছে। শোক আর বেদনায় সেই সন্ধ্যাটি যেন তার মুখশ্রীতে নিবিড় হয়ে থাকল।...তারপর আর তাকে দেখিনি। এতকার পরে আজ এখানে আবার তার ছবি

দেখলাম। আমি জানি না, আমার কোনো ভুল হচ্ছে কিনা—তবে সেই মেয়েটিকে আমার ভোলার কথা নয়। অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ডের ছবিটা আর ওই মেয়ের মুখ হুবহু এক।...আমি বুঝতে পারছি না, কেমন করে এটা হল? তা ছাড়া ওই মুখ অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ডেই বা এল কী করে? কে আঁকল? বলতে বলতে মিহির চুপ করে গেল।

মিহিরের কথা ফুরোলে আমরা চুপচাপ। নীলু নতুন একটা সিগারেটের প্যাকেট খুলল। আমরা চারজনে সিগারেট ধরালাম। শীত যেন হাত—পা গায়ে বসে যাচ্ছে। কপাল ব্যথা করছিল।

আমি বললাম, 'অমলা স্টোর্সের ওই মেয়েটির মুখ দেখে আমার একজনের কথা মনে পড়ছে। তার নাম অমলা কিংবা কমলাও হতে পারে—ঠিক বলতে পারব না। পারব না, কেননা তাকে যারা ডাকছিল, তারা আমার থেকে এতটা তফাতে ছিল যে আমি নামটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম না। ব্যাপারটা বেশিদিন আগে ঘটেনি। এবার পুজোর সময় মা আর মাসিমা তীর্থ করতে, বা বলো বেড়াতে, ওই স্পেশাল গাড়িতে যাচ্ছিল। টাকাপয়সা জমা দিয়ে যথারীতি সিট বুক হয়েছে। যাত্রার দিন আমি গেছি হাওড়া স্টেশনে মা আর মাসিমাকে তুলে দিতে। সে ভাই এক এলাহি কাণ্ড। মানুষে এত বেড়ায় আমার জানা ছিল না। বুড়ো—বুড়ি, বউ, বিধবা, যুবতী কোনোদিকেই কমতি নেই। যারা যাবে—তারা তো যাবেই—যারা যাচ্ছে, তাদের আত্মীয়স্বজনে প্ল্যাটফর্মটা গিজগিজ করছে। মা আর মাসিমাকে তুলে দিয়ে আমি নীচে নেমে একটু হাওয়া খাচ্ছি, দেখি ওই মেয়ে। সংসারের এক—একটা ঘটনা ঘটে ঠিক যেন বজ্রপাত, কখন ঘটে গেল, কী করে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, স্তম্ভিত হলাম—বোঝাই যায় না। এটাও ঠিক তেমনি। একেবারে আচমকা দেখলাম সেই মেয়েটি আর দুজনের সঙ্গে বিছানাপত্র, সুটকেশ, এনে গাড়িতে চড়ছে। অসামান্য চেহারা ভাই। যাকে আমরা ডানাকাটা পরি, উর্বশী বা ওইরকম কিছু বলি, মোটেও তা নয়। একেবারে অন্যরকম, দেখামাত্র চোখে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক লেগে যায়। এমন সুশ্রী, সংযত, শালীন চেহারা। ভগবান মেয়েটিকে কোথাও যেন চড়া রঙে আঁকতে চাননি, একেবারে নরম তুলিতে নরম রঙে। নিখুঁত গড়ন, কোথাও কোনো অমিল নেই, অসংগতি নেই। যেমন হাত—পা, তেমনি কোমর, বুক, গলা। মুখটি যেন শরতে ফুটে ওঠা জ্যোৎস্নার মতন, এমন মসৃণ, স্নিগ্ধ, চোখ জুড়োনো। আমি হাঁ করে মেয়েটিকে দেখতে লাগলাম। সে গাড়িতে উঠল, তার জায়গা খুঁজে নিল, জিনিসপত্র রাখল, তার দুই সঙ্গিনী তাকে অমলা কিংবা কমলা বলে ডেকে ডেকে কথা বলতে লাগল। আর হু—হু করে সময় বয়ে যেতে লাগল। আমি তখন চোখে কী দেখছি আর দেখছি না খেয়াল নেই, বুকের মধ্যে কীসের একটা তোলপাড় চলছে, মাথা ঝিমঝিম করছিল। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটির চুল ছিল এলানো। কেন, কীজন্যে আমি জানি না। এই চুলের জন্যে তাকে কেমন একটা যোগিনী—যোগিনী দেখাচ্ছিল, সাম সর্ট অফ রিলিজিয়াস পিউরিটি ওয়াজ দেয়াল।...তারপর গাড়িটা কখন ছেড়ে দিল। দেখলাম, সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাসছে, আস্তে আস্তে হাত নাড়ল। আমিও একবার হাত নেড়ে দিলাম। গাড়ি ওকে নিয়ে চলে গেল। আমি বেহুঁশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।...সত্যি ভাই, কোনোদিন ভাবিনি—আর ওকে দেখব। কিন্তু আজ হল কী? এই একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায়—এইরকম একটা বাড়িতে কোথাকার একটা দোকানের সাইনবোর্ডে তারই অবিকল মুখ দেখলাম। আশ্চর্য! আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। তবু অবিশ্বাস করতে পারছি না।' আমি আমার কথা শেষ করলাম।

এবার নীলুর পালা। আমরা চারজনেই মাথা গায়ে কম্বল জড়িয়ে আছি। কনকন করছে ঠান্ডা। বিছানাটা এলোমেলো হয়ে গেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভরা! লণ্ঠনের আলোটাকে কুয়াশার আড়াল দেওয়া আলোর মতন দেখাচ্ছে।

নীলু বলল, 'আমি ভাই মেয়েটিকে দেখেছি একেবারে অন্যভাবে। একদিন দুপুরবেলায় অফিসে আমার এক বন্ধুর ফোন পেলাম। বলল, শিগগির আয়, আমার খুব বিপদ। ফোন পেয়ে ভবানীপুর ছুটলাম। গিয়ে দেখি পুষ্প—আমার বন্ধুর নাম পুষ্প—পাগলের মতন মাথা খুঁড়ছে। লোকজন জমে গেছে চারপাশে। পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স। পুষ্পর বউ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ব্যাপারটা বুঝে দেখ, কোথা থেকে

কী! সুইসাইড কেস, কাজেই পুষ্পর বউকে পোস্টমর্টেমের জন্যে নিয়ে চলে গেল, আর পুলিশরা পড়ল পুষ্পকে নিয়ে।...পরের দিন বিকেলে আমরা পুষ্পর স্ত্রীর ডেডবডি পেলাম। হিন্দু মহাসভার গাড়ি করে নিয়ে গেলাম কেওড়াতলা। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। আমাদের পর আরেকটা ডেডবডি এল। খাটে শোওয়ানো, মুখ খোলা, ফুল—টুল সামান্য রয়েছে। কী বলব ভাই, এমন মেয়ে আমি দেখিনি। মনেই হয় না—সে মারা গেছে। যেন চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মজার কোনো স্বপ্ন দেখছে। ঠিক ফুলের মতন মুখ, কী অপরূপ চোখ, ঠোঁট, নাক। মাথার চুলগুলো কাঁধের দু—পাশে ছড়ানো। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম। ভুল করে জ্যান্ত লোককে পোড়াতে আনেনি তো? কিন্তু তাই কি হয়? পুষ্পর বউকে ততক্ষণে চুল্লিতে নিয়ে যাচ্ছে, পুষ্প হাউমাউ করে কাঁদছিল।...আমি শুধু মেয়েটিকে দেখছি। দেখছি আর ভাবছি, ও কি সত্যিই মৃত না জীবিত? জীবিত না মৃত? ভাবতে ভাবতে দেখি, মেয়েটি যেন তার ঠোঁটের কোণে পাতলা একটু হাসল। কেন হাসল, বুঝতে পারার আগেই চুল্লিতে তার ডাক পড়ল। হ্যাঁ—আমি তো তাই বলব, চুল্লিতে তার ডাক পড়ল।...অমন একটা মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার আগে আমি শ্মশান ছেড়ে পালিয়ে এলাম।...জীবনে আমরা কত মুখ ভুলে যাই, কোনো কোনো মুখ আমৃত্যু ভুলি না। এই মুখ হল সেই মুখ, আমি ভুলিনি, ভুলতে পারিনি।...কিন্তু অবাক হয়ে ভাবছি, সেই মুখ এখানে এল কী করে? স্ট্রেঞ্জ!'

নীলু চুপ করল।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, বিয়েবাড়িতে যে মুখের দেখা শরৎ পেয়েছিল, সেই মুখ কোথা দিয়ে কোথায় এসে শেষ হল। হায়, হায়।

আমরা বসেই থাকলাম, চুপচাপ, চার বন্ধু, মাথা—গা কম্বলে জড়িয়ে লণ্ঠনটা টিমটিম করে জ্বলতে লাগল।

হঠাৎ শরৎ বলল, 'বাইরে বড়ো শীত, আমার কেন যেন ইচ্ছে করছে—অমলাকে ঘরে এনে রাখি।'

'মানে, ওই অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ডটাকে?'

শরৎ মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। তবে সাইনবোর্ড—ফোর্ড বোলো না। ও অমলা।'

নীলু বলল, 'আনলেই হয়। এমন কি কঠিন কাজ?'

আমরা চার বন্ধু টর্চ আর লণ্ঠন নিয়ে দরজা খুলে অমলাকে আনতে গেলাম বারান্দায়।

সমস্ত চরাচর জুড়ে জ্যোৎস্না নেমেছে, কী গভীর কুয়াশা, হিম ঝরছে নিঃশব্দ বৃষ্টির মতন।

শরৎ টর্চ ফেলল। ফেলেই বলল, 'আরে!'

আমরা বারান্দার শেষপ্রান্তের দিকে তাকালাম।

অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ডটা কোথাও নেই।

শতাব্দীর ওপার থেকে

সমরেশ বসু

হুগলি জেলা সম্পর্কে একটি প্রাচীন কাব্যে এইরকম উল্লেখ আছে— 'গঙ্গার পশ্চিম কূল। বারাণসী সমতুল।'

কাব্যের উক্তিতে কতখানি স্থানমাহাত্ম্যের কথা বলতে চাওয়া হয়েছে জানিনা, তবে হুগলির প্রাচীনত্ব বিষয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। কবি যদি এক্ষেত্রে ত্রিবেণীর কথা মনে রেখে বলে থাকেন, তা হলে আলাদা। কিন্তু আদি সপ্তগ্রাম, যা একদা, মুসলমান যুগেরও আগে অতি সম্পন্ন স্থান ছিল তার কথাও মনে রাখা দরকার।

কিন্তু ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। যদিও এক সময়ে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আমি হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি। সেই ঘুরে বেড়ানোর কাজটা খুব সহজ ছিল না। শহরে বন্দরে ঘোরাঘুরির অনেক সুবিধা। পকেটে টাকা থাকলেই সেখানে পান্থশালার খাদ্য আর আশ্রয়ের অভাব হয় না। পান্থশালা বলতে আমি হোটেল রেস্তোরাঁর কথাই বোঝাচ্ছি।

প্রায় বছর পনেরো আগে কলকাতার এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তির বাড়িতে আমি একজনের সাক্ষাৎ পাই যাঁর একটিই নেশা— প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করা। এই মুদ্রাসংগ্রহকারী ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় তখন তাঁর কাছে আমি একটি লক্ষ্মণ সেন আমলের স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পাই। তিনি আমাদের কাছে অকপটেই স্বীকার করলেন, মুদ্রাটি তিনি মহানাদ গ্রামের গঙ্গার ধার থেকে কিঞ্চিৎ দূরে একটি পোড়ো ভিটার ধুলা থেকে আবিষ্কার করেন। ভদ্রলোকের এইরকম আরও কিছু সংগ্রহ আমি দেখেছি।

ভদ্রলোকের নাম প্রাণনিধি বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকাল সচরাচর এরকম নাম বড়ো একটা দেখা যায় না। প্রাণনিধিবাবুকে প্রথম আমি নিতান্ত একজন মুদ্রাসংগ্রহের নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কিছু আলাপ—আলোচনার পরেই বুঝতে পেরেছিলাম, তিনিও একজন ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিত ব্যক্তি। এমনি সাধারণভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমানো খুবই কঠিন। কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ চুপ করে যান। দীর্ঘ সময় অন্যমনস্ক থাকেন এবং ঘনঘন নস্যি টানেন।

তাঁর আচরণের মধ্যে আরও কিছু কিছু খারাপ ব্যাপার আছে। যার থেকে মনে হয় তিনি কিছুটা ছিটগ্রস্ত লোক। যদিও তিনি আদৌ তা নন। আসলে তাঁর চিন্তার গভীরে বহমান নানা অন্তঃস্রোতের জটিলতাই এর কারণ— মনে মনেই তিনি যার জট খুলতে সচেষ্ট হন।

প্রাণনিধিবাবু মহানাদেরই এক প্রাচীন পরিবারের একমাত্র বংশধর। প্রায় চল্লিশোর্ধ বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিয়ে করেননি। ইতিপূর্বেই আমার জানা ছিল মহানাদ গ্রামের গঙ্গার ধারে নাকি বিশাল শঙ্খ সমুদ্র থেকে ভেসে আসে। তার ভেতর বায়ু প্রবেশ করলেই মহানাদ ধ্বনিত হত, সেই থেকেই গ্রামের নাম মহানাদ। আমি হুগলি জেলার নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি শুনে প্রাণনিধিবাবু আমাকে তাঁর মহানাদ গ্রামের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলাম।

প্রাণনিধিবাবুর সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষাতের মাসখানেক পরে আমি বিনা সংবাদেই একদিন তাঁর গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ভেবেই রেখেছিলাম প্রাণনিধিবাবুর দেখা পাই ভালো, নচেৎ গুপ্তিপাড়া অঞ্চলে ঘুরে রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় ফিরে আসব। পরে আবার পত্রে যোগাযোগ করা যাবে।

মহানাদ অতি প্রাচীন গ্রাম এবং এক সময়ে বিশেষ সম্পন্ন ছিল। অতি প্রাচীন হলেই যা হয় তাই, ধ্বংসাবশেষের বহু চিহ্ন ছড়ানো। পোড়ো অট্টালিকা, ভাঙা মন্দির, বট অশ্বত্থের আক্রমণে সব কিছু

ধ্বংসোন্মুখ। বেলা দশটাতেই ঝিঁঝির ডাকে নিঝুম মনে হল। বিশাল ভগ্ন ইমারতগুলো দেখলেই অনুমান করা যায় গৃহবাসীরা এখন প্রবাসী। সারা দেশের নানান জায়গায় চাকুরি ও ব্যবসা উপলক্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাঙা পোড়ো অট্টালিকা এখন বাস্তুসাপ গোখরোর নিশ্চিন্ত বিচরণ ক্ষেত্র। দু—চারটি ভাঙা পোড়োবাড়িতেই দেখা যায় দরিদ্র বংশধরেরা এখনও কেউ কেউ টিকে আছে, তাও নিতান্ত যেন দায়ে পড়ে। অন্যান্য দরিদ্র গৃহস্থের কুটিরও কিছু কম নেই। সম্ভবত তারা কৃষি ও মৎস্যজীবী শ্রেণির। সমস্ত প্রাচীন বাড়িই যে একেবারে ভেঙে পড়েছে এমন কথা বলা যায় না। এবং সেই সব প্রাচীন অট্টালিকায় এখনও মানুষের বাস বোঝা যায়। বড়ো বড়ো পুকুর, অধিকাংশ ঘাট ভাঙা শ্যাওলায় বিবর্ণ, ফাটলে ফাটলে সাপের অস্তিত্ব যেন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। জলও সবুজ পানায় ভরতি।

কিন্তু প্রাণনিধিবাবুর বাড়ি কোনটি এবং কোন পাড়ায়? আমি খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে রাখিনি। গ্রামের পথে লোকজনের দেখাও তেমন পাচ্ছি না, যাকে জিজ্ঞেস করা যায়। এক—আধজন যাদের দেখছি হয় স্ত্রীলোক, নাহয় ঘাটে মাঠে খাটা মানুষ। একটু ভদ্রগোছের লোক পেলে সুবিধে হয়। চলতে চলতে ইতিমধ্যেই বারকয়েক চমকে উঠেছি রাস্তার দু—পাশের ঝোপে হঠাৎ সড়সড় শব্দে। তারপর তাকিয়ে দেখেছি, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গোসাপ হিসহিস করে চলে যাচ্ছে।

একটি লোকের দেখা পেলাম ছাতা মাথায় ময়লা ধুতি—পাঞ্জাবি পরা। চশমা চোখে প্রৌঢ়। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রাণনিধি বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন?

ভদ্রলোক অনুসন্ধিৎসু চোখে আমার দিকে তাকালেন। দেখবার কিছু ছিল না। আমারও ধুতি— পাঞ্জাবিই সম্বল, বাড়তির মধ্যে চোখে সানগ্লাস আর ঘাড়ে কাপড়ের ব্যাগ ঝোলানো।

ভদ্রলোক বললেন প্রাণনিধি মানে— পানুর কথা জিজ্ঞেস করছেন?

মাথাটা একটু ইয়ে তো? —মানে বায়ুগ্রস্ত— বে—থা করেনি, তার ওপর বেশি লেখাপড়া শিখলে যা হয়। ছেলে অবিশ্যি ভালো—

আমি তাড়াতাড়ি বললাম ছেলে না উনি একজন—

ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ভদ্দরলোক এই তো। তা অন্যর কাছে যাই হোক, পানু আমাদের কাছে ছেলেমানুষই। কিন্তু আপনি একটু ভুল রাস্তায় এসেছেন। একি আর ছোটোখাটো গ্রাম? চলুন, আপনাকে আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে ওদিকেই যেতে হবে।

ভদ্রলোকের কথা যথার্থই মনে হল। গাঁয়ের ছেলেদের বয়স, বড়োদের কাছে কোনোদিনই বাড়ে না। পথে চলতে চলতে ভদ্রলোক আমার বিষয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করলেন, যতটা সম্ভব তাঁর কৌতূহল নিবারণ করলাম। তিনি নিজের তাঁর নাম বললেন, বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। প্রাণনিধিবাবুর বিষয়ে বললেন পানু ছেলেটি পণ্ডিত। এমএ পাশ করেছে, কিন্তু মাথাটা তেমন ঠিক নেই। বিয়ে—থা করেনি, বিরাট ভূতুড়ে বাড়িতে একা পড়ে আছে। তবে হ্যাঁ, গুণী ছেলে। ওর যা সঞ্চয়, তা একটা জাদুঘরের মতো। কত পুরোনো জিনিস যে জোগাড় করেছে তার ঠিক নেই। তবে ও সেসব কারোকে দেখাতে চায় না, একটা ঘরের মধ্যে সব বন্ধ করা আছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, একদিন হয়তো দেখা যাবে ডাকাতরা ওকে মেরে রেখে সব নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কিছুই বলা যায় না। যা দিনকাল পড়েছে। বুঝলেন তো।

বুঝেছি। এবং বৃন্দাবনবাবু খুব একটা অন্যায়ও বলেননি বোধহয়। প্রাচীন নামি—দামি সংগৃহীত বস্তু যদি এরকম গ্রামের কোনো ঘরে থাকে, তবে বিপদ—আপদ ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাণনিধিবাবু প্রাণ ধরে কিছুতেই সেসব সরকার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য, ওসব জায়গায় নাকি আরও বড়ো শিক্ষিত ডাকাতদের ভিড়।

যাই হোক, বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে আমি সুদীর্ঘ প্রাচীরবেষ্টিত একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। মনে হয় ১০/১২ বিঘা জমি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা যার অনেক জায়গায় নোনা ধরে অশ্বত্থের চারা গজিয়ে ক্ষয় হতে

বসেছে। যার ভিতরে নানান গাছপালা ঘেরা। দরজা জানালা বন্ধ, দোতলা নিঝুম বাড়ি চোখে পড়ছে। আমাদের সামনেই অর্ধবৃত্তাকার খিলানের নীচে মোটা মোটা গজাল পোঁতা। সেকালের ভারী পাল্লার বড়ো দরজা। ভিতর থেকে বন্ধ। বৃন্দাবনবাবু সন্দেহ প্রকাশ করলেন, পানু কি বাড়িতে আছে? কড়া নেড়ে দেখা যাকে, পাগলের ডিম কোথায় হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, প্রাণনিধিবাবু কি একেবারেই একা থাকেন? তাঁর রান্নাবান্না, ঘরদোরের কাজকর্ম কে করে?

বৃন্দাবনবাবু বললেন, সেসব কাজের জন্য একটি লোক আছে। মাঝবয়সি বুড়ো, এই গাঁয়ের লোক, নাম কড়ি বৈরাগী। সেই পানুর সব কাজ করে, খায় থাকে। তিনি আবার দোরের কড়া নাড়া দিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন, পানু আছ না কি হে, অ পানু।

তাঁর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে ভারী হুড়কো খোলার শব্দ হল। দরজা খোলার পরে দেখতে পেলাম ছোটোখাটো ধুতি পরা, গায়ে শুকনো গামছা জড়ানো, বয়স্ক লোক। মাথায় বড়ো বড়ো বাবরি কাঁচা পাকা চুল। গোঁফ—দাড়ি কামানো, কণ্ঠি, কপালে ও নাকে তিলক কাটা।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, এই যে কড়ি, পানু আছে? উনি কলকাতা থেকে এসেছেন পানুর সঙ্গে দেখা করতে।

কড়ি বৈরাগী ঘাড় কাত করে অতি কোমলভাবে বলল, আছেন। আপনি আসুন।

বৃন্দাবনবাবু বিদায় নিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বাড়ির দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ঢুকে ডানদিকে দেখলাম ঠাকুর দালান। পাশেই অতি প্রাচীন একটি চারচালা মন্দির। সংলগ্ন আরও দুটি ছোটো ছোটো মন্দির —সবই ধ্বংসোন্মুখ। আশেপাশে আম জাম নারকেল গাছ।

কড়ি বৈরাগী দরজা বন্ধ করে আমায় ডাকল— আসুন বাবু।

কড়ি বৈরাগীর কথার উচ্চারণ পরিচ্ছন্ন, স্বর কোমল। তাকে ভক্ত মানুষ বলে মনে হয়। সে আমাকে ঠাকুর দালানের উত্তরদিকে একটি একতলা বাড়ির দিকে নিয়ে গেল। মূল দোতলা বাড়ি থেকে সেটি বিচ্ছিন্ন। একতলা বাড়িটির সামনের বারান্দা ছাদঢাকা। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই একটি খোলা দরজা দিয়ে প্রাণনিধিবাবু বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে খুব একটা বিস্মিত হলেন না। একটু হেসে বললেন, ওহ আপনি! কোনো চিঠিপত্র দিয়েছিলেন নাকি?

সংকুচিত হয়ে বললাম, না, চিঠি না দিয়েই চলে এলাম। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় ভালোই, তা না হলে আজ অন্যদিকে ঘুরে চলে যেতাম।

প্রাণনিধিবাবু আমায় ঘরে নিয়ে গেলেন, পুরোনো বিরাট ঘর। স্থানে স্থানে পলেস্তারা খসে পড়ছে। পুবদিকের জানালা ঘেঁষে একপাশে একটি বড়ো টেবিল, খানকয়েক পুরোনো চেয়ার। টেবিলের ওপর লেখার কাগজ কলম ও কিছু বইপত্র দেখে মনে হল, প্রাণনিধিবাবু বোধহয় লেখাপড়া করছিলেন।

সংকুচিত হয়ে বললাম, আপনি নিশ্চয়ই কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমি এসে ব্যাঘাত ঘটালাম।

প্রাণনিধিবাবু বললেন, এমন কিছু না। আমার কাজ তো সারা দিন মাস বছরই লেগে আছে। ক—দিন ধরে ভাবছি, একটু গৌড় আর পাণ্ডুয়া যাব। সময় পেলে আপনাদের কুমড়াকাটা গ্রামেও একবার ঘুরে আসতে পারি।

কামরূপ জেলার কুমড়াকাটা গ্রামের নাম আমার জানা। নরকাসুর আর কামাখ্যা দেবীর একটি বিশেষ কিংবদন্তি সেই গ্রামকে নিয়ে প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রাণনিধিবাবু সেখানে যাবেন কেন? জিজ্ঞাসাটা মনে মনেই রাখলাম।

তিনি আবার বললেন, তবে, এখনই কোনো ব্যস্ততা নেই। কড়ি বৈরাগীর দিকে ফিরে আমার আহারাদির বন্দোবস্ত করতে বললেন। আমি ভদ্রতা করে বললাম, থাকনা আমি চারদিক একটু দেখেশুনে—

প্রাণনিধিবাবু বললেন, এসেছেন যখন ২/১ দিন থেকে আশেপাশে ঘুরে যান। অসুবিধে তো কিছু নেই। খাওয়াদাওয়ার একটু কষ্ট হবে। আমার এখানে নিয়মিত ডাল ভাত ছাড়া আর কিছু পাবেন না।

আমি বললাম, যথেষ্ট।

প্রাণনিধিবাবু আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। কাঠের পাল্লার নিশ্ছিদ্র আলমারি খুলে অতি সাবধানে রক্ষিত কয়েকটি পুঁথি পুস্তকের সংগ্রহ দেখালেন। আপনি ইচ্ছা করলে আপনার মনমতো বিষয়ের বই পড়তে পারেন।

—ধন্যবাদ।

—অ্যাঁ! প্রাণনিধিবাবু বিস্ময়ে যেন চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন। তারপরে বললেন, ওহ হ্যাঁ, বুঝেছি।

তাঁর কথার ভঙ্গিতে আমারই চমকে ওঠার অবস্থা। তারপরে তিনি আমাকে নিয়ে একতলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তরদিকে গেলেন। সেদিকে বিশাল বাগান ও পুকুর। মূল বাড়ির এটা পিছন দিক। পিছন দিক দিয়েই তিনি আমাকে নিয়ে ছোটো একটি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, একটু অন্ধকার, দেখে আসবেন। প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো বাড়ি। এখনও যে টিকে আছে তাই যথেষ্ট।

অতি যথার্থই কথা। অন্ধকার কেবল নয়, বেশ ঠান্ডা ভেজা—ভেজা নোনা ইটের গন্ধ ছড়ানো। তিনি বিভিন্ন সরু দালানের ভিতর দিয়ে চলেছেন। আর ছায়াতে দেখতে পাচ্ছি, অনেক ঘর এবং সব ঘরেরই দরজা বন্ধ। একটি বড়ো দালানের প্রান্তে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে ডাকলেন—কড়ি, কড়ি!

মনে হল, দেওয়ালের ওপাশ থেকে কড়ির গলা শোনা গেল— যাই বাবা।

দেখলাম, ডানদিকের একটি দরজা খুলে কড়ি বৈরাগী ঢুকল।

প্রাণনিধিবাবু বললেন, দোতলার সব ঘর খোলা আছে তো? তালাচাবি দেওয়া নেই তো?

—না, শুধু শেকল তোলা আছে।

—আসুন।

আমি প্রাণনিধিবাবুকে অনুসরণ করলাম। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, কিন্তু তার মধ্যেই গোটা কয়েক পাক দিতে হল। দোতলায় উঠে চৈত্রদিনের আলো দেখতে পেলাম। তিনি বড়ো চওড়া দালানের দরজা খুলে দিতেই দখিনা বাতাস বয়ে গেল। সেই বাতাসে পেলাম একটি মৃদুমধুর সুবাস। কনকচাঁপার গন্ধ।

প্রাণনিধিবাবু বড়ো দালানের মাঝামাঝি একটি দরজা খুলে স্বল্প পরিসর আর একটি দীর্ঘ দালানে ঢুকলেন। দু—পাশে ঘর—দরজা বন্ধ। তিনি এই স্বল্প পরিসর দালানের শেষ প্রান্তে গিয়ে আর একটি দরজা খুললেন। সামনেই বারান্দা, উত্তরদিকের বাগান আর পুকুর দেখা যাচ্ছে।

আবার আমার ঘ্রাণে একটি মিষ্টি গন্ধ পেলাম। এটিও চেনা গন্ধ বাতাসি ফুলের গন্ধ। এখন মৃদু, কিন্তু সন্ধেবেলায় এ গন্ধ নিশ্চয়ই অনেক তীব্র হবে। প্রাণনিধিবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন— অর্থহীন।

বারান্দা থেকে আবার ঢুকে পুবের একটি দরজার শিকল খুললেন। অন্ধকার ঘর। তিনি ভিতরে ঢুকে দুটি জানালা ও একটি দরজা খুলে দিতেই ঘরে আলো ঢুকল। সেই আলোয় দেখলাম, ঘরের একপাশে প্রাচীন উঁচু খাট। তার ওপরে বিছানাপাতা এবং তা মোটামুটি পরিষ্কার।

প্রাণনিধিবাবু বললেন, কয়েকটা ঘর নিয়মিত পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। আপনি এ ঘরে শোবেন। উত্তরদিকের বারান্দা দিয়ে পায়খানায় যাওয়া যাবে। আমি থাকি বড়ো দালানের পুবদিকের ঘরে। এ ঘরে আপনার অসুবিধে হবে না তো?

আমি ব্যস্তভাবে বললাম, না না, অসুবিধে হবে কেন? কিন্তু আপনি তখন অর্থহীন শব্দটা বললেন কেন?

বাড়ি করার মানে হয় মশাই! ইট কাঠের স্তূপ।

আমি হেসে বললাম, আপনার পূর্বপুরুষেরা হয়তো বংশধরদের সুখে থাকবার জন্যেই এইসব করেছিলেন। তখন জানতেন না বাড়ি এরকম খালি পড়ে থাকবে।

প্রাণনিধিবাবু বললেন, বংশধরেরা সবাই থাকলে অবশ্য বাড়ি এরকম খালি পড়ে থাকার কথা নয়। কিন্তু অনেকেই গত চার পুরুষ ধরে উত্তরপ্রদেশের নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু তিনি নিজে কেন এখনও এই গ্রামের বাড়ি আগলে বসে আছেন তা বললেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি উত্তরদিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, আপনি যখন বারান্দায় যাবেন তখন ঘরের ভিতর দিয়েই যাবেন। ইচ্ছে হলে এই দালানের দরজাও খুলতে পারেন।

আমাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে প্রাণনিধি আবার নীচে নেমে এলেন। তাঁর সংগ্রহশালা আমাকে দেখালেন না, আমিও কিছু বললাম না।

প্রাণনিধিবাবু আমায় বাইরে একতলা বাড়িতে রেখে স্নান করে কাপড় বদলে এলেন। তারপর খেতে বসলাম। একান্তই নিরামিষ। কড়ি বৈরাগীর হাতের রান্নাটি ভালো। অতঃপর বিশ্রাম। দোতলায় যাবার আগে আলমারি থেকে আমি একটি তুলোট—বাঁধানো হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি পড়বার জন্য নিলাম।

নাম 'আত্মা পরলোক সম্বন্ধ'।

চৈত্রের নিদাঘের একটি বিশেষ মাদকতা আছে। পুবের জানালা দিয়ে হাওয়া আসছিল। ঘরের খাটের বিছানায় তুলোট কাগজের হাতে লেখা পুঁথি পড়তে পড়তে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটি শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল, ঘরের মধ্যে কেউ পাঁয়জোর পায়ে ঝুমুর ঝুমুর শব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকিয়ে দেখলাম, দিনের আলো ঘরে, কিন্তু শব্দটা যেন তখনও মেঝের ওপর দিয়ে ঝমঝম শব্দে হেঁটে, খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি বালিশ থেকে মাথা তুলে তাকালাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। শব্দও থেমে গেল।

উঠে বসে ভাবলাম, হয়তো কোনো স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু কিছু মনে করতে পারলাম না, দেখলাম বালিশের কাছে পুঁথিটি তেমনি রয়েছে। তারপর মনে হল, আদৌ কিছু শুনেছি কি? নিশ্চয়ই না। বাঁ হাতের মণিবন্ধে ঘড়িটা পরাই ছিল। সময় দেখলাম, তিনটে বেজেছে।

তখনএ একটু তন্দ্রাভাব রয়েছে। আবার বালিশে মাথা দিলাম। একটু পরে মনে হল, সেই ঝুম ঝুম শব্দ কানে আসছে। কিন্তু অনেক দূর থেকে। যেন সামনের চওড়া দালানে, পাঁয়জোর বা বাজুবন্ধ পরে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। শব্দ বেশ হালকা। যেন শিশুর পায়ের মতো।

কিন্তু এ বাড়িতে শিশু বা নারীর কোনো অস্তিত্ব আছে বলে শুনিনি। তবে এই শব্দ কার! কীসের? আমি এখন পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত। শুনতে ভুল হবার কোনো কারণ নেই।

মুহূর্তেই আমার সকল ইন্দ্রিয়কে সচকিত করে দিয়ে দক্ষিণের বড়ো ঘর থেকে ঝুমঝুম শব্দ স্বল্প পরিসর দালান দিয়ে এ ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলাম। কে আসছে বা কে আসতে পারে এইরকম ঝুমঝুম শব্দ করে?

আমি স্পষ্ট টের পেলাম ঝুমঝুম শব্দ যেন আমার ঘরের দরজার সামনে এসে চুপচাপ দাঁড়াল। আমি আস্তে আস্তে মাথা তুলে দরজার দিকে তাকালাম। আশ্চর্য! কেউ নেই। খোলা দরজা, দক্ষিণ দিক থেকে দালানে দীর্ঘ সরু আলো এসে পড়েছে।

শুয়ে তাকতে পারলাম না। উঠে বসলাম। একটু অপেক্ষা করে খাট থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে দক্ষিণ দিকে উঁকি দিলাম। কেউ নেই। মুখোমুখি বন্ধ ঘরগুলোর মাঝখানের সরু দালানে দক্ষিণের বাতাস ঢুকে, নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে না পেয়ে যেন একরকমের হাহাশ্বাস তুলেছে।

আমি সরু দালান পেরিয়ে দক্ষিণের বড়ো দালানে গেলাম। আমার বাঁদিকেই একটি ঘরের দরজা খোলা এবং অংশত দৃষ্ট খাটে, প্রাণনিধিবাবুর শায়িত শরীরের অংশবিশেষ চোখে পড়ল। কাছে গিয়ে দরজার সামনে থেকে দেখলাম, তিনি গভীর দিবানিদ্রায় মগ্ন।

দরজার কাছ থেকে ফিরতে উদ্যত হতেই সরু দালানে ঝুমঝুম হালকা শব্দ শুনতে পেলাম। অথচ আমি বড়ো দালানের দক্ষিণ খোলা জানালার আলোতে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে, সরু দালানের ভিতর দিয়ে সেই

শব্দ যেন এদিকেই আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। দৃষ্টি সরু দালানের দরজার দিকে নিবদ্ধ। শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। আমার বুকের তাল দ্রুত হয়ে উঠল। কিছু একটা দেখবার প্রত্যাশায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় আমার দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত হল।

কিন্তু সরু দালানের দরজার কাছে এসেই আড়ালে সে শব্দ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি দ্রুত পায়ে দরজার কাছে গেলাম। কেউ নেই, দালান শূন্য। অভাবিত ব্যাপার। আমি ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে তাকালাম। কোথাও কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। যেন জেগে স্বপ্ন দেখার মতো। মুখ ফিরিয়ে প্রাণনিধিবাবুর ঘরের দিকে গেলাম। একই দৃশ্য।

সেই মুহূর্তেই সিঁড়ির মুখে ঝুমঝুম শব্দ জেগে উঠল এবং শব্দ যেন সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল, আমি এগিয়ে গেলাম। শব্দ অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। ঝুমঝুম শব্দ সিঁড়ির নীচে অবধি গিয়েই স্তব্ধ হল আর আমি শুনলাম টং টং করে একতারা বাজছে সিঁড়ির পাশের দেওয়ালের আড়ালে। সেদিকে একটা দরজা আছে, সেটা ভেজানো। আমি একরাশ ঝংকারের সঙ্গে গম্ভীর কিন্তু কোমল স্বরের গান শুনতে পেলাম —

> ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে
> রাধারানী যায় অভিসারে
> কী বা অপরূপ সাজে।

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা আস্তে ঠেলে খুললাম। দেখলাম, কড়ি বৈরাগী চোখ বুজে একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। ঘরটিতে পেতল—কাঁসার রান্নার বাসন সাজানো, কড়ি আমার উপস্থিতি টের পেল না। আমি তাকে না ডেকে দরজা আস্তে টেনে দিয়ে ফিরে দাঁড়ালাম।

নীচের সব কিছুই বন্ধ ও অন্ধকার। দরজা জানালার ফুটোফাটা দিয়ে যা সামান্য আলো আসছে। নীচের বড়ো দালানের মাঝখানে, দোতলার মতোই ছোটো দরজা রয়েছে এদিক থেকে শিকল টেনে আটকানো। বাড়ির পিছন দিয়ে ওই দরজা দিয়ে প্রাণনিধিবাবুর সঙ্গে এদিকে এসেছিলাম।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না। আবার ওপরে উঠলাম। দীর্ঘ সরু দালানের দরজা দিয়ে ঢুকে নিজের ঘরে গেলাম এবং ঘরের উত্তরদিকের দরজা খুলে দিয়ে আবার পুঁথি নিয়ে বসলাম।

খানিকক্ষণ বাদেই প্রাণনিধিবাবু এলেন। সদ্য ঘুম—ভাঙা চোখের ফোলা মুখ। জিজ্ঞাসা করলেন, একটু কি দিবানিদ্রা দিলেন, নাকি সেই থেকে পড়ছেন?

—না, একটু ঘুমিয়েছিলাম।

—আমি আবার একটু না ঘুমিয়ে পারি না। চা চলবে তো?

—চলবে।

—তাহলে চলুন মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে নীচে যাই। চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ব, একেবারে ঘুরে—টুরে ফিরব।

বললাম, তাই চলুন।

সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই আমরা ফিরে এলাম। গ্রামের কোন পাড়ায় তিনি স্বর্ণমুদ্রাটি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তা দেখালেন। প্রাচীন গ্রাম আর গঙ্গার ধারেই আমাদের বেড়ানো সীমাবদ্ধ রইল।

বাড়ির মধ্যে হ্যারিকেনের আলো। একতলায় বাইরের বাড়িতে প্রাণনিধিবাবু তাঁর নানাবিধ বস্তুর সংগ্রহের কাহিনি শোনালেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে ন—টার সময়ে কড়ি বৈরাগী আমাদের খেতে ডাকল। দেখা গেল রাত্রে লুচির ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে একটু দুধ।

পরদিন সকালে গুপ্তিপাড়া, বোগুলা ইত্যাদি গ্রাম ঘুরতে যাবার প্রোগ্রাম করে শুতে গেলাম।

ঘরে ঢুকে দেখলাম খাটে মশারি টাঙানো, চারিদিক গোঁজা। হ্যারিকেন জ্বলছে। একপাশে জলের কুঁজো ও কাঁসার গ্লাস।

হ্যারিকেন কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ ঘুম এল না। বাইরের গাছপালায় চৈত্র বাতাসের হু হু শব্দ, কনকচাঁপা আর লেবু ফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে। ঘুমটা ঠিক এসেছিল কি না বুঝে ওঠবার আগেই আবার সেই ঝুমঝুম শব্দ ঘরের মেঝেয় শোনা গেল। মনে হল, হেঁটে সেই শব্দ আমার খাটের সামনে এসে থামল।

আমি বালিশ থেকে মুখ তুলে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোটোখাটো একটা ছায়ামূর্তি মশারির বাইরে আমার দিকেই যেন তাকিয়ে রয়েছে। আমি উঠে বসতে বসতেই, কমানো হ্যারিকেনের আলোয় সেই মূর্তি যেন অনেকটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করল। দেখলাম একটি ৭/৮ বছরের ফরসা মেয়ে, লাল পাড় শাড়ি পরা। কপালে এবং সিঁথেয় সিঁদুর। গায়ে কোনো জামা নেই, কিন্তু সর্বাঙ্গে সোনার গহনা। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, ডাগর কালো চোখের স্থির দৃষ্টি আমার দিকে।

কয়েক মুহূর্ত সেই চোখের দিকে চেয়ে থেকে আমি কেমন যেন আচ্ছন্নতা বোধ করলাম। দেখলাম, সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো মশারির বাইরে খাট থেকে নেমে দাঁড়াতেই বালিকা বধূ দরজার কাছ থেকে হাতছানি দিয়ে ডেকে আমাকে খিল খোলবার ইঙ্গিত করল। আমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম। সে আমাকে বড়ো দালানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। বালিকা আমার আগে ঝুমঝুম শব্দে এগিয়ে চলেছে, আমি তাকে অনুসরণ করে চলেছি।

বড়ো দালানে পৌঁছে সে সিঁড়ির মুখে গিয়ে আমাকে নীচের দিকে যাবার সংকেত করল। অন্ধকারে বালিকার মূর্তি কেমন করে এত স্পষ্ট ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, সে প্রশ্ন আমার মনে একবারও জাগল না। নীচে নেমে, বড়ো দালানের মাঝামাঝি সরু দালানের দরজার কাছে গিয়ে বালিকা দাঁড়াল। আমাকে আবার সরু দালানের দিকে যেতে ইশারা করল। নিজের সম্পর্কে কোনো চেতনাই আমার তখন নেই শুধু বালিকাকে অনুসরণ করা ছাড়া। একটা ঠান্ডা বাতাসের ভেজা স্পর্শ অনুভব করলাম। সরু দালানের খানিকটা গিয়ে বালিকা আমাকে ইশারায় বাঁদিকের একটি ঘরের মধ্যে ডাকল।

সেই ঘরে ঢুকে দেখি, হ্যারিকেন জ্বলছে এবং ছ—টি নারী মূর্তি সকলেই কোনো কাজে ব্যস্ত। আমি ঢুকতেই সকলে আমার দিকে তাকাল। দেখি, দশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স এবং সকলেই বিবাহিতা। কপালে ফোঁটা, সিঁথেয় সিঁদুর, কারোর শুধু লাল পাড়, কারোর লালের ওপর কল্কা দেওয়া জলকাচা শাড়ি পরা। কারোরই গায়ে জামা নেই, হাতে গলায় কানে নাকে পায়ে সোনার অলংকার। সকলেই ফরসা আর সুন্দরী। আমার এই বালিকাটিকে নিয়ে সর্বসাকুল্যে সাত জন।

সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে যেন অর্থবহ হাসি হাসল। ওদের মধ্যে কেউ শিলে কিছু বাটছে, কেউ হামানদিস্তায় কিছু গুঁড়ো করছে, কেউ জলের পাত্রে পাথরের গেলাস নিয়ে জল ঢালা তোলা করছে।

তাদের মধ্যে ১৬/১৭ বছরের একটি তরুণী হঠাৎ যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল এবং তার বুকের আঁচল খসে পড়ল। কান্নার কোনো আওয়াজ শোনা গেল না। সে তার স্বাস্থ্যোদ্ধত তরুণী বুকে হাত দিয়ে সজোরে চাপড়াতে লাগল।

একটু বয়োজ্যেষ্ঠ আর একজন তাকে বুকে টেনে নিয়ে নানাভাবে যেন সান্ত্বনা দিতে লাগল। সেই ৭/৮ বছরের বালিকাও ওদের মাঝে পড়ে কাঁদতে লাগল। কোনো শব্দ নেই কান্নায়। কোনো রুদ্ধ কান্নার দমকা নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে সকলেই কান্না থামাল। আবার তারা যে যার কাজে ব্যস্ত হল। তারা নিজেদের শিথিল এবং স্খলিত শাড়ি ও উদাম উন্মুক্ত অঙ্গের জন্য কেউ লজ্জিত নয়। এবং নিজেদের মধ্যে নিঃশব্দে কথা বলাবলি করছে, হাসাহাসি করছে। তাদের সুবর্ণমণ্ডিত যৌবনোচ্ছল শরীরগুলো যেন বিবসনা সুন্দরীদের মতো আমার সামনে জীবন্ত প্রতিমাবৎ আচরণ করছে।

তাদের কথাবার্তা আচার—আচরণ আমার খুব স্বাভাবিক লাগছে না। আমি বুঝতে পারছি, আচ্ছন্নতার মধ্যেও একটি মুগ্ধতা আমার প্রাণের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। নানান বয়সের এই বিবাহিতা নারীরা কী করছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তারা আমার খুব কাছেই, তবু যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। একটা তীব্র গন্ধ আমার ঘ্রাণকে অতিমাত্রায় উত্তেজিত করে তুলতে লাগল।

তারপর আবার তারা পরস্পরকে জড়িয়ে কান্নাকাটি শুরু করল। তাদের দীর্ঘ কেশরাশি আলুলায়িত, শাড়ির কোনো স্থিরতা রইল না। প্রস্তুত তরল পদার্থ তারা পাথরের পাত্রে ভরে সকলে পান করল। ক্রমে তাদের মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে লাগল। তারা সকলে যেন যন্ত্রণায় ছটফট করে কুঁকড়ে, বুক চাপড়াতে লাগল। সকলের আগে ৬/৭ বছরের সেই বালিকা প্রায় নগ্নাবস্থায় সম্পূর্ণ স্থির হয়ে গেল এবং তার স্বর্ণকান্তি নীলবর্ণ ধারণ করল।

একে একে সকলের দশাই এক হল।

আমার চোখের সামনে সাতটি বিভিন্ন বয়সের বালিকা, কিশোরী, যুবতী চোখ বুজে মৃতবৎ পড়ে রইল। এবং সকলের বর্ণই নীল হয়ে উঠল।

সহসা একতারার ঝংকার শুনে চমকে উঠলাম এবং মুহূর্তেই আমার চোখের সামনে দৃশ্য অপসারিত হল। দেখলাম আমি একটা অন্ধকার ঘরে ভূতগ্রস্তের মতো যেন সদ্য স্বপ্ন ভেঙে জেগে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কেবল একটা চামচিকে ফরফর করে আমার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে।

আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল, তৎক্ষণাৎ ঘরের বাইরে এলাম। সরু দালানে পা দিতেই দক্ষিণের বড়ো দালানে নজর পড়ল। ভাঙা দরমার ফাঁক দিয়ে সেখানে ভোরের আলোর ইশারা চোখে পড়ছে। একতারার শব্দও এদিক থেকেই আসছে। আমি দ্রুতপদে বড়ো দালানে গেলাম এবং দেখলাম, কড়ি বৈরাগী দালানের বড়ো দরজার সামনে বসে একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। তার চোখ বোজা, সে আমাকে দেখতে পেল না। তার গানের কথাগুলো শুনলাম।

আমার রাইবিনোদিনী
সঙ্গী সঙ্গে যাবে মথুরা
এ বৃন্দাবন গোকুল
রাইগোপিনী হারা

আমি প্রায় মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে তার গান শুনলাম। আবার বড়ো দালানের ভিতর দিয়ে বাঁদিকে তাকালাম। আলো নেই, কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। সাতটি স্বর্ণ প্রতিমাবৎ নারী তো দূরের কথা। অথচ সারারাত আমার একভাবে দাঁড়িয়ে কেটে গিয়েছে।

আমি আমার শোবার ঘরের চেহারা দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে গিয়ে বড়ো দালান পেরিয়ে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম, রাত্রের সেই ঘর। হ্যারিকেন তেমনি কমানো। আমি যেখান দিয়ে মশারি ফাঁক করে বেরিয়েছিলাম, সেখানে মশারি এখনও তেমনি আলগা করা। আমার চোখের সামনে সেই বালিকার মূর্তি ভেসে উঠল তারপর বাকি ক—জনের মূর্তিও। আমি অভাবিত বিস্ময় নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ পারলাম না। মনে হল চোখ দুটো জ্বালা করছে, বুজে আসছে। আমি মশারির মধ্যে গিয়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। প্রায় ধড়মড় করে উঠে বসলাম। রাত্রের সমস্ত কথাই মনে পড়ল। যদিও কোনো কূলকিনারাই পাচ্ছি না এবং এখন সমস্ত ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক আর অবাস্তব মনে হচ্ছে। আমি উত্তরের দরজা খুলে বাথরুমে গিয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ঘরে গিয়ে দেখলাম মশারি তোলা হয়ে গেছে। প্রাণনিধিবাবু বসে আছেন খাটের ওপর। জিজ্ঞেস করলেন, রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল?

আমি নির্দ্বিধায় বললাম, প্রথম রাত্রে তেমন হয়নি, নতুন জায়গা তো। তাই বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল।

প্রাণনিধিবাবু এ বিষয়ে আর কিছু না বলে অন্য কথা বললেন, তাহলে চলুন একটু কিছু খেয়ে ঘুরে আসা যাক।

—চলুন।

আমরা দুপুর পর্যন্ত ঘুরে এসে স্নান খাওয়াদাওয়া সারলাম। স্বভাবতই রাত্রে ঘুম হয়নি বলে দিনের বেলা ঘুম পেল। এবং আবার সেই ঝুমঝুম শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। শব্দ ছাড়া দিনের বেলা কিছু দেখতে পেলাম না। কেবল নীচের দালানে গিয়ে সেই শব্দ হারিয়ে গেল এবং কড়ি বৈরাগীর একতারা বাজিয়ে গান শোনা গেল।

এ বিষয়ে প্রাণনিধিবাবুকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও পারলাম না। আরও একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করল, তা হল প্রাণনিধিবাবু তাঁর সংগ্রহশালা একবারও আমাকে দেখাবার কথা বললেন না।

রাত্রে ঘুমোতে যাবার পরে আবার সেই বালিকার আবির্ভাব ঘটল। এবং গত রাত্রের মতোই হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আজ যেন আমার নিশিঘোরের কৌতূহলই বেশি। আজও আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাত সোনার প্রতিমার সেই একই আচার—আচরণ এবং নিদ্রাভিভূত অবস্থায় নীল হয়ে যেতে দেখলাম। কিন্তু তার আগেই আমি ব্যাকুলভাবে বলে উঠলাম, তোমরা কারা? তোমরা কী করছ?

জবাবে আমি কড়ি বৈরাগীর একতারার ঝংকার শুনলাম এবং অন্ধকার দেখলাম। বাইরে সেই ভোরের আলো।

ঘুম ভাঙল তেমনি বেলাতেই। আজ আমার কলকাতায় ফেরার দিন। অথচ সাতটি স্বর্ণ প্রতিমার আকর্ষণ যেন কিছুতেই কাটাতে পারছি না। মনে হচ্ছে, সারাজীবন দুপুর ও রাত্রিগুলোর অন্ধকারে, আমি সাত স্বর্ণপ্রতিমার সান্নিধ্য খুঁজে ফিরি।

কিন্তু সেকথা প্রাণনিধিবাবুকে বলতে পারলাম না, তবে আজ বলেই ফেললাম, আপনার সংগ্রহশালাটি দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল।

প্রাণনিধিবাবু বললেন, চলুন।

তিনি একগোছা চাবি নিয়ে দোতলার সরু দালানের মধ্যে সেই তালাবন্ধ ঘরের তালা খুললেন। দরজা খুলে জানালা উন্মুক্ত করতেই দীর্ঘ টেবিলের ওপর নানারকমের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দেখতে পেলাম। নানারকম দামি ও মহার্ঘ পাথরও রয়েছে। সব কিছুরই পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাশে পাশে কাগজের বোর্ডে লেখা আছে। আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। শুধু নেশা নয়, অতি নিষ্ঠা না থাকলে এরকম সংগ্রহ কেউ করতে পারে না।

একপাশে একটি বড়ো কাঠের বাক্সের ঢাকনা খুলে চমকে উঠলাম। দেখলাম কতকগুলো লাল এবং লালের ওপর কল্কা দেওয়া শাড়ি, তার ওপরে স্তূপীকৃত সোনার গহনা। আমার খুবই চেনা শাড়ি ও গহনা—যা আমি সেই সাত সোনার প্রতিমার গায়ে দেখেছিলাম।

আমি প্রাণনিধির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কীসের সংগ্রহ প্রাণনিধিবাবু?

তিনি বললেন, ওগুলো আমার পারিবারিক সংগ্রহ। এক ট্র্যাজেডির সাক্ষী।

আমি ব্যাকুল বিস্ময়ে ও কৌতূহলে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী ট্র্যাজেডি?

প্রাণনিধিবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, ট্র্যাজেডিটা ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। আমার প্রপিতামহের সাত বোনকে এক রাত্রে এক বৃদ্ধ কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাত বছর বয়স থেকে কুড়ি পঁচিশের মধ্যে তাঁদের সকলের বয়স ছিল।

প্রাণনিধিবাবু থামলেন। আমি রুদ্ধশ্বাস হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

তিনি বললেন, কুলীনদের ব্যাপার তো সবই জানেন। কিন্তু ঘটনাটা যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ঘটত কী হত জানি না, কিন্তু শেষের দিকে হাওয়া একটু অন্যরকম ছিল। প্রপিতামহের বোনেরা সে বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। সকলেই একরাত্রে বিষ খেয়ে একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছিলেন। এসব চিহ্ন তাঁদেরই।

আমি অপলক চোখে সেই বাক্সের শাড়ি আর গহনাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার কানে বাজতে লাগল ঝুমঝুম শব্দ ও চোখের সামনে ভাসল সাতটি জীবন্ত সুবর্ণ প্রতিমা।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি কাঠের বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করলাম। শতাব্দীর ওপারের সাতটি প্রাণের যন্ত্রণা আমাকে আহ্বান করছিল। জাতির এক অভিশপ্ত খেলার করুণ সেই চিহ্ন আমি দেখেছি।

দুপুরের খাওয়ার পর পরই সোজা কলকাতায় রওনা হয়ে গেলাম।

বাচ্চা ভূতের খপ্পরে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গল্পটা শুনেছিলুম বাজপেয়ীদার কাছে। পুরো নাম জগদানন্দ বাজপেয়ী। তবে পদবি থেকে যা মনে হয়, তা নন। কয়েক পুরুষ ধরেই এঁরা একেবারে আদ্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষ। বাজপেয়ীদা নিজে তো অগ্নিযুগের বিখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন, পরাধীনতার আমলে বহু বছর জেলে কাটান, সেই সময়ে ইংরেজদের হাতে শারীরিক নির্যাতনও কম ভোগ করেননি। তবে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে দেশ স্বাধীন হবার পরে। তখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন, আর আমি একজন উঠতি সাংবাদিক, ওই একই কাগজের রবিবাসরীয় বিভাগে কাজ করি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের রবিবাসরীয় বিভাগে তখন খুব আড্ডা জমত। বাজপেয়ীদাও সেই আড্ডায় এসে যোগ দিতেন। মুড়ি, তেলেভাজা আর চায়ের সঙ্গে চলত নানারকমের গল্পগুজব। বাজপেয়ীদাকে সেই আসরেই আমি প্রথম দেখি। মুর্শিদাবাদের মানুষ, যেমন টকটকে গায়ের রং, তেমন ছ—ফুট লম্বা চেহারা, বয়েস হয়েছে, কিন্তু পেটানো স্বাস্থ্য, শরীর এতটুকু টসকায়নি, তার উপরে আবার মুখে সবসময় এমন নির্মল একটুকরো হাসি খেলে বেড়াত যে, বয়সের ভার যেন তাঁকে ছুঁতেই পারত না।

মজলিশি মানুষ ছিলেন, আর গল্প বলতেন চমৎকার। বেশিরভাগই ভূতের গল্প। এমন সব ভূতের গল্প, যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। আমি তো ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু বাজপেয়ীদা এমনভাবে গল্পগুলো বলতেন যে, শুনে মনে হত, কী জানি বাবা, হবেও বা! তা এখানে যে গল্পটা তোমাদের শোনাব, সেটা তাঁরই কাছে শুনেছিলুম, তাই তাঁরই জবানিতে সেটা বলা যাক।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে, পেয়ালাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বাজপেয়ীদা বললেন :

'আপনারা যে ভূতপ্রেত মানেন না, সে আমি খুব ভালোই জানি। কিন্তু মুশকিল কী হয়েছে জানেন, আমার জীবনে অনেক সময় এমন সব ঘটনা ঘটেছে, যার কোনো ব্যাখ্যা আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। যেমন ধরুন, আমাকে যখন জেলের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের বাইরের বারান্দায় একজন লোক এসে দাঁড়ায়। আমার খুব চেনা লোক, মুরশিদাবাদের মানুষ, একসময়ে আমাদের দলের হয়ে কাজকর্মও নেহাত কম করেনি। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে বলে, 'তোর তো ছাড়া পাবার সময় হয়ে এল।' বলে সে আর দাঁড়ায় না, বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে যায়। খানিক বাদে তাকে আর দেখতে পাইনি।

''সত্যি বলি, লোকটিকে দেখে আমার মুখে কোনো কথাই সরছিল না। আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। সে তো আমাদের মতো পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। তাহলে এই সন্ধ্যারাতে সে এখানে এল কী করে? এখন তো ভিজিটার আসার সময় নয়, জেল—ফাটক তো বন্ধ হয়ে গেছে। তা হলে? কিন্তু আমার অবাক হওয়ার আরও কিছু বাকি ছিল। পরদিনই জানতে পারি যে, আমার রিলিজ—অর্ডার এসে গেছে। অর্থাৎ লোকটি আমাকে মিথ্যে কথা বলেনি।

'তবে কিনা আসল ধাক্কাটা খাই দেশের বাড়িতে ফিরে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই দেশের বাড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনি, মাত্র দু—দিন আগে জেলের বারান্দায় যাকে দেখেছি, শুধু দেখেছি নয়,

আমাকে বারান্দা থেকেই জানিয়েছিল যে, আমার ছাড়া পাবার সময় হয়ে এল, সে নাকি হপ্তাখানেক আগে মারা গেছে।

'এখন বলুন, এর কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনারা। আরে মশাই, এর কি কোনো ব্যাখ্যা হয়? ব্যাখ্যা হয় না। আসল কথা আত্মা আছে। তেমন ভূতও আছে। জেলখানায় যাকে দেখেছিলুম, সে কি রক্তমাংসের মানুষ? মোটেই না। সে হল আত্মা। তবে হ্যাঁ, যেমন ভালো আত্মা আছে, তেমন মন্দ আত্মাও আছে বইকী। আমি যার দেখা পেয়েছিলুম সে হল ভালো লোকের ভালো আত্মা। তাই জেলখানায় ঢুকে মানুষের রূপ ধারণ করে আমাকে একটা ভালো খবর দিয়ে গেল। কী, আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না?'

বাজপেয়ীদার কথা শুনে বুঝলুম যে, আমরা যদি বলি, না, বিশ্বাস হচ্ছে না, তাহলে এক্ষুনি তিনি থামিয়ে দেবেন তাঁর গল্প। তাই হামলে পড়ে বললুম, 'খুব বিশ্বাস হচ্ছে, খুব বিশ্বাস হচ্ছে। তবে কিনা ভালো আত্মার কথা তো শুনলুম, এবারে একটা খারাপ আত্মার গল্প শুনব। নাকি কখনো কোনো খারাপ আত্মার খপ্পরে আপনি পড়েননি?'

'তাও পড়েছি বই কী,' বাজপেয়ীদা বললেন, 'অনেকবার পড়েছি। একবার তো হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গার ধারেই অতি বিচ্ছিরি এক আত্মার পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলুম। সেবারে যে কী ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলুম, সে আর কহতব্য নয়। নেহাত ভাগ্যের জোর, তাই তার হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে অনেক কষ্টে বাড়ি ফিরতে পারি।'

'কী হয়েছিল?'

আর এক প্রস্থ চা এসে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। বাজপেয়ীদা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, 'বলছি।'

গল্পটা এবারেও তাঁরই জবানিতে শোনা যাক। চা শেষ করে, রুমালে মুখ মুছে, বাজপেয়ীদা বললেন :

'আমাদের দেশের বাড়ি থেকে মাইল তিন—চারেক দূরে একটা হাট বসে। মস্ত হাট, নানা রকমের বিস্তর জিনিস আসে সেখানে। আনাজপত্র, মাছ ইত্যাদি তো আসেই, শৌখিন মনোহারী জিনিসও নেহাত কম আসে না। তা ছাড়া আসে দা, কুড়ুল, খন্তা, কোদাল, মায় লাঙল পর্যন্ত। অর্থাৎ গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছুই সেখানে মেলে। আমার অবশ্য এতসব জিনিসের দরকার নেই, স্রেফ হপ্তাখানেক চলতে পারে এইরকম আনাজপাতি কিনব। আর হ্যাঁ, হাট যেখানে বসে, তার আধমাইলটাকের মধ্যেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি, তার সঙ্গে এই ফাঁকে একবার দেখাও করব, তারপর সন্ধে লাগার আগেই রওনা হব বাড়ির দিকে। অন্ধকারে ভয় নেই, শুক্লপক্ষের নবমী, আকাশে জ্যোৎস্না আলো থাকবে, গ্রামের রাস্তা হলেও খানাখন্দে ভরা নয়, ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে চেনা রাস্তা ধরে বাড়ি ফেরা মোটেই শক্ত হবে না।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন বাজপেয়ীদা। তারপর বললেন, 'রওনা হয়েছিলুম চারটে নাগাদ, স'পাঁচটার মধ্যে হাটে পৌঁছে যাই। পশ্চিমা যে ভৃত্যটি সঙ্গে ছিল, আনাজপাতি কিনে তার মাথার ধামায় তুলে দিলুম। সে বলল, যা দিয়ে সে বাগানের মাটি কোপায়, সেই কোদালের লোহার ফলায় মরচে ধরে গেছে, নতুন একটা ফলা কেনা দরকার। বন্ধুটির সঙ্গে দেখাও করে এলুম তার বাড়িতে গিয়ে। তার কাছে শ—তিনেক টাকা পাওনা ছিল, তাও মিটিয়ে দিল সে। তবে তার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে বেরিয়ে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছিল। তাই সন্ধে লাগার আগে আর ফেরার পথ ধরা গেল না, পথে নেমে দেখি, সন্ধে পেরিয়ে গেছে। ভাবলুম, তা হোক, আকাশে দিব্যি চাঁদ উঠেছে, তখন আর ভাবনা কীসের। সঙ্গে অবশ্য কিছু টাকা রয়েছে, কিন্তু পথে তো আর চোর—ডাকাতের ভয় নেই, আর থাকলেই বা কী, আমি তো আর স্রেফ আমাদের ভৃত্যটিকে নিয়ে পথটা পাড়ি দেব না, হাট—ফেরতা আরও বিস্তর লোকজনকে নিশ্চয় সঙ্গে পেয়ে যাব। গ্রীষ্মকাল, দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, হাটুরে লোকজনদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে নিশ্চিন্তে এই তিন—চার মাইল পথ চলে যাওয়া যাবে।

'কিন্তু খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়েই ঠাহর হল যে, পথ একেবারে নির্জন, আমাদের ওদিক থেকে যারা হাটে এসেছিল, কেনাকাটা শেষ করে তারা ফিরে গেছে। নেহাতই দু—চারজন লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে

আসছিল বটে, কিন্তু তারা কাছাকাছি থাকে, খানিকটা গিয়েই তারা ডাইনে—বাঁয়ে মাঠের মধ্যে নেমে যে যার গ্রামের পথ ধরল। ব্যস, আমরা একদম একা। সামনে আর পিছনে একটাও লোক নেই। সঙ্গী বলতে স্রেফ পশ্চিমা ভৃত্যটি, ওকে নিয়েই এখন বাদবাকি পথ আমাকে পাড়ি দিতে হবে।'

বাজপেয়ীদা আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'সত্যি কথাই বলি, এতক্ষণ যে ভয়টাকে একদম আমল দিইনি, এইবারে সেটা হঠাৎ ফিরে এল। আর কিছু না, ডাকাতের ভয়। সঙ্গে তিনশো টাকা রয়েছে, এ যখনকার কথা বলছি, তিনশো টাকার দাম তো তখন নেহাত কম ছিল না। হঠাৎ যদি এই ফাঁকা পথে একদল লোক হঠাৎ রে—রে করে সামনে এসে দাঁড়ায় তো কী করব। শুনেছি এদিকে ডাকাতি বড়ো একটা হয় না, কিন্তু হতে কতক্ষণ! হাতে একটা লাঠিও তো নেই। আশেপাশে নেহাতই কিছু কাঁটাঝোপ আর বাবলা গাছ ছাড়া বড়ো রকমের কোনো গাছ পর্যন্ত নেই যে, তার ডাল ভেঙে মজবুত একটা লাঠির কাজ চালানো যাবে। তা হলে?

'এইসব ভাবছি, এমন সময় একটা বাঁকের মুখে খুবই মিহি গলার একটা কান্নার শব্দ কানে এল। একবার মনে হল, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যখন বাতাস বয়ে যায়, তখন অমন একটা শব্দ হয় বটে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলুম যে, না, এটা বাতাসের শব্দ নয়। ভৃত্যটিকে বললুম, 'শুনছিস?' দাঁড়িয়ে গিয়ে, শব্দটা ভালো করে শুনে নিয়ে সে বলল, 'কোই বাচ্চা রোতা হ্যায়।' অর্থাৎ কোনো বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। বাঁকটা ঘুরে আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, ঠিক তা—ই। রাস্তার ধারে ধুলোর মধ্যে বসে একটা তিন—চার বছরের ছোট্ট ছেলে হাপুস নয়নে কাঁদছে। গায়ে জামা নেই, পরনে ইজের নেই, একেবারে উদোম বাচ্চা, শুধু গলায় একটা ধুকধুকি।

'এদিকে, মানে মুরশিদাবাদ জেলার এই এলাকায়, বিহার থেকে আসা দেহাতি মিস্ত্রি—মজুর, কুলি—কামিন কিছু কম থাকেন না, বাচ্চাটার গলায় ধুকধুকি দেখে মনে হল, তাদেরই কারও ছেলে হবে, কিন্তু ছেলেটাকে এইভাবে পথের মধ্যে ফেলে রেখে তারা গেল কোথায়? এ তো বড়ো বেখেয়ালি বাপ—মা, সম্ভবত হাটে এসেছিল, তারপর সওদাপত্র করে সামনে এগিয়ে গেছে, এগিকে বাচ্চা ছেলেটা যে পিছনে পড়ে রইল, সেই খেয়ালই নেই! গলা উঁচিয়ে দু—চারবার হাঁক ছাড়লুম, কিন্তু সামনে থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু বাচ্চাটাকে পথের মধ্যে এইভাবে ফেলে রেখে আমরাই বা এখন বাড়ি ফিরি কী করে? ফেলে রেখে গেলে তো মাঝরাত্তিরে শেয়াল কিংবা হেড়োলই একে টুকরো—টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলুম যে, সঙ্গে করে একে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব, রাত্তিরটা সেখানে থাকুক, তারপর কাল সকালবেলায় এর বাপ—মায়ের খোঁজে বেরোনো যাবে।

'কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেকে এতটা পথ হাঁটিয়েই বা নিয়ে যাই কী করে? পশ্চিমা ভৃত্যটিকে বললুম, ''এই, তুই তোর ধামাটা আমায় দে, তারপর এই বাচ্চাটাকে তোর কাঁধে তোল।'' '

'তো তাই হল। ধামাটা আমি আমার মাথায় তুলে নিলুম, আর বাচ্চাটাকে কাঁধে নিয়ে ভৃত্যটি আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে একবার পিছনে ফিরে তাকিয়েছিলুম। দেখলুম, ভৃত্যের ঘাড় থেকে তার গলার দু—দিকে পা ঝুলিয়ে বাচ্চাটা বেশ জুত করে বসেছে। এখন আর কাঁদছে না। মুখে যে হাসি ফুটেছে, চাঁদের আলোয় তাও চোখে পড়ল।

'কিন্তু খানিকটা পথ গিয়েই খটকা লাগল একটা। ভৃত্যটি বারবার পিছিয়ে পড়ছে কেন? ওর তো ঠিক আমার পিছন পিছনই আসার কথা। তা হলে? একবার জিজ্ঞেসও করলুম, হ্যাঁরে ব্যাপার কী? যেভাবে হাঁটছিস, তাতে তো বাড়ি পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যাবে। তাতে সে বলল, বাচ্চাটা নাকি দারুণ ভারী। শুনে হেসে বললুম, 'আমার ধামার মধ্যে পাঁচ সের আলু, দশ সেরি একটা কাঁঠাল, সের কয়েক বেগুন আর মস্ত একটা কুমড়ো রয়েছে। বাচ্চাটার ভার কি তার চেয়েও বেশি নাকি রে?'

'এরপরে আর খানিকক্ষণ কোনো কথা হল না। কিন্তু তার পরে যা হল, সে এক তাজ্জব ব্যাপার। পিছন থেকে কাঁপা—কাঁপা গলায় ডাক শুনলুম, 'বাবু!' ভৃত্যটির গলা, মনে হল সে খুব ভয় পেয়েছে। পিছন না

ফিরেই বললুম, 'কেন রে, আবার কী হল?'

'তাতে ওই কাঁপা—কাঁপা গলাতেই সে বলল, 'বাবু, ইসকা টেংরি তো বাড়হত চলি!'

'অর্থাৎ, এর পা ক্রমেই বেড়ে চলেছে!

'এরপরে আর পিছন না ফিরে উপায় কী! কিন্তু পিছন ফিরে যা দেখলুম, তাতে আর আমার বাকস্ফূর্তি হল না, একেবারে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়।'

বাজপেয়ীদা আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমরা এদিকে অস্থির হয়ে উঠেছি। বললুম, 'কী হল বাজপেয়ীদা, চুপ করে গেলেন কেন, পিছন ফিরে কী দেখলেন?'

'যা দেখলুম, তা আপনারা বিশ্বাস করবেন না ভাই।'

'বিশ্বাস করি বা না—করি, সে আমরা বুঝব। আপনি কী দেখলেন, সেইটে বলুন দেখি।'

'দেখলুম,' বাজপেয়ীদা বললেন, 'উঃ, সে কথা ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়!'

'যাচ্চলে, কী দেখলেন, সেইটে বলুন না।'

'দেখলুম যে, ছেলেটা তো আমাদের বাড়ির চাকরের গলার দু—পাশ দিয়ে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসেছিল, সেই ঠ্যাং দুটো লম্বা হয়ে গিয়ে একেবারে মাটিতে এসে ঠেকেছে।'

'তারপর?'

'তারপরই চাকরের ঘাড় থেকে মস্ত একটা লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পাশের মাঠের ভিতর দিয়ে ছুট লাগিয়ে কোথায় যে সে মিলিয়ে গেল, কিচ্ছু বুঝলুম না।'

'আর আপনারা?'

'সঙ্গে সঙ্গে মাথার ধামা মাটিতে নামিয়ে আমিও ছুট লাগালুম। চাকরটিও দৌড় লাগাল আমার পিছনে পিছনে। দৌড়তে দৌড়তে একবারও আর পিছন ফিরে তাকাইনি। একেবারে বাড়িতে পৌঁছে তবে থামি।'

গল্প শেষ করে বাজপেয়ীদা বললেন, 'আছে রে ভাই, ভালো—মন্দ সব রকমের আত্মাই আছে, তা আপনারা বিশ্বাস করুন আর না—ই করুন।'

সাতভূতুড়ে

মহাশ্বেতা দেবী

ফল্গু যে বড়ো হতে না হতে অমন গল্পবাজ হবে, তা আগে কেন বুঝিনি এখন তাই ভাবি। সবসময়ে ওর জীবনে তাজ্জব সব ঘটনা ঘটত আর আমাদের গল্প বলত। সে সব কি সত্যি, তাও আর জানা যাবে না। ওর ঠিকানাটা তো দিয়ে যায়নি, যে গিয়ে জিগ্যেস করব।

ওষুধ কোম্পানির কাজ নিয়ে যখন পাটনা গেল, তখন তো ওকে সমানে ঘুরতে হত। তখন নাকি অবধলাল বলে একটা লোককে নিয়ে সে ঘুরত। অবধলাল সঙ্গে থাকলে গাঁজা খাবে, পূর্ণিয়া বললে মতিহারির টিকিট করবে, নোট হাতে পেলে খুচরো ফেরত দেবে না, তবু ওকে সঙ্গে রাখা চাই।

কেন রাখা চাই?

আহা! বুঝলে না! কোন বাড়িটায় বিদেহীদের বাস, কোন রাস্তায় সন্ধের পর ডাইনি ঘোরে, এসব বিষয়ে ওর একটা ব্যাপার আছে।

তাতে তোর কি?

তুমি কি বুঝবে? কত জায়গা ঘুরতে হয়। কখন কোথায় গিয়ে ফেঁসে যাব, এই তো সেবার...

কি হয়েছিল?

কাজে নয়। কাজ সেরে বেড়াতেই গিয়েছিল ফল্গু। ডালটনগঞ্জের কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় পেয়ে গেল জঙ্গল বাংলা। চৌকিদার নাকি বলে দিল, জল—টল তুলে দিয়ে, খানা বানিয়ে দিয়ে ও চলে যাবে। রাতে ও থাকবেই না।

ঘর দুটো। দুটো ঘরই ফাঁকা। লোক নেই। দু—কামরাতেই নেয়ারের খাট। চেয়ার টেবিল আছে। অবধলাল ফল্গুকে কিছুতেই ভালো ঘরটায় থাকতে দিল না। ছোটো ঘরটায় দুজনে থাকব।

কেন রে?

অবধলাল শুধু বলে, ও ঘরে থাকবেন কী দাদা, পরিষ্কার দেখলাম ঘরে স্বামী—স্ত্রী বসে আছে।

ফল্গু তো কিছুই দেখেনি। কিন্তু বাইরে তখন বিকেল শেষ হচ্ছে। হেমন্তের বিকেল! বাতাসটা ঠান্ডা হচ্ছে। চারদিকে জনমানব নেই। এ সময়ে অবধলালের কথা অমান্য করতে গেলে অবধলাল তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে।

অবধলাল চোখ মটকে বলল, ব্যাপারটা বুঝলেন না? ওই যে চৌকিদার, ও কেন রাতে থাকে না? ও ঘরে কারা বসে আছে, তা তো ও জানে। কেন বসে আছে, সেটাই দেখতে হবে।

ফল্গু তো দেখেছে কামরা জনশূন্য, জানলা বন্ধ, অবধলাল কি তা মানে? ও চোখ মটকে বলল, রাতে খেয়ে দেয়ে আপনি ঘুমোন, আমি দেখি ওরা কী করে। ওঃ মেয়েটা ছেলেমানুষ। ভয়ও পেয়েছে খুব, লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

ফল্গু ধমকে বলল, আমি ভিতু মানুষ। আমি ওর মধ্যে নেই। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও মাঝখানের।

দাদা! অবধলাল থাকতে আপনার কাছেও কেউ আসবে না, কোনো অনিষ্ট করবে না। আমিও ওদের চিনতে পারি, ওরাও আমাকে চিনতে পারে।

এসব চেনাচেনির কথা সন্ধের মুখে কি ভালো লাগে? চৌকিদারটা এ সময়ে তেল ভরা দুটো লণ্ঠন জ্বেলে রেখে গেল। তারপর ঢেঁড়স দিয়ে ডিমের ডালনা, রুটি আর জলের কলসি রেখে গেল ঘরে। বলে গেল,

সাবধানে থাকবেন বাবু, রাতে বাইরে বেরোবেন না।

ফল্গুকে আর দু—বার বলতে হল না। ঢেঁড়স দিয়ে ডিমের ডালনা কে কবে খেয়েছে বলো? তা ফল্গুবাবুর কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ও ছাপরায় অড়হর ডাল আর পিঁপড়ের ডিমের মোগলাই কারি (অবধলালের রান্না), গৌরীপুরে আলু আর আটার গোলাসেদ্ধ (ওর রান্না), মজঃফরপুরে কামরাঙা দিয়ে পাবদা মাছের ঝোল (অবধলালের রান্না) খেয়েছে। এসব কথার সত্যি আর মিথ্যে জানা যাবে না। কেননা অবধলালও ফল্গুর উধাও হবার সময় থেকেই উধাও।

সত্যি বলতে কি, অবধলালকে আমরা চর্মচক্ষে আজও দেখিনি। ও আরেকটা ফল্গুবাবুকে খুঁজছে। যাকে পেলে তার সঙ্গে জুটে যাবে।

রাতে তো ফল্গু খুব ঘুমোল। সকালে উঠে দেখে অবধলাল চৌকিদারকে খুব চোটপাট করছে।

ব্যাপার তো কিছুই নয়। লোকটা ওই আওরতকে খুন করেছিল। নিজেও খুদকুশি (আত্মহত্যা) করে। তা তুমি এ কামরায় কোনো বন্দোবস্ত করোনি কেন?

কি করব বাবু!

অবধলাল থাকতে ভাবনা?

অবধলাল তার ঝোলা থেকে কী একটা জড়িবুটি বের করল। ঘরের দেয়াল ফুটো করে পুঁতে দিল। ওগুলো নাকি ভূত তাড়াবার মোক্ষম ওষুধ।

ফল্গুরা যখন ট্যুর সেরে ফিরেছে, সেই চৌকিদার তো অবধলালকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। না না সে দুটো ভূত আর আসছে না। তবুও ভূতুড়ে ঘর শব্দটা চৌকিদার চালু রেখেছে।

কেন?

চৌকিদার খৈনি মুখে দিয়ে বলল, চৌকিদারিতে আর কি মিলে বাবু! এখন আমরা মাঝে মাঝে ও ঘরে একটু জুয়া সাট্টা খেলি। ধরম পথে পয়সাও কামাই হয় দুটো।

পুলিশ জানে?

পুলিশের সঙ্গেই তো খেলি বাবু। এ আপনারা খুব বড়ো কাজ করলেন। পাবলিকের ডাক বাংলো। এখন পাবলিকের কাজে লাগছে। সবাই অবধলালজীকে খুব আশীর্বাদ করছে। তবে কি বাবু! কামরায় তো ঢুকতে পারে না। রোজ ওই তেঁতুল গাছে বসে দুজনে খুব ঝগড়া করে।

তা করুক না। ও বেচারীরা যায় কোথায়। ভূত বলুন, পিশাচ বলুন, ওদের তো থাকার জায়গা চায়। আমার গ্রামেই তো ডাক্তারবাবুর বউ যখন ভূত হয়ে গেল, কেবল সাবান চুরাত, কুয়াতলায় চান করত, আমিই তো তার ব্যবস্থা করে দিলাম। এখন সে পুকুরপাড়ে বেলগাছে থাকে। রোজ একটা সাবান মেখে স্নান করে।

ফল্গু বলল, তবে যে শুনি গয়াতে গেলে...

অবধলাল ফচফচ করে হাসল। বলল, গয়াজীতে গেলেও বাবু! ভূতের মধ্যে যারা গিটগিটা আর পিচপিচা, তাদের মুক্তি হয় না।

সে আবার কী?

সে আপনি বুঝবেন না। সবচেয়ে পাজি হল কিরকিচা ভূত। গ্রামের ঝগড়াটি মেয়েছেলেরা কিরকিচা ভূত হয়। তবে হ্যাঁ, বহুত কাজও করে।

কীরকম?

এই আমার মা আর পিসিকে দেখুননা। গ্রামে ঝগড়া লাগলে সবাই ওদের নিয়ে যেত। ওদের মতো গাল দিতে আর ঝগড়া করতে কেউ পারত না। এই যে দুজনে মরে গেল মেলায় গিয়ে কলেরা হয়ে, এখনও কত কাজ করে। বাপ রে বাপ!

কী করে!

সন্ধে হলেই আসবে, ঘরের চালে বসবে, আর বাবাকে, আমার সৎমাকে বাড়ির সকলকে গাল দেবে। কে ঠিকমতো কাজ করেনি। বাবা মাঠে গিয়ে কাজ না করে ঘুমোচ্ছিল কেন, বউরা কেন ঝগড়া করেছে, বাসনে কেন এঁটো থাকবে, কাপড়ালত্তা কেন সাফ হয় না— এই নিয়ে এক ঘণ্টা গাল দেবে, তারপর চলে যাবে।

এ তো সর্বনেশে কথা!

অবধলাল ক্ষমার হাসি হাসল। বলল বাবুজী! কিরকিচা ভূত না থাকলে কোনো গ্রামে শান্তি থাকে না। মেয়েছেলেরা সবচেয়ে বেশি ঝগড়া করে। কিরকিচারা গিয়ে ডবল তিন ডবল গালি দিয়ে সবাইকে ঠান্ডা রাখে। বাপ রে! আমার বাবা বলছিল গয়াজীতে যাব। তাতে মা আর পিসিমা গয়াজী গিয়ে এমন গাল দিতে থাকল যে পাণ্ডাজী বাবাকে লাঠি দিয়ে পিটাল। তুমি কিরকিচার পিণ্ড দিতে এসেছ?

চৌকিদারও বলল, হাঁ হাঁ, কিরকিচা প্রতি গ্রামে থাকা খুব দরকার।

ফল্গুর মুখে গল্প শুনে আমাদের খুব ইচ্ছে হয়েছিল একটা কিরকিচা ধরে আনি। মায়ের পুষ্যি যত পাড়ার বাজখেঁয়ে মেয়েছেলে, তারা কি কম ঝগড়া করত?

সাতভূতুড়ে বাড়িতে অবশ্য ও ভূতের বাড়ি জেনে যায়নি। দুমকা ছাড়িয়ে অনেক দূরে কোথায় রাজবাড়ি পোড়ো হয়ে আছে, তাই দেখতে গিয়েছিল।

বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই দুমকার বন্ধু কমলবাবু বলল, আজ চোখে দেখুন, তারপরে সকালে এসে ভালো করে দেখবেন ঘুরে ঘুরে।

সাপের ভয়?

শীতকালে সাপের ভয়?

বদলোকের আড্ডা আছে?

না মশাই। আসলে...

অবধলাল তো মহা খুশি। কি ব্যাপার বাবু? ভূত আছে নাকি? গিটগিটা না পিচপিচা?

সে আবার কী?

বাবুজী জ্যান্ত মানুষের জাত আছে, ভূতের জাত নেই? গিটগিটা, পিচপিচা, কিরকিচা, কত জাতের ভূত আছে তা জানেন?

না বাপু, আমি জানতেও চাই না।

কি আছে ওখানে?

সবাই বলে সাতটা ডাকাত এ তল্লাটে খুব তরাস তুলেছিল। তা রাজবাড়ির একটা কামরায় ডাকাতির মাল ভাগ করতে গিয়ে মারামারি করে সাতটাই মরে। তারাই ও ঘরে দাপাদাপি করে।

মনে হচ্ছে গিটগিটা।

ডাকাতির মালের লোভে যেই গেছে সেই মারা পড়েছে। কেউ যায় না।

অবধলাল বলল, তাহলে তো থেকে যেতে হয়। আমার নাম অবধলাল। আমি সাতটাকেই তাড়াব।

কমলবাবু বললেন, আমি ওর মধ্যে নেই।

গ্রামের লোকেরা খুশি। বাপরে, রাজবাড়ির বাগান তো এখন জঙ্গল। ভয়ের চোটে কেউ কুলটা আমটা আনতে যাই না। ভূতগুলো তাড়াও বাবু। আমাদের ঘরে আজ থাকো। খাও দাও আরাম করো।

কমলবাবুও থেকে গেলেন। ও বাড়িতে উনি ঢুকবেন না। কিন্তু তামাশা তো দূর থেকেও দেখা যায়।

মাহাতোদের গ্রাম। ফলে মুরগি, ভাত, জবর খাওয়া হল।

পরদিন অবধলাল আর ফল্গু বাড়িতে ঢুকল। একেবারে পোড়ো বাড়ি। দোতলা দিয়ে বটগাছ উঠেছে বড়ো বড়ো।

একতলায় দুটো ঘর তবু থাকার মতো। অবধলাল বড়ো ঘরটা দেখিয়ে বলল, ওখানেই বেটাদের আড্ডা।

সে ঘর যেমন ধুলোপড়া, তেমনি বড়ো। কোণের দিকে একটা কাঠের সিন্দুক।

আরে আরে দেখুন!
কী দেখব?
জানালা দিয়ে দেখুন।
জানালার নীচে বেশ বড়ো একটা খাত। পাশে একটা গাছ।
ওর মধ্যে কিছু আছে বোধহয়।
পাশের ঘরটা সাফসুতরো করল অবধলাল। গ্রাম থেকে চাটাই আনল, বালিশ তেলভরা লণ্ঠন, কুঁজো বোঝাই জল। সন্ধের মুখে বলল আমি তো চললাম। আপনার ডর লাগে তো আপনি থেকে যান গ্রামে।
ফল্গু বলল, মোটেই না, আমিও যাব।
লোকগুলোর লাশ কোথায় গেল?
মাহাতোরা বলল, সে তো সে সময়েই পুলিশ নিয়ে যায়। পুলিশ ডাকাতির মালও খোঁজে, পায়নি।
অবধলাল আর ফল্গু তো চলে এল। ফল্গু বলল, অবধলাল, আমি শুয়ে পড়েছি। তুমি ভূত তাড়িয়ে তবে আমাকে ডাকবে।
আগে দেখি ব্যাটারা কেমন জাতের। আর একটু কাজ সেরে আসি।
কী কাজ?
খাতের পাশে গাছটা দেখলেন না?
দেখলাম তো!
বেচারি! ওখানে একটা কিরকিচা আছে। বেচারি আছে বলেই কেউ জানে না। একটু খইনি একটু বিড়ির জন্যে বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।
এখানেও কিরকিচা?
বাবুজী, কিরকিচা কোথায় নেই?
ও কেন ভূতগুলোকে তাড়াচ্ছে না?
কিরকিচা বলে ওর আত্মসম্মান নেই? ওকে কেউ বলেছে?
তুমি কি ওকেই ডাকবে?
না না, সে দেখা যাবে। একটু খইনি, দুটো বিড়ি, একটা দেশলাই তো রেখে আসি। বাবুজী, ভূত তাড়াবার জড়িবুটিও তো আমাকে একটা কিরকিচাই দিয়েছিল।
এমনি সময়েই প্যাঁচা ডাকল, আর ফল্গু একটা ঘুমের বাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।
মাঝরাতে সে কী গণ্ডগোল। অন্য কারও গলা শোনা যাচ্ছে না, অবধলাল চেঁচাচ্ছে।
তাই বলো! কিরকিচার ভয়ে এখানে ঢুকে বসে আছ? কেন, পুলিশ যখন লাশ নিয়ে গেল, তখন সঙ্গে গেলে না কেন?
একটা গলা মিউমিউ করে বলল, গিটগিটা কোথাও যেতে পারে?
সর্দার কে?
আমি তো ছিলাম।
ঘরে কেন, বাইরে জঙ্গল আছে না?
অহি কিরকিচা!
ওর ভয়ে মরে গেলে?
হাঁ বাবু। আগে তো মারামারি করে মরলাম। তারপর পালাতে যাব, কিরকিচা যা গাল দিল আবার মরে গেলাম। এখন তো পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু দু—বার মরলে কেমন করে পালাব?
হায় হায়, এ তো বহত আফশোস। ডবল ডেথ হয়ে গেল। তোমরা তো গিটগিটাও নেই, পিচপিচাও নেই। বিলবিলা হয়ে গেছ, হায় হায়!

আমাদের ছেড়ে দাও ভৈয়া।
ছাড়ব তো, যাবে কোথায়?
তা ফল্গু বলল, অবধলাল বলেছে যে কখনো কোনো কিরকিচা নিজের গ্রাম থেকে নড়ে না।
যদি বেড়াতেও আসে!
না না সে অসম্ভব।
ফল্গুকে বলতাম, অবধলালের কথা বিশ্বাস করিস?
ও বলত, বিশ্বাস করব না? জঙ্গলে যারা কাজ করে তারা বাঘের চেয়ে ভালুককে ডরায়। বাঘ মানুষ দেখলে সরে যায়। ভালুক তেড়ে এসে আক্রমণ করে। সেবার হাজারিবাগে...
একটা গল্পের সুতো ধরিয়ে দিয়েই, এমন হতভাগা বলত, সকাল আটটা। বসে গল্প করার সময় নয়। থলিটা কোথায়, বাজারে চল।
আমাকে বাজারে টেনে নিয়ে যাবে, যা দেখবে সব কিনবে আর বাড়ি ঢুকে বলবে, ছ্যা ছ্যা, বুড়ো হয়েছে তো! যা দেখে সব কেনা চাই।
গল্প বলার সময় সন্ধেবেলা। বাগানের চাতালে বসে। লোডশেডিং হলে আরও জমত।
হাজারিবাগের জঙ্গলে ঘোরার আসল মজা বিট অফিসারের সঙ্গে পায়ে হাঁটে, তাঁবুতে থাকো, মাঝে মাঝেই দেখব গ্রামের মেয়ে—পুরুষ কাজ করছে।
তেমনি ঘুরতে ঘুরতে ওরা নাকি ভালুকের সামনে পড়ে। ভালুক দেখে ওরা তো দৌড় লাগিয়েছে। ভালুকও তেড়ে আসছে। তখন অবধলাল চেঁচিয়ে বলছে, আরে জঙ্গলে তো কত আওরতও মারা পড়েছে। একটাও কিরকিচা নেই? আরে কিরকিচা, কোথায় আছ?
সঙ্গে সঙ্গে গাছপালায় ঝড়তুফান তুলে ভালুকের দু—পাশে দুই কিরকিচা এমন চেঁচাতে শুরু করল যে ভালুক ঘাবড়ে পালাল।
এটা সত্যি?
ইচ্ছে হলেই বিট অফিসারকে জিজ্ঞেস করে জেনে আসতে পারো।
তা, অবধলাল সঙ্গে থাকত বলে ফল্গুরও ঝোঁক চেপেছিল ভূতের বাড়ি হলেই ওকে নিয়ে সেখানে থাকবে।
বাইরে থেকে কে খনখন করে হাসল। ঠিক যেন হায়েনা হাসল।
যৈসে ভি হো, ভাগ যায়েগা।
কে যেন খনখনে গলায় বলল, সত্যি কথাটা বলনা বাপু। আমি তোদের কেন পুরে রেখেছি?
ফিঁচফিঁচ করে কেঁদে একজন বলল, অরে লখিয়াকে মা! তোর তামাকুর ডিব্বা আমরা নিইনি।
গিটগিটার দোহাই?
গিটগিটার দোহাই।
বিলবিলার দোহাই?
বিলবিলার দোহাই।
আমার কাছে মাপ চাইবি?
চাইলাম, চাইলাম।
যা তবে, ছেড়ে দিলাম।
অবধলাল এ সময়ে কী যে করল কে জানে। ঘরে ভীষণ একটা ঝুটোপাটি পড়ে গেল।
সকালে ফল্গুকে তো অবধলাল ডেকে তুলল। ফল্গু বলল, কাল অত চেঁচামেচি সব শুনেছি।
ছাই শুনেছেন। সিদ্ধির শরবত খেয়ে ঘুম মারলেন। কি শুনবেন?
চেঁচামেচি হয়নি?

সব মনে মনে।

ওরা চলে গেছে?

দেখুন না।

ধুলোর ওপর সাত জোড়া ছোটো ছোটো পায়ের ছাপ। সব বাইরের দিকে বেরিয়ে গেছে।

ছোটো ছোটো ভূত?

না বাবু। বেচারাদের মতো অভাগা হয় না। মরল তো গিটগিটা হয়েছিল। গিটগিটারা বড়ো বড়ো ভূত। কিরকিচার ভয়ে আবার মরে গেল। এখন তো ওরা বিলবিলা। বেঁটে বেঁটে ভূত। কী দুঃখ!

দুঃখ কেন?

আর বিলবিলা দেখলে গিটগিটা, পিচপিচা, কিরকিচা, সবাই পিটাবে। বিলবিলা হওয়া তো ডর—পোকের লক্ষণ। এক দফে মরলে, ঠিক আছে। আবার ডবল দফে মরবে? ওরা সমাজের কলঙ্ক।

এখন ওরা কী করবে?

পালাবে আর কী করবে।

আসার আগে অবধলাল খাতে নেমে অনেক খুঁজেও কিছু পেল না। মাহাতোদের বলে, ওহি গাছের নীচে পিতলের ডিব্বায় তামাক পাতা, চুন রেখে দেবে। ভূত তো তাড়িয়ে দিয়েছি। গাছে যে কিরকিচা আছে, তাকে চটাবে না।

ডাকাতির মাল?

নির্ভয়ে খোঁজ গে।

গ্রামের লোক তো পায়ের ছাপ দেখতে পেল। গিটগিটাদের বিলবিলা হবার কথাও সব শুনল। ওদের কি আনন্দ! মাহাতোরা, সাঁওতালরা, তেলিরা, সবাই যাবে। দরজা, জানালার কপাট নেবে, ইট নেবে। বাগান থেকে যথেষ্ট কুল, আমলকি, আম নেবে। গাছ কেটে জ্বালানি করবে। ওই মস্ত পুকুরে স্নান করবে। ঘাসবনে গোরু চরাবে।

প্রচুর মুরগি কাটা হল, খুব খাওয়া—দাওয়া।

কমলবাবু সবই খেলেন, কিন্তু বললেন, ভূতের ডবল ডেথ, ধুলোতে পায়ের ছাপ, দূর মশাই, সব ধাপ্পা।

অবধলাল বলল, ও সব বলবেন না বাবুজী, তাহলে কিরকিচাটা আপনার পেছনে লেগে যাবে। আপনাকে গিরগিটা বানিয়ে ছেড়ে দেবে। আপনি যা ভিতু হয়তো আবারও মরে যাবেন। তখন বিলবিলা হয়ে থাকতে হবে।

চাবি

আশা দেবী

মাঝরাতে একটা ঝোড়ো হাওয়া প্রভাত বিশ্বাসের কাচের জানালার ওপর আছড়ে পড়ল। যেন মনে হল দূরের পাহাড় পেরিয়ে ঝাউগাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে সে যেন ওই জানালাটা লক্ষ করেই ছুটে আসছে, তারপর সেই ঝোড়ো হাওয়া ঠিক কান্নার মতো সবেগ উচ্ছ্বাসে জানালার খড়খড়িগুলোকে বুক চাপড়ানোর মতো আওয়াজ করে খুলে ফেলল! আর যেন ঝোড়ো হাওয়ায় দূরের ভেসে আসা ফুলের গন্ধের মতো একরাশ গন্ধের সঙ্গে পালকের মতো লঘু পায়ে কে যেন ঘরের ভেতর নেমে এল। তারপর সেই কোরা শাড়ির গন্ধ, চেনা চেনা মিষ্টি মিষ্টি গায়ের গন্ধ, চুলের গন্ধ আর গরম গরম নিশ্বাসে কে যেন ঘরটা ভরে দিল। প্রভাত অনুমান করল অনু এসেছে।

ক—দিন বৃষ্টি নেই। প্রচণ্ড গুমোট চলছে। পাহাড়ে এমন গুমোট সচরাচর দেখা যায় না। মনে হচ্ছে একটা প্রবল ঝড়বৃষ্টির পূর্বসংকেত। প্রভাতের ঘরটার বাইরে যেন শব্দহীন পাহাড়ি রাজ্যের স্পন্দনহীন অন্ধকার রাতটা যেন তার অনুভূতিগুলোকে স্তিমিত করে আনছে। যেন মনে হচ্ছে, বাইরের এই পাহাড়ি—পাথুরে অন্ধকারটা তার বুকটাকে দু—হাত দিয়ে চেপে ধরতে চাইছে।

বাইরের নিঃশব্দ পৃথিবী—ভেতরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। এই নিথর রাতের আঁধারে যেন তার ইন্দ্রিয়গুলো এই মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে তার কে যেন জানালার কাছে এসেছে। শাঁখের মতো সাদা আর সরু সরু আঙুলগুলো দিয়ে খড়খড়ির কাঠগুলো তুলছে, তারপর, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তার খাটের কাছে। আরও কাছে—এগিয়ে আসছে সে।

—বাহাদুর—বাহাদুর! নিল—নিল আমার সিন্দুকের চাবি নিল। বিকৃত কণ্ঠে প্রভাত চিৎকার করে উঠল। তারপর তিরের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই শীতের রাতেও সে ঘেমে নেয়ে গেছে। উত্তেজনায় ছুটে সে ঘরের কোণার সুইচ বোর্ডটার কাছে গিয়ে আলো জ্বালাল। মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে কে। ঘরের আলোটা জ্বলে উঠতেই যেন ছায়াবাজির মতো দেওয়ালের গায়ে অনু আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

প্রভাত বিছানার ওপর বসে পড়ল ধপ করে। নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে সে আবার চারিদিকটা বেশ করে চেয়ে দেখল। আলোটা ভারি ঘোলাটে লাগছে। কতদিনের পুরোনো আর ময়লা বালব। ধুলো—ময়লা পড়ে পড়ে ওর জোর কমে গেছে। চারিদিকে মাকড়সায় জাল বুনেছে। সেই মাকড়সার জালের তার বেয়ে নেমে আসা আলোর ক্ষীণতম রশ্মিগুলোতে চুন—বালি ওঠা দেওয়ালগুলোকে যেন ক্রুর শ্বাপদের দাঁতের মতো লাগছিল। কারা যেন অজস্র অঙ্গুলির সংকেতে তাকে শাসিয়ে চলেছে একটানা।

প্রভাত ঘর—বার, খাটের তলা, আলমারির পাশ সব দেখল খুঁজে। অনু কোথাও নেই। দরজার হুড়কো তেমনি বন্ধ। তবে কে বালিশের নীচের চাবি নিতে এসেছিল? প্রভাত বালিশ তুলে দেখল, সেটা সেখানেই পড়ে আছে। আলমারির পাশে লোহার সিন্দুকে তেমনি ছেঁড়া অয়েলক্লথ দিয়ে ঢাকা। ধুলোয় ধুলোয় সিন্দুকের গায়ের লাল স্বস্তিক চিহ্নটা একটা ক্ষতের মতো তেমনি কালো হয়ে তাকিয়ে আছে। কেউ যে এতে হাত দিয়েছে এমন তো মনে হচ্ছে না। তবে—?

প্রভাত বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। ভাঙা দাঁতের ওপরের কাটা ঠোঁটটার ভেতর থেকে সরীসৃপের মতো বার কতক লাল জিভটা নাড়ল। এবার যেন তার অনুভূতিগুলো একটু একটু করে আসছিল। হঠাৎ মনে হল বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, ঘরের ভেতরে রাখা কাচের কুঁজোটা থেকে ঢক ঢক করে খানিকটা জল সে খেয়ে

ফেলল। তারপর ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল। অনু এসেছিল! প্রভাত জানত সে আসবেই, আসবেই তার গয়নার আকর্ষণে।

পাগলের মতো ছুটে এসে সে জানালাটা খুলে দিল, তারপর দূরে সন্ধানী চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজতে লাগল সেই নিকষ—কালো অন্ধকারের ভেতর। ওই যে পেনসিলে আঁকা পাহাড়ের সারি আকাশের বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, তাদেরই মাথার ওপর দিয়ে হয়তো ওই দমকা ঠান্ডা হাওয়াটা ছুটে এসেছিল পাগলের মতো। কালো কালো পাইনের মাথাগুলো কেঁপে কেঁপে শিউরে শিউরে উঠেছিল যেন সেই হিমেল স্পর্শে। পাহাড়ের বুকের গ্রামগুলোর ঘুমন্ত গৃহস্থের ঘরের নিবু নিবু আলোগুলোকে যেন সে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল সহসা। হঠাৎ যেন বাজপড়া নেড়া গাছটার ওপর শকুনের ছানাটা চিৎকার করে কঁকিয়ে কেঁদে হঠাৎ চুপ করে গেল কাকে দেখে। আর কে যেন ছুটে আসছে সাদা কঙ্কালের আঙুলের ধোঁয়ায় কালো বুকপোড়া চোরা লণ্ঠন হাতে ধরে। আর দেখতে দেখতে সেই ঘরের চাল সেই গাছের মাথার পুঞ্জপুঞ্জ হিমানী জমে রূপ নিলে অনু আর সেই গাছের মায়াময়ীর কায়া যেন অনায়াসেই কায়া গ্রহণ করে জানালার ভেতর দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

তারপর তার ব্রোঞ্জের চুড়ির কর্কশ ঠুনঠান, শাড়ির আওয়াজ আর মাথার তেলের গন্ধ ঘরে ভরে দিয়েছিল। প্রভাত তাকে দেখেছে নইলে সে বুঝল কী করে অনুকে।

বাইরে থেকে বাহাদুর ডাকছে—বাবু—বাবু কী হল? দরজা খোল। কিন্তু প্রভাত দরজা খুলল না, শুধু পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল যেন কাকে খুঁজছে—যেন দরজা খুললেই সে পালিয়ে যাবে।

এমনি সে প্রায়ই করে। বাহাদুর পুরোনো চাকর, সে সবই জানে। অনুকে দোতলার জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে খুন করবার পর থেকেই সে অমনি করে স্ত্রীর গহনা পাহারা দিয়ে চলেছে যক্ষের মতো অনুর হাত থেকে। তবু মনে হয় পারবে না, সে কিছুতেই পারবে না। অলংকার লোলুপতা অনুর মৃত্যুর পর আরও বেড়েছে, সে ওগুলো নেবেই— এই কথাটা ভাবতে ভাবতে যেন তার মাথার শিরা—উপশিরাগুলো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যেতে চাইছে যন্ত্রণায়। যদি তার একটা রাতও নিশ্চিন্তে ঘুম হত তাহলে হয়তো সে বাঁচতে পারত।

বাড়ির নাম 'প্রভাত—কিরণ'। এই ইতি—কথা বড়ো বিচিত্র। এই শহরের পথে পথে সিগারেট ফিরি করে বেড়াত প্রভাত! ক—টা পয়সাই বা হয় এতে। কখনো একবেলা ভাত জোটে, কখনো অনাহার। হঠাৎ যুদ্ধ বাধল। চারটে ভাঙা দাঁত আর কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল তার মুখে। সরস্বতীকে ক্লাস সেভেনে বিদায় দিলেও লক্ষ্মীকে কীভাবে লোহার সিন্দুকে বাঁধতে হয় তা সে জানত। যুদ্ধের সুযোগে ভুটিয়াদের মারফত তিব্বতে সে সিগারেটের চোরাকারবার করত। আরও যেন কী কী চালান দিত কে জানে, চক্ষের নিমেষে কাঁচা টাকা আর সোনার বারে তার সিন্দুক ভরে উঠল।

গরিলার মতো লোমশ হাতে কানের ওপর থোপা থোপা চুলগুলো টেনে টেনে ফাঁকা দাঁতের পাশে লিকলিকে জিভটা নেড়ে নেড়ে হাসত প্রভাত। কি সুখী কি সুখী সে। নিজের নামে বাড়ি করেছে সে।

সবাই ধরে বসল—বিয়ে কর। কেউ নেই, কে দেখবে। প্রভাত এবার জন্তুর মতো অর্থহীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। তাকে বিয়ে করবে কে? যার চোখ আছে সে কিছুতেই সাহস করবে না।

কিছুদিন বেশ কেটে গেল। এবার বিয়ের প্রসঙ্গে তার মুখে রহস্যের হাসি। এরও তিনমাস পর একদিন সকলকে বিস্মিত করে চৌমাথার মোড়ে বউ নিয়ে নামল প্রভাত। সবাই বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। অফিসের লেট হয়ে গেল তবু কোনো মন্তব্য পর্যন্ত করতে পারল না। অপূর্ব সুন্দরী অনু—তার সারা শরীর গয়না আর বেনারসিতে ঝলমল করছে। সবাই বললে, এ গরিলার গলায় হিরের হার পরাল কে?

গয়না প্রভাতই দিয়েছিল। মনে মনে ছিল স্ত্রীকে দেওয়া মানেই গর্বে থাকা। তা ছাড়া সুন্দরী বুদ্ধিমতী অনু প্রথমে একেবারে বেঁকে বসেছিল। কিন্তু গরিবের মেয়ে, সাজতে—গুজতে গয়নাগাঁটিতে তার বড়ো লোভ। সেই রন্ধ্রেই শনি প্রবেশ করল এবং সে প্রভাতের ফাঁদে পা দিল।

পাহাড়ের কোলে বিরাট বাড়ি, বাগান। এমন স্বামীর ঘর অনু আশাও করেনি। কিন্তু আশ্চর্য, এ ক—দিনেই যেন সে অনুভব করল প্রভাতের চোখ তাকে সমানে পাহারা দিয়ে ফিরছে। কিছুদিন আড়ে আড়ে কথা বলে তারপর একদিন বলেই ফেলল প্রভাত—গয়নাগুলো খুলে রাখ। সর্বদা ব্যবহার করলে ক্ষয়ে যাবে।

—সেকি? তবে দেবার দরকার ছিল কি?

—আমি তোমার সর্বদা ব্যবহারের জন্যে ব্রোঞ্জের চুড়ি তৈরি করে রেখেছি।

—না, আমি গয়না খুলব না। অনু গলার হারটা দু—হাতে চেপে ধরল। রোলড গোলডের হার পরব না আমি। ছিঃ—

—ছিঃ, আবার কী? সবাই তাই করে। তুমিও করবে।

না, আমি করব না। দৃঢ়স্বরে অনু জানিয়েছিল। কিন্তু কথা তার টেঁকেনি। প্রভাত ঠিক তখনই নেয়নি, কিন্তু তার ক—দিন পরই নিয়েছে জোর করে। যেন সে এত সোনার এভাবে অপচয় সহ্য করতে পারছে না! ব্যবহার করলে সোনা ক্ষয়ে যায় যে।

অনু ক—দিন চেয়েছে, অভিমান করেছে। তারপর হাতে ক—গাছা ব্রোঞ্জের চুড়ি ছাড়া কোনো গহনাই পরেনি। আর মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে প্রভাত— কী লোভী মেয়েটা! কী ভীষণ লোভ ওর গয়নার ওপর, নইলে গরিলার মতো স্বামীর চেহারা দেখেও বিয়ে করবে কেন? বিয়ে তো করেছে সে গয়না—শাড়িকে, প্রভাতকে নয়। কাছে ডাকলে আসে না। সর্বদা দূরে দূরে থাকে। মনে হয় যেন কেমন ভয় করে তাকে। বেশ তো ছিল, কী দরকার ছিল তাকে বিয়ে করবার। তার সুন্দরী স্ত্রী—ইচ্ছে করে অনুকে দূর করে দেয় বাড়ি থেকে—সামনের কাটা ঠোঁটের দন্তহীন গহ্বরের ফাঁক দিয়ে যেন সরীসৃপের মতো জিহ্বাটা তার লিকলিক করে ওঠে। এই সময় যেন তাকে ভারি বীভৎস লাগে দেখতে।

হঠাৎ তার সামনে চোখ পড়তেই দেখে অনু জানালার কাছ থেকে দু—চোখে ভয় নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে যেন পায়ের কাছে সাপ দেখেছে সে।

বাজারের সামনে ক—টা হোটেল খুলেছে। দিনরাত সে তাই নিয়েই ব্যস্ত, বাড়ি প্রায় ফেরা হয়ই না। আজ সে বাড়ি ফিরবেই যত রাত হোক। বাহাদুর অবশ্য বাড়ি ফেরবার জন্য রোজই বলে, এও বলে, না ফিরলে হয়তো খুবই ক্ষতি হবে। কিন্তু প্রভাত নিরুপায়। চীনা সীমান্তে যুদ্ধ লেগেছে। এখানে কত সৈন্যের আমদানি হচ্ছে, একটা ভালো হোটেল খুললে এ সময়ে লাল হয়ে যাবে সে। বাড়ি তো আছেই চিরকালের, এই মওকায় কিছু টাকা সংগ্রহ করে নিতে দোষ কি?—সুযোগ জীবনে ক—বার আসে?—কিন্তু যাক সে সব কথা। সে আজ বাড়ি ফিরবেই।

একটা পুরু ইটালিয়ান কম্বল গায়ে জড়িয়ে সে নির্জন বনের পথ ধরে অন্ধকারে একা বাড়ির পথ ধরল।

কুয়াশা, শীত, হাওয়া আর এই আঁকাবাঁকা পথ। একটু দেরিই হল বাড়ি ফিরতে। কিন্তু বাড়ির সামনে এসে চমকে থেমে গেল প্রভাত। অনু হাসছে আর কথা বলছে যেন কার সঙ্গে। কী সুন্দর সে হাসি! এমন করে আবার যে অনু হাসতে জানে, না দেখলে প্রভাত বিশ্বাস করত না।

পোলাটা ভূপতির না? তারই কর্মচারী ছোকরা। অনুরই দেশের ছেলে। ভারি সুপুরুষ দেখতে। অনুরই অনুরোধে প্রভাত ওকে চাকরি দিয়েছে। তখন বোঝেনি, খাল কেটে সে কুমির এনেছে।

—আমি আর থাকব না ভূপতি, তুমি আমাকে বাঁচাও। ওরা আমাকে সারাদিন পাহারা দেয়। বাড়ি থেকে বাগানে পর্যন্ত নামতে দেয় না, সব গয়নাপত্র কেড়ে নিয়েছে। তুমি আমায় নিয়ে চল।

—আমি তো তখনই বলেছি। মানুষ জন্তুর সঙ্গে থাকতে পারে না।

—তুমি আমাকে বাঁচাও!

—চাবিটা নিয়ে গয়নাগুলো হাত কর। তারপর চল যাই চলে।

—চাবি নেব কী করে? ওর ট্যাঁকে থাকে যে।

—দেখ না, বুদ্ধি করে কীভাবে নেওয়া যায়।

আর সহ্য হল না প্রভাতের। সে ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা দিল। —দরজা খোল অনু।

ওদিকে জানালা বন্ধের আওয়াজ এল। তারপর অনু দরজা খুলতেই সে বাঘের মতো অনুর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি আর প্রেম। বের করছি সব। আমি জন্তু? বেশ, দেখাচ্ছি তোর মজা।

কুকুর বাঁধা শেকল দিয়ে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে প্রভাত অনুকে পিশাচের মতো চাবুক দিয়ে পিটল। অনু দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল। ঘৃণায় লজ্জায় তার চিৎকার পর্যন্ত করতে ইচ্ছে করল না। শুধু ভয় হতে লাগল ওই শ্বাপদটার ভাঙা দাঁত আর কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লিকলিকে জিবটা বেরিয়ে কখন তাকে একেবারে শেষ করে ফেলবে। খানিকটা পরই অনু জ্ঞান হারিয়েছিল।

সামনের জানালার কাছে দপ দপ করে জ্বলছে ভূপতির দুটো চোখ। অন্ধরাগে যেন ফেটে পড়তে চাইছে সেই অগ্নিপিণ্ড দুটো।

এর পর কিছুদিন বেশ চুপচাপ কাটল। প্রভাত নিয়মিত কাজকর্ম করতে লাগল আর অনু আপনার মতো এতবড়ো বাড়ির কোন কোণে গৃহকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। তার খবর কেউই রাখবার প্রয়োজন বোধ করল না।

মাঝে মাঝে প্রভাতের কেমন আত্মজিজ্ঞাসা জাগত। তখন মনে হত তারও আজকাল এমন করে ভালোবাসা, স্নেহ, মায়ার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

শনিবারের হাট থেকে ফিরে প্রভাত মুখর কণ্ঠে ডাকল,—অনু, অনু, অনুপমা!

অনুর কানে সে ডাক যেতেই সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার ডাক এল—কী এনেছি, দেখ এসে।

বেরিয়ে যাবার সময় ট্যাঁকের চাবিটা ফেলে গিয়েছিল প্রভাত। এখন সেটা অনুর চোখে পড়েছে। দেবে কী দেবে না ভাবতে ভাবতেই আবার ডাক এল—অনু আমার সর্বনাশ হয়েছে, চাবি?—ছুটে পাগলের মতো সে ঘরে ঢুকল।

দ্রুত কতকগুলো চিন্তা বিদ্যুতের মতো খেলে গেল তার মাথায় আর মুহূর্তে পাকা অভিনেত্রীর মতো একগাল হেসে সে বললে—এই তো এখানে পড়ে। পাগলের মতো কোথায় খুঁজছ তুমি?

—দাও—দাও, বলে হাত বাড়িয়ে ছুটে এল প্রভাত—আলমারি—টালমারি আবার খোলনি তো?

—কী যে বল! এখুনি তো পেলাম এই তোমার ডাক শুনে আসতে গিয়ে।

—ঠিক তো? আগে পাওনি তো? বলেই সে চাবি নিয়ে ছুটে গেল, আলমারি খুলে দেখল। না, সব ঠিক আছে।

আর বাঁকা চোখের সকৌতুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল অনু। যেন একটা মজার খেলার দর্শক সে।

এবার ছুটে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে—দেখ, তোমার জন্যে কী এনেছি। শাড়ি—সাবান—স্নো—পাথরের মালা। গলাটা খালি থাকে কিনা, ভালো দেখায় না। নাও—অনু। অমন করে চেয়ে আছ কেন?

নিথর হয়ে জমে যাওয়া হৃৎপিণ্ডটাকে অনু যেন নাড়া দিয়ে জাগাতে চাইল আর একবার! আর অভিনয় করা সম্ভব নয়। বরং নিষ্ঠুরতা ভালো। এ সোহাগ সহ্য হয় না আর। ফাঁকা দাঁতের ফাঁকের কাটা ঠোঁটের এই বিকট হাসি তার আরও অসহ্য। সে ধীরে ধীরে মৃতের মতো পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাশের বাড়ির ভূপতির জানালার দিকে খানিক তাকিয়ে কী যেন ভাবল প্রভাত, তারপর থেকে ক্যাশমেমোটা বের করে একবার দেখে নিয়ে সাবধানে জিনিসগুলো তুলে রাখল। আর এতগুলো টাকা বেঁচে গেল ভেবেই কী 'একটা বাঁকা হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে খেলে গেল না অন্য কিছু সে অনুভব করল?

রাতে অনুর ঘুম হল না। কেবল এপাশ—ওপাশ করতে লাগল। প্রভাত সশব্দে নাক ডাকছে। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

ঘরটা যেন তিমির তীর্থ। শীতের দেশ—সব কেমন স্যাঁৎস্যাঁৎ করছে বলে মনে হয়। চারিদিকে ধুলোর গন্ধ—জিনিসপত্রের দম বন্ধ করা গুমোট ভাব যেন অসহ্য লাগছে তার। দিনের বেলায় এসব তো কিছুই মনে হয় না। কিন্তু রাতের অখণ্ড অবসরে এরা যেন একটা অখণ্ড রূপ নিয়ে সে সামনে দাঁড়ায়।

ভূপতি বলেছে পালাতে হবে। জানালার কাছে সে সংকেত করেছে। পথে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর দেরি করা চলবে না। এখুনি পালাতে হবে। কিন্তু চাবিটা প্রভাতের ঘুনসিতে বাঁধা—হাতটা তার ওপর আছে। কিন্তু গহনা না নিয়ে সে কিছুতেই যেতে পারবে না—প্রাণ গেলেও নয়। এই গহনার জন্যে তার আজ এত কষ্ট!

কী করে চাবিটা নেওয়া যায়? অনু ধীরে ধীরে প্রভাতের পাশে এসে বসল। ধীরে ধীরে মাথায় কপালে হাত বুলোতে লাগল। আর ঘুমের ঘোরে দুর্বলতার মুহূর্তে প্রভাত অনুকে দু—হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। ধীরে ধীরে অনু চাবিটা কোমর থেকে খুলে নিল।

আলমারিটা খুলতেই হয়তো শব্দ হয়েছে। হঠাৎ প্রভাত চিৎকার করে উঠল—বাহাদুর—বাহাদুর, চোর—চোর। বলেই ছুটে গিয়ে ইলেকট্রিকের বোতামটা টিপে দিতেই আলো জ্বলে উঠল। আর প্রভাত বাঘের মতো লাফিয়ে গিয়ে অনুর ঘাড়ে পড়ল।

—চোর—শয়তান—

অনু সোজা হয়ে দাঁড়াল—নিজের জিনিস নেওয়া চুরি নয়। তা ছাড়া আমি কি এ বাড়ির কেউ নই? আলমারিতে হাত দেবারও আমার অধিকার নেই?

—না, নেই। তোমার কিছুতেই কোনো অধিকার নেই এ বাড়ির।

—নিশ্চয়ই আছে। আমার গয়না দিয়ে দাও। আমি চলে যাব।

—ভূপতির সঙ্গে? মুখ বিকৃত করে প্রভাত বলল।

—হ্যাঁ, ওর সঙ্গেই যাব। আমার ওকে ভালো লাগে।

—তবে রে! যাও, ওর কাছেই তোমাকে পাঠাচ্ছি। বলেই জানালা খুলেই সেই নিথর জঙ্গলের অতলান্তে অনুকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে জানালা বন্ধ করে দিল। পেছনের ঝরনার কলতানের সঙ্গে অনুর চিৎকার যেন মিশে রাতের আকাশকে বিদীর্ণ করে দিল। আর তখুনি কালো আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকালো আর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি ঝড় আর আকাশ—ভাঙা বৃষ্টি নামল বিশ্রামহীন সংযমহীন ভাবে একটানা সাতদিন। নীচের মুখর ঝরনা আরও মুখর হল। বড়ো বড়ো পাথর টেনে আনতে লাগল—গাছপালা ভেঙে জলের স্রোত চলল তিস্তার দিকে ছুটে। পাথরের নীচে কোনো গুহার অন্ধকারে অনু চিরনিদ্রায় নিথর হয়ে রইল, কে তার খবর রাখে?

অনু চলে গেল চিরদিনের মতো, কিন্তু প্রভাতের দ্বিতীয় চেতনা যেন মনের কাছে একটানা প্রলাপ বকে চলল! প্রতি রাতে তারপর থেকে আর্ত চিৎকার শোনা যেত। রাত যেন বিভীষিকা। তার সব শান্তি—ঘুম যেন কেড়ে নিল অনু। রাতের পর রাত জেগে সে সেই বন্ধ জানালার কাছে বসে চিৎকার করে। ডাক্তারের পায়ে ধরে বলে—আমার সব নাও ডাক্তারবাবু, আমায় একরাত ঘুমোতে দাও।

কিন্তু অনু তার ঘুম কেড়ে নিয়ে গেছে। সারারাত মনে হয় কে যেন আসে। কে যেন তার ঘরে ঢুকছে। তার শাড়ির গন্ধ, চুড়ির শব্দ, পায়ের আলতো আওয়াজ আর রাতের অন্ধকারে উত্তপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ আর চাবির শব্দ প্রভাতকে পাগল করে তোলে।

অনু এসেছিল। নিশ্চয়ই এসেছিল। বন—প্রান্তর পাইনের সারির ওপর দিয়ে দূর—দূরান্তর সপ্তসিন্ধু পার হয়ে মৃত্যুর অন্ধকার থেকে। জীবন্তকে খুন করা যায় কিন্তু মৃতকে খুন করবে কেমন করে? প্রভাত চিৎকার বলে উঠল—চাবি, দাও অনু। নইলে খুন করব।

লোকটা কে

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে পরাশর সেনের তখন বেশ নামডাক। এই নাম ছড়াবার পেছনে রয়েছে একটা জোড়াখুনের রহস্য উদ্ধার। যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরাশর সেই দুর্ধর্ষ খুনিকে আবিষ্কার করেছিল, তাতে তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই নিয়ে খবরের কাগজে খুব লেখালিখিও হয়েছিল একসময়।

অবশ্য এমনিতে পরাশরকে দেখলে মনে হবে ছাপোষা মানুষ। যেন ভাজা মাছটাও উলটে খেতে জানে না। কিন্তু ডিটেকটিভ হিসেবে তদন্তের কাজে ওর বুদ্ধি যেন ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। কোন পরিবেশে কোথায় কীভাবে টোপ ফেলে এগোতে হবে, সে ব্যাপারে ওর জুড়ি মেলা ভার।

গড়িয়ার কাছে বড়ো রাস্তার ওপরই পরাশরের অফিস। অফিস মানে ছোট্ট একটা ঘর। বেশ সাজানো—গোছানো। সেখানে হারু নামে একটা ছোকরা সারাদিন ঘর খুলে বসে কাটায়। প্রয়োজনে—অপ্রয়োজনে ফাই—ফরমাস খাটে, চা—ফা এনে দেয়। অফিসে কে এল না এল তা নোট করে রাখে। এ ছাড়া কখনো বা ব্যাঙ্কে যাওয়া, পোস্ট অফিসে যাওয়া, কাউকে কোনো চিঠি দিয়ে আসা ইত্যাদি সব কাজই হারুকে করতে হয়।

পরাশরকে গোয়েন্দাগিরির কাজে সারাক্ষণই ঘোরাঘুরি করতে হয়। যথাবিহিত সেদিনও ছুটোছুটির কাজ সেরে সন্ধ্যা নাগাদ পরাশর অফিস ঘরে এসে ঢুকল।

ঢুকেই দেখল, হারু একটা টুলের ওপর বসে ঝিমুচ্ছে।

কী রে হারু ঘুমুচ্ছিস?

কেমন যেন চমক ভেঙে লাফিয়ে ওঠে হারু, আজ্ঞে না স্যার। আসলে—, বোকার মতো একটু হাসে। আসলে স্যার সারাদিন একা একা বসে ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।

তা অবশ্য ঠিক। তোকেও আর দোষ দিয়ে লাভ নেই। সারাদিন ওরকম বসে থাকলে ঘুম পাওয়ারই কথা। ঠিক আছে একটা কাজ কর দেখি। খাতাটা দে, কে কে এসেছিল একবার দেখে নিই।

আজ্ঞে স্যার, আজ কেউ আসেনি, একটা মাছিও না স্যার।

সে কি রে? কেউ না!

হারু আবার বোকার মতো তাকায়, মাথা চুলকোয়।

ঠিক আছে, তাহলে একটু চা—ই নিয়ে আয়। চা—টা খাইয়ে তুই বাড়িও চলে যেতে পারিস। মিছিমিছি বসে থেকে আর কি করবি।

হারু চায়ের কেটলিটা হাতে নিল। তারপর ছুটে গিয়ে চা নিয়ে এসে পরাশরকে একটা কাপে ঢেলে দিল। নিজেও একটু নিল। তারপর চা খাওয়া হয়ে গেলে বোকার মতো একটু হাসল আবার।

কী হল, হাসছিস যে? বললাম তো তুই যেতে পারিস। আমি বরং আর একটু বসেই যাই। চাবিটা এখানে রেখে যা।

হারু তাই করে। চাবিটা রেখে চলে গেল।

পরাশর ঘড়ি দেখল। সবে সাতটা। তার মানে এখনও সন্ধ্যাই বলা যেতে পারে। চেয়ারে হেলান দিয়ে পা দুটো সামনের দিকে টেনে লম্বা করে ছড়িয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হওয়ায় নতুন

কেস হিস্ট্রির ফাইলটা পাশের র‍্যাক থেকে টানতে গিয়ে দরজার দিকে চোখ পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। পর্দার ওপাশে কেউ একজন যেন দাঁড়িয়ে।

কে? টান টান হয়ে বসে জিগ্যেস করে পরাশর।

বাইরে থেকে কেমন একটা মিনমিনে গলা, ভেতরে আসতে পারি স্যার?

আসুন। ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?

পর্দা সরিয়ে লোকটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। কেমন যেন ইতস্তত ভাব। একটু কথা ছিল স্যার।

লোকটার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিল পরাশর। বছর পঞ্চাশেক বয়স। পরনে ময়লা ধুতি, গায়ে কলার ছেঁড়া শার্ট, পায়ে ছেঁড়া—ফাটা চপ্পল। কিন্তু এসব যেমন—তেমন, লোকটার কপালের পাশে একটা টিউমার। ছোটোখাটো একটা আপেল যেন ওখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আর চোখ দুটোও কেমন যেন মিয়োন।

কি ব্যাপার, বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বসবার জন্য একটা চেয়ার দেখিয়ে দেয় পরাশর।

লোকটা এগিয়ে এসে চেয়ারে বসে।

কী কথা বলুন এবার?

আগন্তুক ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর পরাশরের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, একটা খুনের ঘটনা স্যার।

খুনের ঘটনা, মানে! পরাশর কেমন সোজা হয়ে বসে। কোথায় খুন, কে খুন করল?

খুন করে স্যার বডিটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

পরাশর কেমন বোকার মতো তাকায়। তারপর নোট করার জন্য ডায়েরি বুকটা টেনে নেয়, একটু খুলে বলুন দেখি। কোথায় খুন, কাকে? কেমন যেন উত্তেজনা বোধ করতে থাকে পরাশর।

অথচ লোকটা নির্বিকার। শীতলভাবেই বলল, আপনি যদি বডিটা দেখতে চান স্যার দেখাতে পারি। তবে খুনি কিন্তু বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাই স্যার এই অসময়ে আপনাকে খবরটা দিতে এলাম।

পরাশর লোকটাকে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, লোকটার মাথায় কোনো গোলমাল নেই তো! কিন্তু না, তাও তো মনে হয় না। বলল, আচ্ছা দাঁড়ান, চা খাবেন?

না স্যার, আমি চা খাই না। তা ছাড়া স্যার, এদিকে যদি দেরি করেন লোকটা কিন্তু পালিয়ে যাবে। আজ রাতের ট্রেনেই ও বোম্বাই পালাবে বলে ঠিক করেছে। টিকিটও কাটা হয়ে গেছে ওর।

পরাশর বলল, কিন্তু ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন তো। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে, কে সে?

বেশি দূরে নয় স্যার। এই গড়িয়াতেই, খালের ধারে। একটা বহুকালের পুরোনো বাড়িতে।

ঠিকানা বলুন?

ঠিকানা বলল লোকটা। পরাশর চটপট তা লিখে নিল।

বেশ, এবার চলুন, কে খুন হয়েছে আর কেই বা খুন করেছে? কী নাম তার?

যে খুন করেছে স্যার তার নাম সি দাস মানে চণ্ডী দাস। মহা ফেরেববাজ লোক, ডেঞ্জারাস।

বটে। কাকে খুন করেছে?

আজ্ঞে স্যার ওরই এক পার্টনার অম্বিকা রায়কে। টাকাপয়সা নিয়ে দু—জনের মধ্যে অনেক দিন ধরেই ঝগড়া চলছিল। আজই স্যার সকালে নিজের বাড়িতে অম্বিকাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মওকা বুঝে খুন করে।

আজ সকালে! কীভাবে খুন করল?

বাড়িটা স্যার এমনিতেই খুব নির্জন। চণ্ডী ছাড়া আর কোনো লোক থাকে না ওখানে। দু—জনে ঘরের ভিতর বসে কথা বলছিল। হঠাৎ সুযোগ বুঝে চণ্ডী একটা চপার দিয়ে ওর মাথায় একটা কোপ মারে। আর

তাইতেই স্যার।...

বটে, তা আপনি জানলেন কী করে? আপনি কি দেখেছেন?

লোকটা কী যেন একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আর ঠিক তখনই কেলেঙ্কারি। টুক করে আলো নিভে গেল। পরাশর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুঝল, লোডশেডিং।

লোকটা বলল, আমি তাহলে যাই স্যার। খুনের খবরটা আপনাকে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এবার আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।

বলতে বলতে লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে টের পেল পরাশর। সে কি মশাই, কোথায় যাচ্ছেন? কথাই তো হল না? তা ছাড়া স্পটটা দেখাবেন তো আমাকে?

সেখানে আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না স্যার। আপনি একাই চলে যান। এখনই গেলে চণ্ডীবাবুকে পেয়ে যাবেন। ওকে জিগ্যেস করলেই সব জানতে পারবেন।

টুক করে ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল আগন্তুক।

পরাশর কেমন বোকার মতো তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল, ঘরের ভিতর এভাবে এখন বসে থাকারও মানে হয় না। একটু কী ভেবে জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। চারপাশে তাকাল, না, লোকটা উধাও।

অদ্ভুত ব্যাপার। পাগল না তো। হঠাৎ করে এসে একটা মার্ডারের কথা শুনিয়ে গেল, অথচ চোখে—মুখে ওর বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই। নাকি আমাকে খানিকটা হ্যারাস করার জন্যই ব্যাপারটা করে গেল! কে জানে!

আবার ভাবল, নাহ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাত তো এখন সবে সাড়ে সাত। দেখাই যাক না চণ্ডীবাবু নামে কাউকে পাওয়া যায় কি না।

ঘরে তালা লাগিয়ে ডায়েরিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পরাশর। আর রাস্তায় পা দিয়ে খানিকটা এগোতেই আবার আলো জ্বলে উঠল চারপাশে। যাক বাবা, বাঁচা গেল। অল্পের ওপর দিয়েই লোডশেডিং কাটল।

তারপর হাঁটতে শুরু করে পরাশর। এ—রাস্তা সে—রাস্তা করে শেষটায় নম্বর মিলিয়ে এসে হাজির হল চণ্ডীবাবুর বাড়ির সামনে। আবার ঘড়ির দিকে তাকাল, আটটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। কিন্তু এরই মধ্যে পাড়াটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ।

বাড়িটার দিকে তাকাল। বহু পুরোনো আমলের বাড়ি। দেয়াল ফুঁড়ে গাছ গজিয়ে আছে। সামনের দিকে বাগান মতো অনেকখানি জায়গা। ঝোপজঙ্গলে ভরে রয়েছে। কেউ যে এরকম একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে বাস করে ভাবাই যায় না।

পরাশর দেখল, বাড়ির সব ক—টা দরজা—জানালাই বন্ধ। তবে পাশের দিকে একটা ঘরে যে আলো জ্বলছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে কলিং বেল টিপল পরাশর।

আর, কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। কে?

পরাশর দেখল, মধ্যবয়সি একজন লোক। পরনে প্যান্ট—শার্ট। পায়ে শু। একটু যেন ব্যস্তসমস্ত ভাব।

আমি একটু চণ্ডীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বলুন কী দরকার। আমার কিন্তু একদম সময় নেই। ট্রেন ধরতে হবে।

পরাশর বলল, আপনি যে বোম্বে মেল ধরবেন সেটা আমি জানি। ট্রেন ক—টায়?

ভদ্রলোক কেমন যেন একটু চমকে উঠলেন, তার মানে, কে আপনি? আপনি কী করে জানলেন আমি বোম্বাই যাচ্ছি!

পরাশর মাথা ঠান্ডা রাখে। না দেখুন, বোম্বেতে আপনি ক—দিন থাকবেন? কোথায় উঠবেন? এসবও আমার জানা দরকার।

চণ্ডীবাবুর চোখ—মুখের চেহারাই যেন পালটে গেছে। একপলক ভ্রূ বাঁকা করে পরাশরের দিকে তাকালেন, এসব আপনি জিগ্যেস করার কে? কে আপনি?

এরকম পরিস্থিতিতে কীভাবে কথা বলতে হয় পরাশরের জানা। বলল, দেখুন চণ্ডীবাবু, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। সেখানেই জানতে পারবেন আমি কে?

হোয়াট ডু ইউ মিন? থানায় কেন? কী করেছি আমি? যান যান মশাই, থানা দেখাবেন না। আমার এখন সময় নেই। যান।

বলতে বলতে ভদ্রলোক আবার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

পরাশর কেমন বোকার মতো তাকিয়ে রইল। সন্দেহটা মাথার মধ্যে বেশ দানা বেঁধে উঠল। কিছুতেই লোকটাকে এখন হাতের বাইরে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হল, ও তো একদম খালি হাত—পা। আবার লোকটা তো খুনি আসামী, ও না পারে হেন কাজ নেই।

টুক করে ঘরের আলোটা নিভে গেল। নিভে যেতেই চমকে উঠেছিল পরাশর। চণ্ডীবাবু একটা স্যুটকেস হাতে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, ও কী, এখনও আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। বললাম, জরুরি কাজে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। এখনই না বেরোলে ট্রেন ধরতে পারব না।

বলতে বলতেই ভদ্রলোক ঘরে তালা লাগিয়ে স্যুটকেস হাতে সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

পরাশর কী করবে বুঝতে পারে না। লোকটাকে কি ফলো করা উচিত? আবার মনে হল, ফলো করে কী লাভ, তার চেয়ে থানাতেই যাই, থানাকেই ব্যাপারটা আগে জানানো দরকার।

হঠাৎ পেছন থেকে কার একটা গলার আওয়াজ, স্পটটা একটু দেখে যাবেন না স্যার?

কে? পরাশর চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে দেখে, আরে এ তো সেই লোকটাই। খানিকক্ষণ আগে ওর চেম্বারে গিয়ে খুনের খবরটা ওকে দিয়ে এসেছিল।

আপনি!

হ্যাঁ স্যার আমি। চণ্ডী তো আপনাকে পাত্তাই দিল না দেখলাম। ও তো একটা ট্যাক্সি চেপে সটান হাওড়ার দিকে চলে গেল।

আপনি কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

লোকটার সেই মিয়োন চোখ, আসুন না, জায়গাটা আপনাকে দেখিয়ে দিই। খুন করে কোথায় মাটি চাপা দিয়েছে দেখে যান।

বাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে যেতে থাকে লোকটা। পরাশরও ওর পিছু নেয়। এককালে এদিকেও বাগান ছিল বোঝা যায়। এখন বাগানের বদলে জংলা গাছে ঠাসা। বাউন্ডারি ওয়ালটা এদিকে বেশ উঁচু।

এই বাউন্ডারি ওয়ালের ওপাশেই স্যার খাল।

তাই বুঝি!

আর ওই কোণের দিকে দেখুন স্যার। লোকটা আঙুল তুলে দেখায়।

পরাশর দেখে দেওয়ালের এক পাশে ময়লা জঞ্জালের স্তূপ। তারই ওপর একটা ভাঙাচোরা ড্রাম বসানো।

ওই যে স্যার ময়লা ফেলার ড্রামটা দেখা যাচ্ছে, ওটা একটু সরালেই দেখা যাবে, গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। বডিটাকে একটা বস্তায় ভরে ওখানে পুঁতে রাখা হয়েছে।

পরাশর এগিয়ে গেল ড্রামটার কাছে। ড্রামটা সরাবার জন্য হাত বাড়াতেই লোকটা হাঁ হাঁ করে উঠল, না স্যার, আপনি হাত দেবেন না। আগে পুলিশকে আসতে দিন। পুলিশের সামনেই বডিটা বার করা ভালো।

পরাশর হাত সরিয়ে নিয়ে পিছিয়ে এল। পুলিশকে তাহলে এখনই খবরটা দিতে হয়।

পুলিশ এখনই এসে পড়বে স্যার। ওই তো জিপের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

হ্যাঁ, একটা গাড়ি আসার শব্দই যেন পাচ্ছে পরাশর। সদর গেটের দিকে এগিয়ে গেল। সত্যিই একটা পুলিশ ভ্যানই এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য পুলিশও জেনে গেছে তাহলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। ভ্যান থেকে নেমে এলেন ওসি।

এই যে পরাশরবাবু, কী ব্যাপার, তলব করেছেন কেন?

পরাশর একটু অবাক হয়, তলব করেছি, কই আমি না তো। তবে আপনারা এসে পড়ায় খুব ভালো হয়েছে।

সে কি মশাই, খানিকক্ষণ আগে তাহলে কে ফোন করল আমাদের। খুব জরুরি দরকার, আপনি অপেক্ষা করছেন, ফোর্স নিয়ে এখনি এই ঠিকানায় চলে আসতে বলেছেন আপনি।

কেমন রহস্যময় লাগে পরাশরের। কিন্তু তখন আর ওসব কচকচি বাড়িয়ে লাভ নেই। বলল, এ বাড়িতে ভীষণ একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটে গেছে। বাড়ির পেছন দিকে মাটির নীচে দারুণ এক রহস্য লুকোনো রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

তাই নাকি। কী রহস্য? চলুন তো দেখি।

খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়ে গেল। ড্রামটা সরিয়ে খানিকটা মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল বস্তাবন্দি একটা মৃতদেহ।

টেনে উপরে তুলে আনা হল বডিটাকে। তারপর টর্চের আলোর মধ্যে বস্তাটা কেটে সরাতেই চমকে ওঠে পরাশর। আরে এ কি করে সম্ভব! পরনে ধুতি, গায়ে শার্ট। আরও আশ্চর্য লোকটার কপালের পাশে সেই আপেলের মতো টিউমারটাও।

কী হল?

পরাশর চারপাশে তাকায়। কিন্তু এতক্ষণ যে লোকটার সঙ্গে ও কথা বলল, সে কোথায়?

কে কোথায়, কার কথা বলছেন?

পরাশর এবার ভয়ে ভয়ে তাকায়। জানেন ওসি, অবিকল এরকম চেহারারই একটা লোক আমার চেম্বারে খুনের ঘটনার খবরটা দিতে গিয়েছিল। আবার কিছুক্ষণ আগেও লোকটা এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেছে। অবিকল এই চেহারা। এরকম ধুতি—শার্ট, কপালের টিউমারটাও।

তার মানে আপনি বলছেন—

বিশ্বাস করুন ওসি, আমার মনে হচ্ছে এই লোকটার আত্মাই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। থানায় যে ফোনটা গিয়েছিল সেটাও বোধহয় ওরই কীর্তি।

তাই নাকি! পুলিশ অফিসারও কেমন বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর সোজা হাওড়া স্টেশনে। বম্বে মেলেই পাওয়া গেল চণ্ডীকে। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। পুলিশের কাছে চণ্ডী স্বীকার করল, বন্ধুকে সেই হত্যা করেছে।

আশ্বিন ১৪০১

মোতিবিবির দরগা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কী এক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। যেন দরজা খোলার শব্দ। চোখ খুলে দেখি, ঘর অন্ধকার। একটু অবাক লাগল। আমার অভ্যাস জানালা খুলে রাখা। কেন জানালা বন্ধ করে শুয়েছি কয়েকমুহূর্ত ভেবেই পেলাম না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল সব কথা। অমনি ওঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। শরীরে এতটুকু জোর নেই। মাথার ভেতরটা শূন্য লাগছে। তেষ্টাও পেয়েছে তাই ওঠা দরকার। মনে পড়ছে, কোনার দিকে কুঁজোয় জল রেখে গেছে দরবেশ সায়েব। বলে গেছে, অসুবিধা হলে ডাকবেন। পাশের ঘরেই আছি। কিন্তু ডাকতে গিয়ে টের পেলাম, গলায় আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

কেন যে এই অলক্ষুণে বাসটায় চেপেছিলাম! অত ভিড়ের বাসে চাপার অভ্যাস নেই। পারি না। ইচ্ছে করলে বন্ধুর বাড়িতে রাতটা আরামে কাটিয়ে আসতে পারতাম। ভোরের বাসটা নাকি খালিই যায়। অথচ কী এক ভূতুড়ে জেদ আমাকে পেয়ে বসেছিল। সন্ধ্যার দিকে আগাপাছতলা লোকে ঠাসা বাসটা এসে দাঁড়াতেই নির্বোধের মতো গুঁতো মেরে ঢুকে গেলাম। পাদানিতে অনেকগুলো পায়ের ওপর পা রেখেছিলাম। ওরা আপত্তি করেছিল। বাসটা স্টার্ট দিয়ে খুব জোরে চলতে শুরু করল। প্রায় মাইলটাক ঝগড়াঝাঁটি চলতে থাকল গেঁয়ো লোকগুলোর সঙ্গে। তারপর কে যেন আমাকে হ্যাঁচকা টানে চলন্ত বাস থেকে টেনে নামাল। অর্থাৎ আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস পিচের ওপর পড়িনি। রাস্তার ধারে পুরু ঘাসের ওপর পড়ে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

যখন জ্ঞান হল, টের পেয়েছিলাম সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে অদ্ভুত একচোখো একটা লণ্ঠন। লণ্ঠনটার আলোর রং নীল। এমন নীল কাতে ঢাকা বাতি নিয়ে মানুষ ঘোরাঘুরি করে, কস্মিনকালে দেখিনি। আলোর পেছনে আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম লোকটাকে। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড। সে আলোটা আমার পাশে রেখে গম্ভীর গলায় বলেছিল—কে আপনি? এভাবে রাস্তার ধারে শুয়ে আছেন কেন? নেশা করেছিলেন বুঝি?

অত কষ্টের মধ্যে হাসি পেয়েছিল!—মাতাল নই। বাস থেকে পড়ে গেছি। তারপর কী হয়েছে, জানি না।

—সে কী! বলে লোকটা আমার পাশে ঝুঁকে এসেছিল। তারপর লণ্ঠনটা তুলে পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিয়ে বলেছিল—জখম হয়নি তো?

—বুঝতে পারছি না। রক্তটক্ত দেখতে পেলেন কি?

—না। তবে হাড়ে আঘাত লাগতেও পারে। টের পাচ্ছেন না কিছু?

—কে জানে!

—ওঠার চেষ্টা করুন তাহলে। কাছেই আমার ডেরা।

এখন যেমন শরীরের অবস্থা তখনও ঠিক এমনি ছিল। লোকটা শেষে আমাকে দু—হাতে শূন্যে উঠিয়েছিল। তারপর ফের জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

দ্বিতীয়বার জ্ঞান ফিরে দেখেছিলাম এই ঘরে শুয়ে আছি। খাটিয়ায় বিছানার ওপর। সেই নীল আলোর লণ্ঠনটা নেই। ঘরের মেঝেয় একটা হেরিকেন রয়েছে। আর আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলখাল্লাধারী নীল লম্বাচওড়া এক দরবেশ। কালো আলখাল্লা। গলায় লাল—নীল পাথরের মালা। কাঁচাপাকা

চুল ও দাড়ি। খাড়া নাক। লালচে টানাটানা চোখ। তার হাতে একটা গেলাস। আমাকে চোখ খুলতে দেখে বলেছিল—শরবতটা খেয়ে নিন। কই, হাঁ করুন। খাইয়ে দিচ্ছি।

একটু ঝাঁঝালো সুগন্ধ সেই শরবত কয়েক ঢোক গেলামাত্র আমার শরীরে যেন বিদ্যুতের খেলা শুরু হয়েছিল। ভয় পাওয়া গলায় বলেছিলাম—এ কীসের শরবত?

দরবেশ হেসেছিল—ভয় পাবেন না। বিষ নয়। খুব উপকারী দাওয়াই আছে ওতে। এক্ষুনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

একেবারে সুস্থ হতে না পারলেও উঠে বসার শক্তি ফিরে পেয়েছিলাম। তারপর ওঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। জানতে পেরেছিলাম, বিশাল মাঠের মধ্যে এক দিঘির ধারে নির্জন দরগায় আমি আশ্রয় পেয়েছি। এর নাম মোতিবিবির দরগা। এক তপস্বিনীর কবর আছে এখানে। তার ওপর একটা পাথরের ঘর আছে। সেই ঘরে দরবেশ থাকে। পিদিম জ্বালে। আগরবাতি পোড়ায়। সাধনা—টাধনা কী সব করে। এই ঘরটা পরে ইট দিয়ে বানানো হয়েছিল। ভক্ত বা দৈবাৎ বিপদে পড়ে কেউ এলে তাকে এ ঘরে থাকতে দেওয়া হয়।

কিছুক্ষণ পরে দরবেশ আমাকে খান দুই মোটা রুটি আর খানিকটা গুড় দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—মেহেরবানী করে এই দিয়েই খিদে মিটিয়ে নিন। আমি ফকির। বুঝতেই পারছেন...

—এই যথেষ্ট। তবে খিদে আমার বিশেষ নেই। আপনি এগুলো...

দরবেশ আপত্তি করেছিল।—না, না। আপনার কিছু খাওয়া দরকার। খেলেই গায়ে জোর হবে। আল্লার দয়ায় আপনি বেঁচে গেছেন। ওভাবে চলন্ত বাস থেকে পড়লে মানুষ বাঁচে না। যদি বা বাঁচে, হাড়গোড় আস্ত থাকে না।

আমার হাড়গোড় আস্ত আছে, তা ঠিক। কিন্তু শরীর এত দুর্বল হয়ে গেছে কেন বুঝতে পারছি না। দরবেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতেই রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরেছিলাম।

ফের সেই শব্দটা হল।

খুব পুরোনো জংধরা লোহার কপাট খোলার মতো শব্দ। কিন্তু কিছুটা চাপা। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ঘর। অন্তত তেষ্টা মেটানোর জন্যে যথাশক্তি চেষ্টা করলাম উঠে বসতে। তারপর মনে পড়ল, পানজাবির পকেটে দেশলাই আর প্যাকেটটা আছে। সিগারেটও আছে। পানজাবিটা মাথার কাছে রেখেছিলাম। অতিকষ্টে হাত বাড়িয়ে দেশলাই আর প্যাকেটটা বের করলাম। দেশলাই জ্বেলে কুঁজোর কাছে গেলাম। মাথা ঘুরছে। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে, আবার জ্ঞান হারাব। কুঁজোর মুখে গেলাস আছে। দেশলাই কাঠিটা নিভে গেল। আন্দাজ করে জল ঢেলে চোঁ—চোঁ করে গিলে ফেললাম। তারপর খাটিয়ায় ফিরে এসে সিগারেট ধরালাম।

তৃতীয়বার দরজা খোলার মতো বিশ্রী চাপা শব্দটা শোনা গেল। তারপর মনে হল, বাইরে এইমাত্র যেন ঝড় এসে পড়েছে। শন—শন শোঁ—শোঁ আওয়াজ বাড়তে থাকল। ছোট্ট দুটো জানালা আছে দুদিকে। একটা জানালা আচমকা খুলে গেল। ঘরে হু—হু করে ঢুকে পড়ল ঝড়টা। কষ্ট করে উঠতেই হল। জানালাটা বন্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালে পারলাম। কিন্তু জানালাটা কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না। ঘরের ভেতর খড়কুটো ধুলোবালি ঢুকে পড়ছে ঝড়ের সঙ্গে। বাইরের ঘরে যেন কালো অন্ধকারে কী এক প্রাণী যেন হুলস্থূল বাধিয়েছে। তারপর বিদ্যুৎ ঝিলিক দিতে থাকল। বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও। তখন ভাঙা গলায় ডাকার চেষ্টা করলাম—দরবেশ সায়েব। দরবেশ সায়েব!

কোনো সাড়া এল না। দরজা অনুমান করে পা বাড়ালাম। দরজাটা খুঁজে পাওয়ার পর যেই ছিটকিনি খুলতে গেছি, কানে এল চেরা গলায় সুর ধরে কেউ গান করছে বাইরে।

এই দুর্যোগের রাতে নির্জন দরগায় দরবেশের হঠাৎ গান করার ইচ্ছে কেন, জানি না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় যেন হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নিল। বারান্দায় ছিটকে পড়লাম। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে

বললাম—আমার জ্ঞান হারালে চলবে না। মাথা ঠিক রাখতেই হবে।

বারান্দার সামনে বিদ্যুতের আলোয় ছোট্ট একটা উঠোন আর ইঁদারা চোখে পড়েছিল। দরবেশের ঘরের দিকে দেওয়াল ধরে এগোতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল, বিদ্যুতের আলোয় মুহূর্তের জন্যে একটা সাদা ঝলসানো মূর্তি এবং মূর্তিটি স্ত্রীলোকের তাতে ভুল নেই—ইঁদারার ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম—কে? কে ওখানে?

ফের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। ফের দেখতে পেলাম মূর্তিটা। কিন্তু এবার সে ইঁদারার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। ভূতে বিশ্বাস নেই। কিন্তু ভয়ংকর রাতে নির্জন দরগায় সেই বিশ্বাসের ভিত্তিটা নড়বড়ে হতে বাধ্য। ওদিকে সেই চেরা গলায় গানটা সমানে শোনা যাচ্ছে। আমি মরিয়া হয়ে ফের দরবেশকে ডাকলাম। তারপর দরবেশের ঘরের দরজায় জোরে ধাক্কা দিলাম।

দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে পিদিম জ্বলছে কালো একটা বেদির শিয়রে। দরবেশ নেই। এ দিকটা ঝড়ের উলটোদিকে। তাই ঘরে ঝড়টা ঢুকছে না। ইঁদারার ধারে মেয়েটিকে ভূত ধরে নিয়েই আমি আক্রান্ত প্রাণীর মতো ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং কাঁপতে কাঁপতে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

হ্যাঁ, বেদিটাই কবর এবং সম্ভবত কষ্টিপাথরে তৈরি। ফার্সিতে কী সব লেখা আছে। কিন্তু পরক্ষণে চমকে উঠলাম। বেদির ওপাশে তিনটে মড়ার মাথার রয়েছে। আবছা আলোয় মাথাগুলো বিকট দেখাচ্ছে। আরও ভয় পেলাম।

এমন সময় বাইরে সেই গানটা থেমে গেল এবং মনে হল প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

বেদি থেকে একটু তফাতে কম্বলের আসন পাতা ছিল। সেখানে গিয়ে বসে পড়লাম। তারপর আশ্চর্য, বন্ধ করে রাখা দরজাটা হঠাৎ মচ মচ করে উঠল। তারপর খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেদির পিদিমটা নিভে গেল।

দরজার সামনে সেই নীল একচোখা লণ্ঠন হাতে দরবেশ দাঁড়িয়ে আছে। সে আলোটা ঘরের ভেতর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিঃশব্দে কিছু দেখে নিল। তারপর বেদির দিকে ঘুরিয়ে রাখল।

দরবেশ আমাকে লক্ষও করল না। তার সিল্যুট মূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দারুণ চমকে উঠলাম। এ কি কোনো জীবিত মানুষের মুখ হতে পারে? দৃষ্টি কেমন অদ্ভুত—নিষ্পলক, শূন্য। হাঁটু ভাঁজ করে পুতুলের মতো বসে পড়ল সে কবরের সামনে। তেমনি মৃতের চোখে তাকিয়ে বসে রইল। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। ঝড়ের শব্দ। বজ্রপাতের ভয়ংকর শব্দ। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর শেষ মুহূর্তটি আসন্ন। এদিকে বেদির মতো কবরের ওপর লম্বাটে নীল আলো থেকে ক্রমশ ধূপের ধোঁয়ার মতো ধূসর বা নীল কী আবছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। তারপর নাকে তীব্র হয়ে ঝাপটা দিল একটা কড়া সুগন্ধ। সুগন্ধটা অসহ্য লাগছিল। চেতনা অবশ করে দিচ্ছিল।

তার আতঙ্কে কাঠ হয়ে দেখলাম, ইঁদারার ধারের সেই মেয়েটি যেন শূন্যে ভেসে এল এবং ধোঁয়ার মতো দরবেশকে ভেদ করে এগিয়ে বেদির ওপর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

নীলাভ শরীর তার—হয়তো নীল আলোটাই এর কারণ হতে পারে। সে সুন্দর, না কুৎসিত, না সাধারণ—বুঝতে পারছি না। হয়তো সেই বোধও হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু সে একেবারে নগ্ন।

আমার তন্ময়তা ভেঙে গেল। দরবেশ ফের চেরা গলায় গান গেয়ে উঠল। কিন্তু এবার সুরটা অনেকটা মিঠে এবং চাপা। ঘুমঘুম আচ্ছন্নতায় দুর্বোধ্য কী এক গান গাইছে সে। সুরটাও অপরিচিত। একটু একঘেয়েও। কিছুক্ষণ পরে নগ্ন নারীমূর্তিটি বেদির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার দিকে তাকাল এবং তার চমকও টের পেলাম। সে অস্ফুটস্বরে একেবারে মানুষের গলায় আমার দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল—ও কে?

সঙ্গে সঙ্গে দরবেশ ঘুরল আমার দিকে। প্রচণ্ড গর্জন করে বলল—বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান বলছি। কেন এ ঘরে ঢুকেছেন আপনি?

নীল আলোটাও নিভে গেল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এখন। বাইরে ঝড়বৃষ্টি সমানে চলছে। অন্ধকারে একটা হাত এসে আমার কাঁধে খামচে ধরল। তারপর দরবেশ আমাকে টেনে ওঠাল এবং একটা থাপ্পড়ও মারল গালে।

ব্যাপারটা অপমানজনক। কিন্তু বাধা দেবার বা প্রতিবাদের ক্ষমতাও ছিল না এতটুকু। অসহায়ভাবে তার হ্যাঁচকা টানে কতকটা শূন্যে ভেসে চললাম। এই দৈত্যের কাছে আমি নেহাত বামন।

ভেবেছিলাম, আমাকে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বের করে দেবে। কিন্তু তেমন কিছু করল না। পাশের সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ফেলে দিল। তারপর ধমক দিয়ে বলল—খবর্দার, আর বেরুবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে আপনাকে বাঁচাতে পারব না। হুঁশিয়ার!

সে বাইরে থেকে দরজা আটকে দিল। আমি ভাবতে থাকলাম, ব্যাপারটা কি স্বপ্নে ঘটছে? নাকি সেই উগ্র আরক মেশানো শরবতের নেশায় যত সব উদ্ভট কাণ্ড দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু না তো! আমি সজ্ঞান পুরোপুরি—যদিও শরীরে প্রচণ্ড দুর্বলতার দরুন মাথাটা ঝিমঝিম করছে। দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেট বিছানায় রেখেছিলাম। খুঁজে নিয়ে প্রথমে লণ্ঠনটা জ্বালালাম। তারপর সেই জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। ঘরের মেঝেয় যথেষ্ট বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়েছে ততক্ষণে। বিছানার একটা পাশ ভিজে গেছে।

সিগারেট টানতে টানতে সেই দৃশ্যটা আগাগোড়া ভাবতে থাকলাম ফের! যা দেখলাম, তা বাস্তব, না অবাস্তব? সত্যি দেখেছি, না স্নায়ুবিকার?

শেষে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পেরে লণ্ঠনটা নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে তখন ঝড়বৃষ্টির জোরালো ভাবটা অনেক কমেছে। শীতবোধ হচ্ছে! পানজাবিটা পরে ধুতির কোঁচাটাও খুলে গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরে ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, ফের কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

এবারকার শব্দটা দরজা খোলার মতো নয়। কেউ কি আর্তনাদ করল কোথাও? ঘুম ভাঙার পর কয়েক সেকেন্ড তার জের ছিল। দৃঢ় বিশ্বাস হল, একটা প্রচণ্ড আর্তনাদই শুনেছি।

দরবেশকে ডাকা বৃথা। তাছাড়া লোকটার অমন ভূতুড়ে ব্যাপার—স্যাপার এবং আমার প্রতি অমন আচরণ—মন বিষিয়ে গেল।

কান পেতে থাকলাম। আর কোনো আর্তনাদ নয়। কিন্তু কে যেন চাপা গলায় কাঁদছে বাইরে। বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে। নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও বড়ো গাছ আছে। তার পাতা থেকে জল ঝরছে। ঝড়টা থেমেছে।

বদ্ধ ঘরে দম আটকে আসছিল। লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। ঘরে বিষাক্ত গ্যাস জমার ভয়ে। এবার উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলাম। বৃষ্টি টিপটিপ করে পড়ছে। দূর দিগন্তে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু মেঘ ডাকছে না।

লণ্ঠনটা আর জ্বালালাম না। কান্নার শব্দ সমানে শোনা যাচ্ছিল। পা টিপেটিপে এগিয়ে সাবধানে নিঃশব্দে দরজা খুললাম। তারপর বারান্দায় গেলাম। তেমনি অন্ধকার হয়ে আছে বারান্দা। কান্নার শব্দটা কবরের ঘর থেকেই আসছে।

নিঃশব্দে ও—ঘরের দরজায় উঁকি দিলাম। সেই নীল আলোটা তেমনি লম্বাটে হয়ে বেদির ওপর পড়ে আছে। তারপর যা দেখলাম, আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলাম। এত ভয়ংকর দৃশ্য কখনো দেখিনি।

বেদির ওপর মাথা রেখে দরবেশ চিত হয়ে দু—হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে। এবং তার গলাটা জবাই করা। চাপ চাপ টাটকা রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। চোখ দুটো তেমনি নিষ্পলক।

সেই মেয়েটির সিল্যুট নগ্ন মূর্তি বেদির পাশে এবং সে দু—হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার কালো একরাশ চুল সামনের দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। দু—হাঁটু ভাঁজ করে একটু ঝুঁকে বসে সে বিলাপ করছে।

কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মাথা ঘুরতে থাকল। যা দেখতে পাচ্ছি, তা কি স্বপ্নে, না বাস্তবে? কী করা উচিত ভেবে পেলাম না। আতঙ্কে কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

তারপর কী একটা আমার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল।

একটা কালো প্রকাণ্ড বেড়াল।

বেড়ালটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কান্না থামিয়েছিল। সে মুখ তুলে বেড়ালটাকে দেখতে থাকল। বেড়ালটা রক্ত চাটতে চাটতে ভয়ংকর মুখ তুলে যেন আমাকেই লক্ষ করছিল মাঝে মাঝে। এর ফলে স্নায়ুর ওপর বারবার আঘাত আসছিল। অসহ্য লাগায় একটু সরে গেলাম।

এইসময় ডাইনে ঘুরে আরেক বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম।

অন্ধকারে একটু দূরে তিনটে আলো আসছিল। হঠাৎ তিনটে আলো মিলেমিশে একটা হয়ে গেল এবং প্রকাণ্ড আলোটা হলুদ বলের মতো ভাসতে ভাসতে এসে স্থির হল। তারপর আলোটা বুদবুদের মতো অনেকগুলো ভাগ হয়ে গেল।

এদিকে আসছে দেখে আমি দ্রুত পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম এবং দরজা নিঃশব্দে ভেজিয়ে কপাটের ফাঁকে চোখ রাখলাম।

আলোগুলো বুদবুদের মতো এবং এত চঞ্চল যে গোনা যাচ্ছে না। অনুমান করলাম এক ডজনের কম নয়।

আলোগুলোর কিন্তু একটুও ছটা নেই। অর্থাৎ কোনো কিছুকে আলোকিত করছে না।

আলোগুলো নাচতে নাচতে এসে বারান্দায় উঠল এবং কবরের ঘরেই ঢুকল, তা ঠিক। তারপর ওঘরে চাপা গলায় কারা কথা বলছে শুনলাম।

কয়েক মিনিট পরে দেখি, মেয়েটি সেই নীল লণ্ঠন নিয়ে বেরুল। আবছা দেখা যাচ্ছিল, তার পরনে এখন শাড়ি রয়েছে। তার পেছনে পেছনে অনেকগুলো সিল্যুট মূর্তি যেন শূন্যে হেঁটে যাচ্ছে। বেড়ালটাকে দেখতে পেলাম না।

ওরা অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কবরের ঘরের দরজা খোলা। আলো তুলে ধরে দেখি, দরবেশের জবাই করা শরীরটা তেমনি পড়ে আছে এবং গলার ফাঁকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এক ফোঁটা রক্ত নেই। বেড়ালটা সব চেটে—পুটে খেয়ে ফেলেছে।

ঘরের ভেতর লণ্ঠনটা ঢোকাতেই কালো বেড়ালটা কোনার দিকে বসে আছে দেখতে পেলাম। সে নীল উজ্জ্বল চোখে তাকাল। মুখে রক্ত লেগে আছে।

তারপর সে দ্রুত আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেদির কাছে গিয়ে দরবেশের গায়ে হাত রাখলাম। আলখাল্লাটা ভিজে রয়েছে। নাড়িতে স্পন্দন নেই। বরফের মতো হিম শরীর।

হঠাৎ সেইসময় চোখ গেল, সেই তিনটে মড়ার মাথার দিকে।

তিনটে মুণ্ডু নড়তে শুরু করছে।

নড়তে নড়তে বলের মতো তারা আমার দিকে গড়িয়ে আসতে থাকল। আর সহ্য করতে পারলাম না। লণ্ঠনটা তাদের ওপর ছুঁড়ে মারলাম। কাচ ভেঙে গেল। তেল ছড়িয়ে আগুন ধরে গেল। তার মধ্যে মুণ্ডু তিনটে নাচতে থাকল।

একলাফে আমি বারান্দায় পৌঁছুলাম। তারপর অন্ধকারে কীভাবে যে এগোলাম, বলার নয়। আছাড় খেলাম কতবার। কাদায় জলে জামাকাপড় আর শরীর যাচ্ছেতাই মাখামাখি হল। কিছুটা এগিয়ে আবছা ধূসর আলোয় ভরা মাঠে পৌঁছুলাম।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশের পশ্চিম—দক্ষিণ কোণে একটুকরো ভাঙা চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। সামনে পিচের পথটা দেখা যাচ্ছিল। সেখানে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। দরগার এদিকটা বিশাল পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে। কালো হয়ে আছে। বুঝলাম জায়গাটা ঘন জঙ্গলে ভরা।

রাস্তায় পৌঁছে সাহস বেড়ে গেল। হাঁটতে থাকলাম। শরীরের সেই দুর্বলতাটা আর নেই। দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। মনে পড়ল, ওধারে সেই ছোট্ট চটি। যেখান থেকে বাসে চেপেছিলাম কাল সন্ধ্যায়।

লোহাগড়া ব্লকে নিশীথ—আমার বন্ধু নিশীথ রায়চৌধুরী কৃষি অফিসার। ভোরবেলা আমাকে জলকাদামাখা ভূতুড়ে চেহারায় দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিল।

সংক্ষেপে তাকে মোটামুটি সবটাই বললাম। সে কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল—ঠিক আছে। আগে বাথরুমে ঢোক। আমার বউ বড্ড ঘুমকাতুরে। বেলা করে ওঠে। তোকে এ অবস্থায় দেখলে হুলস্থূল ঘটাবে।

কাপড়চোপড় ছেড়ে স্নান করে এবং নিশীথের পাজামা—পাঞ্জাবি পরে আরামে বসলাম। ততক্ষণে সূর্য উঠেছে। নিশীথ চা করে আনল।

চা খেতে—খেতে বললাম—এতক্ষণে কোমরে ব্যথা করছে একটু একটু।

নিশীথ বলল—ফিরে গিয়ে এক্সরে করাস। কিন্তু কথা হচ্ছে, ঝড়জলের সময় মোতিবিবির দরগায় নিশ্চয় তুই ভীষণ রকমের দুঃস্বপ্ন দেখেছিস। তা ছাড়া এর কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

—অসম্ভব! দরবেশের ডেডবডিটা নিশ্চয় এখনও আছে। বরং পুলিশে খবর দেওয়া যাক।

নিশীথ হাসল।—কী বলছিস! ওখানে কেউ থাকে না। সে রকম কোনো ঘর—টরই নেই। তবে একটা কবর আছে বটে এবং সেটা কষ্টিপাথরে তৈরি। তুই বাস থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি—তা ঠিক। জ্ঞান ফেরার পর নিশ্চয়ই ঝড়ের আশ্রয় নিতে দরগায় ঢুকেছিলি। তারপর আঘাত পাওয়ার রিঅ্যাকশনে জ্বর—টর এসে গিয়েছিল। তারপর লম্বা চওড়া একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিস।

রেগে গিয়ে বললাম—ঘর নেই তো ঝড়বৃষ্টিতে ছিলাম কোথায়?

নিশীথ বলল—নিশ্চয় দরগার বটতলায় গিয়ে ফের অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি।

—অসম্ভব। এক্ষুনি আয় আমার সঙ্গে। স্বপ্ন হতেই পারে না। আমার ব্যাগ—ট্যাগ সব ওখানে আছে।

নিশীথ একটু হেসে বলল—ঠিক আছে। তোর ভুলটা ভাঙানো দরকার। একটু পরে ব্লকের জিপটা নিয়ে বরং বেরুব।

মুর্শিদাবাদ—সাঁওতাল পরগনা সীমান্তের এই দরগাটির নাম লোহাগড়া—বরমডি রোড। বরমডিতে রেলস্টেশন আছে। সেখান থেকে আমার বাড়ি পৌঁছুনোর অসুবিধে নেই। তাই নিশীথের বউয়ের কাছে দ্বিতীয় দফা বিদায় নিয়ে বেরুলাম। হাসতে হাসতে বলল—আপনি আবার ভূতের পাল্লায় পড়ে ফিরে আসুন! তবে আপনার বন্ধুর সাহসটা বড্ড বেশি। দেখবেন, সেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে দরগায় না থেকে যায়। ও ভীষণ ন্যুডের। দেখছেন না, কত ন্যুড আর্ট টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে?

মিনিট পঁচিশ এগিয়ে রাস্তার ধারে জিপ রেখে আমরা দরগার দিকে পা বাড়ালাম।

তারপর থমকে দাঁড়ালাম। নিশীথ বলল—কী হল?

বললাম—দেখ, দেখ! সেই কালো বেড়ালটা।

একটা কালো বেড়াল ভাঙাচোরা প্রকাণ্ড চত্বরে বসে একটা থাবা তুলে গাল চুলকোচ্ছে! চত্বরের মাঝখানে কষ্টিপাথরের কবর। বেড়ালটা থাবা নামিয়ে আমাকে দেখতে থাকল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! সেই কবরটা! ফার্সিতে লেখা ফলকটাও! কিন্তু এ তো ফাঁকা জায়গায় রয়েছে। ওপাশে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। নিশীথ এগিয়ে গিয়ে জলকাদায় পড়ে থাকা আমার ব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে বলল—তোর ব্যাগ নিশ্চয়?

এই সময় ড্রাইভার একটু কেসে বলল—স্যার, শুনেছি এখানে এক ফকির থাকতেন। পরে তাঁকে কারা মার্ডার করেছিল। মেয়েমানুষ নিয়ে গন্ডগোল।

শুনে আমার মাথা ঘুরতে থাকল। ব্যস্ত হয়ে বললাম—নিশীথ, চলে আয়...

ভয়ের দুপুর

আলোক সরকার

গল্পের বই পড়তে খুব ভালো লাগে মেঘলার। একটা না—পড়া বই হাতে পেলেই তার বুকের ভিতরটা শিরশির করে ওঠে। ইচ্ছে করে তখনি বসে পড়ে বইটা হাতে নিয়ে। শুরু করে দেয় পড়া। তেমন সুযোগ অবশ্য সবসময় ঘটে না, যতক্ষণ না ঘটে মনটা ছটফট করতে থাকে মেঘলার। বই পড়তে শুরু করে গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তরতর করে পাতা উলটোতে উলটোতে এগিয়ে যায় মেঘলা, একদমে, মেঘলার কাছে মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায় বই। তারপর খুঁজে খুঁজে ভালোলাগার জায়গাগুলো আবার পড়া, বারবার পড়া। তরপর গল্পের নায়ক কেন ও—কাজ করল, না করলেই তো ভালো হত, কেন অমন ঝড়—বৃষ্টি হল সেই রাতে, না হতেও তো পারত, না হলে কী হত, এই সব ভাবতে ভাবতে কখন নিজেই গল্পের নায়ক হয়ে দুর্গম পথের পথিক হয়ে যাওয়া, তা টেরও পায় না মেঘলা।

তবু একটা বই শেষ হবার পর আরেকটা বই চাই তো। আবার নতুন ঘটনা, নতুন দেশ, তার ছায়া—ছায়া নতুন কুয়াশা—মাখা গন্ধ। অত বই পাবে কোথায় মেঘলা। তাদের পাড়ায় লাইব্রেরি আছে কিন্তু তারা ছোটোদের জন্য লেখা বই খুব বেশি রাখে না। ইস্কুলেও একটা লাইব্রেরি আছে, সেখান থেকে সপ্তাহে মাত্র একটা বই পাওয়া যায়। বই কিনে আর কত পড়া যায়, যা দাম হয়েছে বইয়ের! তার ছোটো কাকা বলে তাদের সময়ে একটা টাকা দিলে কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের দুটো বই পাওয়া যেত, 'ভোম্বল সর্দারে'র দাম ছিল ছ—আনা মানে আজকের দিনের চল্লিশ পয়সার মতো। এখন হাতে বেশ কিছু টাকা, অন্তত কুড়িটা টাকা না নিয়ে বইয়ের দোকানে ঢোকার কথা ভাবাই যায় না।

সারা মাসে কুড়ি—পঁচিশ টাকার বেশি সংগ্রহ করেও উঠতে পারে না মেঘলা। মানে, প্রতিমাসে মাত্র একটা বই কেনা। আর মাঝে—মাঝে জন্মদিনে কিংবা পুজোর আগে কিছু বই উপহার পাওয়া।

বাধ্যত মেঘলাকে নানান উপায় ভাবতে হয়। সে সহজে অন্যের কাছ থেকে কিছু চাইবার পাত্র নয়, কিন্তু বইয়ের ব্যাপারে অন্য কথা। তার এক বন্ধু আছে, খুব কাছের বন্ধু, বলা যেতে পারে Intimate friend, তার সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছে। পান্থ, পান্থপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর সে ঠিক করেছে ইস্কুল থেকে পাওয়া প্রতি সপ্তাহের বইটা সপ্তাহের মাঝামাঝি তারা বদল করে নেবে। তাহলে সপ্তাহে দুটো বই পড়া হবে। পান্থও প্রতি মাসে অন্তত একটা বই কেনে। কেনা বইটাও মেঘলার প্রত্যেক মাসে কেনা বইটার সঙ্গে মাসের মাঝামাঝি পান্থর বইটা আদানপ্রদান করা যেতে পারে, যেমন উপহার পাওয়া বইগুলোও।

মেঘলার আর একটা নেশা গল্পের বই জমানো। সে নেশাও কম নয়। বরং বলা যেতে পারে অনেক অনেক বেশি। নিজের কেনা আর উপহার—পাওয়া বইগুলো পড়া হয়ে গেলে মেঘলা তার বুকশেলফ সাজিয়ে রেখে দেয়। লাইব্রেরিতে যেমন থাকে, তেমনি, প্রত্যেক বইয়ের একটা নম্বরও দিয়ে দেয় সে। বইয়ের বিষয়ও চিহ্নিত থাকে সেই নম্বরে। যেমন বইটা যদি ছোটোগল্পের হয় তাহলে নম্বর হবে ছো ৩০, উপন্যাস হলে উ ১৬— এইরকম। রবিবার দিন স্নান করতে যাওয়ার আগে বইয়ের, বুকশেলফের ধুলো পরিষ্কার করতে কোনো ভুল হয় না মেঘলার।

পান্থর বুকশেলফের সব বই সুন্দর কাগজের মলাট দিয়ে ঢাকা থাকে। মলাটের ওপর পান্থর নিজের হাতে আঁকা ছবি— সেই ছবি ভিতরের ছবিরই হুবহু অনুকরণ। পাছে আসল ছবি একটুও ময়লা হয়ে যায় সেই ভয়ে পান্থ এইভাবে বই রাখে। পান্থ প্রতিটি বইয়ের পাতার ফাঁকে নিমপাতা রাখে, এতে নাকি বইয়ে পোকা

ধরে না। সাতদিন অন্তর নিমপাতা পালটে দেয় পান্থ। এ ছাড়া ন্যাপথলিন তো আছেই। পান্থের বইয়ের নম্বর আরও বিশদ। যেমন, হেমেন্দ্রকুমার রায়—এর 'যখের ধন'—এর নম্বর হবে হে। য। ১২, বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়'—এর বি। চাঁ। ২০।

—তোর কত বই হল রে মেঘলা?

—এইট্টি ফাইভ। তোর?

পান্থ ম্লান হেসে বলল— বাহাত্তর।

একশো বই জমানোর কাজ কে আগে শেষ করতে পারবে এ নিয়ে দুজনের মধ্যে এক সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে।

কেবল বই সংগ্রহ নয়, মেঘলা আর পান্থ সেই বইগুলোই জমাতে চায় যেগুলো তাদের কাছে অসাধারণ। কত বই পড়া হয়, সব বই তো জমাবার মতো নয়। বই জমাবার ব্যাপারে তারা নতুন দিনের লেখক পুরোনো দিনের লেখকের মধ্যে কোনো বাছবিচার করে না। সুকুমার দে সরকারের 'ময়ূরকণ্ঠী বন' নামের বইটা মেঘলার বুকশেলফে আছে, এই নিয়ে তার কম গর্ব! পান্থর আনন্দ সুনীলচন্দ্র সরকারের 'কালোর বই' নামের বইটা সে হঠাৎ বইমেলায় পেয়ে গিয়েছিল বলে।

সত্যি বলতে তেমন ভালো বই আর ক—টায় বা পাওয়া যায়। তেমন ভালো বই যা নিয়ে বিকেলবেলায় মাঠে পাশে বসে দুজনে অনেকক্ষণ আলোচনা করা যায়। গল্প করা যায়। গল্প করতে করতে সন্ধে হয়ে যাবে, কেউ টেরই পাবে না। খুব একলা একটা একটা পথের মতো বই। সেই বই বুকশেলফে থাকবে আর তার দিকে চোখ পড়লেই মনে হবে সন্ধে হয়ে গেছে, খুব অন্ধকার সন্ধে, আর আস্তে আস্তে, কেউ শুনতেই পাচ্ছে না এমন আস্তে একটা থামা—থামা অনেক দূর নেমে আসছে।

মেঘলার এক মাসতুতো দিদি, অনসূয়া, তারও ছিল বই পড়বার আর বই জমানোর নেশা। বিয়ে হবার পর পুনেয় চলে যাবার পর সে আর অবশ্য বইটইয়ের কথা বিশেষভাবে না। কলকাতাতেই আসে বছরে একবার, তাও ওই দু—চারদিনের জন্যে। মাসিমা ওর কলকাতার বাড়িতে রেখে—যাওয়া শখের জিনিসপত্রের সঙ্গে ওর বইয়ের আলমারি, আলমারিতে রাখা বইগুলোরও খুব যত্ন করে ঝাড়ামোছা করেন নিয়মিত। কত লোভনীয় বই যে আছে অনুদির বইয়ের আলমারিতে দেখলে চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। কিন্তু মাসিমা একটা বইও কাউকে দেবেন না। সে কতবার চেয়েছে, মাসিমা কথার উত্তর না দিয়ে অন্য কথা বলতে শুরু করেছেন। এ জন্য কম কষ্ট তার মনে! মাসিমার কাছে আজকাল আর কোনো বই চায় না সে। মাসিমার বাড়ি যেতেই ইচ্ছে করে না তার। তবু মাঝে—মাঝে তো যেতেই হয়। যখনই যায় সে সোজা অনুদির বইয়ের ঘরে চলে যায়, দাঁড়ায় বইয়ের আলমারির সামনে। একদিন এমনি অনুদির বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে তন্ময় হয় মনে—মনে পড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা বইয়ের নাম, যার কিছু পড়া হলেও, কিছু তার নিজের থাকলেও, অনেক বই—ই তার না—পড়া। একটা বইয়ের নাম '২৪শে এপ্রিল, চুপ', আর একটা বইয়ের নাম 'রূপনারায়ণের মাঝি'। না—পড়া বইগুলোর নাম পড়ছে আর বুকের মধ্যে ঝিমঝিম একটা কাঁপুনি হচ্ছে তার। এমন সময় মাসিমা ঘরে ঢুকতেই তার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেল, 'একটা বই পড়তে দিন না মাসিমা, আমি কালই ফেরত দেব।'

মাসিমা খুব গম্ভীর বিরক্তি—মেশানো গলায় বললেন, 'না না, বারবার বই চেয়ে আমায় বিরক্ত কোরো না মেঘলা। ও অনুর বই, ও আমি কারোকে দেব না। অনু কত যত্ন করে জমিয়েছে বইগুলো।'

মাসিমার কথা শুনে মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মেঘলা। অভিমানে লজ্জায় চোখে জল এসে গেল তার। মেঘলাকে এইরকম শক্ত উত্তর দিয়ে মাসিমাও মনে মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন নিশ্চয়। মাসিমার বাড়ি থেকে চলে আসবে বলে সবে সিঁড়িতে পা রেখেছে এমন সময় শুনতে পেল মাসিমার গলা, 'কী খুব রাগ হয়েছে!' মাসিমা তার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'চল তোকে এখনি বই দিচ্ছি।'

প্রায় জোর করে মাসিমা তাকে বইয়ের ঘরে নিয়ে এলেন। আলমারি খুলে একটা বই বার করে তার হাতে দিয়ে বললেন, 'নিয়ে যা, তোকে আর ফেরত দিতে হবে না।' একটু থেমে বললেন, 'অনুর বই আমি কী করে দিই বল! অনু কতদূরে চলে গেছে।'

বইটা হাতে নিয়ে মলাটের ওপর চোখ পড়ল মেঘলার। ঘন কালো হরফে লেখা 'ভয়ের দুপুর'। সারা মলাট জুড়ে ফিকে হলুদ রঙে আঁকা একটা দুপুরের ছবি, যে দুপুরে একটি মাত্র মানুষ হুহু ধুলোর মধ্যে বসে অনেক অনেক দূরের দিকে চেয়ে আছে।

বাড়ি এসে বইটা পড়ে ফেলল মেঘলা। আশ্চর্য বই। একেবারে নতুন পৃথিবীর বই। বৈশাখ মাসে নির্জন দুপুরের পথে কত ধরনের ভয়, কত ধরনের আলো, আলো ঘুমিয়ে পড়ছে, জেগে উঠছে আলো, হাওয়া একেবারে বোবা, ওই হাওয়ায় ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার অজানায়। বই শেষ হবার পর, একবার দুবার তিনবার শেষ হবার পর বারান্দায় গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মেঘলা। তার চোখে হাজার ছবি, একটা ছবির ওপরে আর একটা ছবি, ছবির পাশে আর একটা ছবি— সব ছবি যত চেনা ঠিক ততটাই অচেনা।

এমন আশ্চর্য বই পান্থকে না—পড়ালেই নয়। মেঘলা তার ইস্কুল ব্যাগের মধ্যে বইটা রেখে দিল।

পরের দিনই বইটা সে পান্থকে দিল। আর তার পরের দিনই ইস্কুলে দেখা হতেই পান্থ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুই আমাকে কী বই পড়ালি মেঘলা!'

পড়াশুনো শেষ করে রাতের খাবার খাওয়ার পর 'ভয়ের দুপুর' পড়তে শুরু করে পান্থ। এক ঘণ্টার মধ্যে বই পড়া শেষ। আর তারপর থেকে একটা ঘোরের মধ্যে আছে পান্থ। গল্পের ছবিগুলো তার সারা মন জুড়ে বাজছে, সে গল্পের দুঃখ বিস্ময় রহস্যের মধ্যেই আছে। যেন একটা ঘন গাছের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া, মস্ত বড়ো বাড়ির শেষের ঘরে দাঁড়িয়ে, কখনো একটা দিঘির পাশে যার রাত্রি—রং জলের ওপরের প্রতিটি ঢেউ অবিরাম হাতছানি দিয়ে এমন একজনকে ডাকছে যে কোথাও নেই। যে কোথাও কোনো দিন থাকবে না। ছবির শেষ নেই 'ভয়ের দুপুরে', শেষ নেই ভয়ের, যে ভয় মানুষকে চেঁচিয়ে উঠতে বলে না, বরং বলে তোমরা চুপ কর, আরও অনেক বেশি চুপ কর তোমরা।

সেদিন বিকেলে খেলার মাঠের পাশে বসে সন্ধে হওয়া পর্যন্ত 'ভয়ের দুপুর' নিয়ে দুজনের গল্প আর থামতেই চাইল না। বাড়ি ফেরবার পথে মেঘলা পান্থকে বলল— কাল বইটা মনে করে আনিস আর একবার পড়ব।

পরের দিন বইটা ফেরত দিয়ে পান্থ বলল— আমি আবার তোর কাছ থেকে বইটা নেব মেঘলা।

মেঘলা বইটা পান্থকে দিয়েছিল কিন্তু সাতদিন পার হবার পরও পান্থর কাছ থেকে 'ভয়ের দুপুর' ফেরত পেল না মেঘলা। রোজ পান্থকে বইটা পরের দিনটা আনতে বলে, রোজই বইটা আনতে ভুলে যায় পান্থ। শেষে একটু কঠিন হতেই হল মেঘলাকে: কাল তুই ঠিক বইটা আনবি পান্থ। আমি বইয়ের শেলফে নম্বর দিয়ে রাখতে পারছি না।

—তুই বইটা আমাকে একেবারে দিয়ে দিবি মেঘলা? ও বই হাতছাড়া করতে কী যে কষ্ট হবে।

—না না! তা কী করে হবে। তুই আমার বই কালই ফেরত দিবি। না হলে খারাপ হবে।

পান্থর মুখটা খুব কালো হয়ে গেছে, লক্ষ করল মেঘলা। কিন্তু সে কী করবে? এইরকম আবদার করাটাই অন্যায় হয়েছে পান্থর।

পান্থ আস্তে আস্তে মেঘলার সামনে থেকে সরে গেল।

তার কিছুদিন পর থেকে ইস্কুলে আর আসেই না পান্থ। কী হল পান্থর। অসুখ হয়েছে? মেঘলার ওপর খুব রেগে গেছে পান্থ? মেঘলার ওপর রেগে গেলে না হয় সে আর কথাই বলবে না মেঘলার সঙ্গে, তা বলে একেবারে ইস্কুলে আসা বন্ধ করে দেওয়া! পান্থর জন্য মনটা খুব খারাপ থাকে মেঘলার, খুব কষ্ট হয়। সে কখনো পান্থর বাড়ি যায়নি, পান্থর বাড়ি চেনা থাকলে যে এখনি যেত।

শেষপর্যন্ত পান্থর বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল। তাদের ক্লাসের অর্ঘ্যদীপ চেনে পান্থর বাড়ি। পান্থ তাদের পাড়াতেই থাকে।

পান্থর ইস্কুলে না—আসা তখন প্রায় তিনমাস হয়ে গেছে। অর্ঘ্য পান্থর বাড়ি চেনে শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে ঠিক করল কালই সে অর্ঘ্যর সঙ্গে পান্থর বাড়ি যাবে। বাড়িতে বলে রাখবে ইস্কুল থেকে ফিরতে একটু দেরি হবে তার।

পরের দিন ইস্কুলের ছুটির পর মেঘলা পৌঁছল পান্থর বাড়ি। অর্ঘ্য সঙ্গে আছে। দরজার বেল বাজাতে দরজা খুলে দিলেন এক মহিলা।

মেঘলা বলল, আমার নাম মেঘলা, আমি পান্থর বন্ধু। পান্থ কেন আর ইস্কুলে আসে না মাসিমা?

—তুমি মেঘলা! ভদ্রমহিলা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মেঘলার মুখের দিকে। আস্তে নীচু গলায় বললেন— পান্থ তোমাকে কী যে ভালোবাসত!

তারপর মুখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠে বললেন— পান্থ নেই, পান্থ চলে গেছে মেঘলা।

সারা শরীর কাঁপতে থাকল মেঘলার। মাসিমার কথার ঠিক কী মানে তাও যেন বুঝতে পারল না সে। তার চোখের সামনে কেমন একটা অন্য রং—এর আলো।

কিছুক্ষণ পরে একটু শান্ত হয়ে মাসিমা তাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন, অনেকক্ষণ গল্প করলেন তাদের সঙ্গে, সবই পান্থকে নিয়ে। পান্থ কত অভিমানী ছিল, পান্থর মন কত স্বপ্ন—ভরা ছিল এ সব বলতে বলতে বললেন— চল তোমাদের পান্থর নিজের ঘরে নিয়ে যাই।

পান্থর ঘরে এসেই মেঘলার চোখে পড়ল পান্থর বইয়ের র‍্যাক। একেবারে সামনেই একটা বই, নাম, ভয়ের দুপুর।

বইটা হাতে তুলে নিয়ে মাসিমা বললেন— তোমার কাছ থেকে এই নামের একটা বই এনেছিল। তোমাকে তাড়াতাড়ি ফেরত দিতে হবে তাই কাগজ কিনে ঠিক 'ভয়ের দুপুর'—এর মাপের একটা খাতা তৈরি করেছিল পান্থ। ওপরে শক্ত মলাট দিয়েছিল 'ভয়ের দুপুর'—এর মতো, 'ভয়ের দুপুর'—এর মলাটের ছবিটাও এঁকেছিল তার ওপর ঠিক 'ভয়ের দুপুর'—ওই যেমন আছে সেই রকম রং দিয়ে। ইচ্ছে ছিল সারা বইটায় কপি করবে বাঁধানো খাতায়। তোমার নাকি তাড়াতাড়ি দরকার বইটা, দুদিন ইস্কুলেও যায়নি কপি করার কাজ শেষ করবে বলে।— কপি শেষ হয়নি। দুদিনে আর কতটুকু কপি করা যায়!

পান্থর 'ভয়ের দুপুর' মাসিমা মেঘলার হাতে দিলেন।

মেঘলার কানের কাছে ঘুরে ঘুরে বাজছে— তুই বইটা আমাকে একেবারে দিয়ে দিবি, মেঘলা। তুই বইটা আমাকে একেবারে দিয়ে দিবি, মেঘলা।

পান্থর 'ভয়ের দুপুর' মেঘলার হাতের ওপর যেন নিজের থেকেই একপাতা দু—পাতা খুলে যাচ্ছে। মেঘলা লক্ষ করল মাত্র সতেরো পাতা পর্যন্ত কপি করতে পেরেছে পান্থ।

মাসিমা বলেই চলেছেন 'ভয়ের দুপুর' বইটাই কী—যে ছিল! ওর বড়ো ভালো লেগেছিল বইটা।

এসব মেঘলার ছোটোবেলার গল্প। এখন অনেক বড়ো হলেও বই পড়ার, বই জমানোর নেশা একটুও কমেনি তার। আজও বইয়ের দোকানে, বইমেলায়, পুরোনো বইয়ের দোকানে, নানান লাইব্রেরিতে বই খুঁজতে খুঁজতে কখনো কখনো তার বুকে খুব ঠান্ডা একটা ভয় বেজে ওঠে। বই খুঁজতে খুঁজতে 'ভয়ের দুপুর' নামের কোনো বই হঠাৎ চোখে পড়বে না তো তার! তার বই খোঁজার হাত তখন হঠাৎ শীতল হয়ে আসে। বই খোঁজা বন্ধ করে সে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে আসে। আলো—জ্বলা, ভিড়ে—ভরা রাস্তার রং খুব ঝিমানো ঠান্ডা আর চুপচাপ হয়ে নেমে আসে তার চারিদিকে।

তার কানের পাশে খুব দূর থেকে অস্পষ্ট বেজে ওঠে— তুই বইটা আমাকে একেবারে দিয়ে দিবি, মেঘলা।

ধোঁয়া

শোভন সোম

সম্পাদক মশাই,

আপনার ফরমাশ মতো গল্প লিখতে বসে অনেক কাগজ নষ্ট করেছি। অনেক প্লট মাথায় ঘোরাফেরা করছে, কিন্তু লিখতে বসলেই কোন এক অদৃশ্য শক্তি বারবার আমার কলমকে এমন এক ঘটনার দিকে চালনা করছে, যে ঘটনার কথা আমি আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি। ঘটনাটি অতি ব্যক্তিগত। আপনি জানেন, ত্রিভুজ প্রেমের মূলে থাকে কিছু ঈর্ষা, কিঞ্চিৎ হীনমন্যতা বোধ। আপনি এও জানেন, ত্রিভুজ প্রেমের পথ কণ্টকসংকুল না হলেও বঙ্কিম তো বটেই। এই ধরনের প্রেমের পরিণতিতে একজনের হার ও একজনের জিত হয়ে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যাকে হার মনে হয় আসলে তা জয় এবং অনেকে জিতেও হেরে যায়। যে হেরে যায় সে হেরে গিয়েও ছায়ার মতো, হাওয়ার মতো, আলোর মতো, গন্ধের মতো বাকি দু—জনের মাঝখানে বর্তমান থাকে। ত্রিভুজ প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তিটির ভূমিকাও তেমনি।

সম্পাদক মশাই, ধান ভানতে শিবের গীত অনেক গাওয়া হল। আসল কথায় এবার আসি। এই কাহিনি নারী সম্পর্কিত এবং সেই নারী অগ্নি—চন্দ্র—সূর্যকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করা আমার স্ত্রী।

আমার ফুলশয্যার রাতের অভিজ্ঞতা আদৌ সুখকর হয়নি। পরদিন সকালে বারান্দায় বসে বিনিদ্র রাতের ক্লান্তি দূর করবার জন্য দ্বিতীয় কাপ চা পান করছিলুম। ঝি—চাকরেরা পোর্চে দাঁড় করানো গাড়িতে মিষ্টির হাঁড়ি তুলে রাখছিল। উৎসব বাড়ির উদবৃত্ত মিষ্টান্ন আত্মীয়—বন্ধুজনের বাড়িতে বিতরণের রীতি আছে। ড্রাইভার রামদুলারে ইতিমধ্যেই মিষ্টি বিতরণের দুটো ট্রিপ দিয়ে এসেছে। এবারও সে স্বভাবতই তার গন্তব্যস্থল জানতে চাইল। আমি বারান্দা থেকেই গলা চড়িয়ে জানতে চাইলুম : মা, রামদুলারে কোথায় যাবে, বলে দাও!

মা সম্ভবত কাজে ব্যস্ত ছিলেন; ভেতর থেকে জবাব দিলেন, সইয়ের বাড়িতে।

আমি রামদুলারেকে বললুম, অমলদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। রামদুলারে আমার নির্দেশ শুনেও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দেখে আমি চটে গেলুম : দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও।

রামদুলারে জবাব দিল, ভাই সাব, মিষ্টিগুলো তুলে নিতে বলুন। এখন পাঠানো ভালো দেখাবে না।

একটা সন্দেহের কাঁটা রামদুলারে আমার মনে বিঁধিয়ে দিল। ব্যাপারটা অনেকেই জানে। তা বলে একটা মাইনে করা ড্রাইভারের এমন আস্পর্ধা! অমলের সঙ্গে না—হয় অনিতার ভালোবাসাবাসি ছিল, তবু অনিতা আমার বিবাহিতা স্ত্রী এখন। মা তাঁর সইয়ের বাড়িতে মিষ্টি পাঠাচ্ছেন, অমলের জন্যে নয়।

রেগে অস্থির হয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, ভালোমন্দ বিচার তোমার কাজ নয়, রামদুলারে। তোমাকে যা বলা হচ্ছে, তা করো।

সে শান্ত স্বরে বলল, আপনি একটু মাতাজিকে আসতে বলুন। আর মিষ্টিগুলো এ অবস্থায় পাঠাবেন না।

আমাদের কথাবার্তা শুনে মা নিজেই বেরিয়ে এলেন।

রামদুলারের সঙ্গে মা—র কথাবার্তা শুনে হতচকিত আমি দ্রুতপায়ে দোতলায় নিজের ঘরটিতে পালিয়ে এলুম। ঘরভরতি যৌতুকের জিনিসপত্র, টাটকা তাজা দোকান—দোকান গন্ধ আর সকালের ঝকঝকে

আলো। আমি বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লুম। এরপর এখানে আর থাকা যাবে না, কালই বোম্বেতে ফিরে যাব এবং অনিতাকে সঙ্গে নিয়েই।

কিছুক্ষণ বাদেই অনিতা ঘরে ঢুকল। ওর সর্বাঙ্গে সুস্নাত স্নিগ্ধতা। ওর দিকে তাকিয়ে মনে হল, অনিতা যেন রূপকথার মানবী। দৈনন্দিনতার মধ্যেও এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে নিজেকে সে আবৃত করে রাখে।

অনিতা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। আয়নায় আমি ওকে দেখতে পেলুম। দেখলুম তার চোখে রাতভর কান্নার চিহ্ন অবগাহনেও ধুয়ে যায়নি।

হালকা প্রসাধন সেরে অনিতা বলল, তুমি একটু উঠে ওই চেয়ারটায় বসবে! আমি বিছানা তুলব।

আমি হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত ধরলুম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম, মিষ্টি কুল আমার ভুল হয়েছে; রাগ করো না।

অনিতা তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে বলল, ভুল তোমার নয়। যা চেয়েছিলে, দিচ্ছি।

না, মিষ্টি কুল, ওগুলো তোমারই থাক। আমি দেখতে চাই না।

ওর কোনো ভাবান্তর আমার চোখে পড়ল না। আর ওর হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে চেয়ারে বসলুম। ও শান্ত ভাবে বিনা তুলতে লাগল।

অমল গত রাতে এসেছিল। আমি তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলুম। উচ্ছ্বসিত নয়, উল্লসিত হয়েছিলুম। তাকে নিয়ে গিয়েছিলুম অনিতার কাছে। লাল বেনারসিতে, গয়নায় কনেচন্দনে অনিতাকে দেবীর মতো দেখাচ্ছিল। আমি বলেছিলুম, দেখ, কে এসেছে।

অনিতা চোখ তুলে তাকায়নি। অমল নীরবে অনিতার হাতে একটা নীল ফিতে বাঁধা মোড়ক তুলে দিয়েছিল। তারপর সে বহু অনুরোধ—উপরোধ অগ্রাহ্য করে না খেয়েই চলে গিয়েছিল। যাবার সময় বাইরে গিয়ে আমার দুটি হাত ধরে বলেছিল, 'তমাল, তুই সুখী হ'।

আমি মনে মনে হেসেছিলুম। মনে হয়েছিল, ব্যর্থ প্রেমিকের আত্মপ্রসাদ— আহা, এতেই যদি তার মন ভরে তো ক্ষতি কি।

রাত বারোটা নাগাদ খাওয়া—দাওয়ার পালা চুকে যাবার পর যখন নিজের ঘরে এলুম, তখন ঘর শূন্য। কিছুক্ষণ বাদে বউদি অনিতাকে নিয়ে এল।

ভাই, তোমাদের আর জ্বালাতন করব না। অনেক রাত হল। এবার নিজের মানুষ বুঝে নাও।

বউদির রসিকতার জবাব দেবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। আমি গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলুম। অনিতা ততক্ষণে এসে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি একটানে ওকে কাছে এনেই জানতে চাইলুম অমল কী দিয়েছে!

অনিতা নিরুত্তর রইল।

কই, দেখাও।

অনিতার চোখ থেকে কান্নার বিন্দু উপচে পড়তে লাগল : সবই তো তুমি জানো।

আমি জানতুম, অমল অনিতার লেখা প্রেমপত্র ফিরিয়ে দিয়েছিল। ব্যর্থ প্রেমিকরা কখনো কখনো এমনি উদারতা দেখায়। আমি শ্লেষের স্বরে বললুম, এই নাটুকেপনার কী প্রয়োজন ছিল আজ! এই ঢং অন্তত আজকের দিনে সে না দেখালে কি পারত না!

অনিতা কান্না—ভেজা স্বরে বলল, তুমিই আমার সর্বস্ব।

মনের জ্বালা যেন বিছুটির জ্বালা, কিছুতে যেতে চায় না। আমি সেই জ্বালার বশে কথার পিঠে কথা তুললুম : দেখ, কথা দিয়ে মন ভিজিও না।

আমার বাকি রাত মনের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে শেষ হল। ভোরের আলো স্পষ্ট হতেই রাতের সেই অপ্রসন্নতার জন্যে নিজেরই খারাপ লাগল। খামোকা আমি কেন সেন্টিমেন্টাল হতে গেলুম। জীবনের স্মরণীয় একটি রাত ব্যর্থ হয়ে গেল একজন তৃতীয় ব্যক্তির জন্যে। নারীর স্বামীত্বের প্রশ্নে পুরুষ চিরকাল নির্মম,

নির্লজ্জ, সন্দেহপরায়ণ ও ঈর্ষাকাতর—জগতের এই সনাতন সত্য আমিও অগ্রাহ্য করতে পারিনি। যদি পারতুম, তবে অমলকে ক্ষমা করতুম আর ফুলশয্যার রাতের সব মাধুর্য আকণ্ঠ পান করতে পারতুম।

দুপুরবেলা মা—কে নিভৃতে ডেকে বললুম, মা, আমি কালই চলে যাব। অনিতাকেও নিয়ে যাব।

আমার ছুটির মেয়াদ তখনও ফুরোয়নি। অনায়াসে আরও চারদিন থাকতে পারি। ফেরা যাত্রা সেরে যাব, এটাই মা জানতেন। বোম্বেতে একটা ঘর নিয়ে থাকি, বড়ো ফ্ল্যাট না—পাওয়া পর্যন্ত অনিতা মা—র কাছে থাকবে কথা ছিল। হঠাৎ আমার অমন প্রস্তাবে মা স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট হলেন, তোদের রাজ্যি ছাড়া কাণ্ডকারখানা আমি বুঝি না। তোরা যা খুশি তাই কর।

মা—র কথায় কী ইঙ্গিত ছিল, বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। অমলের সঙ্গে অনিতার ভালোবাসাবাসির কথা জব্বলপুর সুদ্ধ সব বাঙালি জানে। অমলের মা আমার মায়ের ছোটোবেলার সই। এলাহাবাদের মেয়ে দু—জনই। দু—জনেরই বিয়ে হয়েছিল জব্বলপুরে। দুই পরিবারে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। মা তাই এই বিয়েতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপত্তি করেছিলেন।

আমি আর অমলও ছোটোবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েছি একেবারে এমএ পর্যন্ত। আমরা রবার্টসন কলেজে যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি, তখন অনিতার বাবা জব্বলপুরে স্টেশন মাস্টার হয়ে এলেন। অনিতা তখন ম্যাট্রিকের ছাত্রী। পনেরো বছর বয়েস। দু—বিনুনি বেঁধে শাড়ি পরে রিকশায় চড়ে রাইট—টাউনে স্কুলে যেত। আমাদের উনিশ বছরের উঠতি যৌবনের চোখে নেশা ধরানোর মতো ওই বয়েস ছিল যথেষ্ট। আমরা সাইকেলে করে কলেজে যাবার পথে রোজ রিকশায় ওর দেখা পেতুন। স্টেশন মাস্টারের মেয়ে দেখতে মিষ্টি, তাই আমরা নাম দিয়েছিলুম ইস্টিশনের মিষ্টি কুল। অমল সেই মিষ্টি কুলের ঘায়ে অতি সহজেই কাত হল। অমল ছিল মিশুকে।

অমল তার ভালোবাসার ব্যাপার নিয়ে আমার বা বন্ধুবান্ধব কারও সঙ্গেই কোনো আলোচনা করত না। আমরাও তাকে কোনোদিন কিছু জিজ্ঞেস করিনি। ছোটো শহরে বাঙালির সমাজও ছোটো, সবাই সবাইকে চেনে এবং কোনো কথাই গোপন থাকে না। অমল—অনিতার ব্যাপারও সবাই জানত। তাই নিয়ে কারও কৌতূহল ছিল না।

এমএ পাশ করে কপালের ফেরে আমি পেলুম বোম্বেতে বড়ো চাকরি আর অমল বসে রইল বেকার।

দু—বছর বাদে দিয়ে জব্বলপুরে এসে দেখি, অমল স্কুলে মাস্টারি করছে। মঢ়াতালের কফি হাউসে বসে অনেকক্ষণ গল্প করলুম ওর সঙ্গে। বললুম, চল আজ দু—জনে এম্পায়ারে ছবি দেখে আসি। মনে আছে, কলেজে পড়বার সময় এম্পায়ারে আর ডিলাইটে কত ছবি দেখেছি!

সে আর মনে নেই!—অমল হাসল : তুই তো আরও দু—তিন দিন আছিস। যাব'খন একদিন। আজ একটু কাজ আছে।

রাখ তোর কাজ। কতদিন একসঙ্গে ছবি দেখিনি।

অমল সলজ্জ হেসে বলল, তমাল আজ থাক।

আমার জেদ চেপে গেল, তোর এমনকী কাজ দেখব আমি, চল যাই।

অমল আমাকে নিয়ে সিদ্ধিবালা গ্রন্থাগারে আসতেই বইয়ের তাকের জ্যামিতি ফুঁড়ে যেন সে উদয় হল,—আমার বই এনেছ!

হ্যাঁ, এনেছি। এই যে!—অমল হেসে ওর হাতে একটা বই তুলে দিল। আমাকে বলল, চিনতে পারিসনি!

আলবাৎ। ইস্টিশনের মিষ্টি কুল না। আচ্ছা, আমি চলি রে।—আমি বললুম।

ছবি দেখতে যাইনি বলে রাগ করিসনি তো?

না রে না।—আর কিছু বললুম না বটে, তবে তখন আমি তাজ্জব বনে গেছি। এত বলল আমি অনিতার দিকে তেমন ভাবে তাকিয়ে দেখিনি? আজ যেন ওকে নতুন করে দেখলুম। যে অনিতাকে প্রথম দেখেছিলুম,

সে ছিল কিশোরী, আমাদের উঠতি যৌবনের চোখের নেশা। আজ যাকে দেখলুম, সে যে সেই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, সে আজ দেহের কামনা, মনের বাসনা।

কী আছে অমলের মধ্যে! এই রোগা পাতলা চেহারা, বাঁ গালে বিশ্রী জড়ুল, ওই তো সামান্য এক চাকরি, বাড়ির অবস্থাও তথৈবচ, একগাদা স্বজন পরিজনের সংসার। কী এমন পেয়েছে অনিতা ওর মধ্যে! আমার মাইনে চার অঙ্কের, আমি মোটামুটি সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, স্মার্ট বলে আমার খ্যাতি আছে, বাড়ির অবস্থা বেশ ভালো; নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, সচ্ছলতা, সিকিউরিটি—আর কী চায় মেয়েরা। আদর্শ স্বামী হবার সব যোগ্যতা, কোনো মেয়ের প্রেমিক হবার সংগত অধিকার আমার আছে!

সম্পাদক মশাই, এইখানেই দুটি সমান্তরাল রেখা 'হঠাৎ অন্য একটি রেখার আবির্ভাবের দরুন তিনে মিলে ত্রিভুজ হয়ে গেল। ইটারন্যাল ট্রায়ানগল।

বোম্বেতে ফিরে গেলুম বড়ো জ্বালা নিয়ে।

সুযোগ আপনিই এল। মা চিঠিপত্রে বিয়ের কথা তুলতেই আমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার প্রার্থনা জানালুম। প্রত্যুত্তরে মা আমায় সরেজমিনে তলব করলেন।

বাপ—মরা আদুরে বাধ্য ছোটো ছেলে এমন অবাধ্য হবে, মা ভাবতে পারেননি। আকারে ইঙ্গিতে অমল অনিতার মাখামাখির কথাও তুলেছিলেন। আমি বলেছিলুম, তাহলে থাক, আমার বিয়ের দরকার নেই। মিথ্যে ডেকে পাঠালে।

সম্পাদক মশাই, এত ঘটনার ঘনঘটার পর যদি গল্পটা এখানে শেষ করতে পারতুম, তবে ভালো হত। কিন্তু আপনি যা চান, এবং যে উদ্দেশ্যে এই এত কথা বলা, তার শুরু এখান থেকে।

শ্বশুরমশাই পরদিন আমাদের দু—বাথের একটা কূপের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ট্রেনের কামরার নিভৃত পরিবেশে প্রথম মিলিত হবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল, কিন্তু বাঁধবার আগেই যে বীণার তার ছিঁড়ে গেছে, সেই বীণা তো সুরহীনা। আমাদের ব্যর্থতার ফিরিস্তি দিয়ে কী হবে, সম্পাদক মশাই! কোন এক কবির কবিতায় পড়েছিলুম :

যে কথা ভুলতে চাও কিছুতে পারো না ভুলতে তা'

সে যেন বুকের মধ্যে টনটনে পুরাতন ব্যথা।

বোম্বেতে আমার এক—কামরার আবাস বান্দ্রায়। নতুন সংসার পাতবার কোনো আনন্দ, উৎসাহ আমি বোধ করিনি। পঁচিশ বছর বয়সের সব কামনা বাসনা নিয়ে যতবার অনিতার কাছে যাবার চেষ্টা করেছি, মনে হয়েছে একটি তৃতীয় অবাঞ্ছিত সত্তা ছায়ার মতো, হাওয়ার মতো, আলোর মতো, গন্ধের মতো আমাদের জড়িয়ে অবশ্যম্ভাবী, দুর্নিবার হয়ে রয়েছে।

কয়েক মাস বাদে অনিতা বেশ স্বাভাবিক হয়ে এল। ওর সাংসারিক কথাবার্তা, টুকরো হাসি, ঈষৎ অভিমানের মধ্যে ওর স্বাভাবিকতার স্পর্শ পেলুম। আমি চাকরির সময়টুকু বাদে বাকি সময় অনিতার সান্নিধ্যেই কাটাতুম। ছুটির দিনে হয় সিনেমায় নয় কোথাও একসঙ্গে বেড়াতে যেতুম। একদিন সন্ধেবেলা অনিতা আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলল, তোমাকে একটা জিনিস দেব।—বলে অমলের দেওয়া সেই মোড়কটা আলমারি খুলে আমার হাতে তুলে দিল।

আমি বাথরুমে গিয়ে সেটা পুড়িয়ে ফেলে ঘরে এসে দেখি, অনিতা বিছানার এক কোণে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। আমি সেই প্রথম তাকে উন্মুক্ত বাহু দিয়ে বুকে টেনে নিলুম।

অনিতার দেহে এরপর মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দিল; কিন্তু আমি সাহস করে ওকে জব্বলপুরে পাঠালুম না। বোম্বে আসা তক আমরা আর জব্বলপুরে যাইনি।

বিশেষ করে দুপুরবেলা আমার অনুপস্থিতিতে অনিতার একাকিত্ব এই সময় আদৌ নিরাপদ নয়, তাই ওর দেখাশোনার জন্য বুড়ি ঝি সুলভাবাঈকে ঠিক করলুম।

একদিন অফিসের জরুরি কাজে আটকা পড়ে ফিরতে বেশ দেরি হল। বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন রাত আটটা। ফিরে এসে দেখি অনিতা মিটিমিটি হাসছে। টিপয়ে রাখা অ্যাশট্রে ভরতি চার্মিনারের টুকরো। অনুমান করলুম, কেউ এসেছিল। অনিতা আমাকে কিছু বলল না; আমিও আপাতত চেপে গেলুম।

দূরে গির্জের ঘড়িতে ঘণ্টা পিটিয়ে রাত এগিয়ে চললেও আমার চোখে তিলমাত্র ঘুম এল না। আর থাকতে না পেরে অনিতাকে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করলুম, মিষ্টি কুল, কে এসেছিল বললে না তো?

অনিতাও জেগে ছিল, অবাক হয়ে বলল, কখন!

তাহলে অ্যাশট্রেতে অত সিগারেটের টুকরো কেন?

যাও, দুষ্টুমি কোর না।—খিলখিল শব্দে অনিতা হেসে উঠল।

না, না, সত্যি করে বল।

বাব্বা, কোনদিন না আমায়ই ভুলে যাবে।

হেঁয়ালি রাখ, অনিতা। কী লুকোচ্ছ তুমি?

আমার স্বরের কঠোরতায় অনিতা বিস্মিত হল বোঝা গেল তার জবাবে।

হেঁয়ালি করব কেন? তুমিই তো ন—টায় বেরিয়ে সাড়ে ন—টা না বাজতেই ফিরে এলে। বললে, দেরি করে যাবে। সারাদিন রইলে। তিনটের সময় বেরিয়ে গেলে। বলে গেলে ফিরতে দেরি হবে।

সুলভাবাই কোথায় ছিল?—রুদ্ধশ্বাসে আমি জানতে চাইলুম।

ও তো তুমি আসতেই তোমাকে দেখে চলে গেল। ফিরল বিকেল চারটের পর।

অবাক হইনি, ভয় পেলুম। সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল, দরদর করে ঘামের স্রোত রোমকূপ গড়িয়ে ঝরতে লাগল। চার্মিনার সিগারেট আমি খাই না। চার্মিনার আমার সয় না। অনিতা সেটা জানে না সম্ভবত। দু—তিনটে ব্র্যান্ডে আমার আনাগোনা, কিন্তু কদাপি চার্মিনারে নয়। চার্মিনার অমলের প্রিয় ব্র্যান্ড ছিল। আমি অনিতাকে তখন আর কিছু বললুম না।

পরদিন সুলভাবাইকে রাস্তায় পাকড়ালুম। কাল সারা দুপুর সে কোথায় ছিল, জানতে চাইলুম। কুঞ্চিত মুখে হাসির ঝালর ঝরিয়ে বুড়ি বাই জবাব দিল, ওই তো এক চিলতে ঘর। তোমরা দুটিতে থাকলে আমি মাঝখানে বাগড়া দিই কেন?

ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা সমীচীন বোধ করলুম না। সেদিন আর শরীর খারাপের অজুহাতে অফিসে গেলুম না।

অনিতাকে শত চেষ্টাতেও কিছু বলতে পারলুম না। গতকাল আমি ন—টার সময় অফিসে বেরিয়ে বান্দ্রা স্টেশন থেকে ন—টা দশের ট্রেন ধরে ভি—টি স্টেশনে গেছি। ফোর্ট এলাকায় অফিসের বাড়িতেই ছিলুম সন্ধে ছ—টা অবধি! মাঝখানে একবার বাথরুমে আর একবার ডিরেক্টরের চেম্বারে যাবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠেছি। বাকি সময়টুকু বলতে গেলে চেয়ারের সঙ্গে সেঁটে ছিলুম। কাজের চাপ ছিল খুব বেশি। কোয়ালিটি কন্ট্রোল সেমিনারে ডিরেক্টর যে পেপার পড়বেন, সেটি গতকাল হাজার রেফারেন্স মেটিরিয়্যাল আর ডাটা ঘেঁটে আদ্যোপান্ত তৈরি করে টাইপ করা কপি ডিরেক্টরের হাতে তুলে দিয়ে তবে অফিস ছেড়েছি। যতক্ষণ অফিসে ছিলুম, দুনিয়ার তাবৎ কিছু তো বটেই, অনিতার সম্পর্কেও একলহমা ভাববার ফুরসত পাইনি। আমার পক্ষে তাই সারা দুপুর অনিতার সান্নিধ্যে শারীরিক উপস্থিতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অনিতা বা সুলভাবাই অন্য কাউকে আমি বলে ভুল করবে মনে হয় না, অথচ আমি কস্মিনকালেও চার্মিনার খাই না। তাহলে তমাল—কৃষ্ণ মজুমদার নামক ব্যক্তি সকাল সাড়ে ন—টা থেকে দুপুর তিনটে অবধি একই সঙ্গে দু—জায়গায় কী করে উপস্থিত ছিল!

পরদিন অফিসে বেরোবার সময় অনিতাকে বলে গেলুম, আমি কিন্তু অফিস কামাই করে ফিরে আসব না। ফিরতে সন্ধে ছ—টা সাতটা হবে। ততক্ষণ যেন বাই থাকে।

অনিতা কী বুঝল কে জানে।

সেদিনও ফিরে দেখি টিপয়ে রাখা অ্যাশট্রে ভরতি চার্মিনারের টুকরো। আমি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, এত সিগারেট কে খেল?

অনিতা জবাব দিল, সারা দুপুর বিছানায় গড়িয়ে তুমিই তো ধ্বংস করলে।

আমি!—বিস্ময়ে আমার গলা আটকে এল।

না তো কে? তুমিই তো সাড়ে ন—টায় ফিরে এলে, রইলে তিনটে অবধি। আমি তোমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলুম, আজ যে বড়ো বলে গেলে কামাই করবে না, অথচ সে কথা রাখতেই পারলে না।

তাই নাকি?

কেন, এত ক্ষীণ তোমার স্মৃতিশক্তি! কী দেখছ অবাক হয়ে! তুমি না বললে, মিষ্টি কুল, তোমার কথা বড্ড মনে হচ্ছিল, ট্রেনে চড়তে গিয়েও তাই ফিরে এলুম।

তারপর!

তারপর তুমি তো সুলভাবাইকে সিগারেট আনতে পাঠালে। ওই তো প্যাকেটটা পড়ে আছে।

মাথার বালিশের কাছে পড়ে থাকা চার্মিনারের হলদে প্যাকেট তুলে এনে আমি বললুম, এই সিগারেট তো আমি খাই না, অনিতা!

কী বলছ তুমি!—অনিতা অবাক হয়ে তাকাল আমার মুখে : আমি বললুম, অত সিগারেট খাচ্ছ কেন। তুমি আমার কথা শুনলে না। আচ্ছা, তুমি আজকাল সব ভুলে যাও কেন, বল তো!

কিন্তু অনিতা, আমি তো চার্মিনার খাই না। তুমি জান না!

অনিতা স্তব্ধ বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। থরথর করে ওর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল, কিন্তু কোনো কথা উচ্চারিত হল না।

আমি আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলুম না, এই ভয়ংকর খেলা আর আমার সহ্য হল না, দাঁতে দাঁত কষে বললুম, অনিতা, তুমি যত কথাই সাজাও না কেন, আমি সকাল ন—টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা অফিসেই গেছি। বিকেল পাঁচটা অবধি অফিসে ছিলুম। অফিসের প্রতিটি লোক এর স্বপক্ষে সাক্ষী দেবে। সুতরাং...সুতরাং...

আমার অসমাপ্ত কথা কেড়ে নিয়ে অনিতা হঠাৎ জ্বলে উঠল, তুমি মিথ্যুক, মিথ্যেবাদী। সব পেয়েছ, এখন আরও কী চাও বল! তুমি এত ছোটো আমি জানতুম না।

এই বিস্ফোরণের জন্যে আমি তৈরি ছিলুম না।

পরদিন সুলভাবাইকে পইপই করে বলে গেলুম, যেন দুপুরে আমি এলেও সে অনিতাকে ছেড়ে না যায়। টেলিফোনে যোগাযোগ করে সেদিনই সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে মনঃসমীক্ষকের কাছে অনিতাকে নিয়ে গেলুম। যে ক—দিন চিকিৎসা চলল, ছুটি নিয়ে রইলুম বাড়িতে। নির্দিষ্ট ক—টি সিটিং—এর পর ডাক্তার আমাকে নিভৃতে ডেকে বললেন, আপনি কি আপনার স্ত্রীকে সন্দেহ করেন?

আমিও তাঁকে যতদূর সম্ভব খুলে বললুম। তিনি প্রেসক্রিপশন দিলেন, উপদেশ দিলেন : আপনার স্ত্রী মানসিক অবদমনে ভুগছেন, আর তার জন্যে আপনি দায়ী। ওঁকে সর্বদা প্রসন্ন রাখতে চেষ্টা করবেন। খোলামেলা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন। আর, কখনো কোনো কৈফিয়ত তলব করবেন না; কোনো কথায় বুঝতে দেবেন না যে আপনি ওঁকে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করেন। ভালো কথা, ক—দিন গোয়াতে গিয়ে হাওয়া বদলে আসুন না! দেখবেন, মনের দিক থেকে আপনিও অনেকখানি সেরে যাবেন।

গোয়া যাওয়া হয়নি ছুটির অভাবে। শেষপর্যন্ত অনিতাকে জব্বলপুরে মা—র কাছে পাঠানো ঠিক করলুম।

রিজার্ভেশন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যত যাবার দিন এগিয়ে আসতে লাগল, অনিতার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বিস্মিত হলুম। অনিতা কচি খুকির মতো আবদেরে হয়ে উঠল, আমার গলা জড়িয়ে প্রতিনিয়ত গাইতে লাগল : ওগো, তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না। তাহলে আমি বাঁচব না।

হৃদয় তো হৃদয়, এমন কাকুতিতে পাষাণও গলে।

ওকে আর জব্বলপুরে পাঠালুম না।

মনঃসমীক্ষকের কাছে যাবার পর থেকে এই পর্যন্ত প্রায় সাত—আট মাস আর দ্বিপ্রহরে দ্বিতীয় তমালকৃষ্ণ মজুমদারের আবির্ভাব ঘটেনি। আমিও তাই বেশ নিশ্চিন্ত ছিলুম। অনিতাকে ঘিরে সারাক্ষণ আসন্ন মাতৃত্বের এক স্বপ্নমেদুর বিহ্বল ভাব জড়িয়ে থাকত; ওকে আমি যেন নতুন করে চিনলুম। আমার সন্তানের মাতৃত্বের অধিকারে সে এখন আমার আরও বেশি আপন, আমার রক্তের রক্ত, নিশ্বাসের নিশ্বাস, অস্তিত্বের অস্তিত্ব।

সম্পাদক মশাই, এখানেও যদি শেষ টানতে পারতুম, তাহলে নিজেকে সুখী বলে মনে করতুম। কিন্তু শেষটা যতই আকস্মিক হোক, আমাকে তা বলতেই হবে।

সেদিন সকাল ন—টায় অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে স্টেশন অবধি এসেও হঠাৎ বুকের ভেতর কেমন হা—হা করে উঠল, আমি বাড়ি ফিরে এসে কলিংবেল টিপতেই দরজার ম্যাজিক—আইতে অনিতার চোখের আভাষ দেখতে পেলুম।

ঝটিতি দরজা খুলে অনিতা বিছানার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে আবার আমার মুখে তাকাল। অনিতার সারা মুখে আতঙ্কের ছাপ, ব্যাস বিস্রস্ত, চুল অবিন্যস্ত। এলোমেলো বিছানায় এককোণে অ্যাশট্রেতে আধ—পোড়া চারমিনার ধোঁয়ার ফাঁস ওড়াচ্ছে।

অনিতা বিস্ফারিত চোখে তেমনি আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, কে তুমি, কে...

আমি, আমি অনিতা।—অধীর আগ্রহে এগিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলুম : কী হয়েছে তোমার?

আমার বাহুবন্ধনে তখন অনিতা থরথর করে কাঁপছে : তাহলে একটু আগে কে এসেছিল গো! সে—ও তো তুমি। আমি যখন দরজা খুলতে উঠি, তুমি তো তখন বিছানায় শুয়েছিলে। আবার কী করে তুমি বাইরে থেকে ফিরে এলে গো!—বলতে বলতে অনিতার মুখ বেয়ে গাঁজলা গড়াল, আমার বুকে যে মূর্ছা গেল।

আপ্রাণ চেষ্টা করেও ডাক্তাররা কাউকেই বাঁচাতে পারলেন না। অনিতার সারা মুখে মৃত্যুর শান্ত প্রতিভা, ঈষৎ স্ফুরিত দুটি ঠোঁটে কোন সে অনুচ্চারিত শব্দের স্তব্ধতা, অনিতা এখন অতি দূরের রহস্যের, রূপকথার মানবী।

নার্স হয়তো আমার মনের গোপন কথা বুঝতে পেরেছিলেন। যে অনাগত সন্তানকে ঘিরে অনেক কল্পনার প্রশ্রয় দিয়েছি, অথচ যে পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলল না, এই হাওয়ায় বুক ভরে নিল না, তাকে একবার দেখতে বড়ো ইচ্ছে হল। আলতো হাতে শিশুর মুখের আবরণ নার্স সরিয়ে দিতেই আমি দেখলুম, শিশু অমল শুয়ে আছে। কোনো ভুল নেই— অমলই; মায় বাঁ—গালের সেই জড়ুüলটি পর্যন্ত!

অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমি চোখ বন্ধ করলুম। এ কী করে সম্ভব! অমল যে আমার ফুলশয্যার রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ড্রাইভার রামদুলারের মুখে এই বার্তা শুনেই তো পরদিন আমি জব্বলপুর থেকে পালিয়ে এসেছি।

অমল এতদিন আমার আর অনিতার মাঝখানে অদৃশ্য দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর এখন, দুই মৃত্যুর মাঝখানে জেদ, দম্ভ আর ঈর্ষার ব্যবধান সৃষ্টি করে মূর্তিমান আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি জিতে গিয়ে হেরে গেলুম। দেহ সৎকার করে ঘরে ফিরে আলো জ্বাললুম। চতুর্দিকে আমাদের বিবাহিত জীবনের স্মৃতির ছাপ। ঘরময় বুকচাপা, দম আটকানো চারমিনারের গন্ধ। দরজা—জানলা খুলে ফুলস্পীডে পাখা চালিয়ে দিলুম। রঞ্জিতবাবু, ওই গন্ধ নিরন্তর আমাকে জড়িয়ে রয়েছে। এর থেকে কি পরিত্রাণ আছে?

চোখ

আনন্দ বাগচী

এক একদিন এরকম হয়। ওরা চলে যাবার পরও আড্ডা থামে না। আড্ডা তখন আমার মগজে পুরোনো ফাটা 'রেকর্ডের' মতো বাজতে থাকে। মেসের এক চিলতে ঘরে দড়ির খাটিয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে বেড সুইচ নিবিয়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকি। আমার কানের মধ্যে ভূপতি আর নলিনাক্ষর আবেগমাখা অফুরন্ত কথা আর তর্কবিতর্ক, যুক্তি আর পালটা যুক্তি ধারাবাহিক বাজতে থাকে। বিষয় থেকে বিষয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা এক অসংলগ্ন নাবিকের মতো। বা কখনো কোনো একটি ঝলসে ওঠা সংলাপ পিন বসে যাওয়া ফাটা রেকর্ডের মতো একটি দুটি শব্দের আখরে মুহুর্মুহু বাজতে থাকে। তারপর একসময় ঠাকুর এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় খাঁকারি দিয়ে ডাকে, বাবু খেতে আসেন!

ভূপতি ডাক্তার। হাসপাতালের সার্জন। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে না বলে তার হাতে সময় আর মাথায় খেয়ালের অন্ত নেই। কী একটা দুরূহ বিষয় নিয়ে ও অনেক দিন থেকে নিঃশব্দে গবেষণা করে চলেছে। আর নলিনাক্ষ কোনো কলেজের বটানির প্রফেসার। ওঁর লেখা টেক্সটবুক বাংলা ভাষায় একমাত্র বই যাকে অনেকেই সশ্রদ্ধ ঠাট্টায় বটানির বাইবেল বলে। একটা বইই ওকে বড়োলোক করে দিয়েছে। ওদের দুজনের মাঝখানে আমি হাইফেনের মতো এখনও বন্ধুত্বে অচ্ছেদ্য হয়ে আছি। কমনফ্রেন্ড যাকে বলে। আমি নিজেও সত্যিই কমন। বিয়ে—থা করিনি, চালচুলো নেই, মেসে থাকি। চাকরিটাও সাদামাটা। খবরের কাগজে। রং ফলিয়ে বলা যায় সাংবাদিক, আসলে খবরের কেরানি। টেলিপ্রিন্টারের নিউজপ্রিন্ট বাংলা তর্জমা করি, সাজাই, হেডিং তৈরি করি, ব্যস এই পর্যন্ত। আর আড্ডায়ও আমার ভূমিকা গৌণ, ওদের তর্কাতর্কিকে উসকে দিয়ে দিয়ে জিইয়ে রাখা, চাঙ্গা করা।

আর ওরা আসে বলেই আমার যে শুধু সময় কাটে তাই না, আমি লাভবানও হই। অনেক নতুন কথা শুনতে পাই, জ্ঞানের কথা, অভিজ্ঞতার কথা, আবিষ্কারের কথা। ওরা দুজনেই বইয়ের পোকা, আর আমি বইকুণ্ঠ, কলেজ—ইউনিভার্সিটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বইও ছেড়েছি। এখন খবরের কাগজ ছাড়া ছাপা অক্ষরের সত্যি আমার কদাচিৎই সাক্ষাৎ হয়। তাই আমার রস আর রসদ আসে আমার ওই দুটি বন্ধুর কাছ থেকে। নলিনাক্ষর কাছ থেকেই আমি অনেক বিচিত্র আর বিলীয়মান গাছের কথা শুনেছি। অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছের বটানিক্যাল নাম পর্যন্ত আমার কণ্ঠস্থ হয়েছে। আজ সবাই জানে গাছের প্রাণ আছে একথা আবিষ্কার করেছিলেন এক বাঙালি ভদ্রলোক। কিছু গাছেরও যে মন আছে; স্মৃতি আছে, রুচি অরুচি আছে, তারাও যে মানুষের মতো কথা বলে, এমনকী মানুষের সঙ্গেও, ভয়ে ক্রোধে ভালোবাসায় উত্তেজিত হয়, হার্টফেল করে মারা যেতে পারে সে কথা নলিনাক্ষ না থাকলে আমি জানতেই পারতাম না।

আজকে ছিল ভূপতির দিন। আলোচনাটা শুরু করেছিল রাজনীতি নিয়ে, হাসপাতালের অচল অবস্থা নিয়ে। তারপর জ্যোতিষী, প্ল্যানচেট, জন্মান্তর ইত্যাদি বিষয়ে দুই বন্ধুর মল্লযুদ্ধ হতে হতে অ্যানাটিমি—ফিজিওলজিতে এসে ঠেকল!

প্রথমে বেশ হালকা ভঙ্গিতেই শারীরিক অসংগতি নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল। প্রায় সেটা আরম্ভ হয়েছিল নলিনাক্ষর তরফ থেকেই। ও বলছিল, এরকম দেখেছি, এক একজন মানুষের চেহারা আর চরিত্রের সঙ্গে তার কোনো বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিল হয়নি। নিখুঁত মূর্তি গড়তে গড়তে ভগবান মাঝে মাঝে কেন এমন করেন জানি না। কারও হাত মনে হয় তার নিজের নয়, শরীরের ছাদের সঙ্গে একদম মানায়নি, কিংবা

হাতের সঙ্গে আঙুলগুলো, বেমানান দেখলেই মনে হয় হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে— দু—ছড়া কলার মতো। মাথা যেন মাথা নয়— ঘাড়ে চেপে বসেছে উটকো ভাড়াটের মতো। এইভাবে কারও নাক, কারও কান, কারও পা। একজন ঢিলে—ঢালা অলস স্বভাবের মানুষ, দেখলেই বোঝা যায় আঠারো মাসে বছর কিন্তু হাঁটে যখন মনে হয় টাট্টু ঘোড়া ছুট লাগিয়েছে।

আমি বলছিলাম, হ্যাঁ, এই অমিলগুলো হাসির কারণও হয়ে ওঠে কখনো কখনো। হয়তো আড়াইমন ওজনের পিপের মতো মোটা লোকটা পেনসিলের সিসের মতো সরু গলায় কথা বলে ওঠে। আবার প্যাঁকাটি মার্কা নির্জীব চেহারার মানুষের গলায় মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে গিয়ে তখন তোমার রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইনটাই মনে পড়বে: অ্যাতোটুকু যন্ত্র হতে এতো শব্দ হয়, সত্যি বিষম বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে!

নলিনাক্ষ হাসল, হ্যাঁ, এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই একটা অদৃশ্য হার্মনি আছে। ছোটো ঘড়ি বড়ো ঘড়ি সব এক মাত্রায় চলছে। নিক্তি মাপা রাস্তায়। কিন্তু কখনো কখনো কিছু ব্যাপার খাপছাড়ার মতো ঘটে। কেমন যেন শ্রিংকোনাইজ করে না। ঘড়ির কাঁটা এক কথা বলছে কিন্তু তার বাজনা অন্য কথা। বাড়িতে আটটা বেজেছে হয়তো কিন্তু ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল, দেখোনি কখনো? মানুষের চোখে আর ঠোঁটেও এমনি ঘটনা ঘটতে দেখেছি। ঠোঁটের সঙ্গে চোখ মিলছে না, কিংবা চোখের সঙ্গে ঠোঁট। হয়তো হাসির কথা বলছে। ঠোঁট—মুখ হাসিতে ফেটে পড়ছে কিন্তু চোখ হাসছে না, কেমন বিষণ্ণ কিংবা ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে। খুব নিবিষ্ট হয়ে কোনো সমস্যার কথা ভাবছে লোকটা কিন্তু তার চোখ দুটো খঞ্জনি পাখির মতো নেচেই চলেছে অনবরত। কিংবা হাসছে রহস্যময় হাসি।

ভূপতি লুফে নিল কথাটা, 'ইয়েস নলিন, তুমি একটা জব্বর প্রশ্ন তুলেছ কিন্তু তার আগে বলি, চোখ আমাদের একটা ভাইটাল অর্গান। প্রতিমায় দেখোনি চক্ষুদান করা হয় সকলের শেষে, চক্ষু যোজনা মানেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা। জড় পদার্থ দেখতে পায় না, কেননা তাদের প্রাণ নেই। তোমার সাবজেক্টেই আসি, গাছ দেখতে পায়, তার চোখ আছে, সে যে প্রাণী এইটেই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। চোখ আমাদের অর্ধেক মগজ, বলতে গেলে আমাদের বারো আনা মনই বাঁধা আছে তার মধ্যে। জীবনের একটা প্রধান ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ এবং বর্জন। চোখের ভিতর দিয়ে সেই কাজটাই আমরা প্রতিমুহূর্তে করে যাচ্ছি। চোখ তাই কেবল শরীরের সৌন্দর্য বর্ধন করে না, সে আমাদের চেতনা বা প্রাণকে সজাগ রাখে।

আমি হেসে উঠলাম শব্দ করে। আমার হাসি মানেই উসকানি। বললাম, 'তোমার কথাগুলো আমি ঠিক গিলতে পারছি না, বেজায় গুরুপাক হয়ে যাচ্ছে, ভূপতি। তোমরা বিজ্ঞানীরা আমি দেখেছি সহজ ব্যাপারটাকে কেমন জটিল করে তুলে আনন্দ পাও। চোখ জিনিসটা তো শুধু দেখবার জন্যে, যেমন চশমা। তার মধ্যে ফালতু এতসব ব্যাপার ঢুকিয়ে দিচ্ছ কেন?'

ভূপতি রেগে গেল। বলল, 'তোমার মুণ্ডু! সত্যি, মাথায় যদি তোমার শুধু গোবর পোড়া থাকত তাহলেও আশা ছিল। গোবর থেকে গ্যাস হয়, তা থেকে জ্বালানি, আলো, বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাদের খুলির মধ্যে শুধু রীম রীম নিউজ প্রিন্ট ঠাসা তারা হোপলেস! চোখ দুটো দিয়ে কি আমরা শুধু দেখিরে হতভাগা! চোখ দিয়ে আমরা যেকোনো জিনিসকে ছুঁতে পারি, আস্বাদন করতে পারি। আমাদের শাস্ত্রে আছে ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয়। কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। চোখ দিয়েও আমরা খেতে পারি, শুনতে পারি, কথা কইতে পারি। ভিসুয়্যাল মেমরি বলে একটা কথা শোনা আছে নিশ্চয়। তা চোখের সত্যিই স্মরণ ক্ষমতা আছে, স্মৃতি আছে। একবার তার নিজস্ব, মস্তিষ্ক নিরপেক্ষ স্বাধীন ব্যাপার। বুঝলে ব্রাদার, এরকমটা নির্ভুল কমিউনিকেটিভ কম্পিউটার তুমি সারা দেহ তল্লাশি করলেও পাবে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি বহুকাল থেকে গবেষণা করে চলেছি। হয়তো একদিন প্রমাণ করে দিতে পারব।'

জানতাম। ভূপতির গবেষণার ব্যাপারটা আমার যে একেবারে অজানা ছিল তা নয়। নিউক্লিয়ার জিনিস নিয়ে ও কি সব পরীক্ষানিরীক্ষা করছিল তাও জানি। আমাদের শরীরের সবচেয়ে ছোটো ইউনিট সেল বা কোষের যে নিজস্ব একটা জীবন আছে প্রাণ আছে, আলাদা করে বেঁচে থাকা আছে এরকম একটা কথা

ভূপতিই আমাকে একদিন বলেছিল। এই ইনার ইউনিভার্স এই অন্তর্বিশ্ব যার রহস্যের দরজায় ও ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নিয়ে মাথা খুঁড়ে মরছে। কিন্তু চোখ, যা সহজেই আমাদের চোখে পড়ে, কোনো সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের দরকার হয় না, তা নিয়ে যে এতখানি মাথা ঘামিয়েছে সেইটেই জানতাম না।

আজকেও ওরা চলে যাবার পর আলো নিবিয়ে খাটিয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে আমি একটা ঘোরের মধ্যে পড়েছিলাম। না ঘুমোইনি, নিশ্চয়ই ঘুমোইনি। এই উত্তেজক আলোচনার সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা মিশিয়ে কিছু ভাববার চেষ্টা করছিলাম। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই, আমার চিন্তা সেই পথ ধরেও এগোচ্ছিল না। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমন এক রহস্যের জট পাকানো সুতোর তাল দিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম মাত্র। জন্মান্তর, এই জীবনের বাইরের জীবন, মানুষের ইচ্ছাশক্তি, জিনের স্রোত বেয়ে আসা মানুষের সংস্কার, অভ্যেস এবং সব শেষে এই অলৌকিক ক্যামেরা চোখ— যার ভেতর দিয়ে একজনের মন আর একজনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়, সম্মোহনের এই চাবি কাঠি, এই এক ধরনের রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে কল্পনার জাল বুনে চলেছিলাম এমন সময় আমার নাম ধরে কেউ ডাকল! ডাকল খুব কাছ থেকে, অদ্ভুত গলার, আমার এক চিলতে ঘরের ঠিক দরজায় এসে।

এক ঝটকায় যেন গোটা মাকড়সার জালটা ছিঁড়ে আমার হাতে মুখে জড়িয়ে গেল, কে! আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। প্যাসেজের জিরো ওয়াটের কমজোরি আলোয় দেখলাম চৌকাঠে হাত রেখে এক সিলুয়েট মূর্তি।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?'

'কই না।'

হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলাম। বার কয়েক চোখ পিট পিট করে টিউব লাইটটা জ্বলে উঠল। আলোয় চিনলাম। আমাদের মেসের নতুন বোর্ডার। সুশ্রী, ছিপছিপে, নায়ক—নায়ক চেহারা। একবার তাকালে ঝট করে চোখ সরিয়ে নেওয়া যায় না। বয়স গোটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে। দিন পাঁচেক হল এখানে এসে উঠেছেন, কিন্তু আলাপ হয়নি। এমনিতেই আমি একটু অমিশুক তার ওপর গোটা সপ্তাহটাই নাইট ডিউটিতে গেছে। নিশাচর প্রাণীর মতো দিনে ঘুমানো আর সন্ধে হলেই কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। তবু আসতে যেতে দু—এক ঝলক দেখেছি দূর থেকে।

'একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'আসুন আসুন।'

'সরি, ডিসটার্ব করলাম নাকি।'

'না না সে কি!'

'দীপক ব্যানার্জি, পাবনা থেকে এসেছি।' চেয়ারে ডবসে পড়ে সহাস্যে নমস্কার জানালো।

'আমি ধ্যানেশ সেন, খবরের কাগজে আছি।'

'জানি। মানে শুনেছি। আমি তো আপনার পাশের ঘরেই আছি।'

আমি জানতাম না, কারণ পাশের ঘরে অন্য একজন ছিলেন। তিনি বোধহয় ঘর বদলে নিয়েছেন। এটা সেটা দু—চার কথায় আলাপ জমে উঠল। দীপকের বাড়ি পাটনায়। অবস্থা বেশ ভালো। চাকরিটা শখের। এক ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ, বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছে।

ইতস্তত করে একসময় বলল, 'আপনার বন্ধুটি কি চোখের ডাক্তার?'

প্রসঙ্গটা ধরতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আর তখনই সত্যি করে চমকালাম। এতক্ষণ মনের যে অস্বস্তিকর কারণটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না, এবার স্পষ্ট করে চোখে পড়ল। সেই চোখ। দীপকের চোখ দুটো কেমন সবুজ লুমিনাস পেন্টের মতো, থেকে থেকে আলো পড়ে জ্বলে উঠছে। কিছু কিছু পশুর চোখ এরকম জ্বলে কিন্তু সেটা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার বোধহয় অন্য! ওর চোখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে মনে হল আর দশজনের যেমন হয় তেমন না। এ চোখ যেন ওর সমস্ত অস্তিত্বের বাইরে আলাদা এক ব্যক্তিত্ব। যেন আলাদা একটা মানুষ ওই চোখের ভেতর দিয়ে

আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শিরদাঁড়ার ভেতরটায় কেমন শিরশির করে উঠল। বুদ্ধি কিংবা কথা দিয়েও ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা অশরীরী অস্তিত্বের গন্ধ পাচ্ছিলাম যেন।

আমার মুখের চেহারা নিশ্চয় পালটে গিয়েছিল। ভয়—পাওয়া লোকের মতো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল।

চাপা গলায় দীপক বলল, 'আমার চোখের দিকে কী দেখছেন অমন করে?'

ধরা পড়ে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘোরালাম, 'কই না। ভাবছিলাম আপনি আমার কোনো বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করছেন।'

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে দীপক বলল, 'ক্ষমা করবেন, এটাকে আড়ি পাতা ভাববেন না। আপনাদের আড্ডার সব কথাই আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম পাশের ঘর থেকে। ভেরি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, অন্তত আমার কাছে। আপনার যে বন্ধুটি চোখের কথা বলছিলেন, উনি নিশ্চয়ই আই স্পেশালিস্ট?'

'ও তাই বলুন। না। চোখের ডাক্তার না। তবে— '

'তবে?'

'চোখের ব্যাপার নিয়ে ওর একটা কেমন খ্যাপামি আছে। চক্ষু বিষয়ে কী একটা গবেষণা করছে বলল।'

'শুনলাম। তবে আই মাস্ট সে খ্যাপামি নয়। আমি এ ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ, আনাড়ি। তবু বলব, ওঁর অ্যানালিসিস আমাকে চমকে দিয়েছে, চোখ ফুটিয়েছে—'

আমি কথা বলছিলাম কিন্তু আমার চোখ দুটোকে যেন কোনো জোরালো চুম্বক টানছিল। চুরি করে এক আধ পলকের জন্য আমি দীপকের চোখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আর একবার চমকে দিয়ে দীপক শব্দ করে হেসে উঠল। বিস্মিত গলায় বললাম, 'হাসছেন?'

দীপক মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। এ হাসি অনেক দুঃখের, ধ্যানেশবাবু।'

'বুঝলাম না।'

'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, একটা প্রশ্ন করব।'

'কী প্রশ্ন?' অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'আপনি আমার চোখ দেখছিলেন! দেখছিলেন না?'

একটু সময় নিয়ে শেষে শুকনো গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।'

'দেখে কি মনে হচ্ছে? এ আমার নিজের চোখ নয়, তাই না?'

উত্তর দিতে পারলাম না। বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে গেল। লোকটা কি মনের কথা সব টের পায়! বিব্রত হয়ে চুপ করে থাকলাম।

'ঠিকই ধরেছেন। এ চোখ আমার নিজের নয়।'

আমি হতভম্ব। দীপক আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবছি কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হল না, ও নিজেই আবার কথা বলল।

'বিলিভ মি। এ চোখ আমার সত্যিই নিজের নয়। আর সেটা বুঝতে পারলাম প্রথম কলকাতায় এসে। তা দিন দশেক আগে, তখনও মেসে এসে উঠিনি। এখানে এসে প্রথমে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠেছিলাম। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে এই মেসে। একটা বিবর্ণ হাসি দীপকের ঠোঁটে ভেসে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, 'কিন্তু আমি মূর্খ, নিজের কাছ থেকে কি কেউ পালাতে পারে!'

ভদ্রতাবশত আমি বাধা দিলাম, 'কী বলছেন আপনি! আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন। তবে সে এক লং স্টোরি। আপনাকে বোর করছি না তো?'

দীপককে দেখে, তার কথা শুনে আমার কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছিল। এই চোখের পিছনে কী রহস্য লুকোনো আছে কে জানে।

বললাম, 'ঠিক উলটো। বলুন আপনি। গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে!'

'এটা কিন্তু গপ্পো নয়। ফ্যাকট, সত্যি ঘটনা। ব্যাকরণ ভুল হল নিশ্চয়ই, ট্রু ফ্যাকটের মতো। তবে আপনার ভাবনার কোনো কারণ নেই, যতদূর সংক্ষেপে বলা যায় তাই বলব।'

দীপকের কথাগুলোকে ছাঁটকাট করে সাজালে তার মুখের গল্পটা এইরকম দাঁড়ায়:

সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলে এই পৃথিবী, এই চারপাশ, এই জীবন কেমন লাগে আমার জানা আছে। কারণ একটানা পাঁচবছর আমি কমপ্লিট ব্লাইন্ড হয়ে ঘরে বসেছিলাম। আমার দুনিয়া তখন দু—হাতের গণ্ডির মধ্যে, হাতড়ে বেড়ানো ছোট্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘড়ি তখন শুধু কানে শোনা একটা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। প্রহরে প্রহরে ভাগ করা, দিন আর রাত একাকার হয়ে গিয়ে অনিঃশেষ একটি ভয়ংকর রাত্তির হয়ে গিয়েছিল, যে রাত্রে চাঁদ নেই, তারা নেই, নিরেট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। আমার জীবন অর্থহীন, আমার আহার বিস্বাদ, আমার প্রিয় বইগুলো বোবা। সম্পূর্ণ একলা মানুষের চেয়েও আমি নিঃসঙ্গ, একা। শব্দ এবং নৈঃশব্দের মাঝখানে বন্দি প্রেতের মতো ভেসে রয়েছে। এই যন্ত্রণার তুলনা হয় না।

অথচ দুর্ঘটনা যখন ঘটে এরকমই অকারণে এক পলকে ঘটে যায়। ঘটনার পিছনে যুক্তি থাকে, কিন্তু দুর্ঘনার কোনো যুক্তি নেই। অর্থাৎ সেটা না ঘটতেই পারত তবু ঘটল। আমার তিরিশ বছরের জীবনে বছর বছর হোলির দিন এসেছে, চলে গেছে। সাবান মেখে সে আবির আর রং তুলে ফেলেছে। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর আগে দোলের দিনটি বোধহয় আলকাতরার মতো কালো রং নিয়ে এসেছিল। সেদিন ফাগুয়ার তাণ্ডবের মধ্যে কেউ আমার চোখে রং ছুঁড়েছিল। কী ছিল সেই রঙের মধ্যে জানি না, অনেক কষ্টে যখন চোখ খুললাম তখন দুটো চোখেই আর দৃষ্টি নেই, বেবাক অন্ধ হয়ে গেছি। চোখের সামনে যেন কোনো মানুষ নেই, দৃশ্য নেই, কিচ্ছু নেই। তবু তখনও একটু আলো ছিল, ঠিক আলো নয়, আলোর আভার মতো। ঠিক কী রকম জানেন, গভীর জলের তলায় ডুব দিয়ে চোখ খুললে যেমন দেখা যায় অনেকটা সেই রকম। ডাক্তার বদ্যি এলেন কিন্তু তাঁরা বিদায় নেবার আগেই সে আভাটুকুও আমার দুচোখ ছেড়ে চলে গেল।

পাটনায় আমরা তিন পুরুষের প্রবাসী বাঙালি। আমার ঠাকুরদা ছিলেন বিহারের ও অঞ্চলের বিধান রায়। বাবা এখনও ডাকসাইটে অ্যাডভোকেট। দুই পুরুষের জমানো সম্পত্তি আমার একটা জীবনেও ফেলে ছড়িয়ে বোধহয় শেষ করতে পারব না। কত বড়ো বড়ো কানেকশান আমাদের। দিল্লির দরবার ইস্তক ছড়ানো। তবু শেষ চেষ্টা, ভাই ব্যাঙ্ক থেকে একজোড়া চোখ পেতে আমাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হল। রক্ত বললেই যেমন রক্ত, ব্লাড গ্রুপ মিলতে হয়, চোখ বললেই তেমনি চোখ নয়। আমাদের দেহকোষ বা সেলের আধার যে টিস্যু, তার স্বভাব, তার চরিত্রও বিচিত্র। ফরেনবডিকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না। বোধহয় তারও পছন্দ অপছন্দ আছে।

শেষপর্যন্ত তেমন চোখ পাওয়া গেল। অপারেশনও সাকসেসফুল হল। আমি আবার আগের মতোই দৃষ্টি ফিরে পেলাম। আগে লেখাপড়া করার জন্য চশমার দরকার হত, এখন হয় না। চোখ ভালো হল, কিন্তু চশমা বেচারি ইনভ্যালিড হয়ে গেল, তার চোখ হারাল। আমি খুশি, আমার যেন পুনর্জন্ম হল। আমি আবার পুরোনো কাজে বহাল হলাম।

দিন যাচ্ছিল তরতর করে, ভালোই। কিন্তু কোথায় যে ছন্দ কেটে গেছে, টের পাইনি তখনও। আসলে আমার স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তন আসছিল! চির ধরছিল মনের মধ্যে। সব মানুষের মনের মধ্যেই হ্যাঁ আর না থাকে। অর্থাৎ এক মনের মধ্যে দুই মন। এক মন যাতে সায় দেয়, অন্য মন তাতেই বাগড়া দিতে চায়। তবে এটা খুবই অস্পষ্ট আকারে এবং কখনো কদাচিৎ, তাই তেমন করে বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু আমার কেস আলাদা, দুটোই সমান জোরালো। থেকে থেকে টাগ অফ ওয়ার লেগে যায়। এর ফলে কি না জানি না, আমি ক্রমশ কেমন রাগী হয়ে উঠছিলাম।

এই সময় অফিস থেকে আমাকে কলকাতায় পাঠাতে চাইল। আগের দিন হলেই নিশ্চয়ই এই বদলিতে রাজি হতাম না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার জন্যে আমার মনটা কেমন নেচে উঠল। চলে এলাম, বাড়ির অমত সত্ত্বেও। বাসাও ভাড়া নিলাম একটা। কিন্তু কলকাতায় এসে একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিল। আমার

চোখের থেকে ডবল ভিসন দেখতে লাগলাম, ডবল ইমেজ বললে স্পষ্ট হবে কথাটা। প্রথম দিনের কথাই বলি। কলকাতায় সেটা আমার দ্বিতীয় দিন। একটা রাস্তা দিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল একটা চেনা দোকান দেখে। থরে থরে কাচের শোকেসের ওপিঠে যে লোকটি বসেছে সে আমার বহুদিনের চেনা। এমনকী তার পেছনের ক্যালেন্ডারের ছবিটি পর্যন্ত। মনে পড়ল এই দোকানে কতদিন সরপুরিয়া খেয়েছি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। মাই গড! একি দেখছি। ক্যালেন্ডারের সালটি ১৯৭৪। ঠিক দশ বছর পুরোনো। এরকম ঝকঝকে দোকানে এক পুরোনো ক্যালেন্ডার? চোখ রগড়ে তাকালাম। দৃষ্টি বিভ্রম ছুটে গেল। দেখলাম, না। ১৯৮৪ সালেরই ক্যালেন্ডার। আর ছবিটা আদৌ আমার চেনা নয়। চেনা নয় ক্যাশবাক্স আগলে বসা লোকটাও। আর সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, কাচের শোকেসের রসগোল্লা সন্দেশ সরপুরিয়া কোনো ভোজবাজিতে রুপোর গয়না হয়ে গেছে। ঝকমকে বাউটি, কানপাশা, টায়রা, কাঁকই। যেন ইলেকট্রিক শক খেলাম। খেয়াল হল এই রাস্তায় জীবনে এই প্রথম পা রেখেছি। আসলে কলকাতায় এই আমার স্বচক্ষে আসা। এর আগেও একবার অবশ্য এসেছিলাম, মাস কয়েক আগে। সে তো সোজা হাসপাতালে, অন্ধ অবস্থায়। আই গ্র্যাফটিংয়ের পর কালো চশমা পরে সোজা দমদম এয়ারপোর্ট। সুতরাং চেনা লাগবার আদপেই কোনো রাস্তা নেই।

আমাকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কী চাই আপনার, বলুন দেখাচ্ছি।

আমি ঢোক গিলে বললাম, এখানে কাছে পিঠে একটা মিষ্টির দোকান ছিল না?

ছিল, কিন্তু এখন নেই। লোকটা হাসল, আপনি বোধহয় অনেককাল এ পাড়ায় আসেননি?

কেন বলুন তো?

এইটেই মিষ্টির দোকান ছিল। বছর দুই আগে—

লোকটিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন। কিন্তু পরপর আরও গুটি তিনেক ঘটনা ঘটল সেই দিনই। সবই দৃষ্টি বিভ্রমের। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। উলটোপালটা, রহস্যময়। সেসব ডিটেলস বলে আপনাকে বোর করব না! তবে কথাটা এই, রীতিমতো ভড়কে গেলাম। কেমন মনে হল চোখ খারাপ হয়েছে, তাই এরকম ইলিউশন দেখছি। বোধহয় চশমাই নিতে হবে।

একজন নামকরা আই স্পেশালিস্টের কাছে গেলাম। তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করে বললেন, আপনার চোখের স্বাস্থ্য বোধহয় আপনার থেকেও ভালো। আপনি বরং অমুক ডাক্তারের সঙ্গে আজই দেখা করুন। ওঁর চিঠি নিয়ে সেখানে গেলাম। তিনি সাইকিয়াট্রিস্ট। সাদা বাংলায় পাগলের ডাক্তার। আমাকে নানাভাবে বাজিয়ে দেখলেন। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, দূর মশাই, আপনার চোদ্দো পুরুষে কেউ পাগল নয়। সাধের পাগল না সেজে সোজা বাড়ি যান। একটা ঘুমের বড়ি দিচ্ছি। সেটি গিলে একখানা উনিশ রীলের ঘুম লাগান। দেখবেন ফ্রেশ হয়ে গেছেন।

ঘুমের বড়ি আর হালকা মন নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম সেদিন। কিন্তু সব মাটি করে দিল একখানা আয়না। দাড়ি কামানোর আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। শিরশির করে উঠল শিরদাঁড়ার ভেতরটা। কী দেখলাম জানেন? নিশ্চয় জানেন। একটু আমার চোখে আপনি যা দেখেছেন ঠিক তাই।

তারপর সে রাতে ঘুমের বড়ি খেয়েও কোনো লাভ হল না। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতো টুকরো টুকরো তন্দ্রা মাখা ঘুম ভেসে যেতে লাগল চোখের ওপর দিয়ে। প্রতিবারই জেগে উঠে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে আর একটা লোক শুয়ে আছে আমার পিছনে। তার গায়ে অসম্ভব তাপ, যেন পুড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় নিঃশব্দে ছটফট করছে লোকটা। থেকে থেকে তার ছোঁয়া লাগছে আমার গায়ে। সে ছোঁয়া কী রকম জানেন। বোবায় ধরলে, কিংবা হঠাৎ ভূতের ভয় পেলে যেরকম গাটা ভারী হয়ে যায় সেই রকম।

পরদিন ধুম জ্বর নিয়ে জ্ঞান ফিরল যখন, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। এক সহকর্মীর বাড়িতে দিন দুয়েক কাটিয়ে তারই চেষ্টায় উঠে এলাম এই মেসে। এখানে অন্তত একা থাকতে হবে না। সিঙ্গল সিটের রুম দিতে

চেয়েছিলেন ম্যানেজার, নিইনি। আমার ঘরে আর একজন ভদ্রলোক আছেন।

* * * *

দীপক ব্যানার্জির গল্পটা এইখানেই শেষ হতে পার। কিন্তু হল না। ভূপতি আর আমি কি করে ওর গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। নলিনাক্ষ অবশ্য সব শুনে বলেছিল, 'এটা বিজ্ঞানের যুগ। অলৌকিক গাঁজাখুরি গল্পের পেছনে তোরা যদি দৌড়াতে চাস দৌড়ো, আমি ওসবের মধ্যে নেই। লোকটার হয় মাথার গোলমাল, নয়তো মিথ্যে বলছে।'

'মিথ্যে বলে লাভ?'

'এক একজন লোক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ওরকম মিথ্যে বলে। তা ছাড়া অন্য ধান্ধাও থাকতে পারে।'

'কী ধান্ধা?'

'কী করে জানব!' নলিনাক্ষ পাশ কাটিয়ে গেল। আমার অবশ্য ওরকম মনে হল না। দীপকের সঙ্গে কথা বলে যেটুকু বুঝেছি তাতে ওর মাথায় গোলমাল থাকতে পারে কিন্তু মিছে কথা বলছে না। আর অন্য কোনো মতলব নিশ্চয় নেই। ভূপতি তো ওর কেসটা লুফেই নিল। তার থিওরির এমন কংক্রিট উদাহরণ একেবারে হাতের গোড়ায় এসে যাবে, এ যেন ভাবাই যায় না। সবচেয়ে সুবিধের কথা এই, আমাদের তিনজনের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে কোনো লুকোচাপা নেই। দীপক জানে আমরা তার শুভার্থী, তার এই বিপদের দিনে আমরা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো।

ভূপতির অনুমান এই নতুন চোখজোড়া থেকে দীপকের এই বিপত্তি শুরু হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন তবু থেকেই যায়। দৃষ্টি ফিরে পাবার পরেও কয়েকমাস দীপক পাটনায় ছিল। এই নতুন চোখের প্রতিক্রিয়া তাহলে তখন ঘটেনি কেন। সত্যি বলতে কী, কলকাতায় আসার পর ডবল ভিশন দেখার মতো কোনো ঘটনাই তার জীবনে ঘটেনি। কে ঘটেনি? কলকাতায় এসেই বা কেন ঘটল। এখানে এসে যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। সেই বাড়ির থেকেই কি তার ওপরে অলৌকিক কোনো শক্তি ভর করল? যে শক্তি তাকে অতীতকে দেখার শক্তি জোগায় কোনো কোনো মুহূর্তে? একই রাস্তায় একইসঙ্গে অতীত এবং বর্তমানকে পাশাপাশি দেখতে পাওয়া অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ত্রিকালঙ সিদ্ধ—পুরুষরা অতীত বর্তমানের পাশে ভবিষ্যৎকে দেখতে পান। ফিল্মের ডাবল এক্সপোজারের মতো শোনা যায় ট্রিপল এক্সপোজার। তিনটে ছবিই পরস্পরের মধ্যে গায়ে গায়ে সাঁটা। তবে ওসব পৌরাণিক গাল—গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া গেলেও দীপকের ব্যাপারটা কী? ভৌতিক কাহিনি? তাহলে তো প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করতে হয়।

ভূপতি কোনো গল্পে সন্তুষ্ট হবার মানুষ নয়। বিজ্ঞানের মাপকাঠিতেই সে সব কিছু মাপতে চায়। তাই তার খুঁটিনাটি প্রশ্নের শেষ নেই। দীপককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করে আর নোট নেয়। কোন হাসপাতালে কবে তার অপারেশন হয়েছিল, কে অপারেশন করেছিলেন। তার পাটনার ঠিকানা, কলকাতায় সেই ভাড়া বাসার ঠিকানা। অসুস্থ অবস্থায় যে সহকর্মীর বাড়িতে ছিল। যে চোখের ডাক্তার, যে সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে দেখেছিলেন তাদের সকলের নামধাম বিবরণ যেভাবে সে নোট করে নিল তাতে বুঝলাম ভূপতির সামনে এখন হাতে কলমে অনেক কাজ। মুখে কিছু না বলুক, তার অনুসন্ধানী অভিযান শুরু হয়ে গেছে। দীপকের গল্প আমি অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু সত্যি বলতে কি তার সঙ্গে আলাপ হবার পরে পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেছে অথচ ওরকম ঘটনা আর একদিনও ঘটেনি। ভূপতির কথা মতো দীপক দিন দশেকের ছুটি নিয়েছে, কাজে বেরোচ্ছে না। এই কদিন আমি আর ভূপতি পালা করে ওর সঙ্গে সেঁটে রয়েছি। একসঙ্গে খাই, ঘুমোই, বেড়িয়ে বেড়াই। বসে বসে গল্প করি। কিন্তু কোনো বিস্ময়কর ঘটনা পলকের জন্যেও ঘটেনি। নলিনাক্ষ প্রায় প্রতিদিনই আসে, দীপকের অলক্ষ্যে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে চলে যায়। আমরা কিছুই বলি না, বলার কিই বা আছে। হাতেনাতে প্রমাণ দেখাতে না পারলে অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করানো যায় না। উলটে বিশ্বাসী মানুষের মনও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসে। আমার মনের অবস্থা

এখন খানিকটা সেই রকমই। দীপকের চোখ জোড়া দীপকের মুখের সঙ্গে মেলেনি, তার স্বভাবের সঙ্গে বেমানান হয়ে আছে— সেটা টের পাই। সেটা হতেই পারে, কারণ ওই চোখ ওর নিজের নয়, আর একজনের, বাইরে থেকে চেষ্টা করে জোড়া লাগানো। তাই এ—রকম মনে হতেই পারে। রাতের বেলায় এক আধ মুহূর্তের জন্যে ওর চোখের মধ্যে সবুজ আলোর ঝিলিক ভূপতিও দেখেছে। ওর চোখের ক্লোজআপ ছবিও ভূপতি তুলেছে কয়েকখানা।

কিন্তু এতে কি প্রমাণ হয়? কিছুই না। অবিশ্যি সুস্থ মনে হলেও দীপক এক এক সময়ে কেমন উলটোপালটা ব্যবহার করে। দারুণ হাসাহাসি গল্পগুজব চলছে হঠাৎ দীপক গম্ভীর হয়ে গেল, মিনিট দশেক গুম হয়ে বসে থাকল, একটি কথাও বলল না। কিংবা দিব্যি বেড়াচ্ছি, আচমকা কী হল, কোনো কথা না বলে ও হঠাৎ পিছন ফিরে হনহনিয়ে হাঁটা দিল। পরে এ কথা হলে ও অবাক হয়, ও বিশ্বাস করতে চায় না ও—রকম কিছু করেছে বলে। নলিনাক্ষ শুনে বলে, এ সবই শো বিজনেস বুঝলে।

আজকেও দুজনে বেড়াচ্ছিলাম। রোজ দু—চার মাইল আমরা এভাবে হাঁটি। ভূপতি আজ দিন তিনেক কলকাতায় নেই। বোধহয় পাটনায় গেছে। আজকাল ও যে কী করে, কী ভাবে, কিছুই ভেঙে বলে না। আমার ওপর শুধু একটা নির্দেশ রেখে গেছে, দীপককে যেন সবসময় চোখে চোখে রাখি। রাখছিও। আজকেও গল্প করতে করতে ফিরছিলাম। হঠাৎ একটা কাণ্ড হল।

ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা অ্যাম্বাসাডার সবে চলতে শুরু করেছে এমন সময় দীপক গাড়ির মধ্যে কাউকে দেখতে পেয়েই পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল। আমি ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে ফেলে বিদ্যুৎগতিতে সে গাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। গাড়িটাও থামল না, টপ স্পিডে বেরিয়ে গেল। আমি বোকার মতো দীপকের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে কিছুদূর পর্যন্ত দৌড়ালাম। শেষে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম রাস্তার মাঝখানে। ধারে কাছে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেও গাড়ির পিছু ধাওয়া করতে পারতাম হয়তো, কিন্তু দরকারের সময় এই শহরে হাতের কাছে কিছুই পাওয়া যায় না। বহুক্ষণ দীপকের জন্য অপেক্ষা করে শেষে মেসে ফিরে এলাম। কিন্তু সারারাত অপেক্ষা করেও যখন দীপক ফিরল না আমার দুশ্চিন্তা হতে লাগল। মনে হল কাল রাতেই আমার থানায় ডায়েরি করা উচিত ছিল।

থানায় যাবার জন্য জামা কাপড় পরছি এমন সময় সেই ভোর সকালে ভূপতি এসে হাজির, মুখে চোখে ক্লান্তি। চুল উসকোখুসকো কিন্তু ঠোঁটে একটা সাফল্যের হাসি। এ সময় ও কখনো আসে না। তাই ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে কী ব্যাপার? কোথায় ডুব মেরেছিলি এই কদিন?'

ভূপতি উত্তেজিত গলায় বলল, 'সে অনেক কথা, পরে বলব। তবে আসল রহস্যের বোধহয় যবনিকা তুলতে পেরেছি। প্রথম থেকেই আমি এরকমটাই সন্দেহ করেছিলাম।'

আমি নিজের কথা, দীপকের কথা সেই মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়ে সংক্ষেপে ভূপতির অনুসন্ধানের যে কাহিনি শুনলাম সে সত্যি রোমাঞ্চকর। বছরখানেক আগে আমাদের কাগজের হেডলাইনগুলো আমার চোখে যেন ভেসে উঠল। কারণ সেগুলো আমিই লিখেছিলাম।

অনেকগুলো ডাকাতি মামলার ফেরারি আসামি ভাস্কর নস্কর ওরফে ফান্টাবাবুর হত্যার ব্যাপার নিয়ে তখন কলকাতায় ক—দিন খুব হইচই হয়েছিল। এই লোকটির শরীরে দুটি রিভলভারের বুলেট পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সে জন্য নয়। একদল লোকের ধারণা হয়েছিল বেওয়ারিশ এই লোকটিকে দিয়ে আসামি সাজিয়ে পুলিশ অন্য কোনো বড়ো ব্যাপার ধামাচাপা দিতে চাইছে। পুলিশ অবশ্য ফান্টাবাবুর খুনিকে ধরতে পারেনি, শুধু খুনির ফেলে যাওয়া রিভলভার আর কয়েকফোঁটা রক্ত আবিষ্কার করেছিল। খুনির ব্লাড গ্রুপ আর আঙুলের ছাপ ছাড়া তাদের রেকর্ডে আর কিছু নথিপত্র হয়নি। এদিকে মুমূর্ষ লোকটি যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিল তা অভাবনীয়, মৃত্যুকালে সে তার দুটি চোখই আই ব্যাঙ্ককে দান করে গিয়েছিল। তার এই শেষ ইচ্ছার কারণ হিসেবে বলেছিল, সে এখনই মরতে চায় না। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চায়। প্রায় কবির মতোই কথা।

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' যাইহোক, ভাস্করবাবু ওরফে ফান্টাবাবু সত্যিই ডাকাত ছিল কি না তা জানা না গেলেও সে যে অমানুষিক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল সে বিষয়ে ডাক্তাররা দ্বিমত হননি। ছ—ছটি বুলেট হজম করে, ফুসফুসে—হৃৎপিণ্ডে সরাসরি জখম হয়েও কোনো মানুষ যে ঘণ্টাখানেক মৃত্যুর সঙ্গে সজ্ঞানে যুঝতে পারে এবং তার চোখ দুটো তুলে নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে পারে, তাদের কেতাবি বিদ্যায়—এর ব্যাখ্যা নেই।

কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো খবর ফান্টাবাবুর এই চোখ দুটিই শেষপর্যন্ত দীপকের কপালে জুটেছিল।

ভূপতির মুখে দীপকের নাম শোনা মাত্র আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। ভূপতিকে ওর নিরুদ্দেশের খবর বললাম।

ভূপতি চমকে উঠে বলল, 'সে কি! থানায় ডায়েরি করেছিলি? অ্যাঁ, তাও করিসনি, যাঃ ইডিয়েট! গাড়িটার রং আর নম্বরও নিশ্চয় এতক্ষণে ভুলে মেরে দিয়েছিস? না!'

কালো রং আর আমার একটি প্রিয় সংখ্যা পরপর চারবার ব্যবহার হওয়ায় নম্বর প্লেট মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল। ছুটলাম লোকাল থানায়, সেখান থেকে লালবাজারে, তারপর দক্ষিণ কলকাতার এক হাসপাতালে কাল রাতেই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির আহত ও সংজ্ঞাহীন দেহ পুলিশ রাস্তা থেকে হাসপাতালে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। তাকে দীপক ব্যানার্জি বলে শনাক্ত করে আমরা ফের ছুটলাম ভূপতির এক্স—পেশেন্ট এবং প্রায় বন্ধুস্থানীয় ব্যারিস্টার ডি আর মিত্রর কাছে। আইন আদালতের খবরে যাঁদের বিন্দুমাত্র কৌতূহলও আছে তাঁরাই মিত্র সাহেবকে নামে এবং কাহিনিতে চিনবেন। অপরাধীদের কাছে এই ক্ষুরবুদ্ধি আইনজীবী মানুষটি ডিয়ার তো নন—ই, মিত্রও নন। লোকে রসিকতা করে বলে, ইংরেজি ডেনজার শব্দের আদি এবং অন্তের দুটি নিয়ে ধ্রুব রঞ্জনের ডি. আর।

রূপকথার গল্পের মতোই দীপকের গল্পও এখানেই শেষ। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে মেসে ফিরে এসেছিল। তবে রাজসাক্ষী হয়ে তাকে যথাসময়ে কোর্টে হাজির হতে হয়েছিল। কারণ আমার দেওয়া গাড়ির নম্বর, আর তার দেওয়া মোটর আরোহীর বিবরণের সঙ্গে পুলিশ বছর খানেক আগে তুলে রাখা আঙুলের ছাপ আর রক্ত মিলিয়ে ফান্টাবাবুর হত্যাকারীকে হাতকড়া পরিয়েছিল! সে অনেক ঘটনা এখন। তবে দীপকের চোখ আর তাকে কোনোদিন ট্রাবল দেয়নি। কিন্তু ভূপতির থিওরি এইখানে এসেই আচমকা একটা ধাক্কা খেয়েছে।

জানলার ওপাশে

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

বাপন জানে রাত্তিরে এই সময়টা বাবা একলা থাকতে ভালোবাসেন। একটা সময় ছিল যখন আকাশের দিকে তাকালে বাড়তি কিছু দেখতেন। যা মনে হত লিখে রাখতেন ডায়েরির পাতায়। পরের জীবনটা এই সময়ের সঙ্গে জোড়ে মিলল না। ডায়েরিগুলো হারিয়ে গেছে কবে।

এখন বাবা অফিসে বসেন এয়ার—কন্ডিশান্ড ঘরে। আগেকার আমিকে মনে পড়ে না। আকাশের দিকে তাকাবার ফুরসত কই। ফাঁক পেলে রাত্তিরে খাবার আগে দশ তলার এই ব্যালকনিতে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন বাবা। তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে। পুরোনো সেই লেখালেখির কাজই করেন বোধহয়। তবে কাগজে—কলমে নয়, মনে মনে।

এই সময়টা কথাবার্তার বাইরে রাখতে চান। টেলিফোন ধরেন না। বাবা এমনিতেই একটু দূরের মানুষ। কতটুকু সময়ই বা বাপন কাছে পায়। আবার মাকেও কথাটা জিজ্ঞেস করার নামেই অস্বস্তি। মা আগে কলেজে অঙ্ক কষাতেন। বাপনের জন্মদিনে বিজ্ঞানের বই উপহার দেন। মাকে বললে হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবেন। উলটো বিপত্তিও হতে পারে। হয়তো শোনাতে বসবেন পনেরো বছর বয়েসে কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কী প্রতিভার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল তার গল্প। অথচ বন্ধু টুকাইয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক হয়ে গেছে বিকেলে: ভূত আছে, না নেই? বাপন মায়ের কথাগুলো নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছিল—ভূতটুত কিছু নেই। আসলে বহু বছরের সংস্কার, অজ্ঞতা আর ভয়ের সঙ্গে পরিবেশের কিছু অস্বাভাবিকতা মিলে হ্যালিউসিনেশানের সৃষ্টি করে। টুকাই কিন্তু মেনে নিল না বাপনের যুক্তি। ওর ছোটোমামা নাকি নিজের চোখে এক মৃত বন্ধুকে দেখেছেন শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার পর। ছোটোমামাও আগে কিছু জানতেন না। এই অভিজ্ঞতার পর থেকে স্পিরিচুয়ালিজম নিয়ে মেলাই পড়াশুনা শুরু করে দিয়েছেন।

নিজের সঙ্গে খানিকক্ষণ যুদ্ধ করল বাপন। তারপর নিয়ম ভেঙে বাবার এই সময়ের নিজস্ব সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ার কথা ভাবল। দশতলার ওপর থেকে কলকাতাকে চির—দেওয়ালির শহর বলে মনে হয়। ওপরে তারার শলমা—চুমকি বসানো মস্ত চাঁদোয়া। এখান থেকে দেখলে আকাশের চেহারা অন্যরকম।

বাবার সঙ্গে সব সময় থাকে স্টেট এক্সপ্রেসের প্যাকেট আর গ্যাস লাইটার। নিজে খান খুব কম, অন্যকে বিলোন বেশি। তবে এই সময়টাতে জ্বলন্ত সিগারেট বাবার আঙুলে ধরা থাকে। আজও ছিল।

'বাবা', বাপন একটু দোনোমোনো করে নীচু গলায় ডাকল।

'কী রে, কিছু বলবি?' বাবা যে তারাদের রাজ্যপাট ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন বুঝতে পারেনি বাপন। তাই কথাগুলো সাজিয়ে নিতে একটু সময় লাগল। বাবা কিন্তু তাকিয়ে আছেন বাপনের দিকে। আবছা আলোতেও বাবার মুখে একটা আলগা হাসি। এ—রকম হাসি ভেতরের কথা টেনে আনে।

বাপন চোখ—কান বুজে দুদ্দাড়িয়ে বলে ফেলল। বাবা কিন্তু হাসিটাকে টেনে বাড়ালেন না। তেমনই তাকিয়ে রইলেন বাপনের দিকে। 'পরশুরামের লেখা মহেশের মহাযাত্রা পড়েছিস?' বাবার প্রশ্নটা বাপনের কাছে মনে হল একটা ধাঁধা। বলতেই হল, এরকম কোনো লেখা সে পড়েনি।

'এই জন্যেই আমি সোকলড ইংলিশ—মিডিয়াম স্কুলগুলো দুচক্ষে দেখতে পারি না,' বললেন ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশানের প্রাক্তন ছাত্র, 'রবীন্দ্রনাথের শিশু ভোলানাথ, সে, খাপছাড়া, অবন ঠাকুরের বুড়ো

আংলা, আলোর ফুলকি, সুকুমার রায়ের বানানো একটা আশ্চর্য নেভার—নেভার ল্যান্ড—এ সবই চিরদিন নাগালের বাইরে থাকবে। পরশুরাম তো অনেক দূরের কথা।'

বাপন কিন্তু বাবাকে নতুন করে চিনছে। মস্ত বড়ো মাল্টিন্যাশনালের ব্যস্ত সিনিয়র একজিকিউটিভ নন। বেশ আটপৌরে ঘরোয়া গোছের বাবা। যিনি বাড়িতে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে মেঝের ওপর বসে ছেলের হালচালের খোঁজখবর নেন। 'পরশুরামের গল্পে মহেশ আর হরিনাথ দুই বন্ধুর মধ্যে এই একই প্রশ্ন নিয়ে হাতাহাতির অবস্থা,' বাবা বলে চললেন, 'তবে আমার নিজের কাছে ব্যাপারটা একটা বর্ডার লাইন কেস হয়ে আছে। মানে, ইট ক্যান বি এক্সপ্লেন্ড আইদর ওয়ে। মহেশ মৃত্যুর পরে হরিনাথকে বলে গিয়েছিলেন, আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি, বিশ্বাসীরা হয়তো তাই বলবে। আবার যদি বল হ্যালিউসিনেশান উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা, তাহলেও প্রতিবাদ করব না। সেভাবে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করা যায়।'

'তার মানে, তুমি বলতে চাও তোমার নিজেরই সুপার ন্যাচারাল এক্সপিরিয়ান্স আছে।' বাপন তার রাশভারী বাবার কথা শুনে তাজ্জব।

'ইয়েস স্যার, যদি শুনতে চাও তো ঘর থেকে একটা ফোল্ডিং চেয়ার এখানে নিয়ে এসো।'

বাপনকে আর বলতে হল না। ডিনারের মেনুতে আজ রেশমি কাবাব আছে। মা জনার্দনকে নিয়ে কিচেনে ব্যস্ত। বাবা এর মধ্যে আবার নতুন করে সিগারেট ধরিয়েছেন।

বাবা মানে চোখা ইংরিজি উচ্চারণ, স্যুট—টাই—পরা একটি জলজ্যান্ত ব্যস্ততা। গল্প যারা বলে বলে তাদের চালচলনের সঙ্গে মেলে না। অথচ একই মানুষের মধ্যে থাকে এমন একজন যে কখনো চেনা, কখনো অচেনা। সেই অচেনা মানুষটাই গল্পের বঁড়শি দিয়ে টেনে নিল বাপনকে।

'যত দিন যাচ্ছে,' বাবা বললেন, 'মানুষ ততই সরে যাচ্ছে প্রকৃতির কাছ থেকে। আমাদের ছোটোবেলাতেও কলকাতায় কত বেশি গাছ ছিল। বছর দশ—বারো আগেও বাকসা ডুয়ার্সের জঙ্গলে দেখেছি দিনদুপুরে সন্ধেবেলার আলো—আঁধারি। আমার ঠাকুরদা একটা ছোটো ব্যবসা থেকে তিন—চারটে বড় ব্যবসা বানাতে পেরেছিলেন। আদতে কিন্তু গ্রামের লোক। গাছপালা ভালোবাসতেন। মাঝেসাঝে তাঁর ইচ্ছে হত ব্যবসা—বাণিজ্য, হিসেবনিকেশ দিন—কয়েকের জন্যে ভুলে যেতে। দু—চোখ ভাব আকাশের নীল আর গাছের সবুজ দেখে আবার নতুন উৎসাহে কাজে লেগে পড়া। তাই কলকাতার নাগাল ছাড়িয়ে পেল্লায় এক বাড়ি করেছিলেন মধুপুরে। সেকালে অনেক সচ্ছল অবস্থার বাঙালিই বাড়ি করতেন এইরকম ফাঁকফর্দা জায়গায়। কতকটা হলিডে রিসর্ট গোছের। একটু গাছপালা, নির্জনতা, পাখির ডাক, মনটাকে তরতাজা করে দিত। এখনও সেসব বাড়ি পড়ে আছে নানান জায়গায়। কিন্তু তাদের হালের মালিকরা ওদিক মাড়ানো মানে সময়ের অপব্যয় বলে মনে করে।'

'তুমি যে বাড়িটার কথা বললে সেটা এখনও আছে?' বাবা একটু থামতেই বাপন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ আছে, আমি শেষবার গেছি বছর—কুড়ি আগে।' বলতে বলতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বাবা বললেন, 'কিন্তু আর যাইনি, যাবও না বোধহয় কোনোদিন।'

'কেন বাবা?' বাবার তৈরি সাসপেন্সের চতুর্দোলা থেকে নামবার জন্যে বাপন জিজ্ঞেস করল।

'সেইটেই আমার গল্প,' বাবা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'আর তার মধ্যেই তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর।'

'তুমি যেমন আমার এক ছেলে,' বাবা নতুন করে খেই ধরলেন, 'আমিও আমার বাবার এক ছেলে এটুকু তুমি জানো। আমার ঠাকুরদা ডালপালা ছড়িয়েছিলেন অনেকগুলো। সবসুদ্ধ বোধহয় জনা—চোদ্দো ছিল। আমার বাবা তো শেষের দিকের ছেলে। আমার জ্ঞান হয়ে আমি তিন জ্যাঠা আর দুই পিসিকে দেখেছি। তাও এক জ্যাঠা, তিনি আবার বিয়ে—থা করেননি, সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক সময় পুজো কি গরমের ছুটিতে দাদু, ঠাকুমা, জ্যাঠতুতো আর পিসতুতো ভাইবোনেরা গিয়ে জমায়েত হত মধুপুরের সেই বাড়িটাতে। সবাই যে সব সময় যেত তা নয়। তাহলেও বাড়িটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠত। ছোটোবেলাতেই মাকে

হারিয়েছি, তাই জ্যাঠাইমা আর পিসিমাদের একটু বাড়তি আদর পেতাম। আরেকজনের স্নেহ—ভালোবাসার সিংহভাগ তোলা ছিল আমার জন্যে। সে হল মেজো জ্যাঠার ছোটো মেয়ে শিপ্রাদি। আমার চেয়ে সাত বছরের বড়ো। তাকে শেষ দেখি আমার দশবছর বয়সে। সেও আজ পঁচিশ বছর হয়ে গেল। তাকে দেখি মানে তার জলে ভেজা দেহটা দেখি। ওই মধুপুরের বাড়িতেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কী করে বলতে পারব না। আমি ছোটো, তাই হয়তো ব্যাপারটা কেউ আমার সামনে আলোচনা করেনি। তবে সেই বয়েসেই জানতাম শিপ্রাদির মধ্যে একটা অ্যাবনরমালিটি আছে। ছোটোবেলায় একবার মেনিনজাইটিস হয়েছিল। সেকালে এসব রোগের চিকিৎসা প্রায় ছিল না কিছু। তবু কী করে যেন বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু ডাক্তাররা বলেছিলেন ওর দ্বারা লেখাপড়া আর হবে না। কোনোরকম বাড়তি মানসিক চাপ ওর জখম মস্তিষ্ক নিতে পারবে না। তাই পড়াশোনার জন্যে কেউ জোরাজোরি করেনি ওকে। মেজো জ্যাঠাইমা শিপ্রাদিকে নিয়ে অনেক সময় থাকতেন মধুপুরের বাড়িতে। প্রকাণ্ড আম, জাম, পেয়ারা, কাঁঠাল আর ফুলের বাগান। তার মধ্যেই শিপ্রাদি কতকটা কপালকুণ্ডলার মতো বড়ো হয়ে উঠেছিল।

'কেন জানি না আমাকে অসম্ভব ভালোবাসত। প্রায়ই আমাকে বলত, অভি, আমি যখন থাকব না, তখন মনে রাখবি তো আমাকে? আমি বলতাম, কেন, তুমি আবার কোথায় যাবে। শিপ্রাদি বলত, দেখিস একদিন আমি হারিয়ে যাব, আর দেখতে পাবি না আমাকে। তুই কিন্তু আমার কথা ভুলিস না। কথাগুলো বলতে বলতে শিপ্রাদির চোখ জলে ভরে উঠত। তাই দেখে আমারও কান্না পেত। ও চোখের জল মুখে বলত, ভুলে যদি যাস, তাহলে আমিই তোকে মনে করিয়ে দেব। তখন ওর কথাগুলোর মানে বুঝিনি।

'সুন্দর মাটির পুতুল বানাত শিপ্রাদি। নিজেই সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে রং করত। সে পুতুলের দাবিদার ছিল অনেক। কিন্তু সেরা পুতুলগুলো আমার কপালেই জুটত। এই নিয়ে আবার ভাইবোনেদের মধ্যে নানান মান—অভিমানের পালা চলত। যা হোক, একটা সালিশি করে দিত ওই শিপ্রাদিই। সবাইকে কাছে টানত, গল্প বলত বানিয়ে বানিয়ে। গল্পগুলো ঠিক মনে নেই এতদিন পরে। তবে এটুকু খেয়াল আছে সেগুলোর চরিত্র বা পরিবেশ কোনোটাই ঠিক চেনাজানার মধ্যে পড়ে না। আবার এক এক সময় কী রকম যেন একা হয়ে যেত সকলের মধ্যে থেকেও। কথা বললেও জবাবা দিত না তখন। কাউকে দেখেও দেখত না। মুখে ফুটে উঠত এক অদ্ভুত হাসি। সে হাসির সঙ্গে কোনো কিছুর মিল দেওয়া যায় না। তখন কেন জানি আমার মনে হত শিপ্রাদি ঠিক আমাদের মতো মানুষ নয়। আমাদের সঙ্গে চিরদিন থাকার জন্যে আসেনি। কোনো প্রিয়জন যেন বেড়াতে এসে থেকে গেছে কিছুদিনের জন্যে। আবার যেদিন ঘরের কথা মনে পড়বে, সেদিনই চলে যাবে। মাঝে—মাঝে ঘণ্টা—কয়েকের জন্যে বেপাত্তা হয়ে যেত। হাজার খুঁজেও ওর নাগাল পাওয়া যেত না। আবার নিজে নিজেই চলে আসত। কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞাসা করলে হাসত শুধু, জবাব দিত না।

'শিপ্রাদির জীবনের শেষ দিনটার কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। পুজোর ছুটির সময়। আমরা সবাই মিলে গাইতাম, আজি ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা। শিপ্রাদি ওর ঝামর চুল উড়িয়ে নিজের মতো করে নাচত আমাদের গানের সঙ্গে। গায়ের রং ফরসা হতে গিয়েও হয়নি। কিন্তু চোখমুখ ছিল দেবীপ্রতিমার মতো, আর ছিল মস্ত এক ঢাল চুল যা কখনো খোঁপা বা বিনুনির চেহারা নেয়নি। ওর মতো চুলের গোছ আজ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি।

'দুপুরে খাওয়ার আগে শিপ্রাদিকে পাওয়া গেল না সেদিন। খোঁজাখুঁজি ঠিকই হল। তবে বড়োরা কেউ ভীষণরকম তোলপাড় কিছু করল না। এ—রকম ডুব মারাটা নতুন কিছু নয়। শুধু আমার মনটা কেন জানি ছ্যাঁত করে উঠল। সেদিনই সকালে আমাকে বলেছিল, জানিস অভি, ওরা সব সময় আমাকে ডাকছে। খালি বলছে, চলে আয়, চলে আয়। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কারা তোমাকে ডাকে এমন করে! আমার কথা যেন শুনতেই পেল না। নিজের মনে বলল, ওরা তো মাঝে—মাঝেই আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। নিজেই আবার জোর করে ছাড়িয়ে চলে আসি। কিন্তু এবারে বোধহয় আমার যাবার সময় হল। গেলে আর আসব না। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কী রে, আর যদি না আসি, মনে রাখবি তো আমাকে।

আমার বুক ঠেলে কান্না আসচিল। জোর করে ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়েছিলাম। জীবিত অবস্থায় সেই ওকে শেষ দেখি।'

বাবা আবার নতুন করে সিগারেট ধরালেন। পর পর তিনটে সিগারেট কখনো খান না। বাপন অবাক হতে ভুলে গিয়েছিল। এক মনে শুনছিল বাবার কথাগুলো।

'বিকেলের দিকে একটা হইচই শুনলাম। তার সঙ্গে সেজো জ্যাঠাইমার আছাড়িপিছাড়ি কান্না। আমি যখন গেলাম, কুয়ো থেকে তোলা হয়েছে শিপ্রাদিকে। ভিজে কাপড়ে, এক ঢাল ভিজে চুলের ফ্রেমে বাঁধানো মুখে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোনো ছাপ নেই। চোখ বোজা। মুখে সেই হাসিটার আভাস। যে হাসির মানে বোঝা যেত না। ও নিজেও কখনো বোঝাত না। আমি ভাবতেই পারছিলাম না শিপ্রাদি আর বেঁচে নেই। কে যেন আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল কুয়োতলা থেকে।

'শিপ্রাদির মারা যাবার পরেই ও বাড়ির আনন্দের হাট ভেঙে গেল। এক বছর আগুপিছু করে আমাদের দাদু আর ঠাকুমা বলে ডাকার কেউ থাকল না। বাড়িটার সঙ্গে দূরত্ব বেড়েই চলল। বাবা—জ্যাঠা—পিসিদেরও ওদিক পানে যাবার ইচ্ছেয় ভাঁটার টান। অথচ সকলেই জানে বাড়িটা ঠিকই আছে; আছে ওখানকার সম্পত্তি দেখাশোনার জন্যে নায়েবগোছের একজন। তা ছাড়াও আছে কাজের লোক, দরোয়ান। এমনি করে কেটে গেল অনেকগুলো বছর। আমি লেখাপড়া শেষ করে একটা কোম্পানিতে সেলসের কাজে ঢুকলাম। পাটনায় আমাদের মতো ফেরিওয়ালাদের জন্যে একটা অফিস থেকে কনফারেন্স ডেকেছিল। সেখান থেকে ট্রেনে ফিরছিলাম কলকাতায়। শীত পড়ি—পড়ি করছে তখন। দুপুর নাগাদ ট্রেন পৌঁছল মধুপুর। আগেও বহুবার এপথে এসেছি, গেছি। স্টেশনটা বোধহয় ঘুমের মধ্যে পার হয়ে গেছি অনেক রাতে। কিন্তু দিনের আলোয় জায়গার নামটা থিতিয়ে পড়া অনেক স্মৃতিকে তোলপাড় করে তুলল। সেইসব স্মৃতির হাত ধরে মনটা চলে যেতে চাইল ছোটোবেলায়। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে হাল আমলে ফেরাতে পারলাম না। বাড়িটা চুম্বক হয়ে টানতে লাগল আমাকে। সুখে—দুঃখে একাকার বাড়িটার স্মৃতি আমাকে বের করে আনল ট্রেনের কামরা থেকে। সেই প্রচণ্ড টানকে ততক্ষণে আরও জোরদার করেছে আমার নিজের হঠাৎ চাগিয়ে ওঠা কৌতূহল। দেখিই না কেমন আছে বাড়িটা। আবার কাল সকালেই তো কলকাতা ফেরার পালা। একটা রাত না হয় নাড়াচাড়া করব ছোটোবেলার স্মৃতিগুলো নিয়ে।

'নায়েববাবু আরও বুড়িয়ে গেছেন। তবু আমাকে চিনলেন ঠিকই। খুব খুশি আমাকে দেখে। আগের দিনের কথা মনে করে অনেক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কেউ আর এদিক মাড়ায় না বলে দুঃখের শেষ নেই তাঁর। এই বিশাল বাড়ি যক্ষের মতো আগলে বসে আছেন। উনি চোখ বুজলে এই মস্ত সম্পত্তি পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে।

'বাড়িটার তিনতলায় ঘর ছিল কুল্যে একখানা। কেন জানি না ওই ঘরটাতেই রাত কাটানোর ইচ্ছে হল আমার। নায়েববাবু একটু খুঁতখুঁত করলেন। নীচের ঘরগুলো সাফসুতরো করাই আছে। খাট—বিছানারও অভাব নেই। আমি তবু তিনতলার ঘরটাতে থাকবার জন্যে জেদ করলাম। সারা বিকেল, সন্ধে এলোমেলো ঘুরে ছোটোবেলার সঙ্গী—সাথীদের খুঁজলাম। বিশেষ কাউকে পেলাম না। যে ক—জন আছে, তারাও নিজের নিজের রুটিরুজির ধান্ধায় ব্যস্ত। ছোটোবেলার স্মৃতিচারণের ইচ্ছে বা সময় কোনোটাই নেই তাদের।

'খবর দিয়ে আসিনি। তাহলেও দুবেলা খাওয়াদাওয়া ভালোই হল। রাত্তিরের খাবার পাট চুকিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। পরের দিন ভোরঘেঁষা সকালে ফেরার ট্রেন। তিনতলার ঘরটায় ঢুকে আলো জ্বালতেই চার দেওয়াল, চারটে হাত হয়ে আপনজনের মতো টেনে নিল আমাকে। বইয়ের র‍্যাক থেকে ধুলো ঝেড়ে বের করলাম যোগীন সরকারের বনে—জঙ্গলে, ছবি ও গল্প। ছোটোবেলায় কী ভালই না লাগত বইগুলো। মনে হল খুব কাছের লোকের সঙ্গে দেখা। এই নতুন করে দেখার আগে অনেকগুলো বছর ঢুকে গেছে। আলাপ—পরিচয় তাই ঠিক আগের মতো ঝালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। কেমন যেন সুর কেটে গেছে। তখন আমার বয়েস ছিল দশ, এখন পঁচিশ। পনেরোটা বছর অনেকখানি সময়। একটা মানুষকে আগাগোড়া বদলে দেবার

পক্ষে যথেষ্ট। পঁচিশ বছর বয়েসে দশ বছর বয়েসের স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায়; নাগাল পাওয়া যায় না ছোটোবেলার সেই মনটার। চেষ্টা করলাম নিজেকে হারিয়ে খোঁজার। কিছু পেলাম, ভাঙাচোরা টুকরো—টাকরা। বুঝলাম নেহাতই ঝোঁকের মাথায় এসে পড়েছি। এখানে সময় পনেরো বছর ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি কোনোদিন, সেখানে ফিরতে পারব না।

'আগেই বলেছি শীত জাঁকিয়ে বসার কাছাকাছি সময়। ঘরের প্রায় সবগুলো জানলা বন্ধ। খোলা শুধু একটা। পরিপাটি বিছানা পাতা। কাল ভোরে ওঠার কথা মনে করে শুয়ে পড়লাম। ঘুমোবার আগে বইয়ে চোখ বোলানো অভ্যেস। সঙ্গে ছিল পাটনা স্টেশনে হুইলারের স্টল থেকে কেনা ইংরিজি ডিটেকটিভ উপন্যাস। ভালো ঘুমপাড়ানি ওযুধ। ভেবেছিলাম চোখে টান ধরলেই বেড সুইচ টিপে বাতি নিবিয়ে দেব। পাতা উলটে গেলাম বেশ কয়েকটা। কিন্তু ঘুমের নাগাল পেলাম না। বইয়ের অক্ষরগুলো মানেটানেসুদ্ধ পিছলে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। পড়ছি, কিন্তু মনে কিছুই দাগ কাটছে না। বইটা রেখে উঠে পড়লাম। দাঁড়ালাম ঘরের একটিমাত্র খোলা জানলার ধারে। বাইরে চাঁদের আলো অন্ধকারকে বাড়তে দেয়নি। সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান। তারপরেই একটা কুয়ো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অমনি মনের মধ্যে একটা ছায়া পড়ল। ভিজে এক ঢাল চুলের ফ্রেমে বাঁধানো মুখে একটা বেমানান হাসি নিয়ে শুয়ে ছিল একজন। পুরোনো অ্যালবাম থেকে একটা ছবি আলাদা হয়ে খুলে এল। সময়ের ঘষায় এতটুকু অস্পষ্ট হয়নি। মন থেকে মুখে ফেলতে চাইলাম ছবিটা। পারলাম না। কেমন একটা অস্বস্তি একটু—একটু করে পেয়ে বসছে আমাকে। জ্যোৎস্নায় ধোওয়া। সেই কুয়োতলা থেকে কিছুতে চোখ সরাতে পারছি না। হালকা হাওয়ায় গাছপালা মাথা দোলাচ্ছে। আলো আর অন্ধকার জায়গা বদলাবদলি করছে সমানে। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া অন্য শব্দ নেই। মনে হল সারা বাগান, ওই কুয়োতলা হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে।

'দড়াম করে বন্ধ করে দিলাম জানলাটা। আবার এসে বসলাম বিছানায়। গরম নেই ঘরের মধ্যে। তবু টের পেলাম কপালে বিন্দু—বিন্দু ঘাম জমে গেছে। আমি পঁচিশ বছরের সুস্থ সবল মানুষ একজন। ছাত্রজীবনে কবিতা লিখেছি, ছাপাও হয়েছে। কিন্তু কল্পনা কখনো এ—রকম লাগামছাড়া হয়নি। ট্যুরের চাকরি। অজস্রবার অচেনা অজানা বাংলোতে রাত কাটিয়েছি। চোর—ডাকাত ছাড়া অন্য কোনো কারণে এ—ধরনের ছমছমে অস্বস্তি বোধ করিনি। অথচ এই ঘর আমার চেনা, কত স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িয়ে। বুঝতে পারছি এই মুহূর্তে যেটা অস্বস্তি, যে—কোনো সময় সেটাই ভয়ের চেহারা নিতে পারে। যুক্তিবাদী মনটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সব কিছুর মানে খুঁজে বের করার। একটা সময় তাকে হার মানতেই হবে। আর ঠিক তখনই জেঁকে বসবে ভয়।

'বিছানায় শুয়েও শয্যাকণ্টকী। বই সামনে ধরলেও চোখের নজর যায় পিছলে। ছাপার অক্ষর টপকে চলে যায় বন্ধ জানলাটার ওপর। অমনি মনের আয়নায় দেখতে পাই জ্যোৎস্নায় নিকোনো কুয়োতলাটা। অনেক চেষ্টা করেও এই ছবিটা অন্য চিন্তা দিয়ে আড়াল করা গেল না। উলটে একটা বাড়তি ভাবনা পেয়ে বসল আমাকে। যাকে ভেবে মন বারবার ছুটে যাচ্ছে কুয়োতলায়, সে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে, বন্ধ জানলার ওপাশে। হাজার যুক্তির ঝাড়ু চালিয়েও কথাটা তাড়াতে পারলাম না। এমন সময়,' বলে বাবা থামলেন একটু।

'এমন সময় কী?' বাপনের গলাটা একটু চড়ে গেল। বাবার গল্পের মধ্যে কতখানি ঢুকে গেছে নিজেই বুঝতে পারেনি।

'বন্ধ জানলার ওপাশ থেকে কাঠের পাল্লার ওপর স্পষ্ট শব্দ হল ঠকঠক। পোকা নয়, মাকড় নয়। পরিষ্কার মানুষের হাতে আঙুলের উলটো দিকের গাঁট দিয়ে ঠোক্কর মারার আওয়াজ। যেন কেউ আমার নজর কাড়ার চেষ্টা করছে। ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিকের আলো। আবার ঠিক মাপা দুটি নৌকা জানলার ওপর। শব্দটা আমার মন থেকে যুক্তিটুক্তিতে ভাগিয়ে আমাকে ফেলে দিল ভয়ের গর্তে। সে গর্তের আবার তলা নেই। একবার তার মধ্যে পড়লে শুধু তলিয়েই যেতে হয়।

'আমি বিছানায় আধশোয়া হয়ে। বন্ধ জানলাটা থেকে কিছুতে চোখ সরাতে পারছি না। ফের শব্দ হল—ঠক ঠক। সামান্য একটু বাদে আবার ঠক ঠক। আপনা হতেই শব্দগুলো আমার কাছে কথা হয়ে গেল। পরিষ্কার শুনলাম। অভি—এই অভি!

'এখানে আমাকে এভাবে একজনই ডাকতে পারে। এবং সে—ই ডাকছে আমাকে। কেন একথা মনে হল বলতে পারব না। হয়তো ভয়টাকে আরও পাকাপোক্ত করবার জন্যে আমার মনই চাইছিল এই ধরনের একটা বিশ্বাসের ভিত তৈরি করতে। ভয় আর যুক্তিহীন বিশ্বাস এ ওকে আঁকড়ে ধরল আরও জোরে। বুদ্ধিবৃত্তির শেষ টিমটিমে আলোটা নিবে যেতে সেই অতল ভয়ের মধ্যে এক ধরনের নিশ্চিন্ত ভাবের অবলম্বন পেয়ে গেলাম। আর কোনো সন্দেহ রইল না: শিপ্রাদিই ডাকছে আমাকে জানলার ওপাশ থেকে। বাইরের দেওয়ালে হয়তো টিকটিকি আটকে থাকতে পারে, কিন্তু কোনো মানুষের পায়ের বুড়ো আঙুল আটকাবার মতো জায়গা নেই।

'আবার এল সেই ডাক। একই ধরনের। অভি, এই অভি। আমার হাত—পা অনেকক্ষণ বরফের চাদরের ওপর শুয়ে থাকলে যা হয় সেই রকম। বুকের মধ্যে ঢাক বাজাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ঘরের টেমপারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টে নেমে গেছে। বুঝতে পারছি ঘামে সারা গা ভিজে গেছে বলে ঠান্ডাটা বেশি লাগছে। একবার পঁচিশ বছর বয়সি আমি মরিয়া হয়ে শেষবারের মতো ঘাই মারল একেবারে নেতিয়ে পড়ার আগে। বলল যাও না, জানলাটা খুলেই দেখো না ব্যাপারটা কী! জানলা খোলার কথা ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল। অমনি আবার নতুন করে ভয়কে ফিরে পেলাম। যুক্তি লাগসই না হলে একটা সংশয়ের খোঁচ থেকেই যায়। এই ভয় আমাকে সেই অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচল।

'জানলার ওপাশ থেকে শব্দগুলো আমার কাছে টেলিগ্রাফের টরেটক্কা হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। শিপ্রাদি ডাকছে আমাকে। অভি, এই অভি, ওঠ না, দেখ আমি এসেছি। কখনো বলছে : তুই এতদিন পরে কেন এলি অভি। আমার একা—একা আর ভালো লাগে না।

'আমি যে কতক্ষণ একটা জ্যান্ত সিমেন্টের চাঙড় হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলাম খেয়াল নেই। সেই অদ্ভুত একতরফা সংলাপ শুনে যাচ্ছি তো শুনেই যাচ্ছি। নিজেই বুঝিনি বুদ্ধিভ্রষ্ট ভয় একটা বেপরোয়া সাহসকে খুঁচিয়ে তোলে অনেক সময়। সেই সাহস আচমকা আমাকে ইলেকট্রিকের শক দিল। অনেকটা সময় আমাকে পাকড়ে রাখার পর ভয়ের মুঠোও বোধ হয় একটু ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম। যা—থাকে—কপালে ধরনের একটা খ্যাপামি আমাকে গুলতি থেকে ছিটকে যাওয়া গুলি বানিয়ে দিল। আছড়ে গিয়ে পড়লাম জানলাটার ওপর। শরীরের সবটুকু শক্তি নিংড়ে দিলাম পাল্লাদুটো হাট করে খুলে দেবার চেষ্টায়। তাকালাম খোলা জানলা দিয়ে। দেখলাম—'

'বাপন, তোমার বাবাকে নিয়ে খেতে এসো। দেরি হলে কাবাব ঠান্ডা হয়ে যাবে।' ভেতর থেকে মা ডেকে বললেন।

বাপন শুনেও শুনল না, বলল, 'জানলার ওপাশে কী দেখলে বাবা?'

'সেইটেই আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়,' আস্তে আস্তে বললেন বাবা, 'মনে হল শিপ্রাদিই, তেমনি চুল খোলা, আলো—অন্ধকারে মিলেমিশে আছে, তবুও পরিষ্কার শিপ্রাদি। তবে এই দেখাটা বোধহয় এক লহমার জন্যে। তবে একটা কথা,' একটু হাসলেন বাবা, 'আমার মন তো তাই চাইছিল দেখতে। হয়তো পুরোটাই হ্যালুসিনেশান, যার পেছনে অটো—সাজেশান থাকতেও পারে। তবে একটা কথা। এর ঠিক পরেই বুঝলাম ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো ভয়ও আমার শরীর—মনের চৌহদ্দি ছেড়ে পালিয়েছে। আমি বিছানায় এসে পড়া মাত্র ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম।'

'কিন্তু বাবা, তোমার শিপ্রাদির ঠোঁটের বাঁ কোণের ওপরে কি একটা বড়ো তিল ছিল,' ধাঁ করে জিজ্ঞাসা করল বাপন।

'তুই কী করে জানলি!' এবারে বাবার অবাক হবার পালা।

'না, এমনি হঠাৎ মনে হল।'

ভেতর থেকে বাপনের মা আবার খেতে ডাকলেন। বাবা মাথায় ঝাঁকি দিয়ে নিজের মনেই বললেন, 'আশ্চর্য! তোর তো সে—কথা জানার নয়।'

ক্ষতিপূরণ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি দাঁড়িয়েছিলাম অ্যারিজোনার টুসন বিমানবন্দরে। যাব শিকাগো শহরে। আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ওদেশে সন্ধে হয় খুব দেরিতে, তখনও আকাশে আলো আছে। আমি লাউঞ্জের বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। প্লেনটা আসতে দেরি করছে, আর সেই জন্য ছটফটানি শুরু হয়েছে আমার মনে। শিকাগো পৌঁছতে খুব বেশি রাত হলেই মুশকিল। কারণ শিকাগো এয়ারপোর্টে আমার এক বন্ধু গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে, তার গাড়িতে আমি যাব সীডার র‍্যাপিডস নামে একটা ছোট্ট শহরে। সেটা আরও প্রায় দুশো মাইল দূরে। গাড়িতে যেতে ঘণ্টা তিনেক লেগে যাবে।

আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে প্লেনটাকে দেখা দেখা গেল আকাশে একটা গোল চক্কর দিয়ে নামছে। এই প্লেনটা আসছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে, ওখানে বিকেলবেলা খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল খবর পাওয়া গেছে।

প্লেনটাকে দেখেই আমি কাউন্টারের দিকে ছুটলাম। টিকিট 'ওকে' করে নিতে হবে। প্লেন এসে না পৌঁছলে ওরা টিকিটের এই ছাড়পত্র দেয় না। কাউন্টারে আমার সামনে মাত্র আর একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ আমি দ্বিতীয়! আমার টিকিট 'ওকে' হবেই, কোনো চিন্তা নেই।

আমার সামনের লোকটি ছোটোখাটো দৈত্যের মতন। লম্বায় সাড়ে ছ—ফুট তো হবেই, তেমনি চওড়া। গায়ে একটা জারকিন। লোকটি পেছন ফিরে একবার আমার দিকে তাকাল। লোকটি মুলাটো, অর্থাৎ পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গও নয়, কালোও নয়। মাথার চুল কোঁকড়া, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

ওদের নিয়ম অনুযায়ী আমার চোখাচোখি হতেই লোকটি বলল, হাই! আমি বললুম হাই! লোকটি তারপর বলল, গোয়িং টু শিকাগো? আমি বললুম ইয়া!

লোকটির কি গুরুগম্ভীর গলা!

লোকটির কাঁধে ঝোলানো শুধু চামড়ার ব্যাগ। আর কোনো মালপত্র নেই। কাউন্টারের লোকটি এসে দাঁড়াতেই আমার সামনের লোকটি ব্যাগ খুলতে গেল। আমি বোধহয় অতি উৎসাহের চোটে একটু সামনে ঝুঁকেছিলাম, তারপরেই একটা কাণ্ড হয়ে গেল!

লোকটির হাত যে অত লম্বা তা আমি বুঝতে পারিনি, ব্যাগ খুলতে গিয়ে লোকটির একটা কনুই পিছিয়ে এসে সোজা ধাক্কা মারল আমার বাঁ চোখে। আমি বাংলায় 'বাপরে' বলে চিৎকার করে বসে পড়লুম!

তারপর কী হল আমি চোখে দেখতে পাইনি। আমার চোখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। নানান লোকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, দু—এক মিনিটের মধ্যেই কারা যেন আমায় সাবধানে তুলে শুউয়ে দিল স্ট্রেচারে। তারপরই অ্যাম্বুলেন্সের প্যাঁ পোঁ শব্দ। আমি অজ্ঞান হইনি, অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও আমার মনে পড়ছে, আমার ওই প্লেনটা আর ধরা হল না। শিকাগো এয়ারপোর্টে আমার বন্ধু গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

এক ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তাররা আমার চোখ পরীক্ষা করে ওষুধ লাগিয়ে, মস্ত বড়ো একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দেবার পর আমি জিজ্ঞেস করলুম, আমি কি এরপর পৌনে দশটার প্লেন ধরতে পারব?

বড়ো ডাক্তার জানালেন তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে এখানে অন্তত তিনদিন শুয়ে থাকতে হবে। তাঁদের কথা যদি আমি না শুনি তাহলে আমার বাঁ চোখটা চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কী আর করি, আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম! একটা চোখ কে আর নষ্ট করতে চায়। বিদেশ—বিভুঁয়ে একটা হাসপাতালের কেবিনে শুয়ে থাকতে হল আমায়। এর আগে দেশে বা বিদেশে কক্ষনো আমি

হাসপাতালে থাকিনি।
এই হাসপাতালের প্রত্যেক কেবিনে একটা করে টেলিভিশন সেট। নার্স সেটা চালিয়ে দিয়ে গেছে। এক চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা বলে অন্য চোখটাও খুলতে কষ্ট হচ্ছে আমার। তা ছাড়া এখন টেলিভিশনের প্রোগ্রাম দেখার মেজাজও নেই। কথা আর গানবাজনাগুলো শুনতে পাচ্ছি। দশটার সময় শুরু হল খবর। টেলিভিশনে খবর পড়াটা এরা খুব আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রথমে একজন খবর বলে নিউ ইয়র্ক থেকে, তারপর সেই লোকটি হঠাৎ কথা থামিয়ে বলে, হ্যালো জ্যাক, হোয়াটস আপ দেয়ার? অমনি দেখা যায় তিন হাজার মাইল দূরে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসে আছে আর একজন, সে তখন ওদিককার খবর বলে। এমনিভাবে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আর একজন। কখনো কখনো জাপান, ভিয়েতনাম, ফ্রান্স বা আফ্রিকা থেকেও ওদের প্রতিনিধিকে সরাসরি খবর বলতে দেখা ও শোনা যায়। এনবিসি নিউজের জ্যাক রবসনের খবর পড়া আমার বেশ ভালো লাগে। সে শুরু করতেই আমি কান খাড়া করলুম। জ্যাক প্রথমেই বলল, আজ সন্ধেবেলা ফ্লাইট নম্বর পাঁচশো বাহাত্তর হাইজ্যাকড হয়েছে!
উত্তেজনায় সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে বসলুম। অতি কষ্টে ডান চোখটা মেলে তাকালুম টেলিভিশন সেটের দিকে। ফ্লাইট নম্বর পাঁচ শো বাহাত্তর? ওই প্লেনটাতেই তো আমার যাওয়ার কথা ছিল!
এই প্রথম সেই দৈত্যের মতো চেহারার মুলাটো লোকটির উপর আমার খুব রাগ হল। ওই লোকটা তার লম্বা ধেরেঙ্গা হাতের কনুই দিয়ে আমায় খোঁচা মারল বলেই তো আমি এখন একটা দারুণ সুযোগ হারালুম; হাইজ্যাকিংয়ের সময় সেই বিমানে থাকার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের! যারা হাইজ্যাকিং করে তারা তো যাত্রীদের মারে না, সব ব্যাপারটা বেশ দেখা যায়।
জ্যাক রবসন আরও জানালো যে হাইজ্যাকড প্লেনটা প্রথমে যাচ্ছিল কিউবার দিকে, কিন্তু সেখানে খোঁজ নিয়ে শোনা গেছে, কিউবায় সেটা নামেনি, সেটা উড়ে গেছে 'আননোন ডেস্টিনেশনের' দিকে। আননোন ডেস্টিনেশন, সে যে আরও রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আমি নিরাশ হয়ে পড়লুম।
বেল বাজিয়ে নার্সকে ডাকলুম একবার।
ছোট্টখাট্ট চেহারার ফুটফুটে নার্স এসে দরজার কাছে দাঁড়াতেই আমি জিজ্ঞেস করলুম, সিস্টার, আমাকে এখানে কে ভরতি করে দিল?
নার্স বললে, তোমাকে তো নিয়ে এসেছে এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি স্টাফ।
যে লোকটা আমায় কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরেছে সে আসেনি?
তোমায় কে ধাক্কা মেরেছে? সে কথা তো কেউ বলেনি!
হ্যাঁ, আমার সামনের লোকটির কনুইয়ের ধাক্কাতেই তো...
—সে কথা তাহলে তুমি পুলিশকে জানাতে পারো। লোকটির নাম জানো তুমি?
—নাম জানিনা! তবে চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে।
—সেই কথাই পুলিশকে জানিয়ো, পুলিশ ঠিক নাম বার করে ফেলবে। তারপর ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারো তার কাছ থেকে।
—আচ্ছা থাক, পরে ভেবে দেখব। টিভি বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে দিয়ে যাও।
এদেশে সব ব্যাপারেই ক্ষতিপূরণ। সামান্য সামান্য ব্যাপারে মামলা করেই অনেকে টাকা পেয়ে যায়। মামলা না করলেও ইনসিওরেন্স কোম্পানি দেয়। আমার এক বন্ধু হিচ হাইকিং করার সময় একটা গাড়িতে বিশ পয়সার রাইড নিয়েছিল, সেই গাড়িটা অ্যাকসিডেন্ট করল ব্লুমিংটন শহরের কাছে, আমার বন্ধুটির একটা পা মুচকে গিয়েছিল শুধু। খুবই সামান্য ব্যাপার, একটু চুন—হলুদ লাগালেই সেরে যাবার মতন। তাতেই ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেছে দু—হাজার ডলার।
বিদেশে বেড়াতে এসে ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। পুলিশের সঙ্গে কে নিজেকে জড়াতে চায়! তবু আমি মনে মনে বললুম লোকটা খুব অভদ্র তো! হয়তো সে ইচ্ছে করে আমায় ধাক্কা

দেয়নি; তবু আমার কাছে এসে একবার অন্তত দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ছিল তার!

চোখের যন্ত্রণায় ঘুম আসছে না। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলুম! কমিকসের গল্পের ছবির মতন যেন দেখতে পেলুম, সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ফ্লাইট নম্বর পাঁচশো বাহাত্তর; ওর ভেতরে ককপিটের সামনে পাইলটের কপালের কাছে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিমান—দস্যু... সবাই ভয়ে মুখ ফ্যাকাসে করে আছে। ...হঠাৎ আমার মনে হল, ওই দৈত্যের মতন চেহারার লোকটাই বিমানদস্যু নয় তো? ওর চেহারা তো ঠিক ডাকাতেরই মতন! হয়তো ওর আরও সঙ্গী ছিল? বিমানটা ছিনতাই করে বোধহয় চলে যাচ্ছে আফ্রিকার কোনো দেশে...। বেশ একখানা গল্প ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম একসময়ে।

পরদিন সকালেই কাগজে বড়ো বড়ো করে খবর বেরুলো, ওই হাইজ্যাক করা বিমানটা আকাশেই ধ্বংস হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে গালফ অফ মেক্সিকোতে। ছাপান্ন জন যাত্রীর মধ্যে একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি; সবাইকে মৃত বলে ধরে নেওয়া যায় নিশ্চিতভাবে। দুর্ঘটনা হয় রাত সাড়ে দশটায়, তারপর শেষ রাত পর্যন্ত সার্চ পার্টি সেখানকার সমুদ্র এলাকা খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে উদ্ধার করতে পারেনি। পৃথিবীর সব কাগজেই বেরিয়েছিল এই খবর। খবরটা পড়ে যে আমার কী মনে হল কী বলব! ওই শীতের দেশেও সারা গায়ে ঘাম এসে গেল, ঝিম ঝিম করতে লাগল মাথাটা। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। ওই প্লেনে আমার থাকার কথা ছিল। চোখে এই ধাক্কাটা না লাগলে, এতক্ষণে আমার দেহটা টুকরো টুকরো হয়ে গালফ অফ মেক্সিকোতে ভাসছে আর হাঙরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

খবরের কাগজটা তন্ন তন্ন করে পড়লুম। প্লেনটা কেন ভেঙে পড়ল তার কারণটা ঠিক জানা যাচ্ছে না। পাইলট প্রথমে খবরটা জানাবার পর আর কিছু বলতে পারেনি। খুব সম্ভবত প্লেনের মধ্যে গুলি চলেছে। পুলিশের লোক বলেছে যাত্রীদের মধ্যে একজন নাকি নেভাডার লাস ভেগাস শহরে জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়েছিল, তারপর পাওনাদারদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছিল টুসন—এ, সেখান থেকে প্লেন হাইজ্যাক করে অন্য দেশে আশ্রয় নেবার মতলবে ছিল। তারপর কী হয়েছে, কেউ জানে না।

আমার কেন যেন দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল, সেই দৈত্যের মতন মুলাটো লোকটাই এসব কাণ্ড করেছে। লাইনের একেবারে প্রথমে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। এরকম কাণ্ড হবার পরও একটুও অপেক্ষা করেনি। এত ব্যস্ত ছিল প্লেনটা ধরবার জন্য।

দুপুরের দিকে আমার মনে হল, ওই লোকটা ইচ্ছে করেই আমায় ধাক্কা দেয়নি তো? লোকটা জানতো, ওই প্লেনে নানারকম বিপদ হবে, তাই ও আমায় বাঁচাতে চেয়েছিল? কিন্তু আমায় ও চেনে না শোনে না। ও আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করবে কেন? এখন যেন স্পষ্ট মনে পড়ছে, আমি এগিয়ে যাইনি, লোকটা ইচ্ছে করেই কনুইটা পিছিয়ে এনে খুব জোরে মেরেছিল আমায়।

লোকটা কি জানতো, ও নিজেও মরে যাবে? সারাদিন আমি ওই লোকটির কথা ভাবতে লাগলুম। লোকটির মুখ আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেল একেবারে।

তিনদিন পরে ছাড়া পেলুম হাসপাতাল থেকে। চোখের ব্যান্ডেজ খুলে আমায় একটা এক চোখ ঢাকা চশমা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে! ডাক্তার জানালেন যে, আর ভয় নেই, চোখটা বেঁচে যাবে।

আমায় একশো পাঁচাত্তর ডলার চার্জ দিতে হল। হাসপাতালেও এদেশে পয়সা লাগে। হেলথ ইনসিওরেন্স থাকলে অবশ্য বিনি পয়সায় হয়ে যায়। আমার এখনও করা হয়নি। বিদেশি বলে আমায় সস্তা করে দেওয়া হয়েছে অবশ্য, নইলে অনেক বেশি টাকা লাগত। এই একশো পঁচাত্তর ডলার দিতেই আমার গা কচকচ করতে লাগল। বিদেশে এসে সবসময় হিসেব করে চলতে হয় টাকাপয়সা। আমার কোনো দোষ নেই, তবু শুধু শুধু খরচ হয়ে গেল এতগুলো টাকা।

প্লেনের টিকিটটা অবশ্য বাতিল হয়নি। সেই টিকিটেই ফিরে এলুম শিকাগোতে।

এরপর দেড় মাস কেটে গেছে।

ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব যাদেরই বলেছি যে অভিশপ্ত ফ্লাইট নাম্বার পাঁচশো বাহাত্তর বিমানটায় আমার আসবার কথা ছিল, কেউ বিশ্বাস করে না। একটা লোক আমার চোখে ধাক্কা দিয়েছিল বলে আমি হাসপাতালে ছিলাম শুনেও ওরা হাসে। এমনকী যে বন্ধুটির কথা ছিল শিকাগো এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করার, সেও বলল, 'তুই যে ওই প্লেনে আসবি না, সেই খবরটা আমায় ঠিক সময় জানাসনি তো, তাই এসব গল্প বানাচ্ছিস। ওটা মোটেই ফ্লাইট নাম্বার পাঁচশো বাহাত্তর ছিল না।'

এরপর কানাডার তিনশো দু—জন যাত্রী সমেত আর একটা প্লেন হাইজ্যাকড হতেই আগেরটার কথা সবাই ভুলে গেল। এই প্লেনটা নেমেছে সাহারা মরুভূমির কাছে একটা ছোট্ট শহরে, দারুণ রোমহর্ষক ব্যাপার!

আমি থাকি আরওয়া সিটি নামে একটা ছোটো শহরে! একটা তিন তলা কাঠের বাড়ির দোতলায় আমার ফ্ল্যাট। সকাল নটা থেকে একটা পর্যন্ত এক জায়গায় কাজে যাই, তারপর সারাদিন আমার ছুটি। আমার ঘরের জানলা দিয়ে একটা নদী দেখা যায়। কদিন ধরে বরফ পড়তে শুরু করেছে। জানলা দিয়ে আমি মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি। সেই নদীটার জল আস্তে আস্তে জমে যাচ্ছে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা নদীর মাঝখানে গিয়ে খেলে। নদীর ধারে সারি সারি উইলো গাছ, সেগুলোর গায়ে ঝুরো ঝুরো বরফ জমে আছে। দূর থেকে মনে হয় থোকা থোকা সাদা ফুল।

একদিন দুপুরে আমার ফ্ল্যাটের দরজায় দুমদুম করে ঘা পড়ল। কলিং বেল আছে, সেটা না টিপে কে এমন ধাক্কা মারছে?

আমি বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলুম, কে?

ভারিক্কি গলায় উত্তর এল মেইলম্যান।

এদেশের মেইলম্যানদের চেহারা আর সাজপোশাক দেখলে মনে হয় মিলিটারি। এরা পায়ে হেঁটে চিঠি বিলি করে না, প্রত্যেকের নিজস্ব গাড়ি আছে। সাধারণত নীচের ডাক বাক্সতেই এরা চিঠি দিয়ে চলে যায়। রেজিস্ট্রি কিংবা মানি অর্ডার থাকলে ওপরে আসে।

দরজা খুলে মেইলম্যানটিকে দেখে আমি এতটাই অবাক হয়ে গেলুম যে আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুলো না। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম তার দিকে!

লোকটি আমার অবস্থা দেখে হেসে বললেন, 'হেই ম্যান, হোয়াজ্জা ম্যাটার? হ্যাভ ইউ সিন আ গোস্ট অর সামথিং?

আমার তখন সত্যিই ভূত দেখার অবস্থা।

ঠিক সেইরকম গলার আওয়াজ, অবিকল সেই চেহারা। সেই সাড়ে ছ—ফুট লম্বা, তেমনি চওড়া, কালোও না ফরসাও নয়, মূলাটো, মাথার চুল কোঁকড়া, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

লোকটা একটা ফর্ম আর একটা কলম এগিয়ে দিয়ে আমায় বললেন, সই করো।

কথা তো নয়, যেন হুকুম। যন্ত্রের মতন আমি সই করলুম। তারপর লোকটা আমার হাতে একটা খাম দিল।

তারপর সে চলে যাবার জন্য পেছন ফিরতেই আমি বললুম, পর্ডন মি। আমি কি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

লোকটি আবার ঘুরে তাকিয়ে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী? আমি বললুম, তোমায় আমি আগে দেখেছি মনে হচ্ছে।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, তা দেখে থাকতে পারো, আমি তো এদিকে প্রায়ই আসি।

আমি বললুম তা নয়, তোমাকে আমি দেখেছি একটা বিশাল জায়গায়...'তুমি কখনো টুসনে গেছো!

লোকটি কর্কশ গলায় বললে, টুসন? সেটা আবার কোথায়? হোয়ার দ্য হেল ইজ দ্যাট ডামনড প্লেস?

আমি এবার বানান করে বললুম, টি ই সি এস ও এন। অনেকে বলে টাকসন, আসলে ওটা টুসন উচ্চারণ হবে। আরিজোনা স্টেটে।

লোকটি বলল, আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলেই কখনো যায়নি।

আমি দ্রুত চিন্তা করতে লাগলুম। দুজন মানুষের চেহারার এমন মিল হতে পারে? পাঁচশো বাহাত্তর বিমান দুর্ঘটনায় একজনও বাঁচেনি! এই লোকটাই বা বাঁচবে কি করে? এক যদি যমজ হয়—

আবার জিজ্ঞেস করলুম, তোমার কোনও যমজ ভাই আছে?

লোকটা এবার হাসল বেশ জোরে, তারপর বললো, টুইন ব্রাদার? সিয়ামিজ টুইন, হা—হা—হা! তুমি দেখছি খুব মজার লোক! আমি আজ পর্যন্ত কোনো যমজ দেখিনি! আমার এমনি একটা ভাই ছিল বটে, নিউ ইয়র্কের হার্লেমে এক দাঙ্গায় সে মারা গেছে পাঁচ বছর আগে, কেন, তোমার এত কৌতূহল কেন?

এবার আমি লজ্জিতভাবে বললুম, না, না, কিছু না এমনিই। কিছু মনে করো না, ক্ষমা চাইছি, যদি তোমায় বিরক্ত করে থাকি—

লোকটি আমার কাঁধ চাপড়ে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ইউ আর ওয়েলকাম! দিস ইজ আ ফ্রি কানট্রি।

কাঠের সিঁড়ি দুপ দুপিয়ে লোকটি নেমে চলে গেল। এবার আমি হাতের খামটি ছিঁড়লাম। তাতে একটা চেক। আবার আমি অবাক। আমায় কে টাকা পাঠাবে?

চিঠিটা পড়ে দেখলুম, কোন একটা ক্রস ওয়ার্ড পাজল প্রতিযোগিতায় আমি একটা পুরস্কার পেয়েছি। আমার তখন রীতিমতো ভ্যাবাচাকা খাওয়ার মতন অবস্থা। সময় কাটাবার জন্যে আমি মাঝে মাঝে খবরের কাগজের ক্রস ওয়ার্ড পাজল সমাধান করার চেষ্টা করি বটে। কিন্তু কোনোটাই শেষপর্যন্ত সবগুলি পারি না। কোনোদিন তো আমি প্রতিযোগিতার ফর্ম ফিলাপ করে পাঠাইনি। তাহলে পুরস্কার পাব কী করে? নাকি কোন এক সময় একটা পাঠিয়েছিলুম। এখন ভুলে গেছি!

আরও চমক লাগল, যখন দেখলুম, চেকটা একশো পঁচাত্তর ডলারের!

সেই মেইলম্যানকে আমাদের রাস্তায় আর কোনোদিন দেখিনি আমি। এ নিয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করাও যায় না। ব্যাপারটা নিশ্চয় অলৌকিক কিছু! আজও সব জিনিসটা আমার কাছে একটা ধাঁধার মতন মনে হয়।

কার হাত?

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়। কাগজের অফিসে, কাজের চাপ থাকলে যা হয়। কোনো খবর বাদ না যায়, আবার গুরুত্ব পাবে কোন খবর, কী মেইন হবে, সেকেন্ড মেইন কিংবা আরও সব দেখে শুনে মোটামুটি কাগজের প্রথম পাতার লে—আউট দেখে ফিরতে হয়। অফিস থেকে গাড়িতে ঘণ্টা খানেকের পথ। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা কখনো বারোটা হয়। একমাত্র স্ত্রী এবং রান্নার লোকটা বাদে অত রাত পর্যন্ত কেউ জেগে থাকে না। কোনোদিন মেজো ছেলে পড়াশোনার চাপ থাকলে জেগে থাকে। কিন্তু সেদিন বাড়ি ফিরে দেখছি সবাই জেগে। রাত নেহাত কম হয়নি। দু—পাশের বাড়ি ঘরের আলো নেভানো। শুধু রাস্তার আলো জ্বলছে। আর মাঝে মাঝে রাস্তার কুকুরগুলি এলোপাথাড়ি দৌড়চ্ছে। কখনো ঘেউ ঘেউ করছে। গেট খুলে দেয় রান্নার লোকটা। দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখি ছোটো মেয়ে দৌড়ে আসছে। কাছে এসেই বলল, জানো মেজদা না সেই কঙ্কালটা নিয়ে এসেছে!

আমি জানি এটা আনার কথা। বিস্ময়ের কিছু নেই। ডাক্তারি পড়তে গেলে ও—সব লাগে। তবে বিস্ময় না থাকলেও মনের মধ্যে কেমন একটা খিঁচ ধরে গেল। শত হলেও নিজের বাড়ি বলে কথা। তাছাড়া সংস্কার যাবে কোথায়। বললাম, কোথায় রেখেছে ওটা?

দাদার খাটের নীচে।

খাটের নীচে রাখতে গেল কেন? সিঁড়ির চাতালে রেখে দিলেই পারত! সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এসব বলা বোধহয় ঠিক হল না। কঙ্কালটা সম্পর্কে আমারও ভীতি আছে—এই কঙ্কাল নিয়ে আসার ব্যাপারে বাড়িতে কিছুটা ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি গিন্নি এবং ছোটোমেয়ে সোনালির! একদিন খেতে বসে সমীর কঙ্কালের কথা তুলতেই, খাওয়া পাত থেকে সোনালি উঠে পড়েছিল—আর সময় পেলি না মেজদা।

সমীর অবাক। সে বলেছিল, তোদের বাড়াবাড়ি!

খেতে বসে সমীরের সাহস দেখে আমার বেশ গর্বই হয়েছিল। এইতো তার আঠারো পার হয়েছে। কঙ্কাল সম্পর্কে ওর কোনো খিঁচ নেই। ডাক্তারি পড়তে গেলে ও—সব থাকলে হয়ও না। কিন্তু তাই বলে খাটের তলায় রেখে ওপরে সে ঘুমোবে ভাবতেও আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

যেন কিছুই না ব্যাপারটা, আমি জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢুকতে গেলে সোনালি ফের বলল, বাবা তুমি কঙ্কালটা দেখবে না?

ওটা আবার দেখার কী আছে!

স্ত্রী বলল, সমীরের ঘরে তুমি বরং আজ শোও। ও একা থাকবে!

সমীর বোধ হয় দোতলার ঘর থেকে সব শুনতে পাচ্ছে। সে চিৎকার করে বলল, তোমাদের কী হচ্ছে।

আমিও বললাম, ওটাতে তো আর কিছু নেই! ভয়ের কি?

বাড়িটায় লোকের চেয়ে ঘরের সংখ্যা বেশি এক এক ঘর এক এক জনের। কেবল, নীচের ডাইনিং স্পেসে রান্নার লোকটা শোয়। সোনালি নিজের ঘরে শুতে যায়নি। সে তার মা—র সঙ্গে শোবে বলে বায়না ধরে বসে আছে। একা কোনো ঘরে ঢুকছে না।

আমি জানি এসব কুসংস্কার থাকা ভালো না। আসলে কঙ্কালটা আসায় বাড়িতে বেশ একটা ভূতুড়ে পরিবেশ যেন সৃষ্টি হয়ে গেছে। এসব ভালো লক্ষণ না। সুস্থতার লক্ষণ না। বললাম চল কঙ্কালটা দেখি।

আমি যাব না বাবা! তুমি যাও।

সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতেই দেখি সমীর উবু হয়ে বেতের ঝুড়ি থেকে একটা হাড় টেনে বের করছে। বোধ হয় সে মিলিয়ে দেখছে, সবগুলি হাড় ঠিক ঠিক সে পেয়েছে কি না। আমাকে দেখেই হাড়টা তুলে বলল, বল তো এটা কোথাকার হাড়।

আমি কী করে জানব?

হাতের। হাড়টার নাম হিউমারাস।

হিউমারাস বলার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের দিকে চোখ গেল। একটা পুরো আর্টিকুলেটেড হাতের কঙ্কাল টেবিলে। আঙুলগুলো ছড়ানো। সত্যজিৎবাবুর মণিহার ছবিতে এমন একটা হাতের কঙ্কাল ঝপাৎ করে পড়তে দেখেছিলাম। ঠিক সেইভাবে হাতের কঙ্কাল তার আঙুলগুলো ছড়িয়ে রেখেছে। ভেতরে কেমন যেন কেঁপে উঠলাম। কঙ্কালটা আলগা থাকলে এতটা বীভৎস লাগত না।

বললাম, সবই আলগা এনেছিস? এ—হাতটা কেন আবার জোড়া লাগানো!

সমীর বলল, যা পাব তাইতো আনব!

সোনালি নীচ থেকে বলছে, দেখলে বাবা?

দেখলাম তো! তুই আয় না। ভয়ের কি আছে?

ওরে বাববা। সে ছুটে পালিয়ে তার মায়ের কাছে বোধ হয় চলে গেল। সমীর হঠাৎ বলল, সোনা বড়ো জ্বালাতন করছে। মা—ও কেমন আমার ঘরে পা দিচ্ছে না বিকেল থেকে।

বিষয়টাকে হালকা করে দেবার জন্য বললাম, মানুষের সংস্কার যাবে কোথায়! কোথাকার কোন অপমৃত্যুর ফলে এটা হয়েছে কে জানে! গেরস্ত ঘরে এটা প্রথম প্রথম হয়। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে জ্যান্ত আস্ত কঙ্কাল তো—আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, ভূতটুতের আশঙ্কায় তোমার মা কেমন ত্রস্ত। থাকতে থাকতে দেখবে, সব সয়ে গেছে। এটা যেই না ভাবা, অবাক, দেখি টেবিলের সেই কঙ্কালটা কেমন চকিতে কোনো নারীর সুন্দর সুগোল হাত হয়ে গেল এবং হাতে শাঁখা। আমি খুবই ঘাবড়ে গেছি। বদ হজম হবেটবে। চোখ ঝাপসা হতে পারে। ভালো করে দেখতেই বুঝলাম, ওটা কঙ্কালই! কঙ্কালের একটা হাত। তবু এটা কেন দেখলাম! মনের গোলমাল হতে পারে। বের হয়ে আসার মুখে বললাম, কঙ্কালটা কি মেয়েমানুষের?

সমীর বলল, হ্যাঁ। কেন বল তো?

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, শীতের রাতেও আমি ঘামছি। তাড়াতাড়ি নিজেকে আড়াল করার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকলাম। বেশি কৌতূহলও প্রকাশ করতে পারছি না। আমি তো বাড়ির অবিভাবক, আমিই যদি ঘাবড়ে যাই তবে আর সব যাবে কোথায়। দীর্ঘকালের সংস্কার থেকে এ—সব হচ্ছে। ঝেড়ে ফেলা দরকার। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছি।

বাথরুমে ঢুকে হাতে মুখে ভালো করে জল দিলাম। নীলাভ আলোটা জ্বলছে বাথরুমের। কেন যে এমন দেখলাম। স্পষ্ট চোখের উপর কোনো বিবাহিত নারীর হাত ভেসে উঠল কেন! বাথরুম থেকে বের হয়ে নীচে খেতে গেলাম। খাবার টেবিলে স্ত্রী পাশের চেয়ারে বসে এটা ওটা এগিয়ে দেয়। কী জানি কেন, ওর হাতের দিকে আমার চোখ গেল। চোখ সরাতে পারছি না। আমি যে খাচ্ছি না, স্ত্রী লক্ষ করে বলল, কী ব্যাপার আমার হাতে কী দেখছ!

কেমন বোকার মতো বললাম, না কিছু না।

কিন্তু ভেতরের খিঁচটা গেল না। রাতে কেন আমি ভালো ঘুমও হল না। পাশের ঘরে সমীর তার খাটের নীচে একটা কঙ্কাল। কেমন একটা অলুক্ষণে ব্যাপার ঘটে গেল চোখের ওপর—তা ছাড়া যদি সমীর ভয় টয় পায়—এসব দুশ্চিন্তায় প্রায় সারাটা রাতই এ—পাশ ও—পাশ করলাম। সাহসেও কুলাচ্ছে না যে যাব তার ঘরে। ঘর থেকে কঙ্কালের ঝুড়িটা চাতালে তুলে রাখব। যেন ও—ঘরে গেলেই হা হা করে তেড়ে আসবে

হাতটা। হাওয়ায় কিংবা বাতাসে একটা কাটা হাত ভেসে বেড়াতে দেখলে, কিংবা টেবিলের ওপর পড়ে থাকলে কার না ভয় লাগে!

কাচের জানলায় দেখলাম, কখন পুব আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। দিনের আলো ফুটতেই কেমন সব অস্বস্তি কেটে গেল। সমীর ঠিকঠাক আছে তো! ভিতরে ভয় ধরে যেতেই ওর ঘরের দরজার লক খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে সমীর। ওর মাথার কাছে সেই—হাতের কঙ্কালটা। ওটা তো টেবিলে ছিল, রাতে ওর মাথার কাছে এনে কে ওটা রাখল!

সমীরকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করতে পারি, হাতের কঙ্কালটা এখানে কে রাখল! কিন্তু সাত সকালে, সকালই বা বলি কি করে, এখনও অন্ধকার ভাবটা ভালো করে কাটেনি, আর এত সকালে তো আমি উঠি না—এসব মনে হতেই খুব সন্তর্পণে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম চোরের মতো। যদি জেগে গিয়ে দেখি আমি তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ—ঘাবড়ে যেতে পারে।

সকালে চা খাবার দিলে দেখলাম, সমীর স্নানে যাচ্ছে। আটটার মধ্যে কলেজে তাকে বের হতে হয়। ডাকলাম, শোন। কাছে এলে বললাম, হাড়—টাড় নিয়ে শুতে তোর ঘেন্না হয় না! ভয় কথাটা ইচ্ছা করেই বললাম না।—ওটা তো টেবিলে ছিল। ওখানে গেল কী করে? তুই রেখেছিস?

কী জানি, মনে করতে পারছি না।

এতে ধন্দ আরও বেড়ে যায়। —মনে করতে পারছিস না মানে।

আমার কথায় সমীর কেমন অবাক হয়ে গেল। আমার মুখে কি সে কোনো ত্রাস দেখতে পেয়েছে! সে বলল, আমার অত খেয়াল নেই।

বিষয়টা আর ঘাঁটালাম না। সে নীচে নেমে গেল। মনের মধ্যে ধন্দটা ঘুচছে না। অশরীরী আত্মা—টাত্মা নিয়েও তেমন আমার একটা বিশ্বাস নেই। কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কি করে। কেমন একটা বিপদের আশঙ্কা ভেতরে অনুভব করলাম। সমীরকে কলেজে যাবার সময় বললাম, আইডেনটিটি কার্ড নিয়েছিল তো! সাবধানে যাস। এসব আমি কোনোদিন দেখি না, কিংবা বলি না কিন্তু আজ কেন যে বলতে গেলাম।

আমাকে চারটায় বের হতে হয়। সকাল দশটায় সোনা বের হয়ে গেল। ওর মা বের হয়ে গেল সাড়ে দশটায়। এখন বাড়িতে আমি আর কাজের লোকটা। খুবই উচাটনে আছি। স্নান খাওয়া করতে হয় করা। সবাই ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে হয়। ওপরের ঘরে আর গেলামই না। গেলেই হাত দেখব না কঙ্কাল দেখব, এই আশঙ্কায় বেশ মিইয়ে গেছি। বাবা বেঁচে নেই। অশুভ আত্মা সম্পর্কে তাঁর একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বাড়ি করার পর, বাবা রক্ষাকালীর পূজা করে গেছেন। মাস তিনেক ছিলেন, রোজই সকালে চণ্ডীপাঠ করতেন। এসবে নাকি বাড়ি থেকে অশুভ প্রভাব দূর হয়। তখন আমার ছেলেমেয়েরা ছোটো ছিল, অত ওরা বুঝত না। কষ্ট না পান ভেবে আমরাও বাবার রক্ষাকালীর পূজা এবং চণ্ডীপাঠ নিয়ে কোনো অবিশ্বাসের কথা বলিনি। এখন কেন জানি মনে হচ্ছে বাবা বেঁচে থাকলে এ—নিয়ে পরামর্শ করা যেত।

আশ্চর্য, সোনা দেখছি লাফিয়ে বাড়ি ঢুকছে। খুব খুশি। ওর আজ বার্ষিক পরীক্ষার ফল বের হবার কথা। আমার কিছুই মনে ছিল না। ও এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, বাবা আমি ফার্স্ট হয়েছি। খুবই সুখবর। তিন বছর ধরে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রথম হবার। কিন্তু হতে পারছিল না। ওর কী আনন্দ। আমরা কী মনে হল কে জানে, অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিলাম, আজ যাচ্ছি না।

এমন সুখবরেও কিন্তু মনের খিঁচটা আমার দূর হল না। সমীর ফিরে না আসা পর্যন্ত—যা সব দুর্ঘটনা ঘটে, তার উপর একটা হাতের কঙ্কাল এভাবে ভয় দেখালে কোনো অশুভ ইঙ্গিত থাকতে পারে এমন মনেই হতে পারে। এবং বার বার জানলায় গিয়ে দাঁড়াই। ঘরে বসে থাকলেও উৎকর্ণ হয়ে থাকি, গেট খোলার শব্দ হয় কি না। একবার হতে নীচে নেমে গেলাম— দেখি ডাক পিয়ন, চিঠি রমার। বড়োমেয়ে রমার চিঠি অনেক দিন পাচ্ছিলাম না। চিন্তায় ছিলাম। চিঠিটি খুলে পড়তে আরও অবাক, ওর বর দিল্লিতে বদলি হয়েছে।

আসামে ছিল, সেখানে বিদেশি প্রশ্নে গন্ডগোল, হানাহানি, অরাজকতা, কত কিছু চলছে বছরের পর বছর। বাড়িতে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কি যে হালকা লাগছে! এই করে এক সময় সমীর এবং তার মা—ও ফিরে এল। এবং মনের মধ্যে যে খিঁচ ছিল সেটা একেবারেই উবে গেল। অশরীরী আত্মার প্রভাব তবে এই বাড়িটাতে কোনো অমঙ্গল ডেকে আনেনি।

এরপর বেশ ক—দিন কেটে গেছে। কঙ্কালটা নিয়ে আমাদের মধ্যে যে ত্রাসের ভাব ছিল, সেটা কেটে গেছে। অনেক দিন বিছানা তুলতে গিয়ে দেখা গেছে, ছোটোখাটো দুটো একটা হাড় পড়ে আছে সমীরের বিছানায়। আসলে সে বিছানায় শুয়ে পড়তে ভালোবাসে। প্রথম বছরটা ডিসেকসান আর হাড়ের নাম মুখস্থ করতে করতেই বুঝি কেটে যায়। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়ে সে নিজেই টের পায় না।

হাড়গোড় বিছানায় পড়ে থাকলেও এ—নিয়ে কেউ আর কোনো সোরগোল তোলে না। তবে ওর মা চানটান করে পারতপক্ষে এখনও সমীরের ঘরে ঢুকতে যায় না। আমি আবার স্বাভাবিক— ওটা মনেরই ভুল ভেবে বিষয়টাকে হালকা করতে চেয়েছি। বাড়ির কুকুরটা আগে আমার ঘরে শুত। এখন সমীরের ঘরে শোয়। একদিন কুকরটা সমীরের ঘরে শুয়েছে কিনা উঁকি দিতেই অবাক, যেখানে কুকুরটা শুয়ে থাকে তার পাশেই সেই হাত। কিন্তু এবারে একেবারে ন্যাড়া। হাতে শাঁখা নেই। সমীর ঘুমিয়ে আছে। ঝুড়িতে কঙ্কালের দাঁতগুলি যেন আমাকে ভেংচি কাটল। গাটা সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠল। কী করব বুঝতে পারছি না। কুকুরটা আমার পায়ের শব্দে জেগে যেতেই দেখলাম, হাতটা আবার কঙ্কাল হয়ে গেছে! আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমি ঠিক আছি কি না ভেবে নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম। না এটা আমি নিজে, নিজের চোখে দৃশ্যটা দেখেছি। এবং পরদিন একটা দুঃসংবাদ পেলাম। আমার এক খুড়তুতো বোন আত্মহত্যা করেছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা।

হাত ন্যাড়া—ঠিক বিধবার হাতের মতো সাদা ফ্যাকাসে—আগে যেটা দেখেছিলাম, একজন যুবতীর হাত, এবারে দেখলাম খুব শীর্ণকায়। তবে এই অশরীরী কি আমায় শুভাশুভ আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছে।

একদিন রাতে বাথরুমে যাচ্ছি, দেখলাম সেই বিধবা হাত আবার মেঝেতে পড়ে আছে। সারারাত আমার ঘুম হল না। খেতে বসে খেতে পারলাম না। স্ত্রী ঠিক টের পেয়ে বলল, তোমার কী হয়েছে। মাঝে মাঝে তুমি কেমন হয়ে যাও। আমি তো বলতে পারি না, বাড়িতে কঙ্কালটা যেমন এসেছে, তার সঙ্গে সেই অশরীরী আত্মাও হাজির। পর পর তিনদিন দেখার পর, নিজের ভ্রম বলে স্বীকার করি কি করে।

সকালে বারান্দায় পায়চারি করছিলাম। একবার ইচ্ছে হল বলি, সমীর তুই এটা ফেরত দিয়ে আয়। কিন্তু বলি কী করে! আমি প্রবীণ মানুষ, আমার মধ্যে যদি বিভীষিকা দেখা দেয় একটা কঙ্কালের কাণ্ডকারখানায়, তাও আস্ত কঙ্কাল নয়, শুধু একটা হাতের কঙ্কাল, তবে সমীরের মতো ছেলেমানুষের পক্ষে মাথা ঠিক রাখাই দায় হবে। কাউকে তো বলাও যায় না। আমার বাড়িটা কঙ্কালটা আসায় ভূতুড়ে বাড়ি হয়ে গেছে ভাবতেও কেমন খারাপ লাগছিল। অমঙ্গলের আশঙ্কায় খুবই ঘাবড়ে গেছি। বড়ো ছেলে বাইরে থাকে যদি কিছু হয়। সকালেই ট্রাংকল করলাম, পেয়েও গেলাম, না পরমেশ ভালোই আছে। আর কী হতে পারে? এই সব সাত পাঁচ ভেবে যখন কূল—কিনারা পাচ্ছিলাম না, কারণ যেকোনো মুহূর্তে যা কিছু অঘটন আছে সব ঘটতে পারে। কাজেই ভিতরে স্বস্তি পাচ্ছি না। ছেলে কলেজে গেল, স্ত্রী স্কুলে চলে গেল, সোনা স্কুলে—এখন বাড়িতে বসে থাকা শুধু অপেক্ষায়। অনেকগুলো খবরের কাগজ আসে। সব দেখা দরকার। আমরা কোন খবর মিস করলাম, কিংবা কোন কাগজ কী খবর মিস করল, আমাদের হেডিং স্টান্ট কতটা—এসব দেখার একটা আকুলতা থাকে। কিন্তু কিছুতেই খবরের কাগজগুলিতে মনসংযোগ করতে পারছিলাম না—এই বুঝি কলিংবেল টিপে কেউ কোনো দুঃসংবাদের খবর দিতে এল। ভিতরে গুটিয়ে আছি কেমন।

না দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। রাতে ফিরে এসেও দেখলাম সব ঠিকঠাক আছে। কেবল একটি সংশয় মনের মধ্যে কঙ্কালটা সত্যি কোনো নারীর কি না। সমীর এমনিতেই বলতে পারে। কিংবা একটা মানুষের সব কটা হাড় না আর কারও হাড় মিশে গেছে। কিন্তু এসব কথা তো গুরুত্ব সহকারে বলা যায় না।

যেভাবে আমি বার বার কঙ্কালটা নিয়ে প্রশ্ন করছি তাতে ভাবতেই পারে সমীর আমি ভালো নেই। সুতরাং ওই ডিসেকসান—রুমের কথা দিয়ে আলোচনাটা শুরু করলাম। সমীর বলল, এবারের বডিটা ভালো পেয়েছি।

তারপর আরও দুটো একটা কথার পর বললাম, এটা মেয়েছেলের কঙ্কাল কী করে বুঝলি। ডোম কি বলে দিয়েছে!

বলে দেবে কেন। মেয়েদের ছেলেদের স্যাকরাম আলাদা রকমের। পিউবিসের গঠনও আলাদা।

সুতরাং এরপর আর কি বলি! তবে ওটা যা দেখি বিধবারই হাত। ন্যাড়া এবং ভয়াবহ রকমের কুৎসিত। রাতের বেলায় হঠাৎ সমীর সেদিন চিৎকার করে উঠল, বাবা কুকুরটা দেখ এসে কী করছে।

একটা দাপাদাপির শব্দ পাচ্ছিলাম। ছুটে ভিতরে যেতেই শরীর হিম হয়ে গেল। কুকুরটা মুখ ঘষছে মেঝেতে, মুখ ঝাড়ছে আর পাগলের মতো মুখ থেকে কী ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। ভয়ে সমীর খাটের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সোনা কান্না জুড়ে দিয়েছে। কুকুরটা কোনো শব্দ করতে পারছে না। কিছুক্ষণের মধ্যে দাপাতে দাপাতে মরে গেল। আমার মুখ থেকে শুধু একটাই অস্ফুট শব্দ, আমি তবে ঠিকই দেখেছি।

সমীর একদিন বলল, মনে হয় ওটার কৃমিটিমি হয়েছিল বাবা।

আমি কিছু বললাম না। কারণ হাতটা যদি আবার দেখি তবে আর একটা বিপদ সামনে বুঝতে পারি।

আমার স্ত্রী একদিন বলল, তোমার শরীর এত ভেঙে পড়ছে কেন! কী চেহারা হয়েছে তোমার!

বললাম, বা বয়েস হয়েছে না। এ—বয়সে আর চেহারাতে চিকনাই আসবে কী করে।

সেদিনই রাতে বাথরুমে যাব বলে বের হয়েছি। জিরো পাওয়ারের এখন আলো জ্বালা থাকে ঘরে। রাস্তার আলোগুলো দেখা যায়—বাড়িটার বড়ো বড়ো জানলা সব কাচের, বাইরের সবই দেখতে পাই, মনে হল গভীর রাতে কোনো যুবতী হাতে টিনের সুটকেস নিয়ে একটা প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বড়ো চেনা। ঠিক সুষমার মতো। ধীরে ধীরে আমার বাড়ির দিকে হেঁটে আসছে। এত রাতে! গাড়ি লেট থাকলেই হতে পারে। কিন্তু একা! সুষমা কবেকার সেই মেয়ে। আমি দরজা খুলে দিতে নীচে নেমে গেলাম। দরজা খুলে দেখলাম কেউ নেই। গেট খুলে বাইরে বের হয়ে দেখলাম সব ফাঁকা। গেট খোলার আওয়াজে সোনা সমীর ওর মা এবং কাজের লোকটাও জেগে গেছে।—কে গেট খুলল।

কে! কে!

নীচ থেকে বললাম আমি!

এত রাতে কোথায় যাচ্ছ? বলে সবাই ছুটে নেমে এল। সবার চোখে মুখে ভারি উদ্বেগ।

তাইতো! প্ল্যাটফরম আসবে কোত্থেকে। এত রাতে কেউ বাড়ি আসে! আর সুষমা যুবতী থাকবে কেন। সেও তো প্রৌঢ় হয়ে গেছে। ইস কি যে ভুল দেখলাম! মাথা—ফাতা খারাপ হয়ে যায়নি তো! তবে কঙ্কালটা কি সুষমার! সেই কি এ—বাড়িতে হাজির। ধুস কি যে ভাবছি। এমনিতেই ঘুম পাতলা, মাঝে মাঝে ঘুম হয় না। আজ দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়তে যাব এমন সময় সমীর সোনা এবং তাদের মা পাশে দাঁড়িয়ে। কৈফিয়ত চাইছে, দরজা খুলে কোথায় যাচ্ছিলে? কুকুরটার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর সমীর, কেমন কিছুটা সংশয়ে ভুগছে।

বললাম, মনে হল কেউ হাঁটছে। চোরের যা উৎপাত! কুকুরটা নেই। চোর ঠিক বুঝতে পেরেছে। প্ল্যাটফরম অথবা সুষমার কথা এড়িয়ে গেলাম। আর সুষমা তো আমাদের দেশের বাড়িতে বছরখানেকের জন্য ছিল। তখন আমি কলেজে পড়ি। সুষমা আর ওর দাদা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। দেশ ভাগ হবার পর ওরা আমাদের বাড়িতে এসে বছরখানেক ছিল। বাঁশবেড়ের দিকে ওর দাদার চটকলে চাকরি হয়ে গেলে সুষমা চলে যায়। তবে সুষমা এই বছরখানেক আমার ঘরের সব কিছু এত সুন্দর করে সাজিয়ে রাখত; বই, জামা, প্যান্ট সব কিছু। সে ভারি যত্নে গোছগাছ করে রাখত। ও আমার চেয়ে বছর দুই—তিনের ছোটোই হবে। ফ্রক পরার বয়স যায়নি তখন, কিন্তু আমাদের সময়টাতে বারো—চোদ্দো বয়স হলেই

মেয়েদের শাড়ি পরার নিয়ম ছিল। যাবার দিন আমি সুষমাকে ট্রেনে তুলে দিতে গেছিলাম। টিনের সুটকেসটা নিয়ে যে যখন ট্রেনে উঠে গেছিল তখন আমার বুকটা কেমন ভারি খালি হয়ে গেছিল। সুষমা জানলায় মুখ রেখে শুধু আমাকে দেখেছে। চোখে জল চিকচিক করছিল।

শুয়ে শুয়ে পুরোনো স্মৃতি হাঁটকাচ্ছিলাম। সমীরের ঘরের কঙ্কালটা সুষমার হতে যাবে কেন। যদিও এর পর জানি না সুষমা কোথায় আছে। সে গিয়ে আমাকে চিঠিও দেয়নি। ওর দাদা বাবাকে চিঠি দিত। তাতে অবশ্য সুষমার কথা বিশেষ থাকত না। চিঠিও একদিন বন্ধ হয়ে গেল। আমার মেজোমাসি কেবল একবার বাড়ি গেলে বলেছিলেন, সুষমার বিয়ে হয়ে গেছে। মেজোমাসির ননদের মেয়ে সুষমা।

এসব ভাবলে ঘুম আসবে না। দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছি। চোখ বুজে আসছে এবং একসময় আবার খুট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতে পারছি না। তবু খোলার চেষ্টা করছি। একটা কাচের গ্লাস পড়ে ভেঙে গেলে যেমন ঝন ঝন শব্দ হয়, তেমনি শব্দ কোথাও। মাথাটায় ঝিম ঝিম করছে। চোখ খুলতে পারছি না। তবু তাকালাম। দেখলাম, সত্যি সুষমার মতো কেউ দাঁড়িয়ে শিয়রে। হাতটা আমার চোখের ওপর বাড়িয়ে রেখেছে। হাতে শাঁখা। যেন হাত ঘুরিয়ে সে তার শাঁখার সৌন্দর্য দেখাচ্ছে। এবারে আর পারলাম না। উঠে বসলাম। তারপরই সব ফাঁকা। বুঝতে পারছি আমি প্রচণ্ড ঘামছি। জল তেষ্টা পেয়েছে। নেমে জল খেলাম। আর ঘুম হল না। অবসাদ শরীরে। ভোরের দিকে ঘুমটা এল এবং বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। এত বেলা করে আমি কখনো উঠি না।

ঘুম থেকে উঠে দেখছি স্ত্রী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। কপালে সুন্দর করে টিপ পরছে সিঁদুরের। ওর টিপ পরা দেখে বললাম, জানো দু—একদিনের মধ্যে কোনো সুখবর পাব। এবং পেলামও। বড়ো ছেলে পরমেশ চিঠিতে জানিয়েছে—সে হ্যালে যোগ দিচ্ছে। বড়ো ছেলের অনেক দিনের স্বপ্ন তাহলে এতদিনে সফল হল। আসলে খুলে বললাম না, হাতে তার শাঁখা পরা দেখেছি। শাঁখা থাকলে কোনো—না—কোনো শুভ খবর পাই। না থাকলে অশুভ খবর। কেউ আমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়ে যায়। হাতটা যে কার?

এরপর আর অনেক দিন কিছু দেখি না। সুষমার কথাও ভুলে গেছি। মেয়ে জামাই বাড়িতে। বেশ উৎসবের মতো কটা দিন কেটে গেল। নাতি—নাতনিকে নিয়ে চিড়িয়াখানা, বিধান শিশু উদ্যানে ঘুরে বেড়ালাম। একদিন গুপি গায়েন বাঘা বায়েন দেখলাম। এই করতে করতে ওদের যাবার দিন এসে গেল। রিজার্ভেশন ঠিক। ওরা এলাহাবাদে দু—দিন কাটিয়ে দিল্লি যাবে। মাঝে একবার মোগলসরাইতেও নামার কথা। সেখানে মেয়ের ননদ থাকে। যাবার সময় আত্মীয়স্বজন সবাইকে দেখে যাবার ইচ্ছা তাদের। দেখতে দেখতে যাবার দিন এসে গেল। এবং সেদিন রাতে খেতে বসে আবার সেই কঙ্কালের ন্যাড়া হাত বারান্দায় পড়ে আছে দেখতে পেলাম। আবার চমকে গেলাম। এটা দেখলেই টের পাই কোনো অশুভ ইঙ্গিত আছে এর মধ্যে। খাবার টেবিলেই অরূপকে বললাম, কাল তোমাদের যাওয়া হবে না। টিকিট ক্যানসেল কর।

ওরা তো অবাক!

অরূপ বলল, কেন কাল গেলে কী হবে?

আমার মন ঠিক সায় দিচ্ছে না।

স্ত্রী ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, তুমি যে কি না! এই হয়েছে—মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর বাবা যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছে।

আমি শুধু বললাম, যাওয়া হবে না। বলে টেবিল থেকে উঠে গেলাম। রাতে আমার ঘরে অরূপ এল। বলল, আবার রিজার্ভেশন কবে পাওয়া যাবে?

বললাম, সে আমি ঠিক করে দেব। তোমাদের ভাবতে হবে না।

দু—দিন বাদে খবরের অফিসে টেলিপ্রিন্টারে ভেসে উঠল খবরটা। এলাহাবাদের কাছে ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা। বিরাশি জন দুর্ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। দুটো বগি চুরমার। এবং বগির নম্বর ট্রেন মিলিয়ে বুঝতে

পারলাম—এই কামরাতেই ওদের থাকার কথা ছিল।

অবশ্য এসব খুবই রহস্যজনক ঘটনা। কাউকে খুলে বলাও যায় না। স্ত্রী বলল, তুমি কি সব আগাম দেখতে পাও?

আমি শুধু বললাম, জানি না।

পরে খবর নিয়ে জেনেছি, সুষমা স্বামীর ঘর থেকে পাঁচ—সাত বছর আগে কোথায় চলে গেছে। তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পুনার সেই হোটেলে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বোম্বে থেকে সকালে ট্রেনে চাপলে একখানা সুন্দর পাহাড়ি পথ বেয়ে চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পশ্চিমঘাটের ন্যাড়া পর্বতমালা দেখতে দেখতে (পুনা মারাঠি উচ্চারণে পুনে) পৌঁছে যাওয়া যায় দুপুরের মধ্যেই। মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলতে পুনা। বোম্বাই যেমন ব্যবসা—বাণিজ্যের শহর, পুনা তেমনি সাহিত্য—শিল্প—সংস্কৃতির পীঠস্থান।

দুপুরবেলা। নিজের লটবহর নিজেই বহন করা আমার অভ্যাস। তাই ট্রেন থেকে নেমে ক্ষুধা—তৃষ্ণা এবং বোঝার ভারে কাতর অবস্থায় প্রথমেই যেটা চাই সেটা হল কাছাকাছি একটা হোটেল।

বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হোটেলের জন্য অনেকবার বিপাকে পড়তে হয়েছে। এমন শহর অনেক আছে যেখানে স্টেশনের কাছে কোনো ভদ্রগোছের হোটেলই নেই, হয়তো বা স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব পাঁচ—ছ—মাইল। অচেনা বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে যেমন তেমন হোটেলে উঠতে ভরসা হয় না। একবার কটকে এবং একবার মাদ্রাজে এরকম হোটেলে উঠে বিপাকে পড়তে হয়েছিল।

তবে হোটেলের দিক থেকে পুনা আদর্শ জায়গা। স্টেশন চত্বরের বাইরেই উলটোদিকে হোটেলের সারি। পথশ্রমে ক্লান্ত আমি এত কাছে হোটেল পেয়ে ভারী খুশি।

প্রথমে যে হোটেলটা সবচেয়ে ঝকমকে দেখলাম সেটাতেই হানা দিলাম। বিশাল পাঁচতলা হোটেল। একটা ঘর পাওয়া যাবেই।

কিন্তু ম্যানেজার বিরস মুখে মাথা নেড়ে বলল, একটা ঘরও খালি নেই।

অনেক ধরা করা করলাম তাকে, অবশেষে সে বলল, তোমাকে বড়োজোর একরাত্রি থাকতে দিতে পারি, কাল সকালেই ছেড়ে দিতে হবে ঘর।

আমি এ প্রস্তাবে রাজি হলাম না। কারণ যে কাজে এসেছি তাতে ক—দিন থাকতে হবে তা বলা মুশকিল। সুতরাং বেরিয়ে এসে পাশের আর একটা হোটেলে হানা দিলাম। সেখানেও ঘর নেই। সব ভরতি।

তৃতীয় হোটেলেও জায়গা না পেয়ে ভারী দমে গেলাম। এদিকে তেষ্টা বাড়ছে, খিদে পাচ্ছে, বিরক্তি বাড়ছে, গরমে ঘামে চিটচিট করছে শরীর। ক্লান্তও বটে। বিপন্ন দেখে দালালরা পিছনে লেগেছে। কিন্তু দালালদের দ্বারা আমি কখনো চালিত হই না, তারা বেশিরভাগই এমন সব হোটেলে নিয়ে তোলে যার সুনাম নেই।

সুতরাং নিজেই খুঁজতে খুঁজতে এগোতে লাগলাম।

একটু দূরে এসেই বাগান—ঘেরা চমৎকার একটা দোতলা পুরোনো বাড়ি নজরে পড়ল। দোতলার ওপরে ছাদ নয়, লাল টিনের ছাউনি। ব্রিটিশ আমলের বাংলো প্যাটার্ন বাড়ি। হোটেলটার নাম—না, আসল নাম বলব না, মানহানির মামলা হয়ে যেতে পারে। ধরা যাক হোটেলটার নাম এ বি সি।

ম্যানেজারের চেহারাটা দারুণ ভালো। সাহেবদের মতো ফর্সা, মোটা গোঁফ, পুরুষালি আকৃতি। ঘর চাইতেই বলল, ঘর আছে, তবে ফাইভ সিটেড রুম। তোমাকে ও ঘরে একাই থাকতে হবে, কারণ আর কোনো বোর্ডার নেই, পঞ্চাশ টাকা করে চাই।

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি। জিনিসপত্রের বোঝা নামিয়ে স্নানটি করে কিছু মুখে দেওয়াই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ।

চাবি দিয়ে দোতলার একটি ঘর খুলে আমার জিনিসপত্র পৌঁছে দিয়ে বেয়ারা চলে গেল।

ঘরটা বেশ পছন্দ হল আমার। খুব উঁচুতে সিলিং। পুরোনো আমালের পাঁচটা সিঙ্গল খাট, বিছানা পাতা, আলমারি টেবিল চেয়ার সবই পুরোনো আমলের। ড্রেসিং টেবল আলনা সব আছে।

বেয়ারা চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে জুতো মোজা ছাড়ছি। হঠাৎ আলমারির একটা পাল্লা কোঁ—ওঁ—ওঁ শব্দ করে ধীরে ধীরে খুলে গেল। উঠে গিয়ে পাল্লাটা আবার চেপে দিয়ে জামাকাপড় বদলে নিলাম, স্নান করেই বেরোতে হবে কিছু খেয়ে নিতে, তারপর পরদিনে অনেক কাজ।

ফ্যানটা চালিয়ে যখন গায়ের ঘাম শুকিয়ে নিচ্ছি তখন ফেল আলমারির পাল্লাটা কোঁ—ওঁ—ওঁ করে খুলে গেল, আপনা থেকেই। কিছু মনে করার নেই। পুরোনো কাঠের আলমারি, কবজা হয়তো ঢিলে হয়ে গেছে। আবার পাল্লাটা ভেজিয়ে স্নান করতে চলে গেলাম।

বাথরুমটায় সেই ব্রিটিশ আমলের কমোড, বাথটাব, বেসিন সবই পুরোনো দাগি ফাটা বা স্বাস্থ্য দেখলেই বোঝা যায় এই হোটেলটা এক সময়ে বেশ অভিজাত ছিল, এখন নাভিশ্বাস ছাড়ছে।

স্নান সেরে এসে যখন আয়নার সামনে চুল আঁচড়াচ্ছি তখন আলমারির পাল্লা তৃতীয়বার কোঁ—ওঁ—ওঁ আর্তনাদ করে খুলল। একটু বিরক্তি বোধ করলাম। আলমারির মধ্যে অনেক পুরোনো খবরের কাগজ পড়ে আছে। তা থেকেই খানিকটা ছিঁড়ে ভাঁজ করে পাল্লাটা নীচে গোঁজা দিয়ে খুব টাইট করে পাল্লাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর দরজায় তালা দিয়ে বেরোলাম দুপুরের খাওয়া সেরে আসতে।

কাছাকাছি একটা হোটেলে খেয়ে ফিরে আসতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগেনি। ইচ্ছে ছিল, একটু বিশ্রাম নিয়ে কাজে বেরোব, ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে একটা বিছানায় গা ঢেলে সদ্য চোখ বুজেছি। পথশ্রমের ক্লান্তি এবং ভরা পেটের শান্তিতে চোখ জুড়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

কোঁ—ওঁ—ওঁ

একটু চমকে চোখ চাইলাম। অবাক কাণ্ড। খুব শক্ত করে গোঁজা দেওয়া পাল্লাটা আবার খুলে গেছে। অনেকক্ষণ আলমারিটার দিকে চেয়ে রইলাম। ঘরে যখন আমি প্রথম ঢুকেছিলাম তখন পাল্লাটা বন্ধ ছিল। আমি ঘরে ঢুকবার পর থেকেই বারবার খুলে যাচ্ছিল। এখন শক্ত করে গোঁজা দেওয়া সত্ত্বেও সেই কাণ্ড। ব্যাপারটা কী?

ধীরে ধীরে উঠলাম। আলমারির পাল্লায় আরও পুরু করে গোঁজা দিয়ে ভীষণ এঁটে বন্ধ করে দিলাম।

খটখট করে একটা শব্দ হল বাথরুমের দরজায়, যেন কেউ ভিতরে আটকে পড়েছে। টোকা দিয়ে জানাচ্ছে, খুলে দাও।

নিশ্চয়ই মনেরই ভুল। গিয়ে ফের শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু বাথরুমের দরজায় থেকে থেকে শব্দটা হতে থাকল। ধীরে ধীরে ঠোকার শব্দ জোরাল হয়ে উঠতে লাগল—খটখট—খটখট—দুম—দুম।

উঠতে হল। গিয়ে বাথরুমের দরজাটা হাট করে খুলে দিলাম। ভিতরে কেউ নেই, থাকার কথাও নয়।

বাথরুম থেকে মুখ ফেরাতেই পিছনে ফের আলমারির পাল্লাটা খুব ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। অলৌকিক ঘটনায় আমার বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু এরকম দিনদুপুরে বড়ো রাস্তার কাছাকাছি এরকম ঘটতে পারে বলে ধারণা ছিল না।

আমি অনুচ্চ স্বরে বললাম, এ ঘরে যে—ই থাক, আমাকে বিরক্ত করো না, আমিও তোমাকে বিরক্ত করব না।

সে কথা কেউ কানে তুলল বলে মনে হল না।

বিছানায় এসে যখন ফের শুয়েছি তখন যুগপৎ আলমারি এবং বাথরুমের দরজা বারবার বন্ধ হয়ে ফের খুলে যেতে লাগল দুমদাম শব্দে।

উঠে পড়লাম। বিশ্রাম হবে না। কাজও অনেক।

যখন বেরিয়ে আসছি তখন দেখলাম, পাশের ঘরটা ফাঁকা, কোনো লোক নেই, অবাক লাগল, কারণ কাছাকাছি কোনো হোটেলে ঘর খালি নেই, কিন্তু এই হোটেলে ফাঁকা ঘর অবহেলায় পড়ে আছে। একতলায় নামবার আগে ভালো করে ঘুরে দেখলাম, দোতলার মোট চারখানি ঘরের মধ্যে তিনখানাই ফাঁকা। একখানা ঘরে শুধু আমি।

এরপর আর অবশ্য ভূতুড়ে ব্যাপার নিয়ে ভাববার সময় ছিল না। অনেকগুলো জায়গায় যেতে হল। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হল। আর এইসব করতে করতে সন্ধে ছাড়িয়ে অন্ধকার নেমে এল চারদিকে।

যখন হোটেলে ফিরলাম তখন রাত আটটা, বাইরের একটা রেস্তোরাঁয় রাতের খাওয়া সেরে এসেছি। সুতরাং নিশ্চিন্ত।

ঘরের তালা খুলতে গিয়েই মনে পড়ে গেল, দুপুরের সব কাণ্ডমাণ্ড। একটু ধড়াস করে উঠল বুক। এই ঘরে আমাকে একটা রাত কাটাতে হবে। শুধু তাই নয়, দোতলায় আমি একদম একা।

কিন্তু ভয় পেলে আমার চলে না। কাজে বেরিয়ে নানা জায়গায় আমাকে একাই থাকতে হয়েছে। জঙ্গলে, পাহাড়ে, নদীর ধারে, ভয় পেলে চলবে না। বিদেশ বিভুঁয়ে ভয় হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললাম এবং অনেকক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আলমারির পাল্লা বা বাথরুমের দরজা কোনো বেয়াদবি করল না।

জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সারাদিন ধকল গেছে অনেক। ঘুম এল বলে, আমার ঘুমও খুব গাঢ়। সহজে ভাঙে না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে টানছিলাম। বড়ো ক্লান্তি, সিগারেট শেষ করেই ঢলে পড়ব ঘুমে।

কখন সিগারেট শেষ হয়েছে, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তা বলতে পারব না। কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভাঙল, আলো নেবাতে ভুলে গেছি। ঘরটা ঝক ঝক করছে আলোয়।

কিন্তু ঘুম ভাঙল কেন? এত ক্লান্ত হয়ে শুয়েছি যে, ভোরের আগে ঘুম ভাঙবার কথাই নয়।

একটা হাই তুলে উঠে বসলাম। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। উঁচু টিনের চালে চড়চড় শব্দ। একটু ঝোড়ো বাতাসও বইছে, সোঁ সোঁ আওয়াজ।

জলের গেলাসটার জন্য হাত বাড়িয়েই থেকে যেতে হল।

ও কী? আমার সামনে ছ—খানা টান টান করে পাতা বিছানা। তার মধ্যে ডান হাতের একদম কোণের দিকের বিছানাটার বালিশ খুব ধীরে ধীরে ডিগবাজি খাচ্ছে। সেই সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে চাদর।

চোখের সামনে দেখতে দেখতে দ্বিতীয় বিছানাটার চাদরও ডিগবাজি—খাওয়া বালিশে জড়িয়ে যেতে লাগল। তারপর তৃতীয় বিছানাতেও সেই একই কাণ্ড।

নড়তে পারছি না। চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই। বিকেলেই দেখে গিয়েছি চাকর বা বেয়ারাকে ডাকার জন্য যে কলিং বেল রয়েছে তা অকেজো। সুতরাং আমি বিচ্ছিন্ন, একা এবং অসহায়।

কিন্তু আমি একটা জিনিস মানি। ভয়ের চেয়ে বড়ো শত্রু নেই। খুব ছোটোবেলায়—বোধহয় ছয় কি সাত বছর বয়স থেকে দীর্ঘকাল নিশুত রাতে আমি একটা ভূতুড়ে পায়ের শব্দ শুনতাম। প্রথমে ভয় পেতাম, কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। রোজ নয়, মাঝে মাঝে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে আমি সেই অমোঘ শব্দ শুনেছি। সেই কারণেই ভয় পেলেও, সেটা অস্বাভাবিক রকমের ভয় নয়। আমার হাত—পা কাঁপছে না, শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে না, শুধু বুকটা ধড়াস ধড়াস শব্দ করছে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছি।

বালিশগুলো ডিগবাজি খেয়ে খেয়ে আবার স্বস্থানে ফিরল।

সব শান্ত।

আমি একটু জল খেতে সিগারেট ধরালাম।

প্রায় দশ মিনিট ঘরে কোনো শব্দ নেই। ঘটনা ঘটছে না।

একটা শ্বাস ফেলে উঠলাম। বারান্দায় যাব বলে দরজাটা খুলবার জন্য ছিটকিনির দিকে হাত বাড়িয়েছি। ছিটকিনিটা আপনা থেকেই খটাস করে পড়ে গেল। হুড়ুম করে খুলে গেল দরজাটা। আর অদ্ভুত ব্যাপার যে, ঘরের ভিতর থেকে একটা বাতাসের ঝাপটা আমাকে ধাক্কা মেরে বারান্দায় বের করে দিল।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে উঠলাম। দরজাটার দিকে ফিরে বললাম, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। তাহলে এরকম করলে কেন?

দরজার পাল্লা দুটো ঠাস করে বন্ধ হয়ে গেল।

ঠেলে দেখলাম। ছিটকিনি বন্ধ।

আমি চেঁচামেচি করলাম না। লোক ডাকতে ছুটলাম না। কেন যেন মনে হচ্ছিল, ওসব করে লাভ নেই, যা কিছু করার আমাকেই করতে হবে।

কিন্তু কী করব? কী আমার করার আছে?

রেলিং—এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিশুতি রাত্রির বৃষ্টি আর বাতাসের ঝাপটা খেলাম। তারপর চোখ বুজে হাত জোড় করে ঠাকুরের কাছে প্রাণভরে প্রার্থনা করলাম, ওর সুমতি দাও। ওর রাগ যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দাও। ও শান্ত হোক। ও বুঝুক আমি ওর শত্রু নই।

প্রার্থনার সময় চোখে একটু জল এসেছিল আমার। ধ্যানে ঠাকুরের মুখশ্রী জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠেছিল আজ্ঞাচক্রে।

খুট করে একটা শব্দ।

চেয়ে দেখি দরজাটা খুলে গেল ধীরে ধীরে।

আমি এগিয়ে গেলাম। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিই। আলমারি বন্ধ, বাথরুমের দরজা যথারীতি ভেজানো। বিছানাগুলো টানটান পাতা।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘরে আর শব্দ নেই। ঘটনা নেই। অবশেষে তার সঙ্গে আমার ভাব—সাব হয়েছে বুঝতে পেরে নিশ্চিন্তে চোখ বুঝলাম আমি।

এক ঘুমে ভোর।

কুকুর—বাংলো

অজেয় রায়

এত সহজে এবং বিনা ভাড়ায় এমন চমৎকার বাড়িটা পাওয়া যাবে, কানাইবাবু তা ভাবতে পারেননি।

কানাইবাবুর স্ত্রী অনেক দিন টাইফয়েডে ভুগলেন। সেরে ওঠার পর ডাক্তার বললেন, 'একটু চেঞ্জ দরকার।' কানাইবাবুর এক উকিল বন্ধু জানালেন, 'আমার এক মক্কেলের একটা বাড়ি আছে ঘাটশিলায়। খালি পড়ে থাকে। ঠিকানা দিচ্ছি, দেখা করো। আমিও ফোনে বলে দেব। বোধহয় পেয়ে যাবে। ঘাটশিলা জায়গাটা বিউটিফুল। আমি গেছি একবার। ফাল্গুন মাস। এখনও গরম পড়েনি। ভালো চেঞ্জ হবে।'

বন্ধুর মক্কেল গোবিন্দগোপাল ঘোষ তাঁর ঘাটশিলার বাড়িটা এককথায় দিতে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'ওটা তো খালিই পড়ে আছে। আমরা কেবল বছরে একবার যাই পুজোর সময়। গিয়ে যদ্দিন ইচ্ছে থাকুন। ভাড়া? ও কথা থাক। আপনি মিস্টার রায়ের বন্ধু। আপনারা গেলে উপকারই হবে। একটু সাফসুফ হয়ে যাবে বাড়িটা। ও বাড়ির কেয়ারটেকার মালিটা অবশ্য এখন দেশে গেছে। ও না থাকলেও ক্ষতি নেই। ভরত আছে। সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

কানাইবাবু দু—দিনের ছুটি নিয়ে একা চলে গেলেন ঘাটশিলায়। প্রথমে ভরতকে খুঁজে বের করলেন। ভরত সাইকেল—রিকশা চালায়। ওর রিকশায় চেপে চললেন বাড়ি দেখতে।

বাড়িটা খাসা। শহরের একদম সীমানায়। পাহাড়ি নদী সুবর্ণরেখা হাঁটা পথে আধ মাইলও হবে না। সাদা রঙের দোতলা বাড়ি। নীচে ও ওপরে অনেকগুলো শোবার ঘর। বুক—সমান উঁচু পাঁচিল ঘেরা বিঘাখানেক কমপাউন্ড। ভিতরে আম, লিচু ইত্যাদির বড়ো বড়ো গাছ। কিছু ফুল ও বাহারি পাতার গাছও রয়েছে। কমপাউন্ডের একধারে ছোটো আউট—হাউস। এখন তালা—বন্ধ। ওখানে সিধু মালি থাকে।

কানাইবাবু চাবি নিয়ে গিয়েছিলেন। তালা খুলে দোতলার ঘরগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। খাট আছে। খাতে গদি পাতা। সুইচ টিপে দেখলেন আলো জ্বলছে। রান্নাঘর, বাথরুম ফার্স্ট ক্লাস। দক্ষিণ—পুব খোলা বারান্দা। আর কী চাই? হাতে সময় কম। চটপট সব দেখে নিয়ে তিনি স্টেশনে ফিরলেন।

শুধু মনে একটু খুঁতখুঁতুনি। বাড়িটা বড্ড বেশি ফাঁকায়। তা যাকগে। ঘোষবাবু তো ফ্যামিলি নিয়ে এসে কাটিয়ে যান।

ভরত লোকটি বেশ। বছর—পঞ্চাশ বয়স। ওই দেশি লোক। তবে দিব্যি বাংলা বলে। শান্ত প্রকৃতির। এই বাড়ির মালি সিধু সম্পর্কে তার ভাই হয়।

রাতের ট্রেনে কলকাতায় ফিরলেন কানাইবাবু।

এক সপ্তাহ বাদে অফিসে দশ দিন ছুটি নিয়ে স্ত্রী, দশ বছরের ছেলে বাবলু এবং ছোকরা কাজের লোক ঘেঁটুকে নিয়ে কানাইবাবু কলকাতা ছেড়ে রওনা দিলেন।

ঘাটশিলায় পৌঁছলেন দুপুরে। সিধু তখনও ফেরেনি। তবে ভরত হাজির ছিল। কানাইবাবুরা দোতলায় থাকবেন। ভরত ওপরতলার ঘর—বারান্দা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল। জল তুলে দিল কুয়ো থেকে। লোকটি সত্যি কাজের। মুখে সর্বদা একটু হাসি লেগে আছে।

বিকেলে ভরতের রিকশা চেপে কানাইবাবু বাজারে গেলেন। এক স্টেশনারি দোকানে ঢুকলেন কেনাকাটা করতে। দোকানের মালিক বাঙালি। কানাইবাবুকে দেখে বুঝলেন চেঞ্জার। জিনিস দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'উঠেছেন কোথায়?'

'হ্যাপি লজ। এক্কেবারে শেষে। সাদা দোতলা বাড়ি।'

'ও, কুকুর—বাংলো। কদ্দিন থাকবেন?'

'অ্যাঁ, কুকুর—বাংলা!' কানাইবাবু দোকানির মুখের পানে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। হ্যাপি লজ—এমন সুন্দর নাম থাকতে এই বিশ্রী নামটা কেন?

দোকানদার কানাইবাবুর মনে ভাব বুঝলেন। বললেন, 'ওই হল। আমরা কুকুর—বাংলোই বলি।'

'কেন?'

'ওটা ছিল হ্যারিস সাহেবের বাড়ি। সাহেবের একগাদা কুকুর ছিল। তাই বাড়িটার ওই নাম চালু হয়ে গেছে।'

'হ্যারিস সাহেব এখন কোথায়?' কানাইবাবুর কৌতূহল হয়।

'সাহেব মারা গেছে। মাথা খারাপ হয়ে গিছল। তারপরই মেমসাহেব বাড়ি বেচে দিয়ে চলে গেল। ঘোষবাবু কিনলেন। এই তো বছর পাঁচেক হল।'

'মাথা খারাপ হল কেন?'

'কে জানে। বয়েসে একটু মাথার গন্ডগোল হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন সকালে খেপে গিয়ে এলোপাতাড়ি বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করল। নিজের একটা কুকুরকে গুলি করে মারল। কয়েকটা পাখি মারল। মেমসাহেবকে তাড়া করেছিল। মেম তো ঘরে দোর দিয়ে প্রাণ বাঁচাল। সব্বাই সামনে থেকে পালাল। তারপর গুলি ফুরিয়ে গেলে লোকে গিয়ে সাহেবকে ধরে ফেলল। তখন ঘোর উন্মাদ। রাঁচির পাগলা—গারদে পাঠানো হয়েছিল। ছ—মাসও বাঁচেনি।'

'সাহেব করতেন কী?'

'কাঠের ব্যবসা। ওই যে আপনার রিকশাওলা ভরত, ও তো কাজ করত হ্যারিস সাহেবের কাছে। ওখানেই থাকত।'

পথে বেরিয়ে কানাইবাবু ভরতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি হ্যারিস সাহেবের কাছে ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'ও বাড়ি ছাড়লে কেন? ঘোষবাবু ছাড়িয়ে দিলেন?'

'না বাবু। উনি রাখতে চেয়েছিলেন। আমিই রইলাম না। ওখানে থাকতে আর মন হল না। দশ বচ্ছর ছিলাম। সিধুকে আমিই এনে দিইচি ওই বাড়িতে।'

কানাইবাবুদের দারুণ লাগছে। এখানে দিগন্ত—ছোঁয়া রুক্ষ মাঠ—প্রান্তরে ছোটো—বড়ো পাথরের চাঁই। তারই মাঝে—মাঝে টুকরো—টুকরো খেত। কাছেই ফুলডুংরি পাহাড় পরিষ্কার দেখা যায়। দূরে আরও পাহাড়ের ঢেউ। বাড়ির সামনের রাস্তাটা ডান ধারে কিছু দূরে শাল—বনের গা ঘেঁষে এগিয়ে গেছে।

ভরত প্রতিদিন এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়। বাবলু ছটফটে দুরন্ত ছেলে। কেবল চায় মাঠে—ঘাটে ঘুরি। বাবলুর মা বেশি হাঁটতে পারেন না। কানাইবাবু স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি হাঁটেন। বাবলু ঘেঁটুকে সঙ্গী করে চারপাশে বেড়িয়ে বেড়ায়। এখানে গাড়ি—ঘোড়ার ভয় নেই। তবে বাবলুকে বারণ করা হয়েছে সুবর্ণরেখা নদীতে যেন না নামে বা শালবনে না ঢোকে।

রাতে কিন্তু বেশ গা ছমছম করে। কানাইবাবুরা শহুরে লোক। এখানে সন্ধে হলেই চারধারে নিঝুম হয়ে আসে। এই বাড়ির ডান দিকে , পিছনে ও সামনে রাস্তার ওপারে খোলা মাঠ। বাঁ পাশে খানিক তফাতে—তফাতে পর—পর দুটো বাড়ি। আবার অনেকটা খোলা জমি। পাশের বাড়ি দুটো এখন ফাঁকা। এগুলোয় কালেভদ্রে লোক আসে বেড়াতে। কানাইবাবুর সামনের রাস্তায় আলো নেই। কাছাকাছি বাড়িতে আলোর চিহ্ন দেখা যায় না। আকাশের অজস্র তারা আর একফালি চাঁদ মিলে যা সামান্য আলো দেয়। সূর্য ডুবলেই শীত—শীত করে। সন্ধের পর সামনের রাস্তা দিয়ে দু—চারটি মাত্র লোক চলে। তবে এই নির্জনতা খানিকটা সয়ে এল ক্রমে।

একদিন বাবলু বলল, 'জানো বাবা, ভরতের একটা কুকুর আছে। এই এত্ত বড়ো। বিরাট। কালো রঙের।'
'দিশি কুকুর?'
'না, বিলিতি। আমার সাথে খুব ভাব হয়ে গেছে। ওর নাম কালু।'
ভরতের বাসা মাইলখানেক দূরে। বাবলু গিয়েছিল সেখানে। বাবলু বেজায় কুকুর—ভক্ত। কানাইবাবুও কুকুর ভালোবাসেন। কিন্তু বাবলুর মা কুকুর দেখতে পারেন না। তাই তাদের কুকুর পোষা হয় না। বাবলু অন্য বাড়ির কুকুর আদর করে সাধ মেটায়।
'বাবা, তোমায় কালুকে দেখাব একদিন। ভরতকে বলব নিয়ে আসতে।' বাবলু উৎফুল্ল হয়ে জানাল।
সেইদিনই বিকেলে। কানাইবাবু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন বাড়ির সুমুখে। ভরতকে হেঁটে আসতে দেখা গেল। তার সঙ্গে চেনে বাঁধা এক প্রকাণ্ড কালো কুকুর। পিছনে—পিছনে আসছে বাবলু আর ঘেঁটু। বাবলু চেঁচাল, 'বাবা, কালুকে এনেছি।'
সত্যি কুকুর বটে। যেন একখানা বাঘ। মাটি শুঁকতে—শুঁকতে এগুচ্ছে। ওর গায়ে কী প্রচণ্ড জোর, বোঝা যায়। কারণ ভরতের মতো জোয়ান লোক দু—হাতে ওর চেন টেনে রাখতে পারছে না। মাঝে—মাঝে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কানাইবাবুর হাত—কুড়ি দূরে এসে থামল ভরত। এক ধমক দিয়ে থামাল কুকুরটাকে। কুকুর জ্বলজ্বলে স্থির চোখে দেখতে লাগল কানাইবাবুদের।
'কালু'—বলে ডাক দিয়ে, বাবার কাছে বাহাদুরি দেখাতে বাবলু ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল কুকুরটার গলা।
বাবলুর মা অমনি আঁতকে উঠে বলতে লাগলেন, 'ছেড়ে দে বাবলু। কামড়ে দেবে। এই বাবলু, ছেড়ে দে বলছি!'
বাবলু কালুর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ধ্যাত!'
কালু চুপ করে দাঁড়িয়ে আধবোজা চোখে বাবলুর কোমল হাতের আদর খেতে লাগল আর আড়—চোখে লক্ষ করতে লাগল তার মাকে।
কালুকে দেখে কানাইবাবু মুগ্ধ। কিন্তু স্ত্রী নার্ভাস হয়ে পড়ছেন দেখে বললেন, 'থাক বাবলু, কুকুরের গায়ে হাত দিও না। যাও এখন ঘরে যাও। মায়ের সঙ্গে যাও।'
বাবলু ও তার মা বাসায় ফিরে চলল।
কানাইবাবু আর—একটু কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলেন কালুকে। হাউন্ড জাতের কুকুর। কুচকুচে কালো লোম। শুধু চারটে থাবায় সাদা সাদা ছোপ। বাঃ!
'এ—কুকুর তুমি কোথায় পেলে?' কানাইবাবু অবাক।
ভরত বলল, 'সাহেবের ছিল। মেমসাহেব চলে যাবার সময় সব কুকুর দিয়ে দিলেন। বিক্রি করে দিলেন। এটাকে আমি চেয়ে নিইচি। তখন দু—মাসের বাচ্চা।'
কানাইবাবু বারবার কালুর তারিফ জানিয়ে বাড়ি ফিরলেন।
এরপর বাবলু প্রায়ই মায়ের আড়ালে বাবার কাছে কালুর গল্প করত। ও নাকি মস্ত বীর। একবার হায়নার মুখ থেকে ভরতের ছাগল উদ্ধার করেছে। রবারের বল ছুঁড়ে দিলে ও তীর বেগে ছুটে গিয়ে বলটা ধরে ফেলে। তবে কালুকে এ—বাড়ি আনতে আর সে ভরসা পায়নি। মা যা ভিতু। কালুর খোঁজে সেই যেত ভরতের বাসায়।

আট দিন কেটেছে।
সকালে বেরিয়েছিলেন কানাইবাবু। বেলা দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখেন একজন লোক নীচের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।—'কে?'
অচেনা লোক। ষণ্ডা চেহারা। চোখের চাউনিটা কেমন চোরা—চোরা। লোকটা বলল, 'বাবু, গামছা নেবেন? ভালো গামছা আছে।'

কানাইবাবু দেখলেন মাটিতে একটা ছোটো পুঁটুলি। 'নাঃ।' তিনি জবাব দিলেন।

লোকটা নড়ল না। এদিক—সেদিন তাকাতে—তাকাতে বলল, 'কাজের লোক রাখবেন বাবু? সব মেহনতি কাজ করে দেব। মাহিনা যা খুশি দেবেন।'

'না। আমার লোক আছে।'

'ওই ছোকরা কুয়াসে জল তুলতে পারে?' ঘেঁটুকে দেখিয়ে বলল লোকটা।

'জল একজন তুলে দিয়ে যায়।'

'ও'—লোকটা এবার মোট তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুপুরে একবার দোতলার বারান্দায় এসে কানাইবাবু দেখেন সকালের সেই গামছাওলা কিছু দূরে একটা বটগাছের নীচে বসে। তার সঙ্গে আর—একটা লোক। এই দিকেই চেয়ে রয়েছে।

এই খাঁ—খাঁ রোদে ওরা করছে কী? কানাইবাবু তাকানো মাত্র লোক দুটো মুখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর উঠে ধীরেসুস্থে চলে গেল। কানাইবাবুর মনটা খচখচ করে। হাবভাব ভালো নয় লোকগুলোর।

সেই রাতে ঘুম আসছিল না কানাইবাবুর। পাশে বাবলু ও বাবলুর মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কানাইবাবুর মনে জমছে নানান চিন্তা। রাত বারোটা বাজল। কানাইবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে ডান দিকের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। পর্দাটা একটু সরিয়ে তাকালেন বাইরে।

বাইরে ফিকে চাঁদের আলোয় গাছপালা, প্রান্তরের উঁচু—নীচু অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খানিক দূরে মাঠের মধ্যে একটা বড়ো পাথরের ঢিবি। তার পাশে কী জানি নড়ল? সন্দিগ্ধ মনটা ধক করে ওঠে। কানাইবাবু পর্দাটা টেনে দিয়ে অল্প ফাঁক রেখে তাই দিয়ে খর চোখে চেয়ে রইলেন পাথরটার দিকে।

হুঁ, কেউ বসে আছে পাথরের আড়ালে—আঁধারে। একটা। দুটো। তিনটে মাথা। দুটো লাল আলোর বিন্দু। ও বিড়ির আগুন। কানাইবাবুর হৃৎপিণ্ডের গতি ভীষণ বেড়ে যায়। নিরীহ ভালো লোক কেউ এই রাত—দুপুরে ওখানে বসে থাকবে কেন লুকিয়ে? কী মতলব ওদের?

তিনটে ছায়া—মূর্তি খাড়া হল। কানাইবাবুর বাড়ির পাঁচিলের কাছে এগিয়ে এল।

কানাইবাবুর মনে ঝড় বইছে। এই বাড়ির অনেক দরজা জানলা পুরোনো। মোটেই পোক্ত নয়। অনায়াসে খোলা যায় বা ভেঙে ফেলা যায়। যদি ওরা চোর—ডাকাত হয়? ঢোকে বাড়িতে। ওরা তিনজন, কানাইবাবু একা। এখান থেকে চেঁচালে কারও সাহায্য পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। এর পরের বাড়িটায় একজন মালি থাকে। কিন্তু সে লোকটা সন্ধে থেকে অঘোরে ঘুমোয়। তার কানে ডাক পৌঁছবে কি?

হেঁকে বলব নাকি—কে? হয়তো ভয় পেয়ে পালাবে লোকগুলো। কিন্তু একটা মুশকিল আছে। বাবলুর মা চমকে জেগে উঠবে। তার হার্ট খারাপ। ভয় পেলে চমকালে বিপদ হতে পারে।

ওদের জাগিয়ে তুলে ব্যাপারটা বলি। কিন্তু তাতেও যে ভয় পাবে ভীষণ।

লোকগুলো পাঁচিলের ধারে আরও ঘেঁষে এল। একজন চড়ে বসল পাঁচিলের ওপর।

কানাইবাবু আর থাকতে পারলেন না। ঘরের আলোটা জ্বেলে দিই। বাবলুরা জেগে উঠবে। অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ করে ভয় পাবে। উপায় নেই। বাড়ির লোক জেগে গেছে দেখলে যদি ওরা পালায়, এই ভরসা।

দেয়ালের গায়ে সুইচের দিকে এক পা বাড়িয়েই থমকে গেলেন কানাইবাবু। কানে এল কোনো কুকুরের গভীর চাপা গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে—'বাপরে' বলে ভীত চিৎকার।

কানাইবাবু চট করে ফের জানলায় দাঁড়ালেন। আবছা জ্যোৎস্নায় দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। মাঠ দিয়ে তিনটে লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে আর তাদের পিছনে লাফাতে—লাফাতে ছুটে চলেছে এক প্রকাণ্ড মিশকালো জীব। কী ওটা? নিশ্চয়ই কুকুর। ও ডাক কুকুরের। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা বাড়ির পেছন দিকে মিলিয়ে গেল। কানাইবাবু থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

বোধহয় আরও মিনিট দু—তিন বাদে দূরে শোনা গেল আবার সেইরকম কুকুরের ডাক। মানুষের গলার একবার আর্তনাদ। তারপরই তীক্ষ্ন শিসের মতো একটা আওয়াজ। এরপর সব চুপ। শুধু একটানা ঝিঁঝির

ডাক।

প্রায় ঘণ্টাখানেক জানলার কাছে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কানাইবাবু। কিন্তু আর অস্বাভাবিক কিছু কানে এল না, দেখতেও পেলেন না।

তিনি বিছানায় গিয়ে শুলেন। ঘুম আসে না। দপদপ করছে মাথা। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না ব্যাপারটা। অতিরিক্ত উত্তেজনার ক্লান্তিতেই শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

'বাবা ওঠো, মাছ আনতে যাবে না?'

বাবলুর ডাকে কানাইবাবুর ঘুম ভাঙে।

প্রায়ই ভোরে কানাইবাবু সুবর্ণরেখার তীরে যান টাটকা মাছ কিনতে। জেলেরা তখন নদীতে মাছ ধরে। আজ মাছ আনার কথা। চটপট তৈরি হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। পথে যেতে যেতে হঠাৎ মনে পড়ল গত রাতের ঘটনা। এমন সুন্দর সকালে ঘটনাটা যেন মনে হল দুঃস্বপ্ন। অবাস্তব।

নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। চওড়া নদী, এখন অবশ্য জল কম। কানাইবাবুর পায়ের কাছ থেকে খাড়া পাড় নেমেছে। তলায় ধারের দিকে জল নেই। ছোটো—বড়ো পাথর ছড়ানো। সেখানে কয়েকজন ছেলে জটলা করছে। তাদের সামনে মাটিতে পড়ে আছে একটি মানুষের দেহ। এমন ভেঙে—চুরে দ হয়ে আছে শরীরটা, মনে হয় যেন প্রাণ নেই। ঘাড়টা ওপাশে ঘোরানো। তাই কানাইবাবু তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। পাথরের গায়ে শুকনো রক্তের দাগ। জেলেরা নিজেদের ভিতর উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে।

কানাইবাবুর বুকে ধুকপুকুনি। তিনি না পারলেন নীচে নেমে গিয়ে ভালো করে দেখতে, না পারলেন চলে যেতে। ওইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন ঠায়। মিনিটপাঁচেক বাদে সেখানে সাইকেল চড়ে হাজির হল একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর এবং দু—জন কনস্টেবল। পুলিশের লোকেরা নেমে গেল নীচে। একজন সেপাই দেহটাকে উলটে দিলেন। কানাইবাবু চমকে উঠলেন। এ যে সেই গামছাওলা। লোকটা মরে গেছে নির্ঘাত। কপাল ও মুখের খানিকটা একেবারে থেঁতলে গেছে। চোখ—দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

ইনস্পেক্টর জেলেদের প্রশ্ন করতে লাগলেন। ওপর থেকে বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না কানাইবাবু। আরও লোক আসছে চারদিক থেকে। মৃতদেহ ঘিরে ভিড় বাড়ছে। ভরতকে আসতে দেখা গেল। তার হাতে দড়ির আংটায় ঝোলানো একটি পিতলের ঘটি। ভরত রোজ ভোরে কানাইবাবুকে তার গোরুর দুধ দিয়ে যায়। ভরতও নদীর ধার বেয়ে নেমে ভিড়ে ঢুকল।

একটু পরে কানাইবাবু সাহস করে নীচে নামলেন। ভরতের কনুইয়ে টোকা দিলেন। ভরত ফিরে বলল, 'ও বাবু, আপনি? চলুন। দুধ দিতে দেরি হয়ে গেল। ভরতের পিছনে পিছনে কানাইবাবু ফের উঠে এলেন ওপরে।

'কী হয়েছে? লোকটা কে? কানাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'দাগি ডাকাত। এখানকার লোক নয়। বাইরের। টাটানগরে একটা ডাকাতির কেসে পুলিশ খুঁজছিল ওকে। দারোগাবাবু বলছিলেন।'

'ও মরল কী ভাবে?'

'ওপর থেকে পড়ে। মাথায় চোট লেগেছে।'

'জানো ভরত, ওই লোকটা কাল আমার বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। আরও দুটো লোক ছিল সঙ্গে।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ। তোমার কালু আমাদের বাঁচিয়েছে।'

'কালু!'

'হুঁ। সকালে ওই লোকটাই একবার আমার বাড়িতে ঢুকেছিল। তারপর—' কানাইবাবু সকাল থেকে রাত অবধি সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বলে গেলেন। শেষে বললেন, 'নিশ্চয়ই কালুর তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে লোকটা গড়িয়ে নদীর ভেতর পড়ে গেছে।'

ভরত একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'না বাবু, ও কালু নয়।'

'আলবত কালু। আমি নিজের চোখে দেখেছি। এমন কুকুর আর কার আছে এখানে?'

আবার মাথা নাড়ে ভরত। বলে, 'বাবু কাল রাতে কালু আমার ঘরে আটক ছিল। একবারও বেরয়নি। আমি বুঝেছি বাবু, ও কালু নয়, টাইগার।'

'টাইগার। টাইগার কে?'

'কালুর বাপ। সাহেবের সব চেয়ে পেয়ারের কুকুর ছিল। সাহেব পাগল হয়ে গুলি করে মেরে দিলেন টাইগারকে। আর ওই যে বলছেন শিস। অমনি সিটি দিয়ে সাহেব টাইগারকে ডাক দিতেন।'

ভূত—অদ্ভুত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার ঠাকুরদা যখন বাড়িটা কিনেছিলেন, তখন তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেই বলেছিলেন, কাজটা ভালো হচ্ছে না। বাড়িটা ঐতিহাসিক, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওলন্দাজ গভর্নরের কুঠিবাড়ি। কিন্তু, যেখানেই ইতিহাস, সেইখানেই তো ভূত। ইতিহাসের আর এক নাম ভূত বললেই বা ক্ষতি কী! বাড়িটায় যেমন অনেক রহস্য আছে, সেইরকম অনেক ভূতও আছে। তা না হলে এতদিন খালি পড়ে আছে!

ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'মশা তাড়াবার যেমন ধূপ আছে, আমার কাছে সেইরকম ভূত তাড়াবার ধুনো আছে। ভূতকে আমি তেমন ভয় পাই না, ভয় পাই মানুষকে।'

আমার ঠাকুরদা ছিলেন নামকরা শিক্ষক। আমাদের পরিবারের লোকসংখ্যাও কিছু কম ছিল না। সকলেই বিজ্ঞানচর্চা করতেন। ভূত, প্রেত, ভগবান, কোনোটাই মানতেন না। বাড়িটা কেনা হল প্রায় জলের দামে। বিশাল এক দোতলা বাড়ি। দু—মহলা। সামনের দিকটা পুব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। পেছনের মহল দক্ষিণ থেকে উত্তরে। 'এল' শেপ। পেছনে একটা বারান্দা। পুবে শুরু হয়ে দক্ষিণ বরাবর পশ্চিম হয়ে উত্তরে ঘুরে গেছে। এই উত্তরটাই ছিল ভয়ংকর। নিরালা, নির্জন। গাছপালা—ঘেরা। মনে হত ভূতের আড়ত।

নানা জনের কথায় ওই বাড়িতে ভূতের যে—তালিকা পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল এইরকম—

এক, গভীর রাতে বাড়ির ন্যাড়া ছাদ থেকে কেউ একজন বিশাল একটা ঘুড়ি ছাড়ত। কালো রঙের ঢাউস ঘুড়ি। অন্ধকার আকাশ। জ্বলজ্বলে তারা। কালো একটা ঘুড়ি, প্রেতাত্মার মতো লাট খাচ্ছে, টাল খাচ্ছে। গোত্তা খেয়ে নীচে নামছে, পড়পড় শব্দে উঠে যাচ্ছে আকাশের টঙে। যাদের ঘুম ভেঙে যেত, তারা শব্দটা শুনতে পেত। সাহসী যারা, তারা বারান্দায় বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালে ঘন কালো ছায়ার মতো একটা কিছু দেখতে পেত।

দুই, কুয়োর সঙ্গে একটা হ্যান্ড—পাম্প লাগানো ছিল। গভীর রাতে কেউ সেটাকে পাম্প করত। হ্যাচাং—হ্যাচাং শব্দ শুনতে পেত প্রতিবেশীরা। তালাবন্ধ খালি বাড়ি অথচ জল পাম্প করার শব্দ। সাহসীরা তিনতলার ছাত থেকে এই বাড়ির পাতকো তলায় টর্চলাইট ফেলত। লোক নেই, জন নেই। পাম্পের হাতল ওঠানামা করছে।

তিন, মাঝরাতের ন্যাড়া ছাতে জলের মূর্তি। একটা মূর্তি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু জল টলটলে। যেমন এক বালতি জল। বালতিটা নেই, জলটা বালতির আকার ধরে আছে। সেইরকম মানুষের আকারে জল। ছাতে টলে—টলে বেড়াচ্ছে। মাঝে—মাঝে আকাশে হাত তুলছে।

চার, সার্চলাইট। হঠাৎ একটা তীব্র আলোর রেখা অন্ধকার চিরে আকাশের দিকে ছুটে যেত। গোল হয়ে ঘুরত। সেই আলোর উৎস এই বাড়ির ছাত।

পাঁচ, একবার এক যাত্রার দল এই পাড়ায় তিনদিন ধরে যাত্রা করতে এসেছিল। সেই দলকে এই বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম রাতের অভিনয়ের পর দলের নায়িকা সকাল দশটার সময় ছাদ থেকে ভেতরের উঠোনে পড়ে গিয়ে, হাত—পা ভেঙে হাসপাতালে পড়েছিলেন এক মাস। তিনি বলেছিলেন, অদৃশ্য কেউ ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।

ছয়, একবার এক ভবঘুরে মানুষ এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভীষণ সাহসী। সারা পৃথিবী ঘুরেছিলেন তিনি। যাওয়ার আগে পাড়ার লোককে বলেছিলেন, এই বাড়িটায় অদ্ভুত একটা কিছু আছে। প্রবল বাতাস

যখন কোনও ফাঁকফোকর দিয়ে বইতে থাকে তখন শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ হয়। সারা রাত এই বাড়িতে সেইরকম শব্দ হয়। বাইরে বাতাস নেই, ভেতরে বাতাস কেঁদে—কেঁদে ফেরে।

সাত, বাগানের মাটি খুঁড়ে একটা কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। কোনো মহিলার। হাতে বালা ছিল।

আট, রান্নাঘরের বাইরের দেওয়াল বেয়ে একটা পোড়ামাটির নল সোজা উঠে গেছে তিনতলার ছাতে। খালি বাড়ি। তালাবন্ধ। কেউ কোথাও নেই। প্রতিবেশীরা দেখছে, গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

আমার ঠাকুরদা এর সব ক'টাই লিখে রেখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ভূতের লিস্ট'। বাড়িল দখল নিয়ে বললেন, 'দেখা যাক, কোন ভূত কখন দর্শন দেয়। ভূতের দর্শন পেলে ভগবানেরও দর্শন পাব।' আমরা তখন খুবই ছোটো।

আমি আর আমার দিদি সন্ধে হলেই দুজনে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতুম। এ—মহল থেকে ও—মহলে যেতে ভয়ে বুক কাঁপত। বারান্দার ঘুরপাক। বাঁ—দিক দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। আর—একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ছাতে। ডানদিকে বাগান থেকে উঠে এসেছে ঝোপঝাড়, গাছপালা। রেলিংয়ে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকালে পাতকো—তলা। হ্যান্ড—পাম্পের হাতলটা অন্ধকারে নিরেট এক অন্ধকার। ঝিঁঝির ডাক। পাতার ফাঁকে—ফাঁকে চিকচিকে জোনাকি। কে আবার শিখিয়ে দিয়েছিল, জোনাকিরা সব প্রেতাত্মা। তাই সন্ধেবেলা দিদি আর আমি যেন অবিচ্ছেদ্য দুই প্রাণী। দিনেরবেলা যত ঝগড়া, রাত্তির হলেই গায়ে গা—লাগানো গলায়—গলায় ভাব। মা কি জ্যাঠাইমা হয়তো উত্তর মহলের রান্নাঘর থেকে ডাকলেন, 'উমা শুনে যা।' আমরা অমনই দু—জনে জড়াজড়ি করে হাজির হলুম।

মা আমাকে বললেন, 'তোকে কে ডেকেছে। পড়া ছেড়ে উঠে এলি কেন?'

জ্যাঠাইমা মাকে বললে, 'বুঝলি না, সব ভূতের ভয়ে জুজু হয়ে আছে।'

আমি আর দিদি দু—জনে যে—ঘরে বসে পড়তুম, সেই ঘরের দুটো জানলা। হা—হা করছে। জানলা মানেই ভূত। লম্বা—লম্বা হাত বাড়ালেই হল। জানলার দিকে পেছন ফিরে বসা চলবে না। ভূত পিঠে সুড়সুড়ি দিতে পারে। দু—জনে মাথা খাটিয়ে বের করলুম, দুজনে পিঠে পিঠ দিয়ে বসব। একজনের মুখ এ—জানলার দিকে আর—একজনের মুখ ও—জানলার দিকে। ভূত যদি হাত বাড়ায়, দেখতে পাব আর চিৎকার করে উঠব। একটু করে পড়ি আর ভয়ে—ভয়ে তাকাই। তাকাই আর পড়ি, পড়ি আর তাকাই।

আমি যে—জানলাটার দিকে তাকাতুম, তার ওপাশেই ছিল বাইরে যাওয়ার সিঁড়ি, বাড়িটার দুটো সিঁড়ি ছিল। একটা খিড়কির, আর—একটা সদরের। ওটা ছিল সদরের সিঁড়ি। একদিন আমরা দু—জনে পড়তে বসেছি। পড়া বেশ কিছুটা এগিয়েছে, এমনসময় জানলায় একটা মুখ। সাদা লম্বা দাড়ি, চুল। ধকধকে দুটো চোখ। সঙ্গে সঙ্গে আমার চিৎকার, 'দিদি—রে! ভূত।' দু—জনে বইপত্তর উলটে, জড়াজড়ি করে দৌড় মারলুম উত্তর মহলের রান্নাঘরের দিকে। জ্যাঠাইমা ময়দা মাখছিলেন। সোজা তাঁর ঘাড়ে। তিনজনেই চিৎপাত। জলের ঘটি উলটে গেল। উলটে গেল দুধের ডেকচি। মা আলুর দমের আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন, ভূমিকম্প হচ্ছে। মা ভয় পেলে ইংরেজি বলেন। চিৎকার করতে লাগলেন, 'আর্থকোয়েক, আর্থকোয়েক। শাঁখ বাজাও, শাঁখ বাজাও।' জল, ময়দা, ডাল, দুধ সব মেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আমরা ভূত দেখেছি।'

'সন্ধে সাতটার সময় ভূত।'

না, ভূত নয়। এক ভদ্রলোক। আশুবাবু, আমার ঠাকুরদার বন্ধু। কবি। ভদ্রলোকের পেছন—পেছন ঠাকুরদাও উঠছিলেন সিঁড়ি দিয়ে। তিনি হুটোপটির শব্দ শুনেছিলেন। রান্নাঘরে এসে বললেন, 'ছি—ছি! কী লজ্জার কথা। আশুবাবু বলছেন, আমার চেহারাটা কী এতই ভয়ংকর যে, ছেলেমেয়ে দুটো ওইভাবে ছুটে পালাল। এ—দাড়ি তো আমার অনেক দিনের। কবিতায় তেমন ফোর্স আসছিল না বলেই দাড়ি রাখতে বাধ্য হয়েছি, কবিগুরুর অনুপ্রেরণায়।'

মা বললেন, 'বাবা, এ—দুটো হল রামভিতু। দিনরাত, চলতে—ফিরতে ভূত দেখছে।'

পরে দিদিতে—আমাতে একটা গবেষণা হল। যতই হোক আমরা তো অপমানিত হয়েছি। ভয়ংকর অপমান। ঠাকুরদার কবি—বন্ধুকে ভূত ভেবেছি।

দিদি বললে, 'বিলু, ভূত সম্পর্কে তোর কোনো আইডিয়া আছে? কেমন দেখতে না দেখতে?'

আমরা দু—জনেই তো দেখিনি কখনো। কেবল শুনেছি। ভূত দেখা যায় না। ভূত কেবল কর্ম। কর্ম বললে ভুল হবে। ভূত হল অপকর্ম। নানারকম অদ্ভুত—অদ্ভুত কাজ করে। দিদি বলল, 'একটা লিস্ট কর, এক নম্বর, ভূত—অদ্ভুত শব্দ করে। দুই, ঘাড়ের কাছে ঠান্ডা নিশ্বাস ফেলে। তিন, যে—কোনো জিনিসকে শূন্যে উঠিয়ে দেয়। চার, শুয়ে থাকলে ঠ্যাং ধরে ঘুরিয়ে দেয়। পাঁচ, বন্ধ জানলা—দরজা খুলে দেয়। ছয়, হা—হা করে হাসে। সাত, পিঠে সুড়সুড়ি দেয়। আট, ঝড় হয়ে বয়ে যায়। নয়, মেজাজ ভালো থাকলে জিনিসপত্তর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। দশ, জিনিসপত্তর অদৃশ্য করে দেয় আবার জিনিস রেখেও যায়। এগারো, ঘুমন্ত মানুষের বুকের ওপর চেপে বসে। বারো, কখনো অস্পষ্ট সাদা মূর্তির মতো কাউকে—কাউকে দর্শন দেয়। নাকিসুরে কথা বলে।'

লিস্ট শেষ হওয়ার পর দিদি বললে, 'শোন বিলু, এরপর থেকে কোনো লোক দেখলে ভূত—ভূত করে চেঁচাবি না গাধার মতো। আমাদের একটা প্রেস্টিজ আছে। ছোট হলেও খুব ছোটো নই। ভূতের কোনো চেহারা থাকে না। ভূত হল বাতাস, ভূত হল ধোঁয়া, ভূত হল শব্দ।'

বেশ চলছিল হেসে—খেলে আমাদের সংসার। মা আর জ্যাঠাইমা যেন দুই বোন। ঠাকুরদা যেন মহাদেব। বাবা আর জ্যাঠামশাই যেন হলায়—গলায় দুই বন্ধু। আর আমরা, ভাই—বোন, কেউ কাউকে ছেড়ে একমুহূর্ত থাকতে পারি না। দু—জনে সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় রোজ কী মন খারাপ। অনেকক্ষণ দেখা হবে না দু—জনের। স্কুল থেকে ফেরার সময় দিদির স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম। দুজনে একসঙ্গে গল্প করতে—করতে ফিরতুম। দিদি ভীষণ বেড়াল ভালোবাসত। পথে কোনো বেড়াল দেখলেই থমকে দাঁড়াত। বলত, বিলু, দ্যাখ কী সুন্দর মা—লক্ষ্মীর মতো বেড়াল। চুক—চুক করে ডাকত। বেড়াল অমনি লেজ তুলে নির্ভয়ে দিদির কাছে এসে গায়ে গা—ঘষত। আমার একটু দুষ্টুমি করার ইচ্ছে হত। লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে টানছি। বুটজুতো দিয়ে পাথরের টুকরোয় শট মারছি। আর দিদি আমাকে সাবধান করছে। যখন শুনছি না, কান ধরে বলছে, বানর ছেলে। আমি হি—হি করে হাসছি। দিদি ভয় দেখাচ্ছে, 'বাড়ি চলো না, তোমার হবে।' বাড়ির কাছাকাছি এসে আমাদের দু—জনের দৌড় শুরু হল। রেস। দিদিকে খুব ফরসা আর সুন্দর দেখতে ছিল। যখন ছুটত, ফিতে—বাঁধা বিনুনি পিঠে দুলত। সপাত—সপাত, শব্দ করত। ফরসা গাল দুটো গোলাপের মতো লাল হয়ে যেত। আর আমি তখন দিদিকে আরও ভালোবেসে ফেলতুম।

এইসময় মা একদিন ভীষণ ভয় পেলেন। রাত এগারোটা নাগাদ কাজকর্ম শেষ করে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে দক্ষিণের মহলে আসছেন, ডান দিকে ছাতে ওঠার সিঁড়ি। জায়গাটা অন্ধকার—অন্ধকার। হঠাৎ দেখলেন, লালপাড় শাড়ি পরে কে একজন ছাদে উঠে যাচ্ছে। মা ভেবেছিলেন, জ্যাঠাইমা। জিজ্ঞেস করলেন, 'এত রাতে ছাতে যাচ্ছ কেন।' কিন্তু ঘরে এসে জ্যাঠাইমাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। মায়ের কথা কেউ বিশ্বাস করতেই চাইলেন না। শেষে বাবা আর জ্যাঠামশাই টর্চ নিয়ে ছাতে গেলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না।

ঠাকুরদা বললেন, 'কিছুই না, চোখের ভুল অমন হয়। ভূত তো বাইরে নেই, আছে মানুষের মনে।'

সবাই সায় দিলেন, 'ঠিকই তো, ঠিকই তো।'

মা কিন্তু পর—পর তিনদিন একই সময় সেই মূর্তিকে ছাদে উঠে যেতে দেখলেন। জ্যাঠাইমা ছাড়া কেউই তেমন পাত্তা দিলেন না, মায়ের এই দেখাটাকে। ঠিক সাতদিনের মাথায় ছাতে কাপড় শুকোতে দিতে গিয়ে মায়ের পায়ের তলায় একটা মাছের কাঁটা ফুটে গেল। হয় কাকে এনেছিল, না হয় বেড়ালে। কাঁটাটা টেনে খুলে ফেলে দিয়েছিলেন। নিচে নেমে এসে জ্যাঠাইমাকে একবার বলেছিলেন। জ্যাঠাইমা আয়োডিন লাগিয়ে

দিয়েছিলেন। জিনিসটাকে কেউই তেমন ভয়ের চোখে দেখেননি, কিন্তু সেইদিনই সন্ধেবেলা মায়ের কেঁপে জ্বর এল। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে বললেন, 'আর কিছু করার নেই, ধনুষ্টঙ্কার হয়ে গেছে।' চব্বিশঘণ্টার মধ্যে মা চলে গেলেন।

দিদি আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে। মনে—মনে ভাবি, মা হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছেন। হঠাৎ ফিরে আসবেন একদিন। দু—হাতে জড়িয়ে ধরবেন আমাদের দু—জনকে। আমি দিদির দিকে তাকাই দিদি আমার দিকে। দু—জনেই কেঁদে ফেলি।

দিদি বলে, 'মায়ের মতো মা কি আর পাওয়া যাবে রে বিলু। আর বেঁচে থেকে কী হবে। জ্যাঠাইমাও আমাদের মা। তা হলেও, মা একটা আলাদা জিনিস।'

পাড়া—প্রতিবেশীরা বলতে লাগল, তখনই বলেছিলুম, বাড়িটা হানাবাড়ি। শুনলে না তোমরা! এখনও সময় আছে। সংসারটা চুরমার হয়ে যাওয়ার আগে পালাও। কেউই সে—কথা শুনলেন না। বাবা বললেন, 'এদের মা যেখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আমার কাছে সেই জায়গাটা তীর্থ।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'ঠিকই তো, ঠিকই তো!'

ছ—টা মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল। শীতের মুখে দিদি একদিন সেই মূর্তি দেখতে পেল সিঁড়িতে। লালপাড় শাড়ি পরে ছাতের সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে ওপরে। দিদি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'বিলু এইবার আমার মরার পালা।'

সকলে দিদিকে জেরা শুরু করলেন, 'তুই কী দেখেছিস, ঠিক করে বল।' দিদি বললে, 'বলে আর কী হবে! আমি যা দেখার দেখেছি। এইবার আমাকে নিয়ে যাবে। আমাকেও চলে যেতে হবে মায়ের কাছে।'

আমি আর দিদি এক বিছানায় পাশাপাশি শুতুম। চাঁদের আলো এসে পড়েছে দিদির মুখে। দিদি অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে ছিল কপালে হাত রেখে। হঠাৎ আমার দিকে পাশ ফিরে বললে, 'শোন, বিলু আমি তো চলে যাচ্ছি, আমার যা আছে সব একটা বাক্সে ভরে তোর কাছে রেখে দিবি। কাউকে দিবি না। বাক্সটার ওপর বড়ো—বড়ো করে লিখে রাখবি, 'আমার দিদি'। যখন তুই অনেক, অনেক বড়ো হয়ে যাবি, তখনও বাক্সটা তোর কাছে রেখে দিবি। মাঝে—মাঝে খুলে দেখবি। যখনই খুলবি আমার গলা শুনতে পাবি, বিলু।'

সে—রাতে দু—জনেই জেগে রইলুম। কারও চোখে ঘুম নেই। সকালে সারা বাড়িতে ভীষণ উত্তেজনা। আমাদের ছাদে আমাদেরই সাদা ধবধবে বেড়ালটা মরে পড়ে আছে। সুস্থ—সুন্দর বেড়াল। আগের রাতে জ্যাঠাইমার হাতে মাছ ভরতি খেয়ে গেছে। এমন তো হওয়ার কথা নয়। ফুলের মতো সাদা একটা বেড়াল দলা পাকিয়ে পড়ে আছে ছাতের এক কোণে। কাল রাতে কাগজের একটা দলা নিয়ে কত খেলেছে! দিদির কোলে শুয়ে ঘড়ঘড় করেছে। জ্যাঠাইমা যখন রান্নাঘরে রাঁধছিলেন, পিঠে গা—ঘষেছে।

দিদি ঘরে গিয়ে চুপ করে বসল। আমাকে বলল, 'বড় ভয় করছে রে বিলু! আমার মৃত্যুটা কীভাবে হবে! ছাতে, না ঘরে!'

আমার ঠাকুরদা সেদিন আর স্কুলে গেলেন না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বাবা আর জ্যাঠামশাইকে বলে গেলেন, 'তোমরা উমাকে ঘিরে বসে থাকো, যেন নিয়ে না যেতে পারে!' কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কিছুই বললেন না।

অনেকক্ষণ পরে ফিরলেন একটা লরি চেপে, সঙ্গে তিনজন লোক। সেইদিনই আমরা বাড়িটা ছেড়ে দিলুম। সব জিনিসপত্তর নিয়ে আমরা আর একটা বাড়িতে এসে উঠলুম। ভূত আছে কি না জানি না, কিন্তু ভূত যেন একালের টেররিস্ট। দিদির বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে সেদিন বলেছিল, 'বাড়িটা ছাড়, নয়তো একেও মারব!'

শুধু একটা দুঃখ, বাড়িটায় না এলে, মা হয়তো আজও বেঁচে থাকতেন!

মুখ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক, অনেক দিন কেটে যাবে তারপর। শেষে একদিন একটি সোনালি বিকেলে হয়তো সীতা নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে। আর, সেই ঝরে যাওয়ার পরে কেউ কি মনে রাখবে যে এখানে একদা ভোরবেলাকার শিশির সূর্যের ছোঁয়া পেয়ে ঝলমল করে উঠেছিল। শুধু সেদিনকার সেই শিশিরের স্মৃতিতে দিন কয় হয়তো তাকিয়ে থাকবে নির্জন শিশুগাছটা। তারপর একসময়ে, শীতের সময়ে শিশুগাছের পাতা ঝরবে টুপটাপ, পড়ন্ত রোদের মিষ্টি আভার দিকে তাকিয়ে কিছুকাল মোহ্যমান থাকবে গাছটি, তারপর একদিন সকালের লালে সে নিজেই অবাক হয়ে যাবে—নতুন সবুজ পাতার রঙে—রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তখন আর সেই নীল নির্জন মুহূর্তের কথা মনেও থাকবে না তার।

জানলার কাচের ওপাশে বিকেলের রোদ। এপাশে মারবেল পাথরের মেঝেয় তারই চৌকো আলো।

সাদা, নরম, দুধের বিছানা থেকে উঠল সীতা। রুগণ পাণ্ডুর বি—রঙ হাতে খুলে দিল জানলাটা। নিটোল একটি বিকেল গড়িয়ে পড়ল মারবেল পাথরের মেঝেয়। জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইল সীতা, সেদিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শুরকি—ঢালা ফুলের কেয়ারি—করা লন। দীঘল একসার বনঝাউ, লম্বা ঝাঁক—বাঁধা বাদাম, আম গাছের সবুজ পাতায় ছায়ার আলপনা, শঙ্খলতা রাজকন্যার দীঘল নরম আঙুলের মতো সোনালি রঙের চাঁপা গাছ। গাড়ি—বারান্দা লন পেরিয়ে ফটক।

উঃ, কতদিন হল সীতা বাইরে বেরোয়নি! অনেকদিন বাদে সেদিন ফটক পর্যন্ত গিয়েছিল। মালিকে ডেকে কিছু—একটা বলতেও যাচ্ছিল তখন, তারপর সেই মুখটা চোখের সামনে অসহ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠায় কিছুই করতে পারেনি। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিল। মারবেল পাথরের বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ঢুকেছিল তেতলার এই ঘরটায়। তারপর নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিল সাদা দুধের মতো ফেনা জমানো বিছানায়। বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে—ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল সেদিন।

কী করতে পারে এ ছাড়া?

লাইব্রেরিগুলো থেকে প্রায় প্রত্যেক দিনের ডাকেই নতুন—নতুন বই আসে। সুন্দর, ঝকঝকে কাচের হালকা মতো সেলোফেনে মোড়া বই। দামি—দামি। উঃ কত কী লিখতে পারে লোকে! আজকাল সীতার আর পড়তেও ভালো লাগে না একঘেয়ে লাগে। পানসে লাগে খবর কাগজেও। চুপ করে কতক্ষণ আর ভাবা যায়? মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে, শীর্ণ গাল বেয়ে ধারাপাত হয় শ্রাবণের, তারপর ঠোঁটে যখন সেই জল এসে পড়ে, তখন বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা ছাড়া কী আর করবার থাকে তার?

এত বড়ো বাড়িটা কী নির্জন!

সীতা জানালার শিক থেকে হাতটা সরিয়ে আনলে, আকাশ থেকে ফিরিয়ে আনলে চোখ। তাকালে ঘরের দেয়ালে। দেয়ালে এবং ঘড়িতে। বিকেল তখন। তাকালে সরোজের অয়েল পেন্টিংটার দিকে। সুন্দর,স্বাস্থ্যবান সরোজ। তাকালে টেবিলে। ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনিগন্ধা। নতুন ফুল। কখন যে মালি এসে ফুল বদলে দিয়ে গেছে জানে না সীতা। হয়তো ঘুমিয়েছিল তখন। সাদা টেবিল ক্লথটায় সুন্দর একটা নকশা কাটা। সাদা লেসের। সীতারই করা।

পায়ে—পায়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল সীতা। সাদা শীর্ণ হাত বুলিয়ে নিল নকশাটার ওপর।

কী করবে সীতা এখন? ঘরটা আবছা হয়ে আসছে। অন্ধকারে। সন্ধে নামছে তেতলার এই ছোট্ট ঘরটায়।

আলোটা জ্বালল সীতা। বোতাম টিপতেই ঝলমল করে উঠল সারা ঘর। এমনি করেই হয়তো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত সীতার জীবন।

টেবিলের ড্রয়ার খুলল সীতা। একটা চৌকো নীল কাগজের বাক্স। চিঠির। আলগোছে একটা চিঠি তুলে নিল সীতা। কালির রং এখনও তো বিবর্ণ হয়নি, চিঠির মসৃণ কাগজটায় এখনও হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ আছে। তবে কেন সীতার সব ফুরিয়ে গেল? কেন ফুরিয়ে গেল সীতার সবকিছু?

বিয়ের রাতে বিকাশ সীতাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল চিঠিগুলো। স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ অক্ষরে লিখে দিয়েছিল একটা ছোট্ট মন্তব্য : এখন আর কী দরকার আমার এই চিঠিগুলোয়? তোমার চিঠি তোমারই থাক।

বিয়ের রাতের কথা মনে পড়তেই ফ্যাকাশে হয়ে এল সীতার শীর্ণ মুখ। তারপর আলতো হাতে একটা নীল কাগজ তুলে নিলে সীতা। আবার পড়ল নিজেরই লেখা অনেকবার—পড়া চিঠিটা।

অনেক, অনেকদিন পর চিঠি লিখতে বসে ভাবছি, সবই তো বলা হয়েছে, তবুও কেন আমার আকুলতা কমল না। প্রত্যেক ভোরে কোথায় যে ফুল পায় পূজারি, অথচ ফুল ছাড়া তার পুজো তো সারা হয় না। হেসো না। আমার হয়েছে মুশকিল। আমি চাই তোমাকে কিছু বলতে, এমন—কিছু যে আমার ভাবনাটাকে যাতে সুন্দরতর করে গোছানো যায়, গুছিয়ে তোমার কাছে মেলে ধরা যায়, কিন্তু বড়ো এলোমেলো হয়ে পড়ে।

কত কথাই যে কত সময় ভাবি। তুমি যদি কোনোরকমে আমার মনের মধ্যে একবার ঢুকতে পারতে, তবে অবাক হয়ে যেতে।

অসম্ভব মন কেমন করছে তোমার জন্যে।

স্নান করতে করতে উঠে এসে সোনালি বালুর ওপর শুয়ে থাকি মাঝে মাঝে। একা, একেবারে একা। দুই হাত মাথার নীচে দিয়ে তাকিয়ে থাকি সমুদ্রের ফেনার দিকে। সাদা—সাদা ফেনার কুচি, ঠিক তোমার হাসির মতো। সকালবেলার সচিত্র আলো আমার চোখে—মুখে। গাঙশালিখের কাঁপা ডানার পালকে রোদ্দুরের ঝালর। তোমায় মনে পড়ে। তখন মনে হয়, হয়তো চোখ ফিরিয়েই দেখব তুমি নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছ। কিংবা মনে হয় এখুনি তুমি টানবে আমার হাত ধরে। টানতে টানতে নিয়ে যাবে সমুদ্রের দিকে।

স্নান সেরে যখন বাড়ি ফিরি, তখন ভিজে শাড়ি ছপছপ করে। চুল থেকে বালি ঝরে। ঝাউবনের পথ দিয়ে চলি। মনে হয় তুমিও চলেছো আমার পাশাপাশি। তখন আর আশেপাশে তাকাতে মন চায় না। তাকালেই দেখব তুমি নেই। সে তো আমি চাইনে। তুমি আছো। তুমি আছো আমার পাশে, আকাশের নীলে, হাওয়ায়, সবখানে, আমার মনে। ইচ্ছে হয়, পথ যেন আর না—ফুরোয়।

কী করে হয় তা? বাড়ির গেট তো একটু পরেই। তুমিও নেই আমার পাশে। বাড়ি ঢুকে চান—ঘরের শাওয়ারের নীচে এলিয়ে দিই শরীর। তারপর একঘেয়ে দিন। ভালো লাগে না।

সত্যি কথা, বিকাশ, বিশ্বাস করো তুমি। সেদিন সন্ধের সময় যখন বৃষ্টির নূপুর বাজল, ঝাউবনের আবছায়ার দিকে তাকিয়ে আমার অসম্ভব মন কেমন করে উঠল। স্পষ্ট যেন তোমার সিগারেটের গন্ধ পেলাম। তোমার গায়ের উত্তাপ আর সকৌতুক চাহনি অনুভব করলাম যেন সর্বাঙ্গে।

জীবনের কোথাও যেন বাঁক নেই, এই কথাটাই সবচেয়ে বেশি মনে হচ্ছে আজকাল। তাই মাঝে মাঝে অসহায় রাগ হয় আমার। ভীষণ। ভাবি, এমন—একটা জায়গা কি থাকবে না, যেখানে শুধু আমি, শুধু আমার একলার সত্তা।

শুনলে হয়তো অবাক হবে। হয়তো—বা ঠোঁট চেপে একটু হেসেও নেবে একটা গল্প শুনলে। গল্পটা অবশ্য তোমার ভাবনা আমার কেমন পেয়ে বসেছে তার একটা উজ্জ্বল নমুনা। কাল দুপুরবেলায় নতুন ধরনের একটা মাছ রান্না করা হচ্ছিল সয়া সস দিয়ে। চমৎকার লাগল। খুব ভালো। ভাবলাম, রান্নাটা শিখে

নিই। তারপর মুহূর্তেই মনে হল, কবে যেন তুমি বলেছিলে সয়া সস তোমার খুব বেশি একটা ভালো লাগে না। তবে আর শিখে কী লাভ? কোনো উৎসাহ আর আমাকে ধন্য করতে পারল না। শেখা হল না রান্নার কায়দাটা।

খুব মজার গল্প সন্দেহ নেই, কিন্তু ভেবে দ্যাখো তো কী করুণ অবস্থা আমার। নিজের যেটা ভালো লাগে তা—ও আমার কাছে নগণ্য, যদি—না তোমার মনের মতো সেটা হয়।

এবার থেকে তোমার সব কথা মেনে নেব না, এমনি একটা সংকল্প গ্রহণ করলে মন্দ হয় না। যা দেখছি, কোনোদিন তোমার হয়তো একঘেয়ে লাগবে এমন অনুগত সীতাকে পেয়ে। ঝগড়া করা তো দুজনেই বোধহয় ভুলে গিয়েছি। এখন মনে হয়, লোকে কী করে ঝগড়া করে সময় নষ্ট করে।

চোখের কালো মণি নীল কাগজটা থেকে উঠে এসে পড়ল জানলায়। একটানা অল্পক্ষণ বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকার পরে দৃষ্টিটা আবার ফিরে এল ঘরের ভিতরে—দেয়ালে আর ঘড়িতে। সরোজের ছবিটায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মুখ, সেই ভয়াবহ মুখটা ফুটে উঠল সীতার চোখের সামনে।

তাড়াতাড়ি টেবিলের দেরাজ বন্ধ করলে সীতা। দৃষ্টিকে নামিয়ে আনতে চাইলে সরোজের ছবিটা থেকে। কিন্তু পারল না। চুম্বকের মতো তাকে আকর্ষণ করল একটি মুখ, একটি ভয়াবহ মুখ।

পরক্ষণেই সরোজ তার স্টাডি থেকে শুনতে পেল চিৎকারটা, যে—চিৎকারটা আজকাল নিয়মিত হয়ে উঠেছে : 'ওই যে! ওই যে!'

ছুটে এসে ঘরে ঢুকল সরোজ, তেতলার ঘরটায়। আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে সীতা। মেঝের ওপর।

সন্ধে সাতটার সময়ে ডাক্তার রায় আসবেন। এক মিনিট এদিক—ওদিক হবার উপায় নেই। ভারি কড়া লোক! তিনি একাই রুগির সঙ্গে কথা বলবেন, ঘরে আর—কেউ থাকবে না। মানসিক চিকিৎসার ধারাই নাকি এই—রকম—ডাক্তার রায় আগেই জানিয়েছেন।

সীতার বিছানার পাশে সরোজ বসেছিল। সীতার জ্ঞান হয়েছে বটে কিন্তু চোখ বুজে শুয়ে আছে সে। সাতটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। চাকর এসে খবর দিলে ফোন এসেছে। পা টিপে—টিপে সন্তর্পণে সরোজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সীতা বিছানায় পাশ ফিরল। মাথার মধ্যে কী—রকম একটা অস্বস্তি হচ্ছে। ঠিক যন্ত্রণা নয়, কিন্তু যন্ত্রণার চেয়েও যেন খারাপ। দেখল ঘরে কেউ নেই। সরোজ বোধহয় কোনো কাজে বাইরে গেছে। টেবিলের ওপরের ফুলদানির রজনিগন্ধা এখন গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। পর্দার ফাঁকে এক ঝলক হাওয়া এসে ফুলের গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে দিলে। দেয়ালের ঘড়িতে সাতটা বাজতে তেরো মিনিট বাকি। নিশ্বাস ফেলতে অসুবিধে হচ্ছে সীতার। রুমালটা নিয়ে সে ঘামে ভেজা কপালের ওপর বুলিয়ে নিলে। রুমালে ল্যাভেন্ডারের ভিজে ঠান্ডা গন্ধ। বোতাম টিপে সীতার কথামতো ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছিল সরোজ। চোখে আলো এসে পড়লে বড্ড লাগে। বারান্দার ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠনটার ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে পর্দার ফাঁক দিয়ে। সন্ধের অন্ধকারে অস্পষ্টের মতো ঘরের সমস্ত জিনিস।

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে সীতা পাশ ফিরে শুলো। সন্ধের অন্ধকারে মাথার কাছে বিছানার ধারে সন্তর্পণ পায়ে যেন কে এসে দাঁড়ালে। চোখ বুজেই সীতা শুধোলে, 'কে?'

নরম গলায় উত্তর এল, 'ব্যস্ত হবেন না। যেমন শুয়ে আছেন, থাকুন। আচ্ছা, আপনার অসুখের সব কথা আমার কাছে খুলে বলুন তো—কিছু বাদ দেবেন না।'

'ওঃ, ডাক্তার রায়? বসুন।'

'থাক, থাক—যেমন চোখ বুজে শুয়ে আছেন থাকুন।'

মাথার ভিতরে খুব অস্বস্তি হচ্ছে সীতার। আর সহ্য হয় না।

'আচ্ছা, শুনুন তাহ'লে। সব কথাই বলছি। প্রায় চার—পাঁচ মাস হল এ ব্যাপারের শুরু হয়েছে। একদিন *গীতবিতানের* সংগীত সম্মেলন থেকে ফিরছি, রাত প্রায় আটটা। সারকুলার রোড আর চৌরঙ্গির মোড়ের কাছে আমার গাড়ি দাঁড়াল লাল আলোর জন্যে। হঠাৎ দেখি গ্যাসপোস্টের তলায় একটা লোক আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে আছে। এত খারাপ লাগল, ভীষণ! রোগা লম্বা চেহারা। একদিকে চোখ ঝুলে নেমে এসেছে। কপালের ওপর এলোমেলো চুল। খোঁচা—খোঁচা দাড়ি। চোয়ালটা যেন আলগা, যেন অন্য—কারু। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, জিভও একটু বেরিয়ে পড়েছে।'

'আপনি তো বেশ ভালো করেই লক্ষ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।' নিস্তেজ গলায় বলতে থাকে সীতা : 'আর তা ছাড়া একবার তো শুধু দেখিনি, তারপর অনেকবার। এত ভয় করছিল তখন! লোকটা আমার দিকে উঁচু—নীচু দাঁত বের করে হেসেছিল। ময়লা ছেঁড়া স্যুট গায়ে ঢলঢল করে আলগা হয়ে ঝুলছিল। ভয়ে শরীর আমার যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। ড্রাইভরাকে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে যেতে বললাম। কিন্তু সেই বিশ্রী ভয়ানক মুখ আমার স্বপ্ন—জাগরণ ছেয়ে থাকল। কখনো লোকটাকে দেখিনি, তবু বার—বার মনে হতে লাগল একে যেন চিনি। কী—রকম বিশ্রী ভিজে ভিজে ফ্যাকাশে মুখ।'

'তারপর?'

একটু দম নিলে সীতা। কপালে তার বিন্দু—বিন্দু ঘাম জমেছে। বোজা চোখের দু—পাশে গালের রগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—নীল রগ। একটা হাত বালিশের তলায় গুঁজে সীতা বলতে থাকল, 'তারপর যখনই বাড়ি থেকে বেরোই, মনে হয় লোকটা বোধহয় আমার জন্যে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। নিউ মার্কেট থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে হয়তো গাড়িতে উঠতে যাব, এমন সময় হয়তো চোখে পড়ল, সেই লোকটা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে মিটমিট করে তাকাচ্ছে, কিংবা কখনো অপলক স্থির চোখে। আমি হয়তো তখন তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর থেকে মনে একটা দারুণ ভয় হল। অনেক দিন অনেক পথের মোড়ে দেখতে পেলাম এই লোকটাকে। একদিনের কথা বলছি। এক বান্ধবীর বাড়ি গিয়েছিলাম। সন্ধের পর বান্ধবীটি আমাকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে গেল। নির্জন শব্দহীন পথ। শুধু মাঝেমাঝে গ্যাসের আলো। হঠাৎ মনে হল, যদি সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! সঙ্গে সঙ্গে শিরশিরিয়ে উঠল সারা গা। ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে দেখি পাঁচ—সাত হাত দূরে লোকটা খুঁড়িয়ে—খুঁড়িয়ে আসছে। ভয়ে যেন হাত—পা ঠান্ডা বরফ হয়ে গেল। প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে এগুলাম। পিছনে একটানা খুঁড়িয়ে চলার শব্দ। বাড়ির গেট পার হয়ে ছুটতে—ছুটতে হলঘরে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।'

সীতা একটু চুপ করে থাকল। উত্তেজনায় আর ভয়ে মুখ যেন ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ঘরে কোনো শব্দ নেই। নীচে সিঁড়ির পাশে সরোজের গলা শোনা যাচ্ছে। টেলিফোনে কথা বলছে। হাওয়ায় ঘরের পর্দা সামান্য দুলছে। ফুলের গন্ধে হাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে।

'অনেকদিন'—সীতা বলতে থাকল, 'আমার স্বামীকে কিছু বলিনি। নানা কাজে উনি ব্যস্ত, আমিও তাই। কিন্তু একদিন বললাম। উনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, বয়েস হবার আগেই ভিমরতি হল? জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা শুরু করলে নাকি। বাড়ির গেটের কাছে এরকম কোনো লোককে তো দারোয়ান দ্যাখেনি। তুমি বরং দিন কতক বাড়িতে বিশ্রাম নাও! কিন্তু ডাক্তার রায়, তারপর থেকেই আমি অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম।'

ধীর, স্পষ্ট গলায় উচ্চারিত হলো, 'আচ্ছা, ব'লে যান'

'তারপর রাস্তায় একদিন অ্যাকসিডেন্ট। একটি ছোটো মেয়ে বাসের তলায় বীভৎসভাবে চাপা পড়েছে। লোকেরা ড্রাইভারকে ধরে মারতেই ব্যস্ত। ভিড়ের মধ্যে দেখি সেই লোকটা। ছোটো মেয়েটার রক্ত—মাখা শরীরের দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে আছে— চোখে—মুখে একটা কুৎসিত উল্লাস। ড্রাইভার মেয়েটিকে আমার গাড়িতে তুলে আনল হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে। দেখতে পেলাম লোকটা ভিড়ের ভেতর থেকে আঙুল তুলে আমাকে যেন শাসাচ্ছে। সেই রাত্রে, ডাক্তার রায়, কী বিশ্রী যে স্বপ্ন দেখলাম! দেখলাম, আমি

যেন কোনো হাসপাতালে অপারেশান টেবিলে শুয়ে আছি। ক্লোরোফর্ম দিতে কে যেন আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল—তাকিয়ে দেখি সেই লোক। চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর থেকেই অসুখের খুব বাড়াবাড়ি। প্রায় সব সময়েই মনে হয় যেন সেই মুখ দেখা দেবে। রত্রে ঘুম হয় না। হার্ট ভয়ানক দুর্বল হয়ে গেছে। আর সইতে পারিনে। ডাক্তার রায়—' সীতার উত্তেজিত গলা কথা ক'য়ে উঠল, 'ডাক্তার রায়, হয় আমাকে সারিয়ে ফেলুম নয়তো দ্রুত যেন আমার মৃত্যু হয়। এইভাবে আর পারিনে।'

গভীর নিশ্বাস ফেলে সীতা তেমনি চোখ বুজে শুয়ে থাকল। সুন্দর ফরসা কপাল ঘামে ভিজে উঠেছে, শ্রান্ত মুখটি বড়োই করুণ। ঘর অন্ধকার। প্রায় কিছুই দেখা যায় না। শুধু খোলা জানালার পর্দার ফাঁকে সামান্য একটু আলো বিছানার ওপর এসে পড়েছে।

'আচ্ছা, সেই লোকটাকে আপনার বাড়িতে কখনো দ্যাখেননি, না?'

'না, তাহলে তো মরেই যেতাম।'

'মুখটা কি খুব বিশ্রী?'

'ভীষণ! সে ভাষায় বোঝানো যায় না!'

'দেখুন তো, এই রকম কি?'

একটা মুখ বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ল। চোখ খুলেই চিৎকার করে উঠল সীতা।

তীব্র ভয়ের সেই চিৎকার একবার যে শুনেছে, সে কখনো ভুলতে পারবে না।

'সীতা! সীতা!' সরোজ টেলিফোন রেখে দ্রুত পায়ে খোঁড়াতে—খোঁড়াতে ওপরে ছুটে এল।

বিছানায় সীতার নিশ্চল স্পন্দনহীন দেহ। ঘরে কেউ নেই।

সীতার নিঃসাড় বুকে স্পন্দনের ধ্বনি অনুভব করবার জন্যে সরোজ কান পাতল। কিন্তু কোনোদিন যে ওই বুকে আর স্পন্দন শোনা যাবে না, এই কথা যখন সরোজ বুঝতে পারল, তখন তার বিস্ফারিত চোখের মণি অকস্মাৎ অদ্ভুত হয়ে উঠেছে।

নীচের হলঘরের ঘড়িতে সাতটা বাজার সঙ্গে—সঙ্গেই ডাক্তার বিকাশ রায়ের মোটরের হর্ন শোনা গেল।

চাঁপাফুলের গন্ধ

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বব গ্রেগরির বলটাকে স্কোয়ার কাট করে বাউন্ডারিতে পাঠাবার পরেই আমি বুঝতে পারলাম, গাওস্করের পঁয়ত্রিশ টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ডটা আমি আজ ধরব। সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখটাও আমার মনে পড়ল। আমি টেস্ট টিমে ঢোকবার আগেই আমার বাবা মারা যান। আমার বয়স তখন সতেরো। এখন আমার ৩৩ বছর ৮ মাস ১৭ দিন। এগুলো খুব দরকারি তথ্য। আজ যদি সেঞ্চুরি করি, কাল কত ভাষ্যকার কত কী লিখবে। আগের সেঞ্চুরিটার পর থেকেই তো আরম্ভ হয়েছে, গাভাসকর আমার চেয়ে বড়ো কি ছোটো। অদ্ভুত লোকগুলো। আমার গুরু গাভাসকর। আজ যদি পঁয়ত্রিশতম সেঞ্চুরিটা হয়, তা হলে কাউকে যা বলিনি, সেটা করব। আমি অবসর নেব। রেকর্ড—বুকে আমার আর গাভাসকরের নাম পাশাপাশি থাকবে। গুরু আর শিষ্য। একলব্য শিষ্য। গাভাসকরের এখন পঁচাত্তরের ওপর বয়স। তবুও একদম সটান মানুষ।

ইডেনের বিরাট স্কোরবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে আমার নামের পাশে আমার রান, ৬০ নট আউট। অন্যদিকে ব্যাট করছে আন্দামানের ছেলে রাকেশ পিটার। একটু আগে ইনিংসের গোড়াপত্ত হয়েছিল খুব ভালো। জম্মু কাশ্মীরের গোলাম রসুল আর উত্তরপ্রদেশের বিনয় দুবে দারুণ খেলে ১০১ রান তোলে। তারপরই এই সাত ফুট লম্বা বব ইংল্যান্ডের হয়ে তৃতীয়বার বল করতে এসে দু ওভারে চারটে উইকেট নেয়। বিনয় প্রথম আউট হয়। আমি নামলাম। প্রথম বলেই একটা বাই রান পেলাম। গোলাম আউট হল। পরের ওভারে আমি চারটে রান পেলাম। দুবার দুই—দুই করে। আবার বব বল করতে এল। পর পর দু বলে আউট হল গোয়ার ফেলিক্স কারনিরেও আর কেরলের সি.এন. জন। দুজনেই দারুণ ফর্মে ছিল। কিন্তু আজ বব দারুণ বল করছে। ছিলাম বিনা উইকেটে ১০১, হলাম চার উইকেটে ১০৬। রাকেশ পিটারের এটাই প্রথম টেস্ট ম্যাচ। বেচারি। আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'তোমার খেলা আমি রনজি আর দলিপ ট্রফিতে দেখেছি, তুমি বড় খেলোয়াড় হবে। আজ তুমি মাথা ঠান্ডা রেখে সোজা ব্যাটে খেলবে। সাহস করে ববের সামনে দাঁড়াও কিচ্ছু ভয় নেই। আমি আর তুমি ভারতের ইনিংস দাঁড় করিয়ে দেব।' রাকেশ নিশ্চয় সাহস পেয়েছিল। ববের বাকি দুটি বল একদম ব্যাটের মধ্যিখানে নিয়ে খেলল। কিন্তু ইংল্যান্ডের আসল লক্ষ্য আমি। আমাকে সরাতে পারলেই ওদের মতলব হাসিল হবে।

জোর লড়াই হল! গ্রেগরি, গারুফি, স্মিথসন তিনজন ফাস্ট বোলার, আর ছোবলমারা বল—দেনেওয়ালা কিচিন তাদের প্রাণপণ চেষ্টা করল। আর সেইসঙ্গে ইংল্যান্ডের ফিল্ডাররা কী ফিল্ডিংই না করল! আমার নিশ্চিত চারগুলোতে হয় রান হল না, নয় দুটো করে রান হল। ওদিকে রাকেশও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের মতো খেলছে, ওর রানও হয়েছে ৫০। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ও আর আমি সমান যাচ্ছিলাম। আমাদের রান এখন ২৩১। গারুফি অনেকগুলো নো—বল করেছে। গ্রেগরির এই ওভারে দশ রান নেবার পর আমি বুঝলাম, আজ আমার দিন।

আর সঙ্গে—সঙ্গে বাবার মুখ মনে পড়ল। আমাদের বংশ অধ্যাপকের বংশ। কত পুরুষ, তা জানি না। তবে সবাই বাঘা—বাঘা অধ্যাপক। তাদের নামে লোকে এখন মাথা নোয়ায়। সেই বাড়ির ছেলে হয়ে আমি পড়াশোনা ভালোবাসতাম না। রাজ্য সরকারের বাধ্যতামূলক শিক্ষাসূচি শেষ হতেই আমি পড়াশোনা ছাড়লাম। এখন আমি শুধু ক্রিকেট খেলব। বাবা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। রোগা লম্বা মানুষটা দেখতে ভারি সুন্দর ছিলেন। চেহারার মধ্যে এমন মাধুর্য ছিল যে, সকলের ভালো লাগত। অত শান্ত মানুষটিরও কিন্তু

থুতনিতে একটা বিরাট কাটা দাগ ছিল। মজা এমনি যে, ওই কাটা দাগেও ওঁকে ভালো দেখাত। সেদিনটার কথা মনে আছে। বাবা তাঁর অঞ্জলি ভরে চাঁপাফুল এনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি চাঁপাফুল ভালোবাসি বলে বাবা প্রায় সারা বছর ধরেই আমার জন্যে চাঁপাফুল আনতেন। কোথায় একটা বারোমেসে গাছের সন্ধান পেয়েছিলেন। তখনই আমি হাতে ব্যাট নিয়ে বেরোচ্ছি। বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'তুই কলেজ যাবি না?' বাবাকে আমি বললাম, 'না। আমি পড়া ছেড়ে দিলাম। নিউ স্টার আমায় ভালো একটা শর্তে খেলতে দিচ্ছে। হাতখরচা পাব। তা ছাড়া ক্রিকেটে এখন অনেক পয়সা। ভালো খেলতে পারলে প্রফেসারির চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাব।'

বাবার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বললেন, 'খেলার মাঠেও একজন শিক্ষিত আর একজন অশিক্ষিত লোককে খুব সহজেই আলাদা করা যায়। কোনো অশিক্ষিত লোককে দেশের নেতৃত্ব করার দায়িত্ব কেউ দেয় না।'

সেই আমার সঙ্গে বাবার শেষ কথা। শেষ দেখাও বটে। ডাক্তার ডাকার সময়ও বাবা দেননি। আমার ওপর অভিমান করে চলে গেলেন।

চায়ের সময় হয়ে এল আমি একটিবার ভাবলাম, আমি কি একটু আস্তে খেলব। বড়ো স্কোরবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে—আমার রান ৭৮। আর ২২—রান, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার আর গাভাসকরের নাম পাশাপাশি হবে।

রাকেশও দারুণ খেলছে। একবার ওভারের মধ্যে ও বললে, 'ক্যাপ্টেন, তুমি একটু জোরে খেলছ। একটু ধীরে খেললে তুমি সেঞ্চুরি পাবেই।'

আমি ওর পিঠের মধ্যে একটা থাবা মেরে বললাম, 'আমি তো পাবই, তুমিও পাবে।'

রাকেশ ভীষণ খুশি হয়ে গেল। তার ফলে কি না জানি না, চায়ের ঠিক আগের ওভারটা কিচিনকে পেটাল দেখবার মতো। আগের ওভারে আমিই বরং চুপচাপ ছিলাম। ৮৪ থেকে ৮৮—তে উঠেছি। বাকি ১২ রান পরে হবে। রাকেশ তখন ৫৬। বেশ ঠান্ডা মাথায় খেলছে। গত বছর রনজি ট্রফিতে আমরা বোম্বাইয়ের অনেক দিনের রেকর্ড ভেঙেছি। ফাইনালে হারাই আন্দামানকে। এই রাকেশ দারুণ ব্যাট করেছিল। আমার বলকেই এগিয়ে এসে ছয় মেরেছিল। সারা পৃথিবীতে খুব বেশি ব্যাটসম্যান এ—কাজ করার সাহস দেখাবে না। সেই খেলা দেখাল। কিচিন বহু যুদ্ধের নায়ক। অনেক উইকেট পেয়েছে, অনেক মার খেয়েছে। কিন্তু প্রথম টেস্ট খেলছে এমন ছেলে ওর এক ওভারে ৬,৬,৪,৪,৬,৪ মোট ৩০ রান নেবে, তাও চায়ের আগের ওভারে, কিচিন ভাবেনি। চার উইকেটে ২৯৪। পঞ্চম উইকেটে আমরা জুড়েছি ১৮৮ রান, পিটার ৮৬ আমি ৮৮ রানে চা খেতে গেলাম। ইডেনের বিশ্বনাথ ব্লক আমাদের প্রতিটি হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে বিউগল বাজাল। আমি রাকেশকে বললাম, 'তুমি এগোও। শেষ ওভারটা অনবদ্য।'

চা খেতে মন চাইছিল না। শুনলাম গাভাসকর, আজাহারউদ্দিন, বেদী, তিন বৃদ্ধই টেলিফোন করেছিলেন। আমি তখনও বাবার কথা ভাবছি। কী অন্যায়! যে মরে যায়, তার সঙ্গে কেন আর কথা বলা যায় না? নইলে বলতাম বাবাকে, আমি পড়াশোনা করেছি। খুব মন দিয়ে করেছি। আজ যদি আমায় দেখতে, তুমি খুশি হতে বাবা। তুমি সত্য বলেছিলে, প্রথম দিকে আমাকে লোকে ঠাট্টা করত। বলত, আমি ভালো খেলি, কিন্তু আসলে চাষা। তারপর সব বদলে গেল। আমি বদলে গেলাম। রাতের পর রাত জেগে পড়েছি। নিজেকে তৈরি করেছি। বাবা, তুমি কিছু দেখতে পাওনি। আজ আমি সারা ভারতে শুধু নয়, সারা বিশ্বে পরিচিত। শুধু ভালো ব্যাটসম্যান বলে নয়, ভালো বোলার বলে নয়, মার্জিত ভদ্রলোক বলেও। ভারতের টিম আদর্শ টিম। খেলার মাঠে, খেলার বাইরে। আমি টিমের ক্যাপ্টেন হবার পর ভারতের কোনো খেলোয়াড় কোনো বাজে আবেদন করেননি। কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কখনো আম্পায়ারের সঙ্গে ঝগড়া করেনি। এখন বলো, আমি কি একজন ভালো অধ্যাপকের সমান হইনি?

আবার মাঠে খেলা। বিশ্বনাথ ব্লক বোধহয় চায়ের বিরতির সময় একদম ওঠেনি। রক্ত—খাওয়া বাঘের মতো হয়ে আছে। আমার তখন মন খুব শান্ত। পিটারকে দেখতে হবে। প্রথম ওভারে একটা লেটকাট করলাম স্মিথসনকে। উইকেটকিপার হাঁ করে বলের চলে যাওয়া দেখল। ৯২। পরের ওভারে ইংল্যান্ডের

কাপ্টেন ডিক বার্ট নিজে বল করতে এল। ও এমনিতে বল করে না, কিন্তু চেঞ্জ বোলার হিসেবে ভালো। রাকেশকে আমি দেখেশুনে খেলতে বলেছিলাম। তাই তিনটে মাত্র চার নিল। সব কটা বোলারের পাশ দিয়ে। মাঠে কী হচ্ছে বোঝানো যাবে না। পিটার ৯৮। এ পরের ওভারেও আমি দুবার দুই—দুই রান নিলাম। আমি ৯৬। মাঠ ফেটে পড়ছে। রাকেশ কিন্তু আমাকে অবাক করে দিল। প্রথম বলে ডিপ থার্ড ম্যানে বল পাঠিয়ে দৌড় শুরু করল। ওর সেঞ্চুরি নিশ্চিত, কিন্তু একটা রান নিয়েই চেঁচাল, নো। তারপর আম্পায়ারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন, সেঞ্চুরিটা আগে তুমি করো।' সারা পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, কিন্তু রাকেশ, ক্রিকেটে আর কখনো পাওয়া রান ছাড়বে না। দলের ক্ষতি।'

রাকেশ বলল, 'জানি, কিন্তু আজ রাগ কোরো না।'

সবাই বুঝেছে, রাকেশ কী করেছে। আমার চোখের সামনে একজন নতুন জনপ্রিয় তারকাকে জন্ম নিতে দেখলাম। পরের বলটা কী করে এল, কী করে খেললাম কিচ্ছু মনে নেই, শুধু চিৎকারই শুনলাম। আমি ৩৫ নম্বর সেঞ্চুরি করেছি। রাকেশ দৌড়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, 'আই ওয়াজ দেয়ার হোয়েন ইউ স্কোরড ইয়োর থার্টিফিফথ সেঞ্চুরি!' ডিক আর তার দল একে একে এসে করমর্দন করল। আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল। তারপরই আবার বিস্ফোরণ। রাকেশ সেঞ্চুরি করেছে। প্রথম ইনিংসে ১০০ রানের এগিয়ে থাকার সুবাদে আমরা মোটমাট ৪২৪ রানে এগিয়ে গেলাম। এখন ইংল্যান্ডকে আউট করার পালা। রাকেশকে নিয়ে আমি ক্লাব হাউসের দিকে পা বাড়ালাম। আজ দুটো উইকেট চাই।

দিনের খেলার শেষে কী যে হল, আর কী যে হল, বলতে পারব না। সারা কলকাতা ময়দানে এসে হাজির হয়েছে। চারদিকে মালা আর মালা। আর বাজি পুড়ছে। যেন কালীপুজোর রাত। বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হল। দরজা খুলে দিল আমার ছেলে। ও ক্রিকেট একদম মজা পায় না। কিন্তু তাও খুব খুশি। বাড়ির সামনেও তখন ছেলেরা নাচছে।

হঠাৎ মনে হল, চাঁপাফুলের গন্ধে ম'ম' করছে আমার ঘর। বাবার পরে আর কেউ আমার জন্যে চাঁপা আনেনি। প্রশ্ন করলাম, 'চাঁপাফুল কোথা থেকে এল রে?'

ছেলে বলল, 'একজন বুড়োমতো লোক এসে তোমাকে দিয়ে গেছেন। ভদ্রলোকের না থুতনিতে একটা বিরাট কাটা দাগ।'

ফুলগুলো আমি বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এবারও বাবাকে দেখতে পেলাম না।

আলো নিভে গেলে বুঝবে

অনীশ দেব

স্যার, স্যার, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? সবে দেওয়ালঘড়ি রাত দশটা বলছে, সবে আপনার সাদা ঘোড়া মার্কা বোতলের ঘোড়ার কেশর পর্যন্ত খরচা হয়েছে, আর আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন! এই সময়েই তো আপনাদের মতো বড়োসাহেবদের আশনাই আর ফুর্তি জমে ওঠে, মনটা মরা গোরু দেখা শকুনের মতো ডানা ঝাপটায়! ভেবেছিলুম, আপনার এই ফুর্তির সময়ে এসে আরও একটা খুশির খবর শোনাব, তা বুঝি আর হয়ে উঠল না। আমি তো স্যার ভয়ে ভয়ে আসছিলুম, বুকটা ধুকুপুকু করছিল, কালকের দিনটা আমার বুঝি আর আধ পেটা খেয়ে থাকতে হল না।

যতই বলুন স্যার, প্রথমে ঢুকতে গিয়েই সদর দরজাটা খোলা দেখে আমার ভারি আশ্চর্য লেগেছে। আপনি তো দরজা এরকম হাট করে খোলা রাখেন না, তাও আবার রাতে! সোজা তো ঢুকে পড়েছি, তবে সত্যি করে বলেছি আপনার শোবার ঘরে ঢুকতে কেউই আমায় আটকায়নি। সব চাকরবাকর বোধহয় খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়েছে। আর আমাদের মতো, ছোটোলোকদের মতো, আপনার তো স্যার আর একটা বউ—থুড়ি—মেমসাহেব নেই যে, যখন তখন আপনার সুখ শান্তির বিঘ্ন করবে! আপনার মেমসাহেবরা আসা—যাওয়ার মধ্যে থাকে। ভীষণ ব্যস্ত! সত্যি, আপনি দেবতা স্যার, দেবতা! অতগুলো পাপীতাপী মেয়েমানুষকে একা তুষ্ট রেখেছেন! সেইজন্যেই কি স্যার আপনাকে এখন এত ক্লান্ত লাগছে? আপনি ভীষণ বোকার মতো হাত—পা ছড়িয়ে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে আছেন? বিছানাটা লন্ডভন্ড? না কি কাল রাতের পর ওটা পাট করে সাফসুতরো করেননি। আপনার চোখেমুখেও কেমন কালির ছাপ। এ একদম বেমানান। কোথায় আপনাকে হাসিখুশি দেখব ভেবেছিলুম স্যার, স্যার, উঠুন। দেখুন, আমি কে এসেছি! আমি হীরার সোয়ামি, স্যার হীরার সোয়ামি! এই তো... চোখ মেলেছেন...হ্যাঁ—হ্যাঁ, এই যে আমি, আপনার বিছানার পাশে, মেঝেতে। আমরা স্যার নীচু জাত, নীচে থাকাই ভালো—যাক গে, যা বলছিলুম, আপনার বেশি সময় আর নষ্ট করব না। প্রথমেই স্যার আপনাকে সেলাম জানাই, অন্তত এক রাতের জন্যে হলেও আমার বউকে মেমসাহেব বানিয়ে দেওয়ার জন্যে। স্যার, হীরা—হীরুর কপালে এত সুখ জুটেছে! ওই মখমল বিছানায় ও শুয়েছে! আপনার রাজবাড়ির খাবার খেয়েছে! আপনার ধবধবে চকচকে ফরসা বুকে মাথা রেখে শোয়ার সুযোগ পেয়েছে! আপনি কী দয়ালু স্যার, আমাদের মতো নোংরা ছোটোলোকদের ঘেন্না করেন না। হীরার গায়ের রং কালো কুচকুচে বলে ওকে ঘেন্না করেননি। উলটে 'কালো হীরে' বলে সোহাগ করেছেন। হ্যাঁ স্যার, ও আমাকে সবই বলেছে। একটুও বাদ দেয়নি। আমাদের মতো গবিরদের জীবনে এ—সুখ কি বারবার আসে? আপনিই বলুন! হীরা তাই কিচ্ছু বাদ দেয়নি, গলায় শাড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ার আগে স্যার গান করার মতো সুর করে স—ব বলে গেছে। ও খুব ভালো গাইত, স্যার! কিন্তু আমার মতো আধপেটা খাওয়া সংসারের বউ হয়ে বড়োসাহেবদের বাড়ি দিনরাত্তির ঝি—গিরি করলে কি আর গানের গলা খোলে? কিন্তু কাল রাতের কথা অন্য, স্যার। কাল যে হীরু ভালোমন্দ খেয়েছিল! গান তো গাইবেই!

হীরার খবরটাই আপনাকে দিতে এসেছিলুম, স্যার। ভেবেছিলুম আপনি বকশিশ দেবেন। কী বলছেন...আপনার মন—মেজাজ ভালো নেই! আগেই আপনি খবরটা পেয়েছেন? তা হলে তো আমার বকশিশটাই মার গেল, স্যার। তা যাক। আপনার দয়া আমি কোনোদিন ভুলব না। আমার বউ সাত জন্মে যে—সুখ পেত না, সেই সুখ ওকে আপনি দিয়েছেন— হোক না কেন এক রাতের জন্যে! আমার আধপেটা

সংসারকে সিকি—পেট হওয়ার হাত থেকেও বাঁচিয়েছেন। কী বলছেন, স্যার? ঠিক বুঝতে পারলেন? ও, হীরু আপনাকে বলেনি বুঝি ওর পেটে খোকা ছিল! তিন মাসের। বলেনি? হাঃ—হাঃ—হাঃ—দেখেছেন, কী বদমাইশ! বরাবরটা আমার সঙ্গে ওরকম ছেনালি করত। আপনি কি চমকে উঠলেন, স্যার? জানেন, আমিও প্রথম শুনে ওরকম চমকে উঠেছিলুম। কোত্থেকে খাওয়া জোটাব এই নতুন পেটের? আমার দিনমজুরি, আর হীরুর ঝি—গিরি...ওতে কি হয়? আমরা স্যার মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, জন্মরোধের কায়দাকানুন জানি না। তাই গোলমাল যত আমাদেরই হয়। তবে আপনি খুব বাঁচিয়েছেন, স্যার। এখন হীরাও গেছে, বে—আক্কেলে বাচ্চাটাও গেছে। আপনার আশীর্বাদে আমি এখন বোধহয় পুরো পেট খেতে পাব। এ কী, স্যার! এক ঢোকে বোতলের ঘোড়ার লেজ ছুঁয়ে ফেললেন? আমরা যেরকম ঢোক ঢোক জল খেয়ে পেট ভরাই, আপনিও সেরকম স্যার? যত দেখছি, সত্যি অবাক হচ্ছি!

ভালো খবর তো শোনালাম, স্যার। এবার খারাপও একটু আছে, সেটাও বলে ফেলি। তবে আমাকে কোনোরকম দোষ দেবেন না, স্যার। আমি আপনার ভালোই চাই, তাই তো এসেছি। একটা কথা কী জানেন স্যার, কাল রাতের ব্যাপারটায় হীরু বোধহয় তেমন খুশি হয়নি। কী করে হবে! ও যে আমার চেয়েও মুখ্যু, বোকা। ও গান করে করে সবই বলল বটে কিন্তু তারপর পেটে দু—হাত চেপে এমন পাগলের মতো চিৎকার শুরু করল যে, সারা বস্তির লোক একেবারে ছুট্টে এল। ও খালি চিৎকার করে বলছিল স্যার, আপনাকে ছাড়বে না। কিছুতেই ছাড়বে না—আরও কত কী। কিন্তু, সত্যি বলতে কী স্যার, সব শুনে প্রথমটা আমারও যে একটু রাগ হয়নি তা নয়। কিন্তু আমি কী করতে পারি, স্যার। আমার এই হাড় বের করা শরীরে শক্তি নেই, আমার মামলা করার পয়সা নেই, আমার একগাদা জোয়ান বন্ধু নেই। তার ওপর আপনার কাছে তো আবার বন্দুক আছে! তাই পরে নিজেকে সামলে নিয়ে ভেবেছিলুম, যা হওয়ার হয়ে গেছে। সবই তো ভগমানের হাত। হাজার হোক, বউটা একবারটি অন্তত মেমসাহেবি ঠাটে থেকেছে। কিন্তু হীরু বোধহয় মানতে পারেনি, স্যার। খালি বলছিল রাত এগারোটায় আমার সব্বোনাশ করেছিস, আমিও রাত এগারোটাতেই তোর সব্বোনাশ করব!...শুনলেও হাসি পায়, স্যার। তবে সকালে উঠে ওর ঝোলানো দেহটা যখন নামাই, তখন ওর মুখটা দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিলুম। চোখ দুটো ভাঁটার মতো বেরিয়ে আসছে, মাথার চুলগুলো সব এলো, টুকটুকে জিভটা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। যেন সাক্ষাৎ মা—কালী! আপনি কপালে হাত ঠেকালেন, স্যার? আপনি ভগমানে বিশ্বাস করেন! সত্যি, আপনি মহান স্যার, আপনি মহান। যাই হোক, সব লোক যখন জানতে চাইল বউটা ম'লো কেন, তখন আমার জন্যে বসে না থেকে ওরা নিজেরাই জবাব দিয়ে দিলে—খিদে, পেটের খিদে। আমি আর মুখ খুলিনি, স্যার। দুনিয়ার সবাই জানে, গরিবরা পেটের জ্বালাতেই মারা যায়।

হীরুকে পুড়িয়ে গঙ্গাচান করে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল, স্যার। পোড়ানোর টাকা তো ছিল না। ওকে ফুটপাথে ফেলে লোকের কাছ থেকে ভিক্ষে করে টাকা তুলতে হয়েছে। বেলা যত বেড়েছে ওর শরীরটা তত ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি ভনভন করতে শুরু করেছে। কিন্তু কী করব, স্যার...কী বলছেন? আপনার কাছে আসতে পারতাম? না, স্যার, ছিঃ, তা হলে আপনার চরিত্রে যে কালি লাগত! সে কি প্রাণ থাকতে আমি করতে পারি? জানেন, স্যার, এখানে আসার আগে দুটো ঘণ্টা আমি মাঠে—ঘাটে বেরিয়েছি। বস্তির ঝোপড়ায় আর ফিরতে পারিনি। মনটা কেমন হু হু করে উঠেছে। হাজার হলেও বউটা আমার খারাপ ছিল না, স্যার। কিন্তু আপনিও তো কম ভালো লোক নন। তাই তো হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় ছুটে এলুম আপনার কাছে। আপনাকে সাবধান করতে এগারোটা বোধহয় বেজে এল স্যার। ওই তো! আপনার বসবার ঘরের দামি দেওয়ালঘড়িতে ঢং ঢং শব্দ শুরু হয়েছে। শুনুন স্যার, গুনুন! এক, দুই, তিন, চার জানেন, স্যার, হীরু বলেছিল, ঘরের বাতিগুলো দপ করে নিভে গেলে বুঝবে আমি...গুনুন, গুনুন!...ছয়...সাত...আট....কী হু—হু করে হাওয়া দিচ্ছে, স্যার। জানালা—দরজার পাল্লাগুলো ঠাস ঠাস করে বাড়ি খাচ্ছে—ঝড় উঠল বুঝি?—নয়—দশ— এগারো—এই যাঃ। কী বলছেন স্যার, লোডশেডিং?

আপনি এত বড়ো লেখাপড়া—জানা লোক হয়ে এই ভুলটা করলেন, স্যার? দেখছেন না, আশপাশের সবকটা বাড়িতেই আলো জ্বলছে! শুধু আপনার বাড়িতেই—।

দরজা খুলে গিয়েছিল

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমি করুণাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সবই কি ম্যাজিক?

দিল্লির নামকরা জাদুকর করুণাশঙ্কর। আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হওয়া ইস্তক যতবার দিল্লি যাই ততবারই তাঁকে ফোন করি : এসে গেছি, চলে আসুন এবার।

দিল্লিতে ডিফেন্স কলোনিতে আমাদের কোম্পানির গেস্ট হাউসে করুণাশঙ্কর আসেন। দারুণ গল্পবাজ ভদ্রলোক। সারা পৃথিবী চরকির মতো ঘুরছেন। বিচিত্র দেশের বিচিত্র মানুষ নিয়ে গল্প। তারপর দু—একটা ম্যাজিক দেখান। যেমন, এবার বললেন, আপনার পকেটে খুচরো পয়সা আছে? খুচরো পয়সা এখন মেলে না। চিত্তবাবু তাঁর ঝুলি থেকে বার করে দিলেন একটা আধুলি। কলকাতা থেকে দশ টাকা খুচরো করে এনেছেন। দিল্লির ট্যাক্সি—ওয়ালাদের তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন এগজ্যাক্ট ফেয়ার দিয়ে। তাঁর ঝুলিতে সিকি আধুলি ভরতি।

করুণাশঙ্কর বললেন, 'আধুলিটা একবার আমার হাতে দিন। তারপর সেটি নিয়ে মন্ত্রপূত করে দিয়ে বললেন, এবার মুঠো করে ধরে থাকুন। হাতের মুঠোয় আধুলি ধরে আছি। ধীরে ধীরে দেখি সেটা গরম লাগছে। এত গরম যে হাতে রাখা যায় না। মনে হল এই বুঝি গরম উনুন থেকে নামানো হল। তাড়াতাড়ি আধুলিটা ফেলতে গিয়ে দেখি এক পুরু ভস্ম জমেছে হাতের তালুতে, আধুলির গায়ে। কোথা থেকে এল?

করুণাশঙ্কর বললেন, এটা ম্যাজিক। আমি বললাম, সবই কি ম্যাজিক? এই যে অনেক সময় অনেক সাধুসন্ত আঙুল ঘষে বিভূতি বার করেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি, একবার একজন—

করুণাশঙ্কর বললেন, ম্যাজিকের বাইরেও কিছু আছে। অনেক সময় অলৌকিক অতীন্দ্রিয় শক্তি কাজ করে। তবে এটা যখন তখন যার—তার দ্বারা হয় না। ঠিকমতো মিডিয়াম চাই। অবশ্য প্রেতই বলুন বা বুদ্ধির অতীত কোনো শক্তিই বলুন তিনি বহু অঘটন ঘটিয়ে থাকেন। বুদ্ধি দিয়ে আমরা তার ব্যাখ্যা করতে পারি না। অলৌকিক আছে, কিন্তু আমাদের ম্যাজিক কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়। এই যে এতক্ষণ আপনাকে যে খেলাটা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিলাম সেটা আর কিছু নয়, এক ধরনের কেমিক্যাল। ক্রমাগত ভস্ম উদগীরণ করে চলে। তবে অলৌকিক কিছু দেখতে চান যদি আপনাকে একটা জিনিস দিতে পারি, পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

—কী জিনিস দেখি।

করুণাশঙ্কর মানিব্যাগ থেকে একটি চোখ বার করলেন। একটি কাচের চোখ। চোখটি অনেকটা মানুষের চোখের মতো। কিন্তু মানুষের চোখ অত ত্রূ«র হয় না।

করুণাশঙ্কর বললেন, আমি যখন কিছুদিন আগে মালদ্বীপ গিয়েছিলাম তখন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। আমার ম্যাজিক দেখে খুশি হয়ে চোখটি আমায় উপহার দিয়ে বলেন, এটি এক ধরনের গোরুর চোখ। মালদ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে—কালো গোরুর চোখ সংরক্ষিত করে মানি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলে যা প্রার্থনা করা যায় তাই ফলে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কোন ফল পেয়েছেন?

করুণাশঙ্কর বললেন, ওই যে বললাম, সবাই উপযুক্ত মিডিয়াম নয়। এই চোখটি এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত মিডিয়ামের সন্ধানে আছে। এ পর্যন্ত তিনজন এই চোখ কাছে রেখে দিয়েছিলেন। তিনজনের কারও কোনো

উপকার হয়নি। আপনি চতুর্থ ব্যক্তি। আপনি এটি নিয়ে রেখে দিতে পারেন।

আমি চিত্তবাবুকে বললাম, আপনি নেবেন?

চিত্তবাবু বললেন, আমি এসব বিশ্বাস করি না। আপনি ভূতের গল্প লেখেন আপনি ওটা রাখতে পারেন।

আমার জীবনে অলৌকিক অভিজ্ঞতার সংখ্যা অজস্র। ভৌতিক কাহিনির স্টকও প্রচুর। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে আমার নিজের জীবনেই।

আমি বললাম, আমি রাখব। আমায় দিন।

করুণাশঙ্কর চোখটি আমার হাতে দিলেন। ওঃ কী বীভৎস চোখটা, মনে হচ্ছে গোরুটা যেন আমার দিকে চেয়ে আছে ড্যাবড্যাব করে।

করুণাশঙ্কর বললেন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনি খুব ঝামেলায় পড়বেন। অর্থক্ষতি হবে।

আমি বললাম, আপনি কী করে বুঝলেন?

করুণাশঙ্কর বললেন, আমি জ্যোতিষ করি। আপনি জানেন, আপনার জন্ম—তারিখ আমি জানি, সেই দেখে হিসাব করলাম।

বললাম, আপনি আমার টেনসন বাড়িয়ে তুলছেন। আমি একে ডায়াবিটিসের রোগী।

করুণাশঙ্কর হেসে বললেন, মুশকিল আসানের জন্য আছে ওই চোখ। আপনার সমস্ত মুশকিল আসান করে দেবে ওই চোখ।

কলকাতায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সত্যি সত্যি এক বিরাট মুশকিলে পড়লাম।

বালিগঞ্জে আমি একটি নতুন ফ্ল্যাট কিনেছি। ফ্ল্যাটটিতে আসবাবপত্র বসানো হয়েছে। তালাচাবি দেওয়া পড়ে আছে। মাঝে মাঝে যাই। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য এ পাড়াটা চট করে ছাড়তে পারি না। ওই ফ্ল্যাটের চাবিসুদ্ধ ব্যাগটি আমি আর খুঁজে পেলাম না। ডুপলিকেট চাবি বোকামি করে আলাদা করিনি। একসঙ্গে ব্যাগে ছিল। ব্যাগ আমার আলমারিতে ছিল। দিল্লি যাওয়ার আগে রেখে গিয়েছি। কোথায় যাবে এখান থেকে! ভীষণ মুষড়ে পড়লাম। চাবি না পেলে ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারব না। অথচ ফ্ল্যাটে আমার কিছু কিছু দামি জিনিস রয়ে গেছে। যেমন দামি রিস্টওয়াচটা ফেলে এসেছি। একটি বিদেশি থ্রি ইন ওয়ান রয়েছে ওখানে। আরও আছে টুকিটাকি জিনিস।

কোথায় গেল চাবির ব্যাগ! স্ত্রী ছেলে মেয়ে সবাইকে জেরা করছি। কেউ বলতে পারছে না। তারা উলটে বলছে, তোমার ভুলো মন, তুমি কোথায় ফেলেছ দেখ।

তিনদিন বসে বসে ভাবলাম। দরজা ভাঙতে হলে চার—পাঁচশো টাকা খরচ। নতুন দরজা, ডামেজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। পুরোনো লক ফেলে দিয়ে নতুন লক লাগাতে হবে। ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে ফতুর হয়েছি। এখন এত টাকা খরচ করার মতো মানসিক ইচ্ছা নেই।

কিন্তু তাই বলে এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া যায় না। একটা কিছু করা দরকার। চাঁদনি বাজারে যাব, নাকি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করব?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল করুণাশঙ্করের উপহারের কথা—চোখ। মানিব্যাগ থেকে চোখটি বার করলাম। তারপর তাকে স্পর্শ করে মনে মনে বললাম, চাবিটা পাইয়ে দাও। ফ্ল্যাটে ঢুকতে হবে।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল জীবনবাবুর টেলিফোন কলে। জীবনবাবু বলছেন, হ্যাঁ মশাই সকালে উঠে দেখি আপনার ফ্ল্যাটের দরজা খোলা, ভাবলাম আপনি আছেন। ভেতরে ঢুকে চক্ষু চড়কগাছ।

আমি বললাম, কেন কেন?

—ভেতরে কিছু নেই। একেবারে ফাঁকা বাড়ি। আমি যতদূর জানি আপনার তো অনেক জিনিস ছিল—

পাগলের মতো বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি, যে চাবির জন্য পনেরো দিন ধরে ফ্ল্যাটে যেতে পারিনি, সেই ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। তাড়াতাড়ি খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি, সব সাফ হয়ে গেছে। আমার

এতদিনকার তিল তিল করে গড়ে তোলা সমস্ত সম্পদের একটিও নেই।

আমি ফ্ল্যাটের চাবি চেয়েছিলাম কিন্তু কী করে সেই অলৌকিক শক্তিকে বোঝাব এভাবে আমি এভাবে দরজা খুলতে চাইনি।

কিন্তু যেই খুলে থাকুক, যে ক্ষতিই হয়ে থাকুক দরজাটা যে খুলে গেল তা দেখেই আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কিছুদিন পরে করুণাশঙ্করের একটিত চিঠি পেলাম দিল্লি থেকে।

প্রীতিভাজনেষু, ম্যাজিক দেখাতে আবার আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছি। আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাইবার আছে। মালদ্বীপে কালো গোরুর চোখ বলে আপনাকে সেদিন যেটি দিয়েছিলাম, সেটি আসলে নাইলনের এক খেলনা হরিণের কাচের চোখ। আমার ছেলেকে ছোটোবেলায় কিনে দিয়েছিলাম হরিণটি। অনেকদিন পরে ভাঙাচোরা হরিণটি পড়ে থাকতে দেখে চোখটা কেটে নিয়ে আমার মানিব্যাগে রেখে দিয়েছিলাম, এই মনে করে ম্যাজিকের কোনো কাজে লেগে যেতে পারে হয়তো। আপনাকে একটু ঘাবড়ে দেবার জন্য চোখটা দিয়েছিলাম আপনাকে। ওটা পত্রপাঠ ফেলে দিন। আপনার ঝামেলা—ঝঞ্ঝাটের যোগটা কিন্তু জ্যোতিষ মতে সত্যি।

চোখটা আমি তার অনেক আগেই ফেলে দিয়েছি। যেদিন ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গিয়েছিল সেইদিনই।

এ কী আজব গল্প

শৈলেন ঘোষ

আমি তোতা। আমার নাম শুনে হাসছ না কি? ভাবছ নাকি? আমি পাখি? না, না, আমি পাখি নই। আমি তোমাদেরই মতো, তোমাদেরই এক বন্ধু। আমি তোমাদেরই মতো ইস্কুলে পড়ি। বাড়িতে আমার মা আছেন, বাবা আছেন। আর আমি তো আছিই। মা ঘর—সংসার সামলান। বাবা ইস্কুলে পড়ান। আমি ওই ইস্কুলেরই ক্লাস এইটের ছাত্র। বাবা ইস্কুলে অঙ্ক শেখান। বুঝতেই পারছ বাবা খুব ভালো অঙ্ক জানেন। কিন্তু মজার কথা কী, আমার সব ভালো, ওই অঙ্কতেই যত আতঙ্ক। তার মানে এই নয়, আমি অঙ্ক বুঝি একেবারেই পারি না। পারি। কিন্তু বাবা যা চান ততটা আমি পারি না। সে আর কী করা! বাবা সেটা ভালোই জানেন। তাই চাপও বেশি দেন না। এমনকী আমার ওপর রাগও করেন না। আশ্চর্য কী, আমি বাবাকে কোনোদিনই কারও ওপর রাগ করতে দেখিনি। বাবা রাগতে জানেন না। তা—ই ইস্কুলে মাস্টারমশায়রা যেমন বাবাকে খুব পছন্দ করেন, তেমনই ছাত্ররাও ভালোবাসে। ছাত্ররা তো ভালোবাসবেই। কেন—না, বাবা প্রথমেই ক্লাসে ঢুকে চক—খড়ি দিয়ে বোর্ডে নানান সংখ্যা লিখে অঙ্কের ধাঁধায় কারও মনকে হারিয়ে যেতে দেন না। হ্যাঁ, তিনি অঙ্কও শেখান, তার সঙ্গে গল্পও বলেন। বাবা যে কত গল্প জানেন আমি শুনতে শুনতে হাঁ হয়ে যাই। আমি বাবার কাছেই শুনেছি, এই যে আমরা আজ এতসব ভোগের রসদ পাচ্ছি, এই যেমন ধরো টেলিভিশন থেকে হালফিল ফেসবুক পর্যন্ত, কিংবা ধরো ওয়াশিং মেশিন থেকে রেফ্রিজারেটার, অথবা রকেট ছুড়ে অন্য গ্রহের খবর সংগ্রহ, এর খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতি বানাবার বুদ্ধিটা মানুষের মাথায় আসছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো গড়ছে কে? আমাদের হাত। আমাদের দু—হাতের দশটা আঙুল।

বটেই তো, তোমার শরীরে সব ঠিকঠাক আছে, অথচ দুটো হাত নেই! হাতের দশটা আঙুল নেই! কী হত তখন! ভাবলে ভয়ে ছমছম করে ওঠে বুকের ধুকধুকি। আরে বাবা মেশিন কি আর আঙুলের কাজ করতে পারে? তোমার বই—এর পাতা ওলটাবে কে? হাতের আঙুল। পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখার কলম ধরবে কে? হাতের আঙুল। কম্পিউটারের মাউস ঘোরাবে কে? হাতের আঙুল। তোমার পিঠ সুড়সুড় করছে, কে চুলকোবে? সে—ও হাতের আঙুল। হাত আর হাতের আঙুল ছাড়া তোমার মুখে কি খাবারই উঠত?

যাকগে যাক, এসব কথা ছাড়ান দাও! বাবার মনে এমনতরো আরও কত যে গল্প জমা হয়ে আছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। সে—সব গল্প বলতে গেলে আসলে আমার নিজের গল্পটাই বলা হবে না। সে এক সাংঘাতিক ঘটনা। সেই গল্পটাই বলি এবার।

সেই ছোট্টবেলা থেকে বাবা আমায় সঙ্গে নিয়ে ইস্কুলে যেতেন। তখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি। ছোটো ছিলুম বলে ছুটির পর ইস্কুল থেকে ফিরতুম বাবার সঙ্গে। এখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। বাবার সঙ্গে ইস্কুলে যাওয়ার সেই অভ্যেসটা এখন চালু আছে। তবে বড়ো হয়েছি বলে ইস্কুলের ছুটির পর এখন আর বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরি না। ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে হই—হই করে বাড়ি ফিরি। অবশ্য, এ ব্যাপারে বাবা কোনো আপত্তি করেননি কোনোদিন। হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি থেকে ইস্কুলটা একটু দূরে। তবে, এমন নয় যে হাঁটতে হাঁটতে দম ছুটে যায়। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে হাঁটতে মজাই লাগে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে যখন বন্ধুরা যে—যার নিজের বাড়ি পৌঁছে যায়, তখন আমি একেবারে একা হয়ে পড়ি। তখনও আমাদের বাড়ির গলিটার নাগাল পেতে আমাকে আরও মিনিট পাঁচেক মুখ বুজে পা ফেলতে হয়! আমাদের বাড়ির গলিটা বেশ নির্জন। এই বিকেলেও তেমন লোকজন দেখা যায় না। এই গলির মুখ থেকে আমাদের বাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়।

গলিতে ঢুকেই আমি ছুটি। রোজ ছুটে বাড়ি ফিরতে আমার খুব মজা লাগে। কিন্তু একদিন যে এক ভয়ানক বিপদ আমার জন্যে ওত পেতে লুকিয়েছিল, সেটা আমি ঘৃণাক্ষরেও টের পাইনি।

রোজ যেমন হয়, সেদিনও তেমন ইস্কুলের ছুটির পর নিয়মমতো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরছি। একে একে বন্ধুরাও যে—যার বাড়ির রাস্তা ধরল। আমিও খানিক একলা হেঁটে আমাদের বাড়ির গলির মুখে পৌঁছে গেলুম। ওমা! গলিতে ঢুকতে যাব, হঠাৎ কী হল কে জানে, একটা লোক কোত্থেকে ছুটে এসে আমার নাকের কাছে একটা রুমাল নেড়ে দিল। একটা অসহ্য ঝাঁঝাল গন্ধ আমার নাকে ঢুকতেই— আমি আর কিছু জানি না। মানে, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

শুনলে অবাক হয়ে যাবে, কেমন করে, কবে কোথায় আমার জ্ঞান ফিরল আমি জানি না। আমি যে—ঘরে বিছানায় শুয়ে আছি, মনে হল, যেন আমারই বিছানা। দেওয়ালে যে—ছবিটা টাঙানো, তাতে দেখছি আঁকা একটা বাড়িতে আগুন লেগে দাউ—দাউ করে জ্বলছে। দেখে, আমার কোনো হেলদোলই নেই। আমার যে একটা লোক আমার নাকে রুমাল ঠেকিয়ে, ঝাঁঝাল গন্ধ শুঁকিয়ে, আমাকে অজ্ঞান করে এখানে নিয়ে এসেছে, সেটা পর্যন্ত আমার মন থেকে উবে গেছে! এমনকী আমাদের যে একটা বাড়ি আছে, বাড়িতে আমার মা— বাবা আছেন, তা—ও আমার মন থেকে বিলকুল মুছে গেছে। আমার চোখে কিছুই উদ্ভট লাগছে না। মনেও কোনো ভয় নেই, চোখেও কোনো জল নেই। ভাবছ নিশ্চয়ই, কী আশ্চর্য! আশ্চর্যই বটে! কেন—না, আমার জ্ঞান ফেরার পর আমি বেমালুম উঠে বসতে পারলুম। উঠে বসতেই একটা হোঁতকা মতো লোক আমার সামনে এসে আগডুম—বাগডুম কী যে বকছে, আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। অথচ আমি যে তাকে দেখে, তার বকবকানি শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি, তেমনও নয়। উলটে আমি সিধেসাপটা তাকে বললুম, বেশ ঘুমিয়েছি।'

এবার সেই হোঁতকা লোকটা আগডুম—বাগডুম বকবকানি থামিয়ে স্পষ্ট বাংলায় বলল, 'উঠে পড়ো। তাড়াতাড়ি মুখ হাত—পা ধুয়ে তৈরি হয়ে নে। যেতে হবে। কী খাবি? কালকের মতো আলুর চপ মুড়ি, না মামলেট—টোস্ট?'

তোমাদের খুব আশ্চর্য লাগলে আমি আর কী করব! সত্যি বলতে কী, আজ নয়, কালও যে আমার নিয়মমতো ঘুম ভেঙেছিল, কাল যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি মুড়ি আলুর চপ খেয়েছি, একদম খেয়াল নেই। আসলে, কাল সারাদিন যে কী করেছি, আর আজ যে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে কোথায় যেতে হবে, তার একবর্ণও আমার জানা নেই। অথচ অবাক কথা, আমি লোকটাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলুম, 'কাল যখন মুড়ি আলুর চপ খেয়েছি, আজ তবে মামলেট—টোস্টই হোক।'

তো, যেমন কথা, তেমনই মামলেট—টোস্টই খাওয়া হল। এবার কোথায় যাওয়া হবে তা তো জানি না।

'নে, এই প্যান্টটা আর শার্টটা পরে নে।' লোকটা অন্য আর একটা ঘর থেকে প্যান্ট—শার্টটা নিয়ে এসে আমায় দিলে। দেখে মনে হল নতুন আমি। চটপট পরেও ফেললুম। তারপর লোকটার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটা দিলুম। কোন রাস্তায় হাঁটছি, চেনা, না—অচেনা, হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যাচ্ছি, এসব নিয়ে কোনো দুর্ভাবনাই আমার মনে চেপে বসল না।

এরই ফাঁকে হঠাৎ কানে এল ক—টা কুকুরের বেদম চিৎকারের ডাক, ঘেউ—উ, ঘেউ—উ! পেছন ফিরে দেখি, একটা লোক যাচ্ছে, তার কাঁধে একটা বাঁদর বসে। আর তা—ই দেখে একদল কুকুর ঘেউ— উ ঘেউ—উz করে তার পিছু নিয়েছে। দেখে তো আমি হেসে মরি। লোকটার কিন্তু থোড়াই কেয়ার। দিব্যি নির্ভয়ে হেঁটে চলেছে! আমি যে হোঁতকা লোকটার সঙ্গে যাচ্ছিলুম, সে আমায় সাবধান করে বলল, 'এই, চুপ! চুপ! অমন করে হাসিস না। কুকুরে কামড়ে দেবে!'

আমি থতমত খেয়ে মুখের হাসি থামিয়ে ফেললুম। কিন্তু বুঝতে পারলুম পেটের ভেতর হাসিটা দারুণ কিলবিল করছে। সেই হাসিটাকেই কোনো রকমে পেটের ভেতরই আটকে রেখে এগিয়ে চললুম।

আর একটুখানি হাঁটতেই কাঁধে—বাঁদর লোকটা একটা গলির পথে ঢুকল, আর আমরা যেমন সিধে পথে হাঁটছিলুম, তেমনই সিধে পথে চললুম। কিন্তু কুকুরগুলো আর লোকটার পিছু—পিছু গলিতে ঢুকল না। গলির মুখে কিছুক্ষণ ঘেউ—উ, ঘেউ—উ করে যে যার নিজের রাস্তা দেখল।

হোঁতকা লোকটা আমার কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর খুব মজা লেগেছে না?'

আমি উত্তর দিলুম, 'মজা বলে মজা। দেখেছ, বাঁদরটা ওর কাঁধে বসে ল্যাজ দিয়ে গলাটা কেমন জড়িয়ে ধরে এদিক—ওদিক জুলজুল করে তাকাচ্ছিল।'

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'বাঁদর দেখলে খুব মজা লাগে না?'

আমি বললুম, 'মজা তো লাগেই, তার ওপরে ওদের রকমসকম দেখলে ভীষণ হাসি পায়।'

সে আবার বলল, 'কত রকমের জন্তু আছে বল পৃথিবীতে!'

আমি উত্তর দিলুম, 'আছেই তো। বাঘ—সিংহ থেকে শুরু করে...আমার কথা শেষ করতে না—দিয়ে, কথার মাঝখানেই সে জিজ্ঞেস করল, 'পৃথিবীতে এত যে জন্তু, তোর সবচেয়ে পছন্দ কোন জন্তু?'

আমি একনিশ্বাসে উত্তর দিলুম, 'ঘোড়া।'

লোকটা একটু অবাকই হল। বলল, 'সে কী রে! এত থাকতে ঘোড়া!'

আমি একটু হাসিমাখা মুখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'বাঘ, সিংহ, হাতি, হরিণ—'

তাকে কথা শেষ করতে না—দিয়ে আমি উত্তর দিলুম, 'ধুত! ঘোড়ার কাছে ওরা খোঁড়া।'

লোকটা এবার আমার কথা শুনে হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'ধর, তোকে যদি এখন আমি একটা ঘোড়া উপহার দিই, তুই কী করবি?'

'ঘোড়ার পিঠে বসব। বগল বাজিয়ে এদিক—ওদিক, যেদিকে খুশি ছুটে বেড়াব।'

সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তুই ঘোড়ার নাচ দেখেছিস কোনোদিন?'

আমি উত্তর দিলুম, 'তা অবশ্য দেখিনি।'

'দেখবি।'

'দেখালে নিশ্চয়ই দেখব।'

'তবে চ, তোকে ঘোড়ার নাচ দেখিয়ে আনি।'

আমি বললুম, 'তাই চলো।' বলে আনন্দে ডগমগ করতে করতে লোকটার সঙ্গে আমি ঘোড়ার নাচ দেখতে চললুম সেই সিধে রাস্তাটা ধরে।

তোমাদের বলব কী, সেই হোঁতকা লোকটা যেখানে আমায় নিয়ে এল, সেখানটা দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। কী যে এলাহি কাণ্ড চলছে সেখানে, কী বলব! অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা তাঁবু খাটানো। সেটা যেমন উঁচু, তেমনই পেল্লাই। চারপাশে লোক গিজগিজ করছে। সে বলল, 'চল, ভেতরে যাব।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এর ভেতরে ঘোড়ার নাচ হবে?'

সে বলল, 'শুধু ঘোড়ার নাচ নয়, ভেতরে আরও অনেক কিছু হবে। সার্কাস হবে, সার্কাস।'

আমি ক্লাস এইটে পড়ি তখন, এ কথা তোমরা সবাই জানো। বাবা কতবার যে আমায় সার্কাসে নিয়ে গেছেন, সে আর নতুন করে কী বলব। কিন্তু এখন কোন জাদুবলে যে এই হোঁতকা লোকটা আমার মন থেকে সব লোপাট করে দিয়েছে, কে বলবে! তাই সার্কাসের নাম শুনে আমি হাঁদার মতো তার মুখের দিকে তাকালুম। সে আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে চলল। ভেতর মানে যেখানে সার্কাস হয়, সেখানে নয়। একটা অন্য নিরিবিলি ঘরে। ঘরে ঢুকে দেখি, ছিমছাম পোশাক পরা একজন লোক চেয়ারে বসে টেবিলে কিছু কাগজপত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে তার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াতেই, সেই ছিমছাম পোশাক পরা লোকটি চমকে তাকিয়ে হোঁতকা লোকটিকে ডাক দিল, 'আরে তুমি, এসো এসো!'

হোঁতকা লোকটা আমায় সঙ্গে নিয়েই ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'এই যে, আপনার কথামতো এই ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি। ছেলেটি বলছিল, ঘোড়ার পিঠে বসে ছোটাছুটি করতে ওর খুব ভালো লাগে।'

'তাই নাকি! তবে তো ভালোই হল। এই রকমই একটি ছেলের এখন আমার খুব দরকার। যে—ছেলেটি এতদিন ঘোড়ার খেলা দেখাত সে হঠাৎ কাউকে কিছু না—বলে ছেড়েছুড়ে চলে গেছে। আমি পড়েছি বিপদে। আমি এখন ঘোড়ার খেলাই দেখাতে পারছি না। তুমি আমায় বিপদ থেকে বাঁচালে। দেখে তো মনে হচ্ছে, ছেলেটি বেশ চালাক—চতুর। দেখতে শুনতেও ভালো। ঘোড়ার পিঠে দু—চার দিন ট্রেনিং দিলেই অনেকটা রপ্ত করে ফেলবে বলে মনে হয়।' এই পর্যন্ত বলেই ছিমছাম লোকটি হঠাৎ আমায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

আমি একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। আসলে, তখন তো আমার নামটা পর্যন্ত আমার মন থেকে মুছে গেছে। চোখের পলকে হোঁতকা লোকটার দিকে তাকাতেই আমার কী মনে হল, আমি বলে ফেললুম, 'আমার নাম বরবটি।'

আমার নাম শুনে হোঁতকা আর ছিমছাম দুটো লোকই হেসে গড়িয়ে পড়ল। আমি বোকার মতো ওদের হাসি দেখে নিজেও হাসতে লাগলুম।

অবশ্য হাসিটা বেশিক্ষণ গড়াল না। ছিমছাম লোকটি হোঁতকা মতন লোকটিকে বলল, 'ঠিক আছে বাবা। বরবটি এখন এখানে একটু বসুক, তুমি এসো আমার সঙ্গে। আসল কাজটা সেরে ফেলা যাক।' বলতে বলতে দুটো লোকই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি একা চুপচাপ বসে রইলুম, আর সার্কাসে যেসব জীবজন্তু খেলা দেখায় তাদের, হট্টগোল শুনতে লাগলুম আমার একবারও মনে হল না, আসল কাজটা কী, কী কাজ সারতে গেল দুজনে!

তার পরের ঘটনাগুলো খুব সোজা:

হাসিমুখে দুজনে ফিরে এল একটু পরেই।

হোঁতকা লোকটা আমায় বলল, 'সাবধানে থাকিস রে বরবটি। আমি চলি এখন। পরে আবার আসব।'

সেদিন থেকে ক—দিন নিয়মিত একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে আমায় নানান ধরনের খেলা দেখানোর কায়দা শেখানো চলল। সত্যি বলতে কী ঘোড়াটাকে যখন প্রথম দেখি, তখন থেকে এমন ভালো লেগে গেল! কী শান্ত ঘোড়াটা। ঘোড়াটার যেন আমাকেও খুব ভালো লেগে গেছে। কেন না, আমি যখন ওর পিঠে দাঁড়িয়ে খেলা শিখি, আমি বুঝতে পারি বেচারির কষ্ট হচ্ছে, তবুও আমাকে কোনো দিনও লাফিয়ে—ঝাঁপিয়ে ঝটকা মেরে ওর পিঠ থেকে ফেলে দেয়নি। সুতরাং খেলা শিখতে আমার মনে ভয় ছিল না কোনো। কত সহজে শিখে ফেললুম কত শক্ত শক্ত খেলা। সেই খেলাটা কী শক্ত, যেটা বাজনার তালে তালে ঘোড়ার নাচের খেলা। পেছনের দু—পা মাটিতে রেখে নাচে ঘোড়া। সামনের দু—পা শূন্যে। আমি শূন্যের সেই দু—পা মাটি থেকে লাফিয়ে ধরে ডিগবাজি খাই। একটা—দুটো, পাঁচটা—ছ—টা, দশটা পর্যন্ত। তা—ও সেই নাচের বাজনার তালে তালে। ভাবতে পারবে না, কী হাততালি পড়ে তখন!

এই ভাবেই বেশ চলছিল। ওরা আমার এই ঘোড়ার নাম রেখেছিল 'কামাল'। কামাল বলেই সবাই ডাকত। আমি ডাকতুম 'বন্ধু' বলে। আমি একাই ডাকতুম। বললে বিশ্বাস করবে না, কী গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল আমাদের। আমি যেমন ভালোবাসতুম তাকে, সে—ও তেমনই ভালোবাসত আমায়। আমাকে সামনে না—দেখলে সে খাবারই মুখে দিত না।

তার পরেই ঘটে গেল সাংঘাতিক ঘটনা।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। ভিড়ের ঠেলায় সার্কাসের গ্যালারি উপচে পড়েছে। এক—একটা খেলা শেষ হচ্ছে, হাততালিতে ফেটে পড়ছে সার্কাসের ঘেরাটোপ। যখন ঘোড়ার নাচের বাজনা বেজে উঠল, আর আমি ঘোড়ার পিঠে চেপে যখন খেলার চত্বরে হাজির হলুম, তখন যদি দর্শকদের আনন্দের ধুম দেখতে, নির্ঘাত ভাবতে, এ যেন খুশির তুফান আকাশ—বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে! প্রথমে যেমন রোজ হয়, সেদিনও তেমন ক

—টা খেলা হল ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে। ক—টা খেলা হল, ঘোড়ার পেটে ঝুলে, ঘাড়ে দুলে। তারপরে শুরু হল ঘোড়ার নাচের খেলা। প্রথমে ঘোড়ার চার পায়ে ঝুমুর পরিয়ে দেওয়া হল। ঘোড়া বাজনার তালে তালে চার পা ফেলে, কোমর দুলিয়ে, ঘাড় হেলিয়ে ক—টা মজাদার নাচ দেখাল। তারপর, চারপায়ে নাচতে নাচতে হঠাৎ সামনের দু—পা শূন্যে তুলে ধেই—ধেই করতে লাগল, অমনই আমি ঘোড়ার শূন্যে তোলা দু—পা ধরার জন্যে মেরেছি লাফ। সঙ্গে সঙ্গে মট করে একটা আওয়াজ। আমি ভয়ে চমকে উঠেছি। বুঝতে পারলুম আমার লাফানোটা বেকায়দায় হয়ে গেছে। ফলে আমার শরীরের ভারে ঘোড়ার একটা পা বোধ হয় ভেঙে গেল। আর বলতে, সত্যি তাই। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আমি পড়লুম ছিটকে দশহাত দূরে। তারপর আমি আর কিছু জানি না। জ্ঞান হারালুম। হঠাৎ যখন আমার জ্ঞান ফিরল, দেখেশুনে আমি আঁতকে উঠেছি। মনে হল, আমি একটা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। আমার শরীরের এখানে—ওখানে ব্যান্ডেজ। আমার আশেপাশে অনেক রুগি বিছানায় শুয়ে। অনেক নার্স এদিক—ওদিক ব্যস্ত পায়ে ঘোরাফেরা করছেন। আমার কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। আচমকা আমার বাড়ির কথা সব মনে পড়ে গেল! এখানে আমি কেমন করে এলুম! আমার মা কই? বাবা কই? আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলুম। নার্স ছুটে এসেছেন, 'কী হয়েছে ?'

আমি তেমনই চিৎকার করে বললুম, 'আমি বাড়ি যাব।'

নার্স বললেন, 'ডাক্তারবাবু ছুটি না—দিলে তুমি বাড়ি যাবে কেমন করে? তোমার যা আঘাত, তাতে এত তাড়াতাড়ি তোমার ছুটি হবে কী করে?

আমি নাছোড়বান্দা। নার্সকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন লাগল আঘাত? কেমন করে লাগল আমার, আমি তো জানি না।'

নার্স উত্তর দিলেন, 'সে কী কথা! সার্কাসে ঘোড়ার খেলা দেখাতে গিয়ে তুমি যে পড়ে গেছলে, তা তোমার খেয়াল নেই? কী সাংঘাতিক ঘটনা! ভগবানের দয়ায় তুমি খুব বেঁচে গেছ। ঘোড়াটাকে তো বাঁচানো যায়নি!'

নার্সের এই কথা শোনার পর, কী আশ্চর্য, আমি যা একেবারেই ভুলে গেছলুম, একটি একটি করে তার সব মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল, ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় একটা হোঁতকা মতো লোক আমার নাকের কাছে একটা রুমাল নেড়ে দিতেই তার ঝাঁঝাল গন্ধে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। তারপর আর কিছু জানি না। জ্ঞান ফিরলে একেবারে অন্য মানুষ। সার্কাসে আমি ঘোড়ার খেলা দেখাই। ঘোড়াটা আমার ভীষণ ভালোবাসে। আমিও ভালোবাসি। তাকে বন্ধু বলে ডাকি। হ্যাঁ, কাল সেই দুর্ঘটনাটা ঘটল। আমি বেঁচে গেছি। নার্স বলছেন আমার বন্ধু ঘোড়া বেঁচে নেই। শুনে আমি এখন কান্নায় ভাসছি, আর ভাবছি আমি এখন কেমন করে মা আর বাবার কাছে যাব! তাঁরা না—জানি আমাকে পাগলের মতো খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে যাচ্ছেন!

আমি কোথায় এসেছি জানি না। আমাদের বাড়ি কোনদিকে তা—ও আমার জানা নেই। কিন্তু না, আমার আঘাত যতই গুরুতর হোক, ডাক্তারবাবু আমাকে ছুটি না—দিলেও আমি লুকিয়ে পালাব এখান থেকে। কিন্তু কেমন করে! আমি কি উঠে বসতে পারছি! দেখি তো! নার্সের সামনেই আমি উঠে বসার চেষ্টা করলুম। বসতে পারলুম। নার্স একটু ব্যস্ত হয়ে ধমক দিলেন, 'এ কী করছ? উঠছ কেন?'

'আমি একটু বাথরুমে যাব', বলে আমি পা বাড়াবার চেষ্টা করলুম মাটিতে পা ফেলার।

নার্স হন্তদন্ত হয়ে আমাকে ধরে ফেললেন। ততক্ষণে আমার মাটিতে পা পড়ে গেছে। আমি দিব্যি একপা, দু—পা করে হেঁটেও ফেলেছি। বুঝতে পারলুম হাঁটতে আমি পারব। আঘাতটা আমার পায়ে লাগেনি। লেগেছে হাতে আর মাথায়। এই দু—জায়গাতেই ব্যান্ডেজ জড়ানো। আর যা লেগেছে, তার কোথাও কেটেছে, কোথাও ছড়েছে। তবে মাথার ভেতরে একটা যন্ত্রণা আমায় কষ্ট দিচ্ছে। বাঁ—হাতটা ভেঙেছে মনে হয়। কবজিটা মনে হচ্ছে, প্লাস্টার করে দিয়েছে।

নার্স আমায় আটকালেন। চেঁচালেন, 'তোমায় বাথরুম যেতে হবে না। এখানে, বেডেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

আমিও জেদ ধরলুম, যাবই।

অগত্যা নার্স আমায় ধরে ধরে নিয়ে চললেন বাথরুমে। আমি বুঝতে পারলুম, হাঁটতে আমার কষ্ট হল না।

কে না—জানে, এই আলো—ঝলমল দিনের বেলায় তো আর নার্সের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালানো যায় না। সুতরাং আমাকে গভীর রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমার দেখা হয়ে গেছে, হাঁটতে আমার কষ্ট হচ্ছে না, সুযোগ পেলে আমি ঠিক পালাতে পারব। সুতরাং গভীর রাতের অপেক্ষায় আমি গুনতে লাগলুম।

ইতিমধ্যে সার্কাসের বড়োকর্তা হাসপাতালে এসে আমার খোঁজখবর নিয়ে গেছেন। তিনি এতটাই মুষড়ে পড়েছেন যে, ছলছল চোখে আমাকে বলে যেতে ভুললেন না, অনেক চেষ্টা করেও ঘোড়াটাকে বাঁচানো গেল না।

সেটা আমি জানি। ঘোড়াটার জন্যে যে আমার মনও কতটা ভার হয়ে আছে, সেকথা আমি ছাড়া আর কে জানে! কিন্তু সে যা হবার সে তো হয়েই গেছে। তাকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখন সব ছেড়ে মন যে আমার বাড়ির জন্যে ভীষণ ছটফট করছে। আমি মাকে, বাবাকে কখন যে দেখতে পাব, কেমন করে যে তাদের কাছে যাব, তার যে কিছুই জানি না আমি। আমার কী হবে? সার্কাসের মালিক যদি আমাকে না—ছাড়েন! ছাড়ার কথাও নয়। কারণ, এই বয়সের এমন একটা ওস্তাদ ছেলেকে সার্কাসের কোনো মালিকই কি ছেড়ে দেয়! সুতরাং কাউকে কোনো জানান না—দিয়েই আমাকে পালাতে হবে। পালাতে হবে গভীর রাতে হাসপাতাল থেকে।

অবশ্য, এখন আর দিনের আলো নেই। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। দিনেরবেলা যে নার্সরা রুগিদের দেখাশোনা করছিলেন, তাঁদের ডিউটি শেষ। এখন রাতের নার্স এসেছেন। আমাকে যিনি দেখাশোনা করবেন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, ভালোমানুষ। এঁকে বোধহয় ফাঁকি দিতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। দেখা যাক, কী হয়।

ঘুমের রাত এল। ঘুম আসার আগে, হাসপাতালেই যেসব ডাক্তারবাবুরা থাকেন, তাঁরা প্রত্যেক রুগিকেই একবার করে দেখে গেলেন। এবার আলো নিভবে একটি একটি করে। খুব ঝিমঝিমে একটা আলো শুধু জ্বালা থাকল। এখন ঘুমোও।

আমার বেড দোতলায়। আমি দেখে রেখেছি, বাথরুম যেদিকে, সেদিকে একটু এগিয়েই নীচে নামার সিঁড়ি। সুতরাং গভীর রাতে নার্সের চোখ ঘুমে যদি একটুও ঢুলু—ঢুলু করে, তখনই পালানোর সুযোগটা নিতে হবে। আর যদি দেখে ফেলেন, তখন তো বলা যেতেই পারে বাথরুমে যাচ্ছি।

অবাক কথা কী, গভীর রাতে এমনই একটা সুযোগ আমি পেয়ে গেলুম। মিটিমিটি আলো। সবাই ঘুমে অচেতন। চারদিক সুনসান। এমনকী, নার্সও ঘুমোচ্ছেন। আমি নিঃসাড়ে বেড থেকে নেমে একাই বাথরুমের দিকে আলতো পায়ে হাঁটা দিলুম। বাথরুম পেরিয়ে সিঁড়িতে পা ফেললুম। নেমেও গেলুম। এমনই বরাত, দেখি গেটের দারোয়ানও দেওয়ালে মাথা এলিয়ে বেমালুম নাক ডাকাচ্ছে। ছুট্টে পেরোতে গেলুম গেটটা, পারলুম না। কোমরটা টনটন করে উঠল। বুঝতে পারলুম প্রচণ্ড ব্যথা সারা শরীরে। ছোটাছুটি করার ক্ষমতা নেই। পালাতে হবে সাবধানে পা ফেলে। শেষপর্যন্ত সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারলুম হাসাপাতাল থেকে। রাস্তায় বেরিয়ে অনেকটা লুকিয়েছাপিয়ে, আর অনেকটা হাঁসফাঁস করে খোলা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটা নিরাপদ জাগয়ায় পৌঁছে গেলুম।

এইবারেই মুশকিল। যদিও তখন গভীর রাত। চারদিক ফাঁকা। কোথাও জনপ্রাণী নেই, তবুও ভয়তো আমার পিছু ছাড়ছে না। এমন করে ফাঁকা পথে হাঁটলে যে, আমি যে—কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারি, সেটা কে না—জানে। আমায় এখনই কোথাও—না—কোথাও লুকিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু কোথায় লুকোব? আমি তো এখানকার ধুলো—মাটি কিছুই চিনি না।

আমি অনেকক্ষণ হেঁটেছি। আর কত হাঁটব! সত্যি বলছি, আর পারছি না। মনে হচ্ছে, গভীর রাত হালকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। আমার ততই মাথা ঝিমঝিম করছে। হাঁটতে হাঁটতে পা—ও আর বইছে না। সামনে কী আছে। কোথায় যাব! কিছু জানি না। আমায় যে একটু বসতে হবে এখনই। নইলে নির্ঘাত মাথা ঘুরে পড়ে যাব। ওই দিকে মনে হচ্ছে, কয়েকটা গাছগাছালি দেখা যাচ্ছে। একটু ঝোপঝাড়ও আছে। ওইদিকেই পা বাড়ালুম। এখানে এসে টাল সামলাতে পারলুম না। এসে গেছি ঝোপের কাছে। ঝোপের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম। তারপর হাঁপাতে লাগলুম।

একটু সামলে আবার উঠে পড়েছি। মনে হল, এই ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকা যায়, কিন্তু লুকিয়ে থাকা যায় না। দিনের আলো ফুটলে কারও নজরে পড়ে যেতে পারি। সুতরাং কুঁতিয়ে—কুঁতিয়ে আবার পা ফেললুম ঝোপ ডিঙিয়ে।

একটু হাঁটতেই মনে হল, এদিকটা যেন জঙ্গল—জঙ্গল। আর একটু হাঁটতেই দেখি, জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা গাড়ি, না, কী একটা পড়ে আছে। হ্যাঁ, কাছাকাছি গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তা—ই, একটা ঘোড়ায়—টানা গাড়ি। বসা যাবে কি? বসতে পারলে বেশ হয়। লুকিয়ে থাকা যাবে, আবার ধকলও সামলানো যাবে।

হ্যাঁ, অন্ধকারে আন্দাজে পা ফেলে ভাঙা গাড়িটার ভেতর ঢুকে বসার মতো একটু জায়গা পেয়ে গেলুম। এখানে আজকের রাতটা অন্তত নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। এই ঘুপচিতে কারও সাধ্যি নেই আমাকে খুঁজে বার করে।

আঃ! এতক্ষণে একটু স্বস্তি পেলুম। না, গাড়ির ভেতর আরাম করে বসতে তেমন কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। এবার আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে! অবশ্য এখানে নির্ভাবনায় একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যেতেই পারে। সুতরাং ঘুমে চোখ বুজে গেল আমার।

ওমা! একী! হঠাৎ আমার ঘুম কেন ভেঙে যায়! আমার মনে হল ভাঙা গাড়িটা যেন ছুটছে। তাই তো! এ কী অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড! ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আসছে কানে। কোত্থেকে ঘোড়া এল। গাড়ির ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখি, আরে এ যে সেই সার্কাসের সেই সাদা ঘোড়া, আমার বন্ধু! আশ্চর্য! সবাই বলল, সে তো মরে গেছে। ভয়ে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়! আমাকে সে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। আমাকেও সে মেরে ফেলতে চায় নাকি! আমি আর কিছু ভাবতে না—পেরে আর্তনাদ করে উঠলুম, 'আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!'

অবাক কাণ্ড, চোখের পলকে গাড়িটা থেমে গেল! কোথায় থামল অন্ধকারে আমি ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না। কেউ আমাকে বাঁচাতেও এল না। ঢিপ ঢিপ করে কাঁপতে লাগল আমার বুক। থরথর করে কাঁপতে লাগল আমার সারা শরীর।

ঠিক এই মুহূর্তে একটা পাখি ডেকে উঠল। একটা কাকও কা—কা করে ডাক দিল। অনেকটা ভয় কাটল আমার পাখির ডাক শুনে। আর দেরি নেই, এবার ভোরের আলো দেখা যাবে। আচ্ছা, গাড়িটা তো থামল। কিন্তু ঘোড়াটার তো আর কোনো সাড়া পাচ্ছি না। তার টগবগিয়ে ছোটার শব্দ না—হয় থামল, কিন্তু তার পরে ঘোড়ার দম ফেলার আবছা শব্দও তো কানে আসবে! কই তেমন তো কিছু শুনছি না! সাহস হল না গাড়ি থেকে নামতে। ভোরের নরম আলোয় আবার উঁকি দিলুম। কই, আমার সেই বন্ধু ঘোড়াকে তো আর দেখা যাচ্ছে না। নিমেষে কোথাও উধাও হয়ে গেল! ভোরের আলো আরও একটু উজ্জ্বল হতে, আমার কেমন যেন সাহস বেড়ে গেল। আমি খুব চাপা স্বরে ডাক দিলুম, 'বন্ধু!' ডাকতে ডাকতে গাড়ি থেকে নেমেও পড়লুম। তারপরেই থ হয়ে গেলুম। এ যে গাড়ি আমাদেরই বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে! একী সত্যি, না আমি স্বপ্ন দেখছি! আমি থাকতে পারলুম না। চিৎকার করে উঠলুম, 'মা—, বাবা—,' চিৎকার করে দুড়দাড়িয়ে ছুটে গেলুম দরজার দিকে। মারলুম ধাক্কা। দরজা খুলে গেল। দেখি সামনে মা। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম মায়ের বুকে। লাগল আমার ভাঙা হাতটায়। মাথাটাও কেমন যেন ঝিনঝিন করে উঠল। কিন্তু সে কি আর তখন মায়ের বুক জড়িয়ে ধরতে আমায় বাধা দিতে পারে। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আমি হাউ হাউ

করে কেঁদে উঠলুম। মা—ও কাঁদছেন। ছুটে এসেছেন বাবাও। বুঝতে পারলুম তিনি আমার মাথা আলতো হাতে ছুঁয়ে ধরেছেন। আমি মুখ তুলে তাকালুম। দেখলুম, তাঁরও চোখে জল। মুখে হাসির আভাস। কান্না—হাসির সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। ছেলেকে যে ফিরে পেয়েছেন! সত্যি বলতে কী, আনন্দ যে মানুষকে এমন করে কাঁদায়, সে কথা কি এতদিন আমি জানতুম! না, আমার এই বয়সে তা জানার কথাও নয়। আজই প্রথম জানলুম!

আর, সব শেষে বলি, আমার বন্ধু ঘোড়া, যে গাড়িটা টেনে আমায় মা—বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল, সেই গাড়িটাও দেখি কোথায় উধাও হয়ে গেছে! আর কোনোদিন দেখতেও পেলুম না। এ কী আজব গল্প!

বিলাপী আত্মা

মঞ্জিল সেন

ফাঁসির আগে আসামি ম্যাথুসের স্বাস্থ্য ডাঃ পিল্লাই বার দুই পরীক্ষা করেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল কেরালায়; ডাঃ পিল্লাই হলেন জেলের ডাক্তার। ওঁরা দুজনেই খ্রীশ্চান।

জীবনের আশা আর নেই জেনে ম্যাথুস ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। প্রতিটি রাতের পর প্রসন্ন সকাল যে তার জীবনের মেয়াদ ক্রমেই কমিয়ে আনছে, তা জেনেও সে তেমন আতঙ্কিত হচ্ছিল না। মৃত্যু—ভয় যেন সে জয় করে ফেলেছে। তার জীবনে আবেদন সরকার নাকচ করে দিয়েছেন, জানবার পর থেকেই তার এই পরিবর্তনের শুরু। তার আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ বাঁচার ক্ষীণতম আশাও তার মনে যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ লোকটি দিবা—রাত্রের প্রতিটি ঘণ্টা মৃত্যুর অজানা বিভীষিকায় উন্মাদের মতো আচরণ করেছিল, বাঁচতে চেয়েছিল। ডাঃ পিল্লাই একজন মানুষের মধ্যে বাঁচার এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর শেষ আশাটুকু নির্মল হয়ে যাবার পর সেই লোকটিরই জীবন সম্বন্ধে নিরাসক্ততার এই পরস্পরবিরোধী সংঘাতে বিস্মিত না হয়ে পারেননি। পরিবর্তনটা এত আকস্মিক যে ডাক্তারের মনে হয়েছিল, আসামির আবেদন না মঞ্জুরের কবরটাই তার অনুভূতির সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিকল করে দিয়েছে। খবরটা শোনার পরই সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল—সেই প্রথমবার ডাঃ পিল্লাই তার চিকিৎসা করেন। জ্ঞান হবার পর থেকেই তার এই অদ্ভুত পরিবর্তন।

যে অপরাধ সে করেছিল তার কোনো ক্ষমা নেই, জনসাধারণের মনেও ম্যাথুসের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণার সৃষ্টি হয়নি। ত্রিবান্দ্রমে তার একটা ছোটো মনোহারী দোকান ছিল। মা আর বউ নিয়ে ছিল তার ছোট্ট সংসার। সেই মা—ই হয়েছিলেন তার জঘন্যতম অপরাধের শিকার। বিধবা মায়ের হাজার পাঁচেক টাকা ছিল। সেই শেষ সম্বলটুকুর ওপর ম্যাথুসের লোভই এই অপরাধের ইতিহাস।

বিচারের সময় প্রকাশ হয়ে পড়ে, ওই ঘটনার সময় বাজারে তার হাজারখানেক টাকা দেনা ছিল। তার বউ দিন কয়েকের জন্য ত্রিচুরে বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল, আর সেই সুযোগে এক রাত্রে মাকে গলা টিপে হত্যা করে বাড়ির পেছনে ছোটো বাগানের জমিতে সে কবর দিয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই মায়ের সঙ্গে টাকা—পয়সার ব্যাপার নিয়ে তার খিটিমিটি লেগেই ছিল। মা প্রায়ই বলতেন, বাড়ি ছেড়ে তিনি চলে যাবেন। ঘটনার দিনেও মা ও ছেলের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়, যার ফলে ভদ্রমহিলা ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা তুলে আনেন। পরদিন ভোরে তিনি তাঁর বাক্স—প্যাঁটরা নিয়ে যেদিকে দু—চোখ যায় চলে যাবেন বলেছিলেন। পাড়পড়শি এ ঘটনার সাক্ষী ছিল। সেই রাতেই ম্যাথুস কাজ হাসিল করে।

খুব ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে, সে তার পরবর্তী কাজগুলো করেছিল। মায়ের জিনিসপত্র একটা তোরঙ্গে পুরে রাত থাকতেই সে বেরিয়ে পড়ে। স্টেশনে গিয়ে মাদ্রাজগামী একটা গাড়িতে তোরঙ্গটা বসবার আসনের তলায় রেখে সে ফিরে এসেছিল। একটু বেলা হতেই পাড়াপড়শির কাছে সে রটিয়ে দিয়েছিল, মা তার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে গেছে, কোথায় গেছে তা সে জানে না। মার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কারও অজানা ছিল না, তাই মিথ্যে দুঃখিত হবার ভাণ না করে খোলাখুলিই সে বলেছিল, মা—ই ছিল যত অশান্তির মূলে, এবার বাড়িতে শান্তি ফিরে আসবে।

বউ ফিরে আসার পর তাকেও সে একই কথা বলেছিল। মা যে—কোনো ঠিকানা দিয়ে যায়নি, তা জানাতেও সে ভোলেনি। কারণ বউ তার ভালো মানুষ, যদি মাকে ফিরে আসার জন্য চিঠি লেখে, তাই বাজে

ঠিকানা দিয়ে হাঙ্গামায় পড়তে সে চায়নি। বউ তার কথা সরল বিশ্বাসেই মেনে নিয়েছিল, অবিশ্বাস কিংবা সন্দেহ করার কারণ অবশ্য ছিল না।

ঘটনার পর কিছুদিন সে খুবই সতর্ক ছিল। প্রতিটি অপরাধীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটা নির্দিষ্ট সময় বা সীমা পর্যন্ত তারা হুঁশিয়ার থাকে, কিন্তু তারপরই তারা ঢিলে দেয়। আর তখনই এমন মারাত্মক ভুল করে বসে, যা তাদের জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়। ম্যাথুসও প্রথম প্রথম খুব ভেবেচিন্তে কাজ করতে লাগল। তার দেনা সে তখুনি শোধ করল না, বরং মা যে ঘরে থাকত সেই ঘরে সে একজন ভাড়াটে বসাল। আর দোকানে যে ছোকরা তার সহকারী ছিল, তাকে সে বিদেয় করল। অর্থাৎ দোকানের খরচা কমিয়ে আর বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়ে সে তার অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা করছে এই ধারণাটাই সে পাঁচজনের মনে ঢোকাতে চাইছিল।

একমাস পর ওই পাঁচ হাজার টাকা থেকে একশো' টাকা দিয়ে সে ব্যাঙ্কে নিজের নামে অ্যাকাউন্ট খুলল। তার কিছুদিন পরই হাজার টাকা দেনা শোধ করল।

এর পরই সে অসাবধানী হতে লাগল। অন্য একটা ব্যাঙ্কে দু—হাজার টাকার আরও একটা অ্যাকাউন্ট খুলে বসল। মাকে বাগানের যে জায়গায় কবর দিয়েছিল, তার গর্তটা গভীর করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তাই শুধু ও জায়গাটার বেশ কিছু মাটি আর সার ফেলে কয়েকটা গোলাপের চারা লাগিয়ে সে নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল। এটা কিন্তু তার চালে একটা মস্ত ভুলই বলতে হবে, কারণ বাগানের নেশা তার কোনো কালেই ছিল না, বরং তার মা—ই ওই বাগানের জমিতে কিছু শাক—সবজির বাগান করেছিলেন। তার হঠাৎ এই রুচির পরিবর্তনে শুধু পাড়াপড়শিরাই নয়, তার বউ পর্যন্ত অবাক না হয়ে পারেনি।

তোরঙ্গটা সে মাদ্রাজগামী গাড়িতে তুলে দিয়েছিল দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে—এক, ওটার মালিক না থাকায়, কেউ হয়তো ওটা বেমালুম সরিয়ে ফেলবে। দুই, যদি তা নাও হয়, তবে হারানো মালপত্রের গুদামে ওটা জমা হবে, এবং কোনো দাবিদার না জুটলে রেল কর্তৃপক্ষ হয়তো ওটা নিলাম করে দেবে। ওটার সঙ্গে তাকে জড়াবার কোনো কারণই ছিল না। তোরঙ্গে জামাকাপড়ের ভাঁজে তার মার কাছে একজনের লেখা একটি চিঠি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল, আর সেটাই তার কাল হয়ে দাঁড়াল। চিঠিতে তার ঠিকানা ছিল।

তোরঙ্গটা আরও অনেক হারানো মালপত্রের সঙ্গে গুদামে সত্যিই জমা পড়েছিল এবং সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে তাই হয়েছিল, অর্থাৎ 'আছে থাকুক' এই মনোভাব নিয়ে কর্তৃপক্ষ ওটার পেছনে অযথা সময় নষ্ট করেননি। গোলমাল বাধল গুদামে হঠাৎ আগুন লেগে যাওয়ায়। বেশি কিছু ক্ষতি হবার আগেই অবশ্য আগুন নিভিয়ে ফেলা হল। কিন্তু কয়েকটা জিনিসের সঙ্গে তোরঙ্গটাও বেশ পুড়ে গেল, আর আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেল চিঠিটা। একেই বলে কপাল। যা হোক, যেসব জিনিসের ক্ষতি হয়েছে, তাদের মালিককে রেল থেকে ক্ষতিপূরণের কথা জানিয়ে চিঠি লেখা হল। সামান্য যে ক—টা জিনিসেরই মালিকের হদিশ পাওয়া গেল, আর তোরঙ্গটা হল তাদের মধ্যে একটা।

যথাসময়ে ম্যাথুসের মা—র নামে চিঠিটা এল, আর পড়ল ম্যাথুসের বউয়ের হাতে। আপাতদৃষ্টিতে ওটা একটা সাধারণ গতানুগতিক চিঠি ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু ওটাই ম্যাথুসের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হল। তোরঙ্গটা কেন যে এগমোর স্টেশনে এতদিন পড়েছিল, তার কোনো কৈফিয়তই সে দিতে পারল না। (কলকাতায় যেমন হাওড়া ও শেয়ালদা মাদ্রাজেও তেমন দুটো স্টেশন, সেন্ট্রাল আর এগমোর)। অগত্যা তাকে বলতে হল, তাঁর মার নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং বাধ্য হয়েই মা—র সন্ধানের জন্য তাকে পুলিশের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশের সন্দেহ পড়ল তার ওপর।

হঠাৎ কিছু অচেনা মুখকে তার বাড়ির আনাচেকানাচে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা গেল। ব্যাঙ্কে খোঁজ করতে গিয়ে তার টাকা জমা দেবার ব্যাপারটা গোয়েন্দা বিভাগের দৃষ্টি এড়ালো না। তার বাগানের গোলাপ গাছ হঠাৎ বাইরের লোকের প্রশংসার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। তারপরই একদিন পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে হাজির

হল। বাগানের মাটি খুঁড়ে গলিত সে শব বেরোল, তার পরিচয়ও আর গোপন রইল না। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হল।

সংক্ষেপে এই হল ঘটনা। বিচারের সময় সে এমন ভাণ করেছিল, যেন সে কিছুই জানে না, নির্দোষ। কিন্তু পুলিশ এমন সব অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দাখিল করেছিল যে, তার ভণিতা ধোপে টেকেনি। এমনকী জেলের পাদ্রির কাছেও সে তার অপরাধ কবুল করেনি। খ্রিস্টান ধর্মে মৃত্যুপথযাত্রীদের কনফেশানের অর্থাৎ স্বীকারোক্তির যে রীতি আছে, সেই সূত্রেই পাদ্রি সাহেব তাকে কনফেশানের জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু কোনো ফলই হয়নি। কনফেশান ছাড়া মৃত্যু হলে তাকে নরকে পচতে হবে, পাদ্রির এই সতর্কবাণীতেও কোনো কাজ হয়নি।

চৈত্র মাসের এক ভোর রাতে ম্যাথুসের ফাঁসি হয়ে গেল। ডাঃ পিল্লাইকে কর্তব্যের খাতিরে বধ্যভূমিতে হাজির থাকতে হয়েছিল। মৃতদেহ মাটিতে নামানোর পর তিনি পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হলেন যে মেরুদণ্ড ও ঘাড় যেখানে মিশছে, সেই হাড় ভেঙে গেছে এবং মৃত্যু ঘটেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

শবব্যবচ্ছেদের কোনো প্রয়োজনই ছিল না, কিন্তু নিয়মানুযায়ী ডাঃ পিল্লাইকে তাও করতে হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিচিত্র অনুভূতিতে তার সব ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। তাঁর মনে হল, কেউ যেন তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। চমকে পাশ ফিরে কাউকে কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন না। একটা অস্বস্তিতে তাঁর মন ভরে গেল। হঠাৎ তাঁর মনে হল যার শবব্যবচ্ছেদ করছেন, সে যেন মারা যায়নি। কিন্তু সেটা যে তাঁর মনের ভুল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণই ছিল না। ফাঁসির ঘণ্টাখানেক পর তিনি মর্গে দেহটা কাটা—ছেঁড়া করছেন, সুতরাং এমন মনের ভুল কেন যে তাঁর হল তা ঠিক তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

আরও একটা ঘটনা ঘটল। জেলের ওয়ার্ডারদের একজন এসে ডাঃ পিল্লাইকে জিজ্ঞেস করল, যে দড়ি দিয়ে ম্যাথুসকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, সেটা ভুল করে মৃতদেহের সঙ্গে মর্গে চলে এসেছে কিনা। ওটা নাকি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, একেবারে উধাও হয়ে গেছে। ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। যে দড়ি জহ্লাদের হাতে মরণ—খেলায় মেতে ওঠে, সেটা যে কারও দরকার হতে পারে তা ভাবাই যায় না। পারতপক্ষে ও—দড়ি সবাই সযত্নে পরিহার করে চলে, স্পর্শ করার লোভ নিশ্চয়ই কারও হয় না। যা হোক, ওটা কিন্তু সত্যিই পাওয়া গেল না।

ডাঃ পিল্লাই বিয়ে—থা করেননি। জেলখানার কাছেই তাঁর কোয়ার্টার। বাড়ির কাজকর্ম, রান্নাবান্না সবকিছুর ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর কমবাইন্ড হ্যান্ড যোশেফের ওপর। লোকটি শুধু কাজেরই নয়, রান্নার হাতও তার চমৎকার। ডাঃ পিল্লাই যা মাইনে পান, তাতে একা মানুষ তাঁর সচ্ছন্দে চলে যায়।

জেলের ডাক্তারের চাকরিটা তিনি নিয়েছিলেন বিশেষ একটা কারণে। সেটা হল ডাক্তারি পড়ার সময়েই তাঁর মনের মধ্যে একটা শখ বা খেয়াল দানা বাঁধতে শুরু করেছিল—অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা। জেলের ডাক্তারের চাকরিতে এ বিষয়ে গবেষণা করার ঢালাও সুযোগের কথা ভেবেই তিনি এ পথে এসেছিলেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যে বিশ্বাস তাঁর মনে শেকড় গেঁথে বসেছিল, তা হল অধিকাংশ অপরাধ বা পাপকর্ম তলিয়ে দেখলে এটাই প্রমাণিত হবে যে মস্তিষ্কের একটা অস্বাভাবিকতা অথবা বুভুক্ষা থেকেই এদের জন্ম। যেমন চৌর্যবৃত্তি—তাঁর মতে শুধু অভাব থেকেই এ প্রবৃত্তি মানুষের আসে না, এর সঙ্গে মস্তিষ্কের এক ধরনের জটিল অসুখেরও যোগাযোগ আছে, নতুবা অভাবী সবাই চোর হত। আবার এমন অনেক ধরনের অপরাধ আছে যা দৈহিক প্রয়োজনের তালিকায় পড়ে না, খেয়ালের বশে মানুষ এ ধরনের অপরাধের দাস হয়ে পড়ে, অনেকটা নেশাগ্রস্তের মতো। এ বিষয়ে তিনি একটি বই লিখেছেন এবং তার বিষয়বস্তু গুণীজনের কাছে যথেষ্ট সমাদরও লাভ করেছে।

তবে অপরাধের যে দিকটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল তা হল মানুষের হিংস্র হয়ে ওঠা এবং হত্যা করার দুর্গম স্পৃহা। বাড়ি ফেরার পথে, সকালে যে খুনি আসামির শেষ সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন, তার কথাই মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। জঘন্য অপরাধ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ম্যাথুসের টাকার প্রয়োজন

এমন স্তরে এসে পৌঁছয়নি, যার জন্য খুন করা ছাড়া তার উপায় ছিল না। খুনের এই অস্বাভাবিকতার জন্য খুনিকে তিনি অপরাধী না ভেবে উন্মাদের পর্যায়ে ফেলাই সংগত মনে করছিলেন। যতদূর জানা যায় লোকটি শান্ত এবং অমায়িক প্রকৃতির ছিল, স্বামী হিসেবেও তার সুনাম ছিল আর পরিচয় ছিল একজন মিশুক প্রতিবেশী হিসাবে। কিন্তু সেই লোকটিই এমন এক নৃশংস অপরাধ করে বসল, যা সে ঠান্ডা মাথায় করেই থাকুক কিংবা উন্মাদনার জন্যই করে থাকুক, তার জন্য সমাজ তাকে কখনো ক্ষমা করবে না। এমন ঘৃণা কাজ যে করে তার এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকারও অধিকার নেই।

কিন্তু একটা কথা ডাঃ পিল্লাই কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না। লোকটা অপরাধ স্বীকার করল না কেন? সে যে হত্যার অপরাধে অপরাধী সে বিষয়ে সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। তবু শেষপর্যন্ত, এমনকী বধ্যভূমিতে যাবার মুহূর্তেও সে যে কেন অপরাধ স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল না, তা তার কাছে হেঁয়ালি বলেই মনে হল।

রাত্রে খাওয়া—দাওয়ার পর তিনি তাঁর পড়বার ঘরে এসে বসলেন। ঘরটিতে আলমারি ঠাসা বই। আজ কেন যেন কিছু পড়তে তাঁর মন বসছিল না। ঘুরে—ফিরেই ম্যাথুসের কথা তাঁর মনে পড়ছিল, আর মনে পড়ছিল মর্গে সেই বিচিত্র অনুভূতির কথা। যেন তাঁর পাশে কেউ এসে দাঁড়িয়েছিল। ম্যাথুস মারা যায়নি, এ অনুভূতিই বা কেন হয়েছিল তাঁর? তবে কি ম্যাথুসের অতৃপ্ত আত্মার উপস্থিতিই তিনি অনুভব করেছিলেন? ঘরের ভেতর এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়ায় তাঁর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। উদ্ভট কল্পনা ভেবে চিন্তাটাকে তিনি জোর করে মন থেকে দূর করতে চাইলেন।

এ অনুভূতি কিন্তু তাঁর আগেও হয়েছিল। আকস্মিক ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে—এমন সব মানুষের শবব্যবচ্ছেদের সময় তিনি অদেহী কারও উপস্থিতি অনুভব করে অসহায় বোধ করেছিলেন। আত্মার বিনাশ নেই এ মতবাদে তিনি বিশ্বাসী, জন্মান্তরবাদও তিনি বিশ্বাস করেন। হয়তো দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নেয় না, হয়তো আরও কিছুকাল সে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। ডাঃ পিল্লাই অবসর সময় দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদের সংকীর্ণ সীমারেখা নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন। বিদেহী আত্মা যে জীবিত মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম, সেকথা ডাঃ পিল্লাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

তাঁর গভীর চিন্তায় বাধা পড়ল। পাশেই ছোটো একটা গোল টেবিলের ওপর টেলিফোনটা ছিল। ওটা হঠাৎ বেজে উঠল। কিন্তু সাধারণ যেমন ভাবে ক্রিং ক্রিং করে বাজে তেমন ভাবে নয়, অনেকটা অস্পষ্ট মৃদু ভাবে। যেন টেলিফোনে কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে। তবে ওটা যে বাজছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডাঃ পিল্লাই হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানে তুললেন। মাউথপীসে মুখ লাগিয়ে তিনি বললেন, 'ডাঃ পিল্লাই বলছি, আপনি কে?'

উত্তরে একটা ফিসফিস শব্দ তাঁর কানে এল, কথা কিছুই বোঝা গেল না।

আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না। তিনি বললেন।

আবার সেই ফিসফিস ধ্বনি। তারপর সব চুপচাপ।

ডাঃ পিল্লাই মিনিটখানেক রিসিভারটা কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন তিনি সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছেন। যখন বুঝলেন ওপাশ থেকে আর কোনো সাড়াশব্দই আসছে না তখন তিনি এক্সচেঞ্জকে ফোন করলেন। নিজের নম্বরটা জানিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এক্ষুনি কেউ আমাকে ফোন করেছিল; কোন নাম্বার থেকে বলতে পারেন?'

সামান্য স্তব্ধতার পর তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব পেলেন। ওটা করা হয়েছিল জেলখানা থেকে। তিনি ওই নাম্বারে ডায়াল করলেন।

'আমাকে কে এইমাত্র ফোন করেছিল?' তিনি বললেন, 'আমি ডাক্তার পিল্লাই বলছি; একটা কথাও আমি শুনতে পাইনি।'

পরিষ্কার কণ্ঠে জবাব এল : 'আপনার বোধ হয় ভুল হয়েছে ডাগদার সাব, আমরা কেউ আপনাকে ফোন করিনি।

'কিন্তু এক্সচেঞ্জ যে বলল জেলখানা থেকেই ফোন করা হয়েছে!'

'এক্সচেঞ্জ নিশ্চয়ই ভুল করেছে।' জবাব ভেসে এল।

'আশ্চর্য! কে কথা বলছ?...ওয়ার্ডার রামানুজম, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সাব।'

'আচ্ছা, রেখে দিলাম।

ডাঃ পিল্লাই আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিলেন। ঘুরে—ফিরে টেলিফোনের অদ্ভুত ব্যাপারটা তাঁর মনে খটকার সৃষ্টি করতে লাগল। ভুল করে অনেকবারই তাঁর টেলিফোনে বেজে উঠেছে, কিন্তু অত মৃদুভাবে কখনো বাজেনি, অমন চাপা দুর্বোধ্য গলায় কেউ কথাও বলেনি। ব্যাপারটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। নিজের অজান্তেই তিনি সারা ঘরে পায়চারি শুরু করলেন। একটা ক্ষীণ সন্দেহ, একটা অদ্ভুত চিন্তা তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

'কিন্তু তা অসম্ভব!' আপন মনেই বলে উঠলেন তিনি।

পরদিন সকালবেলা যথারীতি তিনি জেলখানায় গেলেন। আশ্চর্য, অদৃশ্য কারও উপস্থিতি আবার তাঁর মনে চাড়া দিয়ে উঠল। কেন যেন তাঁর মনে হতে লাগল গতকাল যার ফাঁসি হয়েছে, সে—ই তাঁর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেলখানার অঙ্গনে সেই অনুভূতিটা প্রবল হল, যখন তিনি ফাঁসির আসামিকে যে কুঠুরিতে রাখা হয় তার দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অনুভূতিটা ক্রমে এতই প্রবল হয়ে উঠল যে ওই কুঠুরির মধ্যে যার উপস্থিতি তিনি অনুভব করছিলেন তার দেখা পেলেও হয়তো তিনি বিস্মিত হতেন না। দরজাটা পেরিয়ে, সরু বারান্দার মতো পথের শেষপ্রান্তে পৌঁছে সত্যিই তিনি ঘাড় ফেরালেন—যেন ওকে দেখবেন আশা করেছিলেন। সমস্তক্ষণ একটা দারুণ আতঙ্ক তাঁর বুকে পাষাণভারের মতো চেপে বসেছিল—এই অদৃশ্য উপস্থিতি তাঁকে বিচলিত করে তুলল। হতভাগ্য সেই আত্মা যেন কিছু বলতে চায়, এটা তিনি মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করলেন। সমস্ত ব্যাপারটা যে কাল্পনিক, তাঁর উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট চিন্তার পরিমাণ, একথা কিন্তু একবারও তাঁর মনে হল না। হ্যাঁ, ম্যাথুসের আত্মা জেলখানার মধ্যেই আটকা পড়েছে।

হাসপাতালে ঘণ্টা দুয়েক কাজের মধ্যে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন। সর্বক্ষণ কিন্তু একটা অদৃশ্য কিছুর উপস্থিতি তিনি অনুভব করছিলেন তবে হাসপাতালে তার প্রভাবটা অত নয়, যতটা জেলখানার মধ্যে। জেলখানার কাজ সেরে ফেরার আগে তাঁর ধারণাটা যাচাই করার উদ্দেশ্যে তিনি বধ্যভূমির ছাউনিতে উঁকি মারলেন। পরমুহূর্তে বধ্যভূমিতে প্রবেশের দরজাটা এক হ্যাঁচকা টানে বন্ধ করে তিনি সরে এলেন। তাঁর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। ফাঁসির মঞ্চে কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা আর দু—হাত বাঁধা ঝুলন্ত এক মূর্তি অস্পষ্ট দেখতে পেলেন। অস্পষ্ট হলেও চোখের ভুল তাঁর হয়নি।

ডাঃ পিল্লাইকে অনায়াসে একজন সাহসী পুরুষই বলা চলে। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিলেন। ক্ষণিকের এই আতঙ্কের জন্য তিনি মনে মনে লজ্জাই বোধ করলেন। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করলেন, আকস্মিক স্নায়বিক চমকই তাঁর মনের এই অবস্থার কারণ। আত্মা এবং আধিভৌতিক ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বধ্যভূমিতে দ্বিতীয়বার উঁকি মারার সাহস কিন্তু আর হল না। মনের জোর যেন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। হতভাগ্য ম্যাথুসের আত্মা যদি তাঁকে কিছু বলতে কিংবা কোনো ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, তবে দূর থেকেই সেটা ঘটুক তাই তিনি মনেপ্রাণে চাইলেন। তাঁর মনে হল ওটার গতিবিধি যেন অনেকটা সীমিত। জেলখানার অঙ্গন, যে কুঠুরিতে ফাঁসির আসামিকে রাখা হয় এবং বধ্যভূমি ঘিরেই ওটা ঘোরাফেরা করছে। অবশ্য ওটা তাঁর অনুমান।

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় তিনি তাঁর অফিস ঘরে ফিরে এসে গত রাত্রে যে ওয়ার্ডার টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল, তাকে ডেকে পাঠালেন।

'কাল রাতে আমি তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার আগে কেউ আমাকে ফোন করেনি বলেছিলে তোমার ভুল হয়নি তো?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

ডাঃ পিল্লাই লক্ষ্য করলেন লোকটি সামান্য ইতস্তত করল।

'না', লোকটি জবাব দিল, 'আপনি ফোন করার আধঘণ্টা আগে থেকেই আমি টেলিফোনের পাশে বসেছিলাম। কেউ ফোন করলে আমি দেখতে পেতাম।'

'তুমি তবে কাউকে দেখনি?' ডাঃ পিল্লাই এবার একটু জোর দিয়েই কথাটা বললেন।

লোকটির হাবভাবে একটা অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল।

'না ডাগদার সাব, আমি কাউকে দেখিনি।' সে যেন ইচ্ছে করেই একটু জোর দিয়ে জবাব দিল।

ডাঃ পিল্লাই তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

'কিন্তু তোমার হয়তো মনে হয়েছিল ঘরে কেউ আছে?' অনেকটা নিরাসক্ত ভাবেই তিনি এবার প্রশ্ন করলেন।

ওয়ার্ডার রামানুজম এবার যেন থতমত খেল। তার মনের মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে তা বুঝতে অভিজ্ঞ ডাক্তার পিল্লাইয়ের দেরি হল না।

'আপনি হয়তো ভাববেন আমার তন্দ্রা এসেছিল কিংবা আমি এমন কিছু খেয়েছিলাম যা আমার সহ্য হয়নি...'

ডাঃ পিল্লাইয়ের নিরাসক্ত ভাবটা মুহূর্তে কেটে গেল। ওয়ার্ডারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'ওসব কিছুই আমি ভাবব না, বরং তুমিই বলতে পার রাত্রের খাওয়া—দাওয়ার পর আমি যখন বসেছিলাম তখন আমার ঝিমুনি এসেছিল তাই টেলিফোন বাজার শব্দটা আমি স্বপ্নের ঘোরেই শুনেছিলাম।' ওয়ার্ডারকে আশ্বস্ত করার জন্যই তিনি কথাগুলো বললেন। 'আরও একটা কথা, টেলিফোনটা কিন্তু যেমন বাজা উচিত তেমন বাজেনি। আমি ওটার পাশেই বসেছিলাম তবু কোনোমতে ক্রিং ক্রিং শব্দটা আমার কানে এসেছিল। রিসিভার কানে লাগিয়ে আমি শুধু কার যেন ফিসফিসানি শুনেছিলাম, কিন্তু তুমি যখন কথা বলেছিলে তা স্পষ্ট এবং জোরেই শুনেছিলাম। আমার বিশ্বাস একটা কিছু—মানে কেউ টেলিফোনের এধারে ছিল। তুমিও সে সময় ঘরে ছিলে, কিন্তু কাউকে না দেখলেও কারও উপস্থিতি তুমি অনুভব করেছিলে, তাই না?'

লোকটি একবার সায় দিয়ে ঘাড় দোলাল।

'ডাগদার সাব, আমি ভীতু নই,' সে বলল, 'তা ছাড়া আজগুবি কল্পনা আমার মাথায় আসে না। কিন্তু তবু বলব, ঘরে অদৃশ্য কিছু একটা ছিল। ওটা যেন টেলিফোনের চারপাশেই ঘোরাফেরা করছিল। এমন নয় যে, বাতাসের শব্দে আমার মনের ভুল হয়েছিল, কারণ কাল রাতে বাতাস ছিল না বললেই চলে। ওটা নিশ্চয়ই টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা ওলটাচ্ছিল। বাতাস ছাড়াই যেভাবে একটার পর একটা পাতা খসখস আওয়াজ করে উলটে যাচ্ছিল, তাতেই আমার ও কথা মনে হয়েছিল। যেন কারও টেলিফোন নাম্বার খুঁজছে। আমার খুব কাছে ওটার উপস্থিতি আমি অনুভব করেছিলাম, বিশ্বাস করুন স্যার, আমার গায়েই শুধু কাঁটা দেয়নি, মাথার চুলও খাড়া হয়ে গিয়েছিল। আর...আর...ওটা যখন আমার পাশে এসেছিল, তখন কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডায় আমি কেঁপে উঠেছিলাম।'

ডাঃ পিল্লাই রামানুজমের মুখের দিকে সরাসরি তাকালেন। 'তোমার কি কারও কথা মনে হয়েছিল?' আচমকা তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

লোকটি আবার ইতস্তত করল। তারপর জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সাব, কাল যার ফাঁসি হয়েছিল, তার কথা...'

ডাঃ পিল্লাই সমর্থনসূচকভাবে ঘাড় দোলালেন। 'ব্যাপারটা তাই।' তিনি অনেকটা যেন আপন মনেই বলে উঠলেন। ওয়ার্ডারের দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ রাতেও কি অফিস ঘরে তোমার ডিউটি আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সাব।' লোকটির সর্বাঙ্গ একটা অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠল।

'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি।' ডাঃ পিল্লাই তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কাল আমারও তোমার মতোই অবস্থা হয়েছিল। ওটা যাই হোক না কেন, মনে হচ্ছে যেন আমাকে কিছু বলতে চায়। ভালো কথা, কাল রাতে জেলখানায় কোনো গোলমাল হয়নি তো?'

'হ্যাঁ, হয়েছিল। কম করেও দশ—বারোজন কয়েদি ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচামেচি করে উঠেছিল। তবে কারো ফাঁসি হবার পর প্রথম দু—একটা রাত এমন হয়। আমি আগেও এমন হতে দেখেছি, তবে কাল রাতে যেন একটু বাড়াবাড়িই হয়েছিল।'

'হুঁ। আচ্ছা, ওটা—মানে, অদৃশ্য ওই বস্তুটা যদি আজও টেলিফোনের কাছে আসতে চায়, তবে ওটাকে সে—সুযোগ দিও। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, ওটা কাল যে সময় এসেছিল, আজও সেই সময়ে আসবে। তুমি বরং এক কাজ কর—ওই সময়টা, ধর, রাত সাড়ে ন—টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত ঘরের বাইরে থাক। আমি আমার বাড়িতে টেলিফোনের পাশেই থাকব। যদি ওই সময়ের মধ্যে এখান থেকে আমি কোনো ফোন পাই, তবে তা সেরে আমি তোমাকে ফোন করে জেনে নেব, সত্যিই কেউ আমাকে ফোন করেছিল কিনা। বুঝতে পেরেছ?'

'আজ্ঞে, কোনো বিপদ ঘটবে না তো?'

'আমার বিশ্বাস, সে ভয় করার কারণ নেই।' ডাঃ পিল্লাই অভয় দিয়ে বললেন। পরক্ষণেই বধ্যভূমিতে তাঁর আতঙ্কের হেতু মনে পড়তেই তিনি কেঁপে উঠলেন। সুখের বিষয় ওয়ার্ডার অন্য দিকে তাকিয়েছিল, তাই কিছু লক্ষ্য করল না।

রাত সাড়ে ন—টার সময় তিনি পড়বার ঘরে একা বসেছিলেন—বসেছিলেন বললে ভুল হবে, যেন কিছু একটা ঘটবে, তারই প্রতীক্ষা করছিলেন। খানিক আগেই তিনি রাতের খাওয়া সেরেছেন।

পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক পড়াশোনা করে তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, মুক্তি পায়নি এমন আত্মা একটা নির্দিষ্ট সময়েই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়—তার হেরফের বড়ো একটা হয় না। বিশেষ করে সেই আত্মা যদি মানুষের সাহায্যপ্রার্থী হয়, যেমন হয়েছে এ ব্যাপারে। ম্যাথুসের আত্মা যে একটা যন্ত্রণায় ভুগছে, এবং সেই বিষয়ে তাঁকে কিছু বলতে চায়, তা তিনি অনুভব করছিলেন। মৃত্যুর পর কিছুদিন, পৃথিবীতে বিচরণশীল এ—সব অতৃপ্ত কিংবা মুক্তি না—পাওয়া আত্মার নিজের রূপ প্রকাশের অর্থাৎ দেখা দেবার এবং মানুষকে তার ইচ্ছে জানাবার ক্ষমতা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। তারপর যতই ওটা পৃথিবী থেকে ওপরে উঠতে থাকে, ওই ক্ষমতাও কমে আসে। তবে দেহ থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম দু—একদিন ওটা দুর্বল থাকে, কারণ নতুন অবস্থা ও নতুন পরিবেশ মানিয়ে নিতে ওটার দিন কয়েক সময় লাগে। তাই ডাঃ পিল্লাইয়ের ধারণা হয়েছিল, আজও হয়তো তিনি টেলিফোনে স্পষ্ট কিছু শুনতে পাবেন না, যদিও গতকালের মতো অত অস্পষ্ট হবে না। ঠিক তখুনি টেলিফোনটা বেজে উঠল। গত রাতের মতো অত ক্ষীণ নয়, কিন্তু তবু সাধারণ যেভাবে বাজে, অত জোরেও নয়।

ডাঃ পিল্লাই প্রায় লাফিয়ে উঠে রিসিভারটা কানে তুলে ধরলেন, আর তখুনি একটা চাপা কান্নার ফোঁপানি তার কানে ভেসে এল। কান্নার অদম্য দমকে যে কাঁদছে, তার বুক যেন ফেটে যাচ্ছে।

ডাঃ পিল্লাই যেন বোবা হয়ে গেছেন। একটা হিমশীতল পরশ তিনি বুকের ভেতর অনুভব করছেন। কিন্তু তবু সেই কান্নার মধ্যে যে একটা করুণ আবেদন ছিল, তা তাকে বিচলিত করে তুলল। যে কাঁদছে, সে যেই হোক না কেন, তাকে সাহায্য করার জন্য তার সেবার্ত মন উন্মুখ হয়ে উঠল।

'কে, কে তুমি?' নিজের গলার স্বরই তাঁর কাছে বিকৃত শোনাল। 'আমি ডাঃ পিল্লাই কথা বলছি। বল, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?'

আস্তে আস্তে কান্নার শব্দটা মিলিয়ে গেল। যেন যে কাঁদছিল, সে অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিল। তারপরই ফিসফিস করে বলা কথাগুলো ডাঃ পিল্লাইয়ের কানে ভেসে এল।

'ডাক্তার সাহেব, আমি বলতে চাই...আমি বলতে চাই...আমাকে বলতেই হবে...'

'কি বলতে চাও, বল আমাকে।' ডাঃ পিল্লাই একটু একটু করে যেন সাহস ফিরে পাচ্ছেন।

'না, না, আপনাকে নয়...যিনি আমার কাছে আসতেন, তাঁকে বলতে চাই। আপনাকে যা বলছি, তা যদি তাঁকে একবারটি বলেন। আমি কিছুতেই আমার কথা তাঁকে শোনাতে পারছি না।'

'কে তুমি?' ডাঃ পিল্লাই হঠাৎ প্রশ্ন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল না। তারপরই ফিসফিস করে যে কথা বলছিল, সে বলল, 'আপনি তো জানেন, আমি কে। আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। জেলখানা ছেড়ে আমি বেরোতে পারছি না...বড়ো কষ্ট হচ্ছে।...আপনি ওই ভদ্রলোককে আপনার বাড়িতে ডেকে পাঠাবেন? আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই!'

'তুমি কি পাদ্রি সাহেবের কথা বলছ?' ডাঃ শুধোলেন।

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। কাল যখন আমাকে জেলখানার উঠোন দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি আমার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করছিলেন। তাঁর কাছে বলতে পারলে, আমার আর এত কষ্ট হবে না। বলবেন তাঁকে আপনি?'

ডাঃ পিল্লাই মুহূর্তকালের জন্য ইতস্তত করলেন। কারাগারের পাদ্রি, ফাদার ডি—সুজার কাছে কী তিনি বলবেন? গতকাল যে খুনি আসামির ফাঁসি হয়েছে, সে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়, এই! ফাদার ডি—সুজা কি ভাববেন না, ডাক্তারেরই মাথার চিকিচ্ছের দরকার। কিন্তু টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ম্যাথুসের আত্মাই যে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহই নেই। ওর যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, সেটা তিনি মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করলেন। ও যে ফাদার ডি—সুজার কাছে কী বলতে চায় ডাঃ পিল্লাইয়ের মতো বুদ্ধিমান লোকের তা বুঝতে দেরি হল না।

'বেশ, আমি তাঁকে আসতে বলব।' শেষপর্যন্ত কথাটা যেন তাঁর মুখ ফসকেই বেরিয়ে গেল।

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আপনি তাঁকে নিশ্চয়ই আনবেন।'

কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

'আগামী কাল রাত্রেই আনা চাই।' কণ্ঠস্বর বলল, 'আমি আর বেশিক্ষণ কথা বলতে পারছি না। আমাকে আবার সেটা দেখতে যেতে হবে—হায় ভগবান।'

নতুন করে ফোঁপানির শব্দ আবার ভেসে এল, কিন্তু ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

একটা প্রচণ্ড ভয় অথচ ঔৎসুক্য ডাঃ পিল্লাইকে যেন ঘিরে ধরল।

'কী দেখতে যেতে হবে?' তিনি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। 'তোমার কী ঘটছে একটু বল আমায়।'

'না...না, তা আমি বলতে পারব না...' কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। ডাঃ পিল্লাই রিসিভারটা কানে লাগিয়ে তবু দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু আর কোনো কথা ভেসে এল না। তিনি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন আর তখুনি অনুভব করলেন, তাঁর সমস্ত শরীর ঘামে যেন নেয়ে উঠেছে—কপালে যে ঘাম জমেছে, তা কেমন যেন শীতের সকালের শিশির বিন্দুর মতো ঠান্ডা। তাঁর বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা যেন লাফাচ্ছে। নিজেকে সামলাবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি চেয়ারে বসে পড়লেন। একবার মনে হল, কেউ বোধ হয় তাঁর সঙ্গে সাংঘাতিক রসিকতা করেছে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন, তা নয়। কৃতকর্মের জন্য একটা অনুতপ্ত আত্মা যে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে এই শহরের বুকে তাঁর কোয়ার্টারের আরামদায়ক কক্ষে এইমাত্র তিনি ম্যাথুসের আত্মার সঙ্গে কথা বললেন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

কিন্তু এ নিয়ে বেশি ভাববার সময় ছিল না। তিনি রিসিভারটা আবার তুলে ধরে জেলখানায় ফোন করলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ওপাশ থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেলেন।

'ওয়ার্ডার রামানুজম?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর এল : 'হ্যাঁ, ডাগদার সাব।'

'কিছু দেখেছ তুমি?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। ও এসেছিল। আমি ওকে টেলিফোনের ঘরে যেতে দেখেছি...মানে ছায়ামতো কী যেন ঘরে ঢুকেছিল।'

'তুমি কি ওর সঙ্গে কথা বলেছ?'

'আজ্ঞে না, আমি ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম সাব, শুধু ভগবানকে ডেকেছি। কয়েদিদের মধ্যে একটা চেঁচামেচি উঠেছিল, এখন আবার ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ও ফাঁসির ছাউনির দিকে গেছে।'

'তোমার অনুমান বোধ হয় মিথ্যে নয়। আজ আর কিছু ঘটবে বলে আমার মনে হয় না।'

সেই রাতেই ফাদার ডি—সুজাকে পরের দিন নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি একটা চিঠি লিখলেন। ফাদার যেন অবশ্যই আসেন, খুব জরুরি একটা ব্যাপারে তিনি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চান—একথা লিখতেও ভুললেন না।

পরের দিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ফাদার ডি—সুজা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। খাবার ঘরটা ডাক্তারের পড়ার ঘরের ঠিক পাশেই। ডাঃ পিল্লাইয়ের নির্দেশে যোশেফ ভালো ভালো রান্না করেছিল। খাওয়া শেষ হলে যোশেফ টেবিল পরিষ্কার করে দু—পেয়ালা কফি দিয়ে গেল। একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে ডাঃ পিল্লাই বললেন, 'আপনাকে যে কথা বলার জন্য আজ কষ্ট দিয়েছি, তা শোনার পর দয়া করে আমাকে পাগল ভাববেন না, এই আমার অনুরোধ।'

ফাদার ডি—সুজা হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, সে অঙ্গীকার আমি অনায়াসে করতে পারি।'

'ভালো। গতকাল এবং পরও রাতে দু—দিন আগে যার ফাঁসি হয়েছিল, সেই ম্যাথুসের আত্মার সঙ্গে আমি টেলিফোনে কথা বলেছি।'

ডি—সুজা হাসলেন না। তিনি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

'ডাক্তার পিল্লাই,' তিনি রীতিমতো অভিযোগের কণ্ঠেই বললেন, 'আমি আপনার আতিথেয়তার অমর্যাদা করতে চাই নে। কাল রাতে ও আমাকে অনুরোধ করেছিল আপনাকে এখানে আনার জন্য ও আপনাকে কিছু বলতে চায়।'

'আমি আপনার কথা শুনতে চাই না,' ফাদার ডি—সুজার কণ্ঠস্বর থেকে যেন ভর্ৎসনা ঝরে পড়ল : 'মৃতেরা কখনোই ফিরে আসে না। মৃত্যুর পর কী অবস্থায় তারা থাকে তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু পার্থিব সব সম্পর্ক যে তাদের চুকে যায় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।'

'কিন্তু আমার কথা এখনো শেষ হয়নি ফাদার,' ডাক্তার বললেন, 'দু—রাত আগে আমার টেলিফোনটা খুব আস্তে আস্তে বেজে উঠেছিল, ফিসফিস করে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। আমি এক্সচেঞ্জকে তারপরেই ফোন করে জানতে পারি কলটা এসেছিল জেলখানা থেকে। আমি ওখানে টেলিফোন করি। ওয়ার্ডার রামানুজম আমাকে জানায় জেলখানা থেকে কেউ আমাকে ফোন করেনি। তবে কেউ যে টেলিফোনের ঘরে এসেছিল, এ অনুভূতি ওর হয়েছিল।'

'লোকটা বোধ হয় খুব নেশা করে!' ফাদার ডি—সুজা তীব্র কণ্ঠে বললেন।

'আপনি ওর ওপর অবিচার করছেন ফাদার ডি—সুজা,' ডাঃ পিল্লাই এবার আহত কণ্ঠে বললেন, 'ওয়ার্ডারদের মধ্যে ও লোকটাই সবচেয়ে বিশ্বাসী, কোনো রকম নেশা করে না। আর তাই যদি হয়, তবে আমিও ওই অপবাদ থেকে বাদ পড়ি না, তাই না?'

ফাদার ডি—সুজা আবার বললেন। 'আমাকে ক্ষমা করবেন।' তিনি এবার গলা নরম করে বললেন, 'কিন্তু এ নিয়ে আমি আলোচনা করতে প্রস্তুত নই। তা ছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাই যে একটা রসিকতা নয়, তা কী করে বুঝলেন?'

'রসিকতাটা করবে কে?' ডাক্তার প্রতিবাদ করে উঠলেন, তারপরই বললেন, 'ওই শুনুন।'
পাশের ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠল, ডাঃ পিল্লাই স্পষ্ট শুনতে পেলেন।
'শুনতে পাচ্ছেন?' তিনি ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।
'কী শুনতে পাচ্ছি?'
'টেলিফোনটা বাজছে।'
'না।' ফাদার ডি—সুজা একটু রাগত কণ্ঠেই জবাব দিলেন, 'টেলিফোন বাজার কোনো শব্দই আমি শুনতে পাচ্ছি না।'
ডাঃ পিল্লাই কথা না বাড়িয়ে পাশের ঘরে গিয়ে রিসিভারটা কানে তুলে ধরলেন। মাউথপীসে মুখ লাগিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যালো।' তাঁর অজান্তেই গতকালের মতো গলাটা তাঁর আজও কেঁপে গেল। 'কে কথা বলছ?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফাদার ডি—সুজা এসেছেন।...আচ্ছা, আমি তাঁকে কথা বলতে অনুরোধ করছি।'
তিনি খাবার ঘরে ফিরে গেলেন।
'ফাদার ডি—সুজা,' তিনি আবেদন—করুণ কণ্ঠে বললেন, 'একজনের আত্মা যন্ত্রণা পাচ্ছে, আপনি দয়া করে ও কী বলতে চায় শুনুন। আমি ভগবানের নামে আপনার কাছে অনুরোধ করছি।'
ফাদার ডি—সুজা মুহূর্তকাল ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, 'আপনার যা অভিরুচি।'
ডাঃ পিল্লাই তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে হুক থেকে নামিয়ে রাখা টেলিফোনের যন্ত্রটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ফাদার ডি—সুজা রিসিভার কানে লাগিয়ে বললেন, 'আমি ফাদার ডি—সুজা কথা বলছি।'
তিনি অপেক্ষা করলেন।
'আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।' শেষপর্যন্ত তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, এবার যেন কিছু শোনা যাচ্ছে। কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে।'
'একটু চেষ্টা করুন, শুনতে পাবেন।' ডাঃ পিল্লাই উৎসাহ দিয়ে বললেন।
ফাদার ডি—সুজা আবার শোনবার চেষ্টা করলেন।
হঠাৎ রিসিভারটা কান থেকে নামিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'কে যেন বলল, 'আমি খুন করেছি, আমি স্বীকার করছি...ক্ষমা ভিক্ষা করছি আমি।' এ নিশ্চয়ই রসিকতা ডাঃ পিল্লাই। আপনি যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে একটু বেশি মাত্রায় উৎসুক, তা জেনেই হয়তো কেউ আপনার সঙ্গে রসিকতা করছে। আমি এ বিশ্বাস করি নে।'
ডাঃ পিল্লাই রিসিভারটা নিজের হাতে নিলেন। 'হ্যালো, আমি ডাঃ পিল্লাই বলছি।' তিনি এক নিশ্বাসে বলে গেলেন, 'ফাদার ডি—সুজাকে এমন কোনো প্রমাণ দিতে পার যে, তুমিই কথা বলছ?'
ওপাশ থেকে উত্তরটা শুনে তিনি রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, 'ও বলছে, আপনাকে প্রমাণ দেবে। আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।'
আজকের রাতটাও বেশ গুমোট, একটা ভ্যাপসা গরম। ঘরের জানালাগুলো খোলাই ছিল, কিন্তু একটুও বাতাস আসছিল না। ডাঃ পিল্লাই আর ফাদার ডি—সুজা প্রায় পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছেন, কিন্তু কিছুই ঘটল না। ফাদার ডি—সুজা অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন : 'আমার মনে হয় আর অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'
তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই একটা হিমেল হাওয়া পাশের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে এক মুহূর্তে ভেতরকার আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে দিল। ভ্যাপসা গরম আর অনুভূত হচ্ছে না, বরং যেন শীত শীত করছে। ডাঃ পিল্লাই কেঁপে উঠলেন, খুব ঠান্ডা পড়লে যেমন মানুষ কাঁপে।
'কেমন ঠান্ডা হাওয়া, আপনি টের পাননি?' ফাদার ডি—সুজাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।
'হ্যাঁ, কেমন যেন শীতের মতো হাওয়া।' ফাদার ডি—সুজা সম্মতি জানিয়ে বললেন।

ঘরের মধ্যে হাওয়াটা আবার যেন জেগে উঠল, আর টেবিলের ওপর রাখা কয়েকটা কাগজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল।

'কিছু বুঝতে পারছেন?' ডাঃ পিল্লাই আবার বললেন, একটা আতঙ্ক তাঁকে যেন গ্রাস করতে চাইছে।

ফাদার ডি—সুজা নীরবে ঘাড় দোলালেন। তাঁর বুকের ভেতর যেন হাপর পড়তে শুরু করেছে। 'করুণাময় ঈশ্বর, শয়তানের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর।' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

'ঘরে কে যেন এসেছে!' ডাঃ পিল্লাই আতঙ্কে বলে উঠলেন।

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই, তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে মাত্র পাঁচ হাত দূরে একটা অস্পষ্ট মানুষের মূর্তি আকার নিতে লাগল। শূন্যে সেটা ঝুলছে, কাঁধের একদিকে মাথা হেলে থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। তারপরই ওটা দু—হাত দিয়ে নিজের মুখটা তুলে ধরল, সোজাসুজি তাকাল ঘরে যে দুজন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের দিকে। ওটার দু—চোখ আর জিভ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, গলার চারপাশে একটা গোল লাল দাগ। তারপরই মেঝের ওপর ধপ করে ভারী কিছু একটা পড়ার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু মিলিয়ে গেল, শুধু মেঝের ওপর পড়ে রইল একগাছা নতুন দড়ি।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনের মুখে কোনো ভাষা ফুটল না। ডাঃ পিল্লাইয়ের কপাল বেয়ে দরদর করে ঘামের স্রোত নামছিল, আর ফাদার ডি—সুজা অস্ফুট কণ্ঠে প্রার্থনা করছিলেন অসীম প্রচেষ্টায় ডাঃ পিল্লাই মনের সাহস ফিরিয়ে আনলেন। দড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন, ফাঁসির পর থেকে ওটা পাওয়া যাচ্ছিল না।'

টেলিফোনটা আবার মৃদু বেজে উঠল। এবার আর ফাদার ডি—সুজাকে কিছু বলতে হল না, তিনি তাড়াতাড়ি রিসিভারটা কানে তুলে কিছুক্ষণ কী যেন শুনলেন।

'ম্যাথুস', অনেকটা সংযত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'ভগবানের কাছে তোমার অপরাধের জন্য সত্যিই কি তুমি ক্ষমা ভিক্ষা করছ, সত্যিই কি তুমি অনুতপ্ত?'

ডাঃ পিল্লাই শুনতে না পেলেও বুঝতে পারলেন, ওপাশ থেকে কিছু একটা জবাব এল।

ফাদার ডি—সুজা রিসিভারটা কানে লাগিয়েই দু—হাঁটু মুড়ে, দু—চোখ মুদে প্রার্থনার ভঙ্গিতে যেন স্তব করতে লাগলেন। তারপর বলে উঠলেন, 'ঈশ্বর তোমার আত্মার মঙ্গল করুন।'

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 'আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন তিনি।

ডাঃ পিল্লাই ঘণ্টা বাজিয়ে যোশেফকে ডাকলেন। সে ঘরে ঢুকতেই তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই দড়িটা নিয়ে যাও...ওটা পুড়িয়ে ফেলো যোশেফ।'

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা।

'এ ঘরে তো কোনো দড়ি নেই সাহেব!' যোশেফ জবাব দিল।

ঘণ্টা

অদ্রীশ বর্ধন

হরিশকাকা বললেন—'বাড়িতে নিশ্চয় ভূত আছে।'

শুনে, পদ্মমাসি ছাড়া সবাই হেসে উঠল। পদ্মমাসি ভীতু মানুষ। শহুরে মেয়ে। ভূতপ্রেতের নাম শুনলেই তার গা ছমছম করে।

তবুও জোর করে হাসল মাসি। বলল—'আমার শোবার ঘরটাই নিশ্চয় ভূতের বসবার ঘর!'

হরিশকাকার চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললেন—'সত্যি কথা বলতে গেলে কিন্তু তাই। বাড়ির সেরা ঘরটাতেই ভূতের আসর বসে। তোমার ঘরটাও এ বাড়ির পয়লা নম্বর ঘর। কী হল? ঢোক গিলছ কেন? গলা শুকিয়ে গেছে? লেবুর শরবত দেব? চা?'

'আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি না।' ঝংকার দিল পদ্মমাসি।

হাসির অট্টরোলে হরিশকাকা কী বললেন, শোনা গেল না। পাড়াগাঁয়ে এই আমাদের প্রথম রাত্রিবাস। এসেছিলাম ভাইপোর বিয়েতে। বরকনে এখন কনেবাড়িতে। আমরা জনাদশেক এসেছি হরিশকাকার পৈতৃক ভিটেতে। সেকেলে জমিদারবাড়ি। তিনমহলা। এখন অবশ্য দেউড়িতে বট গজিয়েছে। জানলার খড়খড়ি হাওয়ায় নড়ে। ছাদের ফাটলে জল ঝরে দারুণ বর্ষায়! তাহলেও একটা রাত হইহই করে কাটিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

হরিশকাকার বাল্যবন্ধু ডাক্তার ননী চাটুয্যে বললেন—'নিশ্চয় ভূত আছে বললে কেন?'

'বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকলেই পাড়াগাঁয়ের ভূতরা সেখানে আড্ডা গাড়ে। কানাঘুষো সেইরকম শুনছিলাম মাসখানেক আগে কলকাতায়। মাঝখানে দিন তিনেক থেকেও ছিলাম। সিঁড়িতে খসখস আওয়াজ ছাড়া কিছু শুনিনি বা দেখিনি।'

'ভাঙা বাড়িতে খসখস আওয়াজ হাওয়া দিলেই শোনা যায়।' বলল নগেন দত্ত। সাংবাদিক। আমার বন্ধু।

'তা তো বটেই' বললেন হরিশখুড়ো। 'হাওয়া দিলে অনেক ভূতুড়ে আওয়াজ শোনা যায়। গাছের পাতা সরসর করে, জানালা খটখট করে, দরজা ক্যাঁচক্যাঁচ করে। ভূতের ওঝারা তখন খড়ি পেতে ভূত তাড়ায়। মানে, হাওয়া থামলেই আওয়াজ থামে।'

ননী চাটুয্যে বললেন—'মনে হচ্ছে ভূতে বিশ্বাস নেই?'

'আলবত আছে। নেই বলার মতো বুকের পাটা আমার নেই। তবে সব বাড়িতে থাকে না। সবার ভাগ্যে ভূতদর্শনও ঘটে না।'

আমি বললাম—'কাকা, আপনি কিন্তু ননীকাকার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলেন। এ বাড়িতে সত্যি সত্যিই ভূত আছে কিনা বললেন না।'

হরিশকাকা অপাঙ্গে পদ্মমাসির দিকে তাকালেন। মাসি কাঠ হয়ে বসে ছিল। বেশ বুঝলাম, ভয় পেয়েছে।

বললাম—'কি মাসি, ভূতের বসবার ঘরে শুতে মন চাইছে না?'

'তুই থাম' খ্যান খ্যান করে উঠল মাসি। 'ভূত থাকলে আমার কি? পারুল তো রইল। দোরগোড়ায় ও শোবে'খন; বলি ঘণ্টা—টণ্টা আছে?'

হরিশকাকা গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলেন—'ঘণ্টা কী হবে?'

'বাজাবো, বাজাবো। ভয় পেলেই ঘণ্টা বাজাবো। পারুলের ঘুম ভেঙে যাবে।'

আমি বললাম—'অত সাহসে দরকার কি মাসি? ঘরটা পালটে নিলেই তো হয়।'
কটমট করে পদ্মমাসি তাকাল আমার দিকে।
হরিশকাকা বললেন— 'সিন্দুক খুঁজলে আরতির বাড়তি ঘণ্টা দু—একটা পাওয়া যেতে পারে। আর কারও ঘণ্টা লাগবে নাকি?'
আবার হাসির হররা ছুটল। পদ্মমাসি গজ গজ করতে করতে পারুলকে নিয়ে ওপরে চলে গেল। হরিশকাকাও গেলেন। ফিরে এসে বললেন—'একটা ঘণ্টা দিয়ে এলাম।'
আমি বললাম—'মাসি কিন্তু বড্ড ভয় পেয়েছে।'
'স্বাভাবিক। এ বাড়িতে আগে কোনো উপদ্রব ছিল না। ইদানীং কানাঘুষো শুনছি।'
'সত্যি?'
'দোতলার যে ঘরে তোর মাসি শুয়েছে, ও ঘরটা আগে নাচঘর ছিল! এখন পালঙ্ক পাতা হয়েছে, যাতে অতিথি এসে রাত কাটতে পারে। মুশকিল হচ্ছে ওই পালঙ্ক নিয়েই।'
'কীরকম?'
'পালঙ্কটার পূর্ব ইতিহাস আমি জানি না। একতলার গুদোমে পড়েছিল। আমি দেখলাম, দামি কাঠ। পালিশ করল খোলতাই হবে! তাই করলাম। পালঙ্কের চেহারা ফিরে গেল! রাখলাম নাচঘরে। ওই ঘরটাই সব চাইতে বড়ো অতিথিঘর হল। মাস তিনেক আগে পাখি শিকার করতে আমার এক বন্ধু এল। ওই ঘরে ওই খাটে এক রাত কাটাল। পরের দিন সকালে ঘর পালটে অন্য ঘরে রইল।'
'কেন?'
'খাটটা নাকি মোটেই সুবিধের নয়। ঘুম হয় না।'
'অ।'
ননী চাটুয্যে বললেন—'জেনেশুনে তুমি ওকে ও ঘরে পাঠালে?'
'আমি তো ভয় দেখালাম। কিন্তু ওঁর জেদ চেপে গেলে কী করব? তা ছাড়া গোড়া থেকেই পারুল ওঁর জিনিসপত্র ওই ঘরে তুলেছে। এখন মালপত্র সরানোও ঝামেলা। আমি গোড়ায় জানলে ও ঘর ওঁকে দিতামই না।'
'এখন উপায়?'
'না, ভয়ের কিছু নেই। তোমরা আবার দু পাতা ইংরাজি পড়ে নাস্তিক হয়েছো তো! তাই এতক্ষণ বলি নি। এবার বলি। মাসখানেক আগে আমি এসেছিলাম ওঝা নিয়ে। বাড়ি ঝাড়ফুঁক করে গেছি। কাজেই কোনো ভয় নেই।'
এরপর আর আসর জমল না। হাই তুলতে তুলতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল। কাজেই যে যার ঘরে গিয়ে নিদ্রার আয়োজন করলাম।
পরের দিন রবিবার। আগের দিন খাটাখাটুনির ফলে গায়ে—গতরেও ব্যথা হয়েছিল। তাই ঘুম ভাঙতে আটটা বাজল। একতলার বৈঠকখানায় পুরুষরা জমায়েত হলাম। চা—পানের পর হরিশকাকা বললেন—'চ, আমাদের ভিটে দেখিয়ে আনি।'
প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কলকাতার ছেলেদের সঙ্গে শ্যামলা বাংলার গ্রাম্যরূপ এমনিতেই মধুর। তার ওপর স্মৃতিবিজড়িত জমিদার—ভবন। সুতরাং আমরা হইহই করে বেরিয়ে পড়লাম। আস্তাবল দেখলাম। দেখলাম রঙমহল—এককালে যেখানে কাশী—কাঞ্চীর বাইজিরা এসে ঘুঙুরের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করে গেছে। কচুরিপানায় ঢাকা দেখলাম 'বিন—বাদল—বরসাত'—মোগলাই অনুকরণে একটা বিরাট বাগান। মাঝে ঝিল আর ফোয়ারার সারি। দারুণ গ্রীষ্মেও নাকি এখানে বর্ষার আমেজ সৃষ্টি করা হত। সব দেখে ফিরতে বেলা প্রায় এগোরোটা হল। বৈঠকখানার দোরগোড়ায় দেখি পিণ্টি দাঁড়িয়ে। পিণ্টি আমার খুড়তুতো বোন। হরিশকাকার মেয়ে।

মুখ আমসি করে পিণ্টি যা বলল, তা শুনে আমরা তো হতভম্ব। পদ্মমাসি নাকি এখুনি চলে যাচ্ছে। নিশুতি রাতে নাকি ভূতে হানা দিয়েছিল মাসির ঘরে।

শুনেই আমরা তিন লাফে সিঁড়ি টপকে পিণ্টির পেছন পেছন দোতলায় উঠলাম। পদ্মমাসি ঘর পালটেছে দেখলাম। বড়ো ঘর ছেড়ে শুকনো মুখে শুয়ে রয়েছে পিণ্টির ঘরে।

আমরা ঘিরে দাঁড়াতেই চোখ খুলল পদ্মমাসি। চোখের কোলে দেখলাম কালি পড়েছে। চিঁ চিঁ স্বরে মাসি বলল—'ব্যাপারটা এতক্ষণে খোলসা হল। পারুল আসতেই মানটা হালকা হল। কালরাতে খুব তো ভয় দেখালে আমাকে। জানলা খটখট আওয়াজ করে, সিঁড়িতে সরসর শব্দ হয়—আরও কত কি! সত্যি কথা বলতে কি, ঘরে ঢুকে পর্যন্ত গা ছমছম করছিল। সারাদিন খাটুনির জন্যে তবুও শুতে—না—শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ জেগে উঠলাম। দেখলাম জানলা দিয়ে চাঁদের আলো মেঝেতে এসে পড়েছে। আর আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সাদা মূর্তি। থান কাপড় জড়ানো সাদা মূর্তি। না, না, আমি ভুল দেখিনি।

আমার দিকে চেয়েছিল মেয়েটা। থান কাপড়ের মতোই সাদা তার মুখ। যেন হাড় ছাড়া কিছু নেই সেখানে। চোখের জায়গায় দুটো ছেঁদা। ঝকঝকে দাঁতের সারি। অবিকল মড়ার মাথার খুলির মতো দেখতে। কিন্তু মুখটা খুব বিষণ্ণ। কী যেন বলতে চাইছে। ওই পর্যন্ত দেখেই আমার হাত—পা ঠান্ডা হয়ে গেল। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল। বেশ বুঝলাম, আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি। গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না। আমি জ্ঞান হারালাম। তারপর চোখ খুলে দেখি, ভোর হয়ে গেছে। বিষম ভয় পেয়েছিলাম। এখন অবশ্য ভয় আর নেই। পারুল আমার ভয় ভেঙে দিয়েছে।'

'পারুল ভয় ভেঙে দিয়েছে মানে? পারুল কি ওঝা?' হরিশকাকা বললেন।

'পারুলকে সকালে পেতনির কথা বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ল। আসলে হয়েছে কী, ঘণ্টার আওয়াজ শুনেই পারুলের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ও ঘরে আসে। এসে দেখে আমি চোখ বুঁজে শুয়ে আছি। আসলে ওর থান কাপড় দেখেই আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ও ভাবল, আমি ঘুমোচ্ছি। তাই আর বিরক্ত না করে আবার শুতে চলে যায়।'

'তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। পারুলই কাল রাতে পেতনি হয়েছিল।' বললাম আমি। একটু হতাশ হয়েই বললাম। ভূতপ্রেত নিয়ে কেবল গল্পই করলুম! চোখে দেখা আর হল না।

পদ্মমাসি বলল—'সে যা হোক, আমি বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি। অনেক কাজ আছে। এ বাড়িতে আর ঢুকছি না। যা ভয় পেয়েছিলাম।'

পদ্মমাসি চলে গেলে আমরা আবার বৈঠকখানায় এলাম। চায়ের কাপ এল। চুমুক দিয়ে ননী চাটুয্যে বললেন—'যাক, একটা ফাঁড়া কাটল। পারুল প্রেতিনী—রহস্য পরিষ্কার না করলে ভদ্রমহিলার নার্ভের ব্যায়রাম দাঁড়িয়ে যেত।'

'রহস্য কি সত্যিই পরিষ্কার হয়েছে?' হরিশকাকা বললেন।

'বাকি কী রইল? ঘণ্টার ডাকা শুনেই পারুল ঘরে ঢুকেছে। মাসি তাকেই পেতনি ভেবেছে।' বললাম আমি।

'বুঝলাম। কিন্তু তোর মাসি তো খাট ছেড়ে নামেই নি। তার আগেই অজ্ঞান হয়েছে।'

'তাতে কী হয়েছে।'

'ঘণ্টাটা তাহলে বাজালো কে?'

নিশীথ দাসের ভেলকি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

রজনীবাবুর কাছে কেউ দেখা করতে এলে সকালের দিকে আসেন। এমনকী কিংকরবাবুও। হয়তো দু—একবার তিনি বিকালের দিকে এসেছেন। কিন্তু রাত এগারোটার সময় কে এল!

হরি গেটে তালা দিয়ে এসেছে। এখন খেতে বসবে। রজনীবাবুর খাওয়া হয়ে গেছে। নিজের ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠল। রজনীবাবু অবাক। এমন অসময়ে আবার কে এল!

সিগারেট শেষ করে লেখার টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসতে হবে। কিংকর বর্মন একদিন দু—দিন অন্তর ফোন করেন। রজনীবাবুর খোঁজখবর নেন। দু—হপ্তা আগে এক রবিবারের সকালে এসেও ছিলেন। আসল ব্যাপার হল আর পাঁচ মাস বাদে পুজো। পুজোয় অমানিশা পত্রিকায় রজনীবাবুর গল্প চাই।

কোনো অলৌকিক অভিজ্ঞতা না হলে রজনীবাবু গল্প লিখতে পারেন না। তিনি ভূতের গল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্প লেখেন না। 'অমানিশা'য় কেবল ভূতের গল্প ছাপা হয়। সম্পাদক কিংকরবাবু আভাসে—ইঙ্গিতে জানার চেষ্টা করছেন রজনীবাবুর এর মধ্যে তেমন কোনো অভিজ্ঞতা হল কি না। বিগত দু—দিন কিংকরবাবু ফোন করেননি।

আবার ডোরবেল বেজে উঠল। হরি আজকাল কানে কম শোনে। হয়তো এখন খেতে বসেছে। রজনীবাবু নিজেই চললেন সদর দরজা খুলতে।

রান্নাঘরের সামনে বসে হরি খাচ্ছে। পেছন ফিরে বসেছে বলে রজনীবাবুকে দেখতে পেল না। গোরুর নাকের মতো রবারের চটি রজনীবাবুর পায়ে। চলাফেরার সময় মৃদু ফটফট শব্দ হয়। সে—শব্দ হরির কানে গেল না।

রজনীবাবু সিঁড়ির আলো জ্বাললেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজা। দরজায় খিল লাগানো। তারপর কোলাপসিবল গেট। গেটে তালা লাগানো।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে মনে পড়ল গেটের তালার চাবিটা আনতে ভুলে গেছেন। এখান থেকে হাঁক পেড়ে হরিকে ডাকলে সে শুনতে পাবে না।

চাবি থাক। আগে দরজা খুলে দেখা যাক আগন্তুকটি কে! সদর দরজার খিল খুলে চমকে উঠলেন, 'একী! কিংকরবাবু আপনি! এত রাতে!' কিংকরবাবু রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'তালাটা খুলুন। আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।'

রজনীবাবুর মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে উঠল, 'না, না। এখন কোনো কথাটথা হবে না। আপনি বরং কাল সকালের দিকে আসবেন।

সদর দরজায় খিল দিয়ে রজনীবাবু ভাবলেন কাজটা তিনি ঠিক করেননি। পঞ্চাশ বছরের পুরোনো বন্ধুর মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। অথচ দরজাটা খোলার ইচ্ছেও নেই। রজনীবাবু হঠাৎ এইরকম রেগে যান। তার ওপর তিনি অত্যন্ত জেদি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনলেন ল্যান্ড ফোনটা বাজছে। বার দুই বাজার পর হরির গলা শুনতে পেলেন। সে হ্যালো হ্যালো করছে।

হরির হাতে ফোনের রিসিভার। রজনীবাবুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে সে অবাক হয়েছে।

রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ফোন করছে।' হরি বলল, 'আজ্ঞে কিংকরবাবু।' রজনীবাবুর মোবাইল ফোন বন্ধ আছে। তার মানে কিংকরবাবু এখনও চলে যাননি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর মোবাইল থেকে ফোন করছেন। মাথাটা আবার গরম হয়ে উঠছে। রিসিভারটা নিয়ে বললেন, 'এখনও আপনি আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন!' ওদিকে কিংকরবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'আমি কেন এত রাতে আপনার বাড়ির সামনে যাব। বরং এত রাতে আপনিই তো আমার বাড়িতে এসে ডোরবেল পুশ করেছিলেন।' হাতে ফোনের রিসিভার ধরিয়ে হরি চলে গেছে। রজনীবাবু অবাক। অদ্ভুত গোলমেলে ব্যাপার তো।

রজনীবাবু বললেন, 'আমি যে স্পষ্ট আপনাকে দেখলাম। ডোরবেল শুনে নীচে নেমে গিয়েছিলাম। সদর দরজা খুলে দেখি আপনি। বললেন, কোলাপসিবল গেটের তালাটা খুলুন। আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। কিন্তু গেট খুলিনি। কাল সকালে আপনাকে আসতে বলে ওপরে উঠে আপনার ফোন রিসিভ করছি।' সঙ্গে সঙ্গে কিংকরবাবু বললেন, 'আমিও যে আপনাকে স্পষ্ট দেখেছি। দরজা খুলে দেখলাম, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। আপনারে ঠোঁটে মুচকি হাসি। বললাম, ভিতরে আসুন। কোনো উত্তর দিলেন না। অদূরে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। আপনি সেই ট্যাক্সিটার দিকে এগিয়ে গেলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এ কী! আপনি চলে যাচ্ছেন কেন! উত্তর দিলেন না। ওই ট্যাক্সিটায় উঠে হু...স করে চলে গেলেন। তারপর আধঘণ্টা অপেক্ষা করে আপনাকে ফোন করছি।'

দুই

মাথার চুলগুলি যেন পুড়ে ঝলসে গেছে। মুখে বসন্তের দাগ। গায়ে শতচ্ছিন্ন কালো কোট। এখন শীতকাল নয়। তবুও। পরনে ময়লা পাজামা। বয়স বোঝা মুশকিল। ষাট হতে পারে আবার সত্তরও হতে পারে। সদর দরজা খোলা পেয়ে লোকটা রজনীবাবুর ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। তিনি লোকটাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকেই লোকটা এমন একটা ভেলকি দেখিয়ে দিল যাতে রজনীবাবু অবাক হয়ে গেলেন। হরি নেই। সদর খোলা রেখে বাজারে গেছে।

লোকটা কোটের পকেট থেকে একজোড়া সাদা ইঁদুর মেঝেতে ছেড়ে দিয়ে হাতে তালি দিল। কোথায় ইঁদুর! এ তো দেখা যাচ্ছে একজোড়া সাদা পায়রা। পায়রা দুটো ডানা ঝটপট করে জানলা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে উড়ে গেল। লোকটা হা হা করে হাসতে লাগল। লোকটার তিনটে দাঁত কুচকুচে কালো। পায়ে কোনো জুতো নেই। রজনীবাবু চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন। টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট। দেশলাই। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন। স্তম্ভিত অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনি!' লোকটা হাসতে হাসতে বলল, 'ধরে নিন মানে! আপনার আর কোনো নাম আছে নাকি!' লোকটা বলল, 'আমার নাম নিশীথ দাস। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অমাগ্রামে থাকি। ভেলকিবাজি দেখাই।' ডানা ঝটপট করতে করতে পায়রা দুটো আবার ফিরে এল। এখনও বিকেলের আলো আছে। তবে খুব ফিকে। পায়রা দুটো একজোড়া সাদা ইঁদুর হয়ে গেল। নিশীথ দাস ইঁদুর দুটোকে কোটের পকেটে পুরল।

রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কীজন্যে এসেছেন!'

নিশীথ দাস বলল, 'আপনাকে আমার ভেলকি দেখাতে।' রজনীবাবু বললেন, 'ভালো ভেলকি জানেন দেখছি। একশো টাকা দিচ্ছি।' নিশীথ দাস খি খি করে হাসল, 'দুশো দিন। অনেক দূর থেকে আসছি। বড়ো গরিব আমি। সংসারও বড়ো।'

রজনীবাবু চেয়ার থেকে উঠে ওঘরে টাকা আনতে গেলেন। এসে দেখেন লোকটা নেই। তাঁর চেয়ারে কিংকরবাবু বসে আছেন।

রজনীবাবু চেয়েছিলেন আজ সকালেই যেন কিংকরবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কাল রাতে যা ঘটে গেল তা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। কিংকরবাবু বলেছিলেন, 'সকালে হবে না। আমার ভায়রাভাই মুরারিমোহনের একটা অপারেশন আছে। সন্ধেবেলায় আসব।'

রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সরাসরি নার্সিং হোম থেকে আসছেন বুঝি।' কিংকরবাবু বললেন, 'গিন্নিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে আসছি। দাঁড়ান, একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি।' কিংকরবাবু বাথরুমে গেলেন।

চেয়ার দুটো। একটাতে রজনীবাবু বসলেন। নিশীথ দাস হঠাৎ চলে গেল কেন! হরি এখনও ফেরেনি। সময়মতো কিংকরবাবু ঠিক এসেছেন। রজনীবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। এতক্ষণে হরি ফিরল।

হরি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পরোটা খাবেন তো!' রজনীবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। আগে দু—কাপ চা কর।' হরি অবাক, 'দু—কাপ কেন!' রজনীবাবু বললেন, 'কিংকরবাবু এসেছেন। উনি বাথরুমে গেছেন।' হরি বাজারের থলি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। লোকটা এইরকমভাবে কেন বলল, ধরে নিন আমার নাম নিশীথ দাস। অদ্ভুত লোক। ভেলকি দেখাল। অথচ টাকা না নিয়ে চলে গেল।

হরি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল, 'কোথায় কিংকরবাবু। কলঘরে তো কেউ নেই। দরজা হাট করে খোলা।' রজনীবাবু চমকে উঠলেন, 'সে কী!'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। পরিচিত পায়ের শব্দ। কখন কিংকরবাবু বাথরুম থেকে বেরিয়ে একবারে রাস্তায় চলে গিয়েছিলেন! রজনীবাবু খেয়াল করেননি। কিংকরবাবুর তো উচিত ছিল তাঁকে একবার বলে যাওয়া। কিংকরবাবুর পায়ের শব্দ শুনে হরি চা করতে গেছে।

কিংকরবাবুকে রজনীবাবু ধমক দিয়ে বলতে চাইলেন, 'আপনি কীরকম লোক মশাই।' বলতে পারলেন না। কেননা কিংকরবাবুই ধমক দিয়ে তাঁকে বলছেন, 'আপনি কীরকম লোক মশাই!'

রজনীবাবু হাঁ করে কিংকরবাবুর দিকে তাকিয়ে আছেন। কিংকরবাবু বললেন, 'আপনাকে কতবার ডাকলাম। আপনি যেন শুনতেই পেলেন না। আশপাশের লোকেরা আমাকে নির্ঘাত পাগল ভাবল। কেননা আপনাকে ডাকতে ডাকতে এই বুড়ো বয়সে আপনার পেছনে খানিকটা ছুটতেও হয়েছিল।'

রজনীবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে! কোথায়! কখন!' কিংকরবাবু চেয়ারে বসলেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে। রাসবিহারীর মোড়ে। মিনিট কুড়ি আগে।' রজনীবাবু বুঝলেন গোলমেলে ব্যাপারটা আবার শুরু হয়েছে।

হরি চা এনে টেবিলে রাখতে রাখতে কিংকরবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'একটু আগে আপনি বাবুর কাছে এসেছিলেন। তারপর কলঘরে যাচ্ছি বলে কোথায় চলে গিয়েছিলেন!' কিংকরবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'আমি এসেছিলাম! আমি তো এই এলাম।' হরি বলল, 'আপনারা চা খান। পরোটা ভেজে আনছি। আলুর দমও।'

কিংকরবাবু রজনীবাবুর দিকে তাকালেন, 'হরি এসব কী বলছে।' রজনীবাবু সিগারেট ধরালেন। দুজনে চায়ে চুকুম দিলেন। রজনীবাবু বললেন, 'বড়ো গোলমেলে ব্যাপার। কিছুক্ষণ আগে সত্যিই আপনি এসেছিলেন। বললেন, নার্সিং হোম থেকে গিন্নিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এককাপ চা খেয়ে আসছেন।' কিংকরবাবু বললেন, 'আশ্চর্য! একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। তারপর!' রজনীবাবু বললেন, 'তারপর বাথরুম গেলেন। তারপর আর কিছু নেই। সবটাই ভেলকি। আজ বুঝি গাড়ি নিয়ে আসেননি!' কিংকরবাবু বললেন, 'না। হীরালালের ক—দিন খুব ধকল চলছে। গিন্নিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ওকে ছুটি দিলাম। কিংকরবাবুর ড্রাইভারের নাম হীরালাল।

রজনীবাবু বললেন, 'এবার বলুন। আপনি কী দেখলেন।'

কিংকরবাবু বললেন, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। রাসবিহারীর মোড়ে সিগন্যালে আটকে পড়লাম। হঠাৎ আপনাকে দেখতে পেলাম। তক্ষুনি ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লাম। আপনি বেশ কয়েক হাত দূরে। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেন। এই বয়সে আপনি এত তাড়াতাড়ি কীভাবে হাঁটছিলেন জানি না। আপনাকে ডাকছিলাম। আপনি শুনতেই পেলেন না। তারপর ছুটতে ছুটতে ডাকলাম।

এই বয়সে কীভাবে ছুটলাম তাও জানি না। মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার লোকেরা অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল। হঠাৎ আপনি ম্যাজিকের মতো ভ্যানিস হয়ে গেলেন।'

রজনীবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। ঠিক নিশীথ দাসের মতো।' কিংকরবাবু অবাক, 'তার মানে!' রজনীবাবু বললেন, 'তার মানে জানি না। আপনি যখন আমাকে অনুসরণ করছিলেন তখন আমি বাড়িতে। আজ সারাদিন বাড়িতে। একপা—ও বাড়ি থেকে বেরোইনি।' হরি পরোটা আর আলুর দম নিয়ে এল।

খেতে খেতে কিংকর বর্মন জিজ্ঞেস করলেন, 'নিশীথ দাসটি কে!' রজনীবাবু বললেন, 'ভেলকি, বড় গোলমেলে ব্যাপার'। আর কিছু বললেন না। কিংকর বর্মন খানিকক্ষণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। যখন বুঝলেন এ ব্যাপার রজনীবাবু আর একটিও কথা বলবেন না তখন আবার পরোটা আলুরদম খেতে লাগলেন।

তিন

ইসমাইলের কথা মনে পড়ল। ইসমাইল রজনীবাবুর গল্পের অন্ধভক্ত। বয়স তিপান্ন। পরিভ্রমণ মানে একটা ভ্রমণ—বিষয়ক পত্রিকা বার করে। অচেনা—অজানা জায়গার হদিশ সে দিতে পারে। দরকার অদরকারে তিনি ইসমাইলকে ফোন করেছেন। আগে মাঝে মাঝে সে রজনীবাবুর বাড়িতে আসত। ইদানীং খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ফোনে রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'অমাগ্রাম বলে কোনো গ্রাম আছে নাকি!' ইসমাইল তো রজনীবাবুর ফোন পেয়ে অভিভূত। বলল, 'হ্যাঁ আছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। খুব অবহেলিত গ্রাম। কেন বলুন তো!' রজনীবাবু বললেন, 'কীভাবে কোন ট্রেনে ওখানে যেতে হয় আমাকে বলবে। ওখানে রাত কাটানোর কোনো ব্যবস্থা আছে!' ইসমাইল বলল, 'দশ মিনিট সময় দিন। সব বলছি।'

মিনিট দশেক বাদে ইসমাইলের ফোন এল, 'শেয়ালদা থেকে দুপুর দুটোয় লালপুকুর যাওয়ার একটা ট্রেন আছে। ওই ট্রেনে যেতে হবে। ঘণ্টা দেড়েকের জার্নি। লালপুকুরে নেমে গোরুর গাড়িতে চেপে আরও একঘণ্টা। অমাগ্রামে রাত কাটাবার মতো কোনো হোটেল বা ধর্মশালা নেই। একটা শিবমন্দির আছে। সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কবে যাবেন বলুন?' রজনীবাবু বললেন, 'কাল তোমাকে জানাব।'

পরের দিন সকালে রজনীবাবু কিংকর বর্মনকে ফোন করলেন, 'কাল বেলা বারোটায় আমার বাড়িতে আসবেন। এখানে খাওয়াদাওয়া করবেন। তারপর আমরা দুপুর দুটোয় শেয়ালদা থেকে লালপুকুরের ট্রেন ধরব।' কিংকরবাবু বললেন, 'কাল আমার ছাপাখানা খোলা। কী করে লালপুকুর যাব! আর লালপুকুর হঠাৎ কেন যাব!'

রজনীবাবু বললেন, 'তেমন অসুবিধে থাকলে আসবেন না। কাল এলে হয়তো 'অমানিশা'র পুজো সংখ্যার গল্পটা এই হপ্তার মধ্যে পেয়ে যেতেন। তাহলে থাক। এ বছর আমার গল্প ছাড়া পত্রিকা বেরোক।' কথা শেষ করে রজনীবাবু ফোন রেখে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ড ফোনটা আবার বেজে উঠল। রজনীবাবু ফোন ধরলেন। কিংকরবাবু বললেন, 'কাল আমি আপনার বাড়িতে আসছি।' রজনীবাবু বললেন, 'বেশ। বেলা বারোটার মধ্যে চলে আসছেন।' তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

এবার ইসমাইলকে ফোন করলেন। ইসমাইল ফোন ধরল, 'বলুন রজনীবাবু।' রজনীবাবু বললেন, 'কাল আমরা অমাগ্রামে যাব। তুমি শিবমন্দিরে দু—জনের মতো থাকার বন্দোবস্ত কোরো।' ইসমাইল বলল, 'এক্ষুনি মাধব ভট্টাচার্যকে বলে দিচ্ছি, অমাগ্রামের শিবমন্দিরে এসে আপনি মাধববাবুর সঙ্গে দেখা করবেন।'

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় হন্তদন্ত হয়ে কিংকর বর্মন এলেন। রজনীবাবু সবে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়েছেন। ধপ করে তাঁর সামনের চেয়ারে বসে বললেন, 'হরি আমাকে এককাপ চা দাও।' রজনীবাবু মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আসল কিংকর বর্মন তো!' কিংকরবাবুর ঠোঁটে মুচকি হাসি, 'আমি তো আসল, আপনি!' এবার রজনীবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন, 'তা বটে। যেসব গোলমেলে

ব্যাপার চলছে। লালপুকুরে তো কাল যাব। আজও কি ছাপাখানা না গিয়ে এখানে আড্ডা দেবেন!' হরি চা দিয়ে গেল। কিংকর বর্মন বললেন, 'না। আজ ছাপাখানায় যেতে হবে। লালপুকুর নিয়ে খুব কৌতূহল হচ্ছে। তাই জানতে এলাম।'

রজনীবাবু বললেন, 'সব ভেলকি। নিশীথ দাসের মতো।' একটু থেমে বললেন, 'নিশীথ দাস নামটা নিয়ে সারাদিন ভাবুন। ভেবে কূল না পেলে সাত্যকি দত্তের সাহায্য নিন। কাল এখানে এসে বলবেন ওই নাম ও পদবি থেকে কী পাচ্ছেন।'

চা খেয়ে কিংকর বর্মন চিন্তিত মুখে বিদায় নিলেন।

চার

বেলা সাড়ে এগারোটায় কিংকরবাবু এলেন। চিন্তামগ্ন মুখ। রজনীবাবু বললেন, 'একঘণ্টা পরে ভাত খাব। এখন চা খাওয়া যেতে পারে। শেয়ালদা থেকে দুটোয় লালপুকুর লোকাল ছাড়বে। ইসমাইলকে মনে আছে!' কিংকরবাবু বললেন, 'মনে থাকবে না কেন। কতবার এই বাড়িতে এসেছে। আপনার লেখার ভক্ত।' হরি চা দিয়ে গেল।

রজনীবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'অমাগ্রামের হদিশ তো ইসমাইল আমাকে দিল। 'পরিভ্রমণ' কাগজের সম্পাদক। তাই ওকে সব জায়গার খুঁটিনাটি খোঁজখবর রাখতে হয়। ইসমাইম শুধু খোঁজ দিয়ে ক্ষান্ত নয়। গাড়ি নিয়ে আসবে। আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দেবে। বুঝলেন!'

চায়ে চুমুক দিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে কিংকর বর্মন বললেন, 'আপনি কী বলতে চাইছেন আমি একটুও বুঝতে পারছি না।' রজনীবাবু বললেন, 'আস্তে আস্তে আপনাকে বুঝিয়ে দেব। তা ওই নিশীথ দাসের মর্মোদ্ধার করতে পারলেন!' কিংকরবাবু বললেন, 'না।' রজনীবাবু বললেন, 'বলেছিলাম তো দরকার হলে গোয়েন্দা সাত্যকি দত্তের সাহায্য নিতে পারেন। নেননি।' গম্ভীর মুখে কিংকর বর্মন বললেন, 'তিনিও হেঁয়ালি করে উত্তর দিলেন। বললেন, দুই বন্ধু।'

রজনীবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন, 'সাত্যকি দত্তের তো প্রখর বুদ্ধি। একবার শুনেই ধরে ফেলেছেন তো!' কিংকরবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে রজনীবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গোরুর গাড়ি যখন শিবমন্দিরের সামনে পৌঁছল তখন ঘড়িতে বিকাল পৌনে পাঁচটা। ইসমাইলের হিসাবে আরও পনেরো মিনিট আগে পৌঁছনো যেত।

গাড়ি থেকে দুজনে নামলেন। কিংকরবাবু ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। গোরুর গাড়িটা চলে গেল। গাড়ির শব্দ পেয়ে মন্দির থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে নমস্কার করে বললেন, 'আমার নাম মাধব ভট্টাচার্য।' রজনীবাবু নিজেদের পরিচয় দিলেন।

মাধববাবু ওঁদের নিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকলেন। খুব প্রাচীন মন্দির। কিংকরবাবুর ভক্তি খুব। দু—মিনিট ধরে প্রণাম করলেন। রজনীবাবু মন্দিরটা কত প্রাচীন এই নিয়ে মাধব ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। উনি বললেন, 'কত প্রাচীন জানি না। কলকাতার মল্লিকদের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। তাঁরাই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। বছর পাঁচেক হল এখানে আছি। অকৃতদার মানুষ। তাই কোনো পিছুটান নেই।'

মন্দিরের উঠোনের ওপাশে চারটে ঘর। তার মধ্যে একটা ঘরে রজনীবাবুদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

সেই ঘরে বসে চা খেতে খেতে রজনীবাবু বললেন, 'কাল ভোর ছ—টা কুড়ির ট্রেনে আমরা কলকাতায় ফিরে যাব।' মাধববাবু বললেন, 'গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছি। রঘু আপনাদের স্টেশনে পৌঁছে দেবে।'

রজনীবাবু বললেন, 'এখনও দিনের আলো আছে। আমরা বরং গ্রামটা একটু ঘুরে দেখে আসি।' মাধববাবু বললেন, 'এখানে দেখার কিছুই নেই। বড়ো গরিব এখানকার মানুষ।' রজনীবাবু বললেন, 'এই গ্রামে নিশীথ দাস বলে কেউ থাকেন! ম্যাজিক দেখান!' মাধববাবু মাথা নাড়লেন, 'না তো! তবে ব্রহ্মতোষ ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। এই মন্দিরের প্রাচীন পূজারি। তাঁর বয়স একশো এক। দক্ষিণের ঘরটিতে থাকেন। এখনও প্রখর স্মরণশক্তি। চলুন তাঁর কাছে আপনাদের নিয়ে যাই।'

নিশীথ দাসের নাম শুনে ব্রহ্মতোষ বললেন, 'না। ওই নামে কোনো জাদুকরকে চিনি না। নামটা নিশি দাঁ নয় তো। তাঁর আবার তিনটে কালো দাঁত ছিল। ভোজবাজির খেলা দেখাতেন।' রজনীবাবু বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন। হয়তো আমিই নামটা ভুল বলছি। কীরকম খেলা দেখান!' ব্রহ্মতোষ বিরক্ত হলেন, 'বললাম তো খেলা দেখাতেন। কুড়ি বছর বয়সে এই মন্দিরে পুরোহিত হয়ে আসি। তখন অমাগ্রামে নিশি দাঁকে সবাই ভক্তিশ্রদ্ধা করত। জাদুকরের চেয়ে তাঁর একটা আরও বড়ো পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন পরোপকারী। তিনি মারা গেছেন সত্তর—পঁচাত্তর বছর আগে।' রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এই গ্রামে তাঁর বংশধররা কেউ নেই?' উনি মাথা নাড়লেন, 'না, কেউ নেই।'

রাত্তিরে মন্দিরের ভোগ খেয়ে রজনীবাবু ও কিংকরবাবু নির্দিষ্ট ঘরে বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছেন। মাধববাবু বলেছেন ভোরে ডেকে দেবেন।

লালপুকুরে আসার সময় নিশীথ দাসের ভেলকির ব্যাপারটা রজনীবাবু কিংকরবাবুকে বলেছিলেন। সেই সাদা ইঁদুর ও সাদা পায়রার গল্প।

রজনীবাবু বিছানা থেকে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'ঘুম আসছে না।' কিংকরবাবুও উঠলেন, 'আমারও একই অবস্থা। দিন, আজ একটা সিগারেট খাই।' কিংকরবাবু বহুকাল আগে চেনস্মোকার ছিলেন। ইদানীং শখ হলে ন—মাসে ছ—মাসে একটা দুটো খান।

সিগারেটে টান দিয়ে কিংকরবাবু বললেন, 'এই নিয়ে কী গল্প লিখবেন! নিশীথ দাস আপনাকে ভেলকি দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অমাগ্রামে এসে শুনলাম তাঁর নাম নিশি দাঁ। সত্তর—পঁচাত্তর বছর আগে উনি মারা গিয়েছেন।' রজনীবাবু বললেন, 'মানুষটি সত্যি ভারি পরোপকারী ছিলেন। নিশীথ দাস একবার আপনার চেহারা নিয়েছেন আর একবার আমার। আমার গল্পহীন কলমে উনি এনে দিয়েছেন গল্প।'

কিংকরবাবু অবাক, 'নিশি দাঁ কেন নিশীত দাস হলেন!' রজনীবাবু মুচকি মুচকি হাসছেন। 'এখনও বুঝতে পারেননি। সাত্যকি দত্ত কিন্তু ঠিক ধরে ফেলেছেন। নিশীথ মানে রজনী আর দাসের অর্থ কিংকর। আমরা দুই বন্ধু।'

কিংকর বর্মনের হাতে সিগারেট পুড়ছে। উনি হাঁ করে রজনীবাবুর দিকে তাকিয়ে আছেন।

মোচার ঘণ্ট

বাণী বসু

সকালের ডাকের মধ্যে ছিল আঁকাবাঁকা হাতের লেখাওয়ালা একখানা পোস্টকার্ড। পড়তে— পড়তেই বাবা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'ওরে শামু, তোর ছোটঠাকুরমার চিঠি এসেছে। অনেক দিন ধরে একাজ্বরি হয়ে রয়েছেন। আশ্চর্য! হারুও তো একটা খবর—টবর দেবে! তুই কাল সকালের ট্রেন ধরেই চলে যা। আজই আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ওষুধ—পত্তর সব এনে রাখছি।

মা বললেন, 'কী হয়েছে গো?'

'আরে আজ একমাস হতে চলল ছোটো খুড়িমার রোজ সন্ধেবেলা জ্বর হচ্ছে। না একটা খবর, না কিছু!'

শমু বলল, 'বাবা, আমার বন্ধুদেরও নিয়ে যাব? যাই, হ্যাঁ?'

মা বললেন, 'মোটেই না। শুনছ, তিনি আজ একমাস ধরে ভুগছেন, বুড়ো মানুষ! দেখতে যাবার নাম করে দৌরাত্ম্য করতে যাবে, না?'

বাবা একটু ভেবে বললেন, 'কথাটা কিন্তু মন্দ না। শমুর বন্ধুরাও অনেকদিন ধরে 'গ্রাম দেখতে যাব, গ্রাম দেখতে যাব' আবদার করছে, টেস্ট পরীক্ষা শেষ! ক—দিন ঘুরেই এলে বা! হারু না হয় বামুন মেয়েকে ডেকে আনবে, তিনিই রান্নাবান্না করে দেবেন। খুড়িমা ছেলেপুলে ভালোবাসেন। অসুখ শরীর, ছেলেগুলোকে পেলে ওঁর ভালোই লাগবে।'

মা বললেন, 'জানি না বাবা। দস্যি সব! একা শমুতেই রক্ষে নেই।'

'তায় তিনটে বাঁদর দোসর।' শমু যোগ করল।

'সবই তো জানো দেখছি! জ্ঞানপাপী!' মা হাসতে—হাসতে চলে গেলেন।

আর তিনটে বাঁদর হচ্ছে গোরা, টুলু আর রঞ্জু। চারজনেই ক্লাস টেনে পড়ে। টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে, মাধ্যমিকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

গোরা বলল, 'চল, দু—চারদিনের জন্যে ফ্রেশ হয়ে আসা যাবে। জিয়োমেট্রি আর জিয়োগ্রাফি, এই দুই জিয়োর ভূত এখনও আমার মাথার মধ্যে কিলবিল কিলবিল করছে।'

শমু বলল, 'সাবধান গোরা, ভূতগুলোকে রায়নায় ছোটঠাকুমার আশেপাশে ছেড়ে দিয়ে আসিসনি যেন। মা বলেছে, আমরা চারটে বাঁদর।'

রঞ্জু বলল, 'না রে না, আমরা কি সেই ছেলে? ভীষণ ভালো হয়ে থাকব। খালি তোদের হারুদাকে একটু পুকুরে জাল—টাল ফেলতে—টেলতে বলিস। আর ছোটো ঠাকুমার ভাঁড়ারের চাবি—ফাবিগুলো।...'

টুলু বলল, 'তোরা এত হ্যাংলা না! যাচ্ছিস একজন অসুস্থ বৃদ্ধার সেবা করতে। তা না পুকুরে জাল, ভাঁড়ারের চাবি।...'

'তা বটে, তা বটে,' রঞ্জু বলে উঠল, 'আমাদের টুলুবাবু আবার একজন ভালো ছেলে। সমাজ—সেবক। ছুটিতে—ছুটিতে বস্তিতে গিয়ে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে আসেন...'

শমুর বাবার এখন কোর্টে অসম্ভব কাজ। সুতরাং বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না গ্রাম নিবাসী তাঁর ছোটোকাকিমাকে দেখে আসবার ভার চার বন্ধুর ওপরেই পড়ল। সকাল ৬—৫৫ মিনিটে এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ে। মোটামুটি খালি কামরায় জানলার ধারে বসতে পেরেছে চার বন্ধু। সঙ্গে একটা করে ব্যাগ।

ট্রেন ব্যান্ডেল পেরিয়ে গেল। পৌষের সকালের শান দেওয়া হাওয়া। দু—পাশে খোলা মাঠ। গাছপালা, টেলিগ্রাফের তারে ফিঙের দোল। একটু আগেই আবার চা—শিঙাড়া হয়ে গেছে।

টুলু বলল, 'কী যে সব যা—তা খাওয়াস তোরা। একটা টক ঢেকুর উঠল।'

গোরা বলল, 'বয়স হয়েছে তো? ও একটু উঠবেই। দাদুদের অমন একটু—আধটু উঠে থাকে। ভাস্কর লবণ দেব?'

'যা যা, ফাজলামি করিস না।'

রঞ্জু বলল, 'শমু, আজ কিন্তু আমাদের হরিমটর মনে হচ্ছে। রায়নায় পৌঁছতে অন্তত আড়াইটে—তিনটে। কী হবে বল তো?'

বর্ধমানে নেমে রেলওয়ে—রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেব এখন।' শমু বলল, 'আজকের দিনটা কষ্ট কর। কাল থেকে তোদের যা খাওয়াব না! জীবনে ভুলতে পারবি না।'

'কীরকম? কীরকম?' তিনবন্ধু একসঙ্গে বলে উঠল।

'ছোট ঠাকুমা রান্না করেন ফার্স্টক্লাস। আমরা প্রতিবছরই একবার, কোনো কোনো বছর দু—বারও যাই। পাশের বাড়ির বামুনদিদি হেল্প করে আর ছোটঠাকুমা রাঁধেন। এই বয়সেও হেভি খাটতে পারেন। কীসব আনাজ—টানাজ দিয়ে ডাল বানান, সুক্তুনি, ধোঁকার ডালনা, ফুলকপির বড়া। কিন্তু সবচেয়ে দারুণ কী জানিস? মোচার ঘণ্ট। দুর্দান্ত!'

রঞ্জু মুখ ব্যাজার করে বলল, 'এইসব সুক্তুনি—ফুক্তুনি, মোচা—ফোচা খাওয়াবি? কোথায় ভাবলুম পুকুরের বড়ো বড়ো রুই মাছ...'

'সে তো আছেই', শমু বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুই মাছ ফেলে মোচার ঘণ্ট খাবি, রুই—কাতলা ফেলে মৌরলার অম্বল খাবি।'

গোরা বলল, 'হতেও পারে। ঠাকুমা—দিদিমাদের রান্নার স্বাদ সত্যি সত্যিই আলাদা।'

টুলু বলল, 'একটা কথা কিন্তু তোরা সবাই ভুলে যাচ্ছিস। ছোটঠাকুমা এখন অসুস্থ। খুবই অসুস্থ। তিনি তোমাদের জন্যে এতসব রাঁধতে পারবেন না। এবং দোহাই তোমাদের, গিয়েই তাঁর কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান আরম্ভ কোরো না। তাহলে বলা যায় না। হয়তো অসুস্থ শরীরেই...'

পাশে এক ভদ্রমহিলা উল—কাঁটা নিয়ে তীব্রগতিতে বুনে যাচ্ছিলেন। এতক্ষণ কিছু বলেননি। এবার মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা চার পেটুক দামুতে কোথায় চলেছ?'

অপ্রস্তুত হয়ে গন্তব্যস্থলটার নাম করেই চার বন্ধু চুপ হয়ে গেল।

রায়না গ্রামে শমুদের প্রচুর জমিজমা। ধান জমি, পুকুর—বাগান, গোরু—বাছুর। সমস্ত কিছুরই দেখাশোনা করেন শমুর বাবার নিঃসন্তান ছোটকাকিমা। ও অঞ্চলে এক ডাকে সকলে তাঁকে চেনে, ভালোবাসে, ভক্তি করে। বিষয়—সম্পত্তি যেমন দেখাশোনা করেন, তেমনি আবার ছোটঠাকুমার অন্য কতকগুলো অদ্ভুত গুণ আছে। হাত গুনতে পারেন, অনেক রকম তুকতাক জানেন, যার জন্য আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু লোক বিপদে—আপদে রায়নার মা—ঠাকরুনের কাছে ছুটে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সবসময় থাকে মাদুর্গার পাশে নন্দীর মতো হারুদা। যেমন বিশাল চেহারা আর স্বাস্থ্য, তেমনি কর্মক্ষমতা। হারুদাকে ফাঁকি দিয়ে কেউ এক পয়সাও ছোটঠাকুমার কাছ থেকে আদায় করতে পারবে না। তাই শমুর বাবা বিষয়—সম্পত্তি এবং ছোটঠাকুমার দেখাশোনা সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত।

ট্রেন একটু লেট ছিল। বর্ধমানে নেমে রেলওয়ে রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেবার প্ল্যানটা ওদের ভেস্তে গেল। রায়নার বাস তখন ছাড়ে—ছাড়ে। শুকনো মুখে চার বন্ধু বাসে উঠে পড়ল। সঙ্গে কমলালেবু ছিল, খেয়ে তেষ্টা মিটল বটে, কিন্তু খিদে আরও বেড়ে গেল। শমুর মা ছোটঠাকুমার জন্যে ভালো সন্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। তাতে তো আর হাত দেওয়া যায় না! রঞ্জু দু—একবার বলেছিল, 'দ্যাখ অত সন্দেশ তো বুড়োমানুষ একলা খেতে পারবেন না!' শুনে শমু এবং টুলু বলেছিল, 'সন্দেশের বাক্স এক্কেবারে সীল করা অবস্থায় ঠাকুমার

হাতে পৌঁছে দিয়ে তবে আমাদের ছুটি। তারপর যা করতে হয় উনিই করবেন। একলা খাবেন কি পাঁচজনকে বিলিয়ে দেবেন, আমাদের জানবার দরকার নেই।' রঞ্জু দুঃখিত হয়ে বলেছিল, 'একটু সীতাভোগ মিহিদানা কেনবারও সময় দিলি না। বর্ধমানের কতদিনের ঐতিহ্য!'

পিচের রাস্তা দিয়ে হু হু করে বাস ছুটেছে। দু—দিকে চাইলেই বোঝা যায় রীতিমতো বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। হৃষ্টপুষ্ট গোরু চরছে, বাচ্চাগুলো তেল—চুকচুকে। মাঠ থেকে ধান উঠে গেছে, অনেক বাড়ির সামনেই স্তূপীকৃত সোনালি ধান আঁটি বেঁধে রাখা, কোনো কোনো জায়গায় মরাইয়ে তোলা হয়ে গেছে।

রায়নায় যখন বাস পৌঁছল তখন বেলা প্রায় দুটো। এই দুপুরেও কেমন একটা হাড়—কাঁপানো হাওয়া দিচ্ছে। শমু বন্ধুদের আশ্বাস দিল ডাইনের পায়ে চলা পথটা ধরে খানিকটা গেলেই ওদের বাড়ি এবং বাড়ি গেলে চিড়ে মুড়ি দুধ কলা নারকোল ইত্যাদির কোনো অভাব হবে না। তার সঙ্গে ভালো পাটালি। পেটটা ভরিয়ে ওরা একটু বিশ্রাম করে নেবে। তারপর গ্রাম বাংলা দেখা যাবে।

'ওই তো দেখা যাচ্ছে বাড়ির গেট', শমু চেঁচিয়ে উঠল। বেড়ার গায়ে বাঁশের গেট। ভেতরে উঠোন, দু—পাশে করবী গাছ।

শমু ডাকল, 'হারুদা—আ।'

সাড়া নেই।

'ছোটঠাকুমা—আ!' দু—তিনবার ডাকের পর ভেতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, 'কে এলি? খিড়কি দিয়ে ঘুরে আয়। ওদিক বন্ধ।'

বাড়ি প্রদক্ষিণ করে পুকুরের ধারে খিড়কির দরজা। ঢুকতেই ভেতর—উঠোন। বিরাট এক মরাই। পাশেই দাওয়ার ওপর ঠাকুমার ঘর। বললেন, 'কে এলি, গোপাল?'

শমু বন্ধুদের জুতো খুলতে ইশারা করে নিজেও জুতো খুলতে খুলতে বলল, 'হ্যাঁ গো ঠাকুমা, আছ কেমন? এত শরীর খারাপ, আগে খবর দাওনি কেন?'

তিন বন্ধু ঢুকে গেল, পরিষ্কার একটি গ্রাম্য ঘর। কুলুঙ্গিতে সিঁদুর মাখানো ঠাকুর—দেবতার ছোটো ছোটো মূর্তি। একধারে জলচৌকির ওপর বিশাল বিশাল তোরঙ্গ। এদিকে তক্তপোশের ধবধবে বিছানার ওপর আলো—আঁধারিতে একটি বৃদ্ধা শীর্ণ হাত বাড়িয়ে তাদের ডাকছেন। 'এসো এসো, দাদুভাইরা। ছোটঠাকুমাকে দেখতে অ্যাদ্দিনে এলে?'

শমু বলল, 'তুমি ওঠো তো, আগে ওষুধ খাও। এই নাও, মা তোমার জন্য সিমলের সন্দেশ পাঠিয়েছে।'

'রাখ রাখ, ওই চৌকিটার ওপর রাখ দাদু। হাতটা ধুয়ে এসে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দে, তবে তো ওষুধ খাব!'

'আমার ট্রেনের কাপড়। জল খাবে তো?'

'না খেলে আর যাচ্ছি কোথায় মানিক? তোমার হাতের জল যে অমর্ত ভাই!'

শমু বাইরে থেকে হাত ধুয়ে এসে ঠাকুমার হাতে পাথরের গেলাসে জল গড়িয়ে দিল। ব্যাগ থেকে ট্যাবলেট বার করে বিছানার ওপর রেখে বলল, 'কোথায় তোমার চিড়ে—মুড়ি? কলা—টলা দিয়ে বন্ধুদের যাহোক কিছু খাওয়াই!'

'ওমা, ছেলের কী চ্যাটাং—চ্যাটাং কথা গো! ফলার খেতে যাবি কোন দুঃখে? রান্নাবান্না সব তৈরি। যাও তো দাদুরা, কুয়োতলায় গিয়ে চান করে এসো তো! তেল গামছা, সাবান সব আছে ওখানে। আমি ততক্ষণে সব ব্যবস্থা করে রাখছি।'

'রান্নাবান্না মানে?' শমু অবাক।

ফোকলা দাঁতে হাসতে লাগলেন ঠাকুমা, 'আমি যে হাত গুণতে জানি দাদুভাই। কত খিদেই না জানি পেয়েছে! যাও, তাড়াতাড়ি এসো।'

বিরাট ইঁদারা। এই পৌষমাসের শীতেও তার জল ভারী চমৎকার উষ্ণ। ঘানিভাঙা সর্ষের তেল মেখে চান করে ফেলল চার বন্ধুতে। শরীরে আর ক্লান্তি নেই। ঠাকুমার ঘরের দাওয়ায় এসে দেখে সব সাজানো হয়ে গেছে। বড়ো বড়ো চারটে পিঁড়ে পাতা। সামনে কানা—উঁচু বগি—থালায় গোল করে ভাত বাড়া। থালা ঘিরে কত বাটি। থালার মধ্যেও নানা ব্যঞ্জন। পাশে জলের গ্লাস, ছোট্ট রেকাবিতে মুখশুদ্ধি। নিশ্চয়ই ঠাকুমার কিছু স্পেশাল।

টুলু বলল, 'ইশ, করেছেন কী ঠাকুমা! জ্বরের ওপর এই এত্তোসব করেছেন? কী কাণ্ড!'

'জ্বর তো সন্দেবেলায়! সকালবেলাটা একটু দুব্বল—দুব্বল লাগে। সে এমন কিছু না। ও— বাড়ির বামুন—মেয়ে জোগাড় দিলে, একটু খুন্তি নেড়ে দিলুম। কিচ্ছু কষ্ট হয়নি। তোমাদের জন্যে এটুকু করতে পারব না। যা দরকার হয় চেয়ে নিয়ো। লজ্জা কোরো না।'

গোরা বলল, 'এর ওপর আবার চাওয়া? এই খেয়ে উঠতে পারলে হয়!'

'সে বাবা!' তোমাদের বাপ—ঠাকুরদারা যে তোমাদের বয়সে বাজি ধরে হাঁড়ি খেয়ে নিত।'

খেতে খেতে রঞ্জু অবাক। বললে, 'তুই যা যা বলেছিলি সবই যে রান্না করেছেন রে ঠাকুমা! এই দ্যাখ আনাজ দিয়ে ডাল, সুক্তুনি, মোচার ঘণ্ট, এটা কী? ছানার পাতুরি? ধোঁকার ডালনা, মৌরলা মাছের অম্বল...'

গোরা বললে, 'তোর রুই মাছের চাকাও বাটির মধ্যে থেকে ঘাই মারছে রে!'

শমু দেখল বন্ধুদের পাতে পড়লেও ওর নিজের পাতে মৌরলার অম্বল, রুই মাছের ঝাল কোনোটাই পড়েনি। তাড়াতাড়িতে কি ঠাকুমা অত জোগাড় করতে পেরেছেন? বলল, 'নতুন গুড়ের পায়েসের কী গন্ধ বেরিয়েছে দেখেছিস?' তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাকুমা, এ যে ফাঁসির খাওয়া খাওয়াচ্ছ!'

ঘরের মধ্যে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, 'বালাই ষাট, খেয়ে নাও দাদু, কিচ্ছুটি ফেলো না!'

এক—একটি পদ মুখে দিচ্ছে আর তিন বন্ধু মুখ চাওয়া—চাওয়ি করছে। শমু একটুও বাড়িয়ে বলেনি। সত্যিই এমন জিনিস তারা জীবনেও খায়নি। গোরা বলল, 'আমার দিদিমার থেকেও ভালো। কী গন্ধ বেরোচ্ছে দেখেছিস?'

শমু বলল, 'বাড়ির গোরুর দুধের সরের ঘি, গন্ধ তো বেরোবেই। কিন্তু সত্যি, ছোটঠাকুমা আজ একটা কাণ্ডই করেছেন।' চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাকুমা, আজ নিজের রেকর্ড নিজেই ব্রেক করেছে।'

ঘর থেকে সারা এল না। টুলু উঁকি মেরে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছেন। বেশি চেঁচামেচি করিস না।' খাওয়ার পর ওদিককার ঘরে নিয়ে গেল শমু। বিরাট কারুকার্যকরা সেকেলে পালঙ্ক। চারজনে চারটে বালিশ নিয়ে গড়িয়ে পড়ল। আরামে চোখ বুজে আসছে। ক্লান্তি, ইঁদারার জলে স্নিগ্ধ স্নান, অপূর্ব খাওয়া, গ্রামের তাজা হাওয়া, শেষ বেলার রোদ। দেখতে—দেখতে চারজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল সন্ধেবেলায়, ঘরের দরজায় প্রবল ধাক্কাধাক্কিতে। চোখ মুছতে মুছতে খিল খুলে দিল শমু। সামনে হারুদা। এই শীতেও খালি গা। নতুন কোরা কাপড়ের কোঁচাটা গলায়।

'কখন এলি?'

কেন, ঠাকুমা বলেনি? দুটো নাগাদ এসে পৌঁছেছি।'

'ঠাকুমা বলেনি মানে?' হারুদার মুখ হাঁ।

'তুমি ছিলে কোথায়? এখনও ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করোনি?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে হারুদা বললে, 'সব তো তালা দেওয়া, ঢুকলি কী করে?'

শমু বলল, 'খিড়কি খোলা ছিল। ঠাকুমা ওদিক দিয়েই আসতে বলল।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কী? চান করলুম, ঠাকুমা রেঁধে রেখেছিল খেলুম। হ্যাঁ, ঠাকুমাকে ওষুধ খাইয়েছি, বাবা পাঠিয়েছেন।'

'কী খেলি?'

'ওরে বাবা, সে অনেক, সুক্তুনি, মোচার ঘণ্ট, ধোঁকার ডালনা...'

হারুদার হাতে লণ্ঠন। আলো পড়ে চোখ দুটো চিকচিক করতে লাগল। বলল, 'গোপাল এই মাত্র মা—ঠাকরুনকে দাহ করে ফিরছি।'

'মানে?' চিৎকার করে উঠল শমু, 'আমাদের খাইয়ে—দাইয়ে ঠাকুমা মারা...'

'না, তোদের খাওয়াবার আগেই। গতকাল রাত একটায়। টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। বাবু আজ কী কাল পাবেন। মা—ঠাকরুনের হুকুম ছিল, ছ—সাত ঘণ্টার বেশি যেন দেহ না রাখা হয়। ও—পাড়ার রতন ভটচাজ মুখাগ্নি করলেন।'

শমুর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না, কোনোমতে বলল, 'কিন্তু আমরা যে... আমাদের যে...'

হারুদা বলল, 'আয়, দেখবি আয়।'

সারি—সারি ঘরে তালা ঝুলছে। দালানে ওদের ভূরিভোজের চিহ্নমাত্র নেই। ঠাকুমার ঘরের তালা খুলতে খুব সুন্দর একটা গন্ধ ওদের নাকে এসে লাগল। রঞ্জু দেখল, জলচৌকির ওপর রাখা সন্দেশের বাক্সটাতে পিঁপড়ে ধরেছে। ঘরের কোণে একটা পিদিম জ্বলছে। আর, সেই পিদিমের আলোয় শমুদের দেখে গ্রাম্য বাড়ির দেওয়ালে টাটকা রজনীগন্ধার মালার মধ্যে থেকে একটি মমতাময়ী বৃদ্ধার মুখ তাদের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ কৌতুক আর স্নেহের হাসি হাসছে।

পণ্ডিত ভূতের পাহারায়

শেখর বসু

চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে মনের মতো একটা বাড়ি বানিয়েছিলেন হরিচরণ সাঁই। কৃপণ বলে ভীষণ বদনাম ছিল ওঁর, কিন্তু বাড়ি বানাবার ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য করেননি। দু—হাতে টাকা খরচ করেছেন। বাড়ির প্রতিটি জিনিস সেরা। ছোট্ট দোতলা বাড়ি, সামনে একটা বাগান।

এই গাঁয়ে আরও কয়েকটা দোতলা বাড়ি আছে, কিন্তু সেগুলো দেখতে একটুও ভালো নয়। ইটের পরে ইট গাঁথা মাঠকোঠা। ছোটো—ছোটো জানালা—দরজা। সেই জন্যে ঘরগুলো কেমন যেন অন্ধকার—অন্ধকার। কিন্তু হরিচরণের বাড়ি অন্য নিয়মে বানানো। শহর থেকে বড়ো মিস্তিরি এনেছিলেন। সেই সঙ্গে এনেছিলেন দামি—দামি মালপত্র।

গাঁয়ের লোকে হাঁ করে সেই বাড়ি বানানো দেখত। বাড়ি নয়, যেন ছবি। বড়ো বড়ো জানলা—দরজা। দোতলায় বাহারি রেলিং বসানো ঝুলবারান্দা। বাড়ির দেয়ালের রঙের কী বাহার!

গাঁয়ে কয়েকজন বন্ধু আছেন হরিচরণের। তাঁদের সবার মুখেই এক কথা। বলতেন : হরি তোমার হলটা কী! সারা জীবন তোমার হাত দিয়ে একটা পয়সাও গলেনি। কিপটেমি করে কাটালে। এখন সব জমানো টাকা ঢেলে দিচ্ছ বাড়ি তৈরির পেছনে! বাড়ির দিকে তাকিয়ে কি তোমার পেট ভরবে! চাকরিবাকরি শেষ, জমানো টাকার কিছুটা রেখে না দিলে বাকি জীবনে খাবে কী! তুমি একা নও, বউ আছে। দুটো পেট, খেয়ে—পরে বাঁচতে হবে তো!

হরিচরণ মুচকি হেসে সব বন্ধুকে এক কথা শোনাতেন। বলতেন : ভাই, এইরকম বাড়ি বানানো ছিল আমার সারা জীবনের স্বপ্ন। সেই জন্যই চিরটাকাল অত কষ্টে থেকে টাকাপয়সা জমিয়েছি। কথায় বলে, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। তা, আমার কেষ্ট এই বাড়িটা। সাত গাঁয়ের লোক বলবে, হ্যাঁ, বাড়ি বটে একখান! শহরের লোকও চমকে যাবে এই বাড়ি দেখে। আর, খাওয়াদাওয়ার কথা বলছ? আমাদের পেট বলতে মাত্র দুটো। ছেলেপুলে নেই। ডাল ভাত খেয়ে বুড়োবুড়ির দিব্যি চলে যাবে।

দোতলা বাড়ি বানাবার পেছনে হরিচরণের আর একটা হিসেব ছিল। সেই হিসেবটা উনি গোড়ার দিকে বন্ধুবান্ধবদের কাছে ভাঙেননি। হিসেবটা পরিষ্কার। এখন গাঁয়ে বেশ কিছু সরকারি কাজকর্ম শুরু হয়েছে। সেই কাজের সুবাদে বাইরের লোকজন আসছে। তাদের থাকার মতো খুব বেশি জায়গা নেই এই গাঁয়ে। হরিচরণ ঠিক করেছিলেন, ওঁদের কারও কাছে এ—বাড়ির একতলাটা ভাড়া দিয়ে দেবেন। নিজেরা থাকবেন দোতলায়। ভাড়ার টাকায় দিব্যি চলে যাবে খাওয়াপরা।

নিখুঁত হিসেব। বাড়ি শেষ হওয়ার মুখ থেকেই বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্যে ঘুরঘুর করতে শুরু করে দিয়েছিল লোকজন। সবার সঙ্গেই কথা বললেন হরিচরণ। শেষে বেশ মোটা টাকায় ভাড়াটে বসালেন একতলায়। কিন্তু মাস ফুরোবার আগেই সে ভাড়াটে পালাল। তার পরে যে এসেছিল তার আয়ু মাত্র পনেরো দিন। এই ঘটনাই ঘটতে লাগল পরের পর। সাত মাসে আট জন ভাড়াটে পালাল এই বাড়ি থেকে।

বদনাম হয়ে গিয়েছিল বাড়ির। এত সুন্দর বাড়ি, কিন্তু ভাড়াটে আর জুটছিল না। হরিচরণ বাড়ির ভাড়া কিছু কমিয়েও দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাও কেউ এল না। যে আটজন ভাড়াটে এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে তাদের সবার মুখেই এক কথা : রাত্তিরে যদি ঘুমোতেই না পারি, সুন্দর বাড়িতে থেকে আমাদের হবেটা কী?

হরিচরণের বন্ধুবান্ধবরা এসে বোঝাতে শুরু করলেন বন্ধুকে। একটু ঘুরিয়ে—ফিরিয়ে সবার মুখেই এক কথা। বললেন : হরি, তোমার এ পাগলামো ছাড়ো। লোকে বাড়ি ভাড়া নেয় কেন? থাকার জন্যে তো? তা, থাকা মানে তো শুধু দিনের বেলায় থাকা নয়। রাত্তিরে ঘুমও দরকার। সেই ঘুমটাই যদি না হয়, এ বাড়িতে থাকার কোনো মানে হয় না।

এসব কথা শুনে চটে উঠতেন হরিচরণ। সব বন্ধুকেই শুনিয়ে দিতেন একই কথা। বলতেন: আমার টাকা পড়ে—পাওয়া টাকা নয়। রক্ত জল করে রোজগার করেছি। নিজের কোনো শখ—টখ মেটাবার দিকে যাইনি কখনো। কষ্ট করে থেকেছি। কেন থেকেছি? না, চাকরিবাকরি শেষ হলে জমানো টাকা দিয়ে মনের মতো একটা বাড়ি বানাব। সে বাড়ি আমি বানিয়েছি শেষপর্যন্ত। বানানো মানেই কিন্তু কাজ শেষ নয়। বাড়ি দেখাশোনা করাও তো কাজের মধ্যে পড়ে। দিনের বেলায় দেখার লোকের অভাব হয় না। কিন্তু রাতে? রাতে কে দেখবে? রাতে দেখা মানে পাহারাদারি করা। আমি সেই পাহারাদারির কাজটুকু করি। বিনি পয়সায় এতবড়ো একটা কাজ করে দেওয়ার জন্যে ভাড়াটেদের তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল আমার কাছে! তা না, উলটে ওরা আমার নিন্দেমন্দ করে বেড়াচ্ছে। বলে কিনা বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরেছে আমার! দরকার নেই আমার ভাড়াটের। কিন্তু আমার বাড়ি আমি পাহারা দেবই। ঘরের ভেতরের দামি জিনিসপত্রের কথা বাদ দাও, এ বাড়ির জানলা—দরজা, এমনকী দেয়ালেও অনেক দামি—দামি জিনিসপত্র লাগানো আছে। ওগুলো চুরি হয়ে যেতে পারে যেকোনো রাতে। চোররা যাতে সে সুযোগ না পায় তার জন্যে নজরদারি তো আমাকে চালাতে হবেই। কী, অন্যায় কিছু বললাম?

হরিচরণের সঙ্গে তর্কে এঁটে ওঠা কঠিন। তা ছাড়া এ—বাড়িটা ওঁর নিজের বাড়ি। কীভাবে চালাবেন সে—ব্যাপারে ওঁর কথাই শেষ কথা। তবু বন্ধুরা এই বন্ধুটির মতি ফেরাবার চেষ্টা করতেন। কেউ বলতেন, 'এ গাঁয়ে তো তেমন চুরি হয় না।'

উত্তরে বেশ জোর গলায় বলতেন হরিচরণ, 'আজ তেমন হচ্ছে না, কিন্তু কাল থেকে তো হতে পারে। কথায় বলে, সাবধানের মার নেই। আমি সাবধানে থাকছি শুধু।'

কেউ বলতেন, 'ঠিক আছে, তুমি পাহারা দিচ্ছ দাও। পাহারা দেওয়ার ভঙ্গিগুলো শুধু পালটে দাও।'

এই ধরনের কথার জবাবে একটু চটেই যেতেন হরিচরণ। 'চোর যাতে বাড়িতে না ঢোকে সেই জন্যে তো আমি রাত জেগে পাহারা দিচ্ছি। তা, আমি যে চোর তাড়াবার জন্যে জেগে বসে আছি, এটা চোররা জানবে কীভাবে? ওদের জানান দেওয়ার জন্যে আমি তাই একটু—আধটু কায়দা করি।'

'কী কায়দা?'

'সে আছে কয়েকটা।'

'বলো না।'

'এর আবার বলাবলির কী আছে! আর পাঁচজনও তো নিজেদের বাড়ি পাহারা দেয়, আমিও দিই। আমার শুধু নিজস্ব কয়েকটা কায়দা আছে।'

'কী সেই কায়দাগুলো।'

নাছোড় এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে কায়দার কথা ফাঁস করতে বাধ্য হলেন হরিচরণ। 'আমার একজোড়া মোটা কাঠের খড়ম আছে। কাশীতে গিয়ে কিনেছিলাম অনেক বছর আগে। তোলাই ছিল খড়মজোড়া, এখন একটু—আধটু কাজে লাগাই।'

'কীরকম?'

'রাত একটু গভীর হলে এই পাড়াটা একেবারে নিঝুম হয়ে যায়। তখন আমি ওই খড়মজোড়া বার করি। তারপর গায়ে গলিয়ে হেঁটে বেড়াই দোতলার তিনটে ঘরে আর বারান্দায়। ওইটুকু খড়ম, কিন্তু কী তার আওয়াজ! শুনলে মনে হয় আর একটু শুনি।'

'তোমার ঘরগুলোর নীচেই তো ভাড়াটের ঘর, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তো, ওই বিকট আওয়াজে তো ওদের ঘুম ভেঙে যেত।'

'বিকট ভাবলে বিকট, মধুর ভাবলে মধুর।'

তর্কের মধ্যে না ঢুকে বন্ধু বললেন, 'ভাড়াটেদের ঘুম ভেঙে যেত, এটা তো তুমি মানছ—।'

'এর আবার মানামানির কী আছে! অনেক কারণেই অনেকের ঘুম ভেঙে যায় রাত্তিরে। কিন্তু ঘুম তো কাচের বাসন নয় যে, জোড়া দেওয়া যাবে না। ফের ঘুমোলেই তো ভাঙা ঘুম জুড়ে যায় আবার।'

'কিন্তু ঘুম জোড়া দেওয়ার সময় পেত না যে ভাড়াটেরা। সারা রাত খড়ম পায়ে ছাতের ওপরে হেঁটে বেড়ালে কি ঘুমানো যায়? তোমার ঘরের মেঝে মানে ভাড়াটেদের ছাত।'

আপত্তি করার গলায় হরিচরণ বলেছিলেন, 'আমি তো খড়ম পায়ে সারারাত হাঁটি না। খড়ম পায়ে থাকে শুধু প্রথম রাতে। তারপর আমার কাশি শুরু হয়। আমার একটু কাশির ধাত আছে, জানো তো?'

বন্ধু হেসে বললেন, 'কাশি যদি পায় কাশবে। কাশি পেলে সবাই কাশে। এটা তো আর দোষের নয়।'

হরিচরণ গম্ভীর মুখে বললেন, 'না হে, আমার কাশি খুকখুকে কাশি নয়। জোরালো কাশি। রাতের দিকে সেই কাশির জোর আরও বেড়ে যায়। আমার বউ তো এখন একদম কানে শুনতে পায় না। রাম কালা। কিন্তু যখন শুনতে পেত তখন দূরের ওই পুকুরপাড়ে বসেও চমকে উঠত। বলত, তোমার কাশি শুনে মনে হয় বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। লাঠির বাড়ি মেরে টিনের চাল ভাঙছে। তা, কথাটা তখন আমার মন্দ লাগত না। ব্যাটাছেলের কাশি তো এইরকমই হওয়া উচিত। বয়েস বাড়ার জন্যে কাশির জোরও বেড়ে গেছে এখন। তবে আগে কাশির মধ্যে যে বীরত্বের ভাবটা ছিল, এখন তা আর নেই। এখন কাশিটা কেমন যেন? মনে হবে, আওয়াজ মাটির নীচে থেকে এসে কলসির তলা ফুটো করে ঢুকে বিকট হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটু শুনবে নাকি?'

বন্ধু আঁতকে উঠে বলল, 'না—না, থাক।'

হরিচরণ কাপড়ের খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'তা, রাতের দিকে ওই কাশিটা এলে আমি আর ওকে সহজে ছাড়ি না।'

'সহজে ছাড়ো না মানে?'

'গলায় কাপড়—টাপড় জড়িয়ে নিলে, কাশির ওষুধ খেলে, আপদ বিদেয় হয়। কিন্তু আমি রাতের বেলায় আমার কাশিকে আপদ ভাবি না। একটু কষ্ট হয় ঠিকই, আমি গলা সাধার কায়দায় কাশিটাকে অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাই।'

'কিন্তু কেন?'

'একটাই কারণ। বিকট ওই শব্দ শুনে চোর ভাবে গেরস্ত জেগে আছে। লোক জেগে থাকলে চোরেরা কি আর চুরি করতে বাড়িতে ঢোকে?'

'তা হয়তো ঠিক। কিন্তু তোমার কাশির যে রকমসকম শোনালে, ওই শব্দে তো তোমার একতলার ভাড়াটের ঘুম ভেঙে যেত নির্ঘাত।'

বন্ধুর কথায় একটু বিরক্ত হয়ে হরিচরণ বললেন, 'তুমি ওদের ঘুম ভেঙে যাওয়াটাই বড়ো করে দেখছ! আমি যে কত কষ্ট করে গোটা বাড়িটা পাহারা দিচ্ছি, সেটা কি কিছুই নয়!'

থতমত খেয়ে গিয়ে বন্ধু বললেন, 'তা ঠিক, তা ঠিক। তবে তুমি সবার কথা যেভাবে ভাবছ, সবাই তো আর তোমার কথা সেভাবে ভাবছে না। বরং উলটো বুঝছে। দুনিয়াটাই এইরকম। তা, তোমার চেয়ে তাড়াবার আর কি কোনো কায়দা আছে?'

মুচকি হেসে হরিচরণ বললেন, 'এই কায়দাটা আমার কিন্তু মন্দ লাগে না। ছেলেবেলায় রাসের মেলায় গেলেই আমি বেহালা কিনতাম। খেলনা বেহালা। ওই বেহালায় ছড় টানতে টানতে মনে হত, আমি একদিন ঠিক যাত্রাদলের বাজিয়ে হব। কিন্তু মানুষ যা চায় তা তো আর পায় না বেশিরভাগ সময়। যাত্রাদলের বেহালা

বাজিয়ে হওয়া আমার আর হয়ে ওঠেনি। তবে মনের মধ্যে ওই সাধটা এখনও রয়ে গেছে। বেহালার মতো কিছু একটা বাজাবার ভঙ্গি করলে আজও সুখ পাই। আমাদের দোতলায় টানা বারান্দাটা তুমি দেখেছ তো?'

'দেখেছি, খুবই সুন্দর।'

'গোটা বারান্দায় লম্বা গ্রিল বসানো। রাতের আবছা আলোয় দেখলে মনে হবে, গ্রিল নয়, বেহালার তার। ঘরে বাহারি একটা ছড়ি আছে, রাতের বেলায় ওটাকেই মনে হয় বেহালার ছড়। ওই ছড় আমি বেহালা বাজাবার কায়দায় গ্রিলের ওপরে টানি। এলোপাথাড়ি টান নয়। টানের মধ্যে বেশ একটা তাল আছে। তালটা কীরকম জানো—ক্রি রিং ক্রি রিং ঘ্যাঙ, ক্রি রিং ক্রি রিং ঘ্যাঙ—।'

আঁতকে উঠে বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, 'আওয়াজ ওঠে কীরকম?'

'গানবাজনা মানেই তো আওয়াজ। আমার ওই নতুন ধরনের বেহালার আওয়াজ গোটা এলাকার লোকই বোধহয় কমবেশি শুনতে পায়।'

'তোমার ওই বাজনা চলে কতক্ষণ?'

'মাঝরাত্তিরের পরেই শুরু করি, আর ভোরের আলো ফুটলেই থামি।'

দু—দিকে দু—হাত ছড়িয়ে বন্ধু হতাশ মুখে বললেন, 'তা হলে তোমার ভাড়াটেরা তো রাত্তিরের কোনো সময়েই ঘুমোবার সুযোগ পেত না।'

'কেন পেত না? ইচ্ছে থাকলেই পেতে পারত। গান—বাজনায় ঘুম তো আরও গাঢ় হয়। নিজের মুখে বলা ঠিক নয়, তবু বলছি। আমার সব শব্দের মধ্যে বেশ একটা সুরতাল থাকে। কেউ একটু ভালো লাগাবার চেষ্টা করলেই নির্ঘাত ভালো লাগত। সব সময় অমন পালাই—পালাই করলে হয় না। আমি দেখেছি আজকালকার মানুষজনের ধৈর্য বড়ো কম।'

'তুমি এক কাজ করবে?'

'কী?'

'যারা রাত্তিরে ঘুমোয় না, তাদেরই তুমি এবার ভাড়াটে হিসেবে বসাও।'

সরল মনে হরিচরণ জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা কারা?'

মুচকি হেসে বন্ধু বললেন, 'কারা আবার, চোররা। রাত্তিরে চুরি করতে বেরোবে, সুতরাং তোমার বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকতে কোনো অসুবিধে নেই। চুরি করে ভোরে যখন ফিরবে তখন তো বাড়ি শান্ত ঘুমোতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

বন্ধুর ঠাট্টা শুনে হরিচরণ খুব কষ্ট পেলেন, কিন্তু উনি আর তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে চুপ করে গেলেন। কিন্তু ঠাট্টার জ্বালা ভুলতে না পেরে সন্ধেবেলায় বউকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমিই বলো, আমি কি কোনো অন্যায় করেছি? এদিকে চোরের উৎপাত এখনও ঠিক সেভাবে শুরু হয়নি, কিন্তু হতে তো পারে যেকোনো দিন। আমি তাই সারারাত জেগে বাড়ি পাহারা দিই। গেরস্ত জেগে থাকলে চোর তো চুরি করতে ঢোকে না। সেই জন্যেই আমার জেগে থাকা। আর নানান ধরনের শব্দটব্দ করে চোরদের জানান দেওয়া যে, আমি জেগে আছি। এখানে সুবিধে হবে না। অন্য বাড়ি দেখো। তুমি বলো, এটা কি অন্যায়? কিন্তু ভাড়াটেরা ভুল বুঝে বাড়ি ছাড়ে। এখন নিন্দেমন্দ করে বেড়াচ্ছে আমার। ব্যাপারটা কত দূর করে আমার সঙ্গে। বলে, তোমার বাড়ি তা হলে চোরদের ভাড়া দিয়ে দাও। এখানে থাকতে চোরদের কোনো অসুবিধে হবে না। কথাটা শুনে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি মনে। কিছুতেই ভুলতে পারছি না সে কষ্ট।'

সব কথা বলা শেষ হলে গিন্নি বললেন, 'কী আর করবে বলো! তবে এবার থেকে সাবধান হতে হবে। আমাদের বাগানের গেটটা পলকা। একটু চাপ দিলেই খুলে যায়। গেটে ঠেলা দিয়েই গেট খুলে বাগানে ঢুকে বাগান নষ্ট করছে গোরু। তুমি এবার বাগানে একটা লোহার গেট বসিয়ে দাও। ব্যস, তা হলে আর গোরু—ছাগল বাগান নষ্ট করতে পারবে না।'

কী কথার কী উত্তর! হরিচরণ কপাল চাপড়ে বললেন, 'কালার মরণ! একটা কথা যদি কানে যায়!' বিরক্ত হয়ে উনি ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

এইভাবেই দিন গড়াতে লাগল। মাসের পর মাস কেটে গেল, কিন্তু হরিচরণের বাড়িতে আর কোনো ভাড়াটে এল না। তার বদলে যাঁরা এলেন তাঁরা সাধারণত পোড়োবাড়িতে থাকেন। হরিচরণের একতলার ফ্ল্যাটে বিনে ভাড়ার বাসিন্দা হলেন দুজন ভূত। এঁরা আজেবাজে ভূত নন, খুব পণ্ডিত ভূত। ভূতদের সমাজে সবাই এঁদের খুব মান্যিগন্যি করেন। পড়াশুনোর সুবিধের জন্যে এঁরা একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিলেন অনেক দিন ধরে। হঠাৎ এই ফাঁকা ফ্ল্যাটটা পেয়ে গিয়ে ওঁদের আনন্দ আর ধরে না।

সাজানো—গোছানো ঘর। প্রতিটি ঘরে দেয়াল—আলমারি। কোণের দিকের একটা ঘর বেছে নিয়ে ভূত দুজন নিজেদের বইপত্তর গুছিয়ে ফেললেন আলমারির মধ্যে। এঁরা খুব একটা দরকারি বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। বিষয়টি হল 'মানুষদের ভূতের মতো ব্যবহার।' কিছু মানুষের কাণ্ডকারখানা ঠিক চ্যাংড়া ভূতদের মতো। মানুষগুলো কেন অমন করে? স্বভাব—ভূতুড়ে হয় কেন? এইসব কারণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন এই দুই পণ্ডিত ভূত।

রাত একটু গভীর হলে পণ্ডিত ভূত দুজন বসে গেলেন পড়াশুনো করতে। চারদিক অসম্ভব নির্জন। লেখাপড়ার কাজ এগোতে লাগল তরতর করে। হঠাৎ দুজন ভূতই চমকে উঠলেন একসঙ্গে। মাথার ওপর খট—খট—খটাং। কী ব্যাপার! পাড়ার কিছু বাজে ভূত কি বিরক্ত করতে এসেছে ওঁদের!

কিছুক্ষণ মন দিয়ে শব্দটা শোনার পরে ওঁরা বুঝতে পারলেন, এ শব্দ ভূতের নয়। দোতলায় কোনো মানুষ শব্দ করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত তো!

কোনো শব্দ যদি একভাবে একটানা অনেকক্ষণ ধরে চলে, আস্তে আস্তে সেটা কানে সয়ে যায়। পণ্ডিত দুই ভূত আবার তাঁদের কাজে মন বসালেন কোনোমতে। কিন্তু কাজ বেশিদূর এগোতে পারল না। হঠাৎ খক—খক করে প্রচণ্ড জোরে কাশির শব্দ উঠল। কাশি আর থামতেই চায় না। নিশুতি রাতে বিকট কাশির দমকে গোটা পাড়াটা প্রায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এই শব্দটাও ভেসে আসছে দোতলা থেকে।

এইরকম বিকট শব্দের মধ্যে কি কাজে মন বসানো যায়! কিন্তু বসাতেই হবে। গবেষণার কাজে মন না বসালে চলে না। ভূত দুজন আবার নিজেদের কাগজপত্তরের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বাদে ভয়ংকর একটা শব্দে ওঁদের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছিল। হাতের ধাক্কায় দরকারি কাগজপত্তর ছড়িয়ে পড়েছিল মেঝেয়। এটা আবার কীসের শব্দ? ক্রি—রিং—ক্রি—রিং ঘ্যাঙ, ক্রি—রিং ক্রি—রিং ঘ্যাঙ। দোতলার ওই বিদঘুটে শব্দ সারা পাড়া প্রায় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

এত গোলমালের মধ্যে কাজকর্ম করা তো দূরের কথা, ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকাও অসম্ভব। ব্যাপার কী দেখার জন্যে পণ্ডিত দুই ভূত হাওয়ায় মিশে গিয়ে শাঁ করে দোতলায় চলে এলেন।

এখানে এসে ওঁদের চমকাতে হল আরও একবার। হরিচরণের পরনে খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া, পায়ে খড়ম; তিনি একমনে ছড়ি টেনে যাচ্ছিলেন বারান্দার গ্রিলে। ওই টানেই বিকট শব্দ উঠছিল।

পণ্ডিত দুই ভূতের মধ্যে একজন মাস্টারমশাই আর একজন ছাত্র। মাস্টারমশাই ফিসফিস করে ছাত্রকে বললেন, 'আরে! এ লোকটা তো আমাদের গবেষণার কাজে লেগে যাবে। একেই বলে মানুষের ভূতের মতো ব্যবহার। কিন্তু লোকটা এরকম করছে কেন?'

কারণটা জানার জন্য ভূত দুজন মানুষের চেহারা ধরে হরিচরণের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। মাঝ রাত্তিরে হঠাৎ ঘরের মধ্যে লোক দেখে হরিচরণ 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই মাস্টারমশাই ভূত বলে উঠলেন, 'আমরা চোর নই, ভূত। আপনি শুধু শুধু ভয় পাবেন না।'

হরিচরণ ভূতের চাইতে চোরদের ঢের বেশি ভয় পান। ভূতের কথায় সামান্য বুঝি ভরসা পেলেন। তবে মন থেকে সন্দেহ দূর হচ্ছিল না। চোখ ছোটো করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা যে ভূত, তার প্রমাণ কী? আপনারা কি নিজেদের মাথা নিজেরাই চিবিয়ে খেতে পারেন?'

এই ধরনের বিচ্ছিরি একটা প্রমাণ চাওয়ার জন্য পণ্ডিত ভূত দুজন বেশ কষ্ট পেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে মাস্টারমশাই ভূত বললেন, 'আমরা লেখাপড়া নিয়ে থাকি। চ্যাংড়া ভূতদের মতো ওইসব কাণ্ডকারখানা আমাদের পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়। তবে আপনি যখন প্রমাণ চাইছেন, আমরা একটু ভূতের নাচ নেচে দেখাতে পারি। দেখবেন?'

ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে হরিচরণ বললেন, 'ভূতের নাচ! সে তো শুনেছি দারুণ জিনিস! নিশ্চয়ই দেখব।'

ঘরের মধ্যে নাচ জুড়ে দিলেন দুই পণ্ডিত ভূত। বিশুদ্ধ ভৌতিক নাচ। মাথা নীচে, পা ওপরে। ভূতরা কখনো এপাশে কখনো ওপাশে, কখনো জানলায় কখনো সিলিং—এ।

হরিচরণ আজকাল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। কালা গিন্নির সঙ্গে কথা বলে সুখ নেই। এই অবস্থায় ভূতের নাচ দেখে খুব মজা পেলেন উনি।

নাচার ফলে দুই পণ্ডিত ভূতই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। লম্বা নিশ্বাস ফেলে মাস্টারমশাই ভূত বললেন, 'আমরা যে সত্যি সত্যিই ভূত, এবার বিশ্বাস হয়েছে তো?'

হরিচরণ হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, হয়েছে। এবার বলুন, আপনাদের জন্যে আমি কী করতে পারি?'

পণ্ডিত দুই ভূত ঘোরপ্যাঁচের ভূত নন। সাদা, সরল ভূত। পরিষ্কার ভাষায় মাস্টারমশাই ভূত বললেন, 'আমরা পড়াশুনো করা ভূত। একটা গবেষণার কাজে হাত দিয়েছি। এখন আপনি যদি আমাদের একটা সাহায্য করেন—।'

'কী ধরনের সাহায্য?'

'আপনার একতলায় কোণের ঘরটায় বসে আমরা পড়াশুনো করব। আপনার সঙ্গে মাঝেমধ্যে এসে গল্পও করে যাব। এর বিনিময়ে যা চান তাই দেব আপনাকে।'

হরিচরণ বিষয়ী মানুষ। ভূতের কথা শোনার পরে ওঁর গোঁফের ফাঁকে একটা ধূর্ত হাসি খেলে গিয়েছিল। হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনারা পণ্ডিত ভূত। পড়াশুনো করবেন, এ তো খুব আনন্দের কথা। আমি খুব একটা লেখাপড়া করার সুযোগ পাইনি, কিন্তু লেখাপড়া ভীষণ ভালোবাসি। তা, কতদিন আপনারা ওই ঘরটায় বসে পড়াশুনো চালাতে চান?'

'বেশি দিন নয়, মাত্র দশ বছর।'

একটু চমকে উঠে হরিচরণ বললেন, 'আপনাদের কাছে দশ বছর কিছুই নয়, কিন্তু মানুষের কাছে দশ বছর মানে অনেকখানি। আমি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। ষাট পেরিয়ে গেছে। অদ্দিন কি আর বাঁচব?'

মাস্টারমশাই ভূত স্নেহের গলায় বললেন, 'খুব বাঁচবেন। প্রাণে শান্তি থাকলে যে কেউ বহু বছর বেঁচে থাকে। আপনি যাতে শান্তিতে থাকেন, আনন্দে থাকেন, সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য।'

কথা শুনে বেশ আশ্বস্ত হলেন হরিচরণ। ওঁর বিষয়বুদ্ধিটাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আবার। বললেন, 'তা হলে আপনারা ওই ঘরে আপনাদের পড়াশুনো চালাতে চালাতে আমার যদি একটা ছোট্ট উপকার করেন।'

'কী উপকার?'

হরিচরণের মুখ দুঃখী মানুষের মতো হয়ে উঠেছিল। বললেন, 'জানেন তো আমার কষ্টের শেষ নেই। আমি অনেকদিন ধরে রাতে ঘুমোতে পারছি না।'

'কেন, আপনি কি অনিদ্রা রোগে ভুগছেন?'

'না—না, রাত হলেই ঘুমে আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে যায়। অথচ ঘুমোতে পারি না।'

'কী দুঃখের কথা! কেন এমন হয় বলুন তো?'

মাস্টারমশাই ভূতের স্নেহমাখানো কথা শুনে কান্না পেয়ে গিয়েছিল হরিচরণের। ঢোক গিলে বললেন, 'সারা জীবন ধরে তিল—তিল করে জমানো টাকা নিয়ে এত সুন্দর এই বাড়িটা আমি বানিয়েছি। এ বাড়ি তো

আমার দেখাশোনা করা দরকার।'
'নিশ্চয়ই।'
'পাহারা দেওয়া দরকার।'
'নিশ্চয়ই।'
আর একবার ঢোক গিলে হরিচরণ বললেন, 'আমি খবর পেয়েছি আশেপাশের অনেক চোরের নজর আছে এই বাড়ির ওপর। রাতে আমি ঘুমোলেই ওরা হানা দেবে এখানে। বাড়িতে নানারকমের দামি জিনিসপত্র আছে। আমি ঘুমোলেই ওরা সেগুলো চুরি করবে।'
মাস্টারমশাই মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন আপনি। চোর তাড়াবার জন্যেই তা হলে আপনাকে জেগে থাকতে হয়, তাই তো?'
দু—চোখ জলে ভরে উঠেছিল হরিচরণের। বললেন, 'ঠিক তাই। এখন আপনারা যদি আমার একটা উপকার করেন।'
ছাত্র ভূত তড়াক করে বলে উঠল 'বুঝতে পেরেছি। চোর তাড়াবার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের। তাই না?'
'হ্যাঁ, তাই।'
ছাত্র ভূতের বয়েস কম। বুক ফুলিয়ে বলল, 'ও নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না। কেউ এ বাড়িতে চুরি করতে ঢুকলে তার ঘাড় মটকে দেব।'
কথাটা শুনে খুব খুশি হলেন হরিচরণ। তারপর একটু দোনামনা করে বললেন, 'প্রথমেই ঘাড় মটকাবার দরকার নেই। আগে একটু ভয় দেখালে হয় না? তাতে কাজ না হলে পরে শক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।'
মাস্টারমশাই ভূত ঘাড় নাড়লেন হরিচরণের কথায়। 'আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রথমে ঘাড় মটকাবার দিকে যাব না আমরা। ভয় দেখালে চোর পালাবে। কেউ—কেউ ভয়ে অজ্ঞানও হয়ে যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ বাড়িতে ঢুকে চুরি করবার সাধ্য কোনো চোরের হবে না।'
ভূতের কথা শুনে খুশি মনে হরিচরণ বললেন, 'ঠিক আছে একতলায় কোণের ঘরে আপনারা পড়াশুনোর কাজে লেগে পড়ুন। আমার কোনো আপত্তি নেই।'
মাসখানেক ধরে বিস্তর চেষ্টা করার পরে বাড়িতে আবার ভাড়াটে বসালেন হরিচরণ। একতলার কোণের ঘরটা বাদে বাকি দুই ঘরে ভাড়াটে বসে গেল। ওই ঘরটা তালা দেওয়া থাকে সবসময়। মাঝে মাঝে ওই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কথা বলেন হরিচরণ।
ভাড়াটেরা ভাবে ভীমরতি ধরেছে বুড়োর। তা ধরুক। আগের মতো তো আর সারারাত ধরে বিদঘুটে শব্দ আর করে না। নিশ্চিন্তে এখন রাত কাটে সবার এ—বাড়িতে। সবাই ঘুমোতে পারে।
আসল কথাটা হরিচরণ কিন্তু কারও কাছে ফাঁস করেননি। ভূতটুতে এখন বিশ্বাস করে না অনেকে। বলে, ভূত বলে কিছু নেই। বলুক না, যে যা খুশি বলুক। এ নিয়ে তর্ক করার কোনো মানে হয় না। আসল ব্যাপারটা তিনি তো জানেন।
একতলার কোণের বন্ধ ঘরে দুই পণ্ডিত ভূত গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন পুরো দমে। বিরাট কাজ। এ—কাজ শেষ হতে নাকি কমপক্ষে দশ বছর লেগে যাবে।
হরিচরণ নিশ্চিন্ত। একঘুমে লম্বা—লম্বা রাত কাবার করে দিচ্ছেন। বাড়ি পাহারা দেওয়ার আর দরকার নেই। উনি খুব ভালোভাবে জানেন কোনো পাকা চোরের পক্ষেও এ—বাড়ি থেকে এখন কিছু চুরি করে নিয়ে পালানো অসম্ভব।

কেপ মে'—র সেই বাড়ি

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত[১]

এই বাড়িটা ভারি সুন্দর। এতদিন ধরে চেয়ে—চিন্তে, কেঁদে কঁকিয়ে, একটা মনের মতো বাড়ি পেয়েছে দীপা। সারা জীবন এমনি একটা বাড়ি চেয়েছিল। অবশ্য এ নিয়ে অমরকে দোষ দেওয়া যায় না। এদেশে এসেছিল আট ডলার পকেটে আর একটা ছোট্ট সুটকেস সম্বল করে—পড়াশোনা করতে। তখন একটা ডিম কিনতেও পাঁচবার ভাবতে হত ওদের। তারপর চাকরি—ছেলেমেয়ে মানুষ করা। বাঙালি মানসিকতায় দু—জনেই ভেবেছে বিদ্যালাভই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই ছেলেমেয়েকে পড়িয়েছে নামি—দামি কলেজে। আমেরিকায় ভালো কলেজে পড়ানো মানে প্রতি বছর একটা নতুন মার্সিডিস বেনজ গাড়ি কিনে পাহাড়ের ওপর ফেলে দেওয়া। আট বছর ধরে তাই করেছে। শখের বাড়ি কেনার সংগতি বা অবসর, দু—টোই ছিল না! ভাগ্য ভালো দু—জন ছেলেমেয়েই চৌকস—স্নাতকোত্তর পড়ার খরচ নিজেরাই জোগাড় করেছে। এখন তারা নিজেদের মতো সংসার গুছিয়ে সরে গেছে। এতদিনে ওদের হাত—পা ঝাড়া। এতদিনে দীপার শখ পূরণের সময় হয়েছে।

জীবনের কাজ সামলাতে গিয়ে কখন যেন বেলা পড়ে গেল। একদিন ওর দিকে তাকিয়ে অমর বলল,

'আর বেশি সময় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়াই ভালো।'

নিউ জার্সির দক্ষিণ প্রান্তের ছুঁচলো চিবুকে বসে আছে কেপ মে শহর। সেই চিবুক ঘিরে রয়েছে ডেলাওয়্যার উপসাগর আর অতলান্তিক মহাসাগরের দুরন্ত জল। কেপ মে—র কাছাকাছি গেলেই সমুদ্রের সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়। সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে রয়েছে পুরোনো বাড়ির সারি—সামনে চওড়া রাস্তা।

বাড়ির অবস্থিতি দেখে নেচে উঠল দীপা। রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে সমুদ্রের দিকে মুখ করা একটা দোতলা বাড়ি—একটু একটেরে। চোখ মেললে সমুদ্রের ঢেউ, পাড়ের বালি, দিনে রাতে হু হু করে বয়ে চলা খোলা হাওয়া। আঃ, এত সুখও কপালে ছিল! ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যের প্যাটার্নে বানানো একশো বছরের বেশি পুরোনো বাড়ি। অবশ্যই বহুবার মেরামত হয়েছে, কিন্তু কী চমৎকারভাবে রক্ষা করা হয়েছে ভিক্টোরিয়ান যুগের বৈশিষ্ট্য! বাড়ি ঘিরে ঢাকা বারান্দা—ছাঁইচ থেকে ঝুলে আছে লোহার জাফরি। সামনে খানিকটা জমি, তাতে নানান ধরনের ফুলের কেয়ারি, কিছু ঝোপঝাড়, আর একটা গাছ। সেই ছোটো বাগান থেকে তিন—চারটে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে হয়। সারা বাড়িতে গোল কাচের জানালা, বাইরের দিকে ঠেলে বার করা 'বে উইন্ডো।' ছাদের একদিকে উঁচু গম্বুজ। ঠিক এমনি একটা বাড়িই দীপা চেয়েছিল সারা জীবন। ওর স্বপ্নের বাড়ি!

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অমর বলল,

'বিয়ের পর তো তোমাকে কোনোদিন মধুচন্দ্রিমায় নিয়ে যাইনি, কিছু দিইওনি। ধরে নাও, এটাই তোমার বিয়ের উপহার, মধুচন্দ্রিমা টন্দ্রিমা শুদ্ধু।'

দীপা হেসে ফেলল। অমর যে রোমান্টিক, তেমন অপবাদ ওর শত্রুরাও দিতে পারবে না। কিন্তু রাগও করতে পারল না। ওর স্বপ্নের বিবরণ শুনে শুনে অমর ঠিক সেই মতো বাড়িই খুঁজে দিয়েছে। ওর ভালোবাসার বাড়ি!

সবচেয়ে বড়ো বেডরুমটা হবে ওদের শোবার ঘর; ছেলে—মেয়ের জন্যে দুটো আলাদা ঘর থাকবে। একটা ঘর বই আর কম্পিউটার রাখার স্টাডি, আর অতিথিদের জন্যে তোলা একটা ঘর। রান্নাঘর, ড্রয়িং রুম, খাওয়ার ঘর, বাথরুম, চওড়া বারান্দা মিলিয়ে বাড়িটা বিশাল।

বাড়ির আয়তনে সামান্য ঘাবড়াল দীপা। এখানে সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়। এত বড়ো বাড়ি সাফ সুতরো রাখতে যথেষ্ট খাটতে হবে—বয়স বাড়ছে, কমছে তো আর না! তাও, দীপার মন ভরে গেল।

বাড়িটা প্রায় গুছিয়ে ফেলেছে দীপা। কাজ প্রচুর, কিন্তু গায়ে লাগছে না। সময় অসময়ে সমুদ্রের সামনে দাঁড়ানো—সে এক সঞ্জীবনী অভিজ্ঞতা। ঢেউয়ের ছন্দে কী এক অদৃশ্য হাতছানি ওকে টেনে নিয়ে যায় জলের কাছে, বার বার। দীপা সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের দিকে।

এখনও প্রতিবেশীদের সঙ্গে তেমন আলাপ হয়নি। গ্রোসারি স্টোরে আসতে যেতে কয়েকবার চোখাচোখি—একটু হাসি, 'হাই', 'হ্যালো,' ব্যাস, ততটুকুই।

গুছিয়ে বসতে না বসতেই অমর জানাল অফিসের কাজে দু—দিনের জন্যে বাইরে যাবে। একবার বেরোলে কাজ ছাড়া বাকি পৃথিবী সম্পর্কে অমরের খেয়াল থাকে না। দীপা মনে করিয়ে দিল, 'আসার পরের দিনই কিন্তু আমাদের হাউস ওয়ার্মিং পার্টি। সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে—শেষ মুহূর্তে 'পারছি না' বলে বাতিল করলে চলবে না।'

বাড়িতে পার্টি হলে দীপাই সবকিছু করে—খাবারদাবার, গোছানো, সব। মাঝে মাঝে দীপার মনে হয় নিজের বাড়ির পার্টিতে অন্যান্য অতিথির মতো অমরও গেস্ট হয়ে এসে বসে, আড্ডা—গল্পে আসর মাত করে। অতিথি সেবার খুঁটিনাটি দায়িত্ব থাকে একা দীপার ওপর।

গৃহপ্রবেশ—হাউস ওয়ার্মিং। নিউ জার্সির বিভিন্ন শহর থেকে অনেকেই ঘণ্টা দুই গাড়ি চালিয়ে আসবে, যতটা না অমর—দীপাকে ভালোবেসে, তার চেয়ে বেশি সমুদ্রের ধারে ওদের ভিক্টোরিয়ান বাড়ি দেখার কৌতূহল মেটাতে। ফলে অমর চলে যাওয়ার পর দীপার কাজের কমতি হল না। বাজার, রান্না, টুকটাক গোছগাছ, বাড়িটাকে সুন্দর করে সাজানো। কাজ শেষ করতে সেদিন বিকেল হয়ে গেল। সারাদিনের ক্লান্তি কাটাতে দীপা স্নান করে নিল ভালো করে।

হেমন্তের প্রায় শেষ, দিন ছোটো হয়ে গেছে। এই সময়টা বড়ো অদ্ভুত—কখনো হালকা শীত, কখনো গরম। বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে ঢেউয়ের ওঠা পড়া দেখতে দেখতে দীপার গা শিরশির করে উঠল। সূর্য ডুবতেই ঠান্ডা পড়ছে। সন্ধে হয়ে এলেও এক্ষুনি ভেতরে যেতে ইচ্ছে করল না ওর। গায়ে একটা শাল জড়ালে আরও কিছুক্ষণ বাইরে বসা যাবে। শাল আনতে ভেতরে গেল দীপা।

শোবার ঘরের ক্লজেট থেকে একটা গরম শাল নিয়ে নীচে নামতে পা বাড়াল। ঘরের দরজার দিকে যেতে গিয়ে বাঁ চোখের কোনায় মনে হল ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় কারোর ছায়া পড়েছে। গায়ে কাঁটা দিল—বুকের পাঁজরে ধকধক শব্দ! দৌড়ে পালাবার দুর্বার প্রবৃত্তি রোধ করে দীপা দাঁড়াল। বুকে আতঙ্কের চাপ অবজ্ঞা করে সাহস খুঁজল নিজের মধ্যে—জোর করে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আয়নার দিকে।

বাড়িতে অন্য কেউ নেই, থাকতে পারে না। অমর আসবে দু—দিন পরে। আয়নার দিকে তাকাতে গিয়ে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি বেড়ে গেল আরও। ভয় করছে—তবু তাকাল দীপা। নাঃ, কেউ নেই। ঘরের চারদিকে, সিঁড়ির দিকে দেখল ভালো করে। যেখান থেকে আয়নায় প্রতিচ্ছবি পড়তে পারে সে সব জায়গায় চোখ ফেরাল। পুরো ঘর এক্কেবারে ফাঁকা—যেমন হওয়া উচিত।

নিজের দুর্বলতায় হাসি পেল ওর। নতুন বাড়িতে একা থাকতে ভয় করছে? এ ছাড়া অন্য কী কারণ হতে পারে? সারাজীবন বহু, বহু দিন একা থেকেছে দীপা—ছেলেমেয়েরা যখন ছোট্ট ছিল তখনও। এত বয়সে পৌঁছে এখন একা থাকতে ভয় করছে? তবু, নিজের চোখের অভিজ্ঞতা সহজে উড়িয়ে দিতে পারল না। আয়নায় একটা মুখ ও দেখেছে ঠিকই! অজান্তে বাড়িতে কেউ ঢুকে পড়েছে কি?

কেপ মে যথেষ্ট নিরাপদ শহর। তাদের পাড়া তো বটেই। এখানে কবে শেষ ছিনতাই, চুরি—ডাকাতি হয়েছে খুঁজতে ইতিহাসের পাতা খুলতে হবে। শক্ত হয়ে নিজেকে জড়ো করে পায়ে পায়ে ঘরগুলো ঘুরে দেখতে লাগল দীপা। শরীরের মধ্যে রক্তের ওঠা পড়ার হুসহুস শব্দ শুনতে পাচ্ছে কানে, কাঁধের টানটান পেশিতে কাঁপন! একটা ঘরে যদি কেউ সত্যিই লুকিয়ে থাকে, কী করতে পারবে ও? দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে? সে সময় পাবে কি? তাহলে কি ধরে নেবে বাড়িতে কেউ নেই? যেমন ফাঁকা থাকার কথা তেমনি আছে?

পা টিপে টিপে চারটে ঘর ঘুরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল দীপা। নিশ্চয়ই মনের ভুল। নীচে নামার জন্যে সিঁড়িতে পা ফেলে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে দোষী আয়নাটার দিকে তাকাল আর একবার।

আবার...আবার! আবার একটা মুখ! এক পলকের জন্যে একটা মুখ ভেসে উঠল আয়নায়! এবারে কোনো সন্দেহ নেই! একটা মুখ, একটা মেয়ের মুখ! চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখার দরকার আছে বলে মনে হল না। ও জানে কোথাও কেউ নেই। তবে কী দেখল—প্রেতাত্মা? নাকি আলোছায়ার খেলা? হিম হয়ে গেল দীপা।

একটা সহজবোধ্য, যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়ই! হ্যালুসিনেশন? অলীক প্রত্যক্ষ? এত সহজে ভূত মানতে রাজি নয় ও। নিজের অন্তর্দৃষ্টির প্রতি সেটুকু আস্থা আছে। কী করবে দীপা বুঝতে পারল না। বাড়ি পালটাবার চাপে কি এ ধরনের মানসিক বিকৃতি ঘটতে পারে? একা থাকতে ভয় করছে বলে ওর মন সঙ্গী উদ্ভব করছে? অনেক সময় একা ছোটো বাচ্চারা যেমন অদৃশ্য বন্ধুর জন্ম দেয়! ভয় পেতে অস্বীকার করল ও। সারা জীবন নাস্তিকতায় বিশ্বাস রেখে এখন অশরীরী ভূতে বিশ্বাস করবে?

সামনের দরজা এঁটে বন্ধ করে ছেলেমেয়ে দু—জনকে ফোন করল। ছেলেকে পাওয়া গেল না, তবে মেয়ের সঙ্গে গল্প হল কিছুক্ষণ। বেশ কয়েকবার 'কী হয়েছে' জানতে চাইলেও আয়নায় ছায়ার কথা কিছুতেই বলতে পারল না দীপা। তবে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছুটা বাস্তবের ছোঁয়া পেল। আয়নার মুখ—মনের ভুল হতেই হবে!

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল দীপার চেতনা। প্রতি মুহূর্তে আয়নার দিকে তাকাতে হচ্ছে না, ছায়া দেখে চমকে উঠছে না। তবে আগের উত্তেজনার পরিসমাপ্তিতে ক্লান্ত লাগছে। অমর নেই—ডিনার রান্নার ঝামেলাও নেই। এক বাটি স্যুপ আর একটা স্যান্ডউইচই ওর পক্ষে যথেষ্ট। গল্পের বই নিয়ে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়ল ও। ঘণ্টাখানেক পড়ার পরে চোখ বুজে এল আপনা আপনি। হাত বাড়িয়ে বেড ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিয়ে চোখ বুজতেই একটা মৃদু সুগন্ধি ভেসে এল নাকে। তন্দ্রায় ডুবে যেতে যেতে দীপা ভাবতে চেষ্টা করল, এ গন্ধ কি তার চেনা? কোনো পারফিউমের বোতল উলটেছে? প্রশ্নগুলো বেশিক্ষণ মাথায় ধরে থাকতে পারল না—ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল।

একটা ছোট্ট ছেলে—বয়স কত হবে? দশ? ওর শোবার কামরায় আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতটুকু ইতস্তত করছে না—যেন জায়গাটা ওর চেনা। আচ্ছা, ছেলেটা ঘরে ঢুকল কী করে? দীপা কি তাহলে বাইরের দরজা বন্ধ করেনি? কিন্তু ওর তো বেশ মনে আছে বন্ধ করেছে!

ছেলেটা খাটের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে দীপার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অমন করে কী দেখছে ও? দীপাকে? কেন? বাইরে মেঘ ঘিরে এল কখন? ঘরের ভেতরে অন্ধকার ছেয়ে এসেছে; একটু যেন ঠান্ডাও বেড়েছে! হালকা নীল রঙের পাজামা আর শার্ট পরে রয়েছে ছেলেটা—রাতে শোবার পোশাক! এই দিনদুপুরে রাতের পোশাক পরেছে কেন? এখন কি দিন? তাহলে দীপাই বা শুয়ে আছে কেন? সব কিছু গোলমাল লাগল ওর! সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, কেমন করে ঘরে ঢুকল ছেলেটা? কে দরজা খুলে দিল? অমর ফিরলে বাড়িতে তালার উন্নতি করতে হবে। দিনে রাতে মানুষ ঢুকে পড়ছে, সেটা তো কাজের কথা নয়! নতুন জায়গায় এ সব ব্যাপার ভালো মনে হল না দীপার। কিন্তু ছেলেটা কে?

একদৃষ্টে ছেলেটা তাকিয়ে রয়েছে। ও কি দীপাকে কিছু বলতে চায়? ঘরের শৈত্য বেড়েছে অনেক— বেশ ঠান্ডা লাগছে ওর। কেন এসেছে ছেলেটা? কী চায়? দীপার গলা শুকিয়ে গেছে, কথা বেরোচ্ছে না। ঘরের

ঠান্ডা বেড়েই চলেছে! মোটা কম্বলের তলায় ঠকঠক করে কাঁপছে ও। হঠাৎ কেমন ভয় লাগল। নিজেই অবাক হল, ছোটো একটা ছেলেকে ভয়!

ছেলেটার পেছনে একটা বিশাল কালো ছায়া এগিয়ে এসেছে—প্রায় ঘিরে ফেলেছে ছেলেটাকে। ছোটো ছেলেটা খেয়াল করছে না পেছনে কী রয়েছে! ঘন ছায়ার অবয়ব বোঝা যাচ্ছে না—শুধু আকার। আর, সেই ছায়ার ভেতর থেকে অশুভ, অমঙ্গলাসূচক ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে!

দীপা দেখল চাপচাপ ছায়ার বৃত্তের মধ্যে দুটো আলোর ফুলকি—লাল রঙের বিন্দু! রাত্রে জন্তুর চোখের মতন জ্বলছে! অত হিংস্র দেখাচ্ছে কেন আলোর টুকরো দুটো? এ কি দীপার মনের ভুল?

ছেলেটা কিছু বলছে ওকে। কী বলছে? রাগ করছে? রাগ করছে ওর বাড়িতে দীপারা থাকছে বলে? ঘ্যাঁসঘ্যাঁসে গলায় ছেলেটার ভুল ভাঙাতে চেষ্টা করল ও,

'এই বাড়িটা আমরা কিনেছি। এটা এখন আমাদের বাড়ি...'

ছেলেটা শুনল কিনা বোঝা গেল না—কিন্তু পেছনের ঘোর কালো ছায়া নড়ে উঠল। দীপার খুব ভয় করছে! ছেলেটা কথা বলছে না—ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে আছে। অতি কষ্টে মুখ থেকে কয়েকটা শব্দ বের করল দীপা,

'তুমি কে? কে তুমি? এ বাড়ি এখন আমাদের। বল, তুমি কে?'

আচ্ছা এতটুকু একটা ছেলেকে ভয় পাচ্ছে কেন দীপা? ছেলেটার মা—বাবা কোথায়? বিছানায় উঠে বসতে গেল ও—পারল না। কী হল? প্যারালিসিস? দীপার কি স্ট্রোক হয়েছে? পেছনের ছায়ার ক্রোধ যেন বেড়েই চলেছে! ওর কোনো ক্ষতি করতে পারে কী ওই অন্ধকার?

হঠাৎ ছেলেটার পাশে একজন মহিলা এসে উপস্থিত হলেন। ওর মা? কেমন করে এখানে এলেন উনি? মহিলার মুখ শঙ্কায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। ঘরের তাপমাত্রা আরও নীচে নেমেছে! আর কিছুক্ষণ এমন চললে দীপা জমে যাবে! ছেলেটার অসহায়ত্ব, ছায়ার বেপরোয়া রাগ, আর মহিলার আতঙ্ক কোনোটাই বুঝতে পারছে না ও। কারা এরা, বাড়িতে ঢুকল কী করে, কী বলতে চায় ওকে?

নড়তে পারছে না দীপা। সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে গেছে—পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। নাকি ঠান্ডায় জমে গেছে ওর শরীর, তাই উঠে বসতে পারছে না। ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে ও। সেই নিরালোক ছায়াবৃত্তের আক্রোশ ধীরে ধীরে সমস্ত ঘর ঢেকে ফেলছে—হঠাৎ কী ঘটবে বলা যায় না! ছেলেটার পাশে দাঁড়ানো মহিলার চেহারা গভীর বিষণ্ণতায় পূর্ণ। কোনো গভীর দুঃখে ভেঙে পড়ছেন তিনি। দু—গাল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে টপটপ করে, ঠোঁট কাঁপছে। কিসের এত দুঃখ? কেন এই সর্বগ্রাসী বিষাদ? কিচ্ছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না দীপা, তার দু—ঠোঁট কেউ আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে।

বাঁ হাত দিয়ে ছেলেটার কাঁধ জড়িয়ে ধরে জলভরতি চোখ তুলে দীপার দিকে তাকালেন মহিলা। কান্না ভেজা স্বরে সতর্ক ধ্বনি করলেন একবার। এক ঝটকায় জাপটে ধরলেন ছেলেটাকে। আচ্ছা, এই মহিলাকেই কি আয়নায় দেখেছিল?

ধড়মড় করে উঠে বসল দীপা। ভেঙে গেল জড়তা—সব অসাড়তা। ঘরে কেউ নেই! ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্ন? এত বাস্তবের মতো হয়? ঘরে হালকা সুগন্ধি।

নতুন বাড়িতে একা থাকার উদ্বেগ নিশ্চয়ই ওকে জড়িয়ে ধরেছে। দিনের যাবতীয় দুশ্চিন্তা স্বপ্নের মধ্যে এক মা আর ছেলের রূপ নিয়ে ওর মনে এসে ধাক্কা মেরেছে। যখন অমর বাড়িতে ছিল, এ ধরনের অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। একা হতেই ভূতেরা এসে জমিয়ে বসেছে। নিজের প্রতি বিরক্তিতে দাঁতে ঠোঁট কাটল দীপা। ভূতেদের স্বাধীন যাওয়া—আসার নিয়ন্ত্রণ দিতে মনে মনে অস্বীকার করে চোখ বুজল আবার।

পরের দিনটা কেটে গেল কাজকর্মে। শোয়ার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে জলের ঝরনার তলায় দাঁড়িয়ে সেই হালকা সুগন্ধি নাকে ভেসে এল আবার। আচ্ছা, দীপার কি এপিলেপ্সি হয়েছে? ও শুনেছে মৃগীরোগে খিঁচুনি হওয়ার আগে রোগীরা অনেক সময় কোনো একটা গন্ধ শুঁকতে পায়। তার মানে এই নয় যে বাস্তবে সেখানে

সত্যি কোনো গন্ধ রয়েছে। নাকের স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে উঠলে মস্তিষ্ক বুঝে নেয় গন্ধ বলে। সে রকম কিছু হল নাকি? অনেক সময় খুব ছোট্ট, হালকা ধরনের খিঁচুনিও তো হয়—কয়েক সেকেন্ডের জন্যে সংজ্ঞা থাকে না। একটুক্ষণের জন্যে স্থানু হয়ে যাওয়া, চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকা, কথোপকথনের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে যাওয়া। অন্যেরা বোঝেও না কোনো তফাত হয়েছে বলে। সে রকমই কিছু?

স্নান সেরে বেরোতে সুগন্ধি তীব্র হল। এতটাই যে উপেক্ষা করা চলে না। কোনো পারফিউম বোতলের ছিপি খুলে গেছে? অমরের আফটার শেভ লোশন? কিন্তু এই গন্ধ ওর অচেনা। এই ঘরের কোথাও, কোনো কোণে, অজানা কিছু পড়ে আছে কি?

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়নায় একটা মুখ ভেসে উঠল। চমকে গেল দীপা। ঘুরে পেছন দিকে তাকাল। এবারে সোজাসুজি তাকিয়ে ছিল আয়নার দিকে—ভুল হবার কোনো কারণ নেই। শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ গলা জল নামছে। এত শক্ত করে চিরুনি ধরেছে যে আঙুল শক্ত হয়ে আটকে গেছে। মুখটাকে এড়িয়ে যাবে ভেবেও দীপা চোখ বন্ধ করতে পারল না।

আয়নায় ফুটে উঠেছে একটা মেয়ের মুখ—একটু আবছা, যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে। শ্বেতাঙ্গী। একটা পুরোনো ধরনের জামা পরা—লম্বা চুলে উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। আজকাল লম্বা চুলের মেয়ে দেখাই যায় না! মহিলা কম বয়সি—বছর তিরিশ? দেখে মনে হয় খেটে খাওয়া ঘরের বউ। ওর মুখের এক পাশ দেখতে পাচ্ছে দীপা—মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

ঘরে কেউ নেই অথচ আয়নায় প্রতিচ্ছবি! মেয়েটা কি আয়নার মধ্যে বাসা বেঁধেছে? ভাবনার কাল্পনিকতায় দীপার ভয় পাওয়া উচিত, কিন্তু আশ্চর্য, ওর ভয় করল না। কৌতূহল বিরাট আকারে সামনে এসেছে। কে ওই মেয়েটা?

যেন ওর অনুচ্চারিত প্রশ্ন শুনেই মহিলা সামান্য মুখ ঘোরালেন। এই মহিলাই কি রাতে ওই ছোটো ছেলেটার সঙ্গে দীপার বিছানার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন? কিন্তু সেটা তো স্বপ্ন, তাই না?

দেখতে দেখতে আয়নার ছবি মিলিয়ে গেল—যেন সিনেমার ফেড আউট! দীপা বুঝতে পারছে ব্যাপারটা ওর মানসিক বিকৃতির লক্ষণ। ডাক্তারের কাছে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। অমর ফিরলে ওকে বলতে হবে, ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। তবে যখন শরীর ভালো আছে, কাজকর্ম করতে পারছে, তখন অত জরুরি কিছু হতে পারে না। সামান্য ওষুধ হলেই হয়তো চলবে। দু—হাতে শক্ত করে মাথা চেপে ধরে নিজেকে নির্দেশ দিল দীপা,

'অত সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। মানসিক রোগ ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়। স্থান পরিবর্তনের ফলে এ সব নিশ্চয়ই সাময়িক সমস্যা!'

দীপা এখনও অনেক বছর বেঁচে থাকতে চায়, সুস্থ জীবন উপভোগ করতে চায়। ওর সুখের প্রথম উপাদান হাতে তুলে দিয়েছে অমর—এই বাড়ি।

সন্ধে নেমেছে। আজকাল প্রতিদিনই একটু একটু করে দিন ছোটো হয়ে আসছে। এই রকম হতে হতে বিকেল সাড়ে চারটেয় অন্ধকার হয়ে যাবে—আর সকালের আলো ফুটবে সাড়ে আটটায়। গরমকালে এই আলোই থাকবে সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে ন—টা অবধি। সে যাই হোক, অন্ধকার নেমে গেলেও একটুক্ষণ বারান্দায় বসে সমুদ্র না দেখলে দীপার মন ভরবে না।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। আজ তাড়াতাড়ি শোবে। ঢেউয়ের নিয়মিত ওঠা পড়ার সম্মোহনের সামনে বসে দীপার দু—চোখের পাতা লেগে গেল। সেই মহিলা আবার এসে দাঁড়ালেন। এবারে ছেলে সঙ্গে নেই। দীপা সমুদ্রের সামনে বারান্দায় বসে নেই।

মহিলা খুবই বিচলিত। কোনো এক অজানা কারণে বিহ্বল—দু—হাতের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে নিংড়িয়ে চলেছেন। বারবার বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন—ওখানে কি কোনো দরজা আছে? কার জন্যে অপেক্ষা

করছেন উনি? এই প্রতীক্ষায় মধুর অধীরতা নেই, রয়েছে ত্রাস, শঙ্কা, ভীতির সময় গোনা। কে মহিলাকে এমন করে আতঙ্কিত করেছে?

হঠাৎ মহিলা মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালেন। চোখ বিস্ফারিত। উনি কি দীপাকে কিছু বলতে চান? বুঝে ওঠার আগেই ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেল ছায়াশরীর। চমকে ঘুম ভেঙে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল দীপা। 'আঃ, স্বপ্ন দেখছিল আবার। বাঁচা গেল!' রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে—ঘরে ঢুকে পড়ল ও। আর মাত্র একটা দিন—কাল অমর ফিরে আসছে।

পরদিন অমর বাড়ি আসার পর গত দু—দিনের বিকট দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে গেল ফুস করে। পার্টি প্রস্তুতির ব্যস্ততার দু—একবার আগের ঘটনাগুলো মনে পড়লেও হেসে উড়িয়ে দিল দীপা। বড়ো দূরের মনে হল সে সব ঘটনা। তাও দু—বার শোবার ঘরে গিয়ে তদন্ত করে এল—অন্য কোনো কিছু নেই তো? দীপা চায় না হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু দেখে অমর ঘাবড়ে যায়। একবার মনে হল ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় খসখস আওয়াজ শুনতে পেল। লম্বা সিল্কের জামা পরে হাঁটার সময় পায়ের ঘষায় যেমন ফিসফিসে বাজনা বাজে! দীপা ধরে নিল সমুদ্রের হাওয়ায় জানালার পর্দা নড়ে শব্দ হচ্ছে।

রাত্রে শোবার সময় পরের দিনের কাজগুলো মনে মনে ঝালিয়ে নিতে নিতে অমরকে মনে করিয়ে দিল দীপা,

'সামনের গাছটার নীচের ডাল ক—টা কাল সকালে ছেঁটে দিতে ভুলো না। একেবারে হাঁটার পথের ওপর এসে পড়েছে। তা ছাড়া শীত এসে পড়ছে—এরপর আর কাটা চলবে না।'

বাড়ির কাজ করতে সব সময়ই পরাঙ্মুখ অমর এবারেও ব্যতিক্রমী হল না।

'না করলে চলে না? ঠিক আছে যেটুকু না কাটলে নয়, করে দেব। বাকি সব গরম পড়লে হবে।'

বিছানায় বসে অমরের দিকে পিঠ ঘুমিয়ে পায়ে ক্রিম লাগাচ্ছিল দীপা, মুখ টিপে রইল। বেশি চাপ দিলে ফল উলটো হবে।

'বিকেলে অত লোক আসবে বাড়ি দেখতে। যতটা পারা যায় সাজাতে হবে না বাড়িটা!'

অমরের কাছে এ সব যুক্তি অবান্তর। ওর মতে 'লোকে' বাড়ি দেখতে উৎসুক নয়, ওদের সঙ্গে গল্প করতে আসছে। গাছের ডাল বেঁকে বাড়ি আসার পথের ওপর পড়ছে কি না তা নিয়ে কারোর মাথাব্যথা নেই।

শুয়ে পড়ে বেডসাইড ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিল দীপা। সারাদিনের পরিশ্রমের পর পায়ের কম্বল টেনে বিছানার প্রশ্রয়ে চোখ বুজল। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে অমরের গলা কানে ভেসে এল,

'নতুন পারফিউম কিনেছ মনে হচ্ছে? বেশ সুন্দর গন্ধ।'

পরের দিন সকালে না বলতেই অমর দু—তিন রকমের প্রুনিং কাঁচি নিয়ে সামনের গাছের ডাল কাটতে গেল। এই একটি গাছই রয়েছে ওদের বাগানে—বাকিটা সবই ফুলের কেয়ারি, ঘাসের লন, আর ঝোপঝাড়। সমুদ্রের লোনা জলহাওয়ায় কেমন করে যে এই গাছটা বেঁচে আছে কে জানে! পাতা ভরতি মাঝারি সাইজের তরতাজা গাছ। শীত এসে গেলেও এখনও পাতায় রং ধরেনি, একটা পাতাও ঝরেনি। কী গাছ দীপা জানে না। হয়তো দেরিতে পাতা ঝরে!

রান্নাঘরে দু—একটা রান্নার পদে ফিনিশিং টাচ দিচ্ছে দীপা। জানালার দিকে চোখ তুলে দেখল বরফ পড়ছে ঝুরঝুর করে। আঃ, আজকের দিনে বরফ না পড়লেই হত না? পার্টিটা মিটে গিয়ে কালকে থেকে পড়লে কী হত! আবহাওয়া রিপোর্টে ঘোরতর বরফের কথা তো বলেনি আগে!

দড়াম করে দরজা খুলে অমর ঢুকল ঘরে। দু—হাত দিয়ে বাঁ চোখ চেপে ধরেছে, স্পষ্টত ব্যথায় কাতর। দৌড়ে রান্নাঘরের সিংকে গিয়ে ঠান্ডা জল দিতে লাগল চোখে। ঘাবড়ে গেল দীপা,

'কী হল? কী হয়েছে তোমার?'

'বরফ দাও—বরফ দাও আমাকে।' অমরের স্বর কাতর, উত্তর দেবার সময় নেই।

আরও মিনিট পনেরো পরে কিচেন টেবলের একটা চেয়ারে বসে বরফের টুকরো ভরা তোয়ালে চোখে ধরে অমর বলল,

'নাঃ, দেখতে পাচ্ছি। চোখটা যে বেঁচে গেছে তাতেই আমি ধন্য। কিছুক্ষণের জন্যে ভেবেছিলাম গেছে বাঁ চোখটা।'

'এত সাংঘাতিক ব্যথা লাগল কী করে? কাঁচি লাগল নাকি?'

'নাঃ, একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। তোমার কথামতো গাছের ঝোলা ডালটা প্রথমে কাটতে গেছি। খুব একটা মোটা ডালও নয়—কিন্তু কী রকম যেন পালিশ করা। ঠিক সাইজের প্রুনিং শিয়ার্সই ব্যবহার করেছি বলে তো মনে হল। কিন্তু কিছুতেই কাঁচি বসাতে পারলাম না ডালে। একটু বেশি চাপ দিতেই ডালটা রাবার ব্যান্ডের মতো ছিটকে এসে চোখে মারল।'

দীপার গলার কাছে এক টুকরো ভীতির কয়লা জমা হয়েছে।

'মারল? ছিটকে এসে লাগল বল!'

অমরকে একটু চিন্তিত লাগল।

'কেমন মনে হল ডালটা এসে একটা চড় মারল। ঠিক উদ্দেশ্যহীন ছিটকে এসে লাগা নয়।'

তারপর বক্তব্যের অবাস্তবতায় নিজেই হেসে ফেলল আবার।

'আসলে চোখ খোয়াবার অবস্থা হলে সবারই অমন মনে হতে পারে। তখন ধারণা হয় সমস্ত পৃথিবী ষড়যন্ত্র করছে আমার বিরুদ্ধে!'

সোজা সাপটা ব্যাখ্যা। তবু দীপা মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। অমরের কেন মনে হল গাছটা বিদ্বেষভরে ওকে শাস্তি দিয়েছে? একটা গাছ, একটা আয়না, কিছু দুঃস্বপ্ন! এ বাড়িতে এমন কেন হচ্ছে ওদের? কোনো অদৃশ্য শক্তি ওদের জীবন এমন ধন্দ আর আতঙ্কে ভরিয়ে দিচ্ছে? এখন অবধি কারোর বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কিন্তু হতে কতক্ষণ! তার স্বপ্নের বাড়ি এমন ভয়ংকর হয়ে উঠছে কেন?

আগ্রাসী গাছটাকে দেখতে দীপা বাইরে গেল। গাছের সঙ্গে মোলাকাতের পরিণাম নিয়ে অমর তখনও হন্তদন্ত হয়ে আছে। চোখের ঠিক ওপরে, কপালে একটা বড়োসড়ো ডিম গজিয়েছে। কাঠের দরজা খুলে কাচের স্টর্মডোরের পেছন থেকে দীপা দেখল গাছটা শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে মনে হয় না বীভৎস জিঘাংসা পুষে রেখেছে মনে—বা প্রতিশোধের বশে অমরকে আহত করেছে। সবুজ পাতা ভরতি ডালগুলো এখনও পথের ওপর ছড়িয়ে আছে। গাছের চেহারা দেখে মনে হয় সময়টা বসন্তের প্রারম্ভ, শীতের প্রাক্কাল নয়।

বরফ পড়ে চলেছে—বরং আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরে। ঝুরো বরফ জমে মাটি, ঘর, গাছপালা এখন সাদা। সমুদ্রের বুকে ধোঁয়ার চাদর—ঢেউ স্তিমিত। বছরের এই সময়ে অনেক সময় এমনই আচমকা বরফ পড়ে চারদিক 'উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড' হয়ে ওঠে। এত এলোমেলো চিন্তার মধ্যেও বড়ো সুন্দর লাগল দীপার।

সেই রাগী গাছটার গায়ে এতটুকু বরফ নেই। একটা পাতায় বরফের চিহ্ন নেই। আশেপাশের ঘাস, ঝোপ, বরফে ঢেকে গেলেও গাছটার গায়ে সাদার ছিটেফোঁটা লাগেনি। এমনকী গুঁড়ির চারদিকে গোল করে কোনো বরফ নেই। কী করে এমন হতে পারে? গায়ে গরম জামা না পরে, বাড়ির চটি পায়ে দৌড়ে নেমে গেল দীপা। এমন কী বিশেষত্ব থাকতে পারে গাছটায় যে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বাইরে যেতে পেরেছে? গাছটা এত রহস্যময় কেন?

গাছের তলায় এসে ওর মনে হল হিটারের গরম হাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে। হতভম্ব দীপা বুঝতে চেষ্টা করল এখানে এমন গরম হল কী করে? মাটির তলায় গরম জলের উৎস আছে কি? বা হয়তো অন্য কোনো ভূতাপীয় কারণ রয়েছে? তার কী করা উচিত এখন?

কিছু একটা সরে গেল গাছের পাতার আড়ালে। গা ছমছম করে উঠল দীপার। ওখানে কে? কে দেখছে ওকে? মানুষ, না...

গাছের তলা থেকে বেরিয়ে কম্পাউন্ডের গেটের দিকে এগিয়ে গেল দীপা। চেঁচিয়ে উঠল,

'হু, হু ইজ দেয়ার? কে ওখানে?'

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গী মহিলা। শনের নুড়ির মতো ধবধবে সাদা চুল, একটা সাদা কোট পরা, পায়ে সাদা মিউল জুতো। ফ্যাকাসে মুখের চামড়া কোঁচকানো, ছানির প্রকোপে দু—চোখ ডিমের সাদার মতো ঘোলাটে। কী বলবে বুঝতে পারল না দীপা। উনি কে, এখানে কেন?

'ইয়েস, হাউ ক্যান আই হেল্প হউ?'

মহিলা অসহায় ভাবে ওর মুখের দিকে তাকালেন। ক্ষীণ স্বরে বললেন,

'আই অ্যাম ইওর নেবার। ওই বাড়িটাতে থাকি, ডানদিকের তিনটে বাড়ি পেরিয়ে। পারহ্যাপস এ কাপ অফ কফি? তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

বিকেলে পার্টি। এখন এই মহিলাকে এন্টারটেন করতে হবে? তবু বৃদ্ধাকে ফিরিয়ে দিতে পারল না দীপা। আমন্ত্রণ জানাল,

'প্লিজ কাম ইন।'

দু—কাপ কফি আর পার্টির জন্যে তোলা কেকের দু—টো টুকরো প্লেটে সাজিয়ে বৃদ্ধাকে ড্রয়িং রুমে বসাল দীপা। বৃদ্ধা কফিতে চুমুক দিলেন, কিন্তু কেক ছুঁলেন না।

'তোমরা পাড়ায় নতুন এসেছ—ওয়েলকাম। না জানিয়ে তোমার কাছে এলাম, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।'

মহিলা নিশ্চয়ই ওর অনীহা টের পেয়েছেন। লজ্জা পেয়ে দীপা বলল,

'নো, নো, অমন ভাববেন না। আই অ্যাম গ্ল্যাড আপনি এসেছেন। এই সুযোগে আমাদের আলাপ হল।'

সামান্য মাথা নাড়িয়ে মহিলা ওর মাপ চাওয়া স্বীকার করলেন।

'আমি তোমার বেশি সময় নেব না। বাট আই নিড টু টক টু ইউ। আমি যা বলছি তোমার যদি ভালো না লাগে, ভেবে নিও এক বৃদ্ধার প্রলাপ। আমি কিছু মনে করব না।'

ভদ্রমহিলা এত আমড়াগাছি করছেন কেন? দীপার অসোয়াস্তি হল। মহিলার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বুকে গুড়গুড় বাজনা বাজছে আবার।

'তোমার মতোই আমি সমুদ্র ভালোবাসি। ওহ, ইয়েস। আমি রোজ হাঁটতে বেরিয়ে দেখি তুমি বারান্দায় বসে জলের দিকে তাকিয়ে আছ। ইউ লুক পিসফুল, তাই আমি কিছু বলিনি। নাহলে আগেই আসতাম। আজ সকালে দেখলাম এ জেন্টলম্যান ওয়াজ অ্যাটেম্পটিং টু প্রুন দ্য ট্রি। তোমার স্বামী?'

মহিলার প্রশ্নের জবাবে দীপা মাথা নাড়ল। মহিলা কী বলবেন তা না জানার পূর্বাভাস দীপার পেটের মধ্যে মুঠো পাকাতে থাকল।

'প্লিজ, ডোন্ট হেজিটেট। আপনি বলুন, আমি শুনছি।'

'আমি জানি না তোমার হাজব্যান্ডের কী অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাকে বারণ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই উনি পালিয়ে গেলেন। আই হোপ হি ইজ ওকে!'

এই ধীর অগ্রগতি দীপা আর সহ্য করতে পারল না।

'আপনি বলুন কী বলতে চাইছেন। আই অ্যাম গেটিং অ্যাংশাস!'

মহিলা ঠোঁটে কাপ তুলে আর এক চুমুক কফি খেলেন। আলতো করে ন্যাপকিন ঠোঁটে বুলিয়ে প্রস্তুত হলেন তাঁর বক্তব্য রাখতে।

'তোমার বাড়ি সম্পর্কে কতটা জান? আমি যতদিন দেখছি, তোমার বাড়ির সামনের ওই গাছটা একইরকম রয়েছে—বাড়েওনি, কমেওনি। আমার বয়স তিরাশি বছর—এখানে এসেছিলাম আঠারো বছর বয়সে, র‍্যান্ডলফকে বিয়ে করে। র‍্যান্ডলফ তখন তেইশ।'

মহিলা কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন—বোধহয় প্রয়াত স্বামীর স্মৃতির ভারে। তারপর ঝাড়া দিয়ে উঠলেন আবার।

'ওই গাছ অনেকেই কাটতে চেষ্টা করেছে—পারেনি। যারা শুধু ডাল কেটে প্রুন করতে গেছে, তাদের ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে। যে দু—জন গোড়া থেকে কাটতে গেছিল তারা মারা গেছে। একজন নিজের ইলেকট্রিক করাতে হাত কেটে ফেলল। অ্যাম্বুলেন্স আসার আগেই রক্তক্ষরণে সে মারা যায়। অ্যান্ড আই ন্যু হিম ওয়েল। অন্যজন কুড়ুল তুলতেই হার্ট অ্যাটাক হল। বাড়ির লোকজন তাকে পেল গাছের নীচে—ভয়ার্ত চোখের দৃষ্টি স্থির। সকলে বলেছিল দুটোই কাকতালীয় দুর্ঘটনা। কিন্তু আমি জানি, এর মধ্যে অন্য কিছু আছে। তুমি তো দেখেছ গাছটার কী প্রচণ্ড তাপ। তীব্র শীতেও পাতা ঝরে না, এক বিন্দু বরফ গায়ে লাগে না।'

দীপার গায়ে কাঁটা দিল। তাহলে ও যা প্রত্যক্ষ করেছে তা ভ্রান্তি নয়! মহিলা বলে চললেন,

'তুমি কি বাড়ির মধ্যে কিছু টের পেয়েছ? এ স্মেল, এ সাউন্ড, এ রিফ্লেকসন?'

দীপার মাথা ঘুরছে। কী করবে এখন? কী ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশ করতে চলেছেন এই বৃদ্ধা! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মহিলার বোধহয় দয়া হল।

'ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড। দ্য উওম্যান উইল নট হার্ট ইউ। বাট দ্য ম্যান ইজ আনাদার ম্যাটার।'

এ কী কথা শুনছে মহিলা—কোনো উওম্যান, ম্যানই বা কে! কথা বলতে গিয়ে দীপার গলা থেকে বেলুন চুপসে যাওয়ার মতো শব্দ বেরল।

'হোয়াট ইজ গোয়িং অন! আমাকে দয়া করে বলুন।'

'শোন, এ অনেকদিন আগের কথা। আমার ধারণা হয়তো আমার জন্মেরও কয়েকর বছর আগে। কেপ মে ওয়াজ অ্যান অ্যাগ্রিকালচারাল স্মল টাউন। বড়ো ফার্মের মালিক চাষিরা সমুদ্রের এই অর্ধচন্দ্রাকার পাড়ে নিজেদের বসতবাড়ি তৈরি করেছিল সার বেঁধে। ১১৬ বছর আগে তোমাদের বাড়ি বানিয়েছিল তেমনই এক ধনী চাষি। তার বউ ছিল সুন্দরী, আর একটি সন্তান ছিল। তখনকার দিনের নিয়মমাফিক বউটি বাড়িতেই কাজ করত—ছেলে মানুষ করত। এক রাতে কী হল কেউ জানে না, হয়তো সন্দেহ, হয়তো হিংসে, হয়তো স্রেফ ঝগড়া, লোকটা তার বউ—বাচ্চা আর বাড়ির সব কাজের লোককে খুন করে নিজের হাতের শিরা কেটে ওই গাছের নীচে শুয়ে রইল। পরদিন প্রতিবেশীরা তাকে খুঁজে পায়—তখন গাছের তলার মাটি রক্তে ভিজে গেছে।

'তারপর বহুদিন বাড়িটা খালি পড়েছিল। বাড়ির ওয়ারিশ কে তাই নিয়েই অনেকদিন বিতণ্ডা চলল। পরে এক উত্তরাধিকারী বাড়িটা নিলামে বিক্রি করে দিল। সেই থেকে কোনো লোকই এখানে টিকতে পারেনি। কিছুদিন পরপরই এটা বিক্রি হয়েছে। কী যে তাদের কমপ্লেন, কোনোদিন কেউ ভালো করে বলেনি। এখানে থাকলে তোমরা নিজেরাই সে সব বুঝতে পারবে। বাট আই থট আই শুড ওয়ার্ন ইউ।'

নির্বাক দীপাকে বিদায় জানিয়ে মহিলা চলে গেলেন। কপালে বরফের পুঁটলি ধরে ঘরে ঢুকে অমর বলল,

'উফ! বুড়ি পারেও বাবা! কি, নিজের ভাইপো বাড়িটা কিনতে চায় তাই এত আষাঢ়ে গপ্পো?'

দীপা তখনও অনড় রয়েছে দেখে বলল,

'তা তোমার সিদ্ধান্ত কী, বাড়িটা বিক্রি করে দেবে?'

সম্বিত ফিরে অমরের দিকে তাকাল দীপা। তার এত সাধের বাড়ি—এই চওড়া বারান্দা, সমুদ্র— সবকিছু ফেলে তাকে আবার চলে যেতে হবে। বাড়ির সেই মহিলা—সেই চাষি—বউ তো তার কোনো ক্ষতি করেনি, কোনো ভয় দেখায়নি। বরং তার ঘরে সুগন্ধি ছড়িয়েছে—তার কাছেই করুণ সাহায্য চেয়েছে। তার কী দোষ!

'নাঃ, ছাড়ব কেন! আমরা ভালোই থাকব এখানে। শুধু কথা দিতে হবে তুমি ওই গাছটা কাটার কোনো চেষ্টাই করবে না কোনোদিন। ওটা থাকুক যেমন আছে।'

দীপা ভাবল আরও অনেক প্রতিবন্ধকতা সামনে রয়েছে। এতটুকু থেকে পালালে চলবে কেন!

পাদটীকা

১ এই গল্পের ঘটনাগুলি নিউ জার্সির জনপ্রিয় লোককথা (folklore) থেকে সংকলিত। কেপ মে শহরের একটি পুরোনো বাড়ি, এখন যেটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়, সেখানে একটি বিশেষ ঘরে রাত কাটাতে গিয়ে বহু অতিথি বলেছেন তাঁরা ঘরের আয়নায় এক মহিলার ছায়ামূর্তি দেখেছেন। অনেকে অচেনা সুগন্ধি পেয়েছেন, জামার খসখস শব্দ শুনেছেন। কিন্তু কেউই এই অভিজ্ঞতাকে ভীতিপ্রদ মনে করেননি। এমনকী অনেকে বলেছেন মহিলা তাঁদের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসেছে।

বার্নার্ড টাউনশিপের একটি গাছের উপকথাও (folklore) এখানে যোগ করেছি। 'শয়তানের গাছ' (Devil's Tree) হিসেবে বিখ্যাত এই গাছটি অনেক দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত—আত্মহত্যা, খুন, ফাঁসি। এক চাষি নাকি তার পুরো পরিবারকে খুন করে এই গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। গাছটি দেখতে গিয়ে অনেকে বলেছেন এর বাকল অত্যন্ত উষ্ণ। তাই এই গাছের ডাল, পাতা, এবং গুঁড়ির চারদিকে কখনো বরফ জমে না।

মায়ামাধুরী

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে বহুদিনের একটি পুরোনো বাড়ি পঞ্চাশ বছর আগেও দেখা যেত। গঙ্গার ভাঙনে এখন সেই বাড়ির আর কোনো অস্তিত্বই নেই। বিরাজের দাদামশাই জামালপুরের স্টেশনমাস্টার ছিলেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর খুব কম দামে এই বাড়িটি তিনি কিনে নেন। সেই সময় এদেশে বাঙালিদের আধিপত্য ছিল খুব। বহু বাঙালির বাস ছিল ভাগলপুর, জামালপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে। আর জলহাওয়াও ছিল খুব ভালো। যে বাড়িটি দাদামশাই কিনলেন সে বাড়ির মালিক ছিলেন বেহালা অঞ্চলের এক বিত্তবান বাঙালি। তাঁর দুই ছেলে প্রবাসী হওয়ায় তিনি এখানকার পাট চুকিয়ে কলকাতাতেই পাকাপাকিভাবে থাকা শুরু করলেন। মুঙ্গেরের এই বাড়িটা তাই পরিত্যক্ত হয়ে রইল।

বিরাজের দাদামশাই বাড়িটি জলের দামে মাত্র তিন হাজার টাকায় কিনেছিলেন। বাড়িটির একটি নামও ছিল—মায়ামাধুরী। কেন যে এই বাড়ির নাম এমন হয়েছিল তা কে জানে? দাদামশাই কিন্তু বাড়ি কেনার পর এই নামই বহাল রেখেছিলেন। কেন না নামটি তাঁর মনে ধরেছিল।

বাড়ি কেনার পর বিরাজরা মাত্র একবারই এসেছিল এই বাড়িতে। বিরাজের বয়স তখন চোদ্দো কি পনেরো। বাড়িটি দোতলা। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এর চারদিক। বাড়ির পিছনে বাগান। সেই বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল—সহ বেশ কিছু ফুলের গাছ। টগর, কামিনি, গন্ধরাজ, চাঁপা ইত্যাদি। বাড়িটি ছিল বিরাজের মনের মতো। হাওড়া শিবপুরের ছেলে ও। এই সুন্দর পরিবেশে গঙ্গাতীরের শোভা সৌন্দর্যে মন তার একেবারেই মজে গেল। যাই হোক, প্রায় দিন পনেরো ছিল ওরা। তারপর একসময় চলে যেতেই হল। বাবার অফিস, নিজের স্কুল, পড়াশোনা এসব তো বজায় রাখতেই হবে। তাই অনেক আনন্দে মন ভরিয়ে আবার ফিরে এল স্বভূমে।

এরপর বেশ কতকগুলো বছর কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল। দাদু—দিদার সঙ্গে চিঠিপত্রেই যা কুশল বিনিময় হত। বিরাজের মা বারবার বলতেন, 'তোমাদের বয়স হয়েছে। আর ওখানে না থেকে বাড়ি বিক্রি করে চলে এসো এখানে।'

দাদামশাই অবশ্য মায়ের কথা জানতেন না। গঙ্গার ধারে অমন একটি বাড়ির মোহ ছেড়ে কি আসা যায়? তবে হঠাৎই একদিন মায়ের অসুখের খবর পেয়ে দু—জনেই এসে হাজির হলেন শিবপুরে। বাড়ি অবশ্য একেবারে ফাঁকা রেখে আসেননি। বনমালী নামে স্থানীয় একজন লোককে বাড়ি দেখাশোনার ভার দিয়ে তবেই এসেছিলেন। তবে এই আসাই তাঁদের শেষ আসা। কয়েকদিন পরে মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেও সামান্য একটু জ্বর ভোগের পর দাদু—দিদা দু—জনেই প্রয়াত হলেন। মৃত্যুর আগে মেয়ের হাতে সিন্দুকের চাবি দিয়ে দিদা বলে গেলেন, 'তোকে তো যা দেওয়ার দিয়েইছি। এ ছাড়াও আরও কিছু গয়নাপত্তর আছে আমার। কিছু ফিক্সড ডিপোজিট আর ব্যাংকের পাস বই আছে তোর ছেলের নামে নমিনি করা। ওগুলো যাতে নষ্ট না হয় তা দেখিস। নগদ কিছু টাকাও আছে। আর পারলে বাড়িটা বিক্রি করে দিস।'

দাদু—দিদার মৃত্যুর পর কাজকর্ম সব মিটে গেলে বিরাজ একদিন গোরা নামে ওর এক বন্ধুকে নিয়ে শিয়ালদা থেকে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে রওনা হল জামালপুরের দিকে। ঝাঁঝার কাছে তুফান মেলে সেবার ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর থেকে দিল্লির গাড়ি আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন হয়। সেইসময় অবশ্য

রিজার্ভেশন সিস্টেম চালু হয়নি। আর ট্রেনে এখনকার মতো এত ভিড়ভাট্টাও হত না। তাই ট্রেনে উঠে দুজনে দুটো মুখোমুখি বাক্স দখল করে যাত্রা শুরু করল।

দেশে তখন সরকার ছিল। রেলে প্রশাসন বলে একটা ব্যাপার ছিল। রেল কর্মচারীরাও ছিল সৎ। কাজে ফাঁকি দিত না। তাই পরদিন বেলা দশটা নাগাদ নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন এসে থামল জামালপুরে।

জামালপুর স্টেশনের পাশেই ভীষণদর্শন কালীপাহাড়। ঘন অরণ্যে ভরা। বাঘ, ভালুকেরও উপদ্রব ছিল খুব। পনেরো বছর বয়সে বিরাজ প্রথম এসেছিল এখানে। এখন ওর বাইশ বছর বয়স। গোরারও তাই। দু—জনেই কলেজ পড়ুয়া যুবক। এখানকার প্রকৃতি দেখে বুক কেঁপে উঠলেও ভালো লাগল খুব।

ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে এসে একটা দোকানে বসে চা পর্বটা সেরে নিল ওরা। তারপর একটা টমটম গাড়ি ভাড়া করে চলে এল গঙ্গার ধারে। এদিকে বসতি তখন খুবই কম। তবু দু—চারজনকে জিজ্ঞাসা করে মায়ামাধুরীতে হাজির হল ওরা। কিন্তু এসে দেখল দরজায় তালা। যদিও বাড়ি চিনতে ভুল হয়নি বিরাজের। পুরোনো দিনের সেই স্মৃতি কি ভোলা যায়? কিন্তু দরজায় তালা কেন? বনমালী নামে একজনের তো থাকার কথা।

বিরাজ বলল, 'সর্বনাশ! আমার কাছে তো আলাদা কোনো চাবি নেই। এখন ঘরে ঢুকব কী করে?'

গোরা বলল, 'একটু ওয়েট কর না। লোকটা হয়তো কোথাও গিয়েছে কিছু কেনাকাটা করতে।'

কিন্তু না। প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পরও যখন কেউ এল না, তখন ওরা তালা ভাঙার জন্য ইট—পাথর কিছু খুঁজতে লাগল। এমন সময় হঠাৎই কোথা থেকে যেন একটা চাবির গোছা ঝনাৎ করে পড়ল ওদের পায়ের কাছে। দেখল এক তরুণী চাবিটা এদের দিকে ছুড়ে দিয়েই হনহন করে উধাও হয়ে গেল। তরুণী যে কে, এই চাবি কী করে এল তার কাছে কিছুই ভেবে পেল না বিরাজ।

যাইহোক, ওরা তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। ঘর—দোরের অবস্থা দেখে বুঝল বহুদিন ঝাঁটপাট পড়েনি এখানে। বনমালী তাহলে গেল কোথায়? দাদু—দিদা বিদায় নেওয়ার পর সেকি তার দায়িত্ব পালন করেনি?

কেউ কিছু করুক না করুক এখন নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। ওরা দোতলার একটা ঘরের তালা খুলে নিজেদের মালপত্তর রেখে কীভাবে কী করা যায় তাই নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

বিরাজ বলল, 'তুই একটু বোস গোরা, আমি বাইরে বেরিয়ে দেখি এখানকার কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য কাউকে পাওয়া যায় কিনা। অমনি বনমালীর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি।'

বিরাজ বাইরে এসে দেখল, একজন বয়স্কা মহিলা এই বাড়ির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। বিরাজকে দেখে বললেন, এ বাড়ির কর্তা গিন্নি ফিরে এসেছেন বুঝি? তুমি ওঁদের কে হও?'

বিরাজ বলল, 'আমি ওঁদের একমাত্র নাতি। আমার দাদু—দিদা দু—জনেই একমাস আগে গত হয়েছেন। তা ওঁরা বনমালী নামে একজনকে রেখে গিয়েছিলেন, সেই লোকটা গেছে কোথায় বলতে পারেন?

'সে এক রাত ওই বাড়িতে থেকেই পালিয়েছে বাবা। ওই পোড়ো ভূতের বাড়িতে কেউ বাস করতে পারে? ও যেই ওদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে অমনি ঘরের চাবি ওই ওদিকের গোয়ালাদের বাড়িতে দিয়ে ওর দেশের বাড়ি মিথিলায় চলে গেছে। তা বাবা, তোমরা চাবি পেলে কার কাছে?'

'কোথা থেকে যেন এক মেয়ে এসে চাবিটা ছুড়ে দিয়ে চলে গেল।'

বুঝেছি, বাসনা এসেছিল। খুব ভালো মেয়ে। তা বাবা, তুমি একা এসেছ না সঙ্গে আর কেউ আছে?'

'আমার এক বন্ধুও আছে সঙ্গে।'

'এই ভূতের বাড়িতে তোমরা থাকতে পারবে?'

বিরাজ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'ভূতের বাড়ি! কই একথা আগে কখনও শুনিনি তো? তা ছাড়া আমার দাদু—দিদা প্রায় আট—দশ বছর কাটিয়ে গেলেন এই বাড়িতে। তাঁদের মুখেও তো শুনিনি কিছু। কখনও কোনোরকম ভয় পাননি ওরা।'

'কী করে পাবেন? ওঁরা যে নিত্য পুজোপাঠ করতেন, হোম যাগ করতেন। তাই কিছু টের পাননি। এর আগে যে মালিক ছিলেন পেসাদবাবু। তিনি অবশ্য বছরে একবার কি দু—বার আসতেন। দু—তিন মাস থাকতেন। তোমার দাদু—দিদা যেমন বনমালীকে রেখেছিলেন তিনিও তেমনি প্রভুদের নামে মিশ্র পরিবারের এক ব্রাহ্মণকে রেখেছিলেন এ বাড়ির বিগ্রহের সেবা পুজার জন্য। কী সুন্দর দেখতে তাকে। তা হঠাৎ একদিন কী যে ভাব এল তার মনে, ওই বাগানের কোণে যে চাঁপা গাছটা আছে তারই ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল।'

বিরাজ চমকে উঠল, 'সেকি! সুইসাইড করল?'

'মনে হয় বাবুর দুই মেয়ে মায়া ও মাধুরীকে নিয়েই গোলমাল।'

বিরাজ বলল, 'বুঝেছি, ওদের নামেই তাহলে এই বাড়ির নাম। কিন্তু আমরা তো জানতাম ওই বাবুর দুই ছেলে প্রবাসী হওয়ায় উনি মনের দুঃখে বাড়ি বেচে দেন আমার দাদামশাইকে। ওনার মেয়েদের কথা শুনিনি তো!'

'হ্যাঁ, ওনার দুই ছেলে দুই মেয়ে।'

বিরাজ বলল, 'থাক, আপনি এক কাজ করুন, আমরা দু—বন্ধুতে এসেছি। আপনি কি আমাদের জন্য এমন একজন লোকের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন যে আমাদের রান্না থেকে জল তোলা বা অন্য সব কাজ করে দেবে?'

বলতে বলতেই দেখা গেল সেই তরুণী হনহন করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

মহিলা বললেন, 'ওই তো বাসনা। বনমালী ওদের ঘরেই চাবি রেখে গিয়েছিল।'

বাসনা কাছে এলে মহিলা বললেন, 'জানিস তো এ বাড়ির কত্তাবাবা ও কত্তামা দু—জনেরই স্বর্গগত হয়েছেন।'

বাসনা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'তাই!'

'হ্যাঁ, ইনি ওঁদের নাতি। দেখ না কাউকে পাস কিনা যে ওদের একটু রেঁধে বেড়ে দেবে।'

বাসনা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখছি। একটু আগে আমি ওদের দেখতে পেয়ে চাবি দিয়ে গেলুম। আমি ভাবলাম কত্তামা—রা বোধ হয় পরে আসবেন।' বলে বিরাজকে বলল, 'আপনি ঘরে যান। আমি কাউকে না কাউকে পাঠাচ্ছি।'

বিরাজ এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে এল।

এইটুকু সময়ের মধ্যে গোরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে ওদের শোবার ঘরটাকে।

বিরাজ এসে বলল, 'আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সব ব্যবস্থা পাকা।'

গোরা বলল, 'সত্যি বিরাজ, তুই খুব ভাগ্যবান। তোদের এই বাড়িটা যেন প্রকৃতির এক স্বর্গোদ্যানে। সামনেই বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা। আমাদের হাওড়া কলকাতার মতো ঘোলা জলের নয়। পরিষ্কার নীল জল। আমরা যে কদিন এখানে আছি সে কদিন রোজ ওই গঙ্গায় স্নান করব। আর একটা অনুরোধ, তোরা যেন ভুলেও কখনো এই বাড়িটাকে বেচে দিস না। আমরাই বন্ধুরা মিলে যখন ইচ্ছে তখন এই বাড়িতে আসা—যাওয়া করব। তা ছাড়া বাড়ির লোকদের নিয়ে চেঞ্জেও আসব মাঝে মাঝে।'

গোরার কথা শুনে বিরাজ বলল, 'এই বাড়ি বিক্রি করার বাসনা আমারও নেই রে।'

'তা তোদের সেই বনমালীর কোনো খবর পেলি?'

বিরাজ গোরাকে আর সত্যি কথাটা বলল না। কারণ, যদি ও কোনো কারণে ভয় পায় তাই। তবু বলল, 'ও বোধহয় এ বাড়িতে আর ফিরবে নারে। হঠাৎ ওর দেশ থেকে একটা তার আসায় ও সেই যে গেছে আর ফেরেনি। যাওয়ার সময় বুদ্ধি করে চাবিটা এখানকার এক গোয়ালার বাড়িতে দিয়ে গেছে। আর বলে গেছে, ও যদি দেশ থেকে না ফেরে তাহলে চাবিটা যেন কত্তাবাবু, কত্তামা এলে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

'বুঝেছি। তখন যে মেয়েটা এসে চাবি দিয়ে গেল সে তাহলে ওই গোয়ালাদেরই মেয়ে।'

'হ্যাঁ, ওর নাম বাসনা। ওই আমাদের কাজের লোকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।'

বিরাজের কথা শেষ হওয়ামাত্র নীচের দরজায় টক টক শব্দ। ওরা ওপর থেকে নীচে এসেই দেখল বাসনা এখানকার এক এদেশীয় মহিলাকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। মহিলার গায়ের রং মাজা কালো। বয়স খুবই কম। চব্বিশ—পঁচিশের বেশি নয়। বিবাহিতা।

বিরাজ বাসনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই দিদিটাই বুছি আমাদের কাজ কবে দেবে?'

বাসনা বলল, 'হ্যাঁ, এ হল লছমিদিদি। খুব ভালো মেয়ে। তবে অভাবী খুব। আপনারা দিনে একটাকা কবে ওকে দেবেন, কেমন? আর আপনাদের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাটা ও বিকেলের মধ্যেই করে দিয়ে চলে যাবে।'

বিরাজ বলল 'আমাদের এখানে এতগুলো ঘর, উনি ইচ্ছে করলে এখানেও থাকতে পারেন। আমরা যে কদিন এখানে আছি, সে কদিনের জন্য নয়, বরাবরের জন্যই। ওনাকে ঘরছাড়া দিতে হবে না।'

বাসনা হেসে বলল, 'সে পরের কথা। তা ছাড়া আপনারা দু—জন যুবপুরুষ যেখানে আছেন সেখানে একা কোনো মেয়ে কখনো থাকতে পারে? বিশেষ করে রাতের বেলা?'

বিরাজ বলল 'না না থাকাটা ঠিক হবে না। আমি অবশ্য ওদিকটা ভেবে দেখিনি।' তারপর লছমিকে বলল, 'লছমিদিদি, তুমি একটু ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘরে ঢুকে দেখো আমাদের কাজে লাগে এমন কোনো কিছু পাও কিনা।' বলে নীচের সব ঘরেরই দরজার তালা খুলে দিল।

বাসনা বলল, 'আমি তাহলে আসি?'

বিরাজ বলল, 'আসুন। আবার দেখা হবে।'

লছমিদিদি সব দেখেশুনে বলল, 'সামান্য কয়েক মুঠো চাল ছাড়া ঘরে কিছুই নেই গো দাদাবাবু। তবে স্টোভ জ্বালানোর মতো কেরোসিন আছে অনেকটা। তুমি এখানকার কিছুই চিনবে না। তুমি যদি আমাকে ট্যাকা দাও তো আমিই সব কিনে আনতে পারি।'

বিরাজ বলল, 'ক—টাকা দেব বলো?'

'দশটা ট্যাকা দেও না।'

বিরাজ টাকা দিলে লছমিদিদি দুটো ব্যাগ নিয়ে দোকান বাজার করতে চলে গেল।

লছমিদিদি চলে যাওয়ার একটু পরেই বাসনা এসে হাজির। মেয়েটিকে প্রথম দেখার পরেই দারুণ ভালো লেগেছে বিরাজের। যেন সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা। আর তেমনই মিষ্টি চোখ—মুখের আকর্ষণ।

বাসনা হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'অতিথিদের এখনও চা সেবা হয়নি নিশ্চয়ই? হবেই বা কী করে? ঘরে তো কিছুই নেই। তা আসুন না আমাদের বাড়িতে, চা করে খাওয়াব।'

এমন প্রস্তাব অবহেলা করার নয়। তাই দু—জনেই চলল বাসনাদের বাড়িতে চা খেতে।

মায়ামাধুরী থেকে বাসনাদের বাড়ি বেশ কিছুটা তফাতে। ওরা যেতে বাসনার মা ওদের দু—জনকে পুরোনো ভাঙাচোরা বাড়ির দাওয়ায় বসিয়ে খুব যত্ন করে চা—মুড়ি খাওয়াল। ওদের জমি—জিরেত সব দেখাল। তারপর বলল, 'যদি দুধের দরকার হয় তো বোলো, আমার মেয়ে গিয়ে দিয়ে আসবে।'

বিরাজ বলল, 'চায়ের জন্য দুধ তো লাগবেই। মাস খানেকের মতো আছি। এখানকার খাঁটি দুধ পেলে শরীর, স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।'

গোরা বলল, 'আমি অবশ্যই অতদিন থাকব না। চার—পাঁচদিন থেকেই চলে যাব। আমার বোনের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তবে আমার বন্ধুটি থেকে যাবে। কেন না ওর অনেক কাজ এখানে। সবকিছু গুছিয়ে, গাছিয়ে যাকে হোক বাড়িতে বসিয়ে তবেই যাবে ও।

গোরার কথা শেষ হতেই বাসনার মা একবার তাকিয়ে দেখল বাসনার দিকে। বাসনাও একবার মাকে দেখল। এই দেখাদেখির ব্যাপারটা অবশ্য নজর এড়াল না বিরাজের। মনে একটু ভয়ও হল। কী ভাগ্যিস কোনো ভৌতিক ঘটনার কথা কিছু বলে বসেনি এরা।

চা—পর্ব শেষ হলে ওরা দু—জনে ফিরে এল মায়ামাধুরীতে।

ওরা যাওয়ার একটু পরেই লছমিদিদি এল। অনেক কিছু কিছু। যাইহোক, অভ্যস্ত হাতে বেশ তৎপরতার সঙ্গে গুছিয়ে নিল সবকিছু। বলল, 'ভাত, ডাল একটা তরকারি বানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা ততক্ষণে গঙ্গায় গিয়ে চানটান করে এসো।

গোরা বলল, 'তোমাদের এখানে খাট্টা দই পাওয়া যায় না?'

'কেন পাওয়া যাবে না। ওই একটু এগিয়ে বাজারে গেলেই পাবে।'

'ঠিক আছে, তুমি ততক্ষণ রান্না করো, আমি চট করে একটু দই নিয়ে আসি।'

লছমিদিদি বলল, 'তোমাদের খাওয়াদাওয়া মিটলে আমি সব ঘরগুলো ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দেব।'

'দুপুরে তুমিও আমাদের সঙ্গে খাবে কিন্তু।'

'সে তো খাবই। না হলে আর কোথায় খাব বলো।'

গোরা বাজারে গেলে বিরাজ বলল, 'ঘরে তোমার কে কে আছে লছমিদিদি?'

'আমার সোয়ামি আছে, ছেলেমেয়ে আছে। ওরা অবশ্য কেউই থাকে না আমার কাছে। ছেলেমেয়ে দুটো খুবই ছোটো। সীতাকুণ্ডের আশ্রমে জানকীমাতার কাছে মানুষ হচ্ছে ওরা। আর সোয়ামি দু—বছর আগে অসমে কাজ করতে গিয়ে আর ফেরেনি। আমি শুধু স্বামীর ভিটেটুকু আগলে পড়ে আছি।'

'সত্যিই তুমি খুব ভালো মেয়ে। তা দিদি, আমাদের এই বাড়িতে তুমিই থেকে যাও না। তোমার ঘরটা কাউকে ভাড়া দিয়ে দাও।'

লছমিদিদি যেন একটু ভয় পেয়ে বলল, 'এ বাড়িতে একা থাকলে, আমার খুব ভয় করবে দাদাবাবু।'

'কেন? কীসের ভয়?'

'এ বাড়ির অনেক বদনাম আছে। তোমাদের কত্তাবাবা—কত্তামা যে কী করে ছিলেন তা আমরা ভেবে পাই না। ওনারা তো একজনকে রেখেও গিয়েছিলেন। তা মাত্র একরাত থেকেই ভয়ে পালিয়েছে সে।'

'কিন্তু ভয়টা কীসের?'

'এ বাড়ির এক বামুনঠাকুর বাগানের চাঁপা গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল। তারপরে ওই দুই দিদির একজন বিষ খেল আর একজন সাপকাটি হয়ে মরল। ওদের আত্মারা এই বাড়ির টান ছেড়ে কোথাও যেতে পারেনি। মাঝে মাঝেই একে ওকে তাকে দেখা দেয়। রাত বিরেতে বাড়িতে উপদ্রব করে।'

ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় মনে হল বিরাজের কাছে। ওর দাদু—দিদা এই বাড়িতে কত বছর বাস করলেন, ওরাও তো সেবার এসে প্রায় দিন পনেরোর মতো থেকে গেল, কই কোনো কিছুই তো টের পায়নি ওরা। বাগানে সাজি হাতে ফুল তুলেছে, কেউ ওদের কোনো ভয়ও দেখায়নি। অথচ দাদু—দিদা এখান থেকে চলে যাওয়ার পরই যত সব উদ্ভট গল্প। নিশ্চয়ই কেউ জলের দামে বাড়িটা কিনবে বলে এইসব রটাচ্ছে।

বিরাজ বলল, 'ঠিক আছে। আমরা তো রয়েছি। এখন এ বাড়িতে, দেখাই যাক না কিছু হয় কী না হয়।'

'তোমরাও কিন্তু এখানে থাকতে পারবে না দাদাবাবু। আজকের রাতটুকু থাকো, তেমন কিছু হলে অন্য কোথাও চলে যেও।'

বিরাজ বলল, 'যদি তেমন কিছু হয় তাহলে তাই যাব। তবে এসব গল্প যেন আমার বন্ধুটির কাছে কোরো না।'

বিরাজ আর কথা না বলে বাড়ির বাইরে এসে পায়চারি করতে লাগল। ওর সবকিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে শুনল ব্রাহ্মণ যুবক প্রভুদেবের উদবন্ধনে আত্মহত্যার কথা। পরে শুনল আগের মালিকের ছেলে ছাড়াও দুই মেয়ের কথা। তাদের নাম মায়া ও মাধুরী। এখন লছমিদিদির মুখে শুনল ওই মেয়েদের একজনের বিষ খেয়ে মরার কথা, অপরজনের সাপকাটি হয়ে। হয়তো সত্যসত্যই এমন কিছু হয়েছে। তা এসব কথা কি দাদু—দিদা জানতেন না? কে জানে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে এই বাড়িতে।

একটু পরেই গোরাকে আসতে দেখা গেল কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় দই নিয়ে। গোরার মুখ কেমন যেন গম্ভীর।

বিরাজ বলল, 'দই পেয়েছিস।'

'দেখতেই তো পাচ্ছিস শালপাতার ঠোঙায় দই আছে।'

'চল, তাহলে এবার গঙ্গায় গিয়ে স্নানটা করে আসি।'

গোরা কোনো সাড়াশব্দ করল না। তবে চটপট স্নানের জন্য তৈরি হল।

ওরা দু—জনে অনেকক্ষণ ধরে গঙ্গায় স্নান করল কিন্তু গোরার মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হল না। কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে রইল সে।

বিরাজ বলল, 'হঠাৎ তুই এমন মিইয়ে গেলি কেন রে? কী হয়েছে তোর?'

গোরা বলল, 'তুই কিন্তু আমার কাছে অনেক কিছুই গোপন করেছিস।'

'কী ব্যাপারে বল তো?'

'তোদের এই বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়। রাতে কেউ থাকতে পারে না।'

'ও সব মতলবি লোকেদের রটনা। তা যদি হয় তাহলে আমার দাদু—দিদা দীর্ঘদিন এই বাড়িতে বাস করলেন কী করে?'

'সে কথা তাঁরাই বলতে পারতেন। এখন তো তাঁরা নেই, তাই স্থানীয় লোকেরা যা বলেন সেটাই বিশ্বাস করতে হয়। আমি কিন্তু আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সোজা চলে যাব জামালপুর। তারপর রাতের গাড়িতে বাড়ি।'

'এটাই কি তোর সিদ্ধান্ত?'

'হ্যাঁ। বাজারে না গেলে জানতেই পারতাম না এ বাড়ির গুপ্তকথা।'

বিরাজ বলল, 'বেশ তো, যা ভালো বুঝিস কর। অযথা তোকে থাকতে বলে বিপদে ফেলব না। ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যা তুই।'

এরপর দু—জনে ঘরে এসে দুপুরের খাওয়া সেরে নিল। ডাল, ভাত আর চিনি মাখিয়ে খাট্টা দই। খাওয়াদাওয়ার পর খুব ব্যস্ততার সঙ্গে গোরা ওর ব্যাগপত্তর গুছিয়ে নিল। তারপর বিরাজের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'কিছু মনে করিস না ভাই। ওইসবে আমার দারুণ ভয়, তাই বিদায় নিচ্ছি।'

বিরাজ হেসে বলল, 'কিছুই মনে করব না। মন যখন চাইছে না তখন না থাকাই ভালো। তাছাড়া তুই না এলেও আমাকে তো আসতেই হত। হয়তো মা—ও আসতেন সঙ্গে। তবে সাবধানে যাস কিন্তু।'

গোরা বিদায় নিলে লছমিদিদি বলল, 'ওই দাদাবাবু চলে গেল?'

'হ্যাঁ। বাজারে কারা যেন ওকে ভূতের ভয় দেখিয়েছে তাই।'

'তুমি কী করবে?'

'আমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে যাবই বা কোথায়? আমি থাকব। তুমি শুধু আমার জন্য খানচারেক রুটি করে দিয়ে চলে যাও। ডাল, তরকারি যা আছে তাতেই আমার রাতের খাওয়া হয়ে যাবে।'

এরপর সারাটা দুপুর, বিকেল পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে সন্ধের মুখে লছমিদিদিকে বিদায় দিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে বসল বিরাজ। এখানকার গঙ্গার শোভা সৌন্দর্য দেখে ও এমনই মোহিত হয়ে গেল যে ওর মনের মধ্যে কোনো আতঙ্কই স্থান পেল না।

সন্ধে উত্তীর্ণ হলে ও বাজারে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে রাতে রুটির সঙ্গে খাবার জন্য একটু মিষ্টি কিনে ঘরে ফিরল। ঘরে তো ফিরল। কিন্তু ঘর যে অন্ধকার। এখানে আলোর ব্যবস্থা কী হবে সে ব্যাপারে ওর খেয়াল ছিল না। ও যখন কী করবে ভাবছে ঠিক তখনই একটা হ্যারিকেন নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল বাসনা। বলল, 'আমি জানতাম এমনই হবে। তাই আলো নিয়ে এলাম আপনার জন্য। তা আপনার বন্ধুটি শুনলাম বিদায় নিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। লোকে যা ভয় দেখিয়েছে। আর কখনও থাকে?'

'যাইহোক, আপনি না ভয় পেলেই হল। আমি চলে গেলে বাইরের দরজাটায় খিল দিয়ে আসবেন। কারও ডাকে সাড়া দেবেন না। দরজা খুলবেন না।'

বাসনা চলে গেলে বিরাজ টর্চের আলোয় দরজার কাছ পর্যন্ত এসে খিল দিয়ে গেল। এত বড়ো বাড়িতে এই ভয়ংকর নির্জনে একা থাকতে একটু যে ভয় করল না ওর তা নয়, তবু কী আর করা যাবে? থাকতে তো হবেই। শুধু তো রাতটুকু। তারপর ওর মনের মতো মেয়ে বাসনার সঙ্গ নিয়ে কয়েকটা দিন বেশ ভালোভাবেই কাটিয়ে দিতে পারবে।

সে রাতে বেশ কিছুক্ষণ শরৎবাবুর একটা বই পড়ে কাটাল ও। তারপর খেয়েদেয়ে উপরে এসে আলোর শিখাটা একটু কমিয়ে শুয়ে পড়ল টান হয়ে। শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে বাসনার কথা ভাবতে লাগল। মনে মনে এও ঠিক করল ওর দিক থেকে যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে ওকেই ওর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেবে।

খুব ভোরে অজস্র পাখির কলকাকলিতে ঘুম ভাঙল বিরাজের। আকাশ তখনও ভালোভাবে ফর্সা হয়নি। হ্যারিকেন নিভিয়ে ও টর্চ না জ্বেলেই বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তারপর গঙ্গার দিকে তাকাতেই মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল ওর। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে বাইরের দরজা খুলতেই দেখল বাসনা ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। বলল, 'কী মহাশয়, কাল রাতে ভূতেরা আপনাকে গলা টিপে মেরে ফেলেনি তো?'

'মোটেই না। সত্যি, যা ভয় দেখাল সবাই। মাঝখান থেকে আমার বন্ধুটি ভয় পেয়ে পালাল।'

'এখন তাহলে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'ওই একটু গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে আসি। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?'

বাসনা হেসে গড়িয়ে বলল, 'আমার কাজ নেই বুঝি? আমি শুধু দেখতে এলাম আপনি কতটা ভয় পেয়েছেন।' বলেই দ্রুত উধাও হয়ে গেল।

বিরাজ এরপর সূর্য ওঠার সময় পর্যন্ত গঙ্গার ধারে বসে থেকে যখন ঘরে ফিরল তখন দেখল, লছমিদিদি চারদিক ঝাঁটপাট দিয়ে স্টোভ নিয়ে বসে আছে।

বিরাজ যেতেই বলল, 'ওদিকে ঘড়া ভরতি জল আছে। ওই জল খাবে। দুধ এলেই চায়ের জল বসাব। তা হ্যাঁ দাদাবাবু, কাল রাতে কোনো ভয়টয় পাওনি তো?'

'না। কীসের ভয়?'

'ওই যে সবাই যা বলে।'

এইসব কথার মধ্যেই বাসনা এল দুধ নিয়ে। বলল, 'লছমিদিদি আমিও একটু চা খাব গো।'

বিরাজ বলল, 'তা তো খাবে। কিন্তু তখন তুমি ওইভাবে পালালে কেন?'

বাসনা যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'আমি। আমি তো এই আসছি।'

'আপনি স্বপ্ন দেখেছেন।'

'মোটেই না। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই দেখি তুমি।'

বাসনা একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'তবু ভালো যে রাতের অন্ধকারে আমাকে দেখেননি। কাল থেকে অত ভোরে না উঠে একটু বেলা করে উঠবেন কিন্তু।'

বিরাজ এবার বেশ বুঝতে পারল এ বাড়ির ব্যাপারস্যাপার নিয়ে যা রটনা তা মিথ্যে নয়। যাইহোক, ব্যাপারটা ও ভুলে যাবারই চেষ্টা করল।

চা—পর্ব শেষ হলে বাসনা বলল, 'একটু পরে আসুন না আমাদের বাড়ি। ভালো ঘিয়ের হালুয়া খাওয়াব। আর মাছ, মাংস খেতে চাইলে লছমিদিদিকে টাকা দিন, ও এনে দেবে।'

লছমিদিদি বলল, 'ও পাড়ার হাসিম বলছিল, বাবু যদি মোরগা খায় তো নিয়ে যা। বারো আনা দাম লাগবে।'

বিরাজ বলল, 'বেশ তো, তাই হোক না।' তারপর বাসনাকে বলল, 'একটা গোটা মুরগির মাংস তো আমরা দু—জনে খেয়ে শেষ করতে পারব না, তুমিও যোগ দাও না আমাদের সঙ্গে? গ্র্যান্ড পিকনিক একটা হয়ে যাবে তাহলে।'

বাসনা হেসে বলল, 'আমার আপত্তি নেই। এখন আপনি আসুন আমাদের বাড়ি। অমনি মাকেও বলে আসি। আমার মা কিন্তু আপনাকে খুব ভালো চোখে দেখেছেন।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। বলছিলেন ছেলেটা খুব ভালো রে। বড়ো ঘরের ছেলে কিন্তু কোনো দেমাক নেই।'

বিরাজের মন ভরে গেল একথা শুনে। মনে মনে ভাবল, বাসনাকে ঘিরে ওর মনোবাসনা হয়তো পূর্ণও হতে পারে। গোরাটা চলে গিয়ে ভালোই হয়েছে। সবসময় বাসনাকে ওর খুব কাছে পেতে কোনো অসুবিধেই হবে না আর।

বাসনাদের ঘরে এলে ওর মা খুব আদরযত্ন করলেন বিরাজকে। ভালো ঘিয়ের হালুয়া আর পরোটা খেতে দিলেন। তারপর চা।

বিরাজ বলল, 'আপনি জানেন কিনা জানি না। ভূতের ভয়ে আমার বন্ধুটি কালই বিদায় নিয়েছে এখান থেকে। লছমিদিদি একটা মুরগি আনতে গেছে। আপনার বাসনা কিন্তু আজ আমাদের ওখানেই খাবে।'

মা বললেন, 'বেশ তো বাবা, ওর মন যদি চায় তো যাক না। তা ছাড়া আর কদিনই বা আমার মেয়ে হয়ে থাকবে ও? বড়ো হয়েছে। এবার তো কারও না কারও ঘর করতে চলে যাবে। ওর ভাগ্যে যে কোনো মহাপুরুষ আছেন তা কে জানে?'

বিরাজ একবার বাসনার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'ওর ভালোই হবে, দেখবেন।'

'তোমার কথাই যেন সত্যি হয় বাবা।'

এরপর ওরা দু—জনে যখন মায়ামাধুরীতে ফিরে এল তখন দেখল লছমিদিদি কাকে যেন নিয়ে এসে মুরগি কেটে ছাড়াতে দিয়েছে।

বাসনাও এবার লছমিদিদির সঙ্গে রান্নার কাজে হাত লাগল। আর সেই অবসরে বিরাজ সিন্দুকের চাবি নিয়ে দোতলার একটি ঘরে গিয়ে ব্যাংকের কাগজপত্তর ইত্যাদি দেখতে লাগল। গয়নার বাক্স খুলে গয়নাও পেল অনেকগুলো। চুড়ি, বালা, হার—বেশ কয়েক ভরির।

বিরাজ যখন এইসব নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখনই একটা ট্রেতে করে চা বিস্কুট নিয়ে উপরে এল বাসনা। দেখেই বলল, 'ও বাবা! এতসব কোথায় ছিল? কার এগুলো?'

'আমার দিদার।' তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি রাজি থাকলে তোমারও হতে পারে।' বাসনা লজ্জায় রাঙা মুখে 'ধ্যাৎ' বলে উধাও হয়ে গেল।

ওর লজ্জা দেখেই বিরাজের মনে হল বাসনা ওর দিক থেকে ডাক পেলে না করবে না।

অনেক পরে বিরাজ গঙ্গায় গেল স্নান করতে। ফিরে এসে পেট ভরে মাংস—ভাত খেল। কী সুন্দর রান্না। দারুণ তৃপ্তি হল খেয়ে।

খাওয়াদাওয়ার পর বাসনা চলে গেল ওদের বাড়িতে।

বিরাজের দিবানিদ্রা হয় না। তাই শুয়ে শুয়ে শুধুই এপাশ—ওপাশ করতে লাগল।

বিকেল হতেই বাসনা আবার এল। বলল, 'চলুন আপনাকে আমাদের এখানকার কেল্লা দেখিয়ে আনি।'

সামনেই কেল্লা। স্পষ্ট দেখা যায়।

বিরাজ বলল, 'চলো তবে।'

ওরা নীচে এলে লছমিদিদি ওদের চা করে খাওয়াল।

বাসনা বেশ সাজগোছ করেই এসেছিল। বিরাজও পোশাক পরিবর্তন করে অনেক আনন্দ নিয়ে চলল কেল্লা দেখতে। শুধু কেল্লা দেখা নয়, সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে বসে সূর্যাস্তও দেখল দু—জনে।

অনেক পরে ওরা আবার ফিরে এল মায়ামাধুরীতে।

বাসনা আর ভিতরে ঢুকল না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'শুনুন, আর কিন্তু একদম বাইরে বেরোবেন না। লছমিদিদি চলে গেলে দরজায় খিল দিয়ে উপরের ঘরেই থাকবেন। দিদিকে বলবেন খাবারটা আপনার ঘরেই দিয়ে আসতে। আর একটা কথা, কেউ হাজার ডাকাডাকি করলেও বাইরে বেরোবেন না। সাঁড়া দেবেন না। এমনকী আমি এলেও না।'

বাসনার কথা শুনে এবার আমার গা ছমছম করে উঠল।

বাসনা আবার বলল, 'আজকের রাত্রিটা দেখুন। তেমন বুঝলে কাল থেকে আমাদের ঘরেই আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দেব। বাবা কয়েকদিনের জন্য দেওঘরে গেছেন, আমাদের ঘরও ফাঁকা।'

বাসনা চলে গেলে লছমিদিদি বিরাজের রাতের খাবার গোটা চারেক রুটি আর সকালের মাংস উপরের ঘরে রেখে এল। আগের দিনের মিষ্টি তো ছিলই ঘরে। বাসনার কথামতো লছমিদিদিকে বিদায় দিয়ে উঠোনের দরজার খিল এঁটে দোতলায় শোবার ঘরে চলে এলে বিরাজ।

হ্যারিকেনের আলোয় অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ে একসময় খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়ল বিরাজ। বাসনার সঙ্গে আজকের বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাটিয়ে দারুণ আনন্দ পেয়েছে ও। তাই ওর কথা ভাবতে ভাবতেই এক আশ্চর্য মধুরিমায় ভরে উঠল মন—প্রাণ।

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎই মেয়ে গলার এক সুললিত কণ্ঠের গানের সুরে ঘুমটা ভেঙে গেল বিরাজের। গানের সুর তো ভেসে আসছে বাগানের দিক থেকে। এত রাতে বাগানে এসে গান গায় কে?

বিরাজ আর থাকতে পারল না। পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে বাগানের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল এক পরমাসুন্দরী কন্যা তার রূপের ছটায় বাগান আলো করে নানা ফুলে গাঁথা মালা নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে এদিকসেদিক ঘুরছে। কোনো মেয়ের এত রূপ বিরাজ এর আগে আর কখনো দেখেনি। ওর মনে হল, এখনই বাগান গিয়ে ওর সামনে দাঁড়ায়। আরও কাছ থেকে গান শোনে। বাগান তো ওদেরই। তাই ওখানে যাওয়ার অধিকারও ওর আছে।

ও যখন বাগানে যাওয়ার কথা চিন্তা করছে তখনই একটা খিলখিল হাসির শব্দে পিছু ফিরে তাকাল। দেখল নীচে নামার সিঁড়ির কাছে আর এক রূপবর্তী মোহিনী মূর্তিতে ওর দিকে তাকিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

বিরাজ বলল, 'কে তুমি!,'

মোহিনী বলল, 'আমি সেই।'

'বাগানে গান গাইছে কে?'

'কেউ তো না। কেউ নেই ওখানে।'

বিরাজ বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যিই সেখানে কারও কোনো অস্তিত্ব নেই। আবার পিছু ফিরে দেখল মোহিনীও উধাও। চোখের পলকে গেল কোথায় মোহিনী!

বাগানের ভিতর থেকে মোহিনীর সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমি এ—খা—নে।'

বিরাজ বাগানে দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেল মোহিনীকে। একটি শ্বেত রঙ্গনের ডাল ধরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকা মোহিনী হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। ও ক্ষণবিলম্বও না করে তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। কিন্তু কোথায় মোহিনী? কেউ তো নেই।

এবার ও নিজের ভুল বুঝতে পারল। বাসনা ওকে বারবার বলেছিল কারও ডাকে সাড়া না দিতে। কিন্তু সেই ভুলই সে করে বসল। ওর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তখন। জীবনে এই প্রথম ওর প্রেতাত্মা দর্শন।

তাই আর বাগানে না থেকে ঘরের দিকেই পা বাড়াল।

হঠাৎ সুললিত কণ্ঠের এক মধুর স্তোত্রপাঠ কানে আসতেই থমকে দাঁড়াল বিরাজ। নানাবিধ সুগন্ধি ফুলের সুবাসে চারদিক তখন ম—ম করছে। ও দেখল এক দিব্যপুরুষ হাসি হাসি মুখ করে এগিয়ে আসছেন ওর দিকে। তাঁর গলায় পরমাসুন্দরীর হাতের সেই পুষ্পমাল্য। জ্যোতিষ্মান দিব্যপুরুষ কাছে এলে বিরাজ তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি কে? এই বাগানে কেন?

দিব্যপুরুষ বললেন, 'আমার এবং ওই যুবতির আশ্রয়স্থল এখানেই। এই বাগানের সর্বত্র আমরা সূক্ষ্মশরীরে ঘুরে বেড়াই। যারা আমাদের অস্তিত্বকে মর্যাদা দেয় আমরা তাদের দেখা দিই না। তোমার দাদু—দিদা আমাদের অস্তিত্বের কথা জানতেন। ওঁরা অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ছিলেন। সন্ধ্যা সমাগমে তোমার দাদু এখানেই ঘাসের ওপর বসে গীতাপাঠ করতেন। দিদা গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিয়ে ধূপধুনো দিতেন। ওঁরা নেই। অনাচারী কাউকে আমরা সহ্য করতে পারি না। তাই মাঝে মাঝে আমাদের অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে তাদের ভয় দেখাই। কারণও আছে। অযথা কারও প্রাণহানি হোক এটা আমরা চাই না। এই বাড়ির পরমায়ু বেশিদিন নয়। সে কথা জানানোর জন্যই তোমাকেও দেখা দিলাম। এখন থেকে এ বাড়ির মায়া ত্যাগ কর। যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে চলে যাও।'

কথা শেষ হতেই দিব্যমূর্তিও মিলিয়ে গেলেন।

বিরাজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। আঁধারের আবছা ভাব কেটে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে তখন।

এরপর ঘরে এসে চোখেমুখে একটু জল দিয়েই বাসনাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল বিরাজ।

এত ভোরে ওকে এইভাবে আসতে দেখে বাসনা ও মা দু—জনেই এগিয়ে এল ওর দিকে।

বাসনা বলল, 'কী হল আপনার? এত ভোরে আমি না ঘর থেকে বেরোতে বারণ করেছিলাম। নিশ্চয়ই কোনো ভয়ের ব্যাপার হয়েছে?'

বিরাজ বলল, 'তেমন কিছু নয়। আগে আমাকে এক কাপ চা খাওয়াও তো দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থা হল।

চা খেতে খেতেই বিরাজ রাতের ঘটনার কথা প্রকাশ করল ওদের কাছে। তারপর বাসনার মাকে বলল, 'আজ আর লছমিদিদির রান্না নয়, এ বাড়িতেই দুপুরের অতিথি হব আমি। আপনার হাতের রান্নাই খাব আমি আজ।'

বাসনার মা বলল, 'এ তো খুবই আনন্দের কথা বাবা।'

বিরাজ এবার অসংকোচ বলল, 'একটু বেলায় এখানকার পোস্ট অফিসে গিয়ে বাড়িতে একটা তার করে দিয়ে আসব। আপনাদের অমত না থাকলে আমার মা বাবা দুজনেই এসে আশীর্বাদ করে যাবেন বাসনাকে।'

আনন্দে অভিভূত বাসনার মা আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছলেন।

বাসনাও প্রথমে ওর মাকে পরে গলায় আঁচল দিয়ে বিরাজকে প্রণাম করল।

নিমন্ত্রণ

মনোজ সেন

শশধরবাবু টি—পটের ঠিক পাশেই পটাশিয়াম সায়ানাইড মেশানো চিনির কৌটোটা যত্ন করে সাজিয়ে রাখলেন। পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে তার চেম্বারটা পরীক্ষা করে দেখলেন সবকটা গুলি ঠিকমতো আছে কি না। বলা তো যায় না। রাসপুটিন নাকি পটাশিয়াম সায়ানাইড মেশানো একগাদা কেক চেটেপুটে খেয়ে দিব্যি বহালতবিয়তে হেঁটে চলে যাচ্ছিল। তখন, পেছন থেকে গুলি করে তাকে মারতে হয়। বিষটা হয়তো ভেজাল ছিল, কিন্তু শশধরবাবু শুনেছেন যে অনেক লোকের নাকি ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা থাকে বিষ খেয়ে বেবাক হজম করে ফেলার। কাজেই, কোনোরকম ঝুঁকি তো নেওয়া যায় না। শশধরবাবু অত্যন্ত সাবধানী লোক। বিকল্প ব্যবস্থা না করে তিনি কক্ষনো কোনো কাজ করেন না। তাই পটাশিয়াম সায়ানাইডও রইল, পিস্তলও রইল। তা ছাড়া, সোফার নীচে একটা বড়ো ছোরাও গোঁজা আছে। সেটাও কাজে লাগানো যাবে যদি দরকার পড়ে।

তবে, অতটা দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। কারণ, তড়িতের শরীরটা যতই ভীমাকৃতি হোক না কেন, সে তো রাসপুটিন নয়। রাসপুটিনের কতগুলো অলৌকিক ক্ষমতা ছিল,তড়িৎ নেহাতই রক্ত—মাংসের সাধারণ মানুষ। একটা অপদার্থ, নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ। তাকে খুন করতে খুব বেশি ঝামেলা পোয়াতে হবে না। শশধরবাবু এখন বয়স হয়েছে, তা হলেও এখনও তড়িতের মতো একটা গাড়লকে মারা তাঁর কাছে একটা মশা মারার চেয়েও সহজ ব্যাপার। এই তো, আজ সন্ধেবেলা মাত্র একঘণ্টার মধ্যে পেছনের বাগানে যে একটা পরিষ্কার সুন্দর কবর খুঁড়ে রেখেছেন, আজকালকার কোনো জোয়ানেরও সাধ্যি আছে অমন চমৎকার কাজ করতে পারে? শশধরবাবুর বয়েস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই হাড়েই এখনও ইচ্ছে করলে তিনি ভেলকি দেখিয়ে দিতে পারেন।

তৃপ্ত মুখে শশধরবাবু সোফায় এসে বসলেন। বাইরে সিঁড়ির ল্যান্ডিং—এ জাপানি ঘড়ি টংটং করে সাতটা বাজাল। এখন প্রতীক্ষা। তড়িৎ সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আসবে বলেছে। ছোঁড়ার আবার সময় জ্ঞান ভীষণ টনটনে। আটটা বলল তো আটটাই। এখন ছেলে জীবনে কখনো উন্নতি করতে পারে?

বাড়িটা যেন আজকে ভীষণ নির্জন বলে মনে হচ্ছে। অবিশ্যি, জনমনিষ্যি নেই, নির্জন তো হবেই। বাড়ির চাকর, মালি, সবাইকে দুপুরবেলা ছুটি দিয়ে দিয়েছেন শশধরবাবু। আহা, বেচারিরা! শশধরবাবু এলে ওরা কী পরিশ্রমই না করে। গত দু—মাস ধরে প্রায় নাওয়া—খাওয়া ভুলে ওরা শশধরবাবুর সেবা করছে। মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম না পেলে ওরাই বা কাজকর্ম করে কী করে? তা, সেইজন্যে শশধরবাবু সবাইকে দশটা করে টাকা দিয়ে শ্যাওড়াফুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওরা ওখানে সিনেমা—টিনেমা দেখবে, একটু খাওয়া—দাওয়া করবে, একটু মেয়েছেলে নিয়ে আনন্দফুর্তি করবে। ফিরতে—ফিরতে সেই কাল দুপুর। শশধরবাবুর তাতে কোনো কষ্ট নেই, ওদের আনন্দেই ওঁর আনন্দ। নিজের জন্যে দুটো ভাতে ভাত উনি নিজেই ফুটিয়ে নিতে পারবেন। মাছ—মাংস খাওয়া অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছেন কাজেই অসুবিধে তো কিছু নেই। যবে থেকে শ্রীশ্রীসন্তাপহারী ঈশ্বরানন্দ অবধূতের শ্রীচরণে ঠাঁই মিলেছে, তখন থেকে তো শুধুই আনন্দ, পরিপূর্ণ হৃদয়।

তাহলেও বাড়িটা যেন বড়োই নির্জন লাগছে। তার ওপর সন্ধে থেকেই কেমন একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে। একতলার বিরাট—বিরাট ঘর আর প্যাসেজের মধ্যে সেই হাওয়া পাক খেয়ে—খেয়ে একটা অদ্ভুত

গোঁগোঁ করে আওয়াজ করছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারংবার মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন শশধরবাবু। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, হিমানী মরবার আগে ঠিক এমনি করেই গোঁ গোঁ করে আর্তনাদ করেছিল। অথচ, উনি ঠিকই বুঝতে পারছেন যে, আজ তড়িৎ আসছে বলেই তাঁর হিমানীর কথা মনে পড়ছে। এসে তাঁর বিচলিত হওয়ার কোনো কারণই নেই। তাঁর স্নায়ু কোনোদিন এত দুর্বল নয়। আজ পর্যন্ত কম মেয়েকে তো তিনি গলা টিপে মারেননি। তাদের অনেকেই তো তাঁর পা জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। কিন্তু তিনি কি বিচলিত হয়েছিলেন? মোটেই না। কর্তব্য হল কর্তব্য। কিন্তু, আজ যে হিমানীর কথা মনে পড়ে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠছেন, এতেই তাঁর আশ্চর্য লাগছিল।

আসলে, সব নষ্টের গোড়া হল ওই হারামজাদা তড়িৎ মজুমদার। বিয়ে যেন আর কেউ করে না, আর বউ যেন আর কারোর হয় না। বউ মরেছে, কোথায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবি, আর—একবার ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াবি—তা নয়, শোকের ঠ্যালায় একেবারে গৃহত্যাগ! আচ্ছা, তা—ও না হয় বুঝলুম বেদনা—টেদনায় কাতর হয়ে গৃহত্যাগ করেই ফেলেছিস, তাহলে সন্ন্যাস নে, হিমালয়ে গুহায় গিয়ে তপস্যা করে শান্তি খোঁজবার চেষ্টা কর। তা নয়, ছোঁড়া বলে কিনা হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! কী গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে রে বাবা! হত্যাকারীকে তুই খোঁজার কে রে? পুলিশ রয়েছে কোন কর্মে? তারা যদি খুঁজে না পায়, মিটে গেল ঝামেলা। শশধরবাবু যদি আগে জানতেন যে তড়িৎ ছোকরা এতদূর গাধা, তাহলে কি আর ওর মুখদর্শন করতেন?

অবিশ্যি, তড়িতের মুখদর্শন তো আর তিনি তড়িতের জন্যে করেননি, করেছিলেন হিমানীর জন্যে। হিমানীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট মুখখানি দেখে ওঁর কোমল হৃদয় গলে জল হয়ে গিয়েছিল। ওদের সাহায্য করার জন্যেই না নিজের হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ওদের দিকে! এরকম অসহায়, দুর্বল লোকেদের সাহায্য করাই তো তাঁর ধর্ম এবং তাঁর ব্যবসা।

না হলে কী ছিল তড়িৎ? এম এ পাশ করে একটা বাসনের দোকানে সেলসম্যানের কাজ করছিল। হিমানীকে পুজোয় একটা শাড়িও কিনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। আর, হিমানী বাচ্চাদের স্কুলে পড়াত আর উদয়াস্ত পরিশ্রম করত। শশধরবাবু যদি এগিয়ে না আসতেন, ওদের কাকে—চিলে তুলে নিয়ে যেত না? তড়িৎ কি জীবনে কোনোদিন ফিল্মস্টার হতে পারত, না হিমানী টালিগঞ্জের বিলাসী ফ্ল্যাটে আয়েশ করে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে দিন কাটাতে পারত? কিন্তু, তার প্রতিদানে শশধরবাবু কী পেলেন? আজকের এই ঝামেলা। এই জন্যেই কখনো পরের উপকার করতে নেই।

অথচ শশধরবাবু কিন্তু ওদের উপকারই করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে হিমানীর। শশধরবাবুর মায়ের স্মৃতিবিজড়িত নগেন্দ্রবালা শিশুমন্দিরে যখন হিমানী প্রথম টিচার হয়ে এল, তখন থেকেই তার উপকার করবার জন্য শশধরবাবু ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। শিশুমন্দিরের হেডমিস্ট্রেস মিস মনোলোভা চক্রবর্তী তাঁর অনেক দিনের বিশ্বস্ত সঙ্গিনী,—প্রথম দিকে শয্যায়, পরের দিকে অন্যত্র। তিনিই হিমানী যাতে শশধরবাবুর সাহায্য পায়, সেদিকে নজর রাখবেন বলেছিলেন।

না রাখবেনই বা কেন? তিনিও তো শশধরবাবুর সাহায্যেই আজ নিউ আলিপুরে একটি বারোশো স্কোয়ারফুট ফ্ল্যাটের মালিক। না হলে আজ কোথায় থাকতেন তিনি? বেলেঘাটার একটা এঁদো গলিতে শ্বশুরবাড়ির বাসন মাজতে—মাজতেই তাঁর সেদিনের অসাধারণ রূপ নষ্ট করে ফেলতেন! আজ অবশ্য তাঁর সেই রূপের আর অবশিষ্ট বিশেষ কিছু নেই। শশধরবাবু যাদেরই ফুসলিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছেন, তারা প্রত্যেকেই যে খুবই রূপসী ছিল তা তো বলাই বাহুল্য। শশধরবাবু সুন্দরের পূজারি, কুৎসিত কোনো কিছুই তিনি সহ্য করতে পারেন না। তবে সুন্দরের পূজারি বলেই তো তিনি মাত্র একটি সুন্দরীকে নিয়েই দিন কাটাতে পারেন না। তাহলে, অন্যান্য সুন্দরীরা কি ভেসে যাবে নাকি? কাজেই, কিছুদিন বাদেই তাদের শশধরবাবু পাঠিয়ে দেন তাঁর অন্যান্য কর্মকেন্দ্রে। কেউ, যায় তাঁর সিনেমা ব্যবসায়ে, কেউ স্মাগলিংয়ে, কেউ জাল নোট পাচারের কাজে, কেউ বা সারা শহরের ছড়িয়ে থাকা তাঁর বেশ্যাগারগুলোয়। এসব জায়গাগুলো

থেকে তারা যে আয় করে,তার একশো ভাগের এক ভাগও তারা তাদের সংসারে থাকলে করতে পারত না। সকলেই কী সুখী। তবে কিছু কিছু মেয়ে থাকেই যারা গাধারও অধম। যেমন ছিল হিমানী। তারা প্রতিবাদ করে, কান্নাকাটি করে। দুঃখ পান শশধরবাবু। কিন্তু এত প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তাই তাদের আর বেঁচে থাকতে দেন না তিনি, খুন করে ফেলেন।

এসব অত্যন্ত পরিষ্কার ব্যাপার। এর মধ্যে কোনো গন্ডগোল নেই। এসব তাঁর মনে কোনোদিনই রেখাপাত করে না। যে—কটা মেয়েকে তিনি খুন করেছেন তাদের প্রত্যেকের নাম তাঁর মনে আছে, কণ্ঠস্বর মনে আছে, তারা কে, কোন রং পছন্দ করত তা—ও মনে আছে। এখনও সেইসব গান শুনলে, রং দেখলে তাদের কথা তাঁর মনে পড়ে। কিন্তু কই, তিনি তো কোনোদিনই বিচলিত বোধ করেননি। অথচ আজ হিমানীর কথা মনে পড়তেই তাঁর কীরকম মনে হচ্ছে—যেন তাঁর মনের মধ্যে কোথায় একটা বিরাট জট পাকিয়ে গেছে। কেন যেন মনে হচ্ছে তিনি ভয়ংকর একা। তাঁর অন্তরাত্মা যেন বারংবার বলছে, 'সাবধান শশধর, তোমার সামনে ভীষণ বিপদ।'

এসব তো ভালো কথা নয়। আচ্ছা, ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করা যাক। কীসের বিপদ? স্পষ্টতই তড়িৎ। আসলে, তাঁর মনে ভয় ঢুকেছে যে, তড়িৎ জেনে গেছে যে তিনিই হিমানীর হত্যাকারী এবং তিনি ওকে হত্যা করার আগেই ওই তাঁকে খুন করে বসবে। এটা একটা নিতান্তই অবাস্তব ভয়। দেউকিপুর স্টেশনের গায়ে চায়ের দোকানে তড়িৎকে যখন তিনি বসে থাকতে দেখেছিলেন, তখন তড়িৎ ওঁকে দেখতে পায়নি বা তার পড়ে দেখা সম্ভবও ছিল না। তড়িৎকে দেখেই তাঁর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। তাহলে কি তড়িৎ সব জেনে গেছে এবং তাঁকেই তাড়া করে এতদূরে তাঁর এই গোপন বাসের কাছে এসে পৌঁছেছে? চট করে একটা পাশের দোকানে ঢুকে দ্রুত চিন্তা করে নিলেন তিনি। তখন সকাল আটটা, চারদিকে গিজগিজ করছে লোক, চায়ের দোকানের মালিক নিত্যানন্দ তাঁর মাইনে করা গুন্ডা, কাজেই এর মধ্যে তড়িৎ কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু কোনো কিছু করার আগে, জানা দরকার তড়িৎ ওখানে কী করছে। তড়িৎ ভালো অভিনেতা হতে পারে, কিন্তু হঠাৎ ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ও মনের ভাব গোপন করতে পারবে না। হয় গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, নয়তো পুরোনো দিনের মতো পরামর্শ শুরু করবে। ঝাঁপিয়ে যদি পড়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দকে দিয়ে ওর মাথাটা দু—ফাঁক করে দেওয়া যাবে। যদি না পড়ে, তাহলে কর্তব্য পরে স্থির করলেই চলবে। এই ভেবে, হঠাৎ দুম করে তিনি তড়িতের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তড়িৎ কি তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? মোটেই নয়। বরং স্বভাবসিদ্ধ সরল হাসিতে তৎক্ষণাৎ ওর সমস্ত মুখটা ভরে গিয়েছিল। খুশি—খুশি গলায় বলে উঠেছিল, 'আরে, কাকাকাবু! আপনি এখানে কী করছেন?'

তাহলে এত অস্বস্তির কী আছে? ভুল তাঁর হয়নি। মানুষ চেনায় তাঁর ভুল হয় না। তবে কি নীচের ঘরগুলোয় ওই বাতাসের শব্দটা? কী অদ্ভুত ব্যাপার! বাতাসের সঙ্গে শশধরবাবু ভয় পাচ্ছেন শুনলে যে একটা বাচ্চা ছেলেও হাসবে।

আসলে, দুপুরে বোধ হয় ভালো ঘুম হয়নি, সেইজন্যেই এরকম হচ্ছে। তড়িৎকে বিনা ঝামেলায় খুনটা করে ফেলতে পারলে চিত্তও প্রফুল্ল হবে, এসব অস্বস্তিও চলে যাবে। এবং হয়তো আর কোনো দিন হিমানীর কথা মনেও পড়বে না।

মনে পড়ার তো কোনো কারণ নেই। তিনি তো আর হিমানীকে উপভোগ করেননি। স্ত্রীলোকের সতীত্বে তিনি কোনোদিনই বিশ্বাস করেন না, যেমন করেন না সোনার পাথরবাটিতে। কিন্তু হিমানীর সতীত্ব হয়তো অন্য কেউ হরণ করে থাকতে পারে, তিনি পারেননি। এ হেন ব্যর্থতা তাঁর জীবনে খুবই কম হয়েছে। উপভোগটা না করেই আর কোনো মেয়েকে তিনি মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন, এরকম কথা তাঁর স্মরণে আসে না। সেইজন্যেই কি তাঁর বারবার হিমানীর কথা মনে পড়ছে আজ? তাহলে অস্বস্তি হওয়ার কী কারণ? বরং রাগ হওয়া উচিত।

রাগও যে হচ্ছে না তা নয়। কী অদ্ভুত বুদ্ধিহীন, গণ্ডমূর্খ মেয়েই না ছিল হিমানী। এম এ পাশ করেছিল না কি। কী করে করেছিল, কে জানে। শশধরবাবু তো কল্পনাই করতে পারেন না যে কোনো শিক্ষিত মেয়ে এমন বোকা হতে পারে।

মনোলোভা অবশ্য গোড়াতেই বলেছিল, 'হিমানী বড়ো কঠিন ধাতুর মেয়ে শশধরবাবু। আমাদের মতো লোভী, দুর্বল চরিত্রের মেয়ে ও নয়। আপনার জালে ধরা পড়বে কিনা বুঝতে পারছি না।'

এসব কথা শুনলে শশধরবাবুর হাসি পায়। মেয়েরা যে কী ধাতুর,তা তাঁর আর জানতে বাকি নেই। একটি মাত্র ধাতুই ওদের আছে, সেটি হল সোনা। সোনা ছাড়া ওরা কিছু বোঝেও না, জানেও না। সোনার লোভ দেখালে ওদের দিয়ে সবকিছু করানো যায়। বাড়ি, গাড়ি, গহনা ব্যস! তবে কারোর লোভ বেশি, কারোর কম।

কিন্তু হিমানী যেন কেমন একটা ছিল!

প্রথম দিকে শশধরবাবুর ধারণা হয়েছিল, হিমানীকে বাগানো খুব কঠিন হবে না। উনি যে উপহারগুলো দিতেন সেগুলো নিত, কিন্তু তার পরেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত। বলত,'আমার বাবা নেই। আপনাকে দেখলে, আমার বাবার কথা মনে পড়ে যায়।' এসব কথায় শশধরবাবুর হৃদয় বিচলিত হয় না। অনেক মেয়েই ধর্ষিতা হওয়ার আগে তাঁর পা ধরে তাঁকে পিতৃসম্বোধন করেছে। কিন্তু হিমানীর মধ্যে এমন একটা অসংকোচে সারল্য ছিল যে, তিনি চট করে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন না। তারপর যখন তিনি ওকে সিনেমায় চান্স দেওয়ার কথা পাড়লেন, হিমানী বলল, 'কী যে বলেন জ্যাঠামশাই! আমি আবার অভিনয় করতে পারি না কি? বরং ওকে একটু চান্স দিন না। ও কলেজে পড়ার সময় খুব থিয়েটার—থিয়েটার করত। আর ওর চেহারা যা সুন্দর, আপনার দেখলেই পছন্দ হবে।' বলে সলজ্জ হাসল।

এই ও হল তড়িৎ। তা তড়িৎ দেখতে সত্যিই সুদর্শন ছিল। আর হিমানীকে পাওয়ার জন্য তখন হেন কাজ নেই, যা তিনি করতে পারেন না। অগত্যা, সেই ছোকরাকে তাঁর সিনেমা কোম্পানিতে ঢুকিয়েই নিলেন শশধরবাবু।

তখন মহা হইচই পড়ে গেল। শশধরবাবু কস্মিন কালেও সিনেমা দেখেন না, কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন, সেই ছোকরার অভিনয় দেখে না কি সবার তাক লেগে গেছে। সূর্যকুমার বলতে সবাই অজ্ঞান। তড়িৎ ওই নামেই সিনেমায় নেমেছিল।

তড়িতের হয়তো মাথা ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কে জানে কেন ছোকরা অজস্র অফার নাকচ করে দিয়ে তাঁর কোম্পানিতেই রয়ে গেল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে যে কত টাকা দিতে চেয়েছিল সে খবর শশধরবাবু রাখতেন, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তড়িৎ তাদের সকলকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। তড়িতের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে গোপনে তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন এবং তারা সকলেই বলেছিল যে এই প্রত্যাখ্যানের কারণ তাঁর প্রতি তড়িতের কৃতজ্ঞতা। শুনে শশধরবাবু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

কৃতজ্ঞতা? সে আবার কী? সেরকম কোনো কিছু আবার হয় না কি? হুঁ হুঁ। শশধরবাবুকে দেখতে যতটা বোকা বলে মনে হয়, আসলে তিনি মোটেই তা নন। আসল ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর খুব বেশি দিন লাগেনি।

খুবই সোজা ব্যাপার। কৃতজ্ঞতা—টৃতজ্ঞতা বাজে, আসল কথা গলায় গামছা দিয়ে আরও টাকা আদায়ের ধান্দা। এখন খুব সরল হেসে 'আপনি যা দেবেন তাই নেব, কাকাবাবু!' যতই বলো না কেন, আরও কিছু দিন গেলে আরও একটু নাম করলে, চেহারা যে কতদূর পালটাবে শশধরবাবুর তা জানা আছে। আর বাকি সব প্রোডিউসাররা তো চুনোপুঁটি, তাঁর মতো টাকার কুমির বাংলাদেশে আর ক—টা আছে। খসাতে হলে, এখানে খসানোই ভালো।

তড়িৎকে তখনই তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হিমানীর জন্য পারা গেল না, মেয়েটা তখনও তাঁর কাছে দূর অস্ত। তিনি যতই হিমানীর দিকে এগিয়ে যান, তাকে কাছে টানতে চান, সে ততই মিষ্টি হেসে ভক্তি—টক্তির ভাব দেখিয়ে এড়িয়ে যায়। প্রথম দিকে শশধরবাবু ভেবেছিলেন মেয়েটা ওঁকে খেলাচ্ছে।

ভেবে খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু, পরে দেখলেন তা তো নয়। খেলাটা যে বড্ড বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন শশধরবাবু। শেষপর্যন্ত মনস্থিরই করে ফেললেন। সূক্ষ্ম ব্যাপার—ট্যাপারে কিসসু হবে না, হিমানীর গোবর—পোরা মাথায় কোনো ইঙ্গিতই ঢুকবে না, সোজা বাংলায় বলতে হবে। তারপর, ধর তক্তা মারো পেরেক, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বলপ্রয়োগ।

শশধরবাবু কিন্তু ফেল করে গেলেন। হিমানীকে তাঁর চৌরঙ্গির বাড়িতে ডেকে যখন সব কথা খুলে বললেন, তাকে সোনায় মুড়ে দেবেন বললেন, বাগুইহাটির বাগানবাড়ি লিখে দেবেন বললেন, নতুন মার্সিডিজ বেঞ্জ কিনে দেবেন বললেন, তখন লোভে তার দুই চোখ চকচক করে ওঠার বদলে অপরিসীম ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বিকৃত কণ্ঠে সে বলল, 'আপনি যে এতদূর নারকীয় শয়তান তা আমার জানা ছিল না শশধরবাবু, জানলে আপনাকে জ্যাঠামশাই বলে সম্বোধন করতুম না। আপনার সমস্ত টাকাপয়সা আপনি ফেরত নিয়ে যেতে পারেন। আমি আর তড়িৎ একবস্ত্রে এ শহর ছেড়ে চলে যাব এমন জায়গায়, যেখানে আপনার ক্লেদাক্ত হাত গিয়ে পৌঁছবে না।

অতঃপর বলপ্রয়োগ। কিন্তু সেখানেও ফেল। হিমানীর গায়ে যে এত জোর ছিল, আর সে যে ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো লড়াই করতে পারে কে ভেবেছিল। শেষপর্যন্ত মুস্তাফা আর জমরুকে দিয়ে মেয়েটাকে বেঁধে ফেলতে হল।

হিমানী তখন খাঁচায় বদ্ধ জন্তুর মতো গর্জন করতে লাগল,'আপনি আমার ওপর অত্যাচার করতে পারেন শশধরবাবু, কিন্তু আমি আপনাকে ছেড়ে দেব না। বাইরে সমস্ত লোককে ডেকে বলব, ওই দেখো, ভদ্রতার মুখোশ পরা কী ভয়ংকর এক পিশাচ তোমাদের বুকের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। পুলিশ হয়তো কিছু করবে না, আপনি টাকা ঢেলে অনেকের মুখ বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু আমার মুখ বন্ধ করতে আপনি পারবেন না। আমি রাস্তার মোড়ে মোড়ে চিৎকার করে সবাইকে সম্বোধন করে দেব, আপনার ওই মুখোশ আমি খুলে দেব। প্রতিশোধ আমি নেবই।'

শশধরবাবু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'সে কী কথা? তুমি সবাইকে ডেকে বলবে যে, একজন তোমরা সতীত্ব নাশ করেছে? তোমার লজ্জাশরম নেই, তুমি না কুলবধূ?'

'না, আমার লজ্জাশরম নেই। আমি যদি না বলি, যদি আপনার স্বরূপ না সকলকে জানাই,তাহলে তো কাল আপনি আর—একটি নিরপরাধ মেয়ের ওপরে অত্যাচার করবেন। তা আমি হতে দেব না।'

শশধরবাবু মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'আহা, কী আমার রানিভবানী এলেন রে! তোর বর তো তোকে রাস্তায় দূর করে তাড়িয়ে দেবে। তখন খাবি কী? তখন তো আমার বেশ্যা বাড়িতেই আশ্রয় নিতে হবে।'

'না, তড়িৎ আমায় তাড়িয়ে দেবে না। সে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে।'

'ইঃ, কুলটা বউয়ের পাশে এসে দাঁড়াবে?'

'হ্যাঁ, শশধরবাবু, তাই দাঁড়াবে, আমি কুলটা নই। আপনি জোর করে আমার ওপরে অত্যাচার করেছেন জানলে সে আমায় বুকে তুলে নেবে, এবং তারপর আপনাকে সে ছিঁড়ে টুকরো—টুকরো করে ফেলবে। হাজার মুস্তাফা এলেও কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। পুলিশের দরকার নেই, আমরা দুজনেই আপনার ভণ্ডামির, শয়তানির শেষ করে ছাড়ব। আপনি সাপের চেয়েও মারাত্মক, আপনাকে ছেড়ে রাখা আত্মহত্যার সমান।'

এরপরে আর মাথা ঠিক থাকে? শশধরবাবু মানুষ, দেবতা নন, তা ছাড়া, মেয়েটার কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছিল। এসব আজকাল লেখাপড়া জানা মেয়ে, এরা করতে পারে না হেন কাজ নেই। এইজন্যেই শশধরবাবু মেয়েদের বেশি পড়াশুনো করা পছন্দ করেন না। বেশি পড়াশুনো করলে এমনি সব মারাত্মক কথাবার্তা বলতে শেখে যে মাথায় খুন চেপে যায়। কাজেই শশধরবাবু মুস্তাফা আর জমরুকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে হিমানীর গলা টিপে ধরলেন। ব্যাপারটা একটু কাঁচা হয়েই গিয়েছিল হয়তো। ফুর্তি করে নিয়ে তারপরে

মেয়েটাকে শেষ করাই উচিত ছিল। কিন্তু রাগ চণ্ডাল। আগে তো শশধরবাবুর রাগ আরও বেশি ছিল। আজকাল ঈশ্বরানন্দ অবধূত বাবাজির শ্রীচরণে ঠাঁই পাওয়ার পর মাথা অনেক ঠান্ডা হয়েছে।

শশধরবাবু যখন মানুষ খুন করেন তখন কক্ষনো সাক্ষী রেখে করেন না, তা সে যত বিশ্বস্ত লোকই হোক না কেন, কিন্তু হিমানীর বেলা সবই কেমন গন্ডগোল হয়ে গেল। সবে তিনি মেয়েটার গলা টিপে ধরেছেন আর সে চোখ উলটো গোঁগোঁ করছে, তখুনি হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেন, ঘরের মধ্যে মুস্তাফা দাঁড়িয়ে। তিনি তো স্তম্ভিত। মুস্তাফা তাড়াতাড়ি তার ফেলে যাওয়া কোটটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এখানেও আবার গণ্ডগোল। মুস্তাফাকে তাঁর চিরকালের জন্য সরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু লোকটা এতদিন তাঁর সমস্ত দুষ্কর্মে এতরকম সাহায্য করেছে যে, কেমন যেন লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হল না। তিনি তাকে একগাদা টাকা দিয়ে তার দেশ বিহারের কোনো গণ্ডগ্রামে পাঠিয়ে দিলেন এই কড়ারে যে, যতদিন না তিনি তাকে ডাকছেন, ততদিন সে যেন গ্রাম ছেড়ে কোথাও না যায়।

তারপর হিমানীর মৃতদেহ কম্বলে মুড়ে গভীর রাত্রে পেছনের গলিতে ফেলে দিয়ে ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে তাঁর ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে চলে গেলেন। ফ্ল্যাটের আসল মালিকরূপে পরিচিত বেঞ্জামিন গোমেস পরের দিন এসে উদয় হল।

গন্ডগোল কিন্তু এখানেই মিটে যাওয়া উচিত ছিল, অথচ তা গেল না। তার প্রধান কারণ অবশ্য গাধা তড়িৎ আর কলকাতার স্টুপিড কাগজগুলো। সূর্যকুমার যে এত জনপ্রিয়, কে জানত। তার স্ত্রীকে নিহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যাওয়ায়, কলকাতা সুদ্ধু লোক যেন খেপে গেল, কাগজগুলো যাচ্ছেতাই করে পুলিশকে গলিগালাজ করতে লাগল। কারোর আর খেয়েদেয়ে কোনো কাজ নেই, দিনরাত শুধু এই আলোচনা। এত বিরক্তিকর সব ব্যাপার!

পুলিশ বাধ্য হয়ে তদন্ত শুরু করল। দেখা গেল, সেখানেও গন্ডগোল। যে ডিএসপি—টি তদন্ত শুরু করলেন, সেই শ্রীমন্ত বোস নাকি আবার তড়িতের ভীষণ বন্ধু। সে কাগজে স্টেটমেন্ট দিল, যেভাবেই হোক, সে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবেই। এই সব ছেলে—ছোকরাদের বাড়াবাড়ি দেখলে রাগে হাড় জ্বলে যায় শশধরবাবুর।

তবে, এতেও তিনি খুব একটা ঘাবড়াননি। এর আগে একবার যখন সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ স্মৃতিময় ভট্টাচার্যিকে খুন করিয়েছিলেন, তখনও বেশ গোলমাল হয়েছিল। অবশ্য কিছুই হয়নি, সব ধামাচাপা পড়ে যায়। তবে, এবার যেন গোলমালটা আর থামতেই চায় না। রোজই পত্রিকা খুললে সূর্যকুমারের ছবি, তিনি শোকে কাঁদছেন, রাগে কাঁপছেন, মাথার চুল ছিঁড়ছেন। যত্তোসব! কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন তড়িৎ বাড়ি ছেড়ে উধাও হল, তখন যেন কেমন একটু ভড়কে গেলেন শশধরবাবু। যাওয়ার আগে তাঁকে একটা চিঠি লিখে গেল, 'কাকাবাবু, হিমানীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে চললুম। আপনি আমাকে যে খ্যাতির মধ্যে এনে ফেলে দিয়েছেন, তার মধ্যে থেকে কোনো কাজই করা যায় না, তা সে গোপনেই হোক বা প্রকাশ্যেই হোক। যতদিন না সেই নরখাদককে খুঁজে বের করে স্বহস্তে তার মাথাটা ধড় ছেড়ে ছিঁড়ে ফেলছি, ততদিন ফিরব না। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।'

এরকম গোঁয়ারতুমির কোনো মানে হয়? কী সর্বনেশে সব কথা! শশধরবাবু ভাবলেন, কিছুদিন তাহলে বিশ্রামই নেওয়া যাক। দেউকিপুরের বাড়িটা বহুদিন দেখাশোনা করা হয় না। অতবড়ো বাড়ি, কয়েকটা মালি, আর চাকরের ভোগে লাগছে। ওখানে গিয়ে কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করল, বিশ্রাম পেয়ে শরীরটা চাঙ্গা হবে আর কেউ হঠাৎ কোনো কিছু করে বসতে পারবে না। তড়িৎ ছেলেটা যেন একটু কেমন। ওকে কিছুই বিশ্বাস নেই। কী করতে যে কী করে বসে! মাস দু—তিনেক বাদে সব যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন আবার কাজে নামা যাবে—খন।

কিন্তু তার মধ্যেই আবার এই ঝামেলা।

আজ সকালে স্টেশনের পাশে চায়ের দোকানে তড়িৎকে দেখে তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলেন শশধরবাবু। স্বাভাবিকভাবেই কী মনে হয়? তড়িৎ সব যেন জেনে গেছে এবং তাঁকে তাড়া করে এখানে এসে হাজির হয়েছে। পরে, তড়িতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছেন যে, না ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

আসলে, শ্রীমান গিয়েছিলেন তারকেশ্বর। সেসব ভালো কথা। আজকালকার ছেলেপুলে, ঠাকুর দেবতায় ভক্তিটক্তি হওয়া ভালো। সেখানে গিয়ে সে ঠাকুরের সামনে হত্যে দেয়। কে নাকি তাকে বলেছে, হত্যে দিলে স্বপ্নে ঠাকুর দেখা দিয়ে সমস্যার সমাধান করে দেন। হুঁ! যেমন তড়িৎ, তেমনি তার বন্ধুবান্ধব। ঠাকুরের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, হত্যে দিল আর তিনিও ছুটলেন তার সমস্যার সমাধান করতে! এসব কি হয় নাকি? কক্ষনও হয় না। তড়িতের বেলায়ও হয়নি। মাঝখান থেকে বেচারির পকেটটি সাফ হয়ে গেছে। ক্যাবলাকান্ত জানে না, ধর্মস্থানে সাবধানে থাকতে হয়। সে যা হোক। মানিব্যাগ যে খোয়া গেছে, সেটা সে আবিষ্কার করে শ্যাওড়াফুলি যাওয়ার বাসে উঠে মাঝরাস্তায়। কন্ডাক্টর স্বাভাবিকভাবেই এখানে নামিয়ে দিয়েছে। এখন হাতঘড়ি বাঁধা দিয়ে নিতাই সামন্তের কাছে কিছু পয়সা নিয়ে বসে বসে চা খাচ্ছিল। শশধরবাবুকে দেখে তো ছোকরা যেন আকাশের চাঁদ মুঠোর মধ্যে পেল।

শশধরবাবু ওর সামনে বসে সাবধানে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হল তোমার তড়িৎ? আর কতদিন এরকমভাবে ঘুরে বেড়াবে? বাড়ি ফিরে চলো। পুলিশ ঠিক সেই লোকটাকে খুঁজে বের করবে। তা ছাড়া আমি তো পুলিশমহলের সকলকেই বলে রেখেছি। চেষ্টার কেউ ত্রুটি করবে না।'

তড়িৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'না, কাকাবাবু। ওঁরা এগোবেন নিয়মমাফিক। তাতে দেরি হবে। কিন্তু আমি তো দেরি করতে পারি না। বেশি দেরি করলে হয়তো তাকে আর ধরাছোঁয়াই যাবে না।'

'কী আশ্চর্য! তাই বলে তুমি এমনি ভাবে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াবে?'

তড়িৎ মৃদু হাসল। বলল, 'না কাকাবাবু, আর বেশিদিন ঘুরে বেড়াব না। মনে হচ্ছে, পথের শেষে এসে প্রায় পৌঁছে গেছি।'

শশধরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মানে?'

'মানে, এমন একটা সূত্রের সন্ধান পেয়েছি যে, সেই শয়তানটার পরিচয় পেতে আর বেশি বাকি নেই। সে লুকিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তার গোপন বাসের সন্ধান আমি এবার বের করবই।'

শশধরবাবুর বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল। বললেন, 'একটু খোলসা করে বলো, বাবা তড়িৎ।'

'কী জানেন কাকাবাবু, একজনের সন্ধান পেয়েছি, যে নিজের চোখে সেই হত্যাকাণ্ডটা দেখেছে।'

'বলো কী? কোথায় থাকে সে?'

'অনেক দূরে কোথাও থাকে। সেখানেই প্রথমে যাব।'

মানে, মুস্তাফা আর কী। হুঁ, যাওয়াচ্ছি তোমায়, চটপট প্ল্যান ঠিক করে ফেললেন শশধরবাবু। এসব ব্যাপারে তাঁর মগজ খুব দ্রুত কাজ করে থাকে। বললেন, 'অনেক দূরে তো, যাবে কী করে? যেতে পয়সাকড়ি লাগবে না?'

তড়িৎ অন্যমনস্কভাবে বলল, 'কী জানি লাগবে কি না!'

'না—না, ওসব ছেলেমানুষি করো না। বিনা টিকিটে যেতে গিয়ে খুনি ধরা তো হবেই না, উলটে জেলে পচতে হবে। তারচেয়ে বরং এক কাজ করো। আজ সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে চলে এসো, তোমায় কিছু টাকাপয়সা দিয়ে দেব। তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারবে।'

কৃতজ্ঞতায় তড়িতের গলা বুজে এল প্রায়। বলল, 'আপনি আমায় আবার ঋণী করলেন, কাকাবাবু। তবে চিন্তা করবেন না। আপনার সব ঋণ আমি কড়ায়—গন্ডায় শোধ করে দেব।'

'আরে, না, না। ওসব কিছু নয়। তুমি তাহলে সন্ধেবেলা এসো। তোমাকে এখুনি নেমতন্ন করতে পারতুম, কিন্তু আমাকে এখুনি একবার শ্যাওড়াফুলি যেতে হচ্ছে, সেখানে ইলেকশন সংক্রান্ত কিছু কাজ আছে, সেটা সেরেই আমি বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব।'

তড়িৎ মাথা নেড়ে বলল, নিশ্চয়ই যাব, কাকাবাবু। সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যেই চলে যাব। আজকাল আর দিনেরবেলা কাজ করার তেমন উৎসাহ পাই না, তাই এখন একটু এদিক—ওদিক কোথাও গিয়ে গড়িয়ে নেব। তারপর যাব। কোথায় বাড়িটা আপনার?'

শশধরবাবু ওঁর বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'দেখো, পথ হারিয়ে ফেলো না যেন। বাড়িটা ঘন বাগানের মধ্যে তো, তাই দিনের বেলায়ই ভালো করে কারোর নজরে পড়ে না। রাত্রিবেলা তোমার আবার খুঁজে পেতে অসুবিধে না হয়।'

তড়িৎ বলল, 'না, না রাত্রিবেলা আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আপনি এমন চমৎকার ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছেন যখন, দেখবেন চোখ বুজে হলেও চলে যাব।'

শশধরবাবু মনে মনে বললেন, 'হ্যাঁ, চোখ বুজেই যাবে। তবে সে চোখ আর খুলতে হবে না।

এরপর আর দেরি করা চলে না। শশধরবাবু সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ধরে চলে গেলেন শ্যাওড়াফুলি। সেখান থেকে ফোন করে জমরু আর শোভারামকে তক্ষুনি রওনা হয়ে যেতে বললেন মুস্তাফার বালিয়া জেলার গ্রামের দিকে। সঙ্গে দুটো স্টেনগান নিয়ে নিতে বললেন, যাতে ফসকানোর কোনো সুযোগ না থাকে। একেবারে গুলি করে যেন ঝাঁঝরা করে দেয়। তারপর বাড়ি ফিরে এসে চাকর—মালিদের ছুটি দিয়ে দিলেন। মুস্তাফার ভুল আর দ্বিতীয়বার করতে রাজি নন তিনি। এমনকী, যে কবরে তড়িৎকে চাপা দেবেন, সেট পর্যন্ত নিজে খুঁড়েছেন, যাতে কারোর মনে কোনোরকম সন্দেহ না জাগতে পারে।

এইবার সমস্ত কিছু রেডি। কেবল নিমন্ত্রিতটির আসবার অপেক্ষা। বেচারা জানে না, যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসছে। তা না হলে এ—বাড়ি সে জীবনে কোনোদিন খুঁজে পেত না।

কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও কোথাও যেন একটা অস্বস্তি ক্রমাগত শশধরবাবুর মনের মধ্যে খচখচ করে যাচ্ছে। একটা অদ্ভুত ভয় গলার কাছে একটি কঠিন পিণ্ডের মতো দানা বেঁধে উঠছে। বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট চলেছে সমানে। নীচের তলার ঘরগুলোর মধ্যে সেই হাওয়ার গুমরে ওঠা হাহাকার শশধরবাবুর বুকের মধ্যে একটা বরফ—শীতল ভারের মতো ক্রমশ চেপে বসছে। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, কোথায় যেন কী একটা ভয়ানক গোলমাল হয়ে গেছে। কিন্তু কী যে হয়েছে, কিছুতেই সেটা ধরতে পারছেন না।

শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে দুত্তোর বলে শশধরবাবু ট্রানজিসটারটা খুলে দিলেন। বাংলায় খবর শুরু হয়ে গেছে। আজেবাজে যত ভ্যাজভ্যাজানি। কে যে এসব খবর শোনে, কে জানে!

সিঁড়ির ঘড়িতে টং করে সাড়ে সাতটা বাজল। একটু বাদেই বাগানের দরজাটা খড়খড় করে খুলে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। বাগানের নুড়ি বিছানো রাস্তার ওপর একটি ভারী পদশব্দ এগিয়ে আসছে।

এইবার। এইবার অ্যাকশন।

শিকার দেখলে একটা ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন প্রথমে ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ায়, তেমনিভাবে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াতে গেলেন শশধরবাবু, কিন্তু পারলেন না। একটা ভয়ংকর আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে ধপ করে বসে পড়লেন।

কারণ, রেডিয়োর সংবাদপাঠক তখন বলছেন, 'আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, যে, বাংলা চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা সূর্যকুমার, আজ সকালে পরলোক গমন করেছেন। তারকেশ্বর স্টেশনের বাইরে রেললাইনের ধারে তাঁর মৃতদেহ আজ পুলিশ আবিষ্কার করে। তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি, তবে পুলিশের ধারণা এটা হত্যাকাণ্ড নয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, কিছুদিন পূর্বে তাঁর স্ত্রীর রহস্যময় মৃত্যুর পর তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন।'

বাইরে তখন ঝোড়ো হাওয়া যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। আর পায়ের শব্দটা এগিয়েই আসছে, এগিয়েই আসছে।

অদ্ভুত এক হাওয়া

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

আর একটু হলেই ট্রেনটা বেরিয়ে যেত। দুটো লোক সামনের কামরার দরজা আটকে দাঁড়িয়েছিল। অরূপ প্রায় তাদের ঠেলেই মনীষাকে তুলে দিল। ওভাবে উঠতে গিয়ে শাড়িটা গোড়ালি ছাড়িয়ে একটু উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে নামিয়ে দিতে গিয়ে নীচে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটোর দিকে চোখ পড়ে গেল। তাকিয়ে আছে ওর পা—র দিকে। মনীষা অনেক পুরুষ মানুষের তাকিয়ে থাকা দেখেছে। কিন্তু এদের দৃষ্টি অদ্ভুত, আলাদা।

সবে নড়ে উঠেছে ট্রেন, অরূপ কাঁধের ব্যাগ আর দু—হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে কোনোরকমে উঠে পড়ল। ট্রেনটা এবার সত্যিই চলতে শুরু করেছে। বুক ভরে নিশ্বাস নিল অরূপ। ছাড়ল অনেকটা সময় নিয়ে। তারপর তাকাল মনীষার দিকে। যৎসামান্য হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েও পারল না মনীষা। চোখ ফিরিয়ে নিল জানালা দিয়ে বাইরে। দূরে ছুটে চলা টিমটিমে দু—একটা আলোর অন্ধকারের ভেতরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে দু—এক ফোঁটা। বৃষ্টির ওপারে মেঘ। মেঘের ওপারে ছুটে চলেছে চাঁদ ট্রেনের পাশাপাশি।

বৃষ্টি শুরু হয়েছিল সেই কাকসকালে, প্রায় মশারির ভেতরে। ঘুমের মধ্যে মনীষা তখন জড়িয়ে শুয়েছিল অণিমাকে। সাতাশ বছর আগে অণিমার পেটের ভেতর যখন একটু একটু করে বেড়ে উঠছে মনীষা তখন থেকেই অণিমার গায়ের গন্ধের নেশা ধরে গিয়েছিল। ঘুম পেলে সেই গন্ধটা তার নাকে এসে লাগত। আজ সকাল পর্যন্ত ছিল সেই গন্ধটা। এখন নেই। নেই? খুব জোরে নিশ্বাস নিয়ে গন্ধটাকে খুঁজতে গিয়ে চিকচিক করে উঠল চোখের তলা। এই নেশাটার কথা অরূপ জানে না।

—চলো, ভেতরে যাই। সুটকেস দুটো তুলে নিয়ে ভেতরে এগিয়ে যেতে লাগল অরূপ। তারপর কী ভেবে বলল—তুমি বরং দাঁড়াও। আমি দেখে আসি আগে বসার জায়গা পাওয়া যায় কিনা।

মনীষা মাথা নেড়ে তাকিয়ে থাকল সুটকেস দুটোর দিকে। নতুন। আজ সকালবেলা কিনেছে বর্ধমানের জামির স্টোর্স থেকে। নীলিমার বাড়িতে জমিয়ে রাখা শাড়ি, নেলপালিশ, সেন্ট, চপ্পল থেকে শুরু করে অরূপের জামাকাপড়, বই, গানের ক্যাসেট, ছোটো ক্যাসেট প্লেয়ার—সব ও দুটোর মধ্যে। তারপর বাস ধরে দুর্গাপুরে ম্যারেজ—রেজিস্ট্রারের অফিস। তারপর শ্যামল নীলিমা দুলাল নিখিল শাশ্বতীদের নিয়ে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া ঠাট্টাইয়ার্কি করতে কখন সময় গড়িয়ে গেছে আটটায় কারোই খেয়াল ছিল না। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছিল প্রায় সারাক্ষণ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল শাশ্বতী।

—মা এতক্ষণে পায়ে চটি গলিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু বলে আসিনি।

উঠে দাঁড়াল সবাই। সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া ট্রেনের সময়ও হয়ে এসেছে।

জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনের রিকশায় উঠে বসার পর যতদূর চোখ চলে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল মনীষা। কতদিন পর আবার দেখা হবে। যদি কোনোদিন আর দেখা না হয়? এতক্ষণে শ্যামল আর নীলিমা ঘুমিয়ে পড়েছে। শাশ্বতী হয়তো নিখিলকে দেখছে স্বপ্নে। দুলাল তার চিলেকোঠার ঘরের আলো নিবিয়ে বিছানায় উড়িয়ে নিয়ে এসেছে আরতিকে, কলকাতার বিডন স্ট্রিটে বিয়ে হয়ে যাওয়া স্বামীর পাশ থেকে। শুধু বর্ধমানে তাদের বাড়িটায় এখনও জেগে আছে বিকাশ তার মেয়ে মনীষার জন্য। আর বারবার ছিঁড়ে যাওয়া তন্দ্রার ভেতরে চোখের জল বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে অণিমার মুখ।

হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল মনীষা। সেই দু—জন লোক। তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনীষা বুঝতে পারল অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে। কখন যে ওরা ট্রেনে চেপে বসেছে খেয়ালই করেনি মনীষা। মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখতে পেল অরূপ ফিরে আসছে দু—হাতে সুটকেস নিয়ে। চোখে একরাশ বিরক্তি।

—কোনো জায়গা নেই। আন—রিজার্ভ কামরা। লোকজন থিকথিক করছে। এই সুটকেসের ওপর বসে রাত কাটিয়ে দিতে হবে। পারবে?

মনীষা মাথা নাড়ল।—পারব।

অরূপ সুটকেস দুটো পাশাপাশি রাখল অন্যদিকের দরজা ঘেঁষে।

—যতক্ষণ এদিকটায় স্টেশন না আসছে বসতে পারবে। চাইলে ঘুমাতেও পারো। আমি জেগে থাকব।

—পাহারা দেবে আমাকে? আলতো হেসে বলল মনীষা। তারপর কী মনে পড়ে যেতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল লোক দুটো তখনও তাকিয়ে আছে তার দিকে। পলক পড়ছে না। যেন মনীষার সবটাই দেখতে পাচ্ছে। অদ্ভুত তো! আঁচলটা জড়িয়ে নিল। তাকাল অরূপের দিকে। বুঝতে পারল অরূপও দেখেছে ওদের। কিন্তু লোক দুটোর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

—জল খাবে?

মাথা নেড়ে না বলল মনীষা। বদলে যাচ্ছে ট্রেনের শব্দ। একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে নদী পেরোচ্ছে ট্রেনটা। সব কিছু কেমন অদ্ভুত লাগছে ভাবতে। যেন স্বপ্ন—দুঃস্বপ্নের মাঝখানের কোন সময় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সে। বাবার 'না' বলে চিৎকার করে ওঠা এখনও শুনতে পাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে সাতাশ বছরের মনীষাকে জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেবার শব্দ, শুনতে পাচ্ছে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে মা—র কান্না, কল থেকে জল পড়ে বাথরুম ভেসে যাবার শব্দ, শুনতে পাচ্ছে অরূপের টেলিফোন বেজে চলার শব্দ। কেউ তুলছে না। তোলা বারণ। বন্ধ ঘরে চেয়ারে পা তুলে গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে থাকতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেদিন। ঘুম ভেঙেছিল দরজা দিয়ে খবরের কাগজ ঢুকে পড়ার শব্দে। আর তখনই মনীষা ঠিক করে নিয়েছিল কী করবে। অরূপের দিকে তাকাল। একটা সিগারেট ধরিয়েছে। আশ্চর্য সহজ মুখের মধ্যে সবচেয়ে গভীর দুটো চোখ। আর ওর হাতের দৈবে পাওয়া আঙুলগুলোর মতো সুন্দর কারও আঙুল দেখেনি মনীষা। ওই আশ্চর্য চোখ দুটোর জন্য, আঙুলগুলোর জন্য সবকিছু করতে পারে মনীষা। ঝরে যেতে পারে, মরে গিয়ে বেঁচে উঠতে পারে আবার। মনীষার নিজের চোখও কম সুন্দর নয়। ছোটোবেলায় বাবা ওর ঘুমে বুজে থাকা চোখের ওপর ঠোঁট রেখে আস্তে আস্তে গরম ফুঁ দিত আর হেসে চোখ মেলে মনীষা জড়িয়ে ধরত বাবার গলা। আজ পাঁচ বছর চশমা উঠেছে চোখে তবু নতুন কেউ তাকে দেখে এখনও প্রশংসা করে তার চোখের। কিন্তু অরূপের চোখের দিকে তাকালে মনে হয় সে সব কিছু নয়। আরও অনেক, অনেক সুন্দর অরূপের চোখ।

—কী ভাবছ?

মনীষা তাকায় অরূপের দিকে। বলে— কী ভাববো?

—ভাবছ কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে একটা বিয়ে হল আমাদের! লোকজন এল না! আমার টোপর পরা, তোমার বেনারসি পরে বসে থাকা হল না... এই সব, না?

অরূপের মধ্যে কোথাও এখনও আভাসে লুকিয়ে আছে এক গ্রাম্যতা। এটুকু মেনে নিয়েছে মনীষা। মাঝে মাঝে মজার লাগে। যেখানে—সেখানে চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দেয়, যেখানে দরকার সেখানে দেয় না। চাঁদকে চাদ বলে, আরশোলাকে আঁরসুলা।

—আমার বয়স জানো না? এসব ভাবার বয়স আছে?

—তবে কী ভাবছ?

—ভাবছি দু—একদিন পর স্কুলে যখন সবাই শুনবে অঙ্কের দিদিমণি প্রেম করে পালিয়েছে ড্রিলের মাস্টারের সঙ্গে তখন মেয়েগুলোর মুখ কেমন হবে।

মনীষা আসলে এসব কিছুই ভাবছে না। ভাবছে অন্য একটা কথা। বাবার কথা। ভাবতে ভাবতে একটা রাগ উঠে আসছে শরীরের অনেক নীচে চাপা পড়ে থাকা অন্ধকার থেকে। বিকাশ চিরকাল চেয়েছে মনীষা ছোটো হয়ে থাক। সারাজীবন টিফিন কৌটো নিয়ে বেণী বেঁধে স্কুলে যাক। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শিখুক। শার্লক হোমস—এর বইয়ের জন্য বাবার কাছে বায়না করুক। আর মাঝে মাঝে বাবার আদর খাক। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়তে পড়তে মনীষা ভাবত যখন কলেজে পড়বে তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। কলেজে গিয়ে ভাবত এমএ. পড়ার সময় বাবা বুঝবে সত্যিই বড়ো হয়েছে ও। বুঝবে মনীষার নিজেরও কিছু ইচ্ছে আছে, ভাবনা আছে জীবন সম্পর্কে। চাকরি করতে গিয়ে ভেবেছিল এবার বাবা বদলাবেই। আজ চার বছর স্কুলে পড়াচ্ছে মনীষা। কিন্তু বিকাশ বদলায়নি। বরং অসন্তুষ্ট হয়েছে ছোটোবেলার মতো জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারে না বলে। মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায় বলে। বাড়িতে মনীষা ছাড়া আর কারও বিশেষ একটা ফোন আসে না বলে। আগে আগে অরূপের ফোন এলে ডেকে দিত। ইদানীং কিছু না বলে ফোন নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে দেয়। অণিমাকেও কিছু বলে না। অরূপের সঙ্গে দেখা হবার পর বাড়ি ফিরে এলে মনীষার চোখের প্রশ্নের সামনে এমনভাবে তাকায় যেন কিছুই হয়নি। অরূপকে ঘেন্না করে বিকাশ। দামোদর পেরিয়ে রায়নার দিকে বাসে প্রায় ঘণ্টাখানেক গেলে অরূপদের কাঁচা গাঁথনির বাড়ি। পাঁচ ভাই, তিন বোন। বুড়ি মা। বর্ধমানের একটা মেসবাড়িতে আরও চারজনের সঙ্গে চৌকি পেতে শোয় আর স্কুলে এন.সি.সি. করার সুবাদে ছত্রিশ বছর বয়সে আটশো টাকা মাস মাইনেতে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত মেয়েদের ড্রিল শেখায়। বিকাশের পৃথিবী আলাদা। কিছুটা উঁচু পদের নিশ্চিন্ত সরকারি চাকরি, বাবার দেওয়া বাড়ি ও বিষয়—আশয়, মাঝে মাঝে সেতার বাজানো আর গোগ্রাসে থ্রিলার পড়তে পড়তে কাদা হয়ে গিয়ে তারস্বরে নাক ডাকা। ছোটোবেলায় মাঝে মাঝে সেই ঘুম ভেঙে গেলে মনীষা উঠে গিয়ে বাবার নাক চেপে ধরত। আসলে, বিকাশ কখনও অরূপের দিকে চেয়ে দেখেনি। অরূপের কথা শোনেনি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নগুলোর খোঁজ পায়নি কোনোদিন।

—তুমি কী ভাবছ? মনীষা জিজ্ঞাসা করে।

—ভাবছি ভূপালে পৌঁছতে পৌঁছতে কাল বিকেল। ছোটোখাটো একটা হোটেল খুঁজে বের করতে হবে। তারপর হনিমুন, নতুন স্কুলে ড্রিল মাস্টারের চাকরি, তোমার চাকরি খোঁজা সব একসঙ্গে।

মনীষা হাসে। বলে—তুমি হিন্দি জানো? ওখানে তো ছেলেদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতে হবে।

—যাতা হ্যায় খাতা হ্যায় পর্যন্ত পারি। তারপর চালিয়ে নেব। একটু থেমে বলে—পৌঁছে কিন্তু বাড়িতে সব জানিয়ে একটা চিঠি লিখে দিও। ওঁরা ঠিক বুঝবেন, মানে তোমার বাবা। কিছু করার তো নেই আর ওঁর। তুমি দেখো, আমরা আবার বর্ধমানে ফিরে আসব। ব্যাংক কলোনি বা তার ধারে কাছে কোথাও একটা ছোটো বাড়ি নেব। তোমার শার্লক হোমস আর আগাথা ক্রিস্টির বইগুলো সব সাজিয়ে রাখব। তুমি শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে গান শুনবে, আমি তোমার জন্য পালংপাতা দিয়ে ডাল রান্না করব, কচুর লতি আর সরষে দিয়ে কুমড়োপাতায় ঘণ্ট করব, কুচি মাছের টক করব। জামাইষষ্ঠীর দিন কোঁচা ঝুলিয়ে ধুতি পরে ঘাড় উঁচু করে তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি যাব। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ভেব না।

মনীষা বলে—আমি এসব ভাবছি তোমাকে কে বলল?

—তোমার চোখ।

চোখ সরিয়ে অন্য দিকে তাকাল মনীষা। লোক দুটো নেই। মুখ ঝুঁকিয়ে কম্পার্টমেন্টের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। দেখতে পেল না লোক দুটোকে। ট্রেনটা পাগলের মতো ছুটছে। দুলছে জানালাগুলো। দুলছে বাইরের ঘুরঘুট্টে অন্ধকারের ভেতরে মনীষার সাতাশটা বছর, তার ছোট্ট হলুদ ফ্রক, মা—র সিঁদুরের কৌটো, দাদুর বেতের ছড়ি আর বাবার হাতের আংটি।

—একটু ঘুমিয়ে নাও।

মনীষা বলল—ঘুম পাচ্ছে না। তুমি ঘুমোও। আমি পাহারা দিচ্ছি।

হেসে উঠল অরূপ। তারপর আস্তে আস্তে ওর মুখে অদ্ভুত একটা কষ্ট ফুটে উঠল।

মনীষা বলল—কী হল?

—আমি জানি না ঠিক করলাম কিনা। কেন যে এমন হল! তোমার বাবার কথা তো ভুল নয়। তোমাকে সত্যিই কি আমি কিছু দিতে পারি? কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতাম না। এটা সত্যি। তুমি বাঁচতে?

অরূপ দেখতে পেল মনীষা ঠোঁট নড়ে উঠল। কিন্তু কথাগুলো বেরিয়ে এসে অরূপের কান পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই এক ঝলকে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ল আকাশ পাতাল জল স্থল নিয়ে সমস্ত পৃথিবী। শূন্যে পাক খেয়ে উঠে গেল কামরাটা একটা বলের মতো। নীচে আছড়ে পড়ার সামান্য আগে অরূপ তার সমস্ত শরীর, হাত আর স্মৃতি বাড়িয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মনীষাকে, ঢেকে নিল মনীষার সবটুকু। আর তারপরই হাজার সমুদ্র একসঙ্গে গ্রাস করে নিল তার চেতনাকে। তার এক পল আগে মনীষা শুধু শুনতে পেল তার বাঁদিকে চশমার ফ্রেম খুট শব্দ করে ভেঙে পড়ে গেল। নাকি খুলে পড়ে গেল তার চোখ? তারপরের কোনো কিছুই আর জানে না মনীষা।

হাজার মানুষের হালকা চিৎকার কান্না চেঁচামেচি দৌড়াদৌড়ি ঘূর্ণির মতো ঘুরতে ঘুরতে এক সময় আছড়ে পড়ল মনীষার কানে। অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকাল। কিছুই মনে পড়ল না। কোথায় শুয়ে আছে ও? বাড়িতে? বাবার পাশে ছোটোবেলার ভোরগুলোর মতো গুড়িসুড়ি মেরে আর মুখে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বাবা গান গাইছে 'তোমারও অসীমে...'? না কি এই সেদিনও যেমন মা—কে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল তেমনই শুয়ে আছে? কিন্তু সেই গন্ধটা তো নেই? তারপরই আস্তে আস্তে সব মনে পড়তে শুরু করল। মনে পড়ল ট্রেনের জানালার বাইরে মেঘের ভেতর দিয়ে চাঁদের ছুটে চলা। মনে পড়ল শূন্যে উঠে গিয়ে তাদের কামরাটার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে আছড়ে পড়া ভয়ংকর এক অন্ধকারে, মনে পড়ল দুটো হাতের তার শরীরকে জড়িয়ে ধরা। কার হাত? উঠে বসল মনীষা। অরূপ কোথায়? চারপাশে তাকিয়ে দেখল। অনেক দূরে আকাশে অদ্ভুত এক আলো, আস্তে আস্তে বাড়ছে। ভোর হচ্ছে। পেছনে তাকাল। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। গত রাতের সেই ট্রেনটা। ধনুকের মতো বেঁকে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে এদিক—ওদিক থেকে। কিন্তু অরূপ কোথায়?

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টের পেল ডান হাঁটুতে অসহ্য যন্ত্রণা। বুঝতে পারল পারবে না। চুপচাপ বসে থাকল মনীষা সেই নরকের মধ্যে। চারপাশে উলটে পড়ে আছে মানুষের শরীর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে কাটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। রাশি রাশি জিনিস। মরা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে হাত—পা ছুড়ে কাঁদছে অল্পবয়সি এক মা। হঠাৎ মনে হল পেছনে ঠান্ডা কী যেন লাগছে। সরে বসতে গিয়ে দেখতে পেল সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে রক্ত ভেসে এসে তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সাপের মতো এঁকেবেঁকে। দূরে কিছু মানুষ দৌড়চ্ছে। কিছু মানুষ হাত ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করছে অন্য কিছু মানুষকে। কেউ কেউ এক—একটা শরীর তুলে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের চেনা মুখ। না পেয়ে ফেলে দিচ্ছে আবার। অরূপ ওদের মধ্যেই কোনো একজন নয়তো? ভয়ে কেঁপে উঠল মনীষা। আরও অনেকের মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চাইল। নাকের কাছে কী যেন লাগছে। হাত লাগিয়ে বুঝতে পারল নাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নীচে শুকিয়ে আছে রক্তের ডেলা। মাথা ঘুরে উঠল মনীষার। বুঝতে পারল গভীর গোপন কোনো ঘুম আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলতে চাইছে তাকে। চোখ বুজে আসার আগে শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটছে। হাত তুলে সাড়া দেবার চেষ্টা করল। ডাকটা এগিয়ে আসছে আরও কাছে। অনেক কষ্টে মনীষা মুখটা সামান্য তুলতে পারল মাত্র। বুঝতে পারল অন্য একটা মুখ ঝুঁকে পড়ছে তার ওপর। নিশ্বাস এসে লাগছে ঠোঁটে। চেনা একঝাঁক আঙুল স্বপ্নের মতো ভেসে আসছে মুখের ওপর। প্রায় ছুঁয়ে ফেলছে তাকে। আর তাকিয়ে থাকতে পারল না মনীষা। ঘুম গিলে ফেলছে তাকে। ঘুমের ভেতর দেখতে পেল অদ্ভুত এক ঘুমন্ত রোদ্দুর। তার ভেতর সে, অরূপ আর তাদের বেঁচে থাকা।

মনীষার শরীরটাকে কোনোরকমে কাঁধে তুলে নিল অরূপ। পাশেই পড়েছিল দুটো সুটকেসের একটা। তুলে নিল অন্য হাতে। তারপর এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করল। আলো অনেক বেড়েছে। ভোর হয়েছে সামান্য একটু আগে। ভোর যে আবার কোনোদিন দেখতে পাবে ভাবতেও পারেনি কাল, যখন প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙে পড়েছিল তাদের কামরাটা। ভালো করে ছুটতে পারছে না অরূপ। চারপাশে ছড়ানো ছিটোনো মানুষের শরীর, ছোটো—বড়ো নানান সুটকেস ব্যাগ জলের বোতল। সাবধানে পা ফেলে ফেলে দৌড়তে হচ্ছে। মাটিতে লুটয়ে থাকা একজন হাত এগিয়ে দিল অরূপকে দেখে। তাড়াতাড়ি সুটকেসটা নামিয়ে হাত বাড়িয়ে লোকটিকে উঠে বসতে সাহায্য করল। তারপর আবার দৌড়তে লাগল। যত তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া যায়। কনুইয়ের কাছে অনেকটা চিরে গেছে অরূপের। রক্ত পড়ছে এখনও। হাড় হিম করা একটা ব্যথা ঘাড় পর্যন্ত উঠে আসছে। কিন্তু ও কিছু না। শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকা মানুষদের মধ্যে সেও যে আছে এটা ভাবতেই অদ্ভুত ভালো লাগছে অরূপের। পেছন ফিরে দেখল বেশ খানিকটা দূরে ফেলে এসেছে সেই দুঃস্বপ্নের ট্রেন, মৃত মানুষের স্তূপ এবং তাদের এক নিমেষে হারিয়ে যাওয়া সুখ, দুঃখের স্মৃতিগুলো। কিন্তু মনীষা? বেঁচে আছে তো? নাকি ওর নিষ্প্রাণ শরীর নিয়ে ছুটছে অরূপ? ছ্যাঁত করে উঠল অরূপের বুক। দাঁড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে মাটিতে নামাল মনীষাকে। শুইয়ে দিল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল। গায়ে হাত দিল। কান নিয়ে এবং বুকের কাছে। শব্দ হচ্ছে। পকেট থেকে রুমালটা বের করে আস্তে আস্তে যত্ন করে মুছিয়ে দিল মনীষার মুখ।

অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চোখ মেলল মনীষা। তাকাল অরূপের দিকে। একটা নিশ্চিন্তের হাসির আভাস ফুটে উঠল তার মুখে। ফিসফিস করে বলল— তোমার কিছু হয়নি তো?

—না। তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে?

মাথা নাড়ল। না জানাল মনীষা।— তোমার?

—না।

—আজ কত তারিখ?

—তেইশ।

—কী বার?

—বুধবার। কথা বোলো না। একটু চুপচাপ শুয়ে থাকো। দেখবে অনেক ভালো লাগছে।

—আমি ভালো আছি। মনীষা হাত তুলে তার নাকের কাছে আনল। রক্ত লেগে আছে? নাকের নীচে?

—না।

—তুমি মুছিয়ে দিয়েছ, না? অদ্ভুতভাবে হাসল মনীষা।

দূর থেকে গাড়ি যাবার শব্দ ভেসে এল। উঠে দাঁড়াল অরূপ। প্রথমে মনে হল এক চিলতে একটা নদী। তারপর বুঝতে পারল সকালের আলো পড়ে রুপোর মতো চিকচিক করছে দূরের একটা পিচের রাস্তা। হাওয়ায় ভেসে এল ইঞ্জিনের শব্দ। দেখতে পেল একটা গাড়ি আস্তে আস্তে এসে থামল। সামান্য থেমে আবার চলে গেল। গাড়িটা বিন্দুর মতো অনেক দূরে মিলিয়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে অরূপ তাকাল মাটিতে শুয়ে থাকা মনীষার দিকে। মনীষার চুল উড়ছে, আঁচলের দিকটা উড়ছে, পায়ের দিকের শাড়ি বেশ কিছুটা ওপরে উঠে গেছে। নামিয়ে দিতে গিয়েও থেমে গেল অরূপ। তাকিয়ে থাকল খোলা পা—র দিকে। চারদিকে শুধু হাওয়া আর হাওয়া। তার মাঝখানে চোখ বুজে শুয়ে আছে মনীষা। নাকি একটু ঘমিয়ে পড়েছে? হঠাৎ কেমন অন্যরকম লাগল মনীষাকে। ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পারল চোখে চশমাটা নেই। কোথায় গেল চশমা? খুলে পড়ে গেছে কাল কোন অন্ধকারে, এখন আর পাওয়া যাবে না। ভূপালে পৌঁছে প্রথমেই মনীষার চশমা করাতে হবে। তারপর অন্য কাজ। এত কিছুর পরেও এখন ভালো লাগছে অরূপের। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজে পেল। আঙুলটা আর একটু সরাতেই দেশলাইয়ের বাক্সটা। মনীষার পাশে

বসে একটা সিগারেট ধরাল। মনে মনে হাসি পেল অরূপের। মরতে মরতে আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়ে একটা আকাশছোঁয়া প্রান্তরের মধ্যে বসে সিগারেট টানছে সে, পাশে মনীষা। বেঁচে আছে সেও। বেঁচে গেছে তাদের স্বপ্নগুলো। বেঁচে গেছে তাদের মনে মনে এঁকে রাখা ঘর—গেরস্থালি। তাদের পরস্পরকে জড়িয়ে—মড়িয়ে বেঁচে থাকার অনেক অনেক দিন। কিন্তু ভূপালে পৌঁছবে কী করে? কতদূর এ জায়গাটা ভূপাল থেকে? জায়গাটার নামই বা কী? হঠাৎ অরূপের মনে হল কেউ দেখছে তাদের। মুখ ফিরিয়েই মুহূর্তের জন্য হিম হয়ে গেল তার শরীর। কাল রাতে দেখা ট্রেনের সেই দুটো লোক। তাকিয়ে আছে মনীষার খোলা পা—র দিকে। লোক দুটোর মুখময় শুকিয়ে আছে রক্ত। রক্ত তাদের জামাকাপড়ে। আস্তে আস্তে মুখ তুলে অরূপের দিকে তাকাল লোক দুটো। তারপর হেঁটে যেতে লাগল সামনে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে মনীষা চোখ মেলে তাকাল। দেখল অরূপ চেয়ে আছে তার দিকে। কী গভীর আর উজ্জ্বল লাগছে তার চোখ দুটো। মাথার ওপর এগিয়ে আসছে সেই আঙুলগুলো। নড়ছে। আরাম লাগছে মনীষার। মনীষা হাসল।

অরূপ বলল— উঠতে পারবে? আমাকে ধরে ধরে হাঁটতে পারবে? ওই বড়ো রাস্তাটা পর্যন্ত? ওখান থেকে কিছু পাওয়া যেতে পারে। শহর—টহর কোথাও একটা পৌঁছনো দরকার। পারবে?

মনীষা বলল— পারব।

তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল নিজেই। হাত বাড়িয়ে মনীষাকে উঠতে সাহায্য করল অরূপ। দাঁড় করিয়ে দু—হাত ছেড়ে দিল।

—সত্যি পারবে? অরূপ জিজ্ঞাসা করল।

—ভোরে মনে হচ্ছিল কোনোদিন আর হাঁটতে পারব না। হাঁটু দুটো যন্ত্রণায় ভেঙে যাচ্ছিল। এখন ব্যথাটা একদম নেই। হাঁটব? দেখবে?

মাথা নাড়ল অরূপ। দেখল সত্যিই মনীষা এক পা দু—পা করে হাঁটতে পারছে। সুটকেসটা এক হাতে তুলে নিল। অন্য হাত দিয়ে মনীষার কনুইয়ের ওপর শক্ত করে ধরল। বলল— চলো। না পারলে বলবে। কাঁধে নিয়ে নেব। এখানে তোমাকে কেউ দেখবে না।

মনীষা হাসল। বলল— নিয়েছিলে তো কাঁধে। ছুটছিলে। আমি বুঝতে পারছিলাম। কষ্ট হচ্ছিল তোমার, না?

—না। তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছিলাম। এক সময় মনে হচ্ছিল আর পাব না। তারপর তোমাকে দেখলাম। দেখলাম বেঁচে আছ। তখন মনে হচ্ছিল আমি সব করতে পারি।

আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল মনীষা আর অরূপ। বড়ো রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। রোদ বেড়েছে। সামনে একটা গাছ দেখতে পেয়ে তার তলায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা। দূর থেকে মাইকে একটা গান ভেসে আসছে। কান পেতে শুনে মনীষা বুঝতে পারল কোনো হিন্দি সিনেমার গান। সামনেই কোনো গ্রাম বা আধা শহর গোছের কিছু একটা আছে। কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল অরূপের দিকে। তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। যদি বাস বা গাড়ি কিছু আসে। যদি আর কোনোদিন দেখা না হত অরূপের সঙ্গে? যদি মরে যেত অরূপ আর শুধু বেঁচে থাকত ও? কী করত তাহলে? বর্ধমান ফিরে যেত একা একা? কিংবা যদি শুধুই অরূপ বেঁচে থাকত?

হঠাৎ দেখতে পেল ধুলোঝড়ের মতো ছুটে আসছে একটা ঘূর্ণি। অদ্ভুত একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে বুঝতে পারল ধুলো উড়িয়ে একটা বাস আসছে। কাছে এসে পড়েছে বাসটা। অরূপ হাত তুলে প্রবলভাবে নাড়তে লাগল বাসটাকে দাঁড় করানোর জন্য। আরও কাছে এলে দেখতে পেল বাসের ওপর লেখা আছে ভূপাল। যাচ্ছে, না আসছে ভূপাল থেকে? বাসটা ওদের দেখেছে। আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়াল।

ছুটে গিয়ে অরূপ জিজ্ঞাসা করল— ভূপাল?

বাসের কন্ডাক্টর বা খালাসির মতো কেউ মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানাল। নেমে সুটকেসটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে বাসের ছাদে উঠে গেল। বাঁধল একটা দড়ি দিয়ে আরও অনেক মালপত্রের সঙ্গে। অরূপ মনীষাকে ধরে বাসে ওঠাল। তারপর নিজেও উঠল। হঠাৎ কী দেখে মনীষা প্রায় মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল অরূপ। দেখল সেই লোক দুটো। বসে আছে বাসের ভেতর। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনীষার দিকে।

বাসটা ছুটছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে উড়ে যাচ্ছে। অরূপের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে মনীষা। বেলা শেষ হয়ে আসছে। আকাশে লাল আভা ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে। ভূপাল পৌঁছতে অনেক রাত্রি হয়ে যাবে। সন্ধ্যার পর বাসটা একবার থেমেছিল একটু। চা ছাড়া আর কিছু খেতে চায়নি মনীষা। অরূপের অল্প অল্প খিদে পাচ্ছে এখন। ভূপালে পৌঁছে আগে একটা ছোটোখাটো হোটেল খুঁজে বের করতে হবে। পরিষ্কার —পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। মনীষার একটু পরিষ্কার পরিষ্কার বাতিক আছে। এই জামাকাপড় ছাড়তে না পারলে অরূপের নিজেরই ঘেন্না লাগছে। হোটেলে গিয়ে আগে ভালো করে স্নান করতে হবে। কী পরবে স্নান করে? ওর সুটকেসটা তো খুঁজে পায়নি কোথাও। ওতে সব ছিল।

কন্ডাক্টারকে আগেই বলে রেখেছিল অরূপ হোটেলের কথা। বাজারের সামনে আসতেই সে বলে উঠল— ইঁহা উতর যাইয়ে। ও সামনে হ্যায় হোটেল। বাঙ্গালি হোটেল।

বাস থামল। মনীষা উঠে পড়েছে। চারদিক তাকিয়ে দেখল। হঠাৎ মনে হল সেই লোক দুটো কোথায়? বাসের ভেতর কোথাও তো নেই লোক দুটো। লোক দুটোর কথা ভেবে অবাক লাগল মনীষার। তারপর নিজেই আস্তে আস্তে নামল বাস থেকে। জমজমাট করছে জায়গাটা। চারদিকে আলো। দোকান। লোকজন। ভালো করে তাকিয়ে মনে হল মুখগুলোর মধ্যে কোনো মায়া নেই, স্বপ্ন নেই।

ছাদ থেকে সুটকেস নামিয়ে আনতে ছুটে গেল কন্ডাক্টার। সুটকেসটা নিয়ে অরূপ দুটো টাকা দিল তাকে।

—সেলাম। কপালে হাত ঠুকল লোকটি। তারপর দৌড়ে উঠে পড়ল বাসে। হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে হাত চাপড়াতে লাগল বাসটার গায়ে। বাসটা চলে গেলে উলটো দিকে চোখ পড়ল— নিউ বেঙ্গল হোটেল। কন্ডাক্টারের বুদ্ধির মনে মনে তারিফ করল অরূপ। মনীষার দিকে তাকিয়ে বলল— চলো।

এটাচড বাথ দেড়শো। কমন একশো। মনীষার দিকে তাকিয়ে এটাচড বাথই নিল অরূপ। দুই—এক দিনের ব্যাপার। তারপর স্কুল থেকে একটা ঘর ঠিক করে দেবে বলেছে। কাল ঘুম থেকে উঠেই আগে স্কুল। তারপর মনীষার চশমার জন্য ডাক্তারের খোঁজ করা। তারপর শহরটা ঘুরে দেখা।

তিনতলার একটা ঘর। ঢুকে মন্দ লাগল না মনীষার। বাহুল্য নেই। একটা ডবলবেডের খাট। পাট করে চাদর পাতা। বালিশের ঢাকনাগুলো পরিষ্কার। একটা আলনা। একটা টেবিল আর চেয়ার। বাথরুমের দরজাটা খুলে দেখে নিল। সস্তার দুটো সাবান আর রং উঠে যাওয়া দুটো ধোয়া তোয়ালে। ঠিক আছে। অল্পবয়সি একটা বেয়ারা এসে জলভরতি কাচের জাগ আর দুটো গ্লাস দিয়ে গেল। দেখে মনে হল বাঙালি। মনীষার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। কাল কথা বলবে ছেলেটার সঙ্গে। জানলা দুটো খুলে দিল মনীষা। একঝলক হাওয়া এসে লাগল মুখে। শরীরের সমস্ত তন্তু দিয়ে মনীষা টেনে নিল সেই হাওয়া তার বুকে। তারপর তাকাল অরূপের দিকে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অরূপ। দু—চোখ জুড়ে মায়া। আরও যেন কিছু আছে সেই চাউনিতে। কী যেন চাইছে চোখ দুটো তার কাছে। কত যুগ ধরে এভাবে তাকিয়ে আছে অরূপ তার দিকে?

—চশমা ছাড়া তোমার চোখ আরও সুন্দর লাগছে। অরূপ বলল ফিস ফিস করে।

সব বুঝতে পারল মনীষা। কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছে মনীষা এই মুহূর্তের জন্য। অপেক্ষা করে আছে অরূপ। ঘেমে উঠেছে তার মুখ। অরূপ দেখল মনীষার উজ্জ্বল দুই চোখের চারপাশে, ঠোঁটের চারপাশে জমে উঠছে ঘাম।

খুট করে একটা শব্দ হল। আলো নিবিয়ে দিল অরূপ। তারপর এগিয়ে যেতে লাগল মনীষার দিকে। হঠাৎ মনে হল চাপা এক অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটছে সে। কিন্তু মনীষা কোথায়? ঠিক এই সময় তার হাত, হাতের আঙুল স্পর্শ করল মনীষার শরীর। অরূপ জড়িয়ে ধরল মনীষাকে। বুঝতে পারল মনীষাও জড়িয়ে ধরেছে তাকে। শুষে নিতে চাইছে দু—জন দু—জনার শরীর। অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে অরূপের চোখের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মনীষা। বাড়িয়ে দিল তার আঙুল। অরূপের ঠোঁটের ওপর দিয়ে, নাকের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল মনীষার আঙুল। তারপর দুটো গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। এগিয়ে যেতে লাগল সেই গর্ত দুটোর মধ্যে দিয়ে। এ কি, কোথায় অরূপের চোখ? চোখের জায়গায় হাড়হিম এক আঁধারের মধ্যে দিয়ে কোথায় চলেছে তার আঙুল? আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল মনীষা। ঝরে যেতে লাগল আসমুদ্র অন্ধকার, সেই ঘর, সময়।

অরূপের আঙুল উঠে এল মনীষার চোখের দিকে। তারপর দুটো গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল তার আঙুল। অরূপ বুঝতে পারল সব। বুঝতে পারল দুটো গর্তের মধ্যে দিয়ে এক অনন্ত জলরাশির ভেতর ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে দুটো আঙুল। অনেক অনেক দূরে মনীষার কান্না তবু ছুঁতে পারল অরূপ। কেন এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল সব? নাকি তারা এমনই ছিল চিরকাল? মনীষা কি কোনোদিনই মানুষী ছিল না? সেও কি মানুষ ছিল কোনোদিন? কিছু মনে পড়ল না অরূপের। মনীষারও মনে পড়ল না কোনোকিছু। শুধু অদ্ভুত এক হাওয়া এসে ঘিরে নিল তাদের।

ঘোড়ামারায় একটি রাত

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

নার্ভাস মুখে এদিক—ওদিক তাকাচ্ছিল সুমন। বিকেলবেলাতেও স্টেশনটাকে এমন পাণ্ডববর্জিত মনে হয়নি, এখন চারদিকটা কেমন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। স্টেশনের আশপাশে একটা—দুটো যা দোকানপাট ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে বহুক্ষণ। কোথাও কোনো জনমনিষ্যির চিহ্নটি নেই। কানে আসে শুধু ঝিঁঝিপোকার গা—শিরশির করা আওয়াজ।

পার্থ প্ল্যাটফর্মের সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে পড়েছে। কম্ফর্টারে কান—মাথা ঢাকতে—ঢাকতে গজগজ করে উঠল, 'তোর জন্য.....তোর জন্যই লাস্ট ট্রেনটা মিস করলাম।'

সুমন কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'বা রে, আমার কী দোষ? পথে যদি রিকশআলার সাতবার চেন খুলে যায়...!'

'তুই দেরি করে খেতে বসলি কেন?' পার্থ খেঁকিয়ে উঠল, 'বরযাত্রীদের জন্য কেন অপেক্ষা করলি? আগের ব্যাচে বসা যেত না? রজত তো কতবার বলেছিল, তোরা কলকাতা ফিরবি, কেন মিছিমিছি দেরি করছিস....!'

'ইল্লি রে, কেন আগে বসব? বরযাত্রীদের ব্যাচটা সবসময়ে স্পেশ্যাল হয়। ওদের জন্য কত কী আলাদা করে তোলা ছিল দেখেছিস? সলিড—সলিড মাংসের পিস, গোবদা—গোবদা ফিশফ্রাই, জলভরা তালশাঁস—সন্দেশ....'

'তুই কী হ্যাংলা রে! খাওয়াটাই কি জীবনের মোক্ষ?'

'ফ্যাচফ্যাচ করিস না। তুইও কিছু কম টানিসনি। চেয়েচেয়ে পাঁচখানা ফিশফ্রাই খেলি, একডজন সন্দেশ সাবাড় করলি, ভাবছিস আমি কিছুই লক্ষ করিনি?'

'আহা, চটে যাচ্ছিস কেন?' ঝপ করে আহারের প্রসঙ্গটা চেপে গেল পার্থ। হাতমুখ নেড়ে বলল, 'এখন কী করা যায় তাই বল। সারারাত এভাবেই কি ভ্যাবলার মতো বসে থাকব?'

এই চিন্তাতেই তো গায়ের লোম পর্যন্ত খাড়া হয়ে যাচ্ছে সুমনের। হাওড়া থেকে ঘোড়ামারা স্টেশন ট্রেনে পাক্কা এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট। অর্থাৎ কমপক্ষে পঞ্চাশ কিলোমিটার। এই রাতদুপুরে কীভাবেই বা ফেরা যাবে এতটা পথ?

মাইলখানেকের মধ্যে হাইওয়ে আছে বটে, কিন্তু সেখানেও কি বাসটাস পাওয়া যাবে এখন? তা ছাড়া হাইওয়েতে নাকি চোর—ছ্যাঁচোড়ের বেজায় উপদ্রব। রজতই গল্প করছিল, এদিককার চোররা নাকি ভারি নচ্ছার, কিছু না পেলে তারা নাকি জামাকাপড় খুলে নিয়ে চলে যায়। এই হাড়কাঁপানো মাঘের রাতে তেমন কারও পাল্লায় যদি পড়ে.....!

রজতদের বাড়িই ফিরে যাবে কি? কিন্তু সেও তো মেলা দূর। স্টেশন থেকে না হোক দু—আড়াই মাইল। রিকশাঅলা তো তাদের নামিয়ে দিয়েই উলটোমুখে ছুট মারল, স্ট্যান্ডেও আর গাড়ি নেই, শীতে কাঁপতে—কাঁপতে অতটা রাস্তা হাঁটা কি এখন সম্ভব?

ইস, কী কুক্ষণে যে রজতের দিদির বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছিল আজ? বাড়িতে পইপই করে বলে দিয়েছিল, সুমনরা যেন অবশ্যই রাতে ফিরে আসে। কাল কী ঝাড় যে কপালে আছে!

হতাশ মুখে সুমন বলল, 'চোখকান বুজে কয়েকটা ঘণ্টা কাটাতেই হবে রে! উপায় নেই।'

'খোলা প্ল্যাটফর্মে? ঠান্ডায় জমে কুলপি হয়ে যাব যে!'

'একটা কাজ অবশ্য করা যায়। ওপারে টিকিট কাউন্টারের সামনে ঢাকামতন জায়গা আছে একটা। বেঞ্চিটেঞ্চিও আছে। বিকেলে ট্রেন থেকে নেমে দেখেছিলাম। ওখানেই যাই চল। অন্তত ঠান্ডাটা তো কম লাগবে।'

'চল তবে।'

উঠে পড়ল পার্থ। ওভারব্রিজের দিকে এগোচ্ছে দুই বন্ধু। চাপ—চাপ কুয়াশায় ছেয়ে আছে চরাচর। প্ল্যাটফর্মের বাতিগুলো কেমন ঝাপসা—ঝাপসা। আকাশে চাঁদ উঠেছে আধখানা, কুয়াশার দাপটে তারও বেশ নিষ্প্রভ দশা। জ্যোৎস্না যেন পৌঁছেও পৌঁছতে পারছে না পৃথিবীতে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে—উঠতে সুমন বলল, 'জায়গাটা বড় নিঝুম রে! মনে হচ্ছে যেন ভৌতিক স্টেশন। তাই না?'

পার্থ টেরচা চোখে তাকাল, 'তুই বুঝি ভুতে বিশ্বাস করিস?'

'তা নয়। তবে....এত শুনলাম, কেমন একটা আলো—আঁধারের খেলা চলছে... তোর গা ছমছম করছে না?'

'ধুস, আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।'

'না রে, এসব জায়গায় কিন্তু ভূত থাকার খুব চান্স।''

কথায়—কথায় দুই বন্ধু পৌঁছে গেল ওভারব্রিজের মাথায়। ঠিক তখনই কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল করুণ সুরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক বাজখাঁই হুঙ্কার, 'টিকিট?'

বেজায় চমকেছে দুই বন্ধু। ওদিকের সিঁড়ির মুখে এক দশাসই চেহারার লোক দাঁড়িয়ে। পরনে সাদা প্যান্ট, কালো কোট। গায়ের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

লোকটা আবার হাঁক পাড়ল, 'টিকিট? টিকিট? এই খোকারা, জলদি টিকিট দেখাও।'

খোকা সম্বোধনটা ঠং করে কানে লেগেছে দু—জনেরই। হোক না ফার্স্ট ইয়ার, কলেজে তো পড়ছে, একটা অজানা লোক তাদের খোকা বলে কোন আক্কেলে?

অসন্তুষ্ট গলায় সুমন বলল, 'আমরা হাওড়া থেকে রিটার্ন কেটেই উঠেছি।'

'অ। কিন্তু রাত বারোটার পর তো ওই টিকিট আর চলবে না।'

'রাত বারোটার পর তো আপনাদের ট্রেনও নেই।' পার্থর স্বরে বিরক্তি, 'কাল সকালে আমরা নতুন টিকিট কেটে নেব।'

'ঠিক আছে।' লোকটা যেন সামান্য নরম হয়েছে, তা এখন চললে কোথায়?'

'ওই ঢাকা জায়গাটায় গিয়ে বসব।'

'ওখানে?' লোকটার স্বরে যেন একটু চিন্তান্বিত ভাব, 'ওখানে বসাটা কি ঠিক হবে?'

'বেঠিক কী আছে? ওটাই তো ঘোড়ামারার ওয়েটিংরুম, না কি?'

'তা বটে! তবে ওখানে একটু গন্ডগোল আছে। তিনি কিন্তু যখন তখন এসে পড়তে পারেন।'

'তিনি?' সুমন আর পার্থ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, 'কে তিনি?'

'যিনি মাঝেমাঝেই রাতবিরেতে হানা দেন।' গলা নামাল লোকটা, 'আর একবার যদি তোমাদের ওখানে দেখতে পান, তো হয়ে গেল!'

সুমনের বুকটা ধুকধুক করে উঠল। খপ করে চেপে ধরেছে পার্থর হাত। পার্থ গলাখাঁকারি দিল, 'আপনি কি আমাদের ভয় দেখাতে চাইছেন?'

'বালাই ষাট। তোমরা ভয় পাবে কেন? তিনি কখনো কারও অনিষ্ট করেন না। ওখানে বসে থাকলে টানাহ্যাঁচড়া করে ধরে নিয়ে যাবেন এই যা। যেসব প্যাসেঞ্জার ট্রেন না পেয়ে আটকে যায়, তাদের উপর ভীষণ মায়া ওঁর।'

সুমন ফের আঁকড়ে ধরেছে পার্থর হাত। ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাই চল, যেখানে ছিলাম সেখানেই ব্যাক করি। কী দরকার ভূতটুতের খপ্পরে পড়ার!'

'ছাড় তো!' পার্থ হ্যাঁচকা টান দিল সুমনকে, 'আমরা ওখানেই যাব। কিছু হবে না।' বলেই তরতরিয়ে সিঁড়ি ধরে নামছে। একদম নীচের ধাপিতে এসে ঘুরে তাকাল। লোকটা এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে।

পার্থ চেঁচিয়ে বলল, 'আপনার ভূতবাবাজি আজ এদিকের ছায়া মাড়াবেন না। বুঝেছেন? এই শর্মাকে ভূতেরাও ডরায়।'

লোকটা হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসিটা ছড়িয়ে যাচ্ছে নির্জন প্ল্যাটফর্মে। হাসতে হাসতে লোকটা চলে গেল ওভারব্রিজ বেয়ে। ক্রমশ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

'বিশ্রামাগার' লেখা জায়গাটায় আলোটালোর বালাই নেই। প্ল্যাটফর্মের টিমটিমে বাতিরাই যা দু—এক কুচি আলো ছিটিয়ে দিচ্ছে। আবছা আঁধার—মাখা বেঞ্চিতে সুমনকে নিয়ে বসেছে পার্থ। বন্ধুর পিঠে জোরসে একটা চাপড় মেরে বলল, 'কী রে খুব ঘাবড়েছিস?'

সুমন ঢোক গিলল, 'না মানে... লোকটা যা বলল, তাতে মনে হয়...'

'ধুৎ, পাত্তা দিস না তো। বুঝলি না লোকটার ধান্দা? রাতদুপুরেও ঘাপটি মেরে ছিল, যদি কোনো বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জার পায়! আমাদের কবজা করতে পারল না তো, তাই একটু ফিচলেমি করে গেল।'

''বলছিস? আমার কিন্তু....'

'ভয়কে জয় করতে শেখ।... দেব তোকে একটা ভয় তাড়ানোর দাওয়াই?'

'কী দাওয়াই?'

'আছে। গান। আয়, দু—জনে মিলে গলা ছেড়ে গান গাই।'

'এখন? গান? এখানে?'

'ইয়েস। শীত জব্দ চানে, ভয় জব্দ গানে। চান তো এক্ষুনি করা যাবে না, এক গানেই এখন ডবল এফেক্ট আনব।'

সুমন বুঝি সাহস পেল খানিকটা। বলল, 'কী গান গাইবি?'

'আছে একখানা জব্বর কালোয়াতি। কাফি ইমন দরবারি মালকোষ সব পাঞ্চ করা। আমি শুরু করছি, তুই সঙ্গে—সঙ্গে সুরটা ধরে যা।'

উরুতে তাল বাজাতে—বাজাতে গলা ছাড়ল পার্থ। প্রথমে একটুক্ষণ আ—আ করে আলাপ। তারপর ঢুকেছে গানে, '—কচুবনে কেঁদে গেল কালো কুকুরে... তাই না দেখে বেড়ালছানা ঝিমোয় দুপুরে....'

নানান কায়দায় খেলিয়ে—খেলিয়ে গেয়ে চলেছে পার্থ। ওই দু—লাইনই। শুনে—শুনে সমুনও কণ্ঠ মেলাল। যৌথ স্বর কখনো সপ্তমে চড়ে, কখনো নেমে আসে খাদে। গিটকিরির দাপটে ছিঁড়ে—ছিঁড়ে যাচ্ছে ভয়। তানের কসরতে শীত বেচারার পালাই—পালাই হাল।

হঠাৎই কোত্থেকে খোনা—খোনা গলার ডাক, 'এই যেঁ শুঁনছঁ? শুঁনছঁ?'

সুরের আবেশে চোখ বুজে গিয়েছিল দুই বন্ধুর। দু—জোড়া চোখ পটাং করে খুলে গেল। কই, কেউ তো নেই ধারেকাছে? কী রে বাবা, মনের ভুল নাকি?

ফের উৎসাহ নিয়ে দুই বন্ধু শুরু করেছে যুগলবন্দি, তখনই পার্থর ঘাড়ে একটা হিমশীতল ছোঁয়া, 'এই যেঁ তোঁমরাঁ কাঁরাঁ?'

পার্থ যেন ইলেকট্রিক শক খেল। ধড়মড়িয়ে সামনে হুড়মুড়িয়ে পড়েছে। কোনোক্রমে ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেল এক ছায়ামূর্তি। কে ওটা?

পার্থ নয়, সুমন কাঁপতে—কাঁপতে জিজ্ঞেস করল, 'আ—আ.... আপনি কে?'

'আঁমি এঁখানকার টিঁকিটচেঁকাঁর।'

ঘোড়ামারা স্টেশনে রাতে কোনো মানুষ নামে না, সেখানে কিনা একজোড়া টিকিটচেকার? এ কি সম্ভব? ঝিঁঝিপোকার ডাকটাই বা বন্ধ হয়ে গেল কেন হঠাৎ?

বেঞ্চিতে ভর দিয়ে পার্থ উঠে দাঁড়াল। তোতলাতে—তোতলাতে বলল, 'আ—আ.... আমাদের টি—টি.... টিকিট আছে। বি বি.... বিশ্বাস করুন।'

বেঞ্চির পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তি। হাতে একখানা মিটমিটে লণ্ঠন। বাতিটা উঁচু করে ধরতেই মুখখানা স্পষ্ট হল খানিক। ঘোমটার মতো করে আষ্টেপৃষ্ঠে মাফলার জড়িয়ে আছে, গায়ে লতপতে কালো কোট। মুখের মধ্যে চোখ আর দাঁতই আগে নজরে আসে। ভ্যাবাচ্যাকা দুই চোখ কেমন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, গজাল—গজাল দাঁত ঝুলছে ঠোঁট বেয়ে।

খুনখুনে গলায় ছায়ামূর্তি বলল, 'তাঁ তোঁ বুঁঝলাঁম। কিঁন্তু এঁই ঠাঁন্ডায় এঁখানে বঁসে—বঁসে চিঁল্লাচ্ছঁ কেঁন? আঁমার কাঁচা ঘুঁমটা ভেঁঙে গেঁল ।'

'চেঁচাইনি তো স্যার। গান গাইছিলাম।'

'খুব শীত করছিল যে। গাড়ি ফেল করলাম, বাড়ি ফেরা হল না...'

'আঁ। তাঁর মাঁনে খুঁব আঁতাঁন্তরেঁ পঁড়েঁছ?' ভূতুড়ে নাকিসুরে মমতা ঝরে পড়ল, 'যাঁক গেঁ, আঁমি যঁখন এঁসেঁ গেঁছি, আঁর কোঁনও ভঁয় নেঁই। ওঁঠোঁ। উঁঠে পঁড়োঁ।'

কোরাসে ককিয়ে উঠল দুই বন্ধু, 'কেন স্যার?'

'এঁসোঁ আঁমাঁর কোঁয়ার্টারেঁ। এঁই তোঁ, সাঁমনেই।'

এবার পার্থ খামচে ধরল সুমনের সোয়েটার। তার গলা শুকিয়ে কাঠ। জিভে তালু ভিজিয়ে বলল, 'না, না, আমরা এখানেই বেশ আছি।'

'যাঁহ, তাঁ হঁয় নাঁকি? আঁমি থাঁকতে এঁই [illegible] এঁখানেঁ পঁড়েঁ থাঁকবেঁ? নিঁমোনিয়াঁ হঁয়ে যাঁবে যেঁ।'

'আমাদের শীত করছে না স্যার।' সুমন অস্ফুটে বলল, 'আমরা ঘামছি স্যার।'

'বুঁঝেছিঁ। লঁজ্জা পাঁচ্ছ। আঁরে বাঁবা, আঁমি এঁকাই থাঁকি। আঁমার ওঁখানে তোঁমাদের কোঁনও অ্যাঁসুবিধেঁ হঁবে নাঁ। আঁমার খাঁট আঁছে, বিঁছানা আঁছে, কঁম্বল আছে, আঁরাম কঁরে কঁয়েক ঘঁণ্টা শুঁয়ে নাঁও।'

পার্থ ডুকরে উঠল, 'লাগবে না স্যার। আমাদের ঘুম পাচ্ছে না।'

'দ্যাঁখো ছোঁকরা, পাঁকামিঁ কোঁরো নাঁ। তাঁ হঁলে আঁমি কিঁন্তু বঁকব।''

'আঁইই, ভূতের বকুনি! সর্বনাশের মাথায় পা।'

সুমন ফিসফিস করে পার্থকে বলল, 'বেশি চটিয়ে দিস না। ঘাড় মটকে দিতে পারে।'

ছায়ামূর্তি ঠিক শুনতে পেয়ে গেছে। বলল, 'এঁমাঁ ছিঁ ছিঁ, এঁ কী কঁথা! এঁসো নাঁ আঁমার সঁঙ্গে, রঁসগোল্লাঁ খাঁওয়াবঁ।'

'আমাদের খিদে নেই স্যার।' আবার কোরাস বেজে উঠল, 'আমরা বিয়েবাড়িতে প্রচুর খেয়েছি।'

'তোঁমরাঁ এঁমন কঁরছ কেঁন? কঁত আঁদর কঁরে ডাঁকছিঁ তোঁমরাঁ এঁমন কাঁপছ কেঁন? কঁত নরম কঁরে ডাঁকছিঁ তোঁমাদেঁর। এঁসোঁ, এঁসোঁ আঁমার সঁঙ্গে।' বলেই খপ করে হাত বাড়াল ছায়ামূর্তি। ধরে ফেলেছে। পার্থর হাত। বরফের মতো হিম আঙুলগুলো টানছে পার্থকে।

পার্থ পলকে অজ্ঞান। আঁ আঁ করতে—করতে সুমনও।

কখন জ্ঞান ফিরল, জানে না পার্থ! চেতনা আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মুখের কাছে ঝুঁকে আছে সেই গজাল—গজাল দাঁত, ঠেলে আসা চোখ।

দন্তপঙক্তি বিকশিত হল, 'কী, এঁখন কেঁমন বোঁধ কঁরছ?'

পার্থ অতিকষ্টে বলল, 'আমি কোঁথায়?'

'আমার ঘঁরে। আঁমার বিঁছানায় শুঁয়ে আঁছ....'

সত্যি তো, এ তো একটা ঘরই বটে! আলো নেই তেমন, বোধ হয় লণ্ঠন জ্বলছে, তার মধ্যেও দেওয়াল—টেওয়ালগুলো বুঝতে অসুবিধে হয় না। আশ্চর্য, মাথার উপর একটা সিলিংফ্যানও আছে।

সুমনেরও সংজ্ঞা ফিরেছে। সে শুয়ে আছে সিঁটিয়ে, চোখ খুলেই বুজে ফেলছে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল—'আমরা এখানে এলাম কী করে?'

'বুঁড়োমাঁনুষটাকেঁ খুঁব খাঁটিয়েছ। দুঁ'জনকেঁ টেঁনে আঁনতে গিঁয়ে আঁমার ঘাঁম ছুঁটে গেঁছে।' গজাল—দাঁত বিছানার কোণে বসল। খ্যাঁচ করে শব্দ হল একটা। ফের নাকি—নাকি সুর বাজল, ''তোঁমরাঁ আঁমায় দেঁখে এঁত ভঁয় পাঁচ্ছ কেঁন বঁলো তোঁ? নাঁকি আঁমায় ভূঁত ভাঁবছ?'

একেই কি বলে ভৌতিক রসিকতা? ভূত বলে তাকে ভূত ভাবা হচ্ছে কেন?

সুমন মরিয়া হয়ে বলল, 'কেন ঠাট্টা করছেন স্যার? আমরা জেনে গেছি।'

পার্থ বলল, 'হ্যাঁ স্যার, চেকারবাবু আমাদের বলে দিয়েছেন আপনি কে?'

'কে চেঁকারবাঁবু? কাঁলোদাঁ নঁয় তোঁ? ওঁভারব্রিঁজের উঁপর দাঁড়িয়ে ছিঁল?

'হ্যাঁ স্যার। উনি তো বললেন, আপনি আসবেন, আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন...'

'আঁরে দুঁর বোঁকা, কাঁলোদাঁই তোঁ ভূঁত। সাঁত বঁছর আঁগে অঁপঘাঁতে মৃত্যু হঁয়েছেঁ, কাঁলোদাঁর। রাঁনিং ট্রেঁনে উঁটতেঁ গিঁয়ে পাঁ পিঁছলেঁ গিঁয়েছিঁল, কেঁটে এঁকেবাঁরে দুঁ আঁধখাঁনা। এই ঘোঁড়ামাঁরা স্টেঁশনেই। তাঁরপঁর থেঁকেই রাঁতবিঁরেতে লোঁককে ভঁয় দেঁখানোঁর জঁন্য দাঁড়িয়েঁ থাঁকে ওঁখানটাঁয়। বেঁচে থাঁকার সঁময়েঁ যাঁত্রীদেঁর উঁত্যক্ত কঁরত খুঁব, মঁরে গিঁয়েও অ্যাঁভ্যেসটা যাঁয়নিঁ।'

'ও, আপনি তা হলে সেরকম কিছু নন!' সুমন সোজা হয়ে উঠে বসল, 'সত্যি, এতক্ষণে আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হয়েছিল।'

সাহসী পার্থও উঠে বসেছে। তবে তার এখনও ধন্দ যায়নি। জ্বলজ্বল চোখে দেখছে গজাল—দাঁতকে। সন্দিগ্ধ গলায় বলল, 'কিন্তু আপনার গলার আওয়াজটা তো...?'

'ম্যাঁলেরিয়ায় ভুঁগে—ভুঁগে হঁয়েছে ভাঁই। এঁককালেঁ ঘোঁড়ামাঁরায় মঁশার খুঁব সুঁনাম ছিঁল তোঁ, কাঁমড়ালেই পাঁলাজ্বঁর।' গজাল—দাঁত ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, 'এঁখন আঁর সেঁই রাঁমও নেঁই, অ্যাঁযোধ্যাঁও নেঁই। সেঁইসঁব পিঁনপিঁনে মঁশা আঁর কোঁথায় এখন? ঝোঁপঝাঁড় সাঁফ হঁয়ে গেঁছে, ঘঁরে—ঘঁরে মঁশামাঁরা—ধুঁপের উঁতপাঁত, কঁতসঁব ট্যাঁবলেট বেঁরিয়ে গেঁছে....'

'বুঝলাম। তা আপনার কোয়ার্টারটা এত অন্ধকার কেন?'

'লোঁডশেঁডিং চঁলছে যেঁ! ঘোঁড়ামাঁরায় এঁরকমই হঁয়। কাঁরেন্ট এঁই আঁছে, এঁই নেঁই। যাঁক গেঁ, যাঁক, তোঁমরাঁ নিশ্চিন্ত হঁয়ে ঘুঁমিয়ে পঁড়ো। কঁম্বলগুঁলো ভাঁল কঁরে গাঁয়ে টেঁনে নাঁও।

কদাকার লোকটাকে আর তেমন কিম্ভূত কিমাকার লাগছিল না পার্থ—সুমনের। চেহারা যেমনই হোক, লোকটা সত্যিই বড় ভালো। নিজেদের বোকামির জন্য মনে—মনে হাসিও পাচ্ছিল দুই বন্ধুর। আসল ভূতকে মানুষ ভেবে তারা কিনা এক এক জ্যান্ত মানুষকে ভূত ভেবে ফেলেছিল! ছ্যা ছ্যা....।

গজাল—দাঁত লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর সুমন বলল, 'বিশ্বাস হল তো, ভূত আছে কি নেই?'

ওভারব্রিজের কালোদার কথা ভেবে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল পার্থর। তবু জোর করে একটা তাচ্ছিল্যের সুর ফোটানো গলায়, 'দূর, ওটা কি একটা পাত্তা দেওয়ার মতো ব্যাপার? ঘুমিয়ে পড়।'

কম্বলের ওমে সুমনের চোখ জড়িয়ে এল। দু—মিনিটের মধ্যে পার্থরও নাক ডাকছে। মিশমিশে অন্ধকারে একটাই আওয়াজ—ফররফর.... ফররররর।

কনকনে ঠান্ডায় কাকভোরে ঘুম ভেঙে গেল সুমনের। চোখ রগড়ে উঠে বসতেই শরীর হিম। পাগলের মতো দু—হাতে ঝাঁকাচ্ছে পার্থকে।

জাগতে—না—জাগতেই পার্থরও চক্ষু চড়কগাছ। এ তারা কোথায়?

রাত্তিরের সেই ঘর, বিছানা, কম্বল বেবাক মিলিয়ে গেছে মহাশূন্যে। ঘোড়ামারা স্টেশনের সিমেন্টের বেঞ্চিতেই তো তারা শুয়ে আছে দু—জনে। খোলা প্ল্যাটফর্মে!

ভূত ও মানুষ

অমর মিত্র

বিপদভঞ্জন সরখেলের জানালায় ভোরবেলায় প্রায়ই কেউ না কেউ আসছে। তখন তাঁর চোখে ঘুম। বিপদ ভোরের মুখ দ্যাখেন না কখনো। দেরি হয় ঘুমোতে। অনেক রাত অবধি বই পড়েন। সবই পরলোক সংক্রান্ত। পড়তে বেশ লাগে। গরমে জানালা খুলেই ঘুমোন একা বিপদবাবু। তাঁর ছেলে থাকে সানদিয়েগো। সেই ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট, আমেরিকা। স্ত্রী সেখেনে গেছেন। বিপদকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তাঁর ছেলে নির্ভয়কুমার। বিপদ যাননি। গেলে তাঁর এই সাধের বাড়ি পাঁচ ভূতে এসে শেষ করে দিয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই মথুরগঞ্জে খুব ভূতের উপদ্রব। নানা রকম ভূত। ক্যাংলা, প্যাংলা, হ্যাংলা যেমন আছে, ঠান্ডা ভূত, নরম ভূত, গোভূত, কিম্ভূত... সব। ভূতের সঙ্গে পেতনিও আছে। বিপদভঞ্জনের জানালা দিয়ে ভোরবেলায় যে কেউ উঁকি দেয়, তা তিনি ঘুমের ভিতরেই টের পান। কিন্তু ঘুম তো ভাঙে না, করবেন কি?

মথুরগঞ্জে ভূত গিজগিজ করছে। নেহাত ভূতের ছায়া পড়ে না, তাই তেমন দেখা যায় না ঠিক দুপুরে কিংবা চাঁদের আলোর ভিতরে। তারা ঘুরঘুট্টি ঠিক দুপুর বেলা আর সন্ধের পর রাত্তিরে দাপিয়ে বেড়ায়। ফলে কী হয়েছে গঞ্জ ছেড়ে শহরে গিয়ে বাস করছে অনেকে। রাজ্যের ভূত প্রেত মথুরগঞ্জে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। কাঁহাতক ভূতের উপদ্রব সহ্য করা যায়। কেমন উপদ্রব, না এই রকম। দক্ষিণ পাড়ার সান্যালমশায়ের বাড়ির পিছনের মাঠে রাতদুপুরে খলখল হাসি, এমন হাসি যে অন্তরাত্মা কেঁপে যায়। জানালা দরজা বন্ধ করেও রেহাই নেই, ঘুলঘুলি দিয়ে খলখলানি, ঝনঝনানি, ক্যানক্যানানি এসে ঢুকবেই ঢুকবেই। মনে হয় দরজা জানালার বাইরে ভূতের কেত্তন লেগে আছে। সান্যালের খুব ভূতের ভয়, তিনি শান্ত আর নিরুপদ্রব মানুষ। চিৎকার চেঁচামেচি সহ্য করতে পারেন না। তাতে তাঁর কাব্যচর্চায় বিঘ্ন ঘটে। তিনি অবসরের পর কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন। আশা করেন দ্রুত তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। কবি শিরোমণি উপাধি পেয়ে যাবেন। এহেন বিভূতি সান্যাল আর পারছেন না, তালা বন্ধ করে শহরে ফিরে যাবেন তাঁর ফ্ল্যাটে। কিন্তু তার মানে, তাঁর কবি শিরোমণি হওয়া আর ইহজীবনে হল না। শুধু সান্যাল কেন, ভরত কুণ্ডুও চলে যাবেন। কেন যাবেন, না তাঁর ছাদের উপর ভূতের ছেলেপুলেরা অন্ধকার হলেই দাপাদাপি শুরু করে। চু চু কিত কিত কিত, ভোঁম মারা, কবাডি কবাডি কবাডি....। মথুরগঞ্জে এত মাঠ, এত পোড়োবাড়ি পড়ে আছে, সেখেনে যাবে না শয়তানগুলো, আসতে হবে গেরস্তের বাড়ি। মণ্ডল মশায়ের গিন্নির খুব শখ গাইয়ে হবেন। সকাল সন্ধে রেওয়াজ করেন। বয়স তাঁর পঞ্চাশের উপর। বহুদিন এসব করতে পারেননি। ছোটোবেলায় যা করেছিলেন সব ভুলে গেছেন। এতদিন মেয়েকে গান শেখাতেন, তাকে দিয়ে রেওয়াজ করাতেন সা রে গা মা পা... পা ধা নি সা...। তখন কোনো সমস্যা হয়নি, এখন হচ্ছে। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর নিজে একটু হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছেন, গানের মাস্টার সকাল বিকেল দুবেলা আসছে, বলে গেছে শোয়ার আগে একবার রেওয়াজে বসতে, তাতে যেমন গানের গলা খুলবে তেমনি বদহজম, বুক জ্বালা, খিটখিটানি ভাব সব চলে যাবে। কিন্তু উপায় আছে? রেওয়াজ আরম্ভ হলেই পালটা রেওয়াজও শুরু হয়ে যায় মা রে বাবা রে ধরো রে খাও রে...। নাহ, মথুরগঞ্জে আর থাকা যাবে না।

ক—জন চলেও গেছে মথুরগঞ্জের বাড়িতে তালা মেরে। এমন বদনাম হয়ে গেছে এই গাঁয়ের যে নতুন লোক আসছে না আর। চোর ডাকাতও নেই বলতে গেলে হয়। আর আছে যে দু—একজন তারা বাইরে গিয়ে কাজ করবে যে সে উপায়ও নেই। ভোর রাতে ফেরার সময় ভূতের হাতে নাকাল হয়েছে বেগুনি,

ফুলুরি, দুই চোর। বেগুনি, ফুলুরি এই গাঁয়ের গর্ব ছিল। এ পর্যন্ত তারা ধরা পড়েনি, তা কলার কাঁদি চুরি করুক বা থালাবাসন, গোরু ছাগল, হাঁস মুরগি চুরি করুক। বেগুনি হল খুব রোগা চ্যাপটা আর ফুলুরি হল খপখপে মোটা। মোটা কিংবা রোগা যাই হোক না কেন, তাদের মতো এক্সপার্ট চোর ভূভারতে নেই। শোনা যাচ্ছে তারাও মনের দুঃখে চলে যাবে মথুরা ছেড়ে। মথুরগঞ্জকে এই গঞ্জের মানুষ মথুরা বলে। চুরি তারা এই গাঁয়ে করে না। কিন্তু চুরি করে তো ফেরে নিজের বাড়ি। সেই ফেরার পথেই যত ঝামেলা। হয় পেতনির পা না হয় ভূতের ভ—য়ে। ভ মানে ভয়। হ্যাঁ পেতনির পায়েও সেই ভয়। গাছে বসে পা দুলোয় সিড়িঙ্গে পেতনি। ইচ্ছেমতো তারা লম্বা হয়, খাটো হয়। পায়ে আলতা। লম্বা লম্বা নখেও রং। নাকি সুরে গান ধরে তারা চাঁন্দের হাঁসি বাঁধ ভেঁঙেছে.... এক লাঠিতে তোর পা ভেঙেছে। পা দেখেই ভিরমি খায় ফুলুরি বেগুনি। তারাও ঠিক করেছে চলে যাবে মথুরগঞ্জ ছেড়ে। ভয় নিয়ে গাঁয়ে থাকা যায়।

বিপদভঞ্জনের বাড়ি সবাই দল বেঁধে এল একদিন। সান্যাল মশায়, কুণ্ডু মশায়, গিন্নি সমেত মণ্ডল মশায়, আপনি থাকুন বিপদবাবু, আমরা আর থাকব না।

বিপদ বললেন, আমি আমেরিকা পর্যন্ত গেলাম না মথুরগঞ্জে থাকব বলে, আপনারা চলে যাবেন?

হুঁ যাব, উপদ্রব উপদ্রব, তেনাদের জন্য বাস করাই দায়, আগে তো মথুরগঞ্জ এমন ছিল না। কুণ্ডু বলল। সান্যাল বলল, কাব্যচর্চা মাথায় উঠেছে মশায়, আমার স্বপ্ন আর পূরণ হবে না।

মণ্ডল গিন্নি বললেন, রেওয়াজ করব যে উপায় নেই, আমার হারমোনিয়াম বাজলেই তেনাদের গোঙানি আরম্ভ হয়ে যায়।

একটু স্বস্তিতে যে ঘুমোব, উপায় নেই, ছাতে খেলাধুলো হচ্ছে সন্ধে হলেই, সন্ধের পর থেকেই ধুপধাপ। কুণ্ডু বলল, আমি মশায় ভয়েই মরি, রাম নামেও যায় না তারা।

আর আর কে আছে কিছু বলার জন্য? আছে তো। কাউকে কাউকে খোনা গলায় হুমকি মেরে গেছে তেনাদের কেউ, খঁবদ্দার কাঁউরে বঁলা চঁলবেনি, বঁললে ঘাঁড় মঁটকে দেঁব।

এই হুমকি কুণ্ডু শুনেছে। তাকে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে বলেনি বটে তেনাদের কেউ, কিন্তু এমন ভূতের গাঁয়ে কে থাকে? জলধি সরকার যে তার বাড়ি তালা মেরে শহরে গেল আচমকা, কেন গিয়েছিল ধরা যায়। দুপুর হলেই ঢিল পড়ত। বাড়ি ছেড়ে গিয়ে তবে শান্তি।

তখন জানালায় এসে দাঁড়াল দুজন। এরাই কি ভোরবেলা উঁকি দিয়ে যায়? তাইই তো। বেগুনি আর ফুলুরি, দুই স্যাঙাৎ। তাদের দিকে তাকিয়ে কুণ্ডু সান্যাল আর মণ্ডলবাবুদের ভ্রু কুঁচকে গেল। এই দুটো লোক নাকি পাকা চোর, কিন্তু মথুরাগঞ্জে এদের কোনো বদনাম নেই। যে জলধি সরকার শহরে গেছে, সে যতদিন গাঁয়ে ছিল চুরি হয়নি কিছু, কিন্তু শহরে ঢুকতেই এরাই নাকি তার ঘরে ঢুকে নীল লাল দুটো জামা চুরি করে নিয়ে গেছে। জলধি ফোন করে মণ্ডলমশায়কে জানিয়েছে। সত্যি তাই। এইতো সেই জামা পরেই দুজন জানালার সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। জলধির খুব প্রিয় জামা ছিল এই দুটো। মণ্ডলমশায় বিরক্ত হয়েছেন দুই চোরকে দেখে, জিজ্ঞেস করলেন, এই তোরা কেন রে?

আমাদেরও খুব বিপদ, ভোরে ডিউটি করে ফেরার সময় পেতনির লাথি খেতে হয়, এই দ্যাখো বিপদকাকু, পেতনির পায়ের নখের ঘায়ে আমার মুখে কতটা দাগ। ফুলুরি দেখাল।

এই দ্যাখো শেষ রাতে যখন ফিরছি, আমার গালে কত জোরে চড় মেরেছিল, দাগ বসে গেছে। বেগুনি বলল।

ফুলুরি বলল, ডিউটি করতে ভয় হয় খুব।

বিপদভঞ্জন জিজ্ঞেস করেন, তোরাও কি চলে যাবি নাকি?

বেগুনি বলল, হুঁ, তা ছাড়া উপায় কি?

বিপদভঞ্জন জানেন, ফুলুরি বেগুনি দুই চোর এই গাঁয়ে কিছু করে না। আবার ভূত প্রেতের ভয়ে গাঁয়ে বাইরের চোরও ঢোকে না তেমন। এরা চলে গেলে তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু লাভও নেই। গাঁয়ে এমন দুই

চোর আছে যারা ধরা পড়েনি কোনোদিন, গর্বের কথা তো নিশ্চয়। জলধি সরকারের লাল জামা নীল জামা কী রকম মানিয়েছে ওদের। যারা গাঁ থেকে চলে যাবে তাদের ঘরে ওরা এবার করবে চুরি, যদি মথুরগঞ্জ না ছেড়ে যায় দুই চোর। মণ্ডল, কুণ্ডু, সান্যালরা চলে যাবেই যাবে। ভূতের সঙ্গে কি মানুষ থাকতে পারে? খুব পারে। কেন পারবে না? তিনি তো বেশ আছেন। ভয়ডর নেই। এই যে সেদিন কেষ্টগঞ্জের হাট থেকে ইলিশ কিনে ফিরছিলেন। সন্ধে বেলা। এক মেছোভূত লাগল পিছনে, এই ভঞ্জন ইঁলিশ দেঁ, ইঁলিশ দেঁ....।

রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিপদভঞ্জন, কেন দেব রে, পয়সা দিয়ে কেনা।

তখন আরও পাঁচটা ভূত হাজির, দেঁ দেঁ দেঁ, দিঁইয়ে যা।

তবে রে, মেরে তোদের হাড়গোড় ভেঙে দেব, হাড়া ছাড়া তো আর কিছু নেই বাড়িতে, ছোঁ, এই সরে যা, নইলে ঠাকমার রেখে যাওয়া সর্ষে মারব।

তখনই রাস্তা ক্লিয়ার। সর্ষের কথা তাকে বলে গিয়েছিল তাঁর ঠাকুমা। ঠাকুমার নাকি পোষা ভূত ছিল। সে তাঁর সব কথা শুনত। তখন মথুরগঞ্জে নাকি ভূতই ছিল না। ঠাকুমা তাকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর বাপের বাড়ি থেকে বিয়ে হয়ে আসার সময়। সে একা করবে কী, ঠাকুমার ফাইফরমাস খেটেই মরত। ঠাকুমা মরে গেলে সে চলে গিয়েছিল নাকি কাঁদতে কাঁদতে। মথুরগঞ্জের হেলা বটের একটা ডাল ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল শোনা যায়। তারপর সেই ডাল আর গজায়নি। সবাই জানে মথুরগঞ্জের হেলা বটের একটা ডাল নেই।

তাহলে দাঁড়াল কী? বিপদভঞ্জনের ঠাকুমা চোখ বুঁজতে মথুরগঞ্জে ভূতই ছিল না। তারপর এত তেনারা তেনিরা এলেন কোথা থেকে?

২

তেনা তেনিরা, ভূত পেতনিরা এল এখানে এই বছর পাঁচ। সে কাহিনি বিপদভঞ্জন নিজে একা জানেন। আর কেউউ না। কাউকে বলেনওনি। সে এক মাঝ রাত্তিরের গল্প। তিনি একটা গোয়েন্দা উপন্যাস পড়তে পড়তে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন। খুনি কে?

সত্যিই তো খুনি কে? সকলকে সন্দেহ হচ্ছে, কিন্তু তার ভিতরে একজনই তো খুনি। বইটির নামই ছিল ওই, খুনি কে? বইটি তিনশো পাতার। দুশো পঁচিশ পড়ার পর তিনি বন্ধ করে নিজে নিজে খুঁজে যাচ্ছিলেন খুনি কে? কে সেই হত্যাকারী যে কিনা বিষ দিয়ে মেরেছে নিরীহ যুবকটিকে? একজনকে মারতে গিয়ে আর একজনকে মারল নাকি? কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না প্রকৃত হত্যাকারীকে। সাতদিন হয়ে গেছে। নাহ, তিনি ফেল মেরে গেলেন। খুব মন খারাপ করে জানালার কাছে শুয়ে ছিলেন। ঘড়িতে রাত আড়াইটে। তখন একজন এসে দাঁড়িয়েছে জানালার বাইরে, ভঞ্জনস্যার, ও বিপদস্যার।

তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন জানালার ওপারে একটি মুখ। রোগা একটা বছর পঁচিশের যুবক দাঁড়িয়ে। চেনা চেনা মনে হয় যেন। কোথায় দেখেছেন, কোথায় দেখেছেন! কে তুমি?

সে বলেছিল, আঁজ্ঞে আমি স্বপন মল্লিক।

কে স্বপন মল্লিক?

স্যার চিনতে পারছেন না?

বিপদভঞ্জনের খুব চেনা মনে হয়। নামটা তো একেবারেই চেনা। আর হাওয়াই শার্ট, চোখের নীচে কাটা দাগ, চশমা, একটুখানি ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি থুতনিতে... বিবরণ সব মিলে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় দেখা হয়েছিল? তা বুঝতে পারছেন না তিনি। তখন সে বলল, আপনার ঘুম নেই তো, আমি জানি তার নাম?

চমকে তিনি উঠে বসেছেন। কে? কার নাম জানে এই স্বপন মল্লিক? স্বপন...., আরে সেই যুবকের নাম তো স্বপনই। তিনি বইটির দিকে তাকালেন। বাকি আছে পঁচাত্তর পাতা। আসল তদন্ত শুরু হবে। কে খুনি তা বেরিয়ে আসবে।

তুমি কে বলতো?

যা ভেবেছেন ঠিক তাই স্যার, আমাকে বিষয় দিয়ে মেরে দিয়েছে যে তার নাম আমি বলে দিতে পারি। স্বপন মল্লিক বলল।

ওই বইয়ের কথা বলছ?

ইয়েস স্যার।

তুমি বইয়ের স্বপন?

ইয়েস স্যার, আমাকে যে খুন করেছে তার নাম আমি জানিয়ে দিতে পারি।

সে তো বইয়ে আছে। বিপদ বলেছিলেন।

ইয়েস স্যার, তাহলে বইয়ে দেখে নিন। বিরক্ত হয়ে স্বপন মল্লিক বলেছিল, আমি চলে যাচ্ছি।

কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না বিপদভঞ্জন। তখন স্বপন মল্লিক বলেছিল, আপনি মনে করেন আপনি খুঁজে বের করেন ভেবে ভেবে, আসলে তা নয়।

আসলে কী?

আসলে যাকে হত্যা করা হয়, সেই বলে দেয় বলে শেষ অবধি না পড়েও আপনি ধরতে পারেন খুনি কে।

হুম! গম্ভীর হয়ে বিপদভঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাকে বিষ দিয়েছিল কে?

স্বপন মল্লিক বলেছিল আসন খুনির নাম। বিনিময়ে মথুরগঞ্জে থাকার অনুমতি নিল। এই হল আসল ঘটনা। গোয়েন্দা রহস্য সিরিজের লেখক অজিত বর্মণ তাঁর উপন্যাসের আসল রহস্য ভেদ করতেন শেষের আগের পাতায় শিহরণ জাগিয়ে। তাঁর বইয়ের কাটতি ছিল খুব। আগের বই পড়লে, পরের বই পড়তে হবে। তারপর থেকে অজিত বর্মণ এবং আর সব গোয়েন্দা লেখকের বইয়ে খুন হওয়া, অপঘাতে মৃত লোকজনের ভূত আসতে আরম্ভ করে মথুরগঞ্জে। রটেই গেছে মথুরগঞ্জে ভালো থাকা যায়। বিপদভঞ্জন তাঁদের চেনেন। তাই ভয় নেই তাঁর। কত নতুন নতুন গোয়েন্দা লেখক, খুন জখমের লেখকের বই ছাপা হচ্ছে। খুন জখম মানে মৃতের আত্মার গতি হয় না। ভূত হয়ে মথুরগঞ্জে। অজিত বর্মণের একটা বইয়ে অপরাধী একটি ট্রেন উড়িয়ে দিয়ে নিজেও আত্মহত্যা করেছিল। প্রায় তিনশো লোক মারা গিয়েছিল। সব মথুরগঞ্জে আশ্রয় নেওয়ায় মথুরগঞ্জ গিজগিজ করছে বিদেহী আত্মা, ভূত পেতনি, তেনা তেনিতে। তেনারা মিটিং করে ঠিক করেছেন মথুরগঞ্জ হবে ভূতের গ্রাম। মানুষ থাকা চলবে না। ভয় দেখিয়ে মানুষকে গ্রাম ছাড়া করছে তেনারা। শুধু বিপদভঞ্জনকে নিয়েই তেনাদের কিছু করার নেই। বিপদভঞ্জন তেনাদের ভয় করেন না। ভয় করবেন কেন? তিনি যে অজিত বর্মণের সব বই পড়েছেন। সান্যাল কুণ্ডু মণ্ডলরা গঞ্জ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর একদিন অনেক রাত্তিরে তেনাদের ডেকে বললেন, ভয় দেখান বন্ধ কর, সবাই মথুরগঞ্জ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তেনারা ভয় পান কেন, আপনি তো পান না। স্বপন মল্লিকের ভূত বলেছিল।

তোমরা একটু সংযত হও।

স্বপন মল্লিকের ভূত বলেছিল, মথুরগঞ্জ যদি ভূতের গঞ্জ হয়, ভালোই হবে, মানুষগুলো চলে যাক, ভূত হয়ে ফিরুক।

খুব অপমান লেগেছিল বিপদভঞ্জনের। মথুরগঞ্জ ভূতের গাঁ হবে। কী করে হবে রে? দেখছি কী করে হয়। তিনি সেই রাত্তিরে খবরের কাগজে একটা চিঠি লিখলেন 'রহস্য লেখকের দায়িত্ব' শিরোনামে। হত্যা মৃত্যু যাতে না লেখেন লেখকরা সেই অনুরোধ জানিয়ে। না হলে তাঁদের মথুরগঞ্জ বাঁচবে না। লেখকরা যত অপঘাত মৃত্যু ঘটাবেন, মথুরগঞ্জে ততো ভূত পেতনি, তেনা তেনির সংখ্যা বাড়বে।

মথুরগঞ্জে মানুষের সংখ্যা কম ছিল। ভূত পেতনি বাড়ছিল। দুই চোর, বেগুনি ফুলুরি পর্যন্ত চলে গেছে গঞ্জ ছেড়ে। পরপর তালা মারা বাড়ি। সন্ধে হতেই নাকিসুরে কথা আর খলখল হাসির শব্দ শোনা যায়। ধুপধাপ গাছ থেকে কারা লাফ দিতে থাকে। চুউউ কিত কিত কিত.... ডাক শোনা যায় অন্ধকারে। গাছের ডালে বসে পেতনি পা দুলোয়। বিপদভঞ্জন রহস্য উপন্যাস, ভূতের গল্প পড়েন সন্ধে থেকে। এমনি চলতে লাগল। পরপর তাঁর কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হল। তাতে পুরোনো ভূতের উপদ্রব চলতে লাগল। এমনি করে বছর

দুই গেল। মথুরগঞ্জে মানুষ বলতে তিনি একা। ভূতের ওঝা ভোলা সর্দারও চলে গেল গাঁ ছেড়ে। মানুষ নেই, কার ভূত ছাড়াবে ভূতের ওঝা?

মথুরগঞ্জ নিঃঝুম। মানুষের চিহ্ন নেই। শুধু বিপদভঞ্জন। অজিত বর্মণ তাঁর কথা রেখেছেন। শেষ উপন্যাস, 'কোহিনুর রহস্য' তে কোনো খুন জখম, হত্যা মৃত্যু নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে যে ভূতেরা এসেছে, তাতেই তো মথুরগঞ্জ মনুষ্যহীন হয়ে গেছে। শুধু একা আছেন বিপদভঞ্জন। মথুরগঞ্জে এখন সমস্ত দিন সমস্ত রাত ভূতের কেত্তন। ঘ্যাঁ ঘোঁ চিৎকার, গাছের ডাল ভেঙে পড়া, ছাত থেকে ধুপ করে আছাড়.... কিছুই দেখা যায় না। এতে বিপদভঞ্জনের একটু ভয় যে করে না তা নয়, কিন্তু মনের জোরে সব কাটিয়ে ওঠেন। এমনই চলছিল। এমনি সময়ে এক ভোরে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। জানালায় সেই স্বপন মল্লিক। একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে হাড়ের কঙ্কাল জামা। বিপদ জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে স্বপন, বেঁকে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

স্বপন বলল, কোমরের হাড় ভেঙেছে ভঞ্জন স্যার, হাড়ের বডি তো।

কী করে?

গাছ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে ভেং চি।

ভেং চি, মানে বার্মা মুলুকের সেই দস্যু? জিজ্ঞেস করলেন বিপদভঞ্জন।

ইয়েস স্যার, ভেং চি, চিন সমুদ্রে জাহাজ ডুবিতে মরে যায়, অজিত বর্মণের 'বার্মার আতঙ্ক' বইয়ে ছিল, সে এসে মানুষ না পেয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে, তুলে আছাড় মারছে, হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, আমরা চলে যাব।

ভেং চির ভয়ে চলে যাবে?

স্বপন বলল, এই গাঁয়ে থাকা যায় না।

সে কী, ভূতের গাঁ হয়ে গেছে মথুরগঞ্জ, যা চেয়েছিলে তা হয়েছে।

স্বপন মল্লিক বলল, ভুল হয়েছে স্যার, ভেং চি দোষ দিচ্ছে আমাদের, মানুষ ছাড়া ভূত পেতনি থাকতে পারে, আমরা সব বইয়ের ভিতর ঢুকে যাব, আমরা নিজেরা মারামারি করে হাড় ভাঙছি, আগে কী সুন্দর দিন কাটত স্যার, ভয় দেখিয়ে কত মজা ছিল, আমরা চলে যাব, ভূত আর মানুষ একসঙ্গে থাকে, না হলে ভূতে মারামারি করে হাড় ভাঙে, আমি এখন গাছে বসে পা দুলোতে পারিনে ভঞ্জন স্যার, আর বাইরে থাকব না, বইয়ের ভিতরে ঢুকে যাব।

লেংচে লেংচে চলে গেল স্বপন মল্লিক।

সত্যিই মানুষ না থাকায় মথুরগঞ্জ ভূত শূন্য হয়ে গেল। খবর পেলেন সেই বার্মিজ ভূত ভেং চিও চলে গেছে রাগ করে। ভূত হয়ে মানুষকে ভয় দেখাতে না পারলে ভূত হওয়া কেন? এই প্রথম ভয় করতে লাগল বিপদভঞ্জনের। ভয়ে কাঁপুনি এল। ইস কেউ যেন কানের কাছে ফিসফিস করছে। রাতে দরজা জানালা বন্ধ করেও ঘুম হয় না তাঁর। শেষে না পেরে সকাল হতেই শহরে চললেন, ফিরিয়ে আনবেন সান্যাল, কুণ্ডু আর মণ্ডলদের। পথেই বেগুনি ফুলুরির সঙ্গে দেখা।

অলীক প্রেমিক

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধে নেমে আসার পর কলকাতার এই সাহেবপাড়াটা মৃত্তিকার কাছে বরাবরই কেমন যেন বিদঘুটে, গা—ছমছমে। বিশাল অট্টালিকাগুলোর অবস্থান বেশ দূরে—দূরে বলেই আলোর চেয়ে অন্ধকারের পরিমাণ বেশি, তার ওপর বাড়িগুলোর কম্পাউন্ডের ভেতর অকারণ ঝুপসি—জঙ্গল, অবহেলায় বহুকাল সাফসুফ করেনি কেউ।

আজ আবার সারাদিন ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হয়েছে, এখনও তার টিপটিপানি কমেনি। এমন মন—খারাপ মন—খারাপ মুহূর্তে হঠাৎ দপ করে লোডশেডিং হওয়ায় ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ানো মৃত্তিকার হাতের তুলিটা কেঁপে উঠল একমুহূর্ত।

রাত দশটা বাজেনি এখনও, অথচ নিষ্প্রদীপ হলেই মধ্য—কলকাতার এই এলাকা ঝপ করে ডুবে যায় এক প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে। এতক্ষণ তবু ফ্যানের হাওয়ায় ঘূর্ণায়মান ছিল চারপাশের সামান্য কলরব, এখন একদম ধীর, শান্ত, চুপচাপ পটভূমি। শুধু বৃষ্টির একটানা ঝিরঝির ঝিরঝির।

খুবই বিরক্ত হয়ে মৃত্তিকা অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল দশফুট দরজাটা। হাতের কাছে মোমবাতিটাও আজ রাখেনি বলে খুবই রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর, দেশলাই খুঁজতেও যেতে হবে সেই কিচেনে। এখন ঝুপ—অন্ধকার দু—হাতে ঠেলে তাদের এই বসতবাড়িটার বিশাল বিশাল ঘর, লম্বা বারান্দা পেরিয়ে মোমবাতি—দেশলাই খুঁজে বিকল্প আলোর ব্যবস্থা করাটা এই মুহূর্তে তার কাছে এক হারকিউলিয়ান টাস্ক।

হাতের তুলিটা টেবিলের ওপর কোনোক্রমে রেখে দু—পা এগিয়েছে কি এগোয়নি, হঠাৎ তার নাকের লতিতে এসে ঠোনা দিল সেই অদ্ভুত গন্ধটা। বেশ কড়া গন্ধ, তীব্র অথচ মিষ্টি। চুরুটের গন্ধ বলে মনে হয় তার। এর আগে দু—একবার গন্ধটা ঠারেঠোরে তার মস্তিষ্ক ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে, কিন্তু সেসময় তার ঝাঁজ এমন প্রবল মনে হয়নি, আজ যেন বেশ তীব্রই। এগোতে গিয়ে কেন যেন থমকে দাঁড়াল মৃত্তিকা।

এমন বিজাতীয় গন্ধ এ—বাড়িতে পাওয়ার কথা নয়। হয়তো গন্ধটা চুরুটের নয়। অন্য কোনো পোড়া গন্ধও হতে পারে। সে ব্যাপারে বেশি ধ্যান না দিয়ে মৃত্তিকা আপাতত তার সবে—শুরু—করা ছবিটা শেষ করে ফেলাই জরুরি বলে মনে করল। মাস দুয়েকের মধ্যে অন্তত গোটা দশেক ছবি তার আঁকার কথা। একজন শৌখিন এন. আর. আই, এদেশে এসে শিমুলতলার পাহাড়ি— এলাকায় একটি বাংলোবাড়ি তৈরি করেছেন, তার ইন্টেরিয়র ডেকরেশনের কাজও প্রায় শেষ। তিনিই তরুণ প্রজন্মের এই উঠতি শিল্পী মৃত্তিকাকে বরাত দিয়েছেন কিছু অয়েল পেন্টিং—এর, যেগুলি শিমুলতলার সেই নির্জন বাংলোটির এ—ঘরে ও—ঘরে টাঙাবেন। একটাই শর্ত, ছবিগুলো হবে বাংলোর নির্জন, রোমাঞ্চকর পরিবেশের সঙ্গে বেশ মানানসই। একটু রহস্যের ছোঁয়াও যেন থাকে।

রাতের ডিনার সেরে সবে মৃত্তিকা আঁকতে শুরু করেছিল ছবিটা, রবার্টকে বলেওছিল, 'তুমি বিছানায় শুয়ে পড়ো, আমার শুতে রাত হবে।' রবার্ট অবশ্য খুবই লিবারাল, কোনো কিছুতে আপত্তি করে না। তবে ছবিগুলো শেষ করতে পারলে মৃত্তিকা যে—অঙ্কের পারিশ্রমিক পাবে, তা তার চব্বিশ বছরের জীবনে একটা মস্ত ব্রেক। রবার্টের কাছে প্রমাণ করাও যাবে, তার সঙ্গিনী এই বাঙালি—কন্যাটি নিতান্ত অবহেলার বস্তু নয়। রবার্ট অবশ্য তাকে অবহেলা করেনি এখনও পর্যন্ত। বরং তার ছবি—আঁকার ধারাবাহিক ব্যস্ততা দেখে,

গোঁফদাড়ির জঙ্গল থেকে হাসি উপচিয়ে বলে, হোয়াটস দ্য ইউজ অফ সো মাচ ওয়ার্ক, মৃত্তি। আই অ্যাম রিচ এনাফ।

ঘোর অন্ধকারে এহেন ভাবনার মুহূর্তে গন্ধটা আরও একবার ছুঁয়ে যেতেই ভুরু দুটোয় কোঁচ পড়ল মৃত্তিকার। কী আশ্চর্য, কীসের গন্ধ এটা! আর শুধু কি এই অদ্ভুত গন্ধটা! এই বিশাল বাড়ির অনেক কিছুই তো বিপুল রহস্যে মোড়া। একদা হলুদবর্ণ, এখন বিবর্ণ, পলেস্তারা খসো—খসো, সাহেবি ধাঁচের বিশাল দোতলা বাড়িটায় যেদিন পাকাপাকি থাকতে এসেছিল মৃত্তিকা, তার শরীরে কোথাও যেন ছুঁয়ে যাচ্ছিল একটা চোরা রহস্যের আবহ। ছোটোখাটো রাজপ্রাসাদের মতোই দেখতে, ওপর—নীচ মিলিয়ে ষোলো—আঠারোখানা ঘর। সব ঘর পেল্লাই—পেল্লাই। এত বড়ো বাড়ির দোতলায় বাসিন্দা বলতে তারা মাত্র দু—জন, সে আর রবার্ট। নীচের তলায় অবশ্য দারোয়ান—চাকর—বাবুর্চিরা থাকে। দিনের বেলা তাদের কথাবার্তা, চলাফেরা, চকিত হাঁকেডাকে তবু একটা প্রাণ থাকে বাড়িটার, কিন্তু সন্ধের কিছুটা পরে তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ সারা হলে, সবাই সেঁধিয়ে যায় নীচের তলায় যার—যার ঘরো। তখন গোটা ওপরতলাটা শান্ত, স্তব্ধ, শুনশান।

সেরকমই এক শুনশান প্রহরে, কিছুটা হাসতে হাসতেই সে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল রবার্টকে, এত বড়ো বাড়িতে তুমি এতদিন একা থাকতে। ভয় করত না?

রবার্টের চুল যিশুর মতো লম্বা—লম্বা, মুখময় দাড়িগোঁফের রাশ, তার স্বপ্নালু চোখ বিস্ফারিত করে হেসে উঠেছিল হো হো করে, ভয়! হোয়াট ভয়!

রবার্ট খাস কলকাতার এই সাহেবিপাড়ার বর্ন অ্যান্ড ব্রট—আপ, তার আঠাশ বছরের ক্যালকেশিয়ান জীবনে কিছু—কিছু বাঙালিয়ানা রপ্ত হয়ে গেছে। বাংলাটা মোটামুটি বোঝে, তবে ভালোমতো বলতে পারে না এখনও। তবে মৃত্তিকাকে বলেছে, তোমার সঙ্গে বছরখানেক ঘর করলেই সব শিখে নেব। ডোন্ট ওরি।

মৃত্তিকা অবশ্য বেশিরভাগ ইংরেজিতেই কথা বলে রবার্টের সঙ্গে, কখনো বাংলায়ও। তার দীর্ঘ বাংলা বাক্যগুলি কান খাড়া করে কিছুটা বুঝে কিছুটা না—বুঝে অবোধ বালকের মতো ঘাড় নাড়তে থাকে রবার্ট, তখন একরাশ কৌতুকে, কৌতূহলে উপচে পড়ে মৃত্তিকার মুখ। রবার্টের সব ব্যাপারটাই অবশ্য এখনও তার ভারী মজার মনে হয়। বস্তুত একটা আস্ত বিদেশি যুবকের সঙ্গে ঘর করার কথা সে তিন—চার মাস আগেও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, এখনও তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভারী অবিশ্বাস্য মনে হয়, চমকপ্রদও।

মাত্র চারমাস আগে রবার্টের সঙ্গে তার আলাপ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের সাউথ গ্যালারির এক প্রদর্শনীতে। মৃত্তিকারই গোটা কুড়ি ছবি নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল 'কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস' নামে একটি টগবগে সংস্থা, যেখানে রবার্ট নিতান্তই বোকা—বোকা মুখ করে এ—দেওয়ালে ও—দেওয়ালে ঘুরে ঘুরে দেখছিল মৃত্তিকার 'ইনফিনিটি' সিরিজের নতুন ছবিগুলো, আর মাঝেমধ্যে তার গোঁফদাড়ির সুন্দরবন থেকে বিড়বিড় শব্দ বেরুচ্ছিল, ফাইন, ফাইন। বিউটিফুল।

তখন অবশ্য একটুও মাথা ঘামায়নি মৃত্তিকা, এরকম ফ্লোটিং সমঝদার কতই তো আসে রোজ রোজ, কিন্তু হঠাৎ বিদেশিটি কড়কড়ে আড়াই হাজার টাকায় তার মাঝারি সাইজের একটি ছবি কিনতেই টনক নড়ল তার। খোঁজখবর নিয়ে যে—বৃত্তান্ত জানল, তা ভারী অদ্ভুত, কেননা রবার্ট নাকি সাধারণত অ্যান্টিক কেনারই পক্ষপাতী, হঠাৎ এই ছবিটার ভেতর সে খুঁজে পেয়েছে পৃথিবীর সেই আদিম যুগ, যখন মানুষ গুহায় বাস করত, জীবনধারণ করত ফলমূল কিংবা পশুপাখির ঝলসানো মাংস তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে।

তারপর কিছুদিনের খেজুরে কথাবার্তা, আলাপচারিতার পর রবার্টের সঙ্গে এই লিভ—টুগেদারের সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে তিন মাসও লাগেনি মৃত্তিকার, যদিও তার এহেন গা—জুয়ারি কার্যকলাপে ইতিমধ্যে ভূমিকম্প বয়ে গেছে তাদের একান্নবর্তী পরিবারে, তত রক্ষণশীল নয় এমন শিক্ষিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের ভেতরও।

সেই ভুঁইকাঁপের কিছু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ মৃত্তিকার শরীরেও চারিয়ে না যায়নি তা নয়, কিন্তু ততক্ষণে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে রবার্টজনিত এক মাধ্যাকর্ষণ টান।

কিন্তু রবার্টসম্পর্কিত কারণে যতটা রহস্য ঘনীভূত হয়েছিল তার ভেতর—শরীরে, এখন এই সাবেকি সাহেবি প্যাটার্নের অট্টালিকাটি তার দ্বিগুণ কৌতূহলের কারণ। এ তল্লাটের সবক'টা বাড়িই বেশ পুরোনো। সেকালের ইংরেজি সিনেমায় সাবেক লন্ডনের শহরতলিতে যে—ধরনের দোতলা বাংলো বাড়িগুলো দেখা যায়, ঠিক তেমনই এইসব বাড়ি, অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি। চারপাশে উঁচু পাঁচিল, ভেতরে গুল্মলতা—ঝোপেঝাড়ে ভরতি। দু—একটা বকুল, ছাতিম কিংবা কাঠটগরের মতো বড়ো গাছও। অথবা বৃদ্ধ পামগাছের সারি। অনেকগুলো বাড়িই অর্ধশতবর্ষ অতিক্রম করেছে। কোনোটা আরও পুরোনো, যেমন রবার্টদের ঠিক সামনের বাড়িটাই হাড়গোড় বেরিয়ে আপাতত মহেঞ্জোদারো। এ তল্লাটে শুধু একটাই বাড়ি ঝকঝকে নতুন, মাল্টিস্টোরিড, সেটা এ বাড়ির উত্তর দিকে। রবার্ট জানিয়েছে, ওখানে একটা মস্ত বড়ো পুকুর ছিল, সেটা বুজিয়েই এখন আকাশচুম্বীটা উঠে এসেছে হু হু করে, অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

রবার্টের বাড়ির মস্ত গেটটাতেও যা এখনও খোদিত হয়ে আছে অস্পষ্ট অক্ষরে : এস্টাব্লিশড এইট্টিন থার্টি এইট। অন্তত আধ বিঘে জমির ওপর তৈরি প্যালেসপ্রতিম বাড়িটার চারপাশেও বড্ড ঝোপঝাড়, কত যে গুল্মলতা।

এত বড়ো বাড়িতে প্রথম প্রথম তার বেশ গা ছমছমে লাগলেও মাসদুয়েক কেটে গেল রবার্টকে বুঝতেই। রবার্ট অবশ্য ছিমছাম, রুচিসম্মত যুবক, তার জীবনযাপন সাধারণ, বাঙালি—খানা খেতেও অভ্যস্ত, শুধু একমাত্র ছবি অ্যান্টিক কলেকশন। এত বড়ো বাড়িটার এ—ঘরে ও—ঘরে, বারান্দায়, সিঁড়ির মুখে, দেওয়ালে অজস্র সব পুরোনো মূর্তি, ইতিহাস—ছুঁয়ে—থাকা দেওয়াল—চিত্র,প্রাচীন ঐতিহ্যের কারুকাজ করা পালঙ্ক—ড্রেসিংটেবিল— আলমারি—ছাইদান, আরও টুকিটাকি অপার বিস্ময়।

কিন্তু এতসব অ্যান্টিকের সঙ্গে আরও যে কৌতূহলটি মৃত্তিকাকে জারিত করে, তা হল এ—বাড়ির কিছু অলৌকিকতা। হয়তো কোনোদিন মেঘলা দুপুরে বেডরুমে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে একা শুয়ে আছে, হঠাৎ মনেহয় দু—পায়ে শব্দ তুলে কেউ যেন কিচেনে সরিয়ে সরিয়ে রাখছে ভরতি বয়ামগুলো।

তবে তার চেয়েও যে অস্বস্তিকর ব্যাপার আপাতত সবচেয়ে শিরঃপীড়ার কারণ, তা হল যখন তার ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে তুলি হাতে ব্যস্ত থাকে নতুন কোনো ছবি আঁকা, তখন হঠাৎ কোথা থেকে যেন ভেসে আসে চুরুটের গন্ধ।

গন্ধটা কেন যেন আজকাল প্রায়ই পাচ্ছে সে। বেশ তীব্র আর কড়া ঝাঁজের, তবে তার সঙ্গে একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ ওতপ্রোত হয়ে থাকে, ফলে গন্ধটায় যেন বেশ রোমান্টিক—রোমান্টিক আমেজ। চুরুটের এহেন গন্ধ খুব একটা খারাপ লাগে না, আসলে চুরুট মুখে দেওয়া পুরুষদের এমনিতেই দারুণ ব্যক্তিত্বময় বলে মনে হয় তার। তার ওপর চুরুটে যদি এমন মিষ্টি গন্ধ থাকে তাহলে তো সেই পুরুষটির রুচিবোধ নিশ্চিত তারিফ করার মতোই।

গন্ধটা প্রথম যেদিন এ—বাড়িতে এসে পেয়েছিল, বেশ অবাক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে জিজ্ঞসা করছিল রবার্টকে, তুমি চুরুট খাচ্ছিলে নাকি।

রবার্ট তার যিশুর মতো লম্বা, ঝাঁকড়া, লালচে চুল ঝাঁকিয়ে বলেছিল, নো—

মৃত্তিকা অবশ্যই জানতই যে রবার্ট চুরুট খায় না, সিগারেটও কদাচিৎ। বস্তুত পুরোনো ঐতিহ্য কেনা ছাড়া তার যে তেমন কোনো নেশাই নেই এমন একটা তথ্য আবিষ্কার করেছে মৃত্তিকা। সকালে উঠে কফির কাপ এগিয়ে দিলে বেশ জম্পেশ করে চুমুক দেবে তাতে, না দিলেও বলবে না 'কফি কই!' একদিন বিস্মিত হয়ে বলেওছিল, এই অ্যান্টিক বাড়িটায় আমাকে তুমি কী মনে করে নিয়ে এলো বলো তো?

রবার্ট নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিল, তোমার মধ্যে একটা প্রাচীন বাঙালিয়ানা আছে, যা আমার অ্যান্টিক কালেকশনের পাশাপাশি ভারী মানবে বলে মনে হয়েছিল।

—রিয়্যালি! ঝকঝকে হাসিতে চলকে উঠে মৃত্তিকা অবাক হয়েছিল কম নয়। একটু থিতু হতে এও ভেবেছিল সে ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রী হলেও, মুখে তুখোড় ইংরেজি আর কখনো পরনের জিনস সত্ত্বেও সত্যিই তথাকথিত আধুনিকতা তাকে তেমন স্পর্শ করতে পারেনি। হয়তো উত্তর কলকাতায় এক একান্নবর্তী পরিবারের পুরোপুরি বাঙালি ঘরানায় বড়ো হয়ে উঠে সে এখনও মনেপ্রাণে বাঙালি। সাহেব বরের সঙ্গে ঘর করতে এসেও শাড়িই পরে বাড়িতে।

যাই হোক, রবার্ট চুরুট খায় না, আশেপাশের বাড়িগুলো ঢের দূরে দূরে, তাহলে এ বাড়িতে চুরুটের গন্ধ আসে কোত্থেকে ভেবে—ভেবে হাল্লা হয়ে গেল মৃত্তিকা।

রবার্টকে এ—বাড়ির এতসব অলৌকিকতার কাহিনি শোনালে বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে হেসে বলে, এ বোধহয় তোমার একধরনের ইলিউশন। হ্যালুসিনেশনও বলতে পার। তবে কেউ যদি থেকেও থাকে তো থাকুক না। তোমার তো কোনো ক্ষতি করছে না। মনে করো 'ফ্রেন্ড'।

সেই অদৃশ্য বন্ধুর কথা ভেবে ভারী আশ্চর্য হয়ে রবার্টের দিকে তাকিয়ে থাকে মৃত্তিকা। রবার্টের কথাগুলো যেন কেমন—কেমন। একমুখ দাড়িগোঁফ আর লালচে চুলের এই বোহেমিয়ান যুবকও যেন সেই মুহূর্তে মৃত্তকার একদম অচেনা। রবার্টের বাবা ইংরেজ ছিলেন, মা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। চাকরিতে রিটায়ারমেন্টের পর তার বাবা—মা এ—দেশ ছেড়ে ইংলন্ডে পাড়ি জমালেও পিতৃপুরুষের তৈরি এই বিশাল দোতলা বাড়িটিতে সে রয়ে গেছে হয়তো বা বাড়িটির অ্যান্টিক হয়ে ওঠার কারণেই। রবার্ট একদিন গল্পে—গল্পে এও শুনিয়েছে, তাদের বাড়ির সামনে যে—মহেঞ্জোদারোপ্রতিম হাড়গোড়—বেরোনো দোতলা বাড়িটা এখন প্রায় নিঃসঙ্গ, শুনশান, সেটা কোনো এক আর্মেনীয় পরিবারের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে জাপানি বোমারু বিমানের আক্রমণের আতঙ্কে তারা বাড়িটা ছেড়ে সপরিবারে পালিয়ে গিয়েছিল কোথাও, আর ফিরে আসেনি কখনো। তবে তাদের কোনো এক উত্তরাধিকারী বহুকাল পরে দখল নিতে এলেও চলে গিয়েছিল কোনো অজ্ঞাত কারণে, কারণটা রবার্ট বলতে পারেনি অবশ্য।

যাই হোক, পুরোনো আমলের ইতিহাস থেকে উঠে আসা এই বিদেশি ধাঁচের বাড়িতে বসবাস করাটা ক্রমে যেমন রোমাঞ্চকর হয়ে উঠল মৃত্তিকার কাছে তেমনই অস্বস্তিকর। মস্ত বাড়িটার দোতলায় পশ্চিমের বিশাল বারান্দা—সংলগ্ন পর—পর গোটা ছয়েক ঘর, তারই কোনোটা ড্রয়িং, কোনোটা বেডরুম, কোনোটা ডাইনিং বা কিচেনে রূপান্তরিত করে একেবারে সবশেষে, উত্তরের পেল্লাই ঘরখানা তার বিশাল স্টুডিয়ো করে দিয়েছে রবার্ট। সেখানে ক্যানভাসের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরুপদ্রব দাঁড়িয়ে দু—খানা প্রমাণ সাইজের অয়েল পেন্টিং এঁকে ফেলার পর আজ সেই চুরুটের গন্ধটা যেন বেশ গাঢ় হয়ে ঘিরে ফেলল মৃত্তিকাকে।

অন্ধকার একটু থিতু হতেই ঘরের দেওয়াল ঠাহর করে এগোবার সময় সে এও খেয়াল করল, গন্ধটাও চলছে তার সঙ্গে। কিন্তু দরজা পেরিয়ে বারান্দায় পা দেওয়ার আগেই হঠাৎ তার শাড়ির আঁচলটা যেন বেধে গেল। নিশ্চয়ই দরজার ল্যাচকিতে বেধে গেছে আঁচল এই ভেবে ছাড়াতে গিয়ে দেখল, কোথায় ল্যাচকি! কেউ যেন ইচ্ছে করে টেনে ধরেছিল তার আঁচল, সে ফিরতেই ছেড়ে দিয়ে লুকিয়ে পড়েছে কোন চোরা অন্ধকারে।

বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল মৃত্তিকার। বুঝে উঠতে পারল না, অন্ধকারের সুযোগে কেউ ঢুকে পড়ল কি না বাড়ির ভেতর। ওপরে তো আপাতত সে ছাড়া আর কেউই জেগে নেই। রবার্ট এতক্ষণে নরম বিছানায় অবাধ ঘুমের কবলে। নীচের বাসিন্দারা তথৈবচ। তাহলে!

দ্রুত বারান্দা পেরিয়ে হাতড়ে হাতড়ে কিচেনে ঢুকে আশ্চর্য দক্ষতায় খুঁজে বার করল মোমবাতি আর দেশলাই। মোমবাতিটা জ্বালাতেই এতক্ষণের হারানো সাহস আবার ফিরে পেল। একবার ভাবল, রবার্টকে ঘুম থেকে ডাকবে কি ডাকবে না, পরক্ষণে মনে হল, না তাক, সারাদিনে ব্যবসার কাজে খুবই ধকল যায় তার ওপর।

স্টুডিয়ো—ঘরটিতে দ্রুত ফিরে এসে ক্যানভাসের সামনে টেবিলের ওপর জুতজাত করে বসাল মোমবাতিটা। ক্যানভাসের শরীরে আলো একটু পড়েছে বটে, কিন্তু আঙুলের ডগায় তুলি উদ্যত করে সে এল অনুভব করল যে, ছবিটার আদ্যন্তে বেশ রহস্যময়তা ফুটেছে, এমন আলো—আঁধারি পরিবেশ রহস্য বাড়াতে সাহায্যই করবে নিশ্চয়।

কিছুটা দম নিয়ে, হাতের তুলিতে রং মাখিয়ে যে মুহূর্তে মৃত্তিকা ঝুঁকে পড়তে যাবে ক্যানভাসের ওপর, অমনই কী আশ্চর্য দপ করে নিভে গেল মোমবাতিটা। সে অবাক হল, কারণ কোথায় তো কই তেমন হাওয়া নেই। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বটে, কিন্তু আপাতত সে বৃষ্টি একটুও দামাল নয়।

বিরক্ত হয়ে আবারও দেশলাই জ্বালাল সে, মোমবাতির শিখাটা উসকে উঠতেই আঁকতে শুরু করবে, সেই মুহূর্তে মোমবাতিটা ফস করে নিভে গেল আগের মতোই। ভুরুতে মস্ত কোঁচ ফেলে মৃত্তিকার মনে হল, হাওয়া নয়, কেউ যেন নিভিয়ে দিল মোমবাতিটা। চারপাশে থই থই চুরুটের সেই অদ্ভুত গন্ধ। ঘোর অন্ধকারে, বাইরে একটানা বৃষ্টির ধারাপতনের শব্দ শুনতে শুনতে কেন যেন এতক্ষণে বিপুলভাবে কেঁপে উঠল মৃত্তিকার শরীর। চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, রবার্ট, রবার্ট, হেল্প মি—

কিন্তু তার আগেই দপ করে আলো জ্বলে উঠতেই ঘাম দিয়ে জ্বল ছেড়ে গেল তার। ওহ, কী সাংঘাতিক ঝামেলাতেই না পড়ে গিয়েছিল সে। স্বস্তির শবাস ফেলে রং—তুলি নিয়ে ক্যানভাসের ওপর পুনর্বার মনঃসংযোগ করতেই বুঝল, ছবি আঁকার ঘোরটাই যেন কেটে গেছে। কিছুক্ষণ আঁকিবুকি কেটে, বিরক্ত হয়ে ফিরে গেল তার বিছানায়। কিন্তু সে রাতে তার চোখে ঘুমই এল না।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সমস্ত ঘটনাটাই তার মনে হল একটা স্মৃতি, তাতে একটা ক্ষীণ রহস্য শুধু মাখানো। একবার মনে হল, গভীর ঘুমন্ত রবার্ট কাল রাতে কিছুই জানেনি, শোনেনি, তাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার, পরমুহূর্তে মনে হল, রবার্ট শুনলে হয়তো হো হো হেসে উঠবে। বলবে, বাঙালি মেয়ে তো, তাই এত ভিতু। আমি তো এই বাড়িতে একা—একা এত বছর কাটিয়েছি—

অতএব মনের খুঁতখুঁতানিটা মনের কোল্ড স্টোরেজেই ঢুকিয়ে রেখে মৃত্তিকা যথারীতি সারাদিন তার টুকিটাকি পাঁচমিশেলি কাজে ব্যস্ত থেকে, তারই ফুরসতে কখনো ক্যানভাসে আত্মনিয়োগ করে কাটিয়ে দিল দিনটা। সন্ধের পর একদম ফ্রি। আরও মনোনিবেশে ছবির অবয়বে প্রাণসঞ্চার করতে যেতেই যথারীতি কালকের মতোই নিষ্প্রদীপ। আজ অবশ্য পুরোনো ভুলটা আর করেনি। হাতের কাছে গোছানোই ছিল মোমবাতি—দেশলাই, চট করে জ্বেলে ফেলল দ্রুত ও দক্ষ হাতে। কিন্তু মোমবাতিটা টেবিলে ন্যস্ত করার মুহূর্তেই কে যেন নিভিয়ে দিল এক ফুঁয়ে। মৃত্তিকা বিস্মিত হল, শরীরটা ছমছমও কর উঠল তৎক্ষণাৎ। মনে হল কাছেই কারও যে নিশ্বাস পড়ল ফস শব্দে। এবার একটু ভয় পেয়েই মোমবাতিটা দ্রুত জ্বালিয়ে নিল আবার, কিন্তু তাকে অবাক করে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল কেউ।

একরাশ গা—ছমছমে আবহের মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করে সে বলে উঠল, ডিস্টার্বিং।

তার ক্ষোভে একরাশ জল ঢেলে কেউ যেন হেসে উঠল, তার আশেপাশে কোথাও, সে হাসি প্রায় ফিসফিসানির মতোই।

পরক্ষণেই মৃত্তিকা যেন শুনল, কেউ হিসহিস করে বলছে, আর লাইক টু ডিস্টার্ব ইউ।

মৃত্তিকা ঘোর অন্ধকারের ভেতর একবার চোখ চালিয়ে দেখার চেষ্টা করল, সত্যিই কোথাও কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না। না দেখতে পেয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করল, বাট হোয়াই?

তক্ষুনি ফিসফিস করে কেউ যেন বলল, বিকজ ইউ আর সো বিউটিফুল—

মৃত্তিকার শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল একলহমা। মিশ—অন্ধকারের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে একা কারও সঙ্গে সে কথা বলছে, সেও উত্তর দিচ্ছে মৃত্তিকার সংলাপের, সমস্তটা তার কাছে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য। তবু 'ইউ আর সো বিউটিফুল' সংলাপটি শুনে সে ভারী আশ্চর্য হল, সুন্দরী শুনলে সব মেয়েই যেরকম খুশি হয়।

একটা বিজাতীয় ঘোর ক্রমশ মৃত্তিকাকে ঘিরে ধরছে তখন। কী করবে সে, এই অলৌকিকতা থেকে তার পরিত্রাণ কী, এমন ভাবতে ভাবতে দপ করে আলো জ্বলে ওঠায় সে একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে নিজের মনে উচ্চারণ করল, উফ, বাঁচা গেল।

বলবে—না—বলবে—না করেও শেষমেশ দু—দিনের এই অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহ রবার্টের কাছে বলেই ফেলল মৃত্তিকা। জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যপার বলো তো। একটা মিস্ট্রি আছে মনে হচ্ছে।

রবার্ট আগের মতোই হেসে বলল, অল বোগাস।

—না, সত্যিই কেউ সারাক্ষণ এ—বাড়িতে ঘুরছে ফিরছে মনে হয়।

—দেন ইগনোর হিম। বলল বটে রবার্ট, কিন্তু মৃত্তিকা কিছুতেই এই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে পারল না গা থেকে।

সেদিন রবার্ট দুপুরে বেরিয়ে গেছে তার কাজে, সে একা ড্রইঙে বসেছে, হঠাৎ কে যেন তার গায়ে গভীর নিশ্বাস ফেলল একটা। চমকে এদিক—ওদিক ফিরে ভুল বুঝতে পারলেও চুরুটের গন্ধটা কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারল না। কী আশ্চর্য, কে চুরুট খাচ্ছে, কোথায়!

কিন্তু দিনের বেলায় তবু একরকম, ঘাড়ের ওপর গরম নিশ্বাসের স্পর্শ তবু ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু যত রাত হয়, ততই একটা বিদঘুটে ভয় সারাক্ষণ জড়িয়ে জড়িয়ে উঠতে থাকে তার শরীর বেয়ে। বিশেষ করে কাল রাতের সেই বিচিত্র সংলাপ—

মৃত্তিকা অবশেষে খুব চেষ্টা করতে লাগল, যাতে দিনের আলোয়, বেলা শেষ হওয়ার আগেই যতটা পারে তার ছবি—আঁকার কাজ শেষ করে ফেলে। তবু কয়েকদিন একটানা স্থির পর্যবেক্ষণে সে আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করল, যতক্ষণ সে ঘাড় গুঁজে আঁকছে, কেউ যেন তার আচরণ, নড়াচাড়া সারাক্ষণ লক্ষ করে চলেছে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে। কখনো দূর, থেকে কখনো কাছে এসে, কখনো মনে হচ্ছে তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পরখ করছে তার আঁকাজোকার কাজ। শরীর ছমছম করছে তার, শিউরে উঠছে গা, তবু উপায় নেই বলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাগ্র পরিশ্রমে একনিষ্ঠ সাধনায় তাকে এঁকে যেতে হচ্ছে একটার পর একটা ছবি। এর পরের কয়েকদিন একরত্তিও লোডশেডিং না হওয়াতে কিছুটা স্বস্তিই অনুভব করল মৃত্তিকা। ছবি আঁকার কাজটা কিছুটা এগিয়ে ফেলল ক—দিনে। তবু সারাটা দিন, গভীর রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্তও সেই অলীক, অপার্থিব ঘোরটা যেন লেগেই রইল তার শরীরে।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রবার্ট 'কফি, কফি' বলে দু—তিনবার তাগিদ দিতেই মৃত্তিকা দ্রুত কিচেনে গিয়ে দু—কাপ কফি বানিয়ে ফেলল চোখের নিমেষে। প্লেট বার করল কাবার্ড খুলে, ফিরে এসে অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করল, গ্যাসের স্ল্যাবের ওপর মাত্র একটাই কাপ। অপর কাপটি এলোপাথাড়ি খুঁজতে খুঁজতে হাল্লা হয়ে গিয়ে অবশেষে ভাবতে বসল, তাহলে কি সে এককাপ কফিই বানিয়েছে ভুল করে। এটা কি তার শিল্পীসম্মত অন্যমনস্কতা,—না কি সে একটু ভুলোমনা বলেই! ওদিকে রবার্ট চতুর্থবার তাগিদ দিতেই মৃত্তিকা দ্রুত রবার্টের কাপটা দিয়ে এল ড্রইঙে, যেখানে সে খালি গায়ে শর্টস পরে বসে আছে ঘুমভাঙা চোখে। মৃত্তিকার হাতে এক কাপ কফি দেখে তার চোখে বিস্ময়, তুমি কফি খাবে না?

—খাব। তুমি শুরু করো। আমি আসছি। চোখের পলকে মৃত্তিকা কিচেনে ফিরে এসে দ্বিতীয় কাপ কফি বানাতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখল, যে—কাপটি একটু আগেই তার চোখে পড়েনি, সেটি বহাল তবিয়তে স্ল্যাবের ওপর অপেক্ষমান, কিন্তু খালি।

মৃত্তিকার চোখ বিশ্বাসই করতে পারছিল না ঘটনাটা। আবার গ্যাস জ্বালিয়ে কফি তৈরি করতে করতে হঠাৎ কে যেন তার ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলল, পরক্ষণেই ফিসফিস করে বলল, ইট ওয়াজ মাইন। আমি খেয়ে নিয়েছি।

মৃত্তিকা নিমেষে ঘুরে দেখতে চাইল, সত্যিই তার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না। না দেখে বিরক্তিতে বিড় বিড় করল, ডিস্টার্বিং। তার মন্তব্যে কোথাও কেউ যেন হেসে উঠল প্রায় ফিসফিসানির মতো, কৌতুকের

স্বরে বলল, আই লাইক টু ডিস্টার্ব ইউ—

কফি সংক্রান্ত এপিসোডটি এক সপ্তাহের মধ্যে বারতিনেক ঘটে যাওয়ার পর মৃত্তিকা একদিন শুনল, আমার জন্যেও এককাপ করে বানাও না রোজ।

সমস্ত ব্যাপারটা চরম অবিশ্বাস্য হলেও মৃত্তিকা অতঃপর তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনকাপ করে কফি তৈরি করতে শুরু করল। এককাপ কফি স্ল্যাবের ওপর জিরোতে দিয়ে অন্য দু—কাপ নিয়ে যেত ড্রইঙে। ফিরে এসে দেখত, তৃতীয় কাপটি খালি।

ঘটনাটা একই সঙ্গে বিস্ময়ের, অবিশ্বাসের, সেইসঙ্গে ভারী কৌতুকের মনে হল মৃত্তিকার।

ক—দিন এমন অদ্ভুত টানাপোড়েনে তার ছবি—আঁকার কাজটা পিছিয়ে পড়তে লাগল ক্রমশ। ফলে আবারও গভীর রাত জেগে ছবি আঁকতে শুরু করতে হল। আঁকতে আঁকতে একদিন ঠিক রাত বারোটার সময় দপ করে আলো নিভে গেল গোটা সাহেবপাড়ায়। ঠিক এরকমই একটা আশঙ্কা করছিল আনমনে। তৎক্ষণাৎ তার তুলি—ধরা আঙুলগুলো আচমকা কেঁপে উঠতে ছবিটির একটা অংশ ধেবড়ে গেল বিশ্রীভাবে।

কেউ যেন তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, কৌতুক—কৌতুক মুখে তাকিয়ে দেখছিল তার তন্ময় হয়ে ছবি আঁকা। আলো নিভে যেতে, ছবি নষ্ট হয়ে যেতে হেসে উঠে বলল, দ্যাট'স রাইট।

যেন 'বেশ হয়েছে' বলে হেসে উঠল কোনো খুনসুটে যুবক।

খুব রাগ হয়ে গেল মৃত্তিকার। দেশলাই খুঁজছিল মোমবাতি জ্বালবে বলে, অন্ধকারে টাল খেতে খেতে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, ব্যাট হু আর ইউ?

ফিসফিস কণ্ঠে কেউ জবাব দিল, সে তুমি চিনবে না।

—কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এরকম করছ কেন? উত্তরে সেই কণ্ঠস্বর খুকখুক করে হেসে উঠল, অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলল, আমার ইচ্ছে। খুব ভালো লাগছে তোমাকে রাগাতে। রাগলে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায়। মৃত্তিকা ভুরু কোঁচকাল, অবাক হল, একটা আশ্চর্য শিরশিরানি বয়ে গেল তার সমস্ত শরীরে। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল মোমবাতিটা। টেবিলের কোণে যেখানে রাখা ছিল সেটা, এই মুহূর্তে সেখানে নেই। কোথায় গেল, কোথায় রাখল, গোটা টেবিলে খুঁজতে খুঁজতে যখন জেরবার হচ্ছে সেসময় হঠাৎ কোত্থেকে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল মোমবাতিটা। সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিস কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, কেমন জব্দ করেছি, বলো দেখি।

—রাবিশ। মৃত্তিকা ধমকে উঠল, দেশলাইটা জ্বেলে দেখতে চাইল মোমবাতিটার অবস্থান, সেদিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে গিয়েই মনে হল তার আঁচল পেছন থেকে টেনে ধরেছে কেউ। পেছন ফিরতেই আঁচলটা আলগা হয়ে চলে এল তার পিঠে, কিন্তু মোমবাতির কাছে পৌঁছোবার আগেই আরও গড়িয়ে গেল মোমবাতি। সঙ্গে সঙ্গে কেউ হেসে উঠল অন্ধকারের ভেতর।

মৃত্তিকা বিরক্ত হয়ে বলল, কেন এরকম করছ আমার সঙ্গে?

সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর আবার ফিসফিস করল, বিকজ ইউ আর সো বিউটিফুল।

মৃত্তিকা যে সুন্দরী সেটা তার বয়ঃসন্ধির দিন থেকেই শুনে আসছে এর—ওর মুখে, আয়নায় নিজেকে দেখে না—বোঝেও তা নয়, তবু অশরীরী কণ্ঠস্বরে আরও একবার শুনে হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল তার। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার চব্বিশ বছরের জীবনে কখনো ঘটবে তা ভাবেইনি কখনো। অদ্ভুত অনুভূতিটুকু নিজের মধ্যে চালান করে দিয়ে বলল, কিন্তু তার জন্য আমার ছবি—আঁকার কাজে ডিস্টার্ব করছ কেন? আর ক—দিনের মধ্যে এতগুলো ছবি এঁকে ফেলতে হবে আমাকে—

এবার মৃত্তিকাকে স্তম্ভিত করে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভীষণ আবেগজড়িত গলায় বলল, বিকজ আই লাভ ইউ।

মৃত্তিকা হালকা—পলকা শরীরটা এক অদ্ভুত শিহরনে হু—হু করে কেঁপে উঠল সহসা। তিন শব্দে ভালোবাসার এহেন প্রকাশ তার এ তাবৎ জীবনযাপনে আরও বহু যুবকের কাছ থেকে উপহারের মতো পেয়েছে। একমাত্র রবার্টের কাছে ছাড়া ভয়ংকর অন্ধকারের মধ্যে এক অশরীরী কণ্ঠে বহুবার শোনা কথাটা

নতুন করে শুনে তার শরীর জুড়ে ঘনিয়ে এল অসম্ভব জ্বর। সে স্তব্ধ হয়ে গেল, ভুলে গেল হাতের দেশলাই কাঠিটা জ্বালাতে, শুধু হিম—কণ্ঠস্বরে বলল, তা কী করে হবে? উত্তরে কিছু বলার ছিল বোধহয় সেই কণ্ঠস্বরের, কিন্তু দপ করে আলো জ্বলে ওঠায় তখনকার মতো নিষ্কৃতি পেল মৃত্তিকা।

কিন্তু না, পরবর্তী ক—দিন সেই অশরীরী ক্রমশ আরও দামাল হয়ে উঠল তাকে বিরক্ত করতে। দুপুরে স্নানটান করে চুল বেঁধে, তাতে কাঁটা গুঁজে টুকিটাকি কাজ করতে ব্যস্ত, সহসা কে যেন তার চুলের গোছা ফস করে খুলে ফেলল। মৃত্তিকা ব্যস্ত হয়ে চুল বাঁধতে গিয়ে দেখল, কাঁটাটাই নেই। কাঁটা খুঁজতে এ—ঘর ও—ঘর তোলপাড়, শেষে নতুন একটা কাঁটা খুঁজে তবে রেহাই।

আর কী আশ্চর্য, কাঁটাটা কি না পাওয়া গেল ওয়ারড্রোবে ঝুলিয়ে রাখা রবার্টের টি—শার্টের পকেটে। রবার্টই পরদিন খেয়েদেয়ে বেরোনোর সময় টি—শার্টের পকেট থেকে বের করল চোরাই মালটি, অবাক হয়ে বলল, আরে, তুমি কি আজকাল আমার পকেটটাকেই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার ভেবেছ নাকি!

মৃত্তিকা এতদিনে অভিমানে ঠোঁট ফোলাল, আমি রাখতে যাব কেন?

—তবে কি আমিই রেখেছি?

—না। আর একজন। এ—বাড়ির আর একজন যে বাসিন্দা থাকে, সে—ই।

রবার্ট মৃত্তিকার দিকে তাকাল কীরকম অচেনার চোখে, গায়েই মাখল না কথাটা, বলল, তাই!

—হ্যাঁ, বলে গত কয়েক দিনের ঘটনা কিছুটা চেপে, কিছুটা না—চেপে গড়গড় করে বলে গেল মৃত্তিকা। শুনে রবার্ট খুব যে একটা আশ্চর্য হল তা নয়, হেসে বলল, ইন এনি কেস, ইগনোর হিম।

—কিন্তু ঘটনাটা আসলে কী?

রবার্ট এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি কী করে জানব! সে তো আমাকে ডিস্টার্ব করে না, আসেও না আমার কাছে। হয়তো তোমাকে তার ভালো লেগেছে—

ভালো—লাগার কথাটি কিন্তু মৃত্তিকা ঘুণাক্ষরেও বলেনি রবার্টকে। বলার কথাও নয়, তবু রবার্ট কী করে যে ঘটনাটা আঁচ করল বুঝে উঠতে পারল না সে। কিন্তু বিষয়টা যেদিকে ক্রমশ মোড় নিচ্ছে, তাতে কোনোক্রমেই স্বস্তিবোধ করছে না মৃত্তিকা। সে তো রবার্টকে বলতে পারে না, অদৃশ্য কণ্ঠস্বর কীভাবে রেইন করতে চাইছে তার ওপর। সত্যিই বলছে, তাকে ভালোবাসে—

আর কী আশ্চর্য, ছবিগুলোও যেন শেষ হতে চাইছে না কিছুতেই। নির্ধারিত দিনও যত এগিয়ে আসছে, ততই চাপ বেড়ে চলেছে মৃত্তিকার ওপর, গভীর রাত পর্যন্ত জেগে রং আর তুলি নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার ক্যানভাসের উপর, আর প্রতি মুহূর্তে এও অনুভব করছে তার পিছনে দাঁড়িয়ে কেউ যেন ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ধারাবাহিকভাবে দেখে চলেছে তার আঁকা। কখনো এটা মনে হচ্ছে মৃত্তিকার, তার তুলি আর যেন তার আঙুলের বশে নেই, তুলিটা কোনো অদৃশ্য আঙুলের নির্দেশে যা খুশি এঁকে চলেছে ক্যানভাসের ওপর। বিরক্ত হয়ে একদিন আঁকা বন্ধ করে শুতে চলে গেল নিজের ঘরে। বারান্দায় কিছুটা অন্ধকার ছিল, টানা বারান্দা পার হওয়ার সময় কেউ যেন ফিসফিস করে বলল, ভালোই তো আঁকছিলে, বন্ধ করে দিলে কেন?

মৃত্তিকা রেগেমেগে জবাব দিল, তোমার জন্যই তো। ইউ আর অ্যান আনকালচার্ড ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট।

—ইস, আমাকে এরকম বললে। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। পরদিন সকালে যথারীতি তিনকাপ কফির দু—কাপ ড্রইঙে নিয়ে গেল তার আর রবার্টের জন্য। কফি শেষ ফিরে এসে দেখল, কী আশ্চর্য, আজ আর কফির কাপ ছোঁয়ইনি কেউ। দারুণ অবাক লাগছিল তার, কী একটা কৌতুক ঘনিয়ে উঠছিল তার ভেতর। কাল রাতে যে গালাগালটা দিয়েছিল, বোধহয় তাতেই অভিমান হয়েছে তার।

মনে হল, ঠিকই করেছে সে। তার সঙ্গে বাড়াবাড়িই করছিল ক—দিন ধরে। এবার নিশ্চিন্তে আঁকতে পারবে ছবিগুলো। পরপর কয়েকদিন সে নির্বিঘ্নে ক্যানভাসে মন দিতে পারল। দ্রুত এগোতেও পারছিল তার

বিশাল কর্মযজ্ঞে। এখন আঁকার সময় আর মনে হয় না কেউ তার কাছাকাছি আছে, কিংবা নিশ্বাস ফেলছে তার ঘাড়ের ওপর, অথবা তার তুলি—ধরা আঙুল চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোনো অদৃশ্য শক্তি।

বেশ খুশি খুশি লাগছিল মৃত্তিকার, কিন্তু হঠাৎ কেন কে জানে তার মনে হল, ছবি আঁকার মুহূর্তে সে যে একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে থাকত, একটা অলৌকিক আবেগ ঘিরে থাকত তার শরীর ও মন, তা যেন হঠাৎই অদৃশ্য। তা ছাড়া কেউ একজন অলক্ষ্যে থেকে তার ছবি—আঁকা দেখত, অনুসরণ করত তার নড়াচড়া, তন্ময়তা, সেই চোরা নজরটি উধাও হয়ে যাওয়ায় ঠিক যেন মন বসাতে পারছে না ক্যানভাসে। অনুভূতিটা ভারী বিচিত্র বলে মনে হল তার। কী আশ্চর্য, এরকম তো হওয়ার কথা নয়। প্রায় জোর করেই সেই অশরীরীর উপস্থিতির কথা ভুলে সে মনঃসংযোগ করতে চাইল তার কাজে, নিমগ্ন হতে চেষ্টা করল তার অভীষ্ট অনুভূতির ভিতর, কিন্তু কোথায় যেন একটা তাল কেটে গেছে। আর কী কারণে যেন তার খুব কষ্টও হতে লাগল সেদিনকার অস্বাভাবিক খারাপ ব্যবহারের জন্য।

পরদিনই রাতে একটা বিশাল ক্যানভাসে সে দ্রুত তুলি বুলিয়ে চলেছে, আর কয়েক ঘণ্টা কাজ করলেই শেষ করে ফেলতে পারবে ছবিটা, সে সময় হঠাৎ লোডশেডিং। চারদিক অন্ধকারে ডুবে যেতেই সে আশা করছিল; নিশ্চয়ই অশরীরী আবার এসে খুনসুটি করতে শুরু করবে তার সঙ্গে, কিংবা দুষ্টু—দুষ্টু কথা বলে টিজ করতে চাইবে, কিন্তু না, কোনো অঘটন ঘটল না তো! এ ক—দিন লোডশেডিং তেমন হয়নি বলে মোমবাতি—দেশলাই কাছে রাখতে ভুলে গিয়েছিল বেমালুম। বিরক্ত হয়ে, অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে বারান্দায় বেরোতেই তার যেন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনল একটা। মৃত্তিকা দাঁড়িয়ে এদিক—ওদিক তাকাল একবার। গাঢ় নিশ্চিদ্র অন্ধকারে তখন বিশাল বাড়িটা ঝুপ হয়ে আছে, কোথাও কোনো শব্দ নেই, মৃত্তিকাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগোচ্ছে, হঠাৎ সেই ফিসফিস কণ্ঠস্বর, আমি কিন্তু তোমাকে আর বিরক্ত করছি না। মৃত্তিকার শরীরে একটা হিমশিরানি কুলকুল করে বয়ে গেল তৎক্ষণাৎ, জোর করে হাসতে চাইল, থ্যাঙ্ক য়্যু।

বলে এগোতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী ভেবে থমকাল, তুমি কি রাগ করেছ?

—কার ওপর রাগ করব! ফিসফিস কণ্ঠস্বর তৎক্ষণাৎ বলল, বিশ্বসংসারে কেউ তো আমাকে ভালোবাসে না—

কী ভেবে মৃত্তিকা আবার বলল, তুমি কি খুব দুঃখী?

—খুব। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আবার একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস, তুমিও তো আমাকে সেদিন বকলে।

—ও কিছু না, ফরগেট ইট, মৃত্তিকা বলতে বলতে এগোল কিচেনের দিকে।

সেদিন মোমবাতি জ্বেলে ক্যানভাসে মনঃসংযোগ করতেই মৃত্তিকা আবার খেয়াল করল, তার খুব গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে সে, তার আঁকা দেখছে, অনুসরণ করছে তার নড়াচড়া, কিন্তু একটুও বিরক্ত করছে না। তার এই অলক্ষ্যে উপস্থিতি বেশ পছন্দও করে ফেলল মৃত্তিকা।

পরদিন সকালে যথারীতি কফির কাপ খালি। অর্থাৎ তিনি যে অভিমান করে এতদিন এড়িয়ে থাকছিলেন মৃত্তিকাকে, আপাতত শান্ত, সুবোধ, ক্রোধহীন। মৃত্তিকার বেশ মজাই লাগল ঘটনাটা।

সেদিন সন্ধেবেলা তাদের বাড়িতে ছোট্ট একটা পার্টির আয়োজন করেছিল সে। 'কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস' নামে যে সংস্থাটির সঙ্গে সে জড়িত, তার অধিকাংশ তরুণ—তরুণী অনেকদিন ধরেই আবদার করছিল, এই মৃত্তি, তোর বিদেশি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে না একদিন—

রবার্টও এই পার্টির আয়োজনে ভারী চমৎকৃত, পুলকিত, সারাদিন ছটফট করছ আর বলছে, কই, তোমার বন্ধুরা কখন আসবে, মৃট্টি?

পার্টি মানেই তো কিছুই আড্ডা, জমাটি পানভোজন। রবার্ট আবার আর্টিস্টদের সঙ্গে পরিচিত হতে ভারী আগ্রহী। বিকেল থেকেই লখনউয়ের—কাজ—করা চমৎকার গেরুয়া রঙের একটা পাঞ্জাবি, তার সঙ্গে ধবধবে সাদা চুস্ত পরে বারবার পায়চারি করছে তাদের বারান্দায়। বরার্ট নিয়মিত ড্রিঙ্ক করুক তা অবশ্যই

পছন্দ করে না মৃত্তিকা, কিন্তু এদিন শিল্পীবন্ধুরা বাড়িতে এলে তারা যে বেলাগাম হাতে চাইবে তা তো নিশ্চিতই, সেই সঙ্গে রবার্টও।

তরুণ শিল্পীবন্ধুরা এসে মৃত্তিকার আঁকা ছবিগুলো দেখে কিন্তু বেশ হইচই বাধিয়ে দিল। ছবির ভেতর যে একটা অদ্ভুত রহস্যময়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, একটা আশ্চর্য অলৌকিকতা মিলমিশ হয়ে আছে ক্যানভাসে, তা নাকি মৃত্তিকার এ—তাবৎ আঁকা কোনো ছবিতে দেখা যায়নি। সেদিন ক্যানভাসের জায়গাটা ধেবড়ে গিয়েছিল, সেট নাকি একটা ভূতুড়ে আবহাওয়া তৈরি করেছে ছবিটায়। শুধু তা—ই নয়, মৃত্তিকার তুলি নাকি আগের চেয়ে ঢের ঢের ম্যাচিওর্ড। সন্ধেয় মস্ত ড্রাইংটার ছড়ানো—ছিটানো সোফায় ঋত্বিক—পৃথ্বী—প্রিয়ংবদা— রমিতা—রোহিত তুমুল আড্ডা জমিয়েছিল রবার্ট আর মৃত্তিকাকে ঘিরে। বস্তুত রবার্টই আজ ওদের কৌতূহলের প্রাণকেন্দ্র। প্রিয়ংবদা আর রমিতা বারবার রবার্টকে টিজ করে দেখছিল ইংরেজ—তনয়টির সঙ্গে বসবাস করতে কীরকম লাগছে মৃত্তিকার। রবার্ট অবশ্য ভারী উপভোগ করেছিল একঝাঁক তরুণ—তরুণীর সান্নিধ্য আর হইরই। তার দাড়ি—গোঁফের জঙ্গলের ভেতর থেকে ক্রমাগত বেরিয়ে আসছিল, বিউটিফুল, ওহ, হাউ বিউটিফুল। ইউ আর অল ভেরি নাইস।

প্রিয়ংবদা একসময় একান্তে মৃত্তিকাকে বললও, 'তোর কিন্তু ভারী সাহস, মৃত্তি। ওরকম একটা ভূতুড়ে চেহরার বাড়িতে সাহেব বর নিয়ে বাস করছিস!' ততক্ষণে পৃথ্বী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কই মৃত্তি, গলা যে শুকিয়ে গেল, একটু ভেজাবার ব্যবস্থা করো।

—স্যরি। একটু অপেক্ষা করো, এখনই ব্যবস্থা করছি, মৃত্তিকা বহুদিন পর তার প্রিয়বন্ধুদের কাছে পেয়ে এত হইচইয়ের মধ্যে যেন ভুলেই গিয়েছিল যে সে সারাদিন ধরে এটা—ওটা রান্না করে ভাজাভুজি করে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে তার বন্ধুদের।

পৃথ্বীর তাড়া খেয়ে ততক্ষণে সে গেলাসে গেলাসে ঢেলে ফেলেছে সোনালি পানীয়। সেই সঙ্গে ফিশফ্রাই, চিকেনফ্রাই, বাদাম, চানাচুর। অনতিবিলম্বে সবাই যার—যার গেলাস তুলে ধরল, চিয়ার্স।

—চিয়ার্স, মৃত্তিকা বলল, কিন্তু তার ততক্ষণে নজরে পড়েছে সাতজনে সাতটা গেলাসের দখল নেওয়ার পরেও একটা গেলাস অতিরিক্ত, তাতে সোনালি পানীয় মালিকের অভাবে তাকিয়ে আছে হাঁ করে বাকি সাতজনের দিকে।

ঋত্বিক চকাস করে তার গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল, বাট হু ইজ দ্য এইটথ পারসন,মৃত্তি? রবার্ট হো হো করে হেসে উঠে বলল, মৃট্টি লাভস মি সো মাচ, সেই জন্যই আমার ডাবল গ্লাস।

পৃথ্বী ঘাড় ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, নো, দ্যাটস মাইন। হইচই চেঁচামেচিতে সবাই এতই মশগুল যে কিছুক্ষণ পর মৃত্তিকা আবিষ্কার করল, অষ্টম গেলাসটি একদম নিঃশেষ। নিশ্চয়ই তাদেরই কেউ হট্টগোলের মধ্যে ওটা সাবাড় করে ফেলেছে যদিও তাদের নিজেদের গেলাস তখনও শেষ হয়নি। বুকের ভেতর সহসা কেন যেন ছ্যাঁত করে উঠল মৃত্তিকার, সে সবার অলক্ষ্যে গেলাসটা ভরতি করে দিল আবার, পাশে শূন্য গেলাস দেখে পাছে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলে এই আশঙ্কায়।

কিন্তু ততক্ষণে ড্রাইঙের নিবু—নিবু আলোয় যেন ভোজবাজি ঘটে চলেছে। অন্যদের প্রথম গেলাস তখনও শেষ হয়নি, ইতিমধ্যে অষ্টম গেলাসটি দ্বিতীয়বার শূন্য। মৃত্তিকার বুকের ভেতর একটা কাঁপ ধরছিল, সে কী করবে না করবে ভাবতে ভাবতে কেউ যেন আলো—আঁধারি অস্পষ্ট পরিবেশ মৃত্তিকার কানে—কানে বলল, প্লিজ ওয়ান পেগ মোর—

মৃত্তিকা তখন থরথর করে কাঁপছে। এক মুহূর্ত মনে হল তার গায়ে প্রায় গা ঠেকিয়ে আর একজন বসে আছে, নিঃশব্দে তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে ক্রমশ। তিনের পর চার, চারের পর পাঁচ। পূর্ণ গেলাসটা দ্রুত শেষ হয়ে চলেছে সবার অলক্ষ্যে।

মৃত্তিকার কপাল অবশ্য ভালো। কারণ কয়েক পেগ পেটে পড়তেই অনেকেই তখন টালমাটাল,অষ্টম গেলাসের ম্যাজিক কারও চোখে পড়েনি। অনেক রাতে সবাই খেয়েদেয়ে রওনা দিতে হবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে

সে।

বরার্ট নিজেও তখন প্রায় বেহুঁশ। মৃত্তিকার বুকের ভেতর তখনও একটা হিমকাঁপ। কী এক আনকা শিরানি তাকে সম্মোহিত কর রখেছে অবশ, নিথর করে।

রবার্ট ততক্ষণে গভীর নিদ্রায়। ঘুমের কোন অতল গহনে তলিয়ে গেছে চেতনা। মৃত্তিকা শোওয়ার আয়োজন করার আগে একবার পরখ করে নেয় সব ঘরের দরজা ঠিকঠাক বন্ধ আছে কি না। বরান্দায় বেরিয়েছে সবে, লাইটটা নিভিয়েছে, হঠাৎ আশেপাশে সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর, থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম ফর ইয়ের হসপিটালিটি।

—নট টু বি মেনশনড, বলে দ্রুত তার ঘরের দিকে ফিরে আসতে চাইছিল। কিন্তু কেউ যেন তার আঁচলটা আগের মতো টেনে ধরে বলছে, প্লিজ, মৃট্টি। একটু দাঁড়াও। মৃত্তিকা খেয়াল করছিল অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আজ যন অন্যদিনের মতো পরিষ্কার নয়, কেমন জড়ানো অস্পষ্ট, নেশাগ্রস্ত। তার বুকের ভেতরটা ভীষণ ঢিবঢিব করছে, আঁচলটা ছাড়িয়ে সে চলে আসতে চাইছে তখন, কিন্তু পারছেই না। বাধ্য হয়ে বারান্দার আলোটা জ্বালাতে গিয়েও পারল না। তার হাতও যেন কেউ শক্ত করে ধরে রেখেছে।

—ছাড়ো, মৃত্তিকা তখন ছটফট করে উঠেছে, এ কী করছ? ছাড়ো, ছাড়ো—

তার তখন মনে হচ্ছে কেউ যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে চাইছে তাকে, ছাড়াবার কোনো ক্ষমতাই নেই। পরক্ষণে স্তম্ভিত হয়ে শুনল সেই জড়ানো গলা, চলো মৃট্টি, লেট আস লাভ টু নাইট।

মৃত্তিকা শিউরে উঠল, প্রায় চেঁচিয়ে বলল, ডোন্ট বি সিলি। দাঁড়াও, আলোটা জ্বেলে দি।

—উঁহু, আলো জ্বেলো না প্লিজ। অন্ধকারে তোমাকে ভারী সুন্দর লাগছে। প্লিজ, অ্যায়্যাম ডাইং ফর ইউ।

—না, না, মৃত্তিকা নিজেকে ছাড়ানোর জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে, কিন্তু তার হাত—পা—শরীর সব ততক্ষণে সিল্যুট।

—প্লিজ, লেট মি কিস ইউ, সেই অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে যেন আবদার ঝরে পড়ল।

—নো, নো, মৃত্তিকা চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু কী এক অতৃপ্ত চরম আকাঙ্ক্ষায় কেউ যেন বন্ধ করে দিয়েছে তার ঠোঁট। একটা তীব্র জ্বালায় ছটফট করে উঠল তার ঠোঁটজোড়া। সেই সঙ্গে তীব্র হয়ে উঠেছে চুরুটের সেই মিঠে কক্ষা গন্ধটাও। প্রায় জবরদস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, ইটস ব্যাড, ভেরি ব্যাড, ইতর, বদমাশ, ছোটোলোক—

অন্ধকার বারান্দায় কিছুক্ষণ ঘোর স্তব্ধতা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেউ, ফিসফিস করল, আমি তোমাকে এত ভালোবাসি, আর তুমি আমাকে এমন করে বললে! ছি—

মৃত্তিকা ততক্ষণে বারান্দায় আলোটা জ্বেলে ফেলেছে দ্রুত হাতে। আলো ঝলমলে বারান্দায় কোথাও কেউ নেই, শুধু অনুভব করতে পারল, গ্যালন—গ্যালন ঘাম ভিজিয়ে দিচ্ছে তার শাড়ি—জামা, সমস্ত শরীর।

পরদিন সকালে রবার্ট ঘুম থেকে উঠতেই তাকে বেপরোয়া চেপে ধরল মৃত্তিকা, প্রায় সশস্ত্র বিপ্লবের ভঙ্গিতে। অশরীরীটার উপস্থিতি যে তার দৈনন্দিন জীবনে ভীষণ ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলেছে তা বিবৃত করে জানতে চাইল, বলো তো, আসল ব্যাপারটা কী। নিশ্চয় কিছু একটা চেপে যাচ্ছ আমার কাছে।

রবার্ট প্রথমে কিছুক্ষণ ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইলেও শেষপর্যন্ত পারল না। একটু একটু করে যে—কাহিনি প্রকাশ করল তা রীতিমতো ট্র্যাজিক। রবার্ট স্বীকার করল তার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়ো এক ভাই ছিল, তার নাম পল। সে তার প্রথম যৌবনে প্রেমে পড়েছিল সামনের অট্টালিকাপ্রতিম বাড়িটির একটি তরুণীর সঙ্গে। সামনের বাড়িটি বহুকাল ফাঁকা পড়ে থাকার পর সেখানে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবার থাকতে আসে, তরুণীটি তাদেরই। কিন্তু ট্র্যাজেডির বিষয় এই যে, পলের প্রেমে সাড়া দেয়নি সেই তরুণী। ব্যর্থপ্রেম পল অতঃপর রবার্টদের উত্তরের ঘরটি যেখানে আপাতত মৃত্তিকার স্টুডিয়ো, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল পুকুরে। পুকুরটি অবশ্য এখন আর নেই, পুকুর বুজিয়েই ওখানে মালটিস্টোরিড বিল্ডিংটা তৈরি হয়েছে ক—বছর আগে।

শুনতে শুনতে শিউরে উঠল মৃত্তিকা, এ রকম একটা সাংঘাতিক গল্প বেমালুম তার কাছে এতদিন চেপে রেখেছিল রবার্ট! আর সে কিনা উত্তরের ঘরটাতেই গভীর রাত পর্যন্ত জেগে ছবির পর ছবি এঁকে গেছে পল নামে তরুণটির সঙ্গে মোকাবিলা করে।

সেদিনই মৃত্তিকা তার স্টুডিয়ো সরিয়ে নিয়ে এল তাদের বেডরুম—সংলগ্ন ঘরটিতে। মাঝখানের দরজাটা খোলা থাকলে অন্তত রবার্টের উপস্থিতি সাহস জোগাবে তার মনে, যদিও পল নামের সেই প্রেমিক তরুণটির জন্যে খুব, খুবই কষ্ট হচ্ছিল তার। পল তো কাল রাতে তার কাছেও যথেষ্ট অপমানিত হয়েছে, আর মৃত্তিকা এও বুঝেছে যে, অভিমানী তরুণটি আর কখনো তার কাছে ঘেঁষবে না।

তখনও মৃত্তিকার একটা ছবি আঁকা বাকি। সময়ও হাতে আছে মাত্র তিনদিন। সেই শেষ ছবিটা আঁকতে গিয়ে সে সহসা অনুভব করল যে, গত দু—মাস যে—ঘোর রহস্যময়তায় লীন হয়ে বাকি ন—খানা ছবি এঁকেছে, যে—ছবি দেখে কাল তার তরুণ শিল্পীবন্ধুরা বারবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, সেই ঘোরটা যেন তার মগজে আর একবিন্দুও নেই।

ক্যানভাসের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুলি হাতে দাঁড়িয়ে মৃত্তিকার মনে হল, আসলে তার এই মিস্টিক সিরিজের প্রেরণা ছিল অশরীরী পলই, এখন দশম ছবিটি সেই আশ্চর্য মগ্নতায় আর এঁকে উঠতে পারবে না কিছুতেই।

একমুঠো ছাই

হর্ষ দত্ত

এত জোরে বৃষ্টি আর ঝড় কখনো দেখেছে কিনা শাশ্বত মনে করতে পারল না। কতক্ষণই বা ঝড়—জল হল? বড়োজোর আধঘণ্টা? কিন্তু তাতেই চতুর্দিক তছনছ। তপসিয়া জায়গাটা ভীষণ ঘিঞ্জি। ফলে ছোটো বিপর্যয় ঘটলে যেমন দেখতে লাগে, চারপাশে তাকিয়ে তেমনই মনে হচ্ছে। ঘণ্টাখানেক আগে শাশ্বত তপসিয়ায় এসেছে এক বিচিত্র উদ্দেশে। গত মাসে মা—কে ও একটা মাইক্রোআভেন কিনে দিয়েছে। অফ হোয়াইট রঙের মাঝারি মাপের আভেনটা শুধু কাজেরই নয়, রান্নাঘরের শোভা যেন দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ গত পরশু বাড়িতে একটা চিঠি এল আভেন কোম্পানির নয়ডা অফিস থেকে। চিঠির বক্তব্য,আমাদের ব্র্যান্ডের আভেন কেনার জন্য ধন্যবাদ। আপনার ক্যাশমেমো নম্বরটি—লটারিতে একটি গিফট পেয়েছে। আপনি তপসিয়া রোডে অবস্থিত আমাদের পাবলিক রিলেশন অফিস থেকে উপহারটি দশদিনের মধ্যে সংগ্রহ করলে বাধিত হব।

কিছু কিনলেই তৎক্ষণাৎ একটা বা দুটো ফ্রি কোনো জিনিস উপহার পাওয়া ইত্যাদি নিয়ে শাশ্বতর কোনো আগ্রহ নেই। ওর মতে, এসব ক্রেতাদের প্রলুব্ধ করার ফন্দি। কিন্তু চিঠিটার কথা বলে বলে দিদির মেয়ে বিন্নি ওকে অতিষ্ঠ করে ছাড়ল। ফোন করে, বাড়িতে এসে ওর একটাই কথা, যাও না রূপমামা, ওঁরা কী দেবেন নিয়ে এসো না! নিশ্চয়ই ভালো কিছু পাবে। এত বড়ো কোম্পানি! কেউ আদর করে ডেকে কিছু দিলে নিতে হয়।

বিন্নির কথা শুনে হাসি পেয়েছিল। তেরো বছরের মেয়ে, অথচ পাকা বুড়ির মতো কথা। হাসি চেপে নিমরাজি হয়েছে শাশ্বত, ঠিক আছে, যাব। তবে সস্তা বাজে মাল যদি গছিয়ে দেয়, তা হলে তোদের বাড়িতে ফেলে দিয়ে আসব। বিন্নি তাতেই রাজি হয়েছে।

পড়ন্ত বিকেলে শাশ্বত যখন তপসিয়ায় আসে, তখন আকাশে সামান্য মেঘ ছিল। কিন্তু সেই মেঘের আড়াল প্রকৃতি যে এমন রুদ্ররূপ নিয়ে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে, ভাবতেই পারেনি। তার ওপর আভেন কোম্পানির পিআর অফিসে গিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। শাশ্বতকে ওঁরা খুব আনন্দের সঙ্গে জানিয়েছেন, আপনি আর আপনার কোনো সঙ্গী যদি আগামী পুজোয় গোয়া বেড়াতে যান, তা হলে আমাদের লিসবন টাচু রিসর্টে দু—রাত্রি ফ্রি থাকতে পারবেন, আর বুফে লাঞ্চ ও ডিনারে ফিফটি পার্সেন্ট অফ। শাশ্বতর ইচ্ছে হচ্ছিল, পি আর পার্সোনেলদের মুখের ওপর বলে, গোয়া যাতায়াতের ভাড়াটা কে দেবে? আপনাদের অফ তো সেই গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল মশাই।

এমন অফার নেব কী নেব না পরে জানাব— এই বলে শাশ্বত ট্যাক্সি ধরার জন্য পার্ক সার্কাস—বাইপাস কানেকটরের দিকে এগিয়ে আসছিল। তখনই ঝড়টা এল, তার একটু পরেই অঝোরে বৃষ্টি। পড়িমরি করে ও একটা চায়ের দোকানের ছোট্ট শেডের তলায় এসে দাঁড়িয়েছিল বটে। কিন্তু বেশ ভিজে গেছে। তার ওপর তার ছিঁড়ে যাওয়াতে বা অন্য কোনো কারণে কারেন্ট নেই, চারদিক অন্ধকার!

অকস্মাৎ যেমন এসেছিল, তেমনই ঝপ করে জল পড়া থেমে গেল। হাত, মুখ আর চশমার কাচ মুছে সামান্য এই শেডের তলা থেকে বেরোতে যাবে শাশ্বত, ওর চোখে পড়ল রাস্তার ওপারে একটু কোনাকুনি, একটা মস্ত দরজার ওপর বিশাল সাইনবোর্ড। সম্ভবত গ্লো—সাইন। এপাশ—ওপাশ থেকে ছিটকে আসা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় শাশ্বত দেখল, নীল প্লাস্টিকের ওপর বেশ বড়োসড়ো সাদা অক্ষরে বাংলায়

লেখা— তপসিয়া হিন্দু কবরস্থান। অবাক হয়ে গেল শাশ্বত। হিন্দুদের আবার কবর দেওয়া হয় নাকি? আশ্চর্য তো! এমন একটা সৎকার প্রথার কথা ও জানতই না। সাইনবোর্ডটার দিকে আঙুল দেখিয়ে শাশ্বত চাওয়ালাকে আলতো স্বরে জিজ্ঞেস করল, হিন্দুরা মারা গেলে কি এখানে কবর দেওয়া হয়? আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন?

দোকানি শাশ্বতর দিকে একঝলক তাকালেন। তারপর একজন খদ্দেরের হাতে একটা চা—ভরতি ভাঁড় ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ছোটো ছোটো হিন্দু বাচ্চা মরে গেলে এখানে গোর দেয়। কভি কভি কোই হিন্দু জাত, জাদা ওমরের আদমিও লিয়ে আসে।

এমন একটা কবরস্থানের কথা শাশ্বতর জানাই ছিল না। তবে এটুকু জানত, দুধের শিশু মারা গেলে তাদের দাহ করা হয় না। ওর বিস্ময়াপন্ন মুখের দিকে এবার তাকিয়ে বিহারি চা—ওয়ালা বললেন, কবরখানার ভিতরে যান, গেট খুলা। দেখবেন কর্পোরেশনের লোক আছে। সব বলে দেবে।

আর একটু ডিটেলে জানার জন্য শাশ্বত বেরিয়াল গ্রাউন্ডের বিরাট দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। হাট করে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। বিস্তীর্ণ জায়গা, শেষ দেখা যাচ্ছে না। মাঠের মতো জমির বুক চিরে এধার—ওধার সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে। দূরে দূরে হয়তো গাছপালা, ঝোপঝাড় আছে। ওর মনে হল, ভেতরের আনাচেকানাচে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা ধরনের আলোর টুকরো। হাঁটি—হাঁটি পা—পা শিশুদের মতো!

ভিতরে খানিকটা ঢুকে এসে কাউকে দেখতে পেল না শাশ্বত। বাঁ—হাতি একটা দোতলা ভাঙাচোরা—বাড়ি। বাড়িটার একপাশে বৃষ্টির জল জমে আছে। হারিকেন জাতীয় কোনো আলো জ্বলছে একতলায়। উঁকিঝুঁকি দিয়ে খানিকটা হতাশ হয়ে ঘাড় ঘোরাতেই চমকে গেল শাশ্বত। মাথায় অর্ধেক ঘোমটা দেওয়া এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন ওর পিছনে। মুখটা খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। মহিলার শাড়ির রং ধূসর। গজের মতো কাপড়ে জড়ানো একটি শিশুকে পেটের কাছটায় দু—হাতে আঁকড়ে ধরে আছেন।

শাশ্বত কিছু বলার আগেই হিমস্তব্ধ গলায় মহিলা অনুনয় করলেন, কিছু সাহায্য করবেন? আমার মেয়ে খুব অসুস্থ।

কী হয়েছে আপনার মেয়ের? শাশ্বত অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল।

ঠিক ততক্ষণাৎ বিদ্যুৎ চমকানোর মতো একঝলক নীল আলো ছুঁয়ে গেল মহিলার মুখ। শাশ্বত স্পষ্ট দেখল, বিষাদগ্রস্ত, রক্তশূন্য এক তরুণী অপলকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টিতে কোনো প্রাণ নেই, প্রাণের স্পর্শও নেই। শিশুটি ততোধিক নিস্পন্দ। উত্তরের অপেক্ষা না করে পার্স থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরল শাশ্বত। যেন তৃতীয় একটা হাত বের করে টাকাটা নিলেন ভদ্রমহিলা। তারপর কবরখানার দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। শাশ্বতর সারা শরীর কেমন যেন শিরশির করে উঠল।

দুই

খবরের কাগজের দু—নম্বর পাতায় যত রকমের সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, সেগুলো খুঁটিয়ে দেখা শাশ্বতর মায়ের একটা নেশা। সভা—সমাবেশ, দিনপঞ্জিকা, আবহাওয়া আপনার আজকের দিনটি তো আছে, সেইসঙ্গে স্মৃতির উদ্দেশে, শোকসংবাদ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, কর্মখালি থেকে শুরু করে জ্যোতিষীদের নানা চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন। মা শুধু পড়ে না, মর্মস্পর্শী বা অদ্ভুত কোনো কিছু নাড়া দিয়ে যায়, তা হলে একে—তাকে বলে। শাশ্বতও বাদ যায় না। কোনো সন্দেহ নেই, বিজ্ঞাপনগুলো নানা তথ্য আর চমকের খনি। দেখতে শুরু করলে নেশা ধরে যায়।

দ্রুত চোখে বারো পাতার কাগজ উলটেপালটে দেখে শাশ্বত স্নান করতে গিয়েছিল। জামা—প্যান্ট পরে খাওয়ার টেবিলে এসে বসতেই মা বলল, দুর, সকাল বেলাতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী সাংঘাতিক একটা শোকসংবাদ বেরিয়েছে, পড়েছিস?

কাগজটা খাওয়ার টেবিলে পড়ে আছে। শাশ্বত হাতে তুলে নিল। শোকসংবাদ মানে সেই দু—নম্বর পৃষ্ঠা। একেবারে প্রথম কলমে ওপর থেকে নীচের দিকে সার সার ছবি আর ছবির তলায় কয়েক ফোঁটা চোখের জলের মতো খবর। তিন আর চার নম্বর ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই শাশ্বতর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার জোগাড়! এ কী দেখছে চোখের সামনে! ইনি তো সেই ভদ্রমহিলা, যিনি সেদিন বেরিয়াল গ্রাউন্ডের সামনে ওর কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন। ছবির মুখটায় শুধু বিষণ্ণতাটুকু নেই। কিন্তু তা ছাড়া সব এক। সেই চোখ, নাক, কপাল এমনকী মাথায় অর্ধেক ঘোমটা। ওঁর নীচের ছবিটি একটি শিশুকন্যার। কী মিষ্টি দেখতে। চোখ ভরতি কাজল, ছোট্ট কপালে চাঁদের মতো গোল কালো টিপ! এই বাচ্চাটিই কি সেদিন মহিলার কোলে ছিল? ওর মুখ সেদিন স্পষ্ট দেখতে পায়নি শাশ্বত। তবু এতটুকু ভুল হচ্ছে না। মহিলার মুখটা যে—কোনো কারণেই হোক ওর স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। আর ঘটনাটাও তো এই পরশু দিনের! কিন্তু এরা মারা গিয়েছে কবে? ভদ্রমহিলার ছবির নীচে চার লাইনের একটি লেখা: মা অদিতি, পৃথাকে নিয়ে তুই পনেরো দিন আগে পরপারে চলে গেছিস। আজ তোদের স্মরণ অনুষ্ঠান। যাদের চক্রান্তে তোরা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলি, তাদের কখনো ক্ষমা করিস না। ইতি বাবা, মা ও ভাইদা।

মুহূর্তে হাত—পা ঠান্ডা হয়ে গেল শাশ্বতর। যারা পনেরো দিন আগে মারা গেছে, তাদের সঙ্গে গত পরশু কী করে দেখা হল? এ হতে পারে না। ওর যুক্তিবাদী মন বিদ্রোহ করে উঠল। কিন্তু ছবি দুটোর দিকে আবার তাকাতেই হিম হয়ে এল সারা শরীর। ভদ্রমহিলা যেন স্তব্ধ মুখে ওর দিকে তীব্র ব্যঙ্গে তাকিয়ে আছেন।

রান্নাঘরে মা ওর ভাতের থালা সাজাচ্ছে। বেশ ভয়ার্ত স্বরে শাশ্বত ডাকল, মা!

ছেলের অস্বাভাবিক ডাকে খানিকটা অবাক হয়ে মা ওর সামনে এসে বলল, কী রে মুখ শুকনো লাগছে কেন? শরীর খারাপ লাগছে?

শাশ্বত ছবি দুটোর দিকে আঙুল রেখে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এই বিজ্ঞাপনটার কথা বলছিলে? নিজের গলার স্বর শাশ্বতর কানে কেমন যেন নিস্তেজ শোনাল।

হ্যাঁ রে, এইটে। মা—মেয়ে দু—জনে একই দিনে মারা গেছে! আশ্চর্য। কীভাবে যে মারা গেল। এখানে তো কিছুই লেখেনি। আহা, মেয়েটা কী ফুটফুটে! একেবারে ফুলের মতো।

জানো, শাশ্বত প্রায় ভাঙাভাঙা স্বরে বলল, পরশু হিন্দু বেরিয়াল গ্রাউন্ডের সামনে এই ভদ্রমহিলাকে টাকা দিয়েছিলাম! তোমায় ঘটনাটা বলেছি... এঁকেই...

কী যা—তা বকছিস। মা দু—চোখ কপালে তুলে বলল, এরা তো পনেরো দিন আগে মারা গেছে! পরশু এদের কী করে দেখবি?

শাশ্বত ভয়ংকর জোর দিয়ে বলল, না, আমার কোনো ভুল হচ্ছে না। মেমরিও ফেল করেনি।

মা ঠোঁট উলটে বলল, কী জানি বাবা, যত সব অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড! মরা মানুষ তোর সামনে এসে সাহায্য চাইবে কোন দুঃখে। সে তো তখন সব দুঃখ—কষ্টের পার! নে, দুটি খেয়ে নে। আপিসে দেরি হয়ে যাবে। তখন আমার ওপরে চেঁচাবি।

সামান্য ভাত—মাছের ঝোলটুকুও শাশ্বত তৃপ্তি করে খেতে পারল না। দু—তিন গ্রাস খাওয়ার পরই মনে হল, বমি উঠে আসছে। বাড়ি থেকে বেরোনোর মুহূর্তে শাশ্বত মা—কে বলল, কাগজটা তোমার পড়া হয়ে গেলে গুছিয়ে রেখে দেবে তো। আমি ফিরে এসে আবার দেখব। কাউকে দেবে না।

'কাউকে দেবে না' মানে শাশ্বত পাশের বাড়ির বিভূতিবাবুকে ইঙ্গিত করল। সত্তরোর্ধ্ব এই ভদ্রলোক একটু বেলার দিকে এসে কাগজটা পড়বেন বলে নিয়ে যান। কিন্তু প্রায়ই ওঁর ফেরত দেওয়ার কথা মনে থাকে না। খুব সংকোচের সঙ্গে মা—কে চেয়ে নিতে হয়।

অফিসে ওর পাশে বসে কুন্তল। বেশ হুল্লোড়বাজ ছেলে। পাড়ার গলিতে ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে শবযাত্রা — সব আইটেমেই কুন্তলকে দেখতে পাওয়া যায়। ওকে ঘটনাটা বলে একটু হালকা হওয়ার চেষ্টা করবে

ভেবেছিল শাশ্বত। কিন্তু টিফিন টাইমের আগে পর্যন্ত বলতেই পারল না। টিফিনের পর কুন্তলই হালকা স্বরে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে রে? আজ এত গম্ভীর আর চুপচাপ হয়ে আছিস? এনি প্রবলেম?

প্রথমে মাথা ঝাঁকিয়ে শাশ্বত বলল, না কিছু হয়নি। ঠিক আছি। তারপর একটু ভেবে কুন্তলকে জিজ্ঞেস করল, তুই কি ভূত, আত্মা, স্পিরিট, ঘোস্ট— এসবে বিশ্বাস করিস?

বেশ অবাক হয়ে গেল কুন্তল? বলল, কেন বল তো?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শাশ্বত হিন্দু কবরখানা থেকে আজকের খবরের কাগজ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা জানাল। হুল্লোড়বাজ হলেও কুন্তল ওর কোনো কথাই উড়িয়ে না দিয়ে বলল,হয়তো ভদ্রমহিলার ছবিটা আইডেনটিক্যাল। এমন তো হতেই পারে!

কিন্তু বাচ্চাটা! শাশ্বত চাপা আর্তনাদ করে উঠল যেন।

খটকাটা তো ওখানেই! যদিও তুই বাচ্চাটার মুখ দেখতে পাসনি।

সব শিশুর মুখ প্রায় একরকম। সুন্দর, নিষ্পাপ....

কুন্তল চিবুকে হাত ঘষল, তা ঠিক। এটাকে একটা অকাল্ট এক্সপেরিয়েন্স বলে ভাবতে পারিস। এ ছাড়া আর কী হতে পারে! তবে ওই ভূত আত্মা, অশরীরী— এসব পুরো ধাপ্পা, বাজে কথা, গাঁজাখুরি ব্যাপার। ডোন্ট ওরি...

কথা বলতে বলতে কুন্তল কম্পিউটারে চোখ রাখল। শাশ্বত নিজেও কুন্তলের মতো ভাবতে চায়। মৃত্যুর পরে মানুষ কেবল নানা স্মৃতিতে বেঁচে থাকে। পুড়িয়ে দেওয়া বা সমাধি দেওয়া দেহ পুনরায় দেখতে পাওয়াই অসম্ভব। কেননা মানুষের সারা শরীর ওই প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র যুক্তি সাজাতে থাকল শাশ্বত। কিন্তু কিছুতেই ভদ্রমহিলার মুখটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না।

তিন

অফিস থেকে বেরোতে আজ অস্বাভাবিক দেরি হয়ে গেল, একটা জরুরি ফাইল কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না শাশ্বত। যে—কাবার্ডে ফাইলটা থাকার কথা সেখানে গতকালই দেখেছিল। কারও ওটা নেওয়ার কথা নয়। খুঁজতে খুঁজতে একসময় দিশেহারা লাগছিল। জরুরি ফাইল, হারিয়ে গেলে কোম্পানির ক্ষতি, সেই সঙ্গে ওর সম্মান ও চাকরি নিয়ে টানাটানি। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফাইলটা পেয়েছে ওর টেবিলের নীচের ড্রয়ারে। অথচ ড্রয়ারগুলো খুঁজতে বাকি রাখেনি শাশ্বত। ফাইলটা ড্রয়ারের মধ্যে দেখতে পেয়ে শাশ্বতর মনে হয়েছিল, এইমাত্র ওর চোখে ধুলো দিয়ে যেন কেউ রেখে দিয়েছে! কুন্তল,আশিসদা, দাসবাবু এবং আরও কেউ কেউ ওকে জিজ্ঞেস করছিল, কী খুঁজছ? কী হারালে? কাউকেই স্পষ্ট করে বলতে পারেনি শাশ্বত। ভাসাভাসা উত্তর দিয়েছিল। অথচ অস্পষ্টতা ওর স্বভাব নয়। আজ কেন যে এমন ব্যবহার করল। কে কী ভাবল কে জানে।

দেরির ওপর দেরি যোগ হল মেট্রোতে। শোভাবাজার থেকে শ্যামবাজারের মধ্যবর্তী টানেলে হঠাৎ ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলেই যেখানে কারণ জানা যায় না, সেখানে সুড়ঙ্গের ভেতরে অথই পাথারে ভাসতে থাকার মতো অবস্থা। রাত হয়ে গেলেও নানা কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার ভিড় প্রতিটি কামরায়। যদিও প্রাণান্তকর পরিবেশ তৈরি হয়নি, তবে একটু পরেই গরম লাগতে শুরু করেছিল। সেই সঙ্গে অল্পস্বল্প নিশ্বাসের কষ্ট। ভেস্টিবিউলের এন্ট্রির দিকে দাঁড়িয়ে ছিল শাশ্বত। এখানে বেশ হাওয়া পাওয়া যায়, ধাক্কাধাক্কি কম। আচমকা ট্রেন বন্ধ হয়ে গিয়ে যদিও সব সুখই তখন হারিয়ে গেছে। চোখ বুজে অসহায় ভাবে প্রহর গুনছিল শ্বাশ্বত। তখনই স্পষ্ট শুনতে পেল একটি শিশুর কান্না। একবছর দেড়বছরের বিন্নি ঠিক ওইভাবেই কাঁদত। খিদে পেলে, শরীরে কোনো কষ্ট হলে কিংবা নিছক সাফোকেশনে।

শাশ্বত ঘাড় উঁচু করে দেখার চেষ্টা করেছিল কোনখান থেকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দ। নিশ্চয়ই গরমে বাচ্চাটার খুব কষ্ট হচ্ছে। ফাঁক দিয়ে, পাশ দিয়ে, অন্য যাত্রীদের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়েও শাশ্বত দেখতে

পায়নি। ভেস্টিবিউলে অর্ধেক শরীর ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাইশ—তেইশ বছরের এক যুবক ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, কাউকে খুঁজছেন?

কই না তো! শাশ্বত গভীর বিস্ময়ে বলেছিল, একটা বাচ্চা কোথায় কাঁদছে না! কোনখানে বলুন তো! সেটাই দেখতে চেষ্টা করছি!

যুবকটি প্রথমে হতবাক হয়ে গেছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছে, কেউ কাঁদছে না তো! আপনি বলছেন বাচ্চার কান্না! কিন্তু কোথায়? নাহ...! কান পেতে শোনার চেষ্টা করেছিল তরুণটি। সামান্য পরে ওর দিকে সন্দেহ ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

ওরই মধ্যে দু—বার ফোন করেছিল বিন্নি। কিন্তু কথা বলতে গেলেই লাইন কেটে গেছে। বিন্নি বিরক্ত হয়ে এসএমএস পাঠিয়েছে। কিন্তু তাতেও সাম টেক্সট মিসিং। শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের পুরোটা আর তৃতীয় লাইনের অর্ধেক এসেছিল : রূপমামা, ডু ইউ নো, হাউ মেনি বেরিয়াল গ্রাউন্ডস ইন ক্যালকাটা? ক্যান ইউ গিভ মি আ পিকচার... অফ...। আধখামচা এসএমএসটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বত মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছে। সেই বেরিয়াল গ্রাউন্ড। কিন্তু বিন্নি হঠাৎ এসব জানতে চাইছে কেন? কলকাতা সংক্রান্ত কোনো জেনারেল নলেজের প্রশ্ন? কিংবা বিন্নি কি ওর দিদার কাছ থেকে কিছু শুনেছে? মা কি এরই মধ্যে ব্যাপারটা পাঁচকান করে দিয়ে বসে আছে?

এসব ভাবতে ভাবতে শাশ্বত বাড়ি ফিরেছে প্রায় পৌনে দশটায়। দুর্যোগ আর দুর্ভোগ আজ সকাল থেকে ওর পিছু নিয়েছে। ওর দেরি হচ্ছে দেখে চিন্তায় আকুল মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। শাশ্বত বাড়ি ঢুকতেই গভীর স্বস্তি পেয়েছে। মা দেরির কারণ জিজ্ঞেস না করে বলেছে, জানিস, বিভূতিবাবু খবরের কাগজটা নিতে এসেছিলেন। আমি দিইনি। ওটা তোর আলমারিতে রেখে দিয়েছি।

ভালো করেছ। ক্লান্ত স্বরে বলেছে শাশ্বত, খুব খিদে পেয়েছে মা। চা—টা আর খাব না। তুমি আমাকে রাতের খাবার দিয়ে দাও।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মা কিছু একটা ভেবেছিল। তারপর নিঃশব্দে ছেলের ইচ্ছে পূরণ করেছে।

এই একটু আগে খেয়ে উঠেছে শাশ্বত। বিছানায় একটু গড়িয়ে নেওয়ার জন্য ও শুয়ে পড়ল। ভাবল, একটু পরে খবরের কাগজটা দেখবে। কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে। ভুল থেকে যত সব ইলুশন, হ্যালুসিনেশন! মনটা অকারণে চঞ্চল হয়ে আছে। কোনো মানে হয়! মঙ্গল গ্রহে প্রাণের চিহ্ন খুঁজতে বিজ্ঞান যেখানে মরিয়া, সেখানে, সেই সময়ে বসে প্রাণহীনদের নিয়ে শাশ্বত উলটোপালটা চিন্তা করছে!

সহসা ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল শাশ্বত জানেই না। ঘরের আলো মনে হয় মা নিভিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু কীসের শব্দ? একবার ছাদ থেকে কার্নিশে মাটি ভরতি গাছের টব পড়ে যেতে এরকম শব্দ হয়েছিল। ওর ঘরের পশ্চিম দিকের জানলা দিয়ে রাস্তার আলোর একটা ফালি ঢুকে আসে। আজ সেই আলোটা নেই। তা হলে কি লোডশেডিং? তাই বা কী করে হবে! ওই তো সিলিং থেকে ঝুলতে থাকা পাখাটা বনবন করে ঘুরছে। রাস্তার আলোটা হয়তো কোনো কারণে জ্বলছে না। বালিশের দু—পাশে হাত দিয়ে চশমাটা খুঁজল শাশ্বত। শোওয়ার আগে আশেপাশে কোথাও খুলে রেখেছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে খুঁজে পেল না।

তরাসে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চোখ দুটো জ্বালাজ্বালা করছে। বাথরুমে গিয়ে চোখে—মুখে একটু জল দিয়ে এলে হয়তো আরাম লাগবে। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শাশ্বত মাত্র অর্ধেক উঠেছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘরের কাঠের আলমারির একটা পাল্লা ধড়াস খুলে গেল। কেউ যেন ভেতর থেকে ঠেলে খুলে দিল দরজাটা। শাশ্বত আর নড়তে পারল না। ন্যাপথলিনের হালকা গন্ধের সঙ্গে একটা ভয় যেন সারা ঘরে ছড়িয়ে গেল।

ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল শাশ্বত, কে?

কেউ সাড়া দিল না। পরক্ষণে ওর মনে হল, কোনো মানুষ এসব করছে না। অন্য কেউ। কিন্তু কে সে? যা কিছু ঘটছে কোনোটাই স্বাভাবিক নয়। আলমারিটা বেশ পুরোনো, সেগুন কাঠের তৈরি। পাল্লাটা কি হাওয়ায়

কাঁপছে? আরও একটা শব্দ পাচ্ছে শাশ্বত। খুব নির্জন জায়গায় ঝরাপাতা কিংবা টুকরো ছেঁড়া কাগজ হাওয়ার ধাক্কায় সরে সরে গেলে যেমন শব্দ হয়, তেমন।

দপ কর একঝলক আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। সেই ক্ষণিক আলোর ঝলকানিতে শাশ্বত স্পষ্ট দেখল মেঝেতে পড়ে আছে অগ্নিদগ্ধ একটি শিশু ও এক মহিলার দেহ। মহিলার আধপোড়া ডান হাতটা শিশুটিকে ছোঁয়ার জন্য যেন নড়ছে। চিৎকরে করে উঠল শাশ্বত। কিন্তু বুঝতে পারল, ওর মুখ থেকে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না। অচেতনের আবর্তে তলিয়ে যেতে যেতে শাশ্বত আবার প্রাণপণ আর্তনাদ করে উঠল।

চার

মা আর নন্দামাসির চেঁচামেচিতে শাশ্বতর ঘুম ভেঙে গেল। একী, ঘড়িতে ন—টা পাঁচ! এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল ও! কেউ ডাকেনি কেন? কখন তৈরি হবে, কখনই—বা অফিসে যাবে! সব—কটা ইন্দ্রিয় সজাগ হতেই শাশ্বত বুঝতে পারল নন্দামাসি জোর দিয়ে বলছে, আমার তিন কুড়ি বয়েস হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু চোখের মাথা এখনও খাইনি গো বউদি! আমি স্পষ্ট দেখলুম, শাশ্বতর ঘর থেকে অরু বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল!

তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নন্দা! কী উলটোপালটা বলছ! অরু কোত্থেকে আসবে? ও এল, অথচ আমি জানতে পারলাম না! মায়ের গলা আরও চড়ে গেল, নেশা—ভাঙ করলে লোকজনের কথা এমন অদ্ভুত হয়ে যায়। তোমার চোখে কি ছানি পড়েছে! যত বাজে কথা!

অরু ওর দিদির ডাকনাম। নন্দামাসি ওদের বাড়িতে বহুদিন ধরে কাজ করছে। যদিও ঠিকে কাজ, কিন্তু অনেকটা সময় এখানে থাকে। একটু নিটপিটে ধরনের, তবে কাজকর্ম ভীষণ পরিষ্কার। মায়ের সঙ্গে ওর খুব ভালো সম্পর্ক। কিন্তু আজ নন্দামাসির কথায় মা রেগে আগুন। বিষয়টাও বড়ো অদ্ভুত! নন্দামাসি দিদিকে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে দেখেছে। সত্যিই এ এক আজগুবি কল্পনা! না—জানিয়ে দিদি কক্ষনও বাপের বাড়ি আসে না। তা হলে? কাকে দেখল নন্দামাসি? দিদির মতো কে ওর ঘর থেকে বেরিয়েছে? শাশ্বত ভেবে পেল না।

তা তো বলবে। এই তো শতর খাটের তলায় ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখি একটা লাল রঙের বল আর রুপোর ঝুমঝুমি পড়ে আছে। গিয়ে দেখো না। ওগুলো শতর ঘরে কোত্থেকে এল? হয়তো বিন্নির ছোটোবেলার খেলনা। কোনো কারণে অরু নিয়ে এসে ভাইয়ের ঘরে রেখে গেছে। শত ঘুমোচ্ছিল দেখে আমি জিজ্ঞেস করতে পারিনি। জিনিসগুলো সরিয়ে ঝাঁট দিয়েছি।

শাশ্বতর মাথার মধ্যে যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। ওর খাটের তলায় ঝুমঝুমি আর লাল বল। খাটের ওপর থেকে শরীর ঝুঁকিয়ে দেখল শাশ্বত। কিছুই নেই। শুধু বাড়িতে পরার হাওয়াই চটিটা এক কোণে পড়ে আছে। আশ্চর্য, নন্দামাসি কি সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছে! নীচ থেকে মাথা তুলতেই কাঠের আলমারিটার দিকে ওর চোখ চলে গেল। তৎক্ষণাৎ শাশ্বতর চোখে ছবির মতো ভেসে উঠল কাল রাতের প্রতিটা মুহূর্ত। হাড়হিম করা এক—একটা দৃশ্য। দৃশ্য, নাকি স্বপ্ন! ও কি শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে গেছিল? আলমারির দরজাটা এখন দিব্যি বন্ধ। খাট থেকে লাফিয়ে নেমে দুটো পাল্লা টেনে খুলে ফেলল শাশ্বত। মা বলেছিল, কাগজটা আলমারির ভেতর রেখেছে। কিন্তু কোথায়? কাগজটা তো নেই! তা হলে কি জামাকাপড়ের ভাঁজের নীচে লুকিয়ে রাখা আছে! শাশ্বত চেঁচিয়ে ডাকল, মা!

কী হয়েছে বাবা! নন্দামাসিকে নিয়ে মা এরই মধ্যে ঘরে ঢুকে এসেছে। সম্ভবত লাল বল আর ঝুমঝুমি দেখতে।

কাগজটা কই! কোথায় রেখেছ! শাশ্বতর নিজের কানেই নিজের কণ্ঠস্বর ভীষণ রুক্ষ শোনাল।

রীতিমতো চমকে গিয়ে মা বলল, ওই তো দু—নম্বর তাকটায় তোর গেঞ্জিগুলোর ওপর রেখেছিলাম। সে কী রে সত্যিই তো নেই! সর, সর, কোথাও ঢুকে গেল কিনা দেখি!

মা আলমারিটা আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে। এদিকে খাটের তলায় অর্ধেক ঢুকে নন্দামাসি হাঁউমাউ করে উঠল, এ কী অলুক্ষনে, অনাছিষ্টি। আমি নিজের হাতে ঝুমঝুমিটা সরালুম গো। এখন তো দেখছি হাওয়া। হায় হায়, তোমাদের কাছে বেমালুম মিথ্যেবাদী হয়ে গেলুম!

এদিকে মায়ের নাটক, ওদিকে নন্দামাসির। মেজাজ হারাল শাশ্বত, আমার ঘর থেকে সবাই এখুনি বেরিয়ে যাও। যাও বলছি! মা, তুমি আমাকে ডাকোনি কেন? কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি বলে উঠতে পারলাম না, তুমিও জাগিয়ে দিলে না। অফিসটা ফালতু কামাই হয়ে গেল।

খবরের কাগজটা খুঁজতে খুঁজতে ব্যর্থ ক্লান্ত মা ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বলল, আজ তো পয়লা মে। তোর অফিস বন্ধ, ছুটি। তাই ডাকিনি। অঘোরে ঘুমোচ্ছিলি।

নিজের আচরণে লজ্জা পেল শাশ্বত। আজ যে পয়লা মে ভুলেই গেছিল। ক—দিন ধরে সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে! মাথা নীচু করে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মা অনুচ্চ স্বরে বলল, কাগজটা ঠিক ওখানেই গুছিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু গেল কোথায়!

চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল নন্দামাসি। ওর দুটো হাত ধরে বলল, বিশ্বাস করো শতবাবু, অরুর মতো ছিপছিপে, শাড়ি পরা একটা মেয়েকে তোমার ঘর থেকে বেরোতে দেখেছি। ঝুমঝুমি আর লাল রঙের বলও...। আমি এতটুকু বাজে কথা বলছি না। এসব বলে আমার কী লাভ!

মেয়েটির কোলে কি কোনো বাচ্চা ছিল? নিজের মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে আনমনে জিজ্ঞেস করল শাশ্বত।

চোখ বড়ো বড়ো করে, একটু ভেবে নন্দামাসি বলল, তা তো দেখিনি। আমি বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে বাসনের জল মুছছিলাম। মেয়েলোকটা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল, খুঁটিয়ে দেখতে পাইনি। মনে হল অরু, তাই অত মাথাও ঘামাইনি।

নন্দামাসিকে আশ্বস্ত করে শাশ্বত বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোথাও একটা গন্ডগোল হচ্ছে। তাই এসব উলটোপালটা...। তুমি কাজে যাও।

চোখে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু সর্বত্র একটা তছনছ অবস্থা! টয়লেট থেকে ঘুরে এসে মোবাইল অন করে শাশ্বত দেখল লগবুকে কুন্তলের কল। রিং ব্যাক করল শাশ্বত, কী রে, ফোন করেছিলি?

শোন, একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তোর ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কথা মনে পড়ল। তিনি ওই কাগজেই কাজ করেন। ভদ্রলোক অ্যাডভার্টাইসমেন্ট ডিপার্টমেন্টে আছেন। যাঁরা ওই ছবিসহ শোকসংবাদটা দিয়েছেন তাঁদের কোনো কনটাক্ট নম্বর যদি জানা যায়, এই আশা নিয়ে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তা ভদ্রলোক কাগজের ফাইল দেখে আমাকে স্পষ্ট বললেন, ওইদিন ওরকম কোনো শোকসংবাদ বেরোয়নি।

তার মানে? শাশ্বত চমকে গেল।

ইয়েস। তা ওঁকে আমি বললাম, হয়তো অন্য কোনো এডিশনে বেরিয়েছে— লেট সিটি বা রিজিওনাল। উনি বললেন, ক্লাসিফায়েড অ্যাড সব এডিশনেই প্রকাশিত হয়। তুই তারিখটা ভুল বলেছিস ভেবে ওঁকে গত একসপ্তাহের কাগজ দেখতে অনুরোধ করলাম। ভদ্রলোক আমার আবদারে বিরক্ত হননি, তবে একটু পরে বিস্ময় ঝরিয়ে বললেন, এক সপ্তাহ কেন, গত একমাসেও নেই। কী ব্যাপার বলো তো! আমি তো....

হাতের মুঠো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কানের ওপর থেকে মোবাইলটা নামিয়ে আনল শাশ্বত। এইসব অবিশ্বাস্য, যুক্তিহীন ঘটনার পরম্পরাগুলো মেলাতে চেষ্টা করল। এক অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যে ঘটনাগুলো আবৃত হয়ে আছে। সবকিছুই কি তবে দৃষ্টিভ্রম? মায়াবী মিথ্যা! কোনো উত্তর খুঁজে পেল না শাশ্বত। সাঁড়াশির মতো যত রাজ্যের অস্বস্তি ওকে পিষে ধরল যেন।

দুপুরের মুখে হন্তদন্ত হয়ে এলেন বিভূতিবাবু। শাশ্বত দেখল, ওঁর হাতের মুঠোয় বাসি খবরের কাগজটা অল্প অল্প কাঁপছে। প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে ভদ্রলোক শাশ্বতকে বললেন, দেখো কী কাণ্ড, কাল তোমার মায়ের

কাছ থেকে কাগজটা নিতে এসেছিলাম। তা তখন উনি কোনো কারণে দিতে পারেননি। আজ দেখছি আমাদের লেটার বক্সে লম্বা করে এটা ঢুকিয়ে রাখা আছে। তোমাদের বাড়ি থেকেই কেউ নিশ্চয় রেখে এসেছে।

বিস্ফারিত চোখে কাগজটার দিকে তাকিয়ে শাশ্বত বলল, ওটা আপনি নিয়ে যান।

সামান্য মুখ বিকৃতি করে বিভূতিবাবু বললেন, না ভাই। কোনো দরকার নেই। লেটার বক্সের তালা খুলে কাগজটা যখন বের করছি, মনে হল কারেন্ট খেলাম। তারপর এইটুকু রাস্তা আসছি, হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিলাম! স্পষ্ট ফিল করলাম, কে যেন ধাক্কা মারল! পেছন ফিরে দেখি কেউ নেই! এসব পরের দ্রব্য না বলে ছোঁয়ার শাস্তি। এই রইল তোমাদের কাগজ।

দোমড়ানো—মোচড়ানো পাতাগুলো ওর সামনে নামিয়ে রেখে বিভূতিবাবু অজানা ভয়ে গা মুচড়ে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন।

শাশ্বতর মনে হল, খবরের কাগজটা নয়, ওর চোখের সামনে পড়ে আছে একমুঠো মানুষ পোড়া ছাই।

এ পরবাসে

মধুময় পাল

যাকে বলা হয় এগোনো, সেটা কখনো বস্তুত পালানো হয়।

আকাশের উপদ্রুত কোণে বোমাবাজি চলছিল। বৃষ্টি হতে পারে।

সুপারি কিলারের মতো হাড়—হিম ইমেজে রাউন্ড মেরে গেল পুলিশের গাড়ি। স্যালুট দিল তিনটে ক্লাব।

পা নয়, যেন পদাতিক সমবায়ে ছুটছে বিনোদ। বাড়ির দিকে এগোনো কিংবা পালানো।

ফুচকাওয়ালাকে ঘিরেছে তরুণীরা। টকজল টুবটুব, টুপটুপ।

চারটে নেড়ির বিপুল গলাবাজি। এ ভরা শ্রাবণে ওরা ভরাট রোমান্টিক হয়। ছালচামড়ায় ক্ষতচিহ্ন নিয়ে নেড়ি—পুংরা ঘোরে পাড়ায় পাড়ায়।

শরীর শরীর, তোমার সেক্স নাই, বিনু? কানের পাশে বলল সঙ্গিনী।

বিনোদের বলতে ইচ্ছে হল, ধরতে পাললে বুঝিয়ে দেব কত ধানে....। বলে না। মনে মনে বলে, তোমার তো শরীর নাই।

সাইবার কাফের রোয়াক থেকে উঠে দাঁড়ালেন সেই বর্ষীয়সী সাদা চুলের তুষার—মাথা নিয়ে। এগিয়ে এলেন। কটা বাজে? এটা তাঁর প্রতিদিনকার জিজ্ঞাসা। আরও কাউকে করেন কিনা জানে না বিনোদ। জবাব দেয়। তিনি বলেন, আপনের সময় হয় নাই।

মানে কী? সঙ্গিনীর প্রশ্ন।

বিনোদের জবাব, কী জানি।

ডানদিকে বাঁক নিল বিনোদ। পুকুর বোজাচ্ছে রামুয়া ওরফে জয়রাম মিশ্র। বিহারের বাসিন্দা। অস্ত্রপাচারে দুবার ধরা পড়েছে। সেই থেকে এখানে ঠেক। ক্লাস এইটের বাবলিকে বিয়ে করেছে। কিছুটা তোলতাই, বাকিটা প্রশাসনিক। বাংলার জামাই, আহা রে! পৃথিবীর চক্করের টাইম ধরে শিফটিংয়ে রামুয়ার দুটো লোক নলি সাঁটিয়ে পুকুরপাড়ে অলওয়েজ ফিট। তারা বাঙালি। চাকরিবাকরি নেই, বাপ—মার মাল্লুর জোর নেই, বাইক দিতে পারে না, প্রেম—ট্রেম লাগে, তাই ঘ্যামা পুজো করে, মন্ত্রী আনে উদবোধনে, মাচা—নাচা—গানা হয়, বন্ধ কারখানার দেওয়ালের ইট বেচে, পুলিশকে খবর বেচে, রাস্তার গাছ বেচে ইত্যাদি।

অসীমের দোকানে দাঁড়ানোর কী দরকার ছিল? ওই এক ভাঁড় চা। তার লোভে? এখন বউয়ের ভয়ে এমন ছুটছ যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। সঙ্গিনী বলে।

বিনোদ জবাব দেয় না।

সঙ্গিনী হাসে। বলে, বাতেলার স্থানাভাব ঘটিয়াছে? অফিসে ভালোমানুষ। ট্রেনে বোবা। অসীমের দোকানে এসেই বাতলিং! ওরা তোমাকে দেখে আর মনে মনে হাসে। ভাবে বিশুদ্ধ গাম্বাট।

অফিসের খবর তুমি জানলে কীভাবে?

বোঝা যায়।

অসীমের দোকানে কী বলি তুমি শোনো কীভাবে?

ওই মরা হরতুকি গাছে বসে। ওই যে ঢাকার শাঁখার দোকান, তার পেছনে গাছটা। মেরে ফেলেছে। এবার কেটে ফেলবে। চারটে গুমটি হবে। কাউন্সিলর টাকা খেয়ে বসে আছে। কিসসু খবর রাখো না। বিকেল থেকে

ওভারব্রিজের মাথায় বসে রেল কলোনির মদের দোকানের ভাষণ শুনি। সন্ধের ট্রেনে তোমাকে নামতে দেখে হরতুকির ডালে আসি। সেখান থেকে তোমার ভাষণ।

বেশ করো। বিনোদ বলে। কাজ নেই, কম্মো নেই! আর—একটু এগিয়ে ঝিলে গেলে পারো। মাছ আছে। অনেক পুরোনো। প্রথম লোকসভা ভোটের সময়কার। খপ করে ধরে কাঁচা খাবে।

কাঁচা খাব কেন? রান্নাঘরে রেখে আসব। তোমার বউ রেঁধে দেবে।

বউ তুলে কথা বলবে না। বিনোদ বলে।

সঙ্গিনী হাসে, ইস, কী দরদ! মরে যাই!

ক বার মরবে?

মরলে তোমার ঘর গোছাই কী করে? দোতলার মাঝের ঘরটা গুদাম করে রেখেছিলে। গিয়ে দেখো। চিনতে পারবে না। কী ছিল? হেগে—মুতে... সরি!

দুটো ধাক্কা খায় বিনোদ। দুটো নয়, তিনটে।

পুরসভা বাম্প বানিয়েছে। ফট করে বেপট উঁচু। পাশের ল্যাম্পপোস্টে চিরস্থায়ী অন্ধকার। প্রথম ধাক্কা সেখানে।

দ্বিতীয় ধাক্কা। বউ যদি কোনো কারণে দোতলায় উঠে গোছানো ঘর দেখে। কে করল পরিষ্কার? কে গোছালো? এ তোমার কাজ নয়। তোমাকে এতকাল দেখছি। বলো, কার কাজ? কে এসেছিল? তো নারীকণ্ঠের চিল্লানি শুনে রসের গন্ধে পাড়ার লোক ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিশ্চয় এক্সট্রা মেয়েমানুষ কেস। উদাস উদাস ছিরুদাস সেজে থাকে। কেঁপে ওঠে বিনোদ।

তৃতীয় ধাক্কা, হেগেমুতে....। যে গলা 'কেন যামিনী না যেতে জাগাতে না' গেয়ে আবিষ্ট করে, যে গলা 'এখুনি কি হল তোমার যাবার সময় হায় অতিথি'—র জিজ্ঞাসায় অন্তর্মুখর করে তোলে, যদিও সে—সব মুহূর্তের মুখ দেখতে পায় না বিনোদ, শুধু শোনে, সেই গলায় ওই শব্দটা দুর্গন্ধের মতো লাগে।

ডেঙ্গির মৃতদেহ বেরিয়ে এল একা। একটা গলি থেকে। শুধু চালক, সৎকার সমিতির গাড়ির। গাড়ি জুড়ে ব্লিচিং—প্রতাপ। গলি থেকে একটু দূরে টুলে দাঁড়িয়ে দেওয়াল ধরে ভাষণ দিচ্ছে কাউন্সিলর। সে—ও একা।

তোমাদের এখানে উন্নাইন হয়নি। সঙ্গিনী বলে। বিনু, ডেঙ্গি সম্পর্কে তুমি কিছু বলবা না?

অ্যাই, ভাট বকা বন্ধ করো তো। নিজেকে খুব চালাক ভাবো? উন্নয়ন বলতে কী হয়? বিনোদ বলে।

আসলে কী জানো, আমাদের পাড়ায় ডেঙ্গিতে মারা গেলে মেয়র আসে। পাঁচটা ধর্মগ্রন্থ থেকে আট—দশ লাইন করে মুখস্থ বলে। তারপর বলে, মা—বাবাদের সচেতন হতে হবে। নিজেদের সংযত করতে হবে। তারা এমন কিছু করবে না যাতে সন্তানরা বিপথে যায়। সন্তানরা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাই তো কবি বলেছেন, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। এই যে দুধভাত এটা তো আমিই দিচ্ছি। দিনরাত কাজ করছি। ডেঙ্গি প্রাচীনকালেও হত। রবীন্দ্রনাথ ডেঙ্গির ভয়ে ইংল্যান্ডে পালিয়েছিলেন। ডেঙ্গি আমাদের ভূত, ডেঙ্গি আমাদের ভবিষ্যৎ। উন্নয়নে কেউ বাধা দিতে পারবে না। তো মেয়র বলে কথা, তাকে অমান্য করি কী করে? আমাদের পাড়া পশ এলাকা। রোজ কাগজে থাকে।

এবার চুপ করো, চুন্নি! বাড়িতে ঢুকব। অনেক ভ্যাক ভ্যাক হয়েছে। আমি একটা ভদ্রলোক। পাড়ায় আমার মান—সম্মান আছে। বাড়িতে বউ আছে। তার সঙ্গে আমার দায়িত্বশীল সম্পর্ক। বিনোদ বাড়িতে ঢোকার আগে গ্রিলের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে।

বাড়ি থেকে কয়েক হাত দূরে একদল কুকুর উৎকট চিৎকার জুড়ে দেয়। কুকুরগুলো বিনোদকে চেনে। তাকে দেখে চেঁচানোর কথা নয়। সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাকে দেখতে পেল নাকি? গন্ধ পেল? কুকুরগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে আসে। বিনোদের দিকে মুখ তুলে চেঁচায়।

সঙ্গিনী বলে, সব কটা মেয়ে কুকুর, খেয়াল করেছ? তোমাকে বিপজ্জনক ভাবছে না তো? এ সময় ওদের খুব প্রেম হয়। না না, একটা ছেলে কুকুর আছে। থাক, ওদিকে তাকানোর দরকার নেই। দেখো, পূর্ণিমার

চাঁদ যেন খাগড়ার কাঁসার থালা।

গ্রিলের গেটে শব্দ হয়। বিনোদ বলে, তোমাকে পেটাব।

অ্যাই, আরেকবার চুন্নি ডাকবে? ডাকো না, প্লিজ! একবার। সঙ্গিনী বলে।

কে? কে এলো? কুকুরগুলো চেঁচায় কেন? বেপাড়ার কুকুর ঢুকেছে নিশ্চয়। বিনোদের বউ, সঞ্চিতার গলা শোনা যায়।

শাঁকচুন্নি! বিনোদ আবছা করে ডাকে।

এবার বউয়ের কাছে যাও। আদর খাও। দেরি কোরো না যেন। আমি ওপরে যাচ্ছি। শরীর শরীর, তোমার সেক্স নাই, বিনু? সঙ্গিনীর ফিসফিসানি শুনল বিনোদ।

সঙ্গে কে এল আবার? কী চায়? মনসা পুজোর চাঁদা? ও আমি দিয়ে দিয়েছি। তুমি দাতাগিরি করতে যেয়ো না। অন্য পাড়ার পুজোয় আমরা চাঁদা দিই না। এখন যাও তো বাপু! সবে বাড়ি ঢুকল লোকটা। উৎপাতের একশেষ। বলি, শশা এনেছে? না আনলে, কাল সকালে মুড়ির সঙ্গে শশা পাবে না। ঘড়ির দোকানে গিয়েছিলে? এ একটা দোকান হয়েছে বটে। সব ঘড়ি মড়া। আমার চালু ঘড়িটাও মেরে ফেলল। তোমারও আর দোকান জোটে না! আমার যেমন কপাল। অযোধ্যা ইস্ত্রির দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার প্যান্ট—শার্ট ছ টাকা। শাড়ি নেবে কুড়ি টাকা। তাও স্রেফ ইস্ত্রি। বিরজুর বউ কত নেয় খোঁজ নিয়ো। অবশ্য তোমাকে বলা যা, দেওয়ালকে বলাও তাই। সঞ্চিতা থামে। কিংবা হয়তো আরও পরে থামত।

বিনোদ বলে, আমার সঙ্গে কেউ আসেনি। ওপরে যাচ্ছি। যা গুমোট সারাদিন। খুব ঘাম হয়েছে। স্নান করতে হবে। আমার হলে তোমাকে চা বসাতে বলব।

সঞ্চিতা পারতপক্ষে ওপরে ওঠে না। কিন্তু, যদি কোনো কারণে ওঠে। কোনো খেয়ালে। কোনো প্রয়োজনে। উঠতেই পারে। সেক্ষেত্রে ওকে বারণ করার প্রশ্নই ওঠে না। একবার যদি উঠে পড়ে, সর্বনাশ। জুতো খুলে, সঞ্চিতা যে ঘরে বসে আছে, সেখানে উঁকি মেরে বিনোদ বলল, আজ অসম্ভব গুমোট। গা দিয়ে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। স্নান না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। চট করে চলে আসব।

এত কথা বলতে হল সঞ্চিতাকে স্বাভাবিক রাখতে। আসলে বিনোদ ভীষণ নার্ভাস ফিল করছে।

দরজা খুলে, আলো জ্বালতেই, আরেব্বাস! এ তো মলের বইয়ের দোকান। পরিপাটি, নিখুঁত সাজানো। কী করে হল? বিনোদের এই ঘরে হাজার খানেকের ওপর বই আছে। ঘর অনুপাতে অসম্ভব বেশি। শেয়ালদা স্টেশনে পঞ্চাশ দশকের উদবাস্তুদের ভিড়ের মতো। বনগাঁ লোকালের ভিড়ের মতো। কাটোয়া লোকালের ভিড়ের মতো। আলমারিতে জায়গা নেই। দাঁড় করিয়ে রাখা বইয়ের মাথায় শোয়ানো অনেক। জানালার নীচে একটার ওপর একটা চাপিয়ে গাদা করে রাখা বিস্তর। আলমারিদের মাথায় প্রায় রোজ চাপছে। চাপতে চাপতে ছাদ ছুঁয়ে ফেলার উপক্রম। মাটিতে ডাঁই করে রাখা বেশ কিছু। চলার সময় পায়ে ঠোক্কর লাগে। যে বইটা দরকার সেটা খুঁজে না পাওয়াই এই গুদামের দস্তুর। বিনোদ যতবার গোছাতে গিয়েছে ততবার অগোছালো হয়েছে। সেই গুদাম এমন শোরুম, কী করে হল? এত বই কোথায় গেল? ফেলে দিল কি?

চাপা গলায় বলে, ঘর সাজাতে গিয়ে বই ফেলে দিয়েছ কি?

পাগল! সব বই ঠিক জায়গায় আছে। একবার দেখে নেবে পুরোটা। আর ভুল হবে না। নিজে এলোমেলো না করলে যখন যে বই দরকার, পেয়ে যাবে। পাশের ঘর থেকে জবাব ভেসে এল।

শোনো, এ ঘরে এসো। নীচে বউ শুয়ে আছে। টিভি দেখছে না। কানে যেতে পারে। বিনোদ বলে।

তোমাকে আগেই বলেছি, আমার কথা তুমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না। আমাকে বিশ্বাস করো না। আর বউকে ভয় পাও। গলায় একটু বকুনির সুর পেল বিনোদ। এই এলাম। বলো।

যে জায়গা থেকে স্বর এল, সেখানটা শূন্য। ডানদিক শূন্য। বাঁদিক শূন্য। দরজা শূন্য। জানালা শূন্য। ছাদ শূন্য। বইয়ের ভিড়ে জানালা চাপা পড়েছিল, এখন আকাশ আসছে। শূন্য।

আমাকে ডাকো।

চুন্নি!

না না, ওই নামে, শাঁকচুন্নি। আদর করে ডাকো। ঘর সাফাইয়ের মজুরি দেবে না? আমি তোমার কাছে বেশি কিছু চাইনি, বিনু!

আমার শাঁকচুন্নি! এসো, আমার কাছে এসো। আমার চুন্নি, আমার মুন্নি, আমার বুন্নি। বিনোদ আপ্লুত। যে তার বই ভালোবাসে, সে তাকে ততটাই ভালোবাসে। আমার শাঁকচুন্নি!

উমমম।

বউয়ের জবরদস্ত গলা আসে। কী গো, এখনও স্নানে গেলে না? বাথরুমে জলের শব্দ শুনছি না কেন? কী করছ ওপরে? কী হচ্ছে?

বিনোদ বলে, ঘামটা শুকোচ্ছি। এই যাব। এখখুনি হয়ে যাবে। যা গুমোট সারাদিন।

তুমি বউকে সত্যি খুব ভয় পাও।

বউকে নয়, আমাকে। চেঁচামেচি জুড়ে দিলে আমার কিছুই করার থাকবে না। কাউকে কিছু বলতে পারব না। বললে শয়তান ভাববে।

বাথরুমের কল খুলে দাও। জলের শব্দে ঠান্ডা থাকবে। একটু গান গেয়ে নাও। বাথরুম সং। এ মণিহার আমার নাহি সাজে বা যায় যায় দিন বসে বসে দিন। বউ বুঝবে স্নান করছ।

বিনোদ জিজ্ঞেস করে, তুমি খুব ফাজিল। পাজিও। বাথরুমে ঢুকবে না তো?

তুমি চাইলে ঢুকতে পারি। জলের শব্দের ভেতর গল্প করব।

বিনোদ বলে ওঠে, না না। প্লিজ, বাইরে থাকো। আমি এখখুনি বেরিয়ে আসব। প্লিজ, চুন্নি!

লজ্জা পাচ্ছো? থাক তবে। ভেবেছিলাম....। বাদ দাও। তোমার বউয়ের নামে সেভিংস স্কিমের গন্ধ। চিটফান্ডের গন্ধ।

হা হা হা হা। হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে বিনোদ। পাজি কোথাকার! সঞ্চিতা একটা বিখ্যাত বইয়ের নাম।

বউয়ের গলা শুনতে পায় বিনোদ। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বলছে। ওপরে কী হচ্ছে?

বিনোদ জবাব দেয়, কী হবে? সুভাষদা ফোন করেছে। ফরেস্ট বাংলোর ব্যবস্থা হল। নভেম্বরে। তুমি কথা বলবে?

পরে বলব। কোথায় হল? সস্তা হবে তো? দেখো না, সরকারি গাড়ির ব্যবস্থা যদি করতে পারে। ওপরমহলে ওঁর হাত আছে।

বাঃ, ভালোই গুল মারতে পারো। যাও, বেচারা অনেকক্ষণ ডাকছে। কাপড় বদলে নাও। আমি বাইরের ঘরে আছি।

তুমি যে বাইরের ঘরে কী করে বুঝব? শাঁকচুন্নি, আমার সঙ্গে মজা? বিনোদ বলে।

একটু পরেই শুনতে পায়, বাইরের ঘর থেকে ভেসে আসছে 'বিরহ বড়ো ভালো লাগে'।

পায়জামা পরে বিনু। গেঞ্জিও বের করল। এই গরমে পরতে ইচ্ছে করছে না। তবু পরল। চুন্নি আছে।

বিনু, একটা কথা বলব?

বলো।

আমার জন্য এক কাপ চা আনা সম্ভব হবে? ভীষণ ইচ্ছে করছে। পীযূষের সঙ্গে কত রাতে দূর দূরের ধাবায় যেতাম ঘন দুধের চা খেতে। পীযূষ মশলা চা চাইত। দিনগুলো হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। আলো নিভে গেল। সব ভালোবাসা একদিনে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল। পীযূষ মানে একটা আনলিমিটেড স্পিরিটি। ক্লান্তি নেই। ঘুম নেই। মনখারাপ বলে কিছু নেই। ওর সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। অথচ ওকে ভালো না বেসে থাকা যায় না। সরি, আবোলতাবোল বকলাম। মনে পড়ল তাই। আমি কী বোকা! তুমি কীভাবে আমার জন্য চা আনবে? কী বলবে বউকে?

বিনোদ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। ভাবল। বলল, দেখি, পারি কি না। মনে হচ্ছে পারব। সঞ্চিতা জানে, আমি চা খেতে খুব ভালোবাসি। বড়ো কাপে চা আনব। নিজে করে নেব। বলব, আর কিছু লাগবে না। টিফিন বানাতে হবে না। ওর খাটনি বেঁচে যাবে। হয়তো জানতে চাইবে, অফিসে খেয়েছি কিনা। বা অন্য কোথাও। কী খেয়েছি। এর বেশি নয়। সুতরাং তোমার চা আসছে, শাঁকচুন্নি। ওপরে কাপ আছে।

নীচে নেমে বিনোদ দেখে, সঞ্চিতা সিরিয়ালে ডুবে। এ সময় ওকে ডাকলে বিরক্ত হয়। সিরিয়াল ছেড়ে উঠতে হলে থমথমে মুখ, কোঁচকানো ভুরু, নাক। বিনোদ বলে, শুধু চা খাব। নিজে করে নিচ্ছি। নীরেনদার মেয়ে দারুণ রেজাল্ট করেছে। চিকেন প্যাটিস আর জলভরা খাওয়াল। ভীম নাগের জলভরা। অনেক কাল বাদে। ডিপার্টমেন্টের সবাই খেলাম।

সিরিয়াল চলছে। কোনো এক বয়স্ক মহিলা হয়তো ছোটো বউয়ের পক্ষ নিয়ে অশান্তি বাধিয়েছে। সঞ্চিতার প্রতিক্রিয়া শোনা গেল। ছোটো বউ বড়োলোকের বাড়ির মেয়ে বলে যা খুশি করবে? বড়ো বউটাই বা কী...! বড়ো কাপে চা বানিয়ে দোতলায় উঠে যায় বিনোদ।

গুদাম থেকে শো—রুম হয়ে ওঠা বইঘরে জানালার পাশে খালি কাপ চোখে পড়ে বিনোদের। বলে, তুমি কোন ঘরে?

জবাব শোনে, কাপ ধুয়ে রেখেছি। তুমি ঢেলে দাও। আমি নিয়ে নেব। বাইরের ঘর থেকে গলা এল সম্ভবত।

বিনোদ চা ঢেলে চেয়ার টেনে বসে। জানালা থেকে কাপটা উঠে ভাসতে থাকে। ভাসতে ভাসতে, দুলতে দুলতে কাত হয়, সোজা হয়।

ভালো হয়েছে। বেশ ভালো। তার মানে, চা বানানোর অভ্যাস তোমার আছে। পীযূষ ছিল ঠিক উলটো। ওর সব আসবে দামি রেস্তোরাঁ থেকে। জলও। চা খাবে? চলো প্লাজা বা ধাবা। আমাদের কাজের মেয়েটির সত্যি কোনো কাজ ছিল না। মাসের অর্ধেক দিন রান্না নেই। ঘর গোছানোর কাজ আমার হাতে। অন্য কারও কাজ পছন্দ হয় না। মেয়েটি আমার সঙ্গে বাজার যেত, নাটক দেখতে যেত। চায়ের কাপ ভাসে, দোলে। বিনোদ অনুমান করে চুন্নি দেওয়ালে হেলান দিয়ে আছে।

বিনোদ হঠাৎই প্রশ্ন করে বসে, তুমি আর পীযূষবাবু তো একসঙ্গে...

হ্যাঁ, তুমি যা জানতে চাইছ, বলছি। ওই রাধানগরের দিকে। আমরা ফুলকুসমা থেকে ফিরছিলাম। পীযূষ ড্রাইভ করছিল। রাশ ড্রাইভিং ওর নেশা। রাত আটটা সাড়ে আটটা হবে। হঠাৎ উলটো দিক থেকে একটা ট্রেলার। ভুলটা পীযূষেরই। ওভারটেক করছিল। বেরোতে পারেনি। দুটো বিশাল গাড়ির মাঝখানে পড়ে চিড়েচ্যাপটা। ক্র্যাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ও মারা যায়। আমি লোকাল হেলথ ক্লিনিকে আধঘণ্টা পর। আমাদের কথা ছিল, একসঙ্গে মারা গেলে, পরেও একসঙ্গে থাকব। আমার লেট দেখে কিংবা আমি বেঁচে যেতে পারি ভেবে ও পুরন্দরপুরে আত্মঘাতী একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে চলে গেল। মেয়েটাকে ধর্ষণ করেছিল চারটে শয়তান। লজ্জায় ফাঁসি দেয় মেয়েটা। আমি খবর পেয়েছি। তবে পুরন্দরপুরে আর যাইনি। কারণ, মরার পরে মেয়েটা একটু শান্তিতে থাকুক। পীযূষ ওকে খুব ভালোবাসবে।

ফাটাফাটি গল্প। শিরোনাম, মরণের পরে। বিনোদ বলে, তা শাঁকচুন্নিদেবী, আপনি আমার কাঁধে চাপলেন কেন? কী মনে করে? এত র‍্যাশনাল মহিলা আপনি, আপনার স্বামীর কাছে অন্য মেয়ে শান্তিতে ভালোবাসায় থাকবে, এটা বোঝেন। আর, আমার একখানা আস্ত জলজ্যান্ত স্ত্রী এবং হাড্ডিচোষ সমাজ আছে জেনেও শান্তিতে থাকতে দেবেন না আমাকে? কী অপরাধ করলাম?

শিশুকণ্ঠের মতো কলকল হাসিতে ভরে যায় ঘর। বাইরের ঘর থেকে হাসিটা এল। কাপটা জানালায়। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বাঙাল মহাশয়, আপনি দেখিতে যেমন বোকার মরণ, আদতেও তেমনই। আমি আপনার ঘাড়ে চাপি নাই। সঙ্গী হইয়াছি মাত্র। আপনার এমন কোনো গুণ নাই যে আমি আপনার স্কন্ধাসীন হই। শুধু শরীর শরীর, তোমার সেক্স নাই, বিনু!

বাইরের ঘরের মেঝেয় চেয়ার ঘষটানোর শব্দ হল।

তোমার বেতের চেয়ারটা সত্যি বেশ নরম, আরামদায়ক। হ্যাঁ, তুমি জানতে চাইতেই পারো, এত লোক থাকতে তোমার সঙ্গী হলাম কেন? পীযূষ ওই বাচ্চা মেয়েটার কাছে চলে যাওয়ায় কষ্ট পেয়েছি, সত্যি কথা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তখুনি একটা পুরুষ ধরে পীযূষকে দেখিয়ে দিতে চাই। আমি হরিণখালি, মহিষডোবা, দ্বারবাসিনী, কাঁসারিপাড়া, চন্দননগর ইত্যাদি এলাকায় উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দেখলাম যে—জীবনে আমি কিছুদিন আগেও ছিলাম, সেখান থেকে আজ কত দূরে। যে—জীবনে থেকেও আমি জীবন দেখিনি, সেটাও দেখলাম। যাদের হাতে দেশ চালানোর ভার, তারা দেশের কথা ভাবে না, দেশের মানুষের সর্বনাশের কথা ভাবে। এরা কী ডেঞ্জারাস বলে বোঝানো যাবে না। আমাদের পাড়ার মেয়রকে দেখেছি, এরা মেয়রের সাতগুণ বাপ! বড়ো বড়ো বাড়ি দেখে জানালা দিয়ে ঢুকে পড়তাম আর শুনতাম কীভাবে ডিল হচ্ছে, ফিক্সিং হচ্ছে, আবার বাণী বানানো হচ্ছে। খুব রাগ হত। মনও খারাপ হত। ঠিক করলাম এই সব পাপের ঘরে আর ঢুকব না। ছাদে বা চিলেকোঠার মাথায় বসে থাকি। চাঁদ দেখি, তারা দেখি। গাছ তো প্রায় শেষ। পাখিদেরও ঘর জোটে না। এ সময় একটা জিনিস আবিষ্কার করি। বিশ্বাস করো, আমার গলায় কোনোদিন গান ছিল না। হঠাৎ গান এল। এল যখন, ঝরনার মতো। এক রাতে, চন্দননগরে পাকড়াশিদের বাড়ির ছাদে গেয়ে উঠলাম 'যখন এসেছিলেন, অন্ধকারে চাঁদ ওঠেনি, সিন্ধুপারে চাঁদ ওঠেনি'। জানি না কীভাবে এল, পীযূষের জন্য মন খারাপে নাকি দেশের জন্য দুঃখে? জানি না। তবে কষ্ট থেকে গান এসেছে, এটা বুঝি।

বিনোদ বাধা দিয়ে বলে, এ তো বড়ো গল্প। গ্যাটিস দিয়ে উপন্যাসও হতে পারে। নীতিকথা আছে। সরকারি পুরস্কার মেলার চান্স আছে।

ইয়ারকি হচ্ছে? ডাকব সঞ্চিতাকে? সত্যি কথা মানুষ বিশ্বাস করে না।

এও তো একটা বাণী, চুন্নি!

শোনো, তোমাকে দেখি ভদ্রেশ্বর স্টেশনে। টিকিটঘরের পাশে ব্রিটিশ আমলের চাতালে। এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলে। অমলতাস গাছে বসে তোমার কথা শুনতে থাকি। বাঙালির সব ছিল, সব গেছে/বাঙালি জানে না তাদের কী ছিল, কী হারিয়েছে/বাঙালি আগে কখনো এত গরিব ছিল না/কখনো এত অসহায় অপদার্থ ছিল না/একটি জাতির এভাবে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম/এরপর কি আমরা শেষ হয়ে যাব ইত্যাদি বলছিলে। মনে হল লোকটা খারাপ নয়। বয়স হয়েছে, তবে ভাবতে জানে। বাঁধা বুলির লোক নয়।

মাইরি! লিখে দেবে? এক কাপ চায়ে এত? এ জন্যই তো অসীমের দোকানে দাঁড়াই। বিনোদ বলে।

যা বলছি শোনো। কয়েকদিন ফলো করি। দেখি, একটু দুর্বলতা আছে। অল্পবয়সি মেয়ে দেখলে চুলবুল করে, কান্নি মেরে দেখে। ও ঠিক আছে। খেলার ক্ষমতা নেই।

কণ্ঠস্বর তাক করে খবরের কাগজ ছোঁড়ে বিনোদ। আস্তে। কোথাও ধাক্কা লেগে কাগজ পড়ে বেতের চেয়ারে। তার মানে ওইখানে আছে। দেখা যাচ্ছে না।

সেই থেকে কয়েকদিন হল আছি তোমার সঙ্গে। তোমার ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছি। হাতের কাছে বই এনে রেখেছি। অন্য ফাইলে ঢুকে যাওয়া নোটবই ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছি। হারিয়ে যাওয়া লাইন মনে করিয়েছি। তুমি বুঝতে পারোনি।

বিনোদের মনে পড়ে। গত কয়েকদিন সত্যি সে কাজের জিনিস দরকারের সময় হাতের কাছে না পেয়ে পাগল পাগল হয়ে যায়নি। ভেবেছে, নিজে বোধ হয় গোছানো হয়েছে। সে ডাকে, চুন্নি! আমার শাঁকচুন্নি!

নীচ থেকে ডাক আসে সঞ্চিতার, তোমার খাবারটা নিয়ে যাবে। কাল ভোরে আমাকে উঠতে হবে। ঠাকুরমশাই বলেছেন...

যাচ্ছি। বিনোদ জানায়। তুমি কি আমার সঙ্গে খাবে চুন্নি!

আমিষ আমার চলবে না। তুমি খেয়ে নাও। এই ফাঁকে আমি সদানন্দধাম থেকে দুধ—খই খেয়ে আসি। ওখানে আমাদের ব্যবস্থা আছে। রাতে হালকা খেলে সুস্থ থাকা যায়।

এখুনি আসবে তো? বিনোদ জিজ্ঞেস করে।

নিশ্চয়। ঘাড়ে যখন চেপেছি...

বইয়ের জানালার আকাশে একটা আলো উড়ে গেল।

একা বসে খাওয়া বিনোদের অনেক দিনের অভ্যাস। এ সময় সে কোনো ক্রাইম সিরিয়াল দেখে। আজ ভুলে গেল। ভূতে সে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করতে চাইল। অনেকগুলো কবে ও কে ভিড় করে এল মনে। যেন মনে হল, একটা আঁচল সরে গেল? যেন দেখল ভেজা তোয়ালেটা চেয়ার থেকে জানলার গ্রিলে মেলে দিয়েছে? যেন মনে হল পুবের জানালায় দেওদারের ওপার থেকে তাকে লক্ষ করছে? যেন দেখল বিছানা পরিষ্কার, বই নেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে, ডায়েরি ফাইল গোছানো? হঠাৎ বিদ্যুৎ গোলযোগে মোম খুঁজে জ্বেলে দিয়েছিল টেবিলে? প্রথম শুনল 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে,/চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে।/ হে অজানা তোমায় তবে বুঝেছিলাম অনুভবে...'? বাইরের ঘর থেকে ভেসে আসছিল। তখন মধ্যরাত। বিনোদ উঠে যেতেই গান চলে গেল। জানালার ওপারে পুকুর, পাড়ার আলো, কিছু ছায়া, মাঝখানে কাঁপতে—থাকা শূন্যতা, যেমন থাকে। কবে প্রথম বিনোদ ডাকল, শাঁকচুন্নি? মনে হয়, বহুদিন আগে ডাকটা ভেতরে জমা হয়েছিল। কবে চুন্নি বলল, শুধু শরীর শরীর, তোমার সেক্স নাই বিনু? কথাটা পাথর—চাপা ছিল অনেক যুগ।

ওপরে এসে বিনোদ দেখে মশারি টানানো হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরে সুর ভাসছে, 'এ পরবাসে রবে কে হায়'। বাইরে থেকে আলো আসছে। গুম গুম ডাকল দূরের আকাশ। একটা হাওয়া এল।

শুয়ে পড়ো।

তুমি কি আজও বাইরের ঘরে?

'কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে'—বাইরের ঘরে চলে গেছে চুন্নি।

বিনোদ ডাকে, চুন্নি!

শুয়ে পড়ো। মশা যেন না ঢোকে। সাবধান।

চুন্নি!

'তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায় রে'।

পাড়ার বেশিরভাগ বাড়ি বিছানায়। ভাঙা কথা আসছে একটা আধটা। কুকুর ডাকছে। দেওদার দুলছে বাতাসে।

তুমি জানালার দিকে ফেরো। এদিকে তাকাবে না। আমাকে দেখার চেষ্টা করবে না। ভয় পাবে। চুপ করে শুয়ে থাকবে। বাধ্য ছেলের মতো।

বিনোদ জানালার দিকে সরে গেল। জানালা দিয়ে দেখতে থাকল দেওদারে অন্ধকার দুলছে। চুন্নি মশারি তুলে ভেতরে ঢুকল। বালিশ নেই। শুয়ে পড়ল। ঠকঠক শব্দ হল। তেমন আপন কেহ নাহি...। ঘুমোও বিনু।

নাকে লাগে গানের গন্ধ, চুলের গন্ধ, ঠোঁটের গন্ধ, পিঠের গন্ধ, বুকের নিজস্ব ফলের গন্ধ, হাড়ের গন্ধ।

রসগোল্লার গাছ

শ্যামলকান্তি দাশ

পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টাও হয়নি এখনও। এরই মধ্যে নানা কাণ্ড। অদ্ভুত। বিদঘুটে। দেখতে দেখতে শিবনাথবাবুর চোখের পলক পড়ছে না। যত দেখছেন ততই অবাক হয়ে যাচ্ছেন। বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা ফুটছে না। এটা ঠিক কোন জায়গা তা এখনও ভালোভাবে জানেন না শিবনাথবাবু। জায়গাটাও কেমন যেন। ল্যাজা—মুড়ো কিচ্ছু নেই। আর এখানে আসার কারণটাই বা কী! গুরুতর কিছু? তাও স্পষ্টভাবে মনে পড়ছে না। চোখ কচলে, গলা ঝেড়ে, নেচেকুঁদে, পেশি ফুলিয়ে, দুটো মৃদু লাফ দিয়ে মনে করবার চেষ্টা করলেন। একবার নয়, অনেকবার। কিন্তু নাহ, কিছুই মনে পড়ল না। আর কেন যে এমন সব গোলমেলে কাণ্ড ঘটছে তা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তিনি।

মস্ত একটা ফুলপাতা আঁকা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিলেন শিবনাথবাবু। মাঝে মাঝে চোখ পাকিয়ে, ভুরু নাচিয়ে, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে নিজেকে ভেংচি কাটছিলেন। এটা শিবনাথবাবুর বহু বছরের পুরোনো অভ্যেস। নিজেকে নিয়ে মজা করতে বেশ লাগে। মনটা তরতাজা হয়ে যায়। কেমন যেন মিহি ফুরফুরে একটা ভাব জেগে ওঠে। নিজেকে কেমন যেন ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ মনে হয়। ভারি আমোদ লাগে তখন।

এই ভাব জেগে ওঠার জন্য কিনা জানি না, খুব পরিপাটি করে চুল আঁচড়াতে গেলেন শিবনাথ। কিন্তু এ কী! মাথার চুলগুলো কোথায় গেল! টেরি ঠিক করতে গিয়ে ঠক করে চিরুনি পড়ে গেল হাত থেকে। মাথাভরতি কোঁকড়ানো চুলগুলো যেন নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ কী গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক নাকি! মাথা আছে, কিন্তু মাথার ওপর যারা দিনভর দাপিয়ে বেড়ায় তারা ভ্যানিশ! একে ভোজভেলকি ছাড়া আর কী বলা যায়! মাথার এই দুরবস্থা দেখে ভয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন শিবনাথ। আর হ্যাঁ, তাঁর মাথাটাই বা কই? কাঠির মতো গর্দানের ওপর যেন একটা ঝুনো নারকেল বসানো। একটু টোকা দিলেই খসে পড়বে।

প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল। এখনও কিছু খাননি শিবনাথ। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। নাড়িভুঁড়ি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খাবেনই বা কী? দেবেই বা কে? কাকেই বা তিনি জানাবেন যে, তাঁর খুব খিদে পেয়েছে। এখন আর কিছু নয়, চাট্টি গরম ডালভাত আর আলুপোস্ত চাই তাঁর, আর সঙ্গে এক টুকরো গন্ধলেবু। আহা হা, এর তুল্য খাবার হয়? ভাবতে ভাবতে তাঁর জিভে জল এসে গেল। কিন্তু কাকে বলবেন এসব কথা! এ তো তাঁর সেই রাজনগর নয় যে যেমনটি চাই মুহূর্তের মধ্যে তেমনটিই পেয়ে যাবেন। বাড়িতে চাল ডাল নেই তাতে কী, হাওয়া খাও। মুহূর্তে পেট টইটম্বুর হয়ে যাবে। অমন নির্মল স্নিগ্ধ হাওয়া কি আছে এখানে!

রাজা নেই, রাজবাড়ি নেই কিন্তু গ্রামের নাম রাজনগর। রাজনগরের কথা মনে পড়তেই প্রাণটা আকুলি—বিকুলি করে উঠল। ছবির মতো গ্রাম। চারপাশে অজস্র গাছপালা, সবুজ। গাছে গাছে কত ফুল, রঙের কত বাহার, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। রাজনগরের মতো অত পাখি আর কোন গ্রামে আছে। ডাহুক, ঘুঘু, শালিক, বেনেবউ, চড়ুই, দুর্গাটুনটুনি। প্রতিটি পাখির ডাক চিনতেন শিবনাথ। বনের পাখি হলে কী হবে, প্রতিটি পাখির সঙ্গে তাঁর গলায় গলায় ভাব।

গ্রামের একপাশে ছোট্ট একটা নদী। আর নদীর নামটাও কবিতার মতো ভারি চমৎকার। কঙ্কাবতী। শান্ত আর নিরিবিলি। কাচের মতো ঝকঝক করছে জল। সন্ধেবেলা সেই নদীর ধারে বসে জলের সঙ্গে কথা

বলতে বলতে ঢেউয়ের গায়ে হাত রাখতেন। এই নদীর কাছেই গল্পের রসদ পেতেন শিবনাথ। এই নদীটা ছিল বলেই তো তিনি অতগুলো বই লিখতে পেরেছেন। আর এই রাজনগর গ্রামটা ছিল বলেই তো লোকজন তাঁকে অত খাতির করত। সভাসমিতিতে যেতেন, গলায় ফুলের মালা পরতেন, হাততালি পেতেন। এই গ্রামটা ছিল বলেই লেখক হতে পেরেছিলেন শিবনাথ।

আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে তো গল্পই লিখছিলেন শিবনাথ। একটা জমকালো ভূতের গল্প। সবে যখন একটু একটু করে গা—ছমছমে পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, গল্পের পাত্র—মিত্ররা এসে হাজির হচ্ছে, হঠাৎ শিবনাথবাবুর বুকে ব্যথা। প্রবল শ্বাসকষ্ট। একটু দূরে বসে খবরের কাগজ দেখতে দেখতে চা খাচ্ছিলেন অভিন্ন—হৃদয় বন্ধু হরিসত্য বসু। তাঁকে কিছু বলবার আগেই কুয়াশার মতো সব কেমন যেন ঝাপসা নিথর হয়ে গেল। রাজনগর, কঙ্কাবতী নদী, নদীর ধারে কুমোরপাড়া, লাল টালি ছাওয়া ইস্কুলবাড়ি, সবুজ ঘাসে ঢাকা মস্ত খেলার মাঠ, লেখার কাগজ, বন্ধু হরিসত্য সব যেন স্বপ্নের মতো। ছায়া—ছায়া। তারপর আর কিছুই মনে নেই শিবনাথের।

আবছা ভাবে এই ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই শিবনাথ আচার্যর বুকটা হু—হু করে উঠল। মনে হল চারদিকে কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। যতদূর চোখ যায় কেবল ফাঁকা আর শূন্য। চারপাশে জাঁকিয়ে বসেছে একটা নিরেট, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

আস্তে আস্তে আয়নার সামনে থেকে সরে এলেন শিবনাথ। এখন আর কোনোভাবেই তিনি শিবনাথ আচার্য নন, ভূতনাথ ভট্টশালী। তাঁর পিতৃদত্ত অমন সুন্দর, ভাবগম্ভীর নামটা এভাবে হারিয়ে যাবে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। শিবনাথের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

২

শিবনাথ।

শিবনাথ।

ও শিবনাথ...।

মনে হল কেউ যেন হেঁড়ে গলায় পেছন থেকে ডাকছে। চেনা গলা, অথচ ঠিক চেনা যাচ্ছে না।

কেউ যেন বারতিনেক শিবনাথ বলে ডেকেই চুকচুক করল। 'এই যাঃ, ভুলে গেছি তো। তুই তো আবার এখন শিবনাথ নোস। তোর কী যেন নতুন নাম হয়েছে না?'

কথাগুলো কেমন যেন ব্যাঙ্গের মতো শোনাল। সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা হাসি। খিক খিক। খিক খিক।

কিন্তু কোথাও কোনো উত্তর নেই। চারদিকে চুপচাপ। অনেক দূরে একটা ধুলোর ঘূর্ণি দেখা গেল। মনে হল গাছপাতা নড়ছে। হঠাৎ আবার সেই গলা, 'ওহ, তুই তো এখন ভূতো, মানে ভূতনাথ...'

এরকম একটা অচেনা—অজানা জায়গায় কে এমন ভাবে ডাকছে! আর এ তো নিছক ডাকা নয়, রীতিমতো তুই—তোকারি। তা ছাড়া তাঁর সুন্দর নামাটাকেও স্লেটের লেখার মতো জল দিয়ে যেন মুছে দিয়েছে।

লোকটা কে? হাতি—ঘোড়া, বাঘ—ভালুক, পণ্ডিত—গোমস্তা যেই হোক, আদপে লোকটা একটা বেয়াদপ। যাকে বলে ষোলো আনা বেল্লিক। ভব্যতার ধার ধারে না। সেই সঙ্গে বুকের পাটাও আছে বলতে হবে। তা না হলে এরকম একটা বয়সি লোককে কেউ কখনো তুই—তোকারি করে!

রাগে ফুঁসছেন ভূতনাথ। লোকটা কে? কোত্থেকে কথা বলছে? চারপাশে ন্যাড়া মাঠ। একটা ধান—গমের গাছ নেই। একটা কাঠফড়িং কিংবা বাহারি প্রজাপতি উড়লেও পরিষ্কার দেখা যাবে। এইতো তাঁর পায়ের সামনে দিয়ে একসার গুঁড়ি পিঁপড়ে যাচ্ছে। তাঁর বুড়ো আঙুলে কুট কুট করে কামড়াচ্ছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন। অথচ লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন না কেন? কেউ কি ফিচলেমি করছে তাঁর সঙ্গে? নাকি অদৃশ্য থেকে ভূত কথা বলছে? নাকি দৈববাণী হচ্ছে? এ তো মহা জ্বালা! তা হলে কি...চিন্তিত হয়ে পড়লেন ভূতনাথ। দেখা হলে লোকটাকে উচিত শিক্ষা দেবেন।

এরকম মনোরম বিকেলবেলায় মনে কোনো রাগ থাকে না, মনের কোথাও কোনো দুঃখ জমতে পারে না। নিজেকে বেশ হালকা, ভারহীন মনে হয়। মাথার ওপর নীল আকাশ। পালকের মতো টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে—ওখানে। সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। সূর্যটা কি ডুবে গেল? কে জানে। একটুও রোদ নেই। মিষ্টি হাওয়া লাগছে গায়ে। দূরে দূরে বুনো গাছের ঝোপ। অদ্ভুত রঙে বিচিত্র সব ফুল ফুটে আছে। ঝিলমিলে, চোখ ধাঁদানো তাদের বাহার। মাথার ওপর দিয়ে ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ করে কয়েকটা পাখি উড়ে গেল।

এরকম পরিবেশে যে—কোনো লোকেরই মাথায় ভাব এসে যায়। ভূতনাথেরও এল। প্রথমেই দুটো দুর্দান্ত লাইন। মন ভালো হয়ে যায়। তারপরের লাইনটা তেমন জমল না। একটু জোলো হয়ে গেল। পানসে আমের মতো। চতুর্থ লাইনটা বেশ ওজনদার হওয়া চাই—তবেই না কবিতাটা দাঁড়াবে!

হাঁটতে হাঁটতে এই চতুর্থ লাইনটা ভাবছিলেন ভূতনাথ। একটা দুর্দান্ত লাইন চকিতে এসেও গিয়েছিল মাথায়—'খোলা আকাশের তলে ক্রীড়া করে বৈকালের ফুলগাছ'। কিন্তু 'ক্রীড়া' আর 'বৈকাল' শব্দ দুটো এখনকার দিনে একেবারেই অচল। পছন্দ হচ্ছিল না ভূতনাথের। 'বৈকাল' শব্দটা কেটে 'মধ্যাহ্ন' লিখবেন কিনা ভাবছিলেন, হঠাৎ আবার কে যেন খিকখিক করে হেসে একটা ছড়া কেটে উঠল:

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে,

মরল তাঁতি হেলে গোরু কিনে।

মানে?

মানে কী এসব কথার? কে তাঁকে এইসব হাসিঠাট্টা করছে? অনর্থক তাঁর কবিতায় বাধা দিচ্ছে কোন বজ্জাত? রাগে আকাশের দিকে ঘুষি পাকালেন ভূতনাথ।

'দূর, দূর, ওটা কি কোনো পদ্য হল রে!'

'পদ্য নয়! এটা তাহলে কী?'

'ওটা তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু। ওটা একটা ছাই।'

'ছাই! তার মানে?'

'ছাই মানে ছাই। মানে পাঁশ। মানে ধুলো। মানে ফক্কা।' হেসে উঠল অদৃশ্যকণ্ঠ।

ভূতনাথের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। বেল্লিকটাকে নাগালের মধ্যে পেলে কান ধরে ওঠবোস করাতেন। নাকে খত দেওয়াতেন। কাব্য ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটানো যে রীতিমতো অপরাধ তা ভালোমতো বুঝিয়ে দিতেন।

'ছাই মানে বোঝো না? গবেট কোথাকার! যার ল্যাজাও নেই মুড়োও নেই তাকে ছাই ছাড়া আর কী বলব? দূর দূর, ওসব ছাতামাথা লিখিস না। কেউ পড়বে না।'

'বেশ করব লিখব। আলবাত লিখব। একশোবার লিখব। হাজারবার লিখব।' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন ভূতনাথ।

'না লিখবি না।'

ভূতনাথ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, ধমকে উঠল অদৃশ্যকণ্ঠ। 'এটা তোর রাজনগর নয় যে যা—খুশি করবি। এখানে এসব চলে না। আর একটা লাইন লিখেছিস কি মটাত করে ঘাড় মটকে দেব।'

ক্রোধে প্রায় জ্বলে উঠলেন ভূতনাথ, 'দেখা যাবে কে কার ঘাড় মটকায়। এতক্ষণ কিছু লিখিনি, শুধুই ভাবছিলাম, এবার সত্যি সত্যি লিখব।' তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'বলে কিনা লিখবি না! তুমি বলার কে হে! চেনা নেই শুনো নেই, উপদেশ দিতে এসেছে। এতদিন গপ্পো লিখেছি, এবার পদ্য লিখব। দেদার পদ্য। লিখব আর হাওয়ায় ওড়াব। চৈত্রমাসের আকাশে উড়বে শিমুল তুলোর মতো। ফুরফুর। ফুরফুর। আহা হা, এই মজার কোনো তুলনা হয়?'

হঠাৎ শিবনাথকে কেউ যেন একটা চিমটি কাটল আড়াল থেকে। কাউকেই ধারেকাছে দেখা গেল না।

যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে কিছু একটা বলতে গেলেন ভূতনাথ। সঙ্গে সঙ্গে মুখে একটা আলতো চাপড় এসে পড়ল, 'উহুঁ, কথাটি নয়, কথাটি নয়। কথা বললেই বিপদ।'

ভূতনাথ একটু নীরব থেকে রহস্যটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আবার সেই বিদ্রূপ মেশানো খিকখিক হাসি, 'বলি, লিখছিস লেখ। কত লোকই তো লেখে, তুইও লিখবি, এতে আপত্তির কী! কিন্তু বাপধন, ছন্দ—টন্দ ঠিক করে লিখতে হবে তো। ভাষা পরিষ্কার হওয়া চাই। ভাব সাফ—সুতরো হওয়া দরকার। মগজ তালগোল পাকানো হলে চলবে না, খোলামেলা পদ্য পড়বে কে শুনি?'

বলতে বলতে টকাং করে একটা গাঁট্টা পড়ল শিবনাথের মাথায়। শিবনাথের চোখে জল এসে গেল। এইসব অপমান আর খুচরো প্রহার তাঁকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। 'মাইকেলের কথা ভাব তো একবার। কী লেখা লিখেছিল লোকটা। পারবি অমন লিখতে—

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—তা সবে, (অবোধ আমি)। অবহেলা করি, পর—ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি... লিখতে হলে এইরকম লিখতে হয়রে ব্যাটা। রবিঠাকুর রবিঠাকুর করে খুব তো গলা ফাটাস। পঁচিশে বৈশাখ এলেই তোদের আহ্লাদের সীমা থাকে না। পারবি ওই বুড়োর মতো একটা লাইন লিখতে? ওই যে রে, একটা পদ্য আছে না—

ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল।

ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল।

লেখ না এরকম পদ্য। বুঝব হাড়ে জোর আছে। পদ্য নিয়ে তোর কোনো পরিষ্কার ধারণাই নেই। তোর ভাবনা অস্পষ্ট। ভাষায় ছানি পড়েছে। কথাগুলোয় মনে হয় কফ জমেছে।'

ভাষায় ছানি পড়েছে! বলে কী মূর্খটা! খোলা আকাশের তলে ক্রীড়া করে বৈকালের ফুলগাছ—ক—জন ভাবতে পারে এরকম! ক—জনের মগজে আসে এরকম ভাবনা!

এবার হাসির শব্দ তুমুল হয়ে উঠল, 'তোকে আগেই তো বললাম, ওটা পদ্য নয়, ছাই। ভস্ম। যে লাইনটায় তুই গলদঘর্ম হচ্ছিস, সেটা এইভাবেই তো ভাবতে পারিস—'আকাশের নীচে সাদা হয়ে আছে রসগোল্লার গাছ'। ব্যস, 'বৈকাল'ও রইল না, আর 'ক্রীড়া'ও রইল না। ল্যাটা চুকে গেল।'

'তা না হয় হল,' আপন মনে আবার বলে উঠলেন ভূতনাথ, 'কিন্তু পরের লাইনটা আবার কীভাবে আসবে? সে তো মহা সমস্যার ব্যাপার রে বাপ।'

''আরে বোকা, বেকুবরাম, সমস্যা মনে করলেই সমস্যা। সমস্যা বলে সংসারে কিছু আছেরে পাগলা? সমস্যা ছাড়াই তো চাঁদ—সুয্যি উঠছে, ফুল ফুটছে, পাখি ডাকছে, বিয়েবাড়িতে লোক পাতপেড়ে কবজি ডুবিয়ে খাচ্ছে, এঁদো গাঁয়ের নাম হয়ে যাচ্ছে রাজনগর—আরে ব্যাটা, সংসারে সমস্যা বলতে কিচ্ছুটি নেই। ওসব তোদের মনের ভুল। যাকে বলে বিভ্রম। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।' হেসে উঠল অদৃশ্য কণ্ঠ।

এসব কথা মানে কী! এ তো কথা নয়, দার্শনিকের উক্তি। সাধুসন্তের মুখনিঃসৃত বাণী। এমন উদ্ভট, সৃষ্টিছাড়া কথা তো আগে কখনো ভূতনাথ শোনেননি। সমস্যার ঠেলায় মানুষ চোখে সর্ষে ফুল দেখছে, গলা পর্যন্ত ডুবে আছে, আর এই হাড়—বদমাশটা বলছে কিনা সমস্যা নেই। বাণী বিলোতে এসে ব্যাটা। দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন ভূতনাথ। তাঁর সারা গায়ে জ্বলুনি। হাঁ করে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে অদৃশ্যকণ্ঠকে খুঁজতে লাগলেন।

খোলা হাঁয়ের ওপর হঠাৎ কেউ যেন একটা মৃদু থাবড়া মেরে বলল, 'আবার বলছি সমস্যা বলে কিছু নেই। গাছের সঙ্গে মাছের মিল দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। এই ধর—' অদৃশ্যকণ্ঠ একটু খুক খুক করে কেশে নিল। তারপর বলল, 'দৃশ্যটা দেখে হাঁ হয়ে গেল পুঁটি মৌরলা মাছ।'

বাঃ বাঃ।

'দৃশ্যটা দেখে হাঁ হয়ে গেল পুঁটি মোরলা মাছ'। ভাবা যায় না। অপূর্ব, অপূর্ব! এ লোকটা নির্ঘাত কবি। সত্যেন দত্তের চেয়েও ভালো পদ্য লেখে। অহঙ্কারে আকাশের চাঁদ ভাবছে নিজেকে। ধরা দিচ্ছে না।

কবিতার লাইনটা আরেকবার বিড়বিড় করে আওড়ালেন ভূতনাথ। সত্যিই অসাধারণ। কোনো সাধারণ লোকের পক্ষে এরকম অসাধারণ লাইন লেখা কোনোমতেই সম্ভব নয়। আহ্লাদে আঠারোখানা হয়ে গেলেন ভূতনাথ। মেহনত ছাড়াই কবিতা। তাও আবার উড়ে আসছে আকাশ থেকে। কবিতা লেখার সত্যিই আর কোনো সমস্যা নেই। ঠিকই বলেছে লোকটা। জাত কবি, তাই ওরকম বলতে পেরেছে। আনন্দে আত্মহারা ভূতনাথ গগন বিদীর্ণ করে চেঁচিয়ে উঠলেন:

আকাশের নীচে সাদা হয়ে আছে
রসগোল্লার গাছ,
দৃশ্যটা দেখে হাঁ হয়ে গেল
পুঁটি মৌরলা মাছ!

ব্যস এবার একটার পর একটা লাইন একটু জুত করে বসিয়ে দিতে পারলেই হল। পুরো ব্যাপারটা জমে দই হয়ে যাবে। দুটো লাইন যখন হাওয়ায় উড়ে এসেছে, বাকি লাইনগুলো আর আসতে কতক্ষণ!

কবিতায় যেন ডুবে গেছেন ভূতনাথ। এত ছন্দ আর মিল আগে আর কখনো দেখেননি। জীবনে তো কম কবিতা পড়েননি তিনি, কিন্তু ভাবে ভাষায় সমৃদ্ধ, রসে পূর্ণ এরকম সহজ সুন্দর কবিতা তাঁর চোখে পড়েনি।

ভূতনাথ তন্ময় হয়ে ভাবলেন, এবার তিনি রসগোল্লার গাছে বোঁদে আর জিলিপির অগুন্তি ফুল ফোটাবেন। পদ্য কাকে বলে বাংলা বিহার ওড়িশার ডাকসাইটে কবিদের তিনি দেখিয়ে ছাড়বেন। আর এক লাইনও গদ্য নয়, এখন থেকে তিনি বাজারে শুধু পদ্যই ছাড়তে থাকবেন। অঢেল পদ্য। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে পদ্য।

এইসব সাতসতেরো ভাবতে ভাবতে বাড়িমুখো হচ্ছিলেন ভূতনাথ ভট্টশালী। সবে দু—চার পা এগিয়েছেন তিনি, চারদিকে একটা গরম হাওয়া বয়ে গেল। বহু লোক যেন হাসি—কান্না মেশানো গলায় নানারকম কথা বলছে, গান গাইছে, ভাষণ দিচ্ছে, আবৃত্তি করছে, আকাশের গায়ে দমাদ্দম ঘুষি মারছে। ব্যাপারটা ঠিক কী, বুঝে ওঠবার আগেই কেউ যেন একটা বাঁকানো লাঠি দিয়ে ভূতনাথের গলাটা টেনে ধরল। তারপর ভূতনাথের পেটে একটা পেনসিলের খোঁচা দিয়ে বলল, 'খবরদার, গাছপালা নিয়ে বেশি মশকরা করতে যেয়ো না। রসগোল্লার গাছে পান্তুয়ার ফুল ফোটাতে পারো। বোঁদে—জিলিপির মতো বাজে ফালতু আকাট ফুল ফুটিয়ো না বাপধন। ঠকবে, খুব ঠকবে।'

মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল ভূতনাথবাবুর। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। গলায় কথা আটকে গেল।

৩

'ও কী! ও কী! খেতে খেতে ওরকম পাগলের মতো হাসছ কেন?' গিরিবালা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'বিষম খাবে যে।'

মন্মথর হাসি তবু থামে না। উৎকট হাসি। হেসেই চলেছেন। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, মুখ থেকে খাবার ছিটকে গেল, মন্মথর সেদিকে দৃকপাত নেই।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? বয়স হয়েছে, খেয়াল আছে? এক্ষুনি একটা অঘটন ঘটবে।'

'নতুন করে আর কী অঘটন ঘটবে!' মন্মথ আগের মতোই হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, 'এইমাত্র তো একটা অঘটন ঘটিয়ে এলাম।'

'অঘটন!' গিরিবালা চোখ কপালে তুললেন।

'অঘটন কথার মানে বোঝো না?' খেঁকিয়ে উঠলেন মন্মথ। 'ডিকশনারি দেখে নাও।'

'কী অঘটন ঘটিয়ে এলে তুমি! কোথায় ঘটিয়ে এলে? বুড়ো বয়সে কী যে সব হেঁয়ালি করো, বুঝি না বাপু।' গিরিবালা যেন একটু উদবিগ্ন হয়ে উঠলেন। তারপর স্বামীর পাতে ঠক করে মস্ত একটা মাছের মুড়ো ফেলে দিয়ে বললেন, 'একটু ঝেড়ে কাশো তো এবার। তোমার কথার ল্যাজা—মুড়ো কিছুই তো ধরতে পারছি না।''

মন্মথ প্রকাণ্ড হাঁ করে মাছের মুড়োটা মুখে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর বেশ আয়েস করে মুড়ো চিবোতে চিবোতে বললেন, 'নাড়াজোলের কথা মনে আছে তোমার?'

'হঠাৎ এই রাতদুপুরে নাড়াজোলের কথা কেন?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন গিরিবালা।

'আহা রাগ করছ কেন! বলি মনে আছে কিনা বলো না।' মন্মথ নরম গলায় বললেন।

'থাকবে না কেন? বাপের বাড়ির কথা লোকে ভুলে যায় নাকি?' গিরিবালার ছানিপড়া ঝাপসা চোখে যেন আলো ঠিকরে উঠল, 'রামনবমীর রথের মেলায় কম জিলিপি আর পাঁপড় খেয়েছি? হ্যাঁগো, রাজবাড়িটা আছে তো এখনও?'

মন্মথ হেসে ফেললেন, 'থাকবে না কেন? সব আছে। একটু এদিক—ওদিক হয়েছে—এই যা।'

শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন গিরিবালা। আনন্দের অশ্রু ঝরছে তাঁর চোখে। 'কালসাফার মাঠটার কথা ভাবলেই বুক ঢিবঢিব করে। মাঠের মাঝখানে তালপুকুর। পুকুরের চারপাশে অগুন্তি তালগাছ। কালসাফার মাঠ পেরিয়ে আমরা ভাইবোনেরা গোরুর গাড়ি করে কেশপুর আমডুবি যেতাম। উঃ মাঠ বলে মাঠ! জনমানুষ নেই। সন্ধে হলেই ভূত—প্রেত ডাকত। জ্যোৎস্না রাত্রে আর এক দৃশ্য। ডাইনি চরে বেড়াচ্ছে মাঠে। অমাবস্যার অন্ধকারে মশাল জ্বলত। অর্জুন ডাকাতের গলা নয়, যেন বাজ পড়ার শব্দ।'

মন্মথর হাত থেকে ঠক করে জলের গেলাসটা থালায় পড়ে গেল। হুঙ্কার ছাড়লেন মন্মথ, 'অত ফিরিস্তি তোমার কাছে কে চেয়েছে গিরি? জানতে চাইলাম নাড়াজোলের কথা মনে আছে কিনা, ব্যস শুরু হয়ে গেল অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত। আমি অত বৃত্তান্ত শুনতে চাইনি।'

গিরিবালা স্বামীর ধমক খেয়ে চুপ করে গেলেন। নাড়াজোল বললেই অনেক কথা মনে পড়ে যায় যে। কী করবেন গিরিবালা? বাড়ির পেছন দিকে ছোটো পুকুরের কাছে ন্যাড়া বেলগাছটার কথা বেশি করে মনে পড়ছিল। বেলগাছটাকে সাপের মতো পাক দিয়ে উঠেছিল একটা রোগা অশ্বত্থ গাছ। রাত বারোটার পর বেলগাছ আর বেলগাছে নেই। দুধের মতো ধপধপে একটা কাপড় সাঁই সাঁই করে উড়ে যেত অনেক উঁচু দিয়ে, প্রায় আকাশের গা ঘেঁষে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভেঙে পড়েছে আকাশ। আর সেই কাপড় ধরার জন্য কত রকম মূর্তি যে ভিড় জমাত বেলতলায় তার হিসেব নেই।

ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যাচ্ছিলেন গিরিবালা। হঠাৎ সংবিত ফিলে পেলেন মন্মথর ডাকে। 'নাড়াজোলের পাশের গ্রামটাই তো রাজনগর?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কী?' গিরিবালার গলার স্বর একটু রুষ্ট শোনাল, 'তখন থেকে হেঁয়ালিই করে চলেছ। বুড়ো বয়সে এই সব আদেখলাপনা ভালো লাগে না বাপু।'

'রাজনগরের শিবনাথকে মনে আছে তোমার? শিবনাথ গো শিবনাথ, যে এখন নাম পালটে ভূতনাথ হয়েছে।'

'শিবনাথ!' যেন আকাশ থেকে পড়লেন গিরিবালা, 'কে শিবনাথ?'

'আরে সেই যে গল্পটল্প লিখত! আমার 'মশগুল' পত্রিকায় কম গল্প লিখেছে নাকি! একবার পুজোর সময় ছেলেবউকে নিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে গেল তিনদিন। ও অবশ্য এখন আর শিবনাথ নয়, ভূতনাথ ভট্টশালী। মনে পড়ছে না তোমার?'

গিরিবালার মুখ হাসিতে ভরে গেল, 'ও, তুমি শিবনাথ আচার্যের কথা বলছ? খেতে ভালোবাসতেন খুব। শাকপাতা যা দিয়েছি রান্না করে, সোনামুখ করে সব খেয়েছেন ভদ্রলোক। খাওয়া নিয়ে তোমার মতো খিটিমিটি করতে কাউকে দেখিনি।'

'আবার উলটোপালটা কথা। বলছি শিবনাথের লেখার কথা আর তুমি চলে গেলে তার খাওয়া—দাওয়ায়। তার লেখালিখিটা গৌণ হয়ে গেল। সত্যিই তুমি একটা অদ্ভুত।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভারী ভালো লিখতেন ভদ্রলোক।' মন্মথর রাগে জল ঢেলে দিয়ে গিরিবালা বললেন, 'ওঁর 'কবন্ধের বন্ধ ঘরে' বইটার কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না। কতবার যে পড়েছি বইটা।'

মন্মথ এবার বেশ গর্বভরে বললেন, 'ওটা কিন্তু আমিই বার করেছিলাম। শিবনাথ রাইটার, নিশিকান্ত প্রিন্টার, মন্মথ পাবলিশার—যাকে বলে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। হাঃ হাঃ।'

মন্মথর সেই গর্বের কথায় কান না দিয়ে গিরিবালা বললেন, 'আর 'আঁতিপাতি কত হাতি' বইটার কথা ভাবো। অতটুকু পুঁচকে একটা হাতি বনবাদাড় পেরিয়ে ঢুকে পড়ল লোকালয়ে। অনিল মুদির রসগোল্লার কড়াইয়ে পা ডুবিয়ে কী অনাসৃষ্টিই না করল।'

'অ্যাই, এতক্ষণে ঠিক ধরেছ। ওই রসগোল্লা নিয়েই তো যত বিভ্রাট। ব্যাটা শিবনাথের মগজে এমন রসগোল্লার প্যাঁচ চরিয়ে দিয়েছি যে এবার বুঝবে ঠ্যালা।' ঘরের ছাদ ফাটিয়ে হো হা করে হেসে উঠলেন মন্মথ। মুহূর্তেই সেই হাসি থেমে গেল। গম্ভীর হয়ে গেলেন মন্মথ।

গিরিবালা বললেন, 'কী হল তোমার? চুপ করে গেলে কেন?'

মন্মথ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'ব্যাটা শয়তান, আগাম টাকা নিয়েছিল আমার কাছে।'

'টাকা!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাকা।' মন্মথ দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, 'করকরে পাঁচ—পাঁচশো টাকা। কী, না, পুজো সংখ্যায় উপন্যাস দেবে। তাগাদা দিতে দিতে আমার জিভ বেরিয়ে গেল। শিবনাথের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। উপন্যাসের 'উ'—ও পাইনি, টাকাটাও ফেরত দেয়নি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অতগুলো টাকা জলে গেল আমার।'

গিরিবালা কপালে মৃদু করাঘাত করে বললেন, 'সর্বনাশের মাথায় বাড়ি। কই, আগে তো কখনো বলোনি এসব?'

'লাভ কী ওসব পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে?' নিজের গালে একটা থাবড়া মেরে মন্মথ বললেন, 'তা ছাড়া তোমাকে বললে লাভই বা কী হত? উপন্যাসটা পেয়ে যেতাম? টাকাগুলো উড়ে আসত আমার কাছে?' হঠাৎ মুহূর্তে গম্ভীর ভাবটা উধাও হয়ে গেল। উদ্ভাসিত মুখে মন্মথ বললেন, 'উপন্যাস না দিক, শিবনাথ উপন্যাসের নামটা কিন্তু দিয়েছিল ফাটাফাটি।'

'কী নাম দিয়েছিল শুনি?' ব্যগ্র হয়ে উঠলেন গিরিবালা।

'বললাম তো নামটা ব্যাটা দিয়েছিল একেবারে যাকে বলে ফাটাফাটি। রসগোল্লার গাছ। সত্যি, এ নামের কোনো তুলনা নেই। আরে বাবা, এরকম নাম দেওয়া যার—তার কম্ম নয়। এরজন্য আলাদা প্রতিভা চাই। শিবনাথের এই প্রতিভাটা কিন্তু ছিল—চোখে—মুখে আলাদা একটা বিভা খেলা করত। সেই বিভা যখন বিকীর্ণ হত, তখন শিবনাথ দুমদাম করে লিখে ফেলত দুর্দান্ত সব গল্প—উপন্যাস।'

গিরিবালা মুচকি হেসে বললেন, 'কী বললে যেন নামটা? রসগোল্লার গাছ? হয় নাকি এরকম? রসগোল্লা কি গাছে ফলে?'

মন্মথ শূন্য ভাতের থালায় একটা ঘুষি মেরে বললেন, 'হয় হয়, বিদর্ভে হয়, উজ্জয়িনীতে হয়, প্রাগজ্যোতিষপুরে হয়, গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে হয়। ওসব জায়গায় তোমার বিশেষ ঘোরাটোরা নেই। জানবে কী করে? তা আজ ব্যাটাকে বাগে পেয়ে এই নামটাই ওর ঘিলুতে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এবার বোঝো কত ধানে কত চাল। রসগোল্লার গাছ খুঁজতে আবার রাজনগর পালাবে।'

গিরিবালা স্বামীর এইসব আবোল—তাবোল কথার কোনো মানে খুঁজে পেলেন না। অতি সরল মনের আলাভোলা মানুষ শিবনাথবাবু। কারও কোনো সাতে—পাঁচে থাকেন না। তাঁকে অযথা ওইরকম একটা প্যাঁচে ফেলার কোনো মানে হয়? কাজটা মোটেই ভালো করেননি মন্মথ। গিরিবালার মুখটা কেমন যেন পালটে গেল। ভেতরে ভেতরে তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। মন্মথকে আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস হল না তাঁর।

রাত হয়েছে। অন্ধকারেই চারদিকে ঘুটঘুট করছে। চারপাশে কিলবিল করছে অজস্র জোনাকি। একেকটা যেন চাঁদের ভাঙা টুকরো। দপদপ করে জ্বলছে আর নিভছে। মেঘের একটা প্রকাণ্ড চাঁই ভাসতে ভাসতে

ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। মন্মথ উঠে গিয়ে ধাঁ করে মেঘটাকে ধরে ফেললেন। তারপর মেঘটাকে নিয়ে প্রথমে খানিকক্ষণ লোফালুফি করলেন। তারপর সেটাকে টুক করে বগলদাবা করে ফেললেন।

এতক্ষণ গিরিবালা মন্মথর বকবকানি শুনছিলেন। পাগলামি দেখছিলেন। এখন তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখ দুটোয় মনে হয় কাঁকর পড়েছে—বেশ কটকট করছে। জানলা দিয়ে ফস করে রোগা, লম্বা, সুঁটকো একটা হাত বাড়িয়ে গাজরের মতো বড়ো বড়ো কুড়িটা কাঁচালঙ্কা তুলে আনলেন, আর ফুটবলের মতো একটা গন্ধলেবু। লম্ফের শিখা একটু উসকে দিলেন। মশালের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। খুব খিদে পেয়েছে। এবার খেতে বসবেন গিরিবালা।

৪

বাপস, এ তো মাঠ নয়, রূপকথার গল্পে পড়া তেপান্তর। যতদূর চোখ যায় ধু ধু করছে চারদিক। কোথাও কোনো বাড়িঘর নেই। হাঁটতে হাঁটতে পা ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল। তা হোক। এত বড়ো একটা মাঠে একা একা বেড়াবার মজাই আলাদা। বেশ অ্যাডভেঞ্চার—অ্যাডভেঞ্চার গন্ধ পাওয়া যায়।

ভূতের গল্প লিখে নাম করলে কী হবে, ভূতনাথ আসলে ভিতু মানুষ। অচেনা জায়গায় কখনো একা একা যাননি। নির্জন জায়গার কথা শুনলেই সিঁটিয়ে যান। এ নিয়ে কি লোকে তাঁকে কম ঠাট্টা করে?

অন্ধকারে, নির্জন রাস্তায় টর্চের আলো ছাড়া চলতেই পারতেন না। ভূতের ভয় যেমন আছে, তেমনই আছে তাঁর চোরের ভয়ও। সাপকে যেমন ভয় পেতেন ভূতনাথ, তেমনই ভয় পেতেন বিছে, গিরগিটি কিংবা মাকড়সাকে। কিন্তু এখন এই প্রকাণ্ড মাঠটায় একা একা তাঁর ঘুরে বেড়াতে একটুও ভয় করছে না। এখানে চোর—ছ্যাঁচ্চোড় আসবে কোত্থেকে। সাপ—খোপ থাকলেও তারা বড্ড কমজোরি, বেশি ট্যাঁ—ফোঁ করে না। আসলে আছে গায়ে ছ্যাঁকা লাগানো গরম হাওয়া আর দমকা বাতাস। আর আছে কুজঝটিকা। কিন্তু তাদের ভয় কী! তারা তো অট্টালিকার মাথায় গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে। নাগালের মধ্যে যাদের পায় তাদের সহজে ছাড়ে না। ঘোল খাইয়ে দেয়।

এসব ভেবেই মাঠের একদিকে নির্ভয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন ভূতনাথ। এই সময় ঘোরাঘুরি করাটা শরীর—স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো। ঘুরতে ঘুরতে মনটাও বেশ তাজা আর ঝরঝরে হয়ে যায়। অন্য কোনো বিষয়ের কথা খেয়াল থাকে না।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই তিন ছায়ামূর্তির আবির্ভাব। গুটি গুটি পায়ে তারা এগিয়ে এল ভূতনাথের দিকে।

ভূতনাথ সাহস করে কিছু বলবার আগেই যেন চারদিকে ঝনঝন করে একটা কাঁসি বেজে উঠল, 'নতুন দেঁশে বেঁড়াতে এঁয়েচ বুঝি? তাঁ বেঁশ। ভাঁলো কঁরে ঘুঁরে ফিঁরে দ্যাঁখো। কঁত যে দেঁখবাঁর আঁছে এঁখানে।'

আরেকজন চিঁচিঁ করে বলল, 'আমি তোঁর মাঁসি হঁই রেঁ বাঁপ। বঁয়স হঁয়েছে তোঁ! তাঁই বোঁধহয় চিঁনতে পাঁরছিস না। দ্যাঁখ দিঁকি, চিঁনতে পাঁরিস কিঁ না?'

অন্যজন খ্যাসখ্যাসে গলায় ফোড়ন কাটল, 'চিঁনবে কী কঁরে? তুঁই যঁখন এখাঁনে এঁলি, সে কী আঁজকের কঁথা? তোঁর বোঁনপোঁ তঁখন কঁত ছোঁটো। ওঁর কী আঁর ওঁসব মঁনে আঁছে রেঁ?'

কথা বলতে বলতে তিন ছায়ামূর্তি ভূতনাথকে ঘিরে ফেলল। ভূতনাথের গলা জড়িয়ে এল। অসহায়ভাবে আমতা আমতা করতে লাগলেন, 'না, মানে, আমি তো আপনাদের কাউকেই চিনতে পারছি না। আগে কখনো দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। আপনারা থাকেন কোথায়?'

তিন ছায়ামূর্তি সমস্বরে হেসে উঠল। একজন আরেকজনকে বলল, 'দ্যাঁখ বেঁকুবটার কাঁণ্ড। আঁমাদের নিবাঁস জাঁনতে চাঁইছে।'

'নিবাঁস? বেঁশিদূর নঁয় বাঁপ, এঁই কাঁছেই। ধ্যাঁদ্ধেড়েঁ গোঁবিন্দপুর। যেঁতে খঁরচ পঁড়ে সাঁকুল্যে সঁতেরো টাঁকা সাঁইতিরিশ পঁয়সা।'

আরেক ছায়ামূর্তি বিশ্রী খনখনে গলায় যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'মাঁয়ের বোঁন মাঁসিকে চিনতে পাঁরছিস না হঁতচ্ছাড়া? বঁলি তোঁর চোঁখে কি চাঁলসে পঁড়েছে? তোঁর মাঁ মঁরার পঁর তোঁকে কোঁলেপিঁঠে কঁরে আঁমিই তোঁ মাঁনুষ কঁরেছি। এঁকটুও কি মঁনে পঁড়ে না রেঁ হঁতভাগা?' ছায়ামূর্তি যেন আর্তনাদ করে উঠল—'তোঁরা এঁত অ্যাঁকৃতজ্ঞ রেঁ শিঁবু! নিঁজের লোঁককে ভুঁলে যাঁস? মাঁয়ের বোঁন মাঁসিকে চিঁনতে পাঁরিস নাঁ, নঁরাধম?'

মাসি! বিদেশ—বিভুঁইয়েও তা হলে আত্মীয়স্বজন থাকে মানুষের! এইজন্যেই কি কবি লিখেছেন 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে...'। আবেগ এসে গেল ভূতনাথের। চোখের এক কোণে আনন্দের অশ্রু ফুটে উঠল। ভূতনাথ মাথা নিচু করে মাসিকে প্রণাম করার জন্য হাত বাড়ালেন, 'কিছু মনে কোরো না মাসি। কবে ছোটোবেলায় তোমাকে দেখেছি, সে কথা কি আর মনে আছে! দু—দিন আগের কথাই মানুষে মনে রাখতে পারে না। ক্ষমা—ঘেন্না করে দাও মাসি।'

কিন্তু এ কী! তাজ্জব কাণ্ড!

মাসির পা কই!

এ তো তিনটে কাঁটা কুলের গাছ। ভূতনাথের হাতের বুড়ো আঙুলে প্যাট করে একটা কাঁটা ফুটে গেল। চোখের নিমেষে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল তিন ছায়ামূর্তি। মাসি বলে এতক্ষণ যে নিজের পরিচয় দিচ্ছিল, সে কি সত্যি মাসি? নাকি প্রহেলিকা? মনের ভুল?

বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল শিবনাথের। কিন্তু সামলে নিলেন নিজেকে। না, না, বিদেশ—বিভুঁইয়ে অত দুর্বল হলে চলে না। ভয় আরও চেপে ধরে। বাবা বলতেন, ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছুই নয়।

মাঠের মাঝ—বরাবর আবার হাঁটতে লাগলেন ভূতনাথ। একটু এগোতেই একটা ছোটো জটলা। চার—পাঁচজন বেশ উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। কী হল এখানে! মারদাঙ্গা হচ্ছে নাকি? একজন তারস্বরে বলছে, 'দেখে নেব। দেখে নেব।'

কী দেখে নেবে রে বাবা! একটু ভড়কে গেলেন ভূতনাথ। এইসব মাথাগরম লোকজনের মধ্যে না ঢোকাই ভালো। হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

কান খাড়া করে ভূতনাথ জটলার কথাগুলো ধরবার চেষ্টা করলেন। একজন ঢ্যাঙা মতন লোক গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'মন্মথ সমাদ্দারকে মাসের পর মাস কাগজ সাপ্লাই দিয়েছি। কখনো না বলিনি। কভারের কাগজ দিয়েছি। একটা কানাকড়িও পাইনি। কুড়ি রিম কাগজের দাম পাব। কত টাকা পাব ভেবে দেখেছ একবার?'

ঢ্যাঙা লোকটির সঙ্গে মুশকো মতন একটি লোক গলা মেলাল, 'চারশো একত্রিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা বাকি। বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেছে। মন্মথ সমাদ্দার একটি পয়সাও দেয়নি। বিনি পয়সায় মাসের পর মাস পত্রিকা বাঁধাই করে দিয়েছি। ওকে ছেড়ে দেব ভেবেছ?'

মিনমিন করে কথা বলছিল তাগড়াই চেহারার একটা লোক। সে প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'পাগল! ছেড়ে দেবে! এগারোটা কভারের দাম দেয়নি মন্মথ সমাদ্দার।'

একজন চোখ কপালে তুলল, 'এ—গা—রো—টা! বলো কী?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। বুকের রক্ত জল করে এক একটা কভার আঁকতাম। কী ডেঞ্জারাস লোকরে বাবা! একটা পয়সাও পেলাম না। ব্যাটা নচ্ছার।'

হঠাৎ ঝাঁকড়া—চুলো, দানবের মতো দেখতে একটা লোক কোত্থেকে যেন উদয় হল। গগন বিদীর্ণ করে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, সকলেই তো পাবে, কিন্তু দেবে কোত্থেকে লোকটা? বইয়ের ব্যবসা তো লাটে উঠেছে। আমার কাছ থেকেই কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল। আসল পয়সা দূর অস্ত, একটা পয়সা সুদও পাইনি।'

'তা হলে উপায়?' সমস্বরে সকলে বলে উঠল।

'উপায় একটা আছে বইকি।'

'কী উপায়? কী উপায়?'

ঝাঁকড়া—চুলো, দৈত্য—সদৃশ লোকটি বলল, 'মন্মথ সমাদ্দারের পুরো বাগান—বাড়িটাই আমি দখল করে রেখেছি।'

'অ্যাঁ!' সকলে হাততালি দিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ। পুরো বাগানবাড়ি। যতদিন না সমস্ত টাকা ফেরত পাচ্ছি, ও বাগান, আমি হাতছাড়া করছি না। আম, জাম আর সবেদার গাছে বাগান ভরতি। টক খেতে চাও? তাও আছে। টোপাকুল আর তেঁতুলের গাছেরও কমতি নেই। তেতো দরকার। ঘোড়ানিম, মহানিম আর চুটকি নিমের গাছে চারদিক থিক থিক করছে। সারাদিন বাগানে টুঁড়ে বেড়াও, পেট ভরে ফলপাকুড় খাও, ছেঁড়ো, ফেল, ছড়াও, পুঁটলি ভরে বাড়ি নিয়ে যাও—খবরদারি করার কেউ নেই। আতা গাছে আতাও আছে। খুঁজলে তোতাও পাবে। হেঁ হেঁ হেঁ।'

পালাবে কোথায় বাছাধন! এতগুলো লোককে তুমি দিনের পর দিন ফাঁকি দিয়েছ। এবার সম্পাদক বলে কেউ তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। ভূতনাথ মনে মনে বললেন, তুমি অকারণ আমার পেছনে লেগেছ। কত গল্প তুমি 'মশগুল' পত্রিকায় ছেপেছ। একটা পয়সাও দাওনি। বই ছেপেছ অতগুলো। কী বিক্রি সেসব বইয়ের। তিনদিনে এডিশন শেষ। শুধু একবারই বিপাকে পড়ে তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম। লেখাটা সময়মতো দিতে পারিনি বলে এত কাণ্ড। এখানে এসেও শান্তি নেই। পেছনে টিকটিকি লেলিয়ে দিয়েছ। ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ। ব্যাটা হাড়বজ্জাত। আমিও কম যাই না। তুমি চলো ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়। তুমি করবে আমাকে জব্দ! হুঁঃ। এবার দ্যাখো মজা কাকে বলে।

ভাবতে ভাবতে বাড়িমুখো হলেন ভূতনাথ ভট্টশালী। আজ আর তাড়াতাড়ি ঘুমোনো নয়। 'রসগোল্লার গাছ' উপন্যাসটা শেষ করে ফেলতে হবে। হাটবাজার নেই, পরীক্ষার খাতা দেখা নেই, ছাত্র পড়ানো নেই, সংসারের ফাইফরমাশ, বউয়ের মুখঝামটা নেই। নেই নেই আর নেই। চমৎকার একটা নেই—রাজ্য। এমন নিশ্চিন্ত অবকাশ অন্য কোথাও বড় একটা মেলে না।

৫

আকাশের মাঝখানে, না, ঠিক মাঝখানে নয়, এক কোণে বারকোশের মতো একটা গোল চাঁদ। সবুজ রঙে ঝলমল করছে। বেগনি, নীল আর হলুদ জ্যোৎস্নায় চারদিক ফটফটে। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। ধারে—কাছে নদী নেই, নদী থাকবার কথাও নয়। কিন্তু কোথাও যেন নৌকোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছপ ছপ। অনেকটা দূরে একটা ফুলের বাগান। মস্ত মস্ত সাদা ফুলে আলো হয়ে আছে চারদিক। ভারি মিষ্টি গন্ধ। এরকম জ্যোৎস্না রাত্রে কেউ বাড়ি থাকে না, সকলে বনে চলে যায়। কিন্তু এখানে না আছে লোকজন, আর না আছে লোকালয়।

কী ভালোই না লাগছে ভূতনাথের। এরকম জ্যোৎস্না মাখানো মায়াময় রাত্রি বড়ো একটা চোখে পড়ে না। গানের গলা থাকলে এখন প্রাণ খুলে তারস্বরে গান গাইতেন। তন্ময় হয়ে কত কী যে ভাবছিলেন। পাখির কথা, আকাশের কথা, মাটির কথা, পৃথিবীর কথা। ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ যেন আলাদা একটা স্বপ্নের আঠায় জড়িয়ে আসছিল। তিনি বিভোর হয়ে উঠছিলেন।

কিন্তু এই ঘোর কাটতে বেশি সময় লাগল না।

উপন্যাসের কথা মনে পড়তেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ভূতনাথ। এখন যেভাবেই হোক উপন্যাসটা শেষ করে ফেলতেই হবে। আর ফেলে রাখা যায় না। এই উপন্যাসটাই তাঁকে ঝুড়ি ঝুড়ি খ্যাতি এনে দেবে। লেখা কাকে বলে তিনি দেশের লেখক সমাজকে দেখিয়ে ছাড়বেন।

লিখবেন তো বটে, কিন্তু কাগজ কই! এখন কয়েকখানা কাগজ চাই। যেমন—তেমন কাগজ হলে চলবে না। দুধের মতো ধবধবে সাদা, মসৃণ কাগজ চাই। রুলটানা কাগজে একদম লিখতে পারেন না ভূতনাথ। আর চাই একটা ফাউন্টেন পেন, যাকে বলে ঝরনা কলম। এখনকার বিতিকিচ্ছিরি বল পেন, যাতে কিনা ছেলেছোকরারা পরীক্ষা দেয়, চিঠি লেখে, পদ্য রচনা করে—দু—চক্ষে দেখতে পারেন না ভূতনাথ। একবার

এই বল পেনে লিখতে গিয়ে কী ঝামেলাটাই না হল! গল্প প্রায় মাঝপথে এসে গেছে, এমন সময় বিভ্রাট। রিফিল ভরতি—কিন্তু কালি সরছে না। কলম ঘষতে ঘষতে হাত ব্যথা হয়ে গেল ভূতনাথের, মুখ ভোঁতা হয়ে গেল কলমের—কিন্তু কিছুতেই কালি বেরোল না। মেজাজ খিঁচড়ে গেল। উঠে পড়লেন ভূতনাথ। গল্পেরও ইতি এখানেই। তারপর থেকেই ভূতনাথ বল পেন দেখলেই তিরিক্ষি হয়ে ওঠেন। ঝরনা কলমে এসব ঝক্কি নেই। কালি ভরতি থাকলে আর চিন্তা কী! তরতর করে লেখা এগিয়ে যায়। কিন্তু এখন ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে কোথায় পাওয়া যাবে ঝরনা কলম আর রয়াল ব্লু কালি? কোথায়ই বা মিলবে বাঘমার্কা দুধসাদা কাগজ? অথচ এখন মাথায় ভাবনা গিজগিজ করছে। কত কিছু যে লেখার আছে! অল্প সময়ের মধ্যে এই নতুন জায়গায় অভিজ্ঞতা কি কম হল?

হঠাৎ দেওয়াল—আলমারিটার দিকে নজর যেতেই চমকে উঠলেন ভূতনাথ।

এ কী! ভূত দেখছেন না তো! ভালো করে দু—বার রগড়ে নিলেন।

থরে থরে সব কলম সাজানো।

লাল। কালো। সবুজ। সাদা। হলুদ। বেগনি। বিচিত্র গড়নের সব কলম। দুটো কালির দোয়াত। একটা চিনেমাটির, একটা পেতলের। দুটো দোয়াতের মধ্যেই মস্ত দুটো খাগের কলম ডোবানো। কলমের গা থেকে যেন জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই জ্যোতির গায়ে হাত দিলেই যেন হাত ঝলসে যাবে।

একটা তাকে ডাঁই হয়ে আছে দিস্তা দিস্তা কাগজ। দুধের মতো সাদা। একেই বোধহয় দুগ্ধফেননিভ বলে। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। ভারি তাজ্জব কাণ্ড। আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলেন ভূতনাথ। সংসারে এতসব আনন্দের জিনিস। আর কী চাই তাঁর!

দেওয়াল—আলমারির আংটায় ছোট্ট একটা তালা ঝুলছে। হাত দেওয়া মাত্রই ঘচাং করে খুলে গেল। আত্মহারা ভূতনাথ 'লিখিও যতনে' নামে একটি কলমে হাত ছোঁয়ানো মাত্র যেন একটা ছ্যাঁকা খেলেন। চমকে এক হাত পিছিয়ে আসতেই কেউ যেন গম্ভীর গলায় বিশুদ্ধ সাধুভাষায় বলে উঠল, 'এই স্থান অতি পবিত্র; নির্মল এবং রৌদ্রকরোজ্জ্বল। সেই হেতু জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই স্থানে অবস্থান করেন। বিনয় এবং ভক্তিপূর্বক নতমস্তকে তাঁহাকে প্রণিপাত কর।'

কাউকে দেখতে পেলেন না ভূতনাথ। কিন্তু কথাগুলি আদেশের মতো। অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। ভূতনাথ কোনো দ্বিরুক্তি করলেন না। লক্ষ্মী ছেলের মতো হাতজোড় করে মাথা নীচু করলেন।

ছেলেবেলায় বাবা তাঁকে একটা মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। সরস্বতীর মন্ত্র। মন্ত্রটার সবটুকু আজ আর মনে নেই। কোনো কোনো শব্দ খুব আবছা ভাবে মনে পড়ছে তাঁর। সকালে পড়তে বসবার আগে মন্ত্রটা তিনবার আওড়াতেন ভূতনাথ। পাছে ভুল হয়ে যায়, তাই এখন আর মন্ত্রটা আওড়ালেন না। মনের মধ্যে কেবল একটা কথাই খচ খচ করছে। কারা করছে এইসব পাঁয়তারা? করে কী লাভ? কেনই বা তাঁকে এরকম ভয় দেখাচ্ছে? যারাই করুক, নিশ্চয়ই একটা ফন্দি আঁটছে তারা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ভূতনাথ। তাঁর চোখ জ্বালা করছে। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। কানটা দু—বার ঝাড়া দিলেন ভূতনাথ। কোনো লাভ হল না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে দিলেন। মাথাব্যথাটা একটু কমুক। তারপর আবার নতুন উদ্যমে লেগে পড়তে হবে। যেই বাগড়া দিক ভূতনাথ দমে যাবেন না। তিনি একজন ডাকসাইটে লেখক। কত পাঠক তাঁর। কত লোক তাঁকে ভালোবাসে। বই বেরনো মাত্র বিক্রি হয়ে যায়। তিনি ভয় পাবেন কেন? তুচ্ছ ভয়কে জয় করে উপন্যাসটা শেষ করা চাই—ই চাই।

কুরুক্কু কুরুক্কু।

কুর কুর কুরুক্কু।

কুরুক্ক...উ...উ...

অদ্ভুত এবং একটানা শব্দ করে একটা পাখি ডেকেই চলেছে। ভারি ঝলমলে রং সেই পাখির, দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। একটা ফলভরতি গাছের ডালে সরু চিকন অন্তত দেড় হাত লম্বা লেজ ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে

পাখিটা। কেউ যেন ফিসফিস করে বলল, 'এই পাখিটার নাম লোচনদাস। স্বর্গের বাগান থেকে হাওয়া খেতে এসেছে। একে একটু খাতির—যত্ন কোরো। ভারি পয়া এই পাখিটা।'

লোচনদাস!

চোখ কচলে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভূতনাথ। লোচনদাস এখানে এল কোত্থেকে! খুব ছেলেবেলার একটা পাখির কথা মনে পড়ল তাঁর। দাদু এনেছিলেন হিমালয় থেকে। ঠাকুরমার প্রাণ ছিল সেই পাখিটা। ঠাকুমাই তার নাম রেখেছিলেন লোচনদাস। খাঁচার দরজা সারাদিন খোলা থাকত। সে যখন খুশি এখানে—ওখানে উড়ে যেত। আবার সন্ধেবেলা ফিরে আসত খাঁচায়। ভোরবেলা 'লোচনদাস' 'লোচনদাস' 'লোচনদাস' বলে খুব চ্যাঁচাত সেই পাখি। বাড়িসুদ্ধ সকলের ঘুম ভেঙে যেত। একদিন ভোরবেলায় কোনো শব্দ নেই। খাঁচার মধ্যে পড়ে আছে নিথর, নিস্পন্দ লোচনদাস।

এই দৃশ্য দেখে ঠাকুমার সে কী পাগলের মতো হাউ হাউ করে কান্না! দাদু যে লোচনদাসের শোকে পাথর হয়ে গেছেন। মুখে একটি কথা নেই। ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে আছেন। সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলার স্বপ্নের পাখি এখানে আসবে কোত্থেকে! না না, এ তাঁর কানের ভুল। শোনায় কোনো বিভ্রম হয়েছে।

আরেকবার চোখ কচলে 'কুরুক্কু'—ডাকা পাখিটাকে দেখার চেষ্টা করলেন ভূতনাথ। না, পাখিটা নেই। মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া। কোথায় গেল পাখিটা? একেই কি পাখির ফাঁকি বলে নাকি?

জানলা দিয়ে আকাশে মুখ বাড়ালেন ভূতনাথ। ভোর হয়ে গেল কি? না, এখনও রাত্রি আছে। তারায় তারায় বিশাল আকাশটা ভরতি হয়ে আছে। বারকোশের মতো গোল চাঁদটা সরসর করে একবার নীচে নেমে আসছে, আবার হুস করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সেঁটে বসে যাচ্ছে আকাশের মাঝখানে। আকাশের একটা দিক একটু ছায়া—ছায়া তো। সেখানে সাতটা লোক যেন জড়াজড়ি করে ধ্যানে বসেছে। মুখভরতি লম্বা দাড়ি। হাতের সামনে খড়ম, চিমটে আর কমণ্ডলু। তাদের চোখে—মুখে বেশ সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী ভাব। গোল হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে শলাপরামর্শ করছে। এতদূর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাদের।

জীবনে অনেক সাধু—সন্ন্যাসী দেখেছেন ভূতনাথ। কিন্তু এরকম বিচিত্র সাধু—সন্ন্যাসী আগে কখনো দেখেননি। চোখের পলক পড়ছিল না। তন্ময় হয়ে তাদের দেখছিলেন। হঠাৎ একটা গমগমে গলা শুনে তন্ময়তা ভেঙে গেল, 'উপসংহারটুকু লিখে ফেললেই তোমার ছুটি।'

উপসংহার! এ আবার কী! কোনো সাংকেতিক শব্দ নাকি? নাকি কোনো গোয়েন্দা গল্পের সূত্র? কার কাছে গেলে এইসব কথার মানে জানা যাবে? ধারে—কাছে তো একজনও চেনামুখ নেই, কাকে জিজ্ঞেস করবেন এইসব কথার মানে? কিংবা কাউকে একটা ডিকশনারি দিতে বলবেন কয়েক ঘণ্টার জন্য!

এইরকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই একটা শব্দ।

ধুপ।

কোনো উঁচু জায়গা থেকে বেড়াল লাফিয়ে পড়ল নাকি ঘরের ভেতর? হ্যাঁ, বেড়ালের মতোই মোটাসোটা, হৃষ্টপুষ্ট দুধসাদা কাগজের একটা বান্ডিল। উড়তে উড়তে এসে পড়ল মেঝের ওপর। একেবারে তাঁর পায়ের কাছে।

শশব্যস্ত হয়ে ভূতনাথ খুলে ফেললেন বান্ডিলের লাল সুতো।

কিন্তু এ কী!

অভূতপূর্ব!

অদৃষ্টপূর্ব!

অশ্রুতপূর্ব!

মুক্তো মতো হাতের লেখায় পাতার পর পাতা নানা বিচিত্র কাহিনি। রাজনগর, নাড়াজোল, মন্মথ সমাদ্দার, মাখনদাদু, ধীরেন ভৌমিক, ভন্টুলাল, অর্জুন সেনের মুদির দোকান, গোবিন্দ ময়রার মুগের জিলিপি, গোপাল দণ্ডপাটের ডাক্তারখানা—কী নেই সেখানে! তিরিতিরি করে বয়ে চলেছে কঙ্কাবতী। এই জায়গাটা পড়তে

পড়তে বিহ্বল হয়ে উঠলেন ভূতনাথ। ছোটো ছোটো ঢেউ এসে যেন গায়ে আছড়ে পড়ছে। নদীর বুকে ভেসে চলেছে ডিঙি নৌকো। লগি ঠেলে ঠেলে একটা সাইকেল আর কয়েক ঝুড়ি মাটির হাঁড়ি পার করছে নিরাপদ মাঝি। টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলছে। নদী যেন আশ্চর্য আর মোহময়।

ভূতনাথ পড়তে পড়তে বিভোর হয়ে গেলেন। মস্ত লেখক। দারুণ লেখা। কী ভাষা! বলার কী চমৎকার ভঙ্গি! বর্ণনা যে কঙ্কাবতী নদীর মতো। উচ্ছল। অবাধ। ইস, আমি যদি পারতাম এরকম লিখতে! চুক চুক শব্দ করলেন ভূতনাথ। কে তাঁকে লিখে দিলেন এরকম লেখা! তাঁর অসমাপ্ত কাজ কে এভাবে শেষ করে দিয়ে তাঁকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন! এরকম বন্ধু কি চট করে মানুষ পায়? ইনি তো কেবল বন্ধু নন, হিতৈষীও।

একা পরিচ্ছেদে এসে স্থির হয়ে গেল ভূনাথের চোখ। তিনি যেন বড়ো ধাক্কা খেলেন। সেই ছেলেবেলার লোচনদাস পাখির কথা সুন্দরভাবে অদৃশ্য—লেখক লিখেছেন। পাখিটার বর্ণনা বড়ো জীবন্ত। ভোরবেলায় তার ঘুমভাঙানিয়া ডাকটার কথাও নিখুঁতভাবে বলা হয়েছে। এও কি সম্ভব? ঠাকুমা পাখিটাকে যেভাবে খাওয়াতেন, আদরযত্ন করতেন, গায়ে হাত বোলাতেন—সব, সব লেখায় ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে।

ভূতনাথ হাতে যেন স্বর্গ পেলেন। আর তাঁকে কষ্ট করতে হবে না। পরিশ্রম করতে হবে না। বিনা আয়াসেই হাতের মুঠোয় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'রসগোল্লার গাছ'। এবার বাজারে রীতিমতো হইচই ফেলতে হবে। আগে বইটা বেরোক।

হাতে যেন একটা সব পেয়েছির দেশ পেয়েছেন ভূতনাথ। এখন তাঁকে খুব নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে। তাঁর ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির অপূর্ব হাসি। আনন্দে তাঁর চোখ বুজে এল।

৬

রেডিয়ো খুলে দিয়ে চুপচাপ রয়েছিলেন সুলোচনা। সুন্দর, মিষ্টি সুরের গান বাজছে। বোধহয় পুরোনো দিনের। গানের কথাগুলোও ভারি চমৎকার। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে হাঁড়িতে ভাত ফুটতে ফুটতে কখন যে গলে পাঁক হয়ে গেছে সে খেয়ালই নেই তাঁর। ভাতের ফ্যান পড়ে কাঠের উনুনও নিবে গেছে অনেকক্ষণ। যাঃ, আজ দুপুরের খাওয়াটাই মাটি হয়ে গেল। রেডিয়ো বন্ধ করে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন সুলোচনা।

কারা যেন দাঁড়িয়ে ছিল রান্নাঘরের জানলার কাছে। সুলোচনাকে দেখেই ঝট করে সরে গেল। চোর—টোর নাকি! দিনের বেলা কেউ চুরি করতে আসে নাকি! কয়েকটা পুরোনো হাতা—খুন্তি, বাটি—গেলাস, কয়েকটা ভাঙা পুরোনো কাঁসার থালা আর শিল—নোড়া ছাড়া রান্নাঘরে আর আছেটা কী। নাকি কোনো ভিখারি—টিকারি সুযোগ খুঁজছিল! যে—ই আসুক সাহ তো কম নয়। জানলার সামনেই ছিল ঠোঙাভরতি ভেলিগুড় আর গুঁড়ো দুধের শিশি। সেগুলো তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেললেন সুলোচনা। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। কাউকে দেখতে পেলেন না। শুকনো পাতার উপর একটা কুকুর শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে এদিক—ওদিক করছে। তারই খড়খড় শব্দ।

চোর, ভিখিরি, মতলববাজ—যেই হোক না কেন, অত সহজে কাউকে ভয় পান না সুলোচনা। 'ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছুই নয়'—অন্তত হাজারবার শোনা পদ্যটা এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল তাঁর। পাশেই কুঞ্জ সিদ্ধান্তের বাড়ি, ওদিকে ধীরেন লাহার মুদি দোকান, একটু দূরেই আঢ্যদের পুকুরে জাল ফেলছে লক্ষ্মণ জেলে, এপাশে সামন্তদের ধানজমি।—কত লোক কাজ করছে। একটা ডাক দিলেই রে রে করে সবাই দৌড়ে আসবে। শিবনাথ ওরফে ভূতনাথ একটা কথা সর্বদা বলতেন, ভয় পেয়েছ কি মরেছ। সাহস করে এগিয়ে যাবে, তারপর যা থাকে কপালে।

শিবনাথের কথা মনে পড়তেই রান্নাঘরের দরজার ছিটকিনি খুলে ফেললেন সুলোচনা। কিছু বলবার আগেই গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এল চারটে ছেলে। একটি ছেলে এসে টিপ করে প্রণাম করে ফেলল। হাসি—হাসি মুখে বলল, 'মাসিমা, আমরা।'

সুলোচনা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'থাক বাবা থাক, প্রণাম করতে হবে না। কিন্তু তোমাদের তো ঠিক চিনলাম না?'

'আমরা আনন্দগড়ে থাকি।'

'আনন্দগড়! সে তো অনেকদূর!' সুলোচনার চোখে—মুখে বিস্ময়।

'না না, দূর কোথায় মাসিমা! এই তো এখান থেকেই দেখা যায়।' একটি ছেলে আঙুল দিয়ে দূরের ঝাপসা গাছপালা দেখিয়ে বলল, 'ওই যে জঙ্গল—মতো দেখছেন, উঁচু উঁচু তালগাছ, ওগুলোর সামনে গিয়ে যাকে বলবেন সেই দেখিয়ে দেবে আনন্দগড় যাওয়ার রাস্তা।'

'তা ভালো কথা, কী মনে করে এসেছ বাবা তোমরা?' সুলোচনার গলায় স্নেহ ঝরে পড়ল, 'ভেতরে এসে বোসো।'

একটি ছেলে ভারি ফচকে। তার মুখচোখ, ভাব—ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়। সে একগাল হেসে বলল, 'মাসিমা, ভেতরে গেলেই মহা বিপদ। নাড়ু খাওয়াতে হবে।'

যে ছেলেটি প্রথমে প্রণাম করেছিল সে বলল, 'হ্যাঁ মাসিমা, নাড়ু। নাড়ু খেতে খুব ভালোবাসি আমরা।'

আরেকটি ছেলে ফুট কাটল, 'কয়েকটা নাড়ু দিয়ে দেবেন মাসিমা। রাস্তায় যেতে যেতে খাব। একটু বেশি করে দেবেন।'

ছেলেগুলো ভারি পাজি তো? সুলোচনা যে একটু বিরক্ত হয়েছেন সেটা বুঝতে না দিয়ে ছেলেগুলোকে বললেন, 'নাড়ু এখন কোথায় পাব বাবা এই অসময়ে? তা, তোমরা আসবে জানা থাকলে না হয় বানিয়ে রাখতাম।'

চারটে ছেলে একসঙ্গে হি হি করে হেসে উঠল, 'নাড়ু খাব মাসিমা, নাড়ু খাব।'

'পাগল ছেলে সব। দুপুরবেলা এসেছে নাড়ু খেতে।' মৃদু ধমক দিয়ে সুলোচনা বললেন,''যাও, গাছে ওঠো, নারকেল পাড়ো, নাড়ু বানিয়ে দিচ্ছি, খাও।'

ফচকে মতো ছেলেটি মুচকি হেসে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, মাসিমা। নাড়ু খেয়ে কাজ নেই। আরেকদিন হবে'খন।'

সুলোচনা বললেন, 'তোমরা কেন এসেছ বললে না তো?'

একটি ছেলে বেশ ভারিক্কি গলায় বলল, 'আমি নাট্যরূপ দিয়েছি।'

ফাজিল ছেলেটি বলল, 'আমি নাট্য—নির্দেশক।'

আরেকটি ছেলে বলল, 'আমি প্রম্পটার।'

সবচেয়ে নিরীহ ছেলেটি হাতে একটা প্রবল তালি দিয়ে বলল, 'দেখবেন জমে যাবে আমাদের নাটক।' ফচকে ছেলেটি কান চুলকে বলল, 'দেখবেন আমাদের নিউ ব্যায়াম সমিতি কালের বুকে একটা স্বাক্ষর রেখে যাবে।'

ছেলেগুলো কি পাগল নাকি? কী সব আবোল—তাবোল বলছে তখন থেকে। নাটক, নাট্যরূপ, নাট্য—নির্দেশক—এসব কথার মানে কী! মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। সুলোচনা একটু ধন্দে পড়ে গেলেন। ছেলেগুলো কি তাহলে বখাটে, বিচ্ছু? তাঁকে একা পেয়ে ভয় দেখাতে এসেছে? এবার একটু একটু মাথা ধরছে সুলোচনার। তিনি যে ছেলেগুলোকে ভাগিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবেন, সে ক্ষমতাও তাঁর নেই। যে ছেলেটা তাঁকে প্রণাম করেছিল, তার মুখটা খুব কচি কচি, মায়াময়। দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। আর ছেলেগুলোর বয়সও খুব কম। ইস্কুল—টিস্কুলে পড়ে বোধহয়। সুযোগ পেয়ে একটু দুষ্টুমি করতে এসেছে।

ধমকের সুরে সুলোচনা বললেন, 'আমি কিন্তু এবার রাগ করব। তখন থেকে কী বকবক করছ তোমরা!'

'রাগ করবেন না মাসিমা, রাগ করবেন না।' ফচকে ছেলেটি এসে খপ করে সুলোচনার হাত ধরে ফেলল।

অন্য একটি ছেলে তার কথায় তাল দিল, 'দেখে বুঝতে পারবেন না, আমরা কিন্তু খুব ভালো ছেলে।'

এবারে আর হাসি চাপতে পারলেন না সুলোচনা। 'তোমরা যে ভালো ছেলে তা আমি জানি। কিন্তু কেন আমার কাছে এসেছ, কী চাই তোমাদের, কিছুই তো খোলসা করে বলছ না।'

ফচকে ছেলেটি মজার মুখ করে বলল, 'অনুমতি চাই। 'রসগোল্লার গাছ' নাটক করব আমরা।'

'ওঃ নাটকটা যা হবে না, দেখবেন একবার! হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে।'

'রসগোল্লার গাছ'। চমকে উঠলেন সুলোচনা। নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে। একটু ভাবতেই অনেক কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

রসগোল্লা খেতে খুব ভালোবাসতেন শিবনাথ। রাত্রে খাওয়ার শেষে তাঁর দুটো রসগোল্লা চাই—ই চাই। রসগোল্লা না পেলেই মুখ বেজার করে থাকতেন। যখন—তখন লুকিয়ে অনিল ময়রার দোকান থেকে রসগোল্লা খেয়ে আসতেন। সুলোচনা রাগারাগি করলেই বলতেন, 'আলুপোস্ত খেয়ে খেয়ে তোমার মাথাটাও পোস্ত হয়ে গেছে। রসগোল্লার মহিমা তুমি বুঝবে না।' তাঁর গল্প—কবিতায় একটাই মিষ্টি—রসগোল্লা। আর রসগোল্লার কত রকম নাম দিয়েছিলেন তিনি—রসরঞ্জন, রসরাজ, রসসুধা, রসসুন্দর, রসলহরী, রসচিত্ত, রসবিভঙ্গ, রসরঙ্গ, রসরইরই। এইসব নাম নিয়ে সুলোচনা কি কম হাসাহাসি করেছেন? এরকম রসগোল্লারসিক মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। এই রসগোল্লা নিয়েই একটা বড়ো লেখার স্বপ্ন ছিল শিবনাথের। শিবনাথ বলতেন, 'এই লেখাটা দেখবে কালজয়ী হবে। বাংলার ছেলেমেয়েরা কাড়াকাড়ি করে বই পড়বে। এই বইটা লিখতে পারলে আর কোনো লেখার দরকার হবে না। তারপর আমি রসগোল্লা খাওয়াও ছেড়ে দেব। এই লেখার জন্য হয়তো একদিন আমার নাম সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে যাবে।'

তবে কি...

সুলোচনা চুপ করে আছেন দেখে ছেলেগুলো বিকট চিৎকার করে উঠল, 'অনুমতি চাই মাসিমা, অনুমতি।'

সবচেয়ে নিরীহ ছেলেটি কাতর ভাবে বলল, 'রসগোল্লার মঞ্চ সাদা হয়ে আছে। স্টেজে বন্যার মতো বইছে রসগোল্লার রস। দর্শকদের মুখ রসগোল্লায় ভরতি। পাত্রমিত্র সব রসগোল্লা। রসগোল্লার মায়াবী আলোয় ডুবে গেছে নিউ ব্যায়াম সমিতির খেলার মাঠ। বাঙালি অনেকদিন এরকম রসগোল্লা দেখেনি।'

ফচকে ছেলেটি এতক্ষণ ফিকফিক করে হাসছিল। সে এবার দন্ত বিকশিত করে বলল, 'রসগোল্লার গাছ অক্ষয় বটের মতো। মরবে না কোনোদিনই।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব ফিচলেমি আর সহ্য করতে পারলেন না সুলোচনা। তাঁর মাথা ঘুরছে। চোখ জ্বালা করছে। পা কাঁপছে থরথর করে। ছেলেগুলোকে আর একটা কথা বলারও সুযোগ দিলেন না। তাদের মুখের উপরেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন সুলোচনা।

বাইরে গগন বিদীর্ণ করে শব্দ উঠল, ''রসগোল্লা অমর রহে। 'রসগোল্লার গাছ' অমর রহে।'

৭

ঢ্যাম কুড় কুড়।

ঢ্যাম কুড় কুড়।

ঢাকে কাঠি পড়েছে। তারই শব্দ। অনেক দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে আসছে। আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ। কেউ যেন খেলাচ্ছলে রাশি রাশি পেঁজা তুলো ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই তুলোগুলোই বোধ হয় এখন ফুরফুরে আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে।

গাছে পাতায় রোদের অদ্ভুতে আঁকিবুকি। সব যেন কেমন অচেনা লাগছে। মাটির রং সোনার মতো। পুকুরের জল সোনার মতো। চারদিকে ঝলমলে বাহারি দৃশ্য।

আকাশে চক্কর দিচ্ছে কয়েকটা শঙ্খচিল। মাঝে মাঝে ডাকছে করুণ সুরে। পানা পুকুর থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুঁটি, খলসে। ঢাকের শব্দ যেন আরও কাছে এগিয়ে আসছে, ঢ্যাম কুড় কুড়, ঢ্যাম কুড় কুড়।

বাণী বলল, 'এই শুভ্রাদি!'

'উঁ।'

'পুজো এসে গেল, না রে?'

শুভ্রা মুখ নীচু করে বসেছিল। তার চোখের কোণে কালি। মুখে আনন্দের ছিটেফোঁটাও নেই। কোনো রকমে ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ।'

বাণী বলল, 'এবারেও কিন্তু আমরা অষ্টমীর দিন বেরোব। ভুলিস না শুভ্রাদি।'

'আমরা এবার পুজো—টুজোয় বেরোনো হবে নারে বাণী। তুই বরং অন্য কারও সঙ্গে বেরোস। দেখছিস তো বাবার অবস্থা।' শুভ্রা চোখ মুছল।

বাণী ফ্যাল ফ্যাল করে শুভ্রার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

হরিসত্য রোজই এই সময় এ—বাড়িতে আসেন। গল্প করেন শিবনাথের সঙ্গে। দু—কাপ চা খান। শিবনাথও তাঁর প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে লেখালেখি নিয়ে কথা বলেন। নতুন কিছু লিখলেই পড়ে শোনান। শিবনাথের লেখালিখির ব্যাপারে হরিসত্যর কথাই শেষ কথা। তিনি যদি বলেন, হয়েছে, তা হলে সত্যি—সত্যিই লেখাটা উৎরেছে। আজও তিনি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই হাঁকডাক ফেলে দিলেন, 'জানলাটা খুলে দে শুভ্রা,' কই সুলোচনা, চা বসাও,' ''কী রে বাণী, ঘরটা এত নোংরা কেন, ঝাঁট দিসনি?'

ঘরের এক কোণে চায়ে চুমুক দিতে দিতে শিবনাথের একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন ডাঃ সরকার। হরিসত্যকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, 'বসুন, কাকাবাবু।'

হরিসত্য নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ কেমন দেখছ?'

'বিপদ কেটে গেছে। আর কোনো ভয় নেই।'

শুভ্রার মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। 'ডাক্তারবাবু, বাবা এখন আগের মতো লেখালেখি করতে পারবে তো?'

'নিশ্চয়ই পারবেন। কিন্তু এখনই লেখালেখির কথা ভাবছ কেন? দুটো দিন বিশ্রাম নিন, তারপর ওসব ভেবো।'

সুলোচনা বললেন, 'না, মানে, তুমি তো জানো সুবিনয়, লেখাই ওঁর প্রাণ। না লিখে এক মুহূর্ত থাকতে পারেন না।'

'সব হবে কাকিমা, আগে মানুষটাকে একটু উঠে বসতে দিন। তারপর। এখন আরেকটু চা খাওয়ান তো, আমি কেটে পড়ি।'

সুলোচনা ব্যস্ত—সমস্ত হয়ে চলে যেতেই ডা. সরকার হরিসত্যকে বললেন, 'কাকাবাবু, আপনার বন্ধুটিকে এবার একটু বকাঝকা করবেন। বয়স হচ্ছে। অত পরিশ্রম ভালো নয়। লেখালিখির চেয়ে জীবনটা অনেক দামি।'

শুভ্রা বলল, 'আমিও তো তাই বলি ডাক্তারবাবু। কিন্তু বাবা কি বারণ শোনার পাত্র?'

ডা. সরকার হাসতে হাসতে বললেন, 'আসলে কী জানো, বয়স হচ্ছে তো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পালটাতে থাকে। তাকে ছেলেমানুষি চেপে ধরে।'

হরিসত্য বললেন, 'আমি কিন্তু ওকে অনেকবার বলেছি সুবিনয়। সত্যিই ও কথা শোনার লোক নয়।'

ডা. সরকার বললেন, 'শুভ্রা, বাবাকে বোলো, এবার যেন নিজেকে নিয়ে একটা গল্প লেখেন। বেশ জমাটি গল্প।'

চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন সুলোচনা, 'সে তোমাকে বলতে হবে না সুবিনয়। সবসময় বলে, নিজেকে নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে। বলতে হবে সব।'

খোলা জানলা দিয়ে রোদ ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সোনার মতো রোদেসারাঘর ঝলমল করছে। জানলার কাছে একটা কলকে গাছ। ফিকে হলদে রঙের অজস্র ফুল ফুটে আছে। অনেকগুলো পাখি কিচিরমিচির করছে কলকে ফুলের গাছে।

হরিসত্য জিজ্ঞেস করলেন, 'সুবিনয় এবার বলো তো, শিবনাথের ঠিক কী হয়েছিল?'

ডা. সরকার বললেন, 'না, তেমন মারাত্মক কিছু নয়। ওঁর মস্তিষ্কের একটা অংশ অল্প সময়ের জন্য অসাড় হয়ে গিয়েছিল।'
হরিসত্য বললেন, 'তার মানে সাময়িক সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস?'
'ঠিক ধরেছেন কাকাবাবু।'
'থ্র—ম্বো—সি—স!' চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল শুভ্রা।
'বলছি তো আর ভয়ের কিছু নেই।'
শিবনাথের গায়ে মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়ে ডা. সরকার বললেন, 'কাকাবাবু এখন বিপদমুক্ত। ভালো আছেন।'
সুলোচনা দেওয়ালে টাঙানো তাঁর গুরুদেবের ফোটোর দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করলেন। তারপর ডা. সরকারকে বললেন, 'সবই তোমার হাত—যশ সুবিনয়। তুমি না থাকলে যে কী হত, ভেবেই আতঙ্ক হচ্ছে।'
শুভ্রার মুখে হাসির রেখা। 'সত্যিই আপনি ভগবান ডাক্তারবাবু।'
ডা. সরকার লজ্জায় জিভ বের করে ফেললেন। শুভ্রাকে বললেন, 'কাকাবাবুকে এখন আর কোনো ওষুধ খাওয়ানোর দরকার নেই। আমি আবার বিকেলে এসে নতুন ওষুধ লিখে দেব।'
আস্তে আস্তে চোখ খুলছেন শিবনাথ। হাত নেড়ে শুভ্রাকে ডাকলেন। খুব নীচু গলায় কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন। সুলোচনা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন, 'না, একদম কথা নয়।'
কিন্তু বারণ শোনার পাত্র নন শিবনাথ। হরিসত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় ছিলাম রে এতক্ষণ?'
'সে তুই—ই জানিস। বেশি কথা বলিস না এখন। আগে ভালো হয়ে ওঠ। তারপর অনেক গল্প হবে।'
ওঠার চেষ্টা করলেন শিবনাথ। শুভ্রা আর বাণী এসে তাঁকে শুইয়ে দিল।
শিবনাথ চুকচুক শব্দ করলেন। তারপর ফিস ফিস করে বললেন, 'ইস, সব মাটি হয়ে গেল।'
'কী মাটি হয়ে গেল?' হরিসত্য ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন।
'সে তোরা বুঝবি না। 'রসগোল্লার গাছ'।'
মুখ চাওয়া—চাওয়ি করলেন সুলোচনা আর শুভ্রা।
'আশ্চর্য দেশ...আশ্চর্য মানুষ...আশ্চর্য অভিজ্ঞতা...জীবনে একবারই দেখা যায়। বারবার হয় না।'
শুভ্রা মৃদু ধমক দিল, 'বাবা, তোমাকে না কথা বলতে বারণ করেছি? কেন তুমি এত কথা বলছ?'
শিবনাথের চোখের কোণে জল। বাইরে সমানে ঢাক বেজে চলেছে ঢ্যাম কুড় কুড়, ঢ্যাম কুড় কুড় কুড়। চারদিকে পুজো পুজো গন্ধ। শিউলির সুবাস আসছে। উতলা হয়ে উঠছে মন। সুলোচনা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছলেন।
শিবনাথ হাত বাড়ালেন হরিসত্যর দিকে। 'হরি,' শিশুর মতো গলায় বললেন, 'কয়েকটা কাগজ আর কলম দিবি? এক্ষুনি না লিখলে সব ভুলে যাব রে।'
হরিসত্য বললেন, 'কী ভুলে যাবি?'
'অভিজ্ঞতা রে, আশ্চর্য একটা অভিজ্ঞতা। লিখে ফেলতেই হবে। গাছে যখন—তখন রসগোল্লা ফলে না রে হরি একবারই ফলে।'
কারও মুখে কোনো কথা নেই। হরিসত্য বললেন, 'শুভ্রা, বাবাকে আর একদম বিরক্ত করিস না। কথা বললেই ও এখন বকবক করবে। ওকে বরং একটু ঘুমোতে দে।'
সুলোচনা বললেন, 'সুবিনয়কে কী একবার ডেকে পাঠাব?'
হরিসত্য বললেন, 'না না, তার কোনো দরকার নেই। বোঝাই যাচ্ছে শিবনাথ এখনও একটা ঘোরের মধ্যে আছে। এই ঘোর কাটতে একটু সময় লাগবে।'
শিবনাথ শুয়ে আছেন। তাঁর মুখের ওপর রোদের একটা ছোট্ট টুকরো খেলা করছে। ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি। আস্তে আস্তে বললেন, 'ঠিক বলেছিস হরি। এই ঘোরের মধ্যে কতক্ষণ আছি জানি না। কিন্তু ছিলাম

বলেই তো একটা 'রসগোল্লার গাছ' পেলাম রে পাগল। এত আনন্দ কী সহজে পাওয়া যায়?'

খোলা জানলার সামনে অনেকগুলো পাখি। পালকে তাদের কতরকম রং। উড়ুৎ ফুড়ুৎ করে গাছের ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে। একসঙ্গে এত পাখি কখনো দেখেননি শিবনাথ। এমন স্বাধীন, বাধাবন্ধহীন জীবনও তাঁর চোখে পড়েনি কখনো। অদ্ভুত একটা আনন্দ আর ভালো লাগায় তাঁর মন ভরে গেল। জানলার বাইরে চমৎকার একটা নীল আকাশ, দুধের ফেনার মতো সাদা সাদা মেঘ, পাতা—লতায় শরতের সোনা ঝরছে, দূরে কাঁকি নদীর জলে ভেসে বেড়াচ্ছে নৌকো। আর কী চাই? 'রসগোল্লার গাছ' লিখে ফেলার এই তো প্রকৃত সময়।

আস্তে আস্তে উঠে বসলেন শিবনাথ।

ভূতের গল্প

পৌলোমী সেনগুপ্ত

লেখক জীবনের অষ্টম বছরে পৌঁছে আদিত্যর মনে হল, ৩৮/৫ শ্রীপতি পুতিতুণ্ডি লেনের দোতলার ঘরে বসে আর যাই হোক, গপপো লেখা যায় না। এই দুপুর থেকেই মাইক লাগিয়ে চরম উৎসাহে রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজন চলেছে। হ্যালো হ্যালো মাইক টেস্টিং করতে—করতে পাড়ার সকলের ভয়েস টেস্টিং হয়ে গেল। তারপর এই গরম! হাওয়া নেই একফোঁটা। এভাবে লেখা যায়? আদিত্য রায় গজগজ করতে—করতে ল্যাপটপটা অফ করল। আগে তাও রবীন্দ্রজয়ন্তী আর চরম গ্রীষ্মের সঙ্গে শান্তিও ছিল, এখন জোনাকি হালদারের পাল্লায় পড়ে শান্তিটুকু গেছে। সুকুমারবাবু সম্পাদক/থাকাকালীন এত চাপ নিতে হত না লেখকদের। উনি ফরমায়েশ করতেন, আদিত্যরাও ভেবেচিন্তে গল্প—উপন্যাস দাঁড় করিয়ে জমা দিয়ে আসত। ছাপাও হয়ে যেত। সেভাবেই তো আদিত্য রায় আজকের এই জনপ্রিয় লেখকে পরিণত হয়েছে। বইমেলায় গেলে লোকে অটোগ্রাফ নেয় বলে কথা, মফসসলের দিকে তো সভায় ভিড় হয় প্রচুর। কিন্তু তাতে কী? 'শুভায়ন' পত্রিকায় সুকুমারবাবুর পর সম্পাদক হয়ে এলেন জোনাকি হালদার। সম্পাদক নয়, সম্পাদিকা বলা উচিত। কিন্তু আজকাল মেয়েদের মেয়ে বললে মেয়েদের রাগ হয়... ঠিক যেমন কানাকে কানা বলিতে নাই। জোনাকি অবশ্য বয়সে আদিত্যদের সমসাময়িক। সম্পাদক হওয়ার পক্ষে বয়সটা কমই। সুকুমারবাবু ছিলেন পাকা বয়সের লোক, চুলে পাক ধরেছে পাণ্ডুলিপি ঘাঁটতে—ঘাঁটতে। কার মাথায় যে সুবুদ্ধি হল, ওঁর পর জোনাকিকে এনে চেয়ারে বসিয়ে দেওয়ার! জোনাকি আগে বম্বেতে একটা ইংরেজি ফ্যাশন ম্যাগাজিনে ছিল...তা ফ্যাশনেই থাকলে পারত...বাংলা সাহিত্যের ঘাড়ে এসে চাপতে গেল কেন কে জানে! আদিত্যদের দুঃসময়ের শুরু এই জোনাকির আমল থেকে। নতুন—নতুন সব নিয়ম চালু হচ্ছে রোজই। মোটামুটি বিখ্যাত লেখকদের লেখাও এখন 'শুভায়ন'—এ মনোনয়নসাপেক্ষ। মানে জমা দিলে পড়া হবে, তারপর পরীক্ষায় পাশ করলে সেই লেখা ছাপা হবে। দিলুম আর ছেপে বেরোল, সে—নিয়ম আর নেই। জোনাকি হালদার ভারি কড়া মহিলা! লেখা চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে ভোলে না, লেখা মনোনীত না হলে ছাপা হবে না। আদিত্যর কোনো লেখা এখনও ফেরত আসেনি ঠিকই, কিন্তু তার বন্ধু সৌম্য সিংহ, রাজদীপ শীল এবং দেবশ্রী তরফদারের লেখা অমনোনীত হয়ে ফেরত গিয়েছে। আদিত্য তাই আর চান্স নিতে চায় না। এই বত্রিশ বছর বয়সে অবিবাহিত, পি ডব্লু ডির আরামপ্রিয় চাকুরে, ঝাড়া হাত—পা লেখকের গল্প—টল্প যদি বাতিল হয়ে যায়, তাহলে আর বছর পাঁচেক পরে তো লেখাই ছেড়ে দিতে হবে। তা ছাড়া 'শুভায়ন'নে লেখা ছাপা না হলে জনপ্রিয়তার ভাটা পড়তে দেরি হবে না, তা বিলক্ষণ জানে সে। সপ্তাহখানেক আগেই জোনাকি ফোন করেছিল, একটা ভূতের গল্প চাই। বড়োদের ভূতের গল্প। অবশ্যই মনোনয়নসাপেক্ষে। এর আগে আদিত্য প্রেম, রহস্য, কল্পবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা কাহিনি লিখেছে বটে, কিন্তু ভূত নিয়ে লেখা হয়ে ওঠেনি। তাতে কী? চ্যালেঞ্জ নিতে হবে না? ভূতের গল্পই জমিয়ে লিখতে হবে। কিন্তু আদিত্য ঠিক করেছে, একটি দেবে না। দেবে দুটি গল্প। সম্পাদককে চাপে ফেলবে। আদিত্য রায়ের দুটি গল্পই পছন্দ করতে হবে জোনাকিকে। মনোনয়ন? ডবল মনোনয়ন করতে হবে! জোনাকির বড়ো বড়ো চোখ আর ছোটো ছোটো চুল ঘেরা মুখটি মনে পড়তেই আরও রোখ চেপে যাচ্ছে। কিন্তু একটাই সমস্যা। উত্তর কলকাতায় এই বাড়িটা কেবলই অসহ্য মনে হচ্ছে আদিত্যর। জোনাকি হালদারকে কলমের জোর আর ক্রিয়েটিভিটি দেখাতে গেলে একটা এক্সপ্যান্স চাই....একটু নিশ্বাস ফেলার জায়গা.....

রাবংলার হোটেলের বিরাট খোলা জানালা দিয়ে সামনের পর্বতশ্রেণির দিকে তাকাল আদিত্য। দুপুরেই ভারী বৃষ্টি—বৃষ্টি বাতাস ছেড়েছে। হাফসোয়েটার পরে থাকা সত্ত্বেও গা শিরশির করে শীত করছে এখন। একটা আলোয়ান গায়ে চাপিয়ে তৃপ্ত দৃষ্টিতে ল্যাপটপে খোলা পাতাটার দিকে তাকাল সে। একটা গল্প এইমাত্র প্রায় শেষ করেছে।

আদিত্য ভেবে দেখেছে, তিন ধরনের ভূতের গল্প বাঙালি খায় ভালো। সাহেব ভূত, অন্তঃপুরচারিণী রহস্যময়ী নারীভূত (যারা লম্বা বারান্দা দিয়ে হেঁটে বেড়ায়) এবং পাড়াগেঁয়ে ভূত (যারা মাছচোর এবং উপকারী, এই দুই প্রজাতিতে বিভক্ত)। তার যা ইমেজ তাকে পাড়াগেঁয়ে ভূতের গল্প লেখা মানায় না। আর ওই ধরনের গল্পে বড়োদের এলিমেন্ট ঢোকালে ঠিক জমবে বলে মনে হয় না। তাই সাহেব ভূতই বেছে নিয়েছে আদিত্য, প্রথম গল্পটার জন্য। বিহারের ছোট্ট এক শহরে ঝড়ের রাতে কার্লটন সাহেবের পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় চার ছাত্র। দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। অর্থাৎ দুটি জোড়া। প্রেম—টেম আছে। বট্যানি ক্লাসের জন্য ট্যুরে বেড়িয়ে তারা ফিরতে পারেনি হোটেলে। বা ফিরতে চায়নি। রাত বাড়ে। চারটে টর্চ সম্বল করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাত কাটাতে বাধ্য হয় তারা। অবশ্য এভাবে রাত কাটাতে পেরে তারা যে ভারি অখুশি হয়েছিল, তাল নয়। এখানটাতেও একটু অ্যাডাল্ট টাচ এনেছেন আদিত্য। একটু প্রেম, একটু শরীরী সম্পর্ক। অল্পবয়সের ছেলেমেয়ে, নিজেদের মধ্যে মেতে ছিল তারা। কিন্তু মাঝরাতে শুরু হয় হাড়কাঁপানো সব কাণ্ডকারখানা। ছায়া, আলো, কালো বেড়াল, কুকুরের কান্না, হু—হু শব্দে বয়ে যাওয়া ঝোড়ো বাতাস। আর সবশেষে ক্লাইম্যাক্স। শেষ প্যারাগ্রাফটা আবার পড়ল আদিত্য :

দরজার চৌকাঠে ও কীসের ছায়া? বাইরের বারান্দার ঘন কালো অন্ধকার ভেদ করে আরও একটু ঘন অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার চৌকাঠে। একটা ওভারকোট আর টুপির ছায়া দেখা যাচ্ছে না? এক পুরুষের অবয়ব ফুটে উঠেছে অন্ধকারের ফ্রেম জুড়ে। তারই মাথায় টুপি, গায়ে ওভারকোট। খুব লম্বা দোহারা চেহারা সেই পুরুষের।

'কে? কে?' মল্লিকা দ্রুতহাতে সোয়েটারটা টেনে ঠিক করল, 'ওখানে কে?'

সম্বুদ্ধ সোজা হয়ে উঠে বসেছে।

হঠাৎ চমকে উঠল বিদ্যুৎ। ভাঙা জানালার কাচ ঝলসে ওঠার সঙ্গে—সঙ্গে দু'জনে দেখতে পেল সেই অপার্থিব মুখ...নীল চোখে জিঘাংসার বহ্নিশিখা... সোনালি চুল বিদ্যুতের আলোয় আরও সোনালি! পরিষ্কার বোঝা যায়, সেই ছায়ামূর্তি এদেশীয় নয়। এক অদ্ভুত সুরেলা অথচ গুরুগম্ভীর গলায় একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে ভাঙা দেওয়ালের পলেস্তারা খসিয়ে দিয়ে...হু হ্যাজ এন্টারড মাই হাউজ উইদাউট পারমিশন?'

পাশ থেকে আঁ—আঁ শব্দ পেয়ে সম্বুদ্ধ বোঝে, মল্লিকা ভিরমি খেল। কিন্তু ছায়ামূর্তির দিক থেকে চোখ সরাতে পারে না সে।

আর একটু ডিম্যান্ড করছে। আর একটু লিখতে হবে গল্পটা।

আদিত্য ঘাড়ের পেছনে হাতের তালু ঠেকিয়ে চাপ দিল। একটানা লিখে ঘাড়ে ব্যথা করছে। কিন্তু থামলে চলবে না। অন্য গল্পটাও অনেকটা লেখা হয়ে রয়েছে। আজকে বেশ জোশ এসে গিয়েছে। যতটা পারা যায় এগিয়ে রাখতে হবে। কালকের দিনটা শুধুই ফিনিশিং টাচের জন্য বরাদ্দ। তার পরের দিন কলকাতার দিকে রওনা হয়ে যাবে সে। পৌঁছেই গল্প দুটো 'শুভায়ন'—এর দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে হবে। জোনাকির তাগাদা এর মধ্যেই এসে গিয়েছে। ওর ডানহাত চন্দ্রিমা মজুমদার কাল সন্ধেয় ফোন করে কড়া গলায় রিমাইন্ডার দিয়ে দিয়েছে। এই মেয়েগুলোও হয়েছে সাংঘাতিক। জোনাকি হালদারের নারীবাহিনী পেরিয়ে সোজাসুজি ওর সঙ্গে কথা বলতে পাওয়ায়ও দুষ্কর। গল্প লেখা সেরে যে একটু ছুটি কাটিয়ে ফিরবে, আদিত্যর কপালে তাও লেখা নেই।

টকটক। দরজায় টোকা। 'আ জাও!' হাঁক দিল আদিত্য।

দরজা ফাঁক করে ঢুকল নেপালি বেলবয়। মুখে হাসি। অবশ্য এদের মুখে সব সময়ই হাসি।

'বাবু, কাল স্ট্রাইক বুলায়া। বনধ,' নেপালি ছেলেটি এখনও হাসছে।

'স্ট্রাইক? কে ডাকল? কোথায়?'

'দার্জিলিংয়ে বাবু। গোর্খারা ডেকেছে।'

'আ। ক—দিনের? এরা তো আবার লম্বা—লম্বা বনধ ডাকে...' আদিত্য একটু টেনশনেই পড়ে যায়।

'অভি তো দো দিন কা বুলায়া। আঠতালিস ঘণ্টে।'

'তাও ভালো।'

'লেকিন সিকিম কা রাস্তা ভি বনধ হো জায়েগা সর। ইসলিয়ে ম্যানেজার সাব মেরেকো ভেজা।'

আরও কিছু প্রশ্ন করে আদিত্য বুঝল ব্যাপারটা। দার্জিলিংয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টার বনধে সিকিমের রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা অন্য নানারকম ঝামেলা হতে পারে, এই ভয়ে বাকি টুরিস্টরা তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছে শিলিগুড়ির দিকে। ম্যানেজার জানতে চাইছেন, আদিত্যও কি নেমে যাবে, নাকি থাকবে? আদিত্য জানিয়ে দিল, সে থাকছে। এখনই নেমে কী হবে? কাজ শেষ হয়নি এখনও। আর আদিত্য একা মানুষ। বাড়িতেও কেউ অপেক্ষা করে নেই যে চিন্তাটিন্তা করবে। আসার সময় কাজের লোক সত্যকে ছুটি দিয়ে এসেছে। চিন্তা করার লোক বলতে কে? উত্তরটা টপ করে মাথায় এল তার নিজের মনেই হেসে ফেলল আদিত্য। জোনাকি হালদার, আবার কে? ঠিক সময়ে গল্প জমা না পড়লে নির্ঘাৎ ভদ্রমহিলা স্মরণ করবেন... ব্যাপারটা ভেবে ভালোই লাগল আদিত্যর...কেউ একজন তো ভাববে আদিত্য কোথায়, কী করছে! না হয় রাগ করেই ভাববে, কিন্তু আলটিমেটলি ভাববে তো। জোনাকি ভারী স্পষ্টবক্তা, একটু কাঠকাঠ ধরনের, দেখে মনে এখনই চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে, এমন অনেক কথাই বাইরে লোকে বলে। লেখকদের আড্ডায় নিন্দে হয় প্রচুর। তবে আদিত্যর অতটা খারাপ মনে হয় না মেয়েটিকে। একটু কড়া হলেও মন্দ কী? পত্রিকাটার ভালোর জন্য চেষ্টা তো করছে। বরং যদি আদিত্য আটকে পড়ে এখানে, যদি সময়মতো কলকাতায় না ফিরতে পারে, তবে নিশ্চয়ই জোনাকি নিজে বা ওর হয়ে কেউ খোঁজ নেবে। আহা! হে ভগবান, যেন আটকেই পড়ি, এমন ব্যবস্থা করে দাও...দু—দিন শান্তিতে কাটাব, তারপর ফের সেই গরমের কলকাতা, আদিত্য ভাবে।

রাতের খাবার দিতে এসে নেপালি ছেলেটি জানাল, হোটেলে আর কোনো গেস্ট নেই। সব ঘর খালি করে নেমে গিয়েছে। বাবু যেন খেয়ে ঘরেই বাসনটা রেখে দেন। ওরা আজ সকাল—সকাল ঘুমিয়ে পড়বে কারণ কোনো কাজ নেই। চারতলা হোটেল। আদিত্য রয়েছে সবচেয়ে ওপরের তলায়। হোটেলের কর্মচারীরা বেসমেন্টে একটা ঘরে শোয়। ওয়েটাররা একটা ঘরে আর তার পাশের ঘরেই ম্যানেজার। বয়টি অবশ্য বলে গেল, খুব দরকার হলে বেল দিতে। খুব দরকার আর কী হবে?

খাবার গরম থাকতে—থাকতে খেয়ে নিয়ে আদিত্য দ্বিতীয় গল্পটা লিখতে বসল। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। শুধু রাতের অন্ধকার নয়, সব জানালায় অন্ধকার। লোকে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। টুরিস্টবিহীন রাবংলা বড্ড নিঃশব্দ আজ। অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আদিত্য জানালা বন্ধ করে ভারী পরদা টেনে দিয়েছেন আগেই। সামনেই রাস্তা, কিন্তু লোকজন নেই, দোকানপাট বন্ধ। হোটেলেও কোনো সাড়াশব্দ নেই আর। লেখায় মনোনিবেশ করার পক্ষে আদর্শ পরিস্থিতি। আদিত্য কম্বলটা ভালো করে গায়ে টেনে নিয়ে মাউজটা নাড়ল। রবীন্দ্রনাথের ছবিওয়ালা স্ক্রিনসেভারটা মিলিয়ে গিয়ে বাংলা অক্ষরগুলো ফুটে উঠল।

দ্বিতীয় গল্পটার নাম 'মোমবাতি'। এবার অকুস্থল রাজস্থানের একটি হাভেলি। পুরোনো স্থাপত্য নিয়ে রিসার্চ করতে রাজস্থানে এসেছে কলকাতার ছেলে কুনাল মুখার্জি। রিসার্চ গাইডের ইনফ্লুয়েন্স, পরিচিতি আর চেনাশোনার সুবাদে রাজস্থানের একটি গ্রামের হাভেলিতে উঠেছে সে। হাভেলির মালিকের পরিবারে সকলেই শহরে থাকে। অজ পাড়াগাঁর এই বাড়িটা পড়ে থাকে কেয়ারটেকারের জিম্মায়। কেয়ারটেকার নিজে থাকে আউটহাউসে, বউ বাচ্চা নিয়ে। হাভেলির দোতলায় একটা ঘরে কুনালকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকে শুরু করে আলো থাকা পর্যন্ত বাড়িটার থাম, দরজা, জানালা, জাফরি, ব্যালকনি এসবের ছবি আঁকে সে, সন্ধ্যা হলে খাতাপত্র গুটিয়ে হাঁটতে বেরোয়। অধিকাংশ দিনই লোডশেডিং থাকে গ্রামে। ঘরে একটি

লণ্ঠন জ্বেলে রেখে যায় কেয়ারটেকার। রাত হলে এক পেগ হুইস্কি নিয়ে কুনাল একা। সিচুয়েশনটার মধ্যে ঢোকার জন্য মিনিটখানেক চোখ বুজে মেডিটেট করে নেয় আদিত্য। তারপর লিখতে আরম্ভ করে :

আলো—আঁধারের ছায়ার মধ্যে দিয়ে বারান্দার দিকে তাকাল কুনাল। ডানদিকে একটা নাম—না—জানা লতানে ফুলের ঝাড়। লাল—লাল—থোকা—থোকা ফুল ফুটে আছে, তাতে অদ্ভুত মাদক একটা গন্ধ। সেই ঝুপসি গাছটার পাশে অন্ধকারের রং যেন আরও ঘন হয়ে এসেছে। অথচ সেই জমাট বাঁধা ছায়ার গায়ে লেগে আছে চাপা আলো। চোখ জোরে চেপে বন্ধ করল কুনাল, তারপর ধীরে ধীরে খুলল। আশ্চর্য। সেই আলোর ছায়া এখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। লণ্ঠনটা দপ দপ করে উঠল হঠাৎ, যেন নিবে যাবে। কুনাল সলতে বাড়ানোর ছোট্ট চাকাটায় আঙুল ছোঁয়ানোর সঙ্গে—সঙ্গে ছায়াটা আস্তে—আস্তে কাছে এগিয়ে এল। ঠিক তখনই কুনালের চোখে পড়ল নারীমূর্তির আপাতদৃশ্যমান অবয়ব, পিঠ ভরে থাকা চুলের ঢাল, সাদা ঘাগরার চিকমিকে জরির পাড়। মাতৃভাষায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কুনালের, 'কে? কে আপনি?'

নারীমূর্তি তার গলার স্বরে থমকে দাঁড়াল যেন, বাঁদিকে ঘাড় বেঁকিয়ে অদৃশ্য চোখের নজর নামিয়ে আনল কুনালের দিকে। গলা শুকিয়ে এসেছে, তবু সে জিজ্ঞেস করল, 'কৌন হ্যাঁয় আপ?'

কেউ দেয়নি উত্তর, কিন্তু তার মনে হয় বারান্দায় ঝাঁকড়া গাছটা নড়ে উঠেছে যেন। বাতাসে উত্তর আসছে, 'ম্যাঁয় হুঁ, হেমবতী...'

আদিত্য আড়মোড়া ভাঙল এই পর্যন্ত লিখে। ব্যাপারটা হাতের মুঠোয় চলে এসেছে এখন। শুধু একটু সময় দরকার। খেলিয়ে লিখতে হবে। আর কালকের গোটা দিনটা যখন নির্জনতার সঙ্গী হয়েই আছে, তখন আজ আর কষ্ট করা কেন? শুয়ে পড়া যাক। সে কম্বলের ভেতর ঢুকে পড়ল, খাটের পাশে রাখা টেবল ল্যাম্পটা অফ করে দিল। পরদার ফাঁক দিয়ে আসা রাস্তার আলো দেওয়ালের গায়ে এসে পড়েছে। নাকটা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে এল আদিত্যর। সে কান পর্যন্ত কম্বলটা টেনে নিয়ে চোখ বুজল।

ঘুম ভাঙতে বুঝল, ঠান্ডাটা আরও জাঁকিয়ে পড়েছে। চোখের এককোণ ফাঁক করে জানলাটার দিকে তাকাল...না, এখনও ভোরের আলো ফোটেনি। নড়েচড়ে উঠে বসতে গিয়ে আদিত্য দেখল, পরদার ফাঁক দিয়ে আসা রাস্তার আলোটা দেওয়ালে আর নেই। যাহ, পাওয়ার কাট বোধহয়। এখানে অবশ্য গভীর রাতে কারেন্ট চলে গেলে কোনো সমস্যা নেই। ফ্যান চালানোর দরকার নেই যখন! শুধু হাতড়ে হাতড়ে নতুন জায়গায় বাথরুমে যাওয়াটাই ভোগায়। শ্বাস ফেলে বালিশের পাশে রাখা চাদরটার দিকে হাত বাড়াল। একটু শক্ত, একটু খড়খড়ে....তার চাদরটা তো এমন নয়। এটা কী? বিরক্ত হয়ে কম্বলের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে উঠে বসল আদিত্য। এবং বসার পরই তার পিঠ বেয়ে যে ঠান্ডা স্রোতটা বয়ে গেল, তার কারণ শুধুমাত্র ঘরের তাপমাত্রা নয়।

ঘরের একমাত্র বেতের চেয়ারটির ওপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। আদিত্য ভুরু কুঁচকে তাকাল চেয়ারের ওপর বিছিয়ে থাকা অবয়বটির দিকে। কী ওটা? বেড়াল? নাহ! দিনতিনেক ধরে ভূতের গল্প লিখে মাথাটাই খারাপ হল নাকি? জ্বলজ্বলে চোখদুটো আর দেখা যাচ্ছে না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পাশের টেবিল থেকে বোতলটা নিয়ে হিম—কনকনে জলই ঢকঢক করে খেয়ে নিল সে। তারপরই সেই জল গলায় শুকিয়ে গেল। চেয়ারে আবার সেই দুটো চোখ। সে এবার ভালো করে দেখল। বেড়াল না, কুকুর। লোমওয়ালা, ছাই রঙের একটা বড়ো কুকুর। চেয়ারে বসে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। দরজাটা কি খোলা থেকে গিয়েছিল? ছিটকিনি দিতে ভুলে গিয়েছিল সে? দরজা খোলা পেয়ে কুকুরটা ঢুকেছে? বিছানা থেকে দরজাটা সোজা দেখা যায় না, একটা ছোটো প্যাসেজ দিয়ে দরজার দিকে যেতে হয়। তাই নিশ্চিত হতে পারল না আদিত্য। সে মুখ দিয়ে নানারকম শব্দ করে কুকুরটাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কুকরটা নড়ছে না। তার আওয়াজ—টাওয়াজ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে থাবার ওপর মুখ রেখে সোজা তাকিয়ে রইল। মহা জ্বালাতন! উঠলে যদি কামড়ে—টামড়ে দেয়? আদিত্য চারদিকে তাকাল। তার চাদরটা বালিশের পাশে গোল্লা পাকিয়ে রাখা আছে, যেমন ছিল। হাতে তখন শক্তমতো যেটা ঠেকল, সেটা

তাহলে কী? যাই হোক, আগে তো কুকুরটাকে তাড়াতে হবে। সে আস্তে—আস্তে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপরেই চোখ পড়ল টেবিলের ওপর রাখা ল্যাপটপটার দিকে। উফ! আবার ল্যাপটপ বন্ধ করতে ভুলে গেছে সে। ঢাকনিটা নামানো আছে বটে, কিন্তু স্তিমিত আলো ফুটে বেরচ্ছে সেটার থেকে। এ এক রোগ হয়েছে আদিত্যর।

আগে সে হাতেই লিখত। সম্প্রতি ল্যাপটপ কিনে বাংলা টাইপ অভ্যাস করার পর থেকেই এখন আর হাত চলে না। কিন্তু এটা প্রায়ই হয়। ঠিকমতো যন্ত্রটা বন্ধ করতে ভুলে যায় সে। কলমের এসব ঝামেলা ছিল না। কিন্তু প্রথমে ল্যাপটপ না, প্রথমে এই উড়ে এসে জুড়ে বসা কুকুরটাকে দূর করতে হবে। আলোটাও এসময়ই গেছে! উফ! আদিত্য হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে অর্ধেক ভরা জলের বোতলটা তুলে নিল। জল ছিটালে বেড়াল পালিয়ে যায়, কুকুর কি পালাবে? দেখা যাক! সে বোতলের ঢাকনিটা খুলে এক ঝটকায় অনেকটা জল কুকুরটার দিকে জল ছুড়ে দিল। কুকুরটার মাথায় জল আছড়ে পড়তেই একটা চাপা গজরানোর শব্দ করে সেটা চেয়ার থেকে নেমে এল। এই প্রথমবার আদিত্য বুঝতে পারল কুকুরটার সাইজটা ঠিক কত বড়ো। দাঁড়ালে আদিত্যর কোমরের কাছে পড়বে। ঘাড় বেঁকিয়ে, লোম ফুলিয়ে কুকুরটা আদিত্যর দিকে তাকাল। গলা থেকে চাপা শব্দ বের করে কুকুরটা এগিয়ে আসছে। আদিত্য ঘষটে—ঘষটে খাটের কোনার দিকে সরতে শুরু করেছে। হাতে কিছুটা জল ভরা বোতল। জানোয়ারটা আক্রমণ করলে ওটাই তার শেষ অস্ত্র। দুটো জ্বলজ্বলে চোখ তার প্রত্যেকটা নড়াচড়া ফলো করছে। সরতে—সরতে থামল সে, কারণ পিছনে হিমঠান্ডা দেওয়াল। পিঠটা জমে গেল যেন। শিউরে উঠতে—উঠতেও আদিত্য টের পেল, বিশাল চেহারার জন্তুটা নীচু হচ্ছে। লাফ দেওয়ার ঠিক আগে যেমন হয়, সেভাবে পিঠ বেঁকিয়ে স্টান্স নিল কুকুরটা। আর মুহূর্তের মধ্যে বিরাট লোমশ শরীরটা জ্যামুক্ত তিরের মতো খাটের ওপর ছিটকে উঠল। ঝকঝকে দাঁতগুলো অন্ধকারে ঝিলিক দিল। রিফ্লেক্স অ্যাকশনে মাথাটা নীচু করল আদিত্য, চোখ বুজে দু—হাতে মাথা ঢাকল। ঠিক তখনই কানে পৌঁছল গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'লুসিফার!'

এক মুহূর্ত সব স্থির যেন। তারপর সন্তর্পণে চোখ খুলল সে। আর দেখল সেই আশ্চর্য দৃশ্য। কুকুরটার বিশাল শরীরটা তার মাথার ওপর হাওয়ায় ভাসমান অবস্থায় স্থির। হৃৎপিণ্ড আটকে আছে তার গলায়। এক... দুই... তিন... সে দেখল, ধীরে ধীরে ভাসতে—ভাসতেই পেছতে লাগল জন্তুটা। তারপর খুব আস্তে চেয়ারের ওপর নেমে গেল। দম ছেড়ে সোজা হয়ে বসল আদিত্য। কুকুরটাও যেন তার দিক থেকে সব আগ্রহ হারিয়েছে। চেয়ারে বসা অবস্থাতেই সেটা পেছন ফিরে কী যেন দেখতে লাগল। চেয়ারের পেছনে দরজার দিকে যাওয়ার প্যাসেজের মুখে চোখ আটকে গেল আদিত্যর।

প্যাসেজের সরু মুখটায় ও কীসের ছায়া? ঘন কালো অন্ধকার ভেদ করে আরও একটু ঘন অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা ওভারকোট আর টুপির ছায়া দেখা যাচ্ছে না? এক পুরুষের অবয়ব ফুটে উঠেছে অন্ধকারের ফ্রেম জুড়ে। তার মাথায় টুপি, গায়ে ভারী পোশাক। খুব লম্বা দোহারা চেহারা সেই পুরুষের।

'কে? কে' আদিত্য দ্রুতহাতে চাদরটা টেনে নিল গায়ে, 'ওখানে কে?'

হঠাৎ চমকে উঠল বিদ্যুৎ। ভাঙা জানালার কাচ ঝলসে ওঠার সঙ্গে—সঙ্গে দু—জনে দেখতে পেল সেই অপার্থিব মুখ...নীল চোখে উজ্জ্বলতা....সোনালি চুল বিদ্যুতের আলোয় আরও সোনালি! পরিষ্কার বোঝা যায়, সেই ছায়ামূর্তি এদেশীয় নয়। এক অদ্ভুত সুরেলা অথচ গুরুগম্ভীর গলায় সেই মূর্তি এবার কথা বলে ওঠে, 'লুসিফারের গায়ে জল পড়লে ও খুব চটে যায়।'

আদিত্যর মনে হয় সে জ্ঞান হারাবে।

ছায়ামূর্তি আবার বলে, 'তা ছাড়া, এখানে যা ঠান্ডা! তার উপর বাইরে বৃষ্টিও নেমেছে। ওর গায়ে জল দেওয়া ঠিক হয়নি আপনার।'

কুকুরটা এবার জিভ বের করে ছায়ামূর্তির হাত চেটে দেয়। ছায়ার হাত যদি চাটা যায়, তবেই অবশ্য...

আদিত্যর গলা দিয়ে ঘঙঘঙে গলা বেরোয়, 'সরি।'

'আরে, সরি বলার কী আছে? আপনি তো জানতেন না। কিন্তু আমি না খেয়াল করলে একটা সমস্যা হয়ে যেতে পারত।'

''আপনি কে? কীভাবে এলেন আমার ঘরে?''

লোকটার সদাশয় ব্যক্তিত্বে একটু ভরসা পেয়ে আদিত্য প্রশ্ন করল।

লোকটা যেন অবাকই হল একটু, 'আমাকে চিনতে পারছেন না আপনি? আমি কার্লটন, স্যাম কার্লটন।'

সে আবার শিউরে ওঠে।

'কার্লটন? মানে ওই...'

'এগজ্যাক্টলি। ওই কার্লটন। আমারই পোড়ো বাংলো থেকে আপনি মনে—মনে ঘুরে এসেছেন। রিমেমবার? বিহারের জঙ্গলে?'

'আপনি তো বাংলা বলছেন।'

'বলছি। কারণ আমাদের দুনিয়ায় ভাষা কোনো বাধা নয়। একবার জীবন পেলে আর কোনও বাধা কাজ করে না আমাদের মধ্যে।'

'আপনাদের দুনিয়া?'

'আমাদের, মানে, কল্পনার জীবদের দুনিয়া। আমাদের মতো যাদের জন্ম হয় আপনাদের কল্পনার মধ্যে দিয়ে, তাদের কাছে ভাষা কোনো সমস্যা নয়।'

'আমাদের কল্পনা...আমার লেখা গল্পে...চরিত্ররা জন্মায়?'

'না, সবাই না। শুধু ভূতেরা। জীবন্ত মানুষের চরিত্রগুলোর এ সৌভাগ্য হয় না। এটা শুধু মৃতদের জন্য। কল্পনার মৃতদের জন্য নতুন জীবন...'

আদিত্য হাঁ করে থাকে।

লোকটা আবার বলে, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি। আমাকে জীবন দেওয়ার জন্য।'

'আপনাকে? আমি...জীবন...কিন্তু আমার তো পুরোটাই কল্পনা...'

'আরে হ্যাঁ। আপনাদের কল্পনাতেই তো আমরা জীবন পাই। বেঁচে উঠি। অবশ্য যদি ভূত হয়েও বেঁচে ওঠা যায়! হাঃ হাঃ। ভূতের আবার বাঁচা, কী বলেন?'

আদিত্য স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে। লোকটা বলতেই থাকে, 'আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা জীবন পেয়েও মিলিয়ে যেতে হয়। অস্তিত্বের যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি বেঁচে রইলাম, কেন জানেন?'

'কেন?'

'প্রেম, মিঃ রাইটার। প্রেমের জন্য আমি বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারলাম না।'

'প্রেম? আমি তো প্রেম নিয়ে কিছু লিখিনি, মানে...'

ভদ্রলোক (নাকি ভূতই বলা উচিত, ভদ্রভূত?) এবার হালকা হেসে ডাকলেন, 'হেমবতী!'

পাশের টেবিলে রাখা ল্যাপটপটা যেন জীবন পেল। সেটার ঢাকনির তলা থেকে বেগুনি ধোঁওয়া বেরিয়ে ঘর ছেয়ে ফেলেছে। আদিত্য পিটপিট করে দেখল, সেই ধোঁওয়া থেকে আস্তে—আস্তে রূপ নিচ্ছে একটি মেয়ের মূর্তি। ছায়ার মতো তরল এবং আবছা সেই কান্না আস্তে—আস্তে কাছে এগিয়ে এল। ঠিক তখনই আদিত্যর চোখে পড়ল নারীমূর্তির আপাতদৃশ্যমান অবয়ব, পিঠ ভরে থাকা চুলের ঢাল, সাদা ঘাগরার চিকমিকে জরির পাড়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল আদিত্যর, 'কে?'

নারীমূর্তি তাঁর গলার স্বরে থমকে দাঁড়াল যেন, বাঁদিকে ঘাড় বেঁকিয়ে অদৃশ্য চোখের নজর নামিয়ে আনল তার দিকে। গলা শুকিয়ে এসেছে, তবু সে জিজ্ঞেস করল, 'এ কী?'

বাতাসে মাখামাখি হয়ে উত্তর এল, 'ম্যাঁয় হুঁ। আমি, হেমবতী।'

কার্লটন মৃদু হাসলেন কিনা ঠিক দেখা গেল না, কিন্তু গলার স্বরে একটু হাসি ছলকে উঠল যেন, 'হেমবতীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেওয়ার কোনো কারণ নেই। ও—ও তো আমার মতো আপনারই কল্পনায় জন্মেছে। আপনি ওকে চেনেন। রাজস্থানের হাভেলি হন্ট করতে করতে ও জীবন পেয়েছে। আর ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আপনার ল্যাপটপেই, আমার পাশের গল্পে। ঠিক যেমন লুসিফারকে পেলাম, পাশের আর—একটা গল্পে।'

কুকুরটার মাথায় হাত গুলিয়ে দিলেন কার্লটন সাহেব। ভীষণ বিস্ময়ের মধ্যেও মনে পড়ে গেল আদিত্যর, মাসছয়েক আগে একটা বাচ্চাদের পত্রিকার জন্য একটা দুষ্টু কুকুরের গল্প লিখেছিল। গল্পের শেষে কুকরটা মারা যায় আর তার নামটা সে নিজেই খুব কায়দা করে দিয়েছিল, 'লুসিফার।' বিস্ময়ে কথা নতুন করে বন্ধ হয়ে গেল তার। সে বড়ো বড়ো চোখ করে চেয়ে রইল কুকুরটার দিকে।

স্যাম কার্লটন বলে চললেন, 'হেমবতীর সঙ্গে, বুঝলেন মিঃ রাইটার, দেখামাত্র একটা কেমিস্ট্রি কাজ করতে লাগল। আমার চোখে মুখে আপনি যেসব জিঘাংসা আর কাঠিন্য ভরে দিয়েছিলেন, হেমবতীর সৌন্দর্য আর রহস্যে সেসব কেথায় উবে গেল! আমরা প্রেমে পড়লাম। হেমবতীর মতো সুন্দরীর প্রেমে না পড়াটাই তো অদ্ভুত, তাই না?'

হেমবতী নাম মহিলা অল্প হেসে বেগুনি ওড়নাটা গায়ে টেনে দিলেন। শীত করে উঠলে মেয়েরা যেমন করে। কার্লটন সহসাই নড়ে উঠল। খাটটার দিকে ভেসে এসে বলল, 'দেখি, হাতটা সরান তো। ওর ঠান্ডা লাগছে।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাতটা সরাল আদিত্য। কার্লটন হাত বাড়িয়ে তুলে নিল একটি ওভারকোট। আদিত্যর হাতে সেটার খড়খড়ে কাপড়টা ঘষে গেল। এটাতেই তার হাত লেগেছিল একটু আগে, চাদর খুঁজতে গিয়ে। ওভারকোটটা হেমবতীর কাঁধে তুলে দিল কার্লটন। বলল, 'এবার ভাল লাগবে, দেখো। লেখক যে কেন এই পাহাড়ের কনকনে শীতে আমাদের জীবন দিলেন।'

হেমবতী হাসে, 'উনি হয়তো ভাবেননি আমাদেরও গরম লাগে, শীত করে। তাই না, লেখক?'

আদিত্য মাথা নাড়ল। আশ্চর্য! ভাষা সমস্যা নয়, কিন্তু শীত করে?

হয়তো ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই হেমবতী বলল, 'সত্যি—সত্যি হয়তো করত না, কিন্তু আমাদেরও কখনো কখনো মানুষের মতো হতে ইচ্ছে হয়।'

কার্লটন বলল, 'মানে, এই উইন্টার ইজ সো রোমান্টিক, তাই না মিঃ রাইটার?'

হেমবতী আবার বলল, 'কিন্তু এই শীতের মৌসমে আমাদের একটা ভালো জিনিস উনি দিয়েছেন। পাস আনে কা মওকা। হঠাৎ পাওয়া এই জিন্দগিতে আমরা খুব কাছাকাছি থাকতে পারব...'

কয়েক মিনিট কেটে গেল, নাকি কয়েক ঘণ্টা, খেয়াল নেই আদিত্যর। সে শুধু দেখল, হেমবতী এগিয়ে গিয়েছে কার্লটনের দিকে। দুটি ছায়াময় শরীর পরস্পরের আলিঙ্গনে হারিয়ে যাচ্ছে। কপালের শিরা দপদপ করতে থাকে তার। খুব ভারী হয়ে আসে দু—চোখ। সে শোনে এক নারীর স্বর, 'আমাদের মিলিয়ে দেওয়ার জন্য শুক্রিয়া, লেখক!'

এবং এক পুরুষের স্বরও, 'অ্যান্ড লাভ উইল কাম টু ইউ টু। যাও, গিয়ে তাকে মনের কথা বলো।'

এক সুগন্ধি কুয়াশায় ডুবে যেতে—যেতে চুম্বনের শব্দে বিভোর হয় আদিত্য...স্বপ্নের ঘোরে ভাবে, ফিরেই জোনাকিকে বলতে হবে। রাবংলার অদ্ভুত এই ঘটনা এবং আরও অনেক কিছু।

পাতালরেলের টিকিট

রতনতনু ঘাটী

অফিস থেকে বেরোতে—বেরোতে সন্ধে সাতটা পেরিয়ে গেল। সকাল থেকেই মনটা কেমন আনমনা হয়ে আছে। সকালেই একটা কোকিল একটানা ডেকেছিল অনেকক্ষণ। কেমন মন কেমন করা সেই ডাক। আমাদের বাড়ির পাশের মোহনবাঁশি আমের গাছটায় কোকিলটা মাঝে—মাঝে এসে বসে। একটানা অনেকক্ষণ ডাকে। আজও ডেকেছিল কোকিলটা।

কোকিলের ডাক শুনলে মন ভালোও হয়ে যায় এক—এক দিন। আজ মনটা আনমনাই হয়ে আছে।

আমি চাঁদনিচকে পাতালরেল ধরে বাড়ি ফিরি। স্টেশনে স্মার্ট গেটে কার্ডটা পাঞ্চ করতে গিয়ে দেখলাম কার্ডের টাকা ফুরিয়ে গেছে। অগত্যা টিকিট কাউন্টারে স্মার্ট কার্ডে টাকা ভরার জন্য দাঁড়ালাম। এটাই আবার এগজ্যাক্ট ফেয়ারের কাউন্টারও। কাউন্টারের ভিতর থেকে ভদ্রলোক বললেন, মেশিন খারাপ। স্মার্ট কার্ডে টাকা ভরা যাবে না। আমার কাছে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন পর্যন্ত যাওয়ার এগজ্যাক্ট ফেয়ারে খুচরো ছ—টাকা নেই। তাই পাশের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

স্মার্ট কার্ড নিয়ে মাঝে—মাঝে নানারকম সমস্যা হয়। কখনো গেটে পাঞ্চ মেশিন খারাপ থাকে। তখন আবার বিনে পয়সার পাতালরেল ভ্রমণ হয়ে যায়। কখনো এই স্টেশনে টাকা ভরা যায় না, অন্য স্টেশনে যাও। কত দিন হয়ে গেল, এখনও কেন যে পুরো ব্যবস্থাটা চালু করা গেল না, কে জানে?

টিকিট কাটার লাইনটা বেশ বড়ো। ধীরে—ধীরে লাইন এগোচ্ছে। আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর বয়স পঞ্চাশ—পঞ্চান্ন হবে। প্যান্ট—শার্ট পরা। মাথায় কাঁচা—পাকা চুল। চোখে চশমা। ভদ্রলোক একবার বাঁ—পকেটে, একবার ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো টাকা বের করে গুনছেন, ফের পকেটে রেখে দিচ্ছেন। আমি ভাবলাম, ভদ্রলোকের যদি খুচরো টাকা আছে তো উনি এগজ্যাক্ট কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কাটতেই পারেন। খামোখা কষ্ট করে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ওই কাউন্টারটা তো ফাঁকাই পড়ে আছে। একসময় ভদ্রলোক ফের খুচরো টাকা বের করে গুনতে লাগলেন। আমি বললাম, 'দাদা, আপনি তো এগজ্যাক্ট ফেয়ারের কাউন্টারে টিকিট কাটলেই পারতেন। তা হলে তো কষ্ট করে এতক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হত না!'

ভদ্রলোক কেমন স্মিত হাসি হেসে বললেন, 'কষ্টে কী আসে যায়!'

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ কীরকম কথা! কষ্টে কী আসে যায়? যাক গে। উনি যদি কষ্ট করতে চান তো করুন। ওঁর ব্যাপার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভদ্রলোক কাউন্টারে পৌঁছলেন। ছ—টাকা দিয়ে একটা মহানায়ক উত্তমকুমার যাওয়ার টিকিট চাইলেন। টিকিট নিয়ে পকেটে রাখতে—রাখতে সরে দাঁড়ালেন। আমি দশ টাকা দিয়ে একটা মহানায়ক উত্তমকুমার যাওয়ার টিকিট চাইলাম। ওই স্টেশনে নেমে আমাকে ঠাকুরপুকুর যেতে হয় দু—বার অটো বদলে। হঠাৎ দেখলাম, আমার পায়ের কাছে একটা টিকিট পড়ে আছে। ওই ভদ্রলোকই বোধ হয় টিকিটটা পকেটে রাখতে গিয়েছিলেন। ভুল করে পড়ে গিয়েছে। আমি টিকিটটা কুড়িয়ে ভদ্রলোকের পিছন—পিছন ছুটলাম, 'এই যে দাদা, শুনছেন। আপনার টিকিটটা পড়ে গিয়েছিল। এই নিন।'

ভদ্রলোক সকালবেলার সেই কোকিলের ডাকের মতো বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'টিকিটে কী আসে—যায়?' বলে হাত বাড়িয়ে টিকিটটা চাইলেন। আমি টিকিটটা ওঁর হাতে দিতে গিয়ে দেখলাম টিকিটের উপর একটা লাল কালির ফোঁটা। হঠাৎ আমার মনে হল ওটা রক্তের ফোঁটা নয়তো? তারপরে ভাবলাম, তাই বা কেন

হবে? এমন অলীক ভাবনার কোনো মানে আছে কি? পাতালরেলের টিকিট, সদ্য মেশিন থেকে বেরিয়েছে। এতে রক্তের ফোঁটা আসবে কোথা থেকে? নিজের এমন অবাস্তব ভাবনার জন্য নিজেকেই বকে দিলাম। তবে লাল দাগটা কিন্তু ভুল দেখিনি।

ভদ্রলোক তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। আমিও এগিয়ে গেলাম। ট্রেন আসতে চার মিনিট দেরি এখনও। প্ল্যাটফর্মে নেমে সামনেই দাঁড়ালাম। প্রথম কম্পার্টমেন্টে উঠলে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনের বাইরে বেরোনোর গেটটা কাছাকাছি হয়। যাঁরা নিয়মিত পাতালরেলে যাওয়া—আসা করেন, তাঁরা অনেকেই নির্দিষ্ট কম্পার্টমেন্টে ওঠেন। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে দেখা হয়। আমিও ঠিক এরকম সময় যখন পাতালরেলের এই কম্পার্টমেন্টে উঠি, তখন অনেক চেনা মুখের দেখা পাই। তবে আমি একটু লাজুক স্বভাবের বলে যেচে তেমন কারও সঙ্গে আলাপ করি না।

এমন সময় দেখলাম, আমার ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। আমি ট্রেন ধরার জন্যে রেডি, ট্রেনটা প্রায় এসে গিয়েছে, হঠাৎ পাশে তাকাতেই দেখলাম, সেই ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ট্রেন ধরার জন্যে। ট্রেনটা কাছাকাছি আসতেই ভদ্রলোক ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিতে গেলেন। হতচকিত আমি খামচে ধরে ফেললাম জামাসুদ্ধ ভদ্রলোককে। কোনো রকমে বাঁচানো গিয়েছে। অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। ভদ্রলোককে কেমন যেন বিমর্ষ এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটা কম বয়সি ছেলে ভদ্রলোককে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে। উনি একটু ঘামছেন।

আমিও এগিয়ে গেলাম ওঁর কাছে। এই ট্রেনটা আমারও ধরা হল না। ক—মিনিট পরে ট্রেনটা চাঁদনিচক স্টেশন ছেড়ে গেল। উলটো দিকের ট্রেনও এল, ছেড়েও গেল দমদমের দিকে। এখন প্ল্যাটফর্মটা বেশ ফাঁকা।

আমি ওঁর পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম। সমব্যথীর গলায় বললাম, 'এমন কাজ করতে গেলেন কেন? মানুষ বেঁচেজ থাকার জন্যেই তো কত কষ্ট করে। আর আপনি....।'

ভদ্রলোক খুব শান্ত এবং নিরীহ গলায় বললেন, 'বেঁচে থাকায় কী আসে যায়?'

আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম, 'না না, আপনাকে বেঁচে থাকতেই হবে।'

উনি খুব বিষণ্ণ চোখে তাকালেন আমার মুখের দিকে। কোনো কথা বললেন না।,

আমি বললাম, 'জীবনের উপর আপনার এত রাগ কেন?'

আবারও উনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। তেমনই বিষণ্ণ চোখ।

আমি কী করব? নতুন যাঁরা প্ল্যাটফর্মে জড়ো হচ্ছেন ট্রেন ধরার জন্য, তাঁরা তো জানেন না, এই ভদ্রলোক একটু আগেই নিজেকে শেষ করে দিচ্ছিলেন। আমি কী সবাইকে জানিয়ে দেব, এই ভদ্রলোক একটু আগে....। তারপর জোর করে ওঁটে ট্রেনে তুলে দেব? অনেক তরুণ আছে, তারা জানলে ওঁকে ঠিক বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমার এইসব ভাবনার ফাঁকে দেখলাম, ভদ্রলোক এগিয়ে যাচ্ছেনত প্ল্যাটফর্মের মাঝের দিকে।

আমিও নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিলাম। যাক, যা করার করুন উনি। আমার কী? আমার উপর তো সব আত্মহননকারীকে বাঁচানোর দায়িত্ব কেউ চাপিয়ে দেয়নি। তারপর আজ রাতে আমাকে একটা কবিতাত লিখতে হবে। কাল সকালে ওই লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক ফোন করবেন। ফোনেই আমি কবিতাটা বলে দেব। সম্পাদক লিখে নেবেন। আজকাল এমনই চল হয়েছে। ডাকবিভাগের অপদার্থতা আর দায়িত্বহীনতার জন্যেই এমন পথ বেছে নিতে হয়েছে মানুষকে।

সাতপাঁচ ভাবনার ফাঁকে পরের ট্রেন এসে গেল। আমিও হুড়মুড় কার উঠে পড়লাম। ফিরে দেখা হল না, ওই ভদ্রলোক কী করলেন। মনটা আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠল। টানেল দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। আমার ফের সকালবেলার কোকিলের ডাকটা কানে বেজে উঠল। বেআক্কেলে কোকিল! আজ কেন যে অমন করে ডাকল! কখন যে ট্রেনটা মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনে এসে গেছে, খেয়াল হল ট্রেনের ঘোষকের গলার ঘোষণায়।

ট্রেন থেকে নেমেই এক অসম্ভব দৌড় শুরু হয় যাত্রীদের মধ্যে। এতে যে ঠিক কতখানি লাভ হয় কার, কে জানে। যারা দৌড়োয় তারাও কি জানে? কখনো কি তারা ভেবে দেখেছে? আমি ওই দৌড়ের মধ্যে থাকি না যেমন, আবার এই দৌড়ের সময় আমার মধ্যেও কেমন একটা দৌড়োনোর স্রোত বয়ে যায়। অনেকটা ছোঁয়াচে রোগের মতো। তখন আস্তে হলেও দৌড়োই।

আমি স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। বেশ বড়ো একটা চাঁদ উঠেছে। আজকের চাঁদটাকে অন্য দিনের চেয়ে মনমরা মনে হল যেন। আজকের দিনটাই যেন এমন!

টালিগঞ্জে অটোর লাইনে দাঁড়ালাম। দু—বার অটো ধরে তবে ঠাকুরপুকুর যেতে হয়। এই অটোর লাইন অনেক সময় অ্যানাকোন্ডার মতো এঁকেবেঁকে চলে যায় পিছনের পেট্রল পাম্প পর্যন্ত। আজ তত লম্বা লাইন নেই। জনা তিরিশেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তবে আজ অটোর ফ্লো কম। রাস্তায় কোথাও জ্যামে আটকে আছে মনে হয়। লাইন খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। এখনই ঘড়িতে প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। বাড়ি পৌঁছোতে সাড়ে ন—টা পেরিয়ে যাবে।

মন থেকে ওই ভদ্রলোকের চিন্তা কিছুতেই যাচ্ছে না। কী হল ভদ্রলোকের? উনি কি আমার ট্রেনটাতেই উঠেছিলেন? নাকি আমার ট্রেনে না—উঠে পরের ট্রেনে...? বাড়িতে গিয়ে টিভির খবরটা দেখতে হবে। কিছু যদি ঘটে তবে খবরে তো দেখাবে। ভদ্রলোক কি সংসারে খুব দুঃখী? কেন? স্ত্রী কি ভালোবাসেন না? সংসারে কি খুবই টানাটানি? হয়তো খুবই সামান্য চাকরি করেন। পান্তা জোটালে নুন ফুরিয়ে যায়? আমার মনে হয়, এই নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেললে কেমন হয়? লিখলে গল্পটা খুবই দুঃখের হবে। কিন্তু কেন? পৃথিবীতে এত দুঃখ ছড়িয়ে আছে, এত দুঃখের ঘটনা। তার উপর আবার দুঃখের গল্প কেন? এই বিষয়টা নিয়ে আনন্দের গল্প লিখলে কেমন হয়? তাই তো উচিত। দুঃখী মানুষকে যতটুকু আনন্দ দেওয়া যায়।

এসব ভাবনার মধ্যে এতটাই ডুবে ছিলাম যে কখন অটো এসেছে, আমি অটোয় উঠে বসেছি, খেয়ালই নেই। অআমি বসেছি অটোচালকের ডান দিকে। অটো করুণাময়ী ব্রিজ পেরোল। পিঁপড়ের সারির মতো অটোর লাইন, এই রাত ন—টাতেও। অটো হরিদেবপুর পর্যন্ত ঢিমে গতিতে চলল, তারপর বেশ গতি পেয়ে গেল। এই মার্চ মাসের সন্ধে—রাতে বেশ একটা ঠান্ডা—ঠান্ডা ভাব আছে বাতাসে। আমি বেশ একটু গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। এমন সময় লুকিং গ্লাসে চোখ পড়তেই দেখলাম, ওই ভদ্রলোক আমার পিছনে অটোর ডান দিকে বসে আছেন। আমি চমকে উঠলাম। টালিগঞ্জে অটোর লাইনে তো আমার সামনে ভদ্রলোককে দাঁড়াতে দেখিনি! তা হলে উনি অটোতে বসলেন কী করে? মনে—মনে ভাবলাম, না না, উনি ঠিকই অটোর লাইনে ছিলেন। আমিই আনমনা ছিলাম বলে ওঁকে দেখতে পাইনি।

মনে—মনে ভাবলাম, তা হলে ভদ্রলোক আমাদের দিকেই থাকেন। যাক, তা হলে ওঁকে বাঁচিয়ে একটা ভালো কাজ করেছি। হয়তো দেখা যাবে উনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন। দেখাই যাক, উনি কবরডাঙায় গিয়ে ঠাকুরপুকুরের অটো ধরেন কিনা।

আজ সকাল থেকেই ক্ষণেক্ষণে ভীষণ আনমনা হয়ে যাচ্ছি। কোনো কিছুতেই ঠিকমতো মন বসাতে পারছি না। কেন এমন হল আজ? তখনই মনে পড়ল, এ সেই কোকিলটার কাজ। সেই যে সকালে এমন মন কেমন —করা সুরে ডাকল একটানা, আর তারপর থেকেই তো...।

একদিন আমার বাড়ির পাশের ওই আমগাছটায় এসে বসেছিল একটা হলদে শালিখ। কী তার চোখ— জুড়োনো রূপ! তার ওই আগুন—ছড়ানো হলদে রং দেখে সেদিন মনটা যেন অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠেছিল। অনেকে ওই পাখিটাকে বেনে বউ বলে ডাকে, অনেকে বলে ইষ্টিকুটুম। আমরা ছেলেবেলায় মেদিনীপুরের গ্রামে ওই পাখি অনেক দেখেছি। আমরা ডাকতাম হলদে পাখি বলে। সেদিন সেই হলদে শালিখ দেখার পর সারাদিনই মনটা টইটই করেছিল আনন্দে। এক—একদিন এক—একটা পাখি, ফুল কেমন মন ভালো রাখে সারাদিন। আজ যেমন ওই কোকিলটা মন খারাপ করে দিয়েছে।

হঠাৎ খেয়াল হতে দেখি আমি ঠাকুরপুকুরের অটোয় বসে চলে এসেছি একদম বাড়ির কাছে। জেমস লং সরণির কাছে বাজারে নেমে গেলাম। বাঁ—দিকে আমার পাড়া। তিন মিনিট হাঁটলেই আমার বাড়ি। প্রায় দশটা বাজতে চলল। তড়িঘড়ি বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

বাড়িতে থাকি আমরা দুটি প্রাণী, আমি আর মেঘনাদদা। আমার স্ত্রী থাকে হলদিয়ায়, চাকরি করে ওখানে। ছেলে—বউমা আর মেয়ে থাকে বেঙ্গালুরুতে। মহিষাদলে গ্রামের বাড়িতে মা আর ভাইরা থাকে। মেঘনাদদা আমার বাবার আমলের লোক, কবে থেকে যে আমাদের বাড়িতে আছে, কেউই মনে করতে পারে না। সবাই বলে, এই মাইক্রো ফ্যামিলির যুগে এমন মানুষ পাওয়া কঠিন। মেঘনাদদার রান্নার হাতও ভালো। দারুণ সুক্তো রাঁধতে পারে। মাংসটাও রাঁধে দারুণ। আমাদের কলকাতার বাড়িতে আমি একা থাকি। মা মেঘনাদদাকে পাঠাল। সেই থেকে আমরা দু—জন এই বাড়িতে। মেঘনাদদাই রাঁধে, বাজার করে, সব দিক সামলায়। সপ্তাহান্তে আমার স্ত্রী চলে আসে এখানে। কখনো আমি চলে যাই হলদিয়ায়। ছেলে—বউমা, মেয়ে ছুটি পেলে চলে আসে। আমাদের এই বাড়ি তখন যেন মুখরা মেয়ে। হইহট্টগোলে জমজমাট হয়ে ওঠে। মেঘনাদদাও তখন আহ্লাদে ষোলোখানা। একাই দশ হাতে সব সামলায়।

বাড়ি এসে আমি আর মেঘনাদদা একসঙ্গে রাতের খাওয়া খেয়ে নিলাম। খেতে বসে ওই ভদ্রলোকের গল্প করলাম। অবাক হয়ে শুনল মেঘনাদদা। সব গুছিয়ে মেঘনাদদার শুতে দেরি হয়। আমি শুতে চলে গেলাম।

আমার ঘরের দরজা ভেজানো থাকে। বন্ধ করি না। সকালবেলা মেঘনাদদা ঘুম থেকে ওঠার ডাক দেবে বিছানার পাশে বসে। আর তখনই আমি উঠব । কিন্তু কিছুদিন হল, একা—একাই আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। কখনো কোকিলের ডাকে, কখনো মোরগের ডাকে। আমার বাড়ির চারপাশের গাছে যে এখন কত রকমের পাখি ডাকে। ঘুম ভেঙে যায়। এসব ডাক বেশ ভালোও লাগে এক—একদিন।

আমি একটু উঁচু বালিশ পছন্দ করি। তাই আমার বালিশটার উপর আমার স্ত্রীর বালিশটাও দিই। এতে যেন অরাম লাগে। যেন আরাম লাগে। মেঘনাদদা দেখলে বকে। ডাক্তারের নিষেধের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজ বোধ হয় মেঘনাদদা খেয়াল করেনি। দুটো বালিশ পেতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘরের লম্বা জানালাটা দিয়ে বিকেলবেলার কনে দেখা আলোর মতো অদ্ভুত একটা আলো এসে পড়েছে। গতকালের সেই কোকিলটা ডেকে উঠল একবার। সকাল এসে পড়েছে আমার ঘরের জানালায়। কুয়াশা কেটে রোদ ওঠার মতো চোখের পাতা থেকে ঘুমটা সরে যেতেই আমার মনে হল, মাথাটা যেন অনেক নীচে পড়ে আছে। হাত দিয়ে দেখলাম, একটা বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে আছি আমি। আর—একটা বালিশ কোথায় গেল? ঘুমোবার সময় দুটো বালিশই তো উপর—উপর রেখে শুয়েছিলাম। আমি পাশে হাতড়ে দেখতে গেলাম, বালিশটা কোথায়? অমনি আমার হাতে লাগল একটা বরফ—ঠান্ডা কিছুর উপর। চোখ বড়ো করে তাকিয়ে দেখলাম, আমার পাশে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে অআছে সেই লোকটা। আমি আঁ—আঁ করে চিৎকার করেই....। আর কিছু মনে নেই। তারপরের কথা মেঘনাদদার মুখ থেকে শুনলাম জ্ঞান ফেরার পর। আমার চিৎকার শুনে মেঘনাদদা ছুটে এসেছিল আমার ঘরে। ফ্যাটা ফুল স্পিডে চালিয়ে চোখে—মুখে জলের ঝাপটা দিয়েছিল। আমি নাকি মিনিট পাঁচেক মড়ার মতো পড়েছিলাম।

এই মাত্র চোখ মেলে তাকালাম। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেঘনাদদা ঠাকুর প্রণাম করল কপালে দু—হাত ঠেকিয়ে। তারপর বলল, 'দাদাবাবু, তুমি চুপ করে বসে থাকো বিছানায়। আমি একটু দুধ গরম করে আনি। তুমি যেন এখনই উঠতে যেয়ো না!'

আমি বাধ্য শিশুর মতো ঘাড় নেড়ে মেঘনাদদার কথায় সায় দিলাম। কপালে গুঁড়ি—গুঁড়ি বৃষ্টির মতো ঘাম জমে আছে। নাকি ঘাম নয়, মেঘনাদদার দেওয়া জলো ঝাঁপটার গুঁড়ো?

মেঘনাদদা ব্যস্ত হয়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। ফ্যানের বাতাস যতটা ঠান্ডা লাগার কথা, তার চেয়েও অনেক বেশি ঠান্ডা লাগছে। তা হলে কি ভোররাতে বৃষ্টি হয়েছিল?

অভ্যেস মতো বালিশের পাশে মোবাইল ফোনটা রেখে ঘুমোই। হাতড়ে মোবাইলটা খোঁজার চেষ্টা করলাম। কোত্থাও পাচ্ছি না। ফের যেন ঘামতে শুরু করলাম। একবার মনে হল পাশের বালিশটার নীচে ফোনটা নেই তো? যেই বালিশটা তুলে সরিয়ে দিলাম, অমনি আবার আমার চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল। দেখলাম, বালিশের নীচে গত কালকের লোকটার সেই পাতাল রেলের টিকিটটা। টিকিটে সেই রক্তের দাগের মতো গোল লাল দাগ।

তারপর? আর আমার কিছু মনে নেই।

ও করকমলেষু

তিলোত্তমা মজুমদার

শনিবার সন্ধ্যা। সবুজকলির ঘর। বন্ধুরা ছড়িয়ে—ছিটিয়ে বসেছে কেউ বিছানায়, কেউ মেঝেতে। সবুজকলি শুয়ে শুয়ে পড়ে, শুয়ে শুয়ে লেখে। তাই ওর ঘরে কোনো চেয়ার—টেবিল নেই। পরীক্ষার সময়ও লিখতে লিখতে ও আধশোয়া হয়ে যেত।

ফেব্রুয়ারির শেষ এখন। দিনের কলকাতা তবু গরম হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় স্নিগ্ধ হাওয়ায় পরদা উড়ে যায়। আর ক—দিন পর দোলপূর্ণিমা। শুক্রবার পড়েছে। নীলাভ মন দিয়ে ক্যালেন্ডার দেখছিল। একটু আগেই সবুজকলি আর প্রভাতসূর্য ঘোষণা করেছে ওরা শিগগির বিয়ে করবে। মধুস্মিতা আর সন্দীপনের বাল্যপ্রেম। একেবারে ছোটোবেলার বন্ধু সবাই। সমবয়সি। একই পাড়ায় বেড়ে ওঠা। কেউ কারোকে ছেড়ে থাকতে পারে না। সবুজকলি ও প্রভাতসূর্যের গভীর বন্ধুত্বের মধ্যে সাম্প্রতিক প্রেমের সঞ্চারে ওরা খুশি। নীলাভ ক্যালেন্ডার দেখছে, কারণ দোলের ছুটিতে ও বন্ধুদের নিয়ে বেরোতে চায় কোথাও।

নীলাভ : খুব ভালো দিন, দ্যাখ। শুক্রবার দোল। শনি—রবি ছুটি। সোমটা জুড়ে নিলে টানা চারদিন।

প্রভাতসূর্য : কোথায় যাবি? চারদিনে কোনো ট্রেক করা যাবে না। আসা যাওয়ার সময় ধরতে হবে তো!

নীলাভ : ট্রেক আর ট্রেক! শুধু বেড়াতে যাবার জন্যই যেতে ইচ্ছে করে না? ধর এমন কোথাও, সারাদিন বারান্দায় বসে বসে দিন কেটে যাবে?

ঝাউ : প্লিজ, কোনো কঠিন ট্রেক করিস না। তোরা তো শুধু এ পাহাড় ও পাহাড় করিস। জানিস তো আমার ভার্টিগো আছে।

নীলাভ : আর আমার আপত্তি আছে। অখাদ্য। কী করতে যে যাস তোরা!

মধুস্মিতা : তুই যেন যাস না!

নীলাভ : আমি তোদের জন্য যাই। তোরা যা বিচ্ছু, একটা গার্জিয়ান টাইপ কেউ না গেলে... হ্যাঁ, জঙ্গল থাকলে আমার ভালো লাগে। গভীর সবুজ বন। গাছের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা টাটকা বুনো গন্ধ। পাতা—ঝরা সরু পথের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার ছিপছিপ শব্দ। পাখি ডাকছে। প্রজাপতি উড়ছে। নদী বইছে।

সবুজকলি : থামতে কত নিবি লাভো? এই নে চার আনা। (একটা সিকি ছুড়ে দিল।)

নীলাভ : এসব ভালো লাগবে কেন? ন্যাড়া ওঁচা পাহাড়, দাম্বা দাম্বা পাথরের স্তূপ দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে, নয়তো সাদা ফ্যাটফেটে বরফের চূড়া! ওই দেখে তো আহ্লাদে গলে যাস।

প্রভাতসূর্য : কাজের কথায় আয় লাভো। কলি, 'ভ্রমণবিলাস' কারেন্ট ইস্যুটা আনবি?

নীলাভ : ওসব ভ্রমণবিলাস—টিলাস ছাড়। চল বাগোরা যাই। বিষ্যুদবার ট্রেনে চাপব। শুক্রবার পৌঁছোব। ঝক্কাস চাঁদ উঠবে। তোরা প্রি—ম্যারিটাল হানিমুন করবি। আর যা করার এবেলাই করে নিবি। বিয়ের পর তো হানি শুকিয়ে যাবে, ফ্যাটফ্যাট করবে বুড়ি চাঁদ!

সবুজকলি : ওফ! এত বাজে বকে না লাভোটা!

প্রভাতসূর্য : কিন্তু বাগোরাটা কোথায়?

নীলাভ : কার্শিয়াং থেকে দশ—বারো কিলোমিটার ওপরে।

সন্দীপন : কার্শিয়াং? বস, দু—বার সান্দাকফু গেছি। আগোরা টাগোরা শুনিনি তো।

নীলাভ : আগোরা নয়, বাগোরা। এ নয় বি।

সন্দীপন : ওই হল।

নীলাভ : না। হল না। কার্শিয়াঙের কাছাকাছি আরও একশোটা জায়গা আছে, যেগুলোর নাম তুই জানিস না।

প্রভাতসূর্য : বাগোরায় ট্যুরিস্ট লজ আছে? জায়গাটা কেমন?

নীলাভ : শুনেছি খুব সুন্দর। ওটা কিন্তু ট্যুরিস্ট স্পট নয়। পণ্ডাদা বলছিলেন একদিন, আমরা যেতে চাইলে বনবাংলোটা বুক করে দেবেন।

সবুজকলি : ও! তোর সেই পণ্ডাদা, না? কী যেন? বনদপ্তরে কী যেন?

নীলাভ : বনমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব। যাবি তো বল। হাঁউটারও খুব অসুবিধে হবে না। কার্শিয়াং তো খুব উঁচু নয়।

ঝাউ : না না। যেতে পারব। কালিম্পং, দার্জিলিং গেছি তো। আর নীলাভ, আমাকে হাঁউ বললে এবারে ঠিক ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলব।

নীলাভ : না না! খাঁউ মাঁউ... কাঁদিস না! মনসিজ কষ্ট পাবে।

মনসিজ : কিছু মনে কোরো না, এই ট্রিপে আমি বাদ।

মধুস্মিতা : সে কী! ঝাউ তা হলে কী করবে?

নীলাভ : ম্যায় হুঁ না! (বুড়ো আঙুল নিজের বুকে ঠেকায়)। দারুণ প্রক্সি দিতে পারি।

সবাই হা হা হাসে। মনসিজও হাসে। ও ঝাউয়ের প্রেমিক। একটু বড়ো বয়সে। কিন্তু দলে মিশে গেছে। ওরা থাকে টালিগঞ্জে। বাকিরা লেকটাউনে। ঝাউকে ওরা পেয়েছে কলেজে।

ওদের খাওয়া হয়ে যাওয়া প্লেট সমেত ট্রে—টা গুছিয়ে ভেতরে দিয়ে এল সবুজকলি। নীলাভর পাশে বসল।

নীলাভ : এই, সরে বোস। তোর গায়ে সূর্যর গন্ধ।

(আরেক প্রস্ত হাসি।)

সবুজকলি : কিন্তু তোর কী হবে লাভো? প্রক্সি দিয়ে তো সারাজীবন কাটবে না! তোর যদি একটা ন্যাকাটাইপ বউ হয়, তাহলে তো অঙ্কপ্রশ্ন আনকমন হয়ে যাবে রে!

নীলাভ : আরে না না। যে—কোনো বউ পেলেই চলবে। আমি যা বউপাগলা!

প্রবল হইচই শুরু হল। প্রত্যেকেই কিছু বলতে চাইছে কিন্তু সবার কথা মিশে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র মনসিজর গলাই আলাদা করা গেল—মাথা নেই তার মাথাব্যথা!

নীলাভ : তোরা কী বুঝবি? যে—কোনো সুন্দরী দেখলেই আমি পাগলা হয়ে যাই। নতুন একজনকে না পাওয়া অবদি তাকেই বউ ভাবতে থাকি।

মধুস্মিতা : বাজে বকিস না। কলেজে গিটার বাজিয়ে স্বরচিত গান করতিস যখন, কত সুন্দরী তোকে ঘিরে থাকত। একটাকেও তুলতে পারলি?

সন্দীপন : শুধু সুন্দরী না! হাই ভোল্টেজ! নেহাৎ মধু আগেই আমায় পটিয়ে ফেলল তাই!

সবুজকলি : মধুটা অসম্ভব ভালো তাই। নইলে কে তোকে পাত্তা দিত রে কুমড়োপটাশ?

মনসিজ : নীলাভ কলেজে বাজিয়ে গাইত? গান গাইত?

প্রভাতসূর্য : ও অনেককিছু করেছে। আমরা যখন ইলেভেনে, ওর নাটক করার ইচ্ছে হল। পাড়াতেই থপুদার গ্রুপ ছিল। ও নিজেই বলুক না!

সবুজকলি : প্লিজ সূর্য! তপুদা বল!

প্রভাতসূর্য : (লাজুক হেসে) আসলে তপুদা। মোটা ভুঁড়িওলা—এই সন্দীপনের মতো, থপথপ করে হাঁটে, তাই থপুদা।

সন্দীপন : আমি থপথপ করে হাঁটি?

মধুস্মিতা : থপুদার বয়সে হাঁটবি। এখনই তো পাহাড়ে ঠেলে তুলতে হয়।

ঝাউ : সেটা কী রে? সেটা কী?

মধুস্মিতা : জোংরি গেছি আমরা। একেবারে খাড়াই পথ। সন্দুটা উঠতেই পারছে না এক জায়গায়।

সবুজকলি : শেষ পর্যন্ত আমি, মধু আর সূর্য ওকে পেছন থেকে ঠেলে তুললাম। উঃ! এর থেকে পাহাড় ঠেলা সোজা!

সন্দীপন : যাঃ! রোগা হয়ে গেলাম।

মধুস্মিতা : কবে?

সন্দীপন : বিয়েটা হোক। তুই যা খাটাবি! সব ঝরে যাবে।

মধুস্মিতা : এই এই—(দুমদাম মারে সন্দীপনকে। ও আরামের ভঙ্গি করে।)

মনসিজ : নীলাভর নাটকটা কী হল? ইন ফ্যাক্ট সূর্য, তোমাদের দু—জনকেই যা দেখতে, সিনেমায় নামতে পারতে। প্রথমে তো আমি ভেবেছিলাম তোমরা ভাই। কত তোমরা?

প্রভাতসূর্য : পুরো ছয়।

নীলাভ : জুতো পরলে ছয় এক। বডি দেখেছিস? সূর্যর ক্রিকেট খেলে। আমার না খেলেই।

সবুজকলি : পাগলা থাম। এবার তো উড়ে যাবি।

ঝাউ : নাটকের গল্পটা বল না!

নীলাভ : আরে নাটকের ইচ্ছে—টিচ্ছে নয়। সূর্য ক্রিকেট প্যাঁদাতে যায়। মধুটা গান শিখতে যায় দু—জনের কাছে। সন্দু আঁকতে যায়। কলিটা আগে ক্যারাটে শিখতে যেত, পরে কত্থক শিখতে লাগল। তো আমি ঘোড়াড্ডিম করি কী! নাটকে চলে গেলাম। ভালোই চলছিল। আমি নায়ক। রফিক আমার বন্ধু কিন্তু ঘটনাচক্রে আমাকে গলা টিপে খুন করবে। তো থপুদা বলে, 'রফিক তোর গলা টিপলে তুই আ আ আ করে আর্তনাদ করবি।' বললাম, 'গলা টিপলে গলা সাধার মতো আ আ আ বেরোবে কী করে তপুদা?' বলে, 'ডিরেক্টরের মুখে মুখে কথা বলিস না। অভিনয়টা অধ্যবসায়। যা বলছি কর।' শালা! ইচ্ছে করছিল ওর গলাটা টিপে দিয়ে দেখাই কীরকম আওয়াজ হয়। ওই শেষ। আর যাইনি।

প্রভাতসূর্য : তবে গানগুলো কিন্তু ভালো বেঁধেছিলি। ছেড়ে দিলি কেন কে জানে!

মধুস্মিতা : কোনো সেন্টু থেকে ছেড়েছে।

নীলাভ : যা ফোট!

মধুস্মিতা : শোন, গান যাকে ধরে, ছাড়ে না। তোর নিশ্চয়ই কোথাও ব্যথা আছে। সেন্টু মেরে গানে গাপ্পি দিয়েছিস।

সবুজকলি : বাদ দে তো। সবই ওর খেয়াল। এখন নয়নমণিকে নিয়ে কী আদিখ্যেতা করে ভাবতে পারবি না।

মনসিজ : নয়নমণি?

ঝাউ : লাভোর হুলো।

মনসিজ : নীলাভ? মানে হুলো মানে ও বেড়াল পুষছে?

সবুজকলি : শুধু পুষছে না। আমাদের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। বেড়ালটা যতদিন ছোটো ছিল কোনো ঝামেলা ছিল না। যেই বড়ো হয়েছে ওমনি মন উচাটন হয়েছে। লাভো আবার ওর গলায় একটা লাল ফিতে পরিয়ে রেখেছে। ফিতেসমেত ও মাঝে মাঝে হাওয়া হয়ে যায়। তখন ওর দুঃখ যদি দেখতে।

মনসিজ : আহা! বাড়িতে দেখার কেউ নেই?

সবুজকলি : আরে বেড়াল কি কুকুর যে দেখে রাখবে? তা ছাড়া কাকু কাকিমা দু—জনেই চাকরি করেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে ন—টা। কে বেড়াল কোলে বসে থাকবে? বাবু নিজেও তো কাজে যান।

প্রভাতসূর্য : আরও কী, ও বেড়াল হারালে খুঁজতে বেরোয়। কিছুতেই একা যাবে না কিন্তু। কলিকে ডাকবে। আমাকে ডাকবে।

সবুজকলি : একদিন কী হয়েছে শোন না, নয়নমণির দেখা নেই বেশ ক—দিন হল। কতদিন যেন লাভো?

নীলাভ : তিনদিন।

সবুজকলি : আমরা খুঁজতে বেরিয়েছি। আমি, সূর্য, লাভো। ঝোপঝাড়, লেকের ধার, এর—ওর বাড়ির বাগান—কোথাও বাদ নেই। হঠাৎ পাড়ার মুখে দাঁড়িয়ে সূর্য হেঁড়ে গলায় চ্যাঁচাতে শুরু করল—নয়নমণি! নয়নমণি! কিছুতেই থামাতে পারি না। লোকে কী ভাবছে বল, সব জানালার পরদা সরিয়ে তাকাচ্ছে। হঠাৎ নীচু হয়ে হাতটা বাটির মতো করে বলে—নয়নমণি নয়নমণি, এই তোর দুধ এনেছি, আঃ আঃ, চুঃ চুঃ।

প্রভাতসূর্য : (হেসে) লাভো ছুটে এসেছে। বলে—নয়নমণি কি কুকুর যে তুই চুঃ চুঃ করছিস?

ঝাউ : তারপর নয়নমণি এল!

প্রভাতসূর্য : সন্ধ্যাবেলা এল, পা না হাত ভেঙে।

নীলাভ : সূর্যর কথা আর বলিস না। রাস্তায় যে বেড়াল দেখে, বলে—ওই তো তোর নয়নমণি! আরে, আমার নয়নমণির গলায় লাল রিবন। আর একটা কান ছোটো।

প্রভাতসূর্য : ফিতে খুলে যেতে পারে না? আর দূর থেকে রাস্তায় বেড়ালের কান মাপা যায় নাকি?

সবুজকলি : কত বললাম, ওরে হুলোদের চরিত্র কখনো ভালো হয় না। তুই একটা মেনি পোষ। না হলে তোর জন্মদিনে একটা ল্যাপডগ দিচ্ছি! শুনলে তো!

মনসিজ : গান আর নয়নমণি—দুই—ই তো থাকতে পারে।

নীলাভ : না ভাই, পারে না। গানের দেবী অন্য কিচ্ছু সইতে পারেন না। হিংসুটে মেয়েছেলে!

সবুজকলি : আবার? আবার ? (নীলাভকে মারে।) বলেছি না ওই শব্দটা উচ্চারণ করবি না?

নীলাভ : (নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে) আরে! তোরা ওটায় রেগে যাস কেন? আমরা তো বেটাছেলে বললে রাগ করি না?

প্রভাতসূর্য : তা হলে কী ঠিক হল? বাগোরা?

মধুস্মিতা : তাই চল। কীভাবে কী ঠিক কর এবার। রাত হয়ে যাচ্ছে।

নীলাভ : তা হলে বিষ্যুদবার বেরিয়ে যাই আমরা? শুক্র—শনি—রবি থাকব। সোমবার ট্রেনে উঠলে মঙ্গলবার কলকাতা পৌঁছে যার যার অফিস যাওয়া যাবে।

ঝাউ : এই না। রবিবারে ফিরব। একদিন একটু রেস্ট নিতে হবে রে!

সবুজকলি : উফ! নেকুপুষুটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সন্দু, তুই তা হলে টিকিটের দায়িত্ব নে।

সন্দীপন : নিলাম। ওই ফ্লো চার্টই রইল তা হলে? সূর্য টিমলিডার। মধু ট্রেজারার। তুই আমি খাবার ম্যানেজমেন্টে। লাভো আগোরার দায়িত্ব নিচ্ছে।

নীলাভ : আগোরা না বাগোরা। এ নয়, বি। বিগ বি।

ঝাউ : আর আমি?

সবুজকলি : তুই আমাদের মাথা গুনবি বারবার। সবাই আছি কিনা। নিজেকেও গুনিস।

নীলাভ : একটা প্রস্তাব আছে।

সন্দীপন : বলে ফেল বাপ।

নীলাভ : কেউ সেলফোন সঙ্গে নেব না।

ঝাউ : এই না।

নীলাভ : কেন না? মনসিজর সঙ্গে পুটুর পুটুর কথা হবে না বলে? তবে শুনে রাখ, বাগোরায় সেল ফোনের সংকেত পাওয়া যায় না।

ঝাউ : রাস্তায় লাগতে পারে।

নীলাভ : কী নেশা! শোন হাঁউ, সেলফোন বিজ্ঞানের একটা তিতকুটে আবিষ্কার। বলিবে কি, সেলফোন কারে বলে, আহা! মুখোমুখি বসিবারে দেয় নাকো যাহা?

প্রভাতসূর্য : আমার মনে হয় এটা মানতে না পারার কিছু নেই।

ঝাউ : আরে সেলফোন এখন চশমার মতো। কানে না দিলে ঝাপসা শোনায়।

ঝাউয়ের প্রতিবাদ দাঁড়াল না। বাকি বন্ধুরা জানে বন—পাহাড়ের মৌনতা কী সম্মোহক! ওখানকার হাওয়ার শব্দ, ঝিঁঝির ডাক, জন্তুজানোয়ারের হাঁকাহাঁকি আর পাতা নড়ার শব্দ এক গভীর ধ্যান স্থাপন করে। তাকে উপলব্ধি করতে পারার আনন্দ অমৃতের সমান। উড়োজাহাজের শব্দ তাকে কলুষিত করে। শিউরে ওঠে বনাঞ্চল। দূরভাষকোষে বেজে—ওঠা ধাতব আহ্বায়ক সুর তাকে পীড়ন করে। গাছের শরীর থেকে আদি অশ্রু পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায়। ফুটবার উপক্রমেও ফুল ঝরে যায় ভয় পেয়ে। জঙ্গল—তাকে চোখের পাপড়ি দিয়ে ছুঁতে হয়।

২

শিয়ালদহ ইস্টিশানে দুটি নতুন প্ল্যাটফর্ম হয়েছে, নয় এ ও নয় বি। সন্ধে সাতটা পঁচিশ। পঁয়ত্রিশে ছেড়ে যাবে আপ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। প্ল্যাটফর্মে লোকজনের ব্যস্ততা, মালবাহকদের চিৎকার, হকারের হাঁকাহাঁকি, ভিখিরির আবেদন মিশিয়ে বিচিত্র হল্লা। যতজন ট্রেনে চাপতে আসে, চাপাতেও আসে ততজন। তাই ট্রেন প্রস্তুত হলেই ভিড় হয়ে যায় কামরাগুলো। মনে হয় এত লোক একটাই কামরাতে! প্রথমদিকে প্রত্যেক যাত্রীই একে অচেনা অপরকে সন্দেহের চোখে দেখে। রুক্ষভাবে বলে—ওই সাতাশ নম্বরটা কিন্তু আমার! কিংবা—আপনার সুটকেসটা একটু ঘুরিয়ে রাখুন না, আমাদেরটাও তো রাখতে হবে। বুবু, নিজের জায়গায় চুপটি করে বসো। জায়গা দখল হয়ে যাবে। তারপর ট্রেন ছাড়ার সময় হলে অতিরিক্ত লোকেরা নেমে জানালার কাছে ভিড় করে। কেউ আর কারও জায়গা দখল করে না। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেলে কিছুক্ষণ নানা স্বর—হ্যাঁ হ্যাঁ! এই ছাড়ল। হ্যাঁ পৌঁছে খবর দেব—সেলফোনে বার্তা পাঠায়। এরপর জড় বিষাদ নেমে আসে কামরা জুড়ে। বাচ্চারা কাঁদে, বায়না করে। বড়ো দল থাকলে কে কোথায় শোবে পরিকল্পনা করে। যারা একক, কিংবা দু—জন, কিছুক্ষণ আগেকার সন্দিহান দৃষ্টি ঝেড়ে ফেলে এ ওর পত্রিকা চেয়ে নেয়। একসময় পত্রিকা হাতের মুঠোয় রেখে, কিছুক্ষণ আগেকার ওই রুক্ষতাও গিলে ফেলে শুরু হয় আলাপচারিতা। কতদূর যাবেন?

দেখতে দেখতে সাড়ে সাতটা বাজল। আর পাঁচ মিনিট। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের ত্রিস্তর শয্যাযুক্ত বাতানুকূল কামরার সামনে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাতসূর্য। নীলাভ ছাড়া বাকি চারজন ভিতরে বসে আছে একই উদ্বেগে। নীলাভ এখনও আসেনি। এই মুহূর্তে ওরা সবাই সেলফোনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে। কেউ মুখে কিছু বলছে না। পত্রিকায় বা ক্যামেরায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছে। এখন কামরার বাইরে প্রভাতসূর্য।

প্রভাতসূর্যর ভাবনা : কোথায় আটকাল লাভোটা? সেরকম জ্যাম তো দেখলাম না। ও তো সল্টলেক থেকে আসবে। না না! ও তো বলেছিল অফিস থেকে বাড়ি ফিরবে একবার। তার মানে লেকটাউন থেকেই আসবে। আমি তো সরাসরি অফিস থেকে এলাম। মধুটাও। কলি আর সন্দুটা যদি লাভোকে নিয়েই আসত। সামনের লোকটার কাছে সেলটা চাইব? যদি ভাবে কোনো বদ মতলব আছে? যদি না বলে দেয়? লোকটা দেখতে বেশ ভদ্র। চাই? আমাকে সন্ত্রাসবাদী ভাববে না তো? চার—পাঁচদিন দাড়ি কাটা হয়নি। লোকটা কথা বলেই যাচ্ছে। এত কী কথা মানুষের? আচ্ছা, যদি এমন হয়, দুটি সেল সংযোজিত হলেই আকাশে তরঙ্গরেখা আঁকা হয়ে যাবে! সবুজ ঢেউ চলতেই থাকবে, যতক্ষণ কথা চলে! কী হবে তা হলে? নীল আকাশ সবুজ হয়ে যাবে। ওই তো নামিয়েছে। তেত্রিশ হয়ে গেল। নাঃ! বলেই ফেলি!

প্রভাতসূর্য : (জনৈক যাত্রীকে) মাপ করবেন। আমাদের এক বন্ধু এখনও পৌঁছোয়নি। আমাদের কারও কাছে ফোন নেই। আপনারটায় কথা বলতে পারি? শুধু জানব ও কোথায় আছে।

যাত্রী : কেন? ফোন নেই কেন? আজকাল ফোন ছাড়া কেউ পথে বেরোয়?

প্রভাতসূর্য : না, মানে, আছে। আমরা আনিনি। আপনার অসুবিধে থাকলে..

যাত্রী : না না! অসুবিধে কী! বলুন নম্বরটা!

প্রভাতসূর্য নম্বর বলছে। ভদ্রলোক ডায়াল করছেন। কানে চাপলেন। সুইচড অফ। আবার আবার। প্রভাতসূর্য ধন্যবাদ জানিয়ে আলোর সংকেত দেখল। এখনও লাল আছে।

ঝাউয়ের ভাবনা : বললাম ফোন ছাড়া চলে না আজকাল। বিশ্ববখাটেগুলো শুনলে তো! মনসিজ কী করছে এখন? লাভোটার আর কী! দিয়ে দিল প্রস্তাব। প্রেম তো করল না জীবনে। আশ্চর্য কিন্তু। বেশি আকর্ষণীয় বলেই ওর বউ, মানে প্রেমিকা জুটল না। সূর্যটা পর্যন্ত যাজ্ঞসেনীর সঙ্গে প্রেম করেছে কিছুদিন। আচ্ছা, সূর্যকে কী করে ল্যাং মারল যগ্যি? সূর্যর মধ্যে একটা নিরুত্তেজ ভাব আছে। কতখানি গরম বোঝা যায় না। ধুস! কীসব ভাবছি! সূর্য সেক্সি কিনা শেষ পর্যন্ত তাই ভাবতে হবে নাকি? ধুস! সমবয়সি বন্ধুদের শরীর নিয়ে ভাবতে বিচ্ছিরি লাগে। একটু বড়ো বয়সের বরই আমার পছন্দ।

সন্দীপনের ভাবনা : কেন যে লাভোটাকে তুলে আনলাম না। ওই তো বলেছিল, তোরা চলে যাস। খাবার ম্যানেজার হওয়ার ঝামেলা কম নাকি? দু—দিন থাকব কিন্তু নিতে হল সবই। বাগোরায় কিছু পাওয়া যায় না। আমি আর কলি তো বেরিয়ে বাজার করে স্টেশনে এলাম। সঙ্গে সূর্যর ব্যাগ, মধুর ব্যাগ। লাভোর ব্যাগই গোছানো হয়নি। হলে আমরা আনতে পারতাম। আর এনেই বা কী লাভ হত? কোথায় আটকাল? সাতটা চৌত্রিশ। সূর্যর এবার ট্রেনে উঠে পড়া উচিত। এখান থেকে কারও ফোন ম্যানেজ করে দেখলে হয়। কিন্তু হিসেবমতো লাভোর এখন স্টেশনের মধ্যে চলে আসার কথা। ফোন কি সঙ্গে রাখবে? মোটেই না। ও এসব ব্যাপারে দারুণ সিরিয়াস। পাগলের মতো বন ভালোবাসে। সিমলিপালে দাবানল থেকে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসছিল পশুরা। লাভোটা কেঁদে ফেলেছিল। ভেতরটা খুব নরম। পরশু রাতে হঠাৎ চলে এল। বলে, থাকব তোর সঙ্গে। থাক। মাঝরাতে আমাকে ঠেলে তুলেছে। কী হল? ঘুম আসছে না। আর কোনো কথা হয়নি। ও একটু অস্থির আছে। কারণটা বলবে ঠিকই। এখন আয় বাবা। আর টেনশন দিসনি।

মধুস্মিতার ভাবনা : কিছু হল না তো লাভোর? ও খুব দায়িত্বসচেতন। বাইরে ছ্যাবলামো করে। পেছনে লাগে। আসলে খুব গভীর আর চাপা। পরশু রাতে সন্দুর সঙ্গে ছিল। ভোর পাঁচটায় আমাকে ফোন করে তুলল। বলে, মধু, আমার গানগুলো তোর মনে আছে? আছে তো। এই জানতে তুই আমায় জাগালি? আমি এখন কোথায় বল তো? কোথায়? সন্দুর ঘরে হা হা! একটা গান শোনা মধু। চলে আয়। না না, কাকু—কাকিমাকে বিরক্ত করব না। ফোনে শোনা। যেন কত দূর থেকে তুই গাইছিস এমনভাবে শুনব। তোর গান? ধুস! ও তো তোরা সর্বত্র গাস। বনে, পাহাড়ে, তাঁবুতে, ট্রেনে। আমার মাথা খারাপ যে ভোরবেলা নিজের গান শুনতে চাইব? গান লেখা ছেড়ে দিলি কেন রে? কোনো ব্যথা থাকলে বল না আমাদের? ব্যথা? না রে মধু! সব ব্যথা কি বলা যায়? আমরা তো কেউ কিচ্ছু লুকোইনি এতকাল। তবে কি এই আমাদের দূরত্ব শুরু হল লাভো? না রে না! ব্যথা—ফ্যাতা নেই। উফ! জেরা না করে গানটা শোনা। কোন গান শুনবি বল? ওই যে, রবীন্দ্রসংগীত—বীণা বাজাও হে...। বীণা বাজাও হে মম অন্তরে/স্বজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে—আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে... চুপ করে ছিল। আমিই ডাকলাম। কীরে আছিস? মধু, গান ছাড়িস না কখনো। না ছাড়ব না। কথা দিচ্ছিস তো? তুই ছাড়লি কেন? আমার কথা বাদ দে। ওসব শখের গানবাজনা। সন্দু তো ভালো রোজগার করছে। তুই চাকরি ছেড়ে দে। শুধু গান কর। তাই হয় পাগল? কেন হয় না রে? আত্মনির্ভরশীল হবি? সন্দু যদি তোর মতো প্রতিভা পেত, তুই ওকে সুযোগ দিতি না? দু—জন যদি পরস্পরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে নাই পারল, তা হলে আর কীসের ভালোবাসা বল তো? আজ অফিস যাবি না? যাব তো। তা হলে একটু ঘুমো এবার। আমার কথাটা ভাববি তো মধু? ভাবব রে ভাবব।

কিছু একটা ছিল ওর স্বরে। আনন্দের অভাব। বিষাদ। কেন? কোনো কিছুতে কষ্ট পেয়েছে। কী সেটা? দেখি, বাগোয়ায় গিয়ে সবাই মিলে চেপে ধরব। না। তা হলে আর গুটিয়ে যাবে। একাই ওকে নিয়ে বসব একদিন। এখনও তো এল না। ইস, লাভোটা না এলে যাবারই কোনো মানে হয় না। সারাক্ষণ ও—ই তো মাতিয়ে রাখে।

সবুজকলির ভাবনা : ও চিজ ভালোবাসে বলে একগাদা নিলাম। ভাত খাবার পর বাবুর মশলা লাগে বলে ক্রোড়পতি গুলিয়া নিলাম। শুধু ওটা নেব বলেই আমরা ফুলবাগান মোড়ে গোকুলচাঁদে গেছি। আর দেখো, কোনো পাত্তা নেই? কাল রাতে এসে বলে, নয়নমণির ভার নিবি কলি? অসম্ভব। তার চেয়ে তোর ভার নেওয়া সোজা। তোর হঠাৎ নয়নমণিকে ভার লাগছেই বা কেন? দেখাশোনা করতে পারছি না যে। মাকে বললাম, চাকরি ছেড়ে নয়নমণির ভার নাও, চটে গেল। তা তুই তো খুব আহ্লাদের কথা বলিসনি। নয়নমণি এখন অ্যাডাল্ট হয়েছে। ওকে অত চোখে চোখে রাখার কী আছে? কাকু—কাকিমা যদি এখন তোকে চোখের আড়াল করতে না চান তোর ভালো লাগবে? শুনে হ্যা হ্যা করে হাসল। স্রেফ আড্ডা মারতে এসেছিল পাজিটা। যত দুর্বুদ্ধি ওর মাথায়। একদিন বলে, মানুষের কোন অংশটা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত বল তো? সবাই বললাম পা। বলে, না পশ্চাদ্দেশ। ওই দেশটার কথা কেউ ভাবে না রে! ভারতবর্ষের চেয়েও খারাপ অবস্থা। উফ, পারেও। আসুক আজ। কিলোব।

সাতটা পঁয়ত্রিশ। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে জ্বলে উঠল সবুজ সংকেত। যাত্রীরা যারা বাইরে ছিল, ব্যস্ত পায়ে ট্রেনে উঠল। প্রভাতসূর্যও উঠল। কাচের দরজা ঠেলে চলে এল বন্ধুদের কাছে। সবাই মুখ গোমড়া করে আছে। ট্রেন দুলে উঠল। গতি বাড়াল।

ঝাউ : কী হবে?

প্রভাতসূর্য : দেখি, বিধাননগর স্টেশনে উঠতে পারে। সন্দু ও কোচ নাম্বার জানে তো?

সন্দীপন : বলে তো দিয়েছিলাম। আতাক্যালানেটার মনে আছে কিনা।

ঝাউ : বললাম ফোনটা আনি।

প্রভাতসূর্য : আনলে কী হত? এখন ওদের বাড়িতে কেউ থাকে না। একজনের ফোনে চেষ্টা করেছিলাম। লাভো সুইচড অফ।

সবুজকলি : বাংলোর বুকিং স্লিপটাও তো ওর কাছে।

প্রভাতসূর্য : সেটা কথা না। আমরা বাগোরা না গিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারি। কিন্তু ও ফাঁসল কোথায়?

(বিধাননগর স্টেশন। ট্রেন থেমেছে।)

প্রভাতসূর্য ও সন্দীপন : দরজায় এসে উঁকিঝুঁকি মারছে। মেঝেয় আরশোলা দৌড়োচ্ছে। প্রভাতসূর্য একবার পতঙ্গহত্যার ওষুধ প্রয়োগের তারিখ দেখে নিল। মাত্র দু—দিন আগের। আবর্জনার পাত্রের চারপাশে এরই মধ্যে কিছু প্যাকেট জমেছে। অথচ পাত্রটি ফাঁকা। যে ফেলেছে, ভেতরে ফেলার দায়িত্ব বোধ করেনি। টয়লেটের দুর্গন্ধ আসছে থেকে থেকে। ওরা যেখানেই যায়, রুম ফ্রেশনার, হ্যান্ডরাব, টিসু পেপার, ন্যাপকিন, ওষুধপত্র, টর্চ, দড়ি সঙ্গে রাখে। ট্রেকিং—এর অভ্যাস। ব্ল্যাকটেপ, ছুরি, সয়েল ব্যাগও বাদ থাকে না। নীলাভ এখানেও উঠল না। ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। ওরা ভেতরে এল। কারও মুখে কথা নেই। এত চুপচাপ ওরা কখনো ভ্রমণ করে না। ট্রেন দমদম পেরিয়ে গেল। এরই মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছে। পিঠে ব্যাকপ্যাক নিয়ে নীলাভ উপস্থিত।

নীলাভ : এসে গেছি! এসে গেছি!

সবুজকলি : কোথায় ছিলি এতক্ষণ! পাজি কোথাকার!

নীলাভ : (ব্যাকপ্যাক খুলতে খুলতে) আর বলিস না। অসময়ে ওপরওলা ডাকলে যা হয়।

সবুজকলি : তোর বস কি স্যাডিস্ট? জানে না তুই আজ ট্রেন ধরবি?

নীলাভ : জানিসই তো জীবন! কে কোথায় ফেঁসে যায় কে বলতে পারে!

সবুজকলি : গুল্লু থামা। কী হয়েছিল তাই বল।

নীলাভ : ওই যে বললাম।

প্রভাতসূর্য : তুই উঠলি কোথায়?

নীলাভ : বিধাননগরে।

প্রভাতসূর্য : আমরা তো দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম। তোকে দেখতে পেলাম না তো।

নীলাভ : পাবি কী করে? আমি তো ট্রেন ছেড়ে দেবার পর পেছনের একটা কামরার হাতল ধরে ঝুলে পড়লাম। তারপর ভেস্টিবিউল দিয়ে এসেছি।

মধুস্মিতা : খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলি লাভো!

নীলাভ : ওফ! যা ফেঁসে গিয়েছিলাম, জাস্ট একটা জিনিসের জন্য আসতে পারা গেল।

ঝাউ : কী জিনিস রে, কী জিনিস?

সন্দীপন : কী আবার? বাংলোর বুকিং স্লিপ। ওটা দেখিয়ে বসের কাছ থেকে ছাড়া পেলি?

বোতলের সিল খুলে গলায় জল ঢালতে ঢালতে হাসল নীলাভ।

৩

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। সকাল সাতটা। মেঘলা আকাশ। ব্যাগপত্র বয়ে এক জায়গায় রাখল ওরা। গাড়ি ঠিক করতে হবে। পিসিও থেকে বাড়িতে ফোন করতে হবে। চাল, ডাল, মুরগি, মশলা বাজার করতে হবে। চা—ওয়ালা এল। সবাই চা নিল একটা করে। সবুজকলি বাস্কেট থেকে বিস্কিট বার করে সবাইকে দিল। পার্কিংয়ে এই সকালেও অনেক গাড়ি। বেশ শীত—শীত লাগছে ওদের।

সবুজকলি : সবাই জ্যাকেট পরে নে।

যে যার ব্যাগ থেকে জ্যাকেট বের করে পরছে।

প্রভাতসূর্য : মধু চল আমরা গাড়ি ঠিক করি। সন্দু লাভো তোরা ফোনটা করে দে বাড়িতে। মালগুলো দেখিস সবাই।

দু—দল দু—দিকে গেল।

ঝাউ : কত ভিখিরি দ্যাখ।

সবুজকলি : খুব বেড়ে গেছে। আগে এখানে এত দেখিনি।

ঝাউ : কষ্ট লাগে। আমরা মজা করছি, আর ওরা...

সবুজকলি : এটাই জীবন হাঁউ। কষ্ট তো হয়—ই। এবার ফিরে আমরা আমাদের এনজিও রেজিস্ট্রেশন করব। লাভো সব স্কিম করেছে। কাজ গোছানোই আছে।

ঝাউ : হ্যাঁ। সেই কলেজের প্ল্যান, না? নাম তো অনেক এসেছিল। কোনটা রেজিস্ট্রেশনে যাবে রে? আমরা কি শুধু বৃত্তি দিচ্ছি?

সবুজকলি : না না। বছরে আপাতত চারজনের হস্টেলে থেকে পড়ার খরচ। গ্রামাঞ্চলের দুস্থ অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য। নাম হল ষাড়ব। মধু দিয়েছিল। দ্যাখ দুটো ঠিক ঝগড়া করতে করতে আসছে। নীলাভ বলেছে,আমাদের বৃদ্ধাবাসের নামটাও হবে ষাড়ব। সেটা নাকি ষাঁড়বও হয়ে যেতে পারে। (দু—জনের উচ্চকিত হাসি।)

সন্দীপন : বলছি কারও সেল চেয়ে ফোন করি, দেবে না।

নীলাভ : কেন দেব? কথা ইজ কথা।

সবুজকলি : বুথে পেলি না?

সন্দীপন : ঝাউয়ের বাড়িতে ফোন করলাম, মনসিজকে করলাম, পরিষ্কার। যেই আমার বাড়িতে করেছি ওমনি খ্যার খ্যার খ্যার। বোধহয় লেকটাউনের সব লাইন খারাপ। তোদের বাড়িতেও এক অবস্থা। কারও

সেলের নম্বর মনে নেই।
সবুজকলি : অন্য বুথে যা। আমাদের পাড়ার অন্য একজনকে বললেই তো হবে।
নীলাভ : আমি দেখছি। আমি বলে দিচ্ছি। কলি, তোর মা—র সেল নম্বরটা বল তো। আমি বাড়িতেও বলে দিচ্ছি।
নীলাভ চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরেও এল।
নীলাভ : সব্বাইকে বলে দিলাম।
সবুজকলি : সব ঠিকঠাক?
নীলাভ : (অন্যমনস্ক) না রে! কাল নয়নমণি চারতলা থেকে পড়ে গিয়ে...
ঝাউ : মারা গেছে!
নীলাভ : (হেসে) না। আহত হয়েছে। মাথায় চোট পেয়েছে। যাক গে! ওদের গাড়ি ঠিক করতে এতক্ষণ লাগছে কেন? তোরা দাঁড়া। আমি দেখি। সন্দু, অবলাগণ তোর দায়িত্বে রইল।
সবুজকলি নীলাভকে মারতে যায়। নীলাভ হাসতে হাসতে সরে পড়ে। সবুজকলি তাকিয়ে থাকল ওর যাবার দিকে।
সবুজকলি : আশ্চর্য খেয়ালি ছেলে। নয়নমণির জন্য অস্থির। অথচ এখন মনে হল কিছুতেই কিছু যায় আসে না। মাথায় চোট পেয়েছে শুনেও বিকার নেই। গাড়ি ঠিক করতে চলে গেল।

৪

পার্কিং লট। প্রভাতসূর্য ও মধুস্মিতা একের পর এক গাড়ি ধরছে। একটু বড়ো গাড়ি চাই ওদের। ছ—জন মানুষ। এত ব্যাগেজ।
গাড়ি ১ : বাগোরা? নামই শুনি নাই।
প্রভাতসূর্য : আমরা চিনিয়ে নিয়ে যাব।
গাড়ি ২ : না না। ওইদিকে যাব না। রাস্তা খারাপ।
মধুস্মতা : রাস্তা তো সব জায়গাতেই খারাপ।
গাড়ি ৩ : যাওয়ার ইচ্ছা নাই। কেন, অত বলতে পারব না।
নীলাভ : কীরে, গাড়ি পেলি না?
মধুস্মিতা : কী জায়গা রে! দাঁড়িয়ে আছে, তবু যাবে না! কারণ ইচ্ছে করছে না!
নীলাভ : চল, ওই গাড়িটা ধরি। ওই দূরের সুমোটা। কেউ তো যাবেই।
তিনজনে এগোল। ওদেরই মতো একটি ছেলে। এককথায় রাজি হয়ে গেল। ওর নাম পটাই। গাড়ির পেছনে লেখা পটাইয়ের গাড়ি। মধুস্মিতা কথা বলে নিল টাকাপয়সার ব্যাপারে। গাড়ির অবস্থা দেখে নিল। পটাই গাড়ির যত্ন করে।
প্রভাতসূর্য : লাভো, আজ একটা ভুটান বাম্পার কেন।
নীলাভ : গাড়িটা লেগে গেল বলে? ক্ষমতা বন্ধু ক্ষমতা।
প্রভাতসূর্য : তোর এরকম দূরদর্শী ক্ষমতা আগে দেখিনি কিন্তু। যা দূর থেকেই গাড়িটা টার্গেট নিলি!
নীলাভ : (জোরে হেসে) সূর্য, তোর কথায় কলির টান লেগেছে।
প্রভাতসূর্য : চ্যাংড়ামো করিস না।
গাড়ি চলছে। সামনে নীলাভ ও মধুস্মিতা। মাঝে প্রভাতসূর্য, সবুজকলি, ঝাউ। পেছনে মালসমেত সন্দীপন।
নীলাভ : পটাই, তোমার বাড়ি কোথায়?
পটাই : মকাইবাড়ির নাম শুনেছেন? ওই মকাইবাড়ি।
নীলাভ : গাড়িটা তোমার?
পটাই : হ্যাঁ। দেখলেন না পেছনে লেখা?

নীলাভ : কেমন রোজগার হয় গাড়ি থেকে? ভালো?

পটাই : ওই, ভগবানের কৃপায় চলে তো যাচ্ছে। বাবা—মা, বউ, দুই বাচ্চা, দুটো বোনের বিয়ে দিলাম। আগে একটা মারুতি ভ্যান ছিল। আমার প্রথম গাড়ি। বেচে এটা কিনলাম।

নীলাভ : তোমার দুই বাচ্চা? কত বড়ো?

পটাই : একটা পাঁচ, একটা তিন!

নীলাভ : তোমার বয়স কত পটাই?

পটাই : (লাজুক হেসে) এই পঁচিশ। আঠেরো বছরে বিয়ে করেছিলাম। বউকে নিয়ে পালিয়ে, সেবক কালীবাড়ির নাম শুনেছেন তো? ওখানে বিয়ে করেছিলাম। সিঁদুর পরিয়ে বললাম, তুমি আমার আমি তোমার। আপনারা বাজার করবেন তো? আজকে শুকনা হাট আছে। সকাল থেকে বসে যায়। ওখানে করে নিতে পারেন। বাগোরাতে কিছু পাওয়া যাবে না।

আকাশে ঘনিয়ে এসেছে কালচে—নীল মেঘ। ওরা দ্রুত বাজার সারল। বাজার ছাড়িয়ে একটু এগোতেই ঝড় উঠল দারুণ। মেঘ নেমে এসেছে এমন, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। কালো মেঘের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ধুলোর ঘূর্ণি আর হাজার হাজার ঝরা পাতা। গাছের ডালপালা এলোমেলো অস্থির দুলছে। আছড়ে পড়ছে বাঁশ। ওরা জানালার কাচ তুলে দিয়েছে। চুপ করে ঝড়ের রূপ দেখছে। কথা বলতে ভুলে গেছে, খিদের কথা ভুলে গেছে। খোলা আকাশের তলায়, খোলা প্রান্তরে বড়ো বড়ো গাছগাছালির ঝাঁকে এমন অনিরুদ্ধ ঝড় ওরা কলকাতায় দেখতে পায় না। ঝড় তাণ্ডব। কিন্তু তাণ্ডবও মনোমোহন।

গাড়ি শুকনা বনে ঢুকল আর ঝাঁপিয়ে এল বড়ো বড়ো ফোঁটার বৃষ্টিময় ঘন অন্ধকার। ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য বৃক্ষসব কোল দিতে চাইল ওদের। ওদের আড়াল করে নিজেরা ভিজতে থাকল। উইন্ডস্ক্রিনে মুহূর্তে জমে যাচ্ছে অসংখ্য ফুল পাতা। প্রভাতসূর্য সচেতন হল। এত দুর্যোগে একটুদাঁড়িয়ে যাওয়া ভালো। আকাশ কাঁপিয়ে চমকাল বিদ্যুৎ।

প্রভাতসূর্য : চল, এখানে গাড়ি থামিয়ে খেয়ে নিই। ততক্ষণে ঝড়বৃষ্টি কিছুটা ধরে যাবে।

গাড়ি থামল একটি অচেনা গাছতলায়। তার থেকে শত শত ফুল পড়ছে বাতাসে দ্রুত পাক খেতে খেতে। যেন অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট প্যারাসুট। ওরা কেউ জানে না এ কী ফুল! কী গাছ! পটাইও জানে না। প্লেট বেরুল। কলা, ডিমসেদ্ধ, পাউরুটি, জ্যাম, সন্দেশ বেরুল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রেকাবি ভরে উঠল জলখাবারে। সবুজকলি সবার হাতে হাতে খাবার এগিয়ে দিল। এতক্ষণে সবাই খিদে বোধ করছে। ঝড়ের মোহময়তার ঘোর আর নেই। বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়ার দাপট কমে যাচ্ছে। নীলাভ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ঝাউকে দেখল।

নীলাভ : হাঁউ, এই যে বৃষ্টি নামল, আমরা বাগোরায় গিয়ে কী দেখব বল তো?

ঝাউ : আমি কী করে জানব? আমি কি গিয়েছি আগে?

নীলাভ : সে তো আমরাও যাইনি? তবু জানি। ওখানে গিয়ে আমরা দেখব পাইন বন। দুশো তিনশো ফিট বা তারও বেশি উঁচু। দেখব কতরকম ফুল, ফল। একরকমের ফুল—সে তো তুই দেখলেই আঁতকে উঠবি। ঠিক সাপের ফণার মতো। আবার লম্বা জিভও বেরিয়ে আছে। স্থানীয় লোকেরা ওকে বলে বাকো। শহুরেরা বলে স্নেক অর্কিড। আর কী দেখব বল তো? আর দেখব পাহাড়ের পর পাহাড় সাজানো ছবি, পাহাড়ি মানুষ, আর জোঁক!

ঝাউ : জোঁক! ও মা গো! গায়ে উঠবে না তো?

নীলাভ : ছাতা এনেছিস? আনিসনি। গায়ে কী? গাছ থেকে টুপ করে মাথায় পড়বে। পা বেয়ে ট্রাউজারে ঢুকে যাবে। অস্থান কুস্থান কিচ্ছু কি বাদ রাখবে? এই মধু—কলিদের জিজ্ঞেস কর না, সেবার বাক্সা ফোর্ট যেতে কী হয়েছিল, কিংবা সিকিমের উত্তরেতে?

ঝাউ : ওমা! আমি কোথাও যাব না। ঘরে বসে থাকব। জোঁকের মুখে নুন—এই তোরা ক—প্যাকেট নুন নিয়েছিস?

পটাই : গায়ে একটু কেরোসিন তেল মেখে নেবেন না তামাকপাতা, জোঁক ধরবে না।

ঝাউ : অ্যা ম্যাঃ!

প্রভাতসূর্য : ওকে ভয় দেখাস না লাভো। হাঁউ, আমরা এতজন আছি, জোঁক একা তোকে ধরবে কেন? ভাগ হয়ে যাবে, ভাবিস না।

সবুজকলি : ও এখন মা—র কাছে ফিরে যেতে চাইলে আমি কিন্তু নিয়ে যেতে পারব না। (সবাই হাসে। সবুজকলি একটা বড়ো সেলোফেন প্যাকেট এগিয়ে দেয়।) এর মধ্যে যার যার প্লেট ফেলো। বাগোরায় নিশ্চয়ই ডাস্টবিন পাব।

পটাই : কার্শিয়াঙে পাব। ফেলে দেব।

বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় নেই। গাড়ি চলতে শুরু করল।

সন্দীপন : এই মধু। চুপ করে আছিস কেন? পেট পুরে খাওয়ালুম, এবার গা। হিট আর্টিস্ট দু—জনেই তো সামনে।

মধুস্মিতা ধরল। বন—পাহাড় নিয়ে নীলাভর লেখা গান। এই গানটায় মধুস্মিতা সুর দিয়েছিল। বন্ধুরা গলা মেলাল। একের পর এক নানাধরনের গানের মধ্যে দিয়ে ওরা অতিক্রম করেছিল বৃষ্টিভেজা পথ। সবুজকলি দেখল অন্যমনস্ক হয়ে আছে নীলাভ।

সবুজকলির ভাবনা : লাভোটার হল কী? এবারের মতো উদাস আগে কখনো দেখিনি। হইচইয়ের চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রাণের অভাব। আগে কিছু হলে হুড়মুড় করে সব বলে দিত। কলেজ—ইউনিভার্সিটি পর্যন্তই সব ঠিক আছে। কাজের জগতে ঢুকে পড়লে বন্ধুদের সবার আলাদা আলাদা জগৎ। আলাদা বিপন্নতা। আলাদা বিরক্তি। ঈর্ষা। প্রতিযোগিতা। আমার অফিসে যেমন শাঁওলির সঙ্গে হচ্ছে। বসের মন পাবার জন্য শরীর... উঃ জঘন্য! সহ্য করতে পারি না। এরকম কয়েকটা মেয়ের জন্যই পুরুষগুলো সব মেয়েকে খাদ্য ভাবে। কাজের সঙ্গে শরীরটা ভাবে ডিউটি—ফ্রি চিজ! সবাই কি একরকম? না, তা না। তবে শাঁওলির ব্যাপারটা বন্ধুদের এখনও বলিনি। কত না বলা কথা জমে যাচ্ছে। আগের মতো রোজ তো আড্ডা হয় না। খুব মিস করি। কী টান ছিল! ছুটির দিনেও গ্রুপ স্টাডির নাম করে হি হি! এখন কি টান কমে গেছে? ধুস! বৃদ্ধ বয়সে একই বৃদ্ধাবাসে থাকব না সবাই?

৫

এখন আর বৃষ্টি নেই। কার্শিয়াঙের পর থেকে পথ ক্রমশ সংকীর্ণ আর এবড়োখেবড়ো। তেমনি খাড়াই। পথের ধারে আশ্চর্য ফুলের মালা। কী অপার্থিব বর্ণময়তা তাদের। বন ক্রমশ ঘন হচ্ছে। তারই মধ্যে পথের ধারে ছোট্ট ছোট্ট কাঠের বাড়ি। কাচের জানালা। বারান্দায় কালো সেলোফেন প্যাকে ফুলের গাছ। দু—পাশে দীর্ঘ দীর্ঘ পাইনের সারি আর তাদের মাথায় আটকে থাকা মেঘ। দূরের পাহাড়ে মেঘের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে ছোট্ট গ্রাম। সবুজ খেত।

প্রভাতসূর্য : চল, এখানে সবাই মিলে একটা বাড়ি কিনি।

সবুজকলি : এ নিয়ে ক—টা কিনলি? তা ছাড়া ভেবে দ্যাখ, নুন কিনতে কার্শিয়াং যেতে হবে। ডাক্তার ডাকতে শিলিগুড়ি নামতে হবে। সংসারী হতে চলেছিস, এসব ভাব সূর্য।

নীলাভ : অসুবিধে আছে ঠিকই কলি, কিন্তু এই সবুজ, এই নির্মল বাতাস—এর মধ্যে শরীরে রোগ ধরে না রে। আর সৌন্দর্যটা ভাব, কোনো কথা হবে না। বৃদ্ধাবাসটা আমরা কোনো পাহাড়েই করব বুঝলি।

সবুজকলি : কেন? তোর তো পাহাড় ভালো লাগে না। প্রতিবার যাওয়া চাই, ঘ্যানঘ্যানও করা চাই।

নীলাভ : এ ব্যাপারে আমি ক্যাপ্টেন হ্যাডক। কী হবে পাহাড়ে চড়ে? সেই তো নেমেই আসতে হবে। আরে পাহাড় হবে এইরকম। সবুজে সবুজ। তোদের ওই ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়? ধুস!

সন্দীপন : কী ঝাঁকুনি রে বাবা!

সবুজকলি : এতে যদি একটু ঝরিস।

সন্দীপন : ঝরব ঝরব, বললাম না, বিয়ের পর, মধু যা খাটাবে! একদিন ইয়ে না হলে ওর নাকি ইয়ে হবে না।

সকলে প্রাণ খুলে হাসে। এভাবেই পৌঁছে যায় বাংলোয়। সুন্দর সুসজ্জিত কাঠের বাংলো। দুটি শোবার ঘর। দুটি স্নানঘর। একটি বিরাট লবি। একপাশে খাবার টেবিল। একপাশে ফায়ার প্লেস ঘিরে বসার আয়োজন। এখানকার কেয়ার টেকার ও কুক ওয়াংদি। পাহাড়ি মানুষ। বয়স বোঝা যাচ্ছে না। বাংলোর সামনে বড়ো লনে প্রচুর রডোডেনড্রন গাছ। তাতে ফুলের গুচ্ছ। এ ছাড়াও আছে বিবিধ মরশুমি ফুল। তারপাশে ঘন বনে ঘেরা। বাংলোর পেছন দিয়ে পাকদণ্ডী চলে গেছে ওপরের দিকে। বেলা দুটো বেজে গেছে। পটাই নেমে গেল। রবিবার এসে ওদের নিয়ে যাবে। নীলাভ ছাড়া কেউ স্নান করল না। দারুণ ঠান্ডা এখানে। রাতে সৌর বৈদ্যুতিক আলো পাবে। দশটা পর্যন্ত।

পেট পুরে খিচুড়ি, ডিমভাজা আর স্যালাড সাঁটিয়ে ওরা হাঁটতে বেরোল। দেখল বাংলোটা এক উপত্যকায়। এখান থেকে টানা খাড়াই চড়ে তারপর পাকদণ্ডী পথ। সদ্য খেয়ে এসে চড়াই উঠতে হাঁপিয়ে গেল ওরা। পাকদণ্ডী দিয়ে একটি ছোট্ট বস্তিতে এল যখন, সন্ধ্যা নামছে। দুটি—তিনটি দোকান আছে কিন্তু জিনিস প্রায় নেই। এখান থেকে রাস্তা দু—ভাগ হয়ে গেছে। একটি গিয়েছে মিলিটারি ক্যাম্পের দিকে। অন্যটি রাজহাট্টা গ্রাম। তার পরেও আরও কত গ্রাম। কত পাহাড়। যে রাস্তায় হাঁটছে ওরা তার নাম ওল্ড মিলিটারি রোড। ওরা ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে। ক্রমশ আঁধার নামছে। আকাশে ঘন মেঘ। চাঁদ আর দেখা যাবে না। বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে। ক্যাম্পের কাছাকাছি কয়েকটি পথবাতি। বস্তির মধ্যেও কয়েকটা। বাতাস বইছে। ওদের হাঁটতে ভালো লাগছে। বিদ্যুৎ চমকাল। প্রভাতসূর্য আকাশের দিকে দেখল। ওর সঙ্গে ব্যাকপ্যাক। তার মধ্যে জরুরি জিনিসপত্র। অন্যদের হাত খালি।

প্রভাতসূর্য : চল ফেরা যাক। মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে।

ফেরার পথ ধরল ওরা। অবতরণ দ্রুত করা যায়। হাওয়ার দাপট বাড়ছে। ওরা গতি বাড়াচ্ছে। অনভ্যাসে পিছিয়ে পড়ছে ঝাউ। নীলাভ ওর হাত ধরেছে। প্রভাতসূর্য টর্চ নিয়েছে হাতে। বস্তি পেরিয়ে গেল নির্বিঘ্নে। পাকদণ্ডী বেয়ে নামছে। বিদ্যুৎ ঝলসে দিল সারা আকাশ। হাওয়া বাড়ল হঠাৎ। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল বড়ো বড়ো ফোঁটায়। ঠান্ডা, বৃহদাকার বৃষ্টি ওদের শরীরে আঘাত করতে লাগল। নিকষ কালো আঁধারে ওরা কেউ কারোকে দেখছে না। শুনছে না। প্রবল বৃষ্টির ধারা ওদের দিকভ্রান্ত করে দিল পুরোপুরি। একটু ভুল পা ফেললেই মরণান্ত ফাঁদ। প্রভাতসূর্যর আলো লক্ষ করে এগোচ্ছে তবু। ও হোঁচট খেল। হাত থেকে ছিটকে পড়ল টর্চ। এখন কোথাও কোনো আলো নেই ক্ষণিকের বিজলি ঝিলিক ছাড়া।

প্রভাতসূর্য : (চেঁচিয়ে) যে যেখানে আছিস, দাঁড়া। নড়িস না। আমি টর্চ খুঁজে দেখছি।

নীলাভ : (চেঁচিয়ে) খবরদার না। কোথায় খুঁজবি? শোন, আমরা ওপরে আর উঠতে পারব না। বৃষ্টিতে ভিজতে থাকলে কাল নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। আমাদের নামতে হবে। সূর্য তোর ব্যাকপ্যাকে দড়ি আছে?

প্রভাতসূর্য : আছে, বার করছি।

নীলাভ : আওয়াজ কর জোরে। আমরা শব্দ শুনে তোর কাছে যাচ্ছি। আওয়াজ কর, থামবি না।

প্রভাতসূর্য : (দড়ি বার করতে করতে) হোও হো ও হো ও...

ওরা একে একে প্রভাতসূর্যের কাছে এল। সন্দীপন আর সবুজকলি সবার কোমরে দড়ি বাঁধছে। শৃঙ্খলের মতো।

নীলাভ : শোন, আমি সবার আগে যাচ্ছি। সূর্য তুই সবার পেছনে যা। তোর আগে সন্দুকে নে। সবাই হাতের শেকলে থাকবি। টানে টানে নেমে যাব।

সবুজকলি : তুই এই অন্ধকারে দেখতে পাবি কী করে?

নীলাভ : তোরাও পাবি। বিদ্যুতের আলোয়।

প্রভাতসূর্য : দড়ি শেষ। আমাকে আর বাঁধা যাবে না।

নীলাভ : সন্দুর হাত ধর। শক্ত করে ধর। চল। আমি গাইছি। চোখ—কান খোলা রাখ। (গান ধরে) ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণীতল।

পায়ে পায়ে চলে ওরা। পাকদণ্ডী পেরিয়ে খাড়াইতে চলে আসে। বৃষ্টি কমার নাম নেই। শীতে কাঁপুনি লেগে যাচ্ছে। জ্যাকেটগুলো ভিজে যাচ্ছে। বাড়তি সকলের থাকার কথা। ওরা অভিজ্ঞতায় জানে বাড়তি নিতে হয়। এই বৃষ্টিতেও পদস্খলনের ভয়ে ওদের গলা শুকিয়ে যায়। পাহাড়ি পথকে অবজ্ঞা করতে নেই। হালকাভাবে নিতে চাই। এখানে পায়ে পায়ে বিপদ। ওরা কর্কশ বিদ্যুতালোকে নীলাভনির্ভর হয়ে নিরুপায় চলে। আর কতদূর? নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে পথ যেন ফুরোয় না।

প্রভাতসূর্যর ভাবনা : আজ লাভোটা দারুণ ফর্মে আছে। এমন হাঁটছে যেন কতবার এসেছে। ও না থাকলে বিপদে পড়তাম। টর্চটা হঠাৎ পড়ে গেল। একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। ভাগ্যিস লাভো স্নায়ু হারায়নি। ও আমাকে নিখুঁত বুঝতে পারে। আজ পর্যন্ত আমার ব্যাপারে ওর ভুল হয়নি। যেই বুঝেছে আমি ধসে গেছি, লিড নিয়েছে। আমারই ভুল। এরপর দ্বিতীয় কারোকে ইকুইপড রাখতে হবে।

একটা হ্যাঁচকা। সন্দীপন হোঁচট খেল। প্রভাতসূর্যর হাত ছেড়ে গেল। হাত ধরার জন্য দ্রুত এগোচ্ছে। নীলাভর চিৎকার হল্ট! হল্ট এভরিবডি! কেউ নড়বি না! নীলাভ শৃঙ্খল সমেত পিছিয়ে এল। প্রভাতসূর্যর হাত ধরল। বিদ্যুৎ ঝলসাল। শিউরে উঠল ওরা। আর দু—পা। প্রভাতসূর্য খাদে পড়ে যেত না থামলে!

৬

সকালে ঝকঝকে রোদ। ওরা লনে খাবার টেবিল সাজিয়ে চা নিয়ে বসেছে। টেবিলে দূরবিন। পাখি চেনার বই। চায়ের পট, কাপ, বিস্কিট। ওয়াংদি এগ নুডলস করছে।

সন্দীপন : কাল কিন্তু খুব বিপদ গেছে যা হোক। ওফ রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলাম।

ঝাউ : আমিও। দেখি অ্যা—ত বড়ো বড়ো জোঁক। (হাত দিয়ে ফুটখানেক দেখায়।)

সবুজকলি : হ্যাঁরে লাভো, (হেসে) তোর কি পেছনে চোখ গজিয়েছে? আগে তো ল্যাজটাই আছে জানতাম।

ঝাউ : কেন? কেন?

সবুজকলি : সূর্য ছিল সবার পেছনে আর লাভো সবার সামনে। ও কী করে বুঝল সূর্য পড়ে যাচ্ছে?

প্রভাতসূর্য : সতর্ক থাকলে বোঝা যায় কেউ ছুটে গেছে চেন থেকে। সেভাবেই...

নীলাভ : (জোরে হেসে) কলি, মাই ফ্রেন্ড, গড অ্যানড গোস্ট—বোথ আর ওমনিপ্রেজেন্ট!

সবুজকলি : যাক এতদিনে চিনেছিস নিজেকে...

নীলাভ : যে আমি ঈশ্বর, না রে! (পা বাড়িয়ে দেয়) নে পেন্নাম কর! কী বর চাস?

সবুজকলি ওকে মারতে ওঠে। ওয়াংদি খাবার সাজিয়ে আসে তখন। ওরা খাবারে মন দেয়।

সারাদিন প্রচুর খেল, ঘুরল, পাখি প্রজাপতি দেখল, ছবি তুলল ওরা। বুনো স্ট্রবেরি খেল। বাকো ফুল দেখল। কিন্তু চাঁদ ওদের সঙ্গ দিতে পারল না। বিকেল থেকে অর্কিডের পাতায় পাতায় ঘন হল মেঘ। আকাশ ঢেকে গেল। টিপ টিপ বৃষ্টিপাত ওদের ঘরবন্দি করে দিল পুরোপুরি। ওরা এমনই মশগুল—চাঁদের পরোয়া না করে নুন লেবু লঙ্কা সমেত ভদকা সাজিয়ে বসল। শৈত্য রয়েছে। ফায়ারপ্লেস জ্বেলে দিয়েছে ওয়াংদি। সন্দীপন ও সবুজকলি কাজু, ভুজিয়া, স্যালাডের ডিশ সাজিয়েছে। ওয়াংদি গরম চিকেন পকোড়া দিয়ে গেল সঙ্গে। ফায়ারপ্লেসকে আধা গোল করে ঘিরে বসল ওরা। হাতে গ্লাস নিয়ে উল্লাস উদযাপন করল।

নীলাভ : আজ প্রত্যেকে আলাদা করে কিছু দেবে। যার যা ইচ্ছে। সেই আমার গান দিয়ে কোরাস শুরু আর 'পুরানো সেই দিনের কথা'—য় শেষ—এরকম চলবে না।

ঝাউ : ওরে বাবা! আমি তো কিছুই পারি না।

সবুজকলি : কেন রে হাঁউ! তুই ওড়িশি শিখতিস তো।

ঝাউ : ওরে বাবা! সব ভুলে গেছি।

সবুজকলি : যা মনে আছে, তা—ই করবি। এখানে আমরা প্রাইজ দেব না।

জমে উঠল সভা। মধুস্মিতা অসামান্য গাইল আশা ভোঁসলের গলায় শোনা 'জীবনগান গাহি কী যে' সলিল চৌধুরীর কথা, হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুর। ঝাউ ওড়িশি, নীলাভর টেবিল—তবলার সঙ্গে হাতে ভদকার গ্লাস নিয়ে সন্দীপন। ধুনুচি নৃত্য, প্রভাতসূর্য আবেগে চোখ বন্ধ করে 'জীবনসে ভরি তেরি আঁখে...' কিশোরকুমার, মধুস্মিতার বোল—এর সঙ্গে সবুজকলি কত্থক—প্রত্যেকে মন দিয়েছে, হয়তো ভদকার চুমুক ওদের নিবিড় করেছে আরও, কিংবা কাজের চাপে আর নিয়মিত অভ্যাস হতে পারছে না, তারই ক্ষুধা ওদের যোগী করেছে। নীলাভর পালা এবার। ছবি তোলা চলছিলই। অতএব সব ক্যামেরা প্রস্তুত হল। হাতের গ্লাস রেখে নীলাভ উঠল। চোখ বন্ধ করে দাঁড়াল।

নীলাভ : একটি ছোট্ট নাটক। সংলাপের সঙ্গে যে কয়েকছত্র কবিতা ব্যবহৃত হবে, তার রচয়িতা কবি অগ্নি বসু।

সবুজকলির পায়ের কাছে জানু ভেঙে বসল। ওর ডানহাতে ধরা আছে ভদকার গ্লাস। নীলাভ টেনে নিল বাঁ হাত।

নীলাভ : নয়নমণি! (স্বরে গভীর ঘন আবেগ! কম্পন! বাকিদের মুখে হাসি।) শেষবার। এই শেষবার। আর আসব না। কোনোদিন আসব না। যা বলতে পারিনি এতকাল, শুধু তারই জন্য, তারই জন্য নয়নমণি —আজ আমার সুদূর পেরিয়ে আসা! নয়নমণি, আমি তোমাকেই তোমাকেই তোমাকেই একমাত্র... (হস্তচুম্বন। এবং হাত ছেড়ে দিয়ে, দু—পাশে নিজের প্রসারিত দু—হাত—ওর চোখ বন্ধ) '....ভোরের আকাশে,উন্মুখ নীল মেঘে আমারও ডানার শব্দ রয়েছে লেগে,—সারাটা জীবন শুধু জেগে, শুধু জেগে এবার তা হলে একটু ঘুমিয়ে থাকি?' (স্বর নামিয়ে শেষ ছত্রটি দু—বার পুনরাবৃত্তি করে। ঝুঁকে নমস্কার করে সহজ হাসি মেখে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অনেকগুলো ক্যামেরার ঝলকের মধ্যে ও সম্পন্ন করে নাটক।) বন্ধুদের হইচই, হাততালি, বিস্ময়, মুগ্ধতা! এত ভালো অভিনয়! গলায় কান্না এসে গেছে। সত্যি, লাভোটার নাটক ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি! কী যে ছেলেটা।

৭

ফেরাটা বড়ো অবসাদের। তবু ফিরতেই হয়। উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে আসে। অতি প্রত্যূষে ওদের ট্রেন পৌঁছোল বর্ধমানে। এখনও রাত্রি কাটেনি পুরোপুরি। আকাশে আলোর রেখা। সকাল সকাল পৌঁছে যাবে কলকাতা। ওপরের দুটি শয্যায় নীলাভ আর প্রভাতসূর্য। বাড়তি পা বেরিয়ে থাকলেও অসুবিধে হয় না ওটায়। প্রভাতসূর্য নেমে এল। নীলাভও।

নীলাভ : চা খাবি?

প্রভাতসূর্য : বল। এই পেপার! পেপার! আজকের 'দৈনিক খবর' একটা দাও তো!

পেপারওলা : আজকেরটা এখনও পৌঁছোয়নি দাদা। আর আধঘণ্টা পরে পাবেন। কালকের আছে।

প্রভাতসূর্য : তাই দাও।

নীলাভ চা আনল। পান করল দু—জনে। ট্রেন চলতে শুরু করল। ওরা ঠেলে তুলল সবাইকে। মাঝের শয্যা না তুললে বসতে পারছে না। হাই তুলতে তুলতে ব্রাশ—পেস্ট নিচ্ছে ওরা। নীলাভ একবার কাগজ খুলল। এ পাতা ও পাতা একটু দেখল। দিয়ে দিল প্রভাতসূর্যর হাতে। প্রভাতসূর্য কাগজ খুলল। ট্রেন ছুটছে জোর। নীলাভ করিডোরে গেল। প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়ে দ্বিতীয় পাতা। শোকসংবাদ, জমি—বাড়ি—সম্পত্তি, নিরুদ্দেশ পেরিয়ে নীচের দিকে আটকে গেল চোখ—শোকসংবাদ—অনেক বড়ো করে। মৃতের স্পষ্ট বৃহৎ ছবি। তলায়—তোমার আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। মাঝে—নীলাভ দত্ত। জন্ম...। মৃত্যু...। আজ তাঁর পারলৌকিক কাজে বন্ধু ও আত্মীয়বর্গের উপস্থিতি অনুরোধ করি!

কিন্তু, কিন্তু ছবিটা তো নীলাভরই! প্রভাতসূর্য কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

প্রভাতসূর্য : এ কী? এই লাভো! ইজ ইট এ প্র্যাকটিক্যাল জোক অর হোয়াট?

সবুজকলি : লাভো বাইরে মুখ ধুতে গেল। তুই এখানে চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে?

প্রভাতসূর্য : পড় এটা। (কোলে কাগজ ছুড়ে দেয়। ছুটে বাইরে যায়। লাভো নেই। ছুটে অন্যদিকে যায়। নেই। সন্দীপনকে ডাকে।) সন্দু তুই ওদিকের কামরাটা দ্যাখ তো। আমি এদিকে দেখছি। দ্যাখ তো লাভো কোথায়?

নেই নেই, কোত্থাও লাভো নেই। সারা ট্রেন খুঁজল ওরা। বহুজনকে জিজ্ঞেস করল। কেউ ঝাঁপ দেয়নি। কেউ পড়ে যায়নি। সবচেয়ে উঁচু শয্যায় চাদর তেমনি কুঁচকোনো কিন্তু লাভোর ব্যাকপ্যাক নেই কোথাও! এ কী? এ কেন? নীলাভর এ কী নাটক? সহযাত্রীর সেলফোন চেয়ে বাড়িতে ফোন করছে প্রভাতসূর্য। সবাই ওকে ঘিরে। এর বেশি হতবুদ্ধি, এর চেয়ে বেশি অবাক ওরা কখনো হয়নি! নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে কিছু একটা!

প্রভাতসূর্য : হ্যালো বাবা! বাবা! আমরা আর ঘণ্টা দেড়েকে পৌঁছে যাব। (গলা কাঁপছে।)

বাবা : এসো। গাড়ি থাকবে।

প্রভাতসূর্য : বাবা, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কাগজে দেখছি নীলাভ দত্ত। অথচ ও তো... ও তো...

বাবা : ও দেখেছ? তোমাদের খবর দিতে পারিনি। এন জে পি থেকে তুমি ফোন করলে, ভালো করে কিছু না শুনেই ছেড়ে দিলে।

প্রভাতসূর্য : এন জে পি থেকে? আমি ফোন করিনি বাবা! লাভো করেছিল। লাভোই তো সবার বাড়িতে...

বাবা : কী বাজে বকছ! শোনো, বিষ্যুদবার সন্ধ্যায় বেরোবার মুখে নয়নমণিকে ধরতে গিয়ে চারতলার রেলিং টপকে নীলাভ পড়ে যায়। পিঠে ভারী ব্যাকপ্যাক ছিল, টাল সামলাতে পারেনি। তোমরা বাড়ি এসো সাবধানে। কথা হবে।

প্রভাতসূর্য : বাবা, বিশ্বাস করো, ও তো... ও তো...

বাবা : হ্যাঁ! ওর ভালো স্বাস্থ্য ছিল। কিন্তু মাথায় আঘাত! কিছু করা যায়নি। ভেঙে পোড়ো না। ওর বাবা—মায়ের কথা ভাবো। এখন তোমাদের পৌঁছোনো প্রয়োজন।

ফোন নামিয়ে নেয় প্রভাতসূর্য। ওরা বিশ্বাস করতে পারে না কিছুই। বোকা হতচেতন হয়ে যায়। কীভাবে বিশ্বাস করবে? কীভাবে বিশ্বাস করাবে অন্যদের? ওদের মনে ধাঁধা লেগে যায়। আবার ধাঁধা খোলেও। নীলাভর বহু কথার দ্বিতীয় মানেটি পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু এ যে অসম্ভব! অবিশ্বাস্য!

সবুজকলি : (চেঁচিয়ে) ক্যামেরা! ক্যামেরা!

ঝাউ ক্যামেরা বার করে। ওই তুলেছে সবচেয়ে বেশি ছবি। একটার পর একটা খোঁজে। কই নীলাভ! নীলাভ কই! নেই! কোনো ছবিতে নেই। অথচ কত ছবি তুলেছিল ওরা। কই! সেসব কই! এই তো! আছে! একমাত্র একটি ছবিতে আছে। নাটকের দৃশ্য। ফায়ার প্লেসের আগুনের চালচিত্রে একটি ছায়াচ্ছন্ন ছবি। হাতে গ্লাস নিয়ে সবুজকলি। ওকে চেনা যাচ্ছে। ওর বাঁ হাতে চুম্বন করছে জানু পেতে বসা নীলাভ। নীলাভ! নাকি প্রভাতসূর্য! দু—জনের শরীর এক একরকম, এই ছায়াময়তায় আলাদা করে চেনা কঠিন।

হ্যাঁ—ভূত, না—ভূত

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

বেলা দশটার সময় রান্নাঘরের দরজার সামনে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে কিটান। বিছানা থেকে উঠেই সটান চলে এসেছে ও এখানে। চুল উশকোখুশকো, জামাটা কোঁচকানো, পায়ে ঘরে—পরার স্যান্ডালটাও গলাতে ভুলে গেছে।

মার এখন খুব তাড়া। যদিও ভাল্লু—কিটান দুজনেরই গরমের ছুটি চলছে তবু বাবার তো আর সামার ভেকেশন নেই। ফলে বাবার অফিসের ভাত, টিফিন সামলানোর ফাঁকে ফাঁকে 'মশলাটা ভালো করে বাটো', 'ঘরের কোণে আজও ধুলো রয়ে গেল' এইসব টুকটাক কাজের কথাও বলতে হচ্ছে আরতিদিকে। আর ওদের, দু—ভাইবোনের ঘুম ভাঙলেই তো কোনোমতে চোখ ধুয়ে, দাঁত মেজে রাজ্যের খিদে নিয়ে ডাইনিংটেবলে এসে বসবে। ছুটির দিন বলে কথা, বায়নার কি শেষ আছে! আজ আলুপরোটা, তো কাল চাওমিন, পরশু স্যান্ডউইচ...পরোটাটা উলটে দিয়ে মা এপাশ ফিরতেই কিটানকে দেখতে পেলেন। 'কীরে, অমন চোরের মতো মুখ করে ঘুম ভাঙতেই এসে দাঁড়ালি কেন? কিছু চাই? ভাল্লুর সঙ্গে ঝগড়া করলি বুঝি সকাল—সকাল?' কিটান তীক্ষ্ন, সরু গলায় জানতে চায়, 'মা, তুমি ভোরবেলা আমার ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছিলে?' প্রশ্নটা করতে গিয়ে গলাটা একটু কেঁপে গেল ওর।

আসলে হয়েছে কী, গরমের ছুটি শুরু হতেই কিটানও একা ঘরে শোয়া শুরু করেছে। ভাল্লু তো অনেকদিনই ওর ঘরে একা শোয়, কিন্তু কিটান মা—র পাশ ছেড়ে ঘুমোতে পারত না। যদিও ওর ক্লাসের অনেক মেয়েই একা—একা শোয়। বাবা অমরেশবাবু অবশ্য একটু আপত্তি করছিলেন প্রথমটায়, 'একা একা মেয়েটা ভয় পায় যদি!' কিন্তু মা বললেন, 'না, না! এখন থেকে একা শোয়া প্র্যাকটিস না করলে চলবে কেন? বড়ো হচ্ছে, মনের জোর বাড়াতে হবে না?' তা, মনের জোর বাড়াতে আপত্তি নেই কিটানের। ভাল্লু সারাক্ষণ 'ভিতু! ভিতু!' বলে খেপায়। মাত্র দু—বছরের বড়ো দাদার দাদাগিরি একদম সহ্য হয় না ওর। এদিকে আবার দাদাকে ছাড়া চলেও না। সে যাইহোক, একা শোয়া ভালো এইজন্য যে, অনেক রাত অবধি জেগে গল্পের বই পড়তে পারে ও। তা ছাড়া একা শুতে রাজি হয়েছে ও কিছুটা ভাল্লুর সঙ্গে রেষারেষি করেও। কিন্তু মা—র সঙ্গে শর্তও করে নিয়েছে একটা, সারা রাত আলো জ্বলে থাকবে ঘরে। মা প্রথমদিকটায় এই শর্ত নিয়ে একটু খুঁতখুঁত করে, পারমিশন দিয়েছেন শেষে। তো, সেটা নিয়েই ঝামেলা বেধেছে আজ। রোজই আলো জ্বেলে রেখে ঘুমোয়, তারপর ভোরবেলা ঘুমটা ভাঙলে টলতে টলতে কোনোমতে আলো নিবিয়ে আবার বিছানায় ধপাশ। কিন্তু আজ পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙার পর আলো নেভাতে গিয়েই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। ওমা! আলো জ্বলছে না তো! যাইহোক বাথরুম সেরে বিছানায় শুয়ে ভয়ে ঘুম আসছিল না কিছুক্ষণ। কে নেভাতে পারে আলো, এই প্রশ্নটাই মাথার মধ্যে আনাগোনা করছিল বারবার। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে উঠেই ছুটে এসেছে তাই মা—র কাছে। ভাল্লুদাদা খিক খিক করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার মতো, বলল, 'তোর যখন এতই ভয়, একা শোয়ার সাহস দেখাতে যাস কেন?' কিটান ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাল্লুর ওপর। ওদের মারামারি ছাড়াতে গিয়ে মা হাঁফিয়ে উঠলেন, চাটুতে পরোটাও পুড়ে গেল। আরতিদি গালে হাত দিয়ে বলল, 'মনে হয় তোমার ঘরে রাতের বেলা তেনারা কেউ এসেছিল কিটান দিদিমণি'। মা ওকে ইশারায় চুপ করতে বলে তাড়াতাড়ি কিটানকে বললেন, 'আমার তো মনে হয়, নানি—ই এসেছিলেন তোর ঘরে আলো নেভাতে।

দেখতিস—ই তো, কাজ না থাকলেও ঘরে আলো—পাখা জ্বালিয়ে রাখলে মা কত রাগ করতেন!' কিটানের মুখটা মুহূর্তের মধ্যে ঝলমল করে উঠল। আরে, তাই তো! নানি মারা গেছেন বছরখানেক হল। খুব ভালোবাসতেন কিটানকে। শাসনও করতেন অবশ্য। কিন্তু, জন্ম থেকে নানির আঁচল ধরে—ধরেই বলতে গেলে এই এতটা বড়ো হল কিটান! এবার আর একটুও ভয় লাগছে না কিটানের! ও ঘরে এসে, খাটে বসে—বসে পা দোলাতে লাগল খুশিমনে। গল্পটা কিন্তু এখানে শেষ নয়। বরং, তোমরা বলতে পারো যে, গল্পের শুরু—ই এই এখান থেকে!

পরদিন স্কুল। কিটান আর ভাল্লু তো স্কুলের বাসে চেপে বসেছে। নামার সময় যে যার মতো দুপদাপ করতে করতে নেমে পড়ে, যদিও মা বাসে ওঠার সময় পইপই করে ভাল্লুকে বলে দেন, 'বোনকে ফেলে আগে নেমে যেয়ো না যেন।' কিন্তু ভাল্লু কোনোদিনই সেটা খেয়াল না রেখে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে—করতে নেমে যায়। ভাল্লুদাদার সঙ্গে ঝগড়া হয় যখন, এইতো পরশুদিন—ই কিটানকে যখন ও কিছুতেই কার্টুন নেটওয়ার্ক দেখতে দিচ্ছিল না তখন কিটানের মাথায় অ্যায়সা রাগ উঠে গেছিল যে ও মাকে প্রায় বলে ফেলছিল আর কী, যে ভাল্লুদাদা বাস থেকে নামার সময় নিজেই আগেভাগে নেমে যায় রোজ। শেষে, দাদার ওপর মায়া হওয়ায় সেটা বলে দেয়নি আর। তো, সেদিনও ভাল্লু বাস থেকে তড়বড় করে নেমে গেছে, কিটান বাসের সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে আর অমনি পেছন থেকে কী যেন বলে উঠেছে বিনু। আর, ও অন্যমনস্কভাবে সেটা শুনতে—শুনতে পা বাড়াতেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। নাকমুখ সিমেন্ট বাঁধানো মেঝেয় থেঁতলে যেত নির্ঘাত, কিন্তু ওর মনে হল মুহূর্তের মধ্যে কে যেন ওকে শক্ত হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল মাটিতে। চমকে গেছিল কিটান। তখনই ভাবল, 'নানি নয় তো?' কিটান এখন বেশ বুঝতে পারে নানি ওর সঙ্গে—সঙ্গে আছেন। এই তো পরশুদিন, অঙ্ক পরীক্ষার শেষে খাতা জমা দিয়ে ফেলতে যাবে, হঠাৎ কেমন মনে হল, ৩ নম্বর অঙ্কটা একটু রিভাইস করে দেখি। ব্যাস, যা ভেবেছে তাই, ১৪—তে ৪—এর আগে ১ বসাতে ভুলে গেছে ও। যা বরাবর হয়ে আসছে। যাকে বাবা বলেন, কেয়ারলেস মিসটেক। এটাও নানি—ই করে দিয়েছে, কিটান জানে। ও শুনেছে, নানি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন। এর মধ্যে কবে যেন স্কুল থেকে ফিরে সন্ধে হওয়ার আগে বন্ধুদের সঙ্গে ক্যারম খেলতে বসেছে কিটান, রেডটাকে টার্গেট করে স্ট্রাইকার মেরেই ও বুঝতে পারল, কোনো চান্স নেই, কারণ রেড বসে আছে খুব বেয়াড়া জায়গায়, কিন্তু টুপ করে সেটা ঢুকে গেল পকেটে। বন্ধুরা অবাক। কিন্তু নানি যে দারুণ ক্যারম খেলতেন সে তো কিটানের নিজের চোখেই দেখা।

এসব কথা এতদিন কাউকে বলেনি ও। ভাল্লুদাদাকে তো নয়—ই। বললে ও এমন খেপাতে শুরু করবে যে কিটানের চোখের জল বার করে ছেড়ে দেবে একেবারে।

কিন্তু সব হিসেব গোলমাল করে দিলেন তীর্থঙ্কর স্যার। কিটানদের স্কুলের ফিজিক্যাল সায়েন্সের নতুন টিচার। দু—দিনেই ওঁর সঙ্গে বেদম ভাব জমে গেল কিটানের। ও প্রায় তীর্থঙ্কর স্যারের পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে পোষা বেড়ালের মতো। বিজ্ঞানের কত নতুন আবিষ্কারের কথা, কুসংস্কার মুক্ত হওয়ার কথা, এসব ওঁর মুখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে কিটান। বলব না, বলব না, করেও একদিন টিফিনের সময় স্যারের কাছে একটা লেসন বুঝে নিতে গিয়ে নানির গল্প করে ফেলল কিটান। বুকটা দুরদুর করছিল। কিটানের এত ফেভারিট তীর্থঙ্কর স্যার যদি রাগ করেন কিংবা হেসেই উড়িয়ে দেন সবটা! কিন্তু উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন, তারপর ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'কাল টিফিন খাওয়া হয়ে গেলে একবার আসিস তো আমার কাছে।'

পরদিন টিফিন পিরিয়ডে তীর্থঙ্কর স্যারের কাছ থেকে যখন ছুটি মিলল তখন মাথা ভোঁ ভোঁ করছে কিটানের। স্যার খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন মৃত্যুর পর মানুষ তার প্রিয়জনদের কাছে ফিরে আসতে পারে না। তাহলে আলো নিবিয়ে দেওয়া? অঙ্ক ঠিক করা? ক্যারমের রেড ফেলা? 'এসবও তুই নিজেই পেরেছিস, অথচ নানি করে দিচ্ছেন এটা ভাবতে তোর খুব ভালো লাগছে, মনে অনেক জোর পাচ্ছিস, তাই ভাবছিস। আজ হয়তো বুঝবি না, কিন্তু বড়ো হয়ে আমার কথাগুলো মিলিয়ে দেখে নিস।'

না, কিটানও যুক্তি দিয়ে ভেবে—ভেবে বুঝতে পারছে যে সবটাই তার মনগড়া। কিন্তু একইসঙ্গে কোথায় যেন একটা ফাঁকা—ফাঁকা লাগছে ওর। আর, তখনই বিদ্যুচ্চমকের মতো ওর মাথার মধ্যে একটা আলো জ্বলে উঠল যেন, কে যেন বলল, 'নানি সঙ্গে—ই আছেন, শুধু কিছু করে দিতে পারেন না এই আর কী!' কে বলে উঠল কথাটা! কে জানে, নানি—ই হয়তো বলে দিলেন এটা, সান্ত্বনা দিলেন কিটানকে! পাশ ফিরে, বিছানায় পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে কিটান।

ছায়ামুখ

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বইমেলায় আজ বেশ ভিড়। অন্যান্য কিছু শিল্পীর মতো সায়রও মেলার মাঠে ক্রেতা বা দর্শকদের পোর্ট্রেট আঁকে, পেনসিল স্কেচ। বিনিময়ে টাকা নেয়। গত ক—দিন ধরে কেউ তেমন আঁকাতে আসছিল না। দিনে দুটোর বেশি পার্টি জোটেনি। আজ বিকেল পড়তে—না—পড়তেই দ্বিতীয়জনের ছবি আঁকছে সায়র, বছরছয়েকের মেয়ে। তার মা সায়রের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে ড্রয়িংটা দেখছেন।

বাচ্চা বলেই মেয়েটি একটু চঞ্চলতা প্রকাশ করে ফেলছে। ইতিমধ্যে ওর মা দু—বার ধমকেছেন, 'স্থির হয়ে বোসো। একদম নড়বে না।'

আর—একজন মহিলা পায়ে—পায়ে এসে সায়রের আঁকা দেখতে দাঁড়ালেন। চোখ তুলেছিল সায়র, মহিলার পরনে সালোয়ার কামিজ, চোখদুটো বাদ দিয়ে গোটা মুখটা ওড়নায় ঢাকা। বেশ অবাক হয়েছে সায়র। আজ মোটেই বইমেলায় ধুলোধোঁয়া নেই। রোদের তেজও কমে আসছে। মুখটা ওভাবে ঢেকে রাখার কী দরকার, কে জানে! এ নিয়ে অবশ্য এখন মাথা না ঘামানোই ভালো। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। সায়র আঁকায় মন দেয়।

মিনিটপাঁচেক বাদে আঁকা শেষ হল। ক্লিপআঁটা বোর্ড থেকে ড্রয়িংশিটটা খুলে নিয়ে বাচ্চা মেয়েটির মায়ের হাতে দেয় সায়র। জানতে চায়, 'ঠিক আছে?'

বাচ্চাটি টুল ছেড়ে উঠে আসে মায়ের কাছে। বলে, 'দেখি—দেখি কেমন হয়েছে?'

মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেয়ের ছবি পছন্দ হয়েছে মায়ের। তিনটে একশো আর একটা পঞ্চাশের নোট বাড়িয়ে দিলেন সায়রের দিকে। সায়র বলল, 'আপনাকে তো তিনশো বললাম।'

'এক্সট্রাটা ছবি ভালো হয়েছে বলে দিচ্ছি, 'খুশি হওয়ার গলায় বললেন ভদ্রমহিলা। হাসিমুখে বিনয়ের সঙ্গে টাকাগুলো নেয় সায়র। এরকম ঘটনা নতুন নয়, ছবি দেখে খুশি হয়ে এর আগেও অনেকে টাকা বেশি দিয়েছে। আর্ট কলেজে পড়া হয়নি সায়রের। সাধারণ কলেজও শেষ করতে পারেনি। বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বাবা মারা গিয়েছেন। মা রান্নার কাজ করেন, ঠোঙা বানান। সায়র টুকটাক আর্টের কাজ করে। পোর্ট্রেট আঁকার হাত তার বরাবরই ভালো। স্কুলে পড়াকালীনই চেনাজানাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সেরকম কিছু পরিচিতজনের মুখের ছবি সায়র নিজের আশপাশে টাঙিয়ে বসছে মেলার মাঠে।

ওড়নায় মুখঢাকা মহিলা এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। সায়র ওঁর দিকে তাকাতেই বলে উঠলেন, 'আমার পোর্ট্রেট আঁকতে হবে।'

উচ্চারণ শুনে বোঝা গেল বাঙালি নন। সায়র বলল, 'শিওর। বসুন টুলটায় গিয়ে। পার পোর্ট্রেট আমি নিই...'

সায়রকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মহিলা বললেন, 'জানি। একটু আগে তো দেখলাম।'

টুলে গিয়ে বসলেন। এবার তো ওড়না সরাতেই হবে। মুখে নিশ্চয়ই কোনো খুঁত আছে, সায়রকে হয়তো বলবেন সেটা ঢেকে ছবিটা আঁকতে। এমন অনেকেই বলেন।

মুখ থেকে ওড়না সরিয়ে দিলেন মহিলা। খুঁত আছে বটে, এভাবে ঢাকা দিয়ে রাখার মতো কিছু নয়। চিবুকের নীচে কাটা দাগ।

'দাগটা যেন ছবিতে থাকে,' বললেন মহিলা। ভিতর থেকে চমকে উঠল সায়র, উনি কি মনের কথা পড়তে পারছেন? না—না, নেহাতই কাকতালীয়। ভাবনা ঝেড়ে ফেলে পেনসিল চালাতে শুরু করে সায়র। মহিলার নাক—মুখ বেশ শার্প। এধরনের মুখের ছবি আঁকা সহজ এবং বেশ ভালোও হয়।

বেশি সময় লাগল না পোর্ট্রেটটা আঁকতে। মহিলা যথেষ্ট সহায়তা করেছেন, একটুও নড়েননি। মনে হচ্ছিল চোখের পাতাও ফেলছেন না। সায়র বোর্ডসুদ্ধ ড্রয়িংটা মহিলার দিকে ঘুরিয়ে বলে, 'দেখুন তো কেমন হয়েছে।'

মহিলা আঁকাটার দিকে একপলক দেখে নিয়ে টুল ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন, 'ছবিটা আপনি রাখুন। হ্যাজব্যান্ডের থেকে টাকাটা নিয়ে আসি।'

মুহূর্তের মধ্যে ভিড়ে মিশে গেলেন মহিলা। সায়র তো অবাক, এ আবার কী! উনি তো বাচ্চা নন যে, খেয়াল হয়েছে বসে পড়েছেন আঁকাতে। টাকা রয়েছে গার্ডিয়ানের কাছে। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আশা করা যায় ছবিটা নিতে আসবেন শীঘ্রই।

তা কিন্তু হল না। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল মহিলা এখনও আসেননি ছবিটা নিতে। অদ্ভুত লাগছে সায়রের, ছবিটা যদি না—ই নেবেন, আঁকালেন কেন? ওঁর ছবি কার কাজে লাগবে?

আপাতত অবশ্য সায়রের কাজে লাগছে, পোর্ট্রেটটা বেশ সুন্দর এবং জীবন্ত হয়েছে। সায়র টাঙিয়ে দিয়েছে ওঁর আঁকা প্রদর্শিত ছবিগুলোর পাশে। বিজ্ঞাপনের কাজ করছে ছবিটা।

আর কেউ ছবি আঁকাতে আসেনি। সায়র ফাঁকা বসে রয়েছে। চোখ বোলাচ্ছে বইমেলার ভিড়ে। কত মানুষ! কত ধরনের পোশাক! কত রকম মুখ!

সায়রের সামনে দিয়ে যেতে—যেতে এক ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। ওঁর দৃষ্টি আটকেছে সায়রের প্রদর্শিত ছবিগুলোর কোনো একটায়। বছর চল্লিশের লোকটির মুখে প্রবল বিস্ময়। আঙুল তুলে সায়রকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কবে আঁকা?'

ঘাড় ঘুরিয়ে সায়র দেখে, সদ্য আঁকা পোর্ট্রেটটার কথা বলছেন ভদ্রলোক। উত্তরে বলে, 'একটু আগেই এঁকেছি। ম্যাডাম হ্যাজব্যান্ডের থেকে টাকা আনতে গিয়েছেন।'

'আমিই ওর হ্যাজব্যান্ড। আমাকে আনতে পাঠাল ছবিটা। কত দিতে হবে?' জানতে চাইলেন ভদ্রলোক। সায়রের খটকা লাগে, ভদ্রলোক প্রথমে কেন জিজ্ঞেস করলেন, 'ছবিটা কবে আঁকা?'

স্ত্রী যদি ছবিটা নিয়ে আসতে বলেন, তা হলে তো ওঁর জানার কথা, ছবিটা আজই আঁকা। কত দিতে হবে, সেটাও নিশ্চয়ই মহিলা বলে দিয়েছেন। তবু কেন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করছেন টাকার অঙ্ক?

সায়র অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'আমি খুব সরি। ভদ্রমহিলা যদি আপনার সঙ্গে আসেন, তবেই ছবিটা দেব।'

'আরে ভাই, সে এখন বই কিনতে স্টলে ঢুকেছে। আসতে পারবে না। কত দেব, পাঁচশো?'

বেশি পেলেও সায়র দেবে না। কেস গড়বড় মনে হচ্ছে। মাথা নেড়ে সায়র বলে, 'বললাম তো সরি। ওঁকে আসতে হবে।'

'ঠিক আছে, আরও দু—শো টাকা বেশি নাও। সাতশো। দারুণ হয়েছে ছবিটা!' বললেন ভদ্রলোক। এর পরও সায়রের থেকে সাড়া না পেয়ে চাপা গলায় বলতে থাকেন, 'ঠিক করে বলো তো কততে দেবে, এক হাজার, দু—হাজার, পাঁচ হাজার...'

'বললাম তো দেব না আপনাকে সে আপনি যত টাকাই দিতে চান,' চেঁচিয়ে ওঠে সায়র। উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে সে। চিৎকার পথচলতি দর্শক, আশপাশে বসে থাকা সায়রের মতো আর্টিস্টদের কানে গিয়েছে। তাদের মধ্যে এক—দু—জন এগিয়ে এসে জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার, কী হয়েছে?'

ভদ্রলোক এবার পিছু হটার তাল করছেন। নিরীহ গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকেই পাঠাচ্ছি।'

কেউ এল না ছবিটা নিতে। বইমেলা আজকের মতো শেষের পথে। ঝাঁট দেওয়া শুরু হয়েছে মেলার মাঠ। টাঙানো ছবিগুলো রোল করে ব্যাগে পোরে সায়র। নিজের চেয়ার আর মডেলের বসার টুলটা উলটো দিকের বইয়ের স্টলে রেখে আসতে যায়।

মেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে সায়র। হাঁটতে হাঁটতে বড়ো রাস্তার দিকে চলেছে। ওখান থেকে বাস ধরবে। পাশে হাঁটছে মেলাফিরতি মানুষ। আচমকাই একজন বাঁ হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল সায়রের। বুকের কাছে কিসের যেন খোঁচা। ঘাড় ফেরাতে সায়র দেখে, সেই লোকটা। যিনি ওড়নাওয়ালা মহিলার ছবিটা কিনতে এসেছিলেন। এখন বলে উঠলেন, 'চুপচাপ ছবিটা দিয়ে দাও। বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছি। বেগরবাঁই করলেই ট্রিগার টেনে দেব।'

কিছুই করার নেই সায়রের। ঝোলা ব্যাগ থেকে রোল করা ছবিটা খুঁজে বের করতে থাকে। ভদ্রলোকের এভাবে বন্ধুর মতো গলা জড়িয়ে থাকার কারণ, পথচলতি মানুষ যাতে টের না পায় রীতিমতো ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। ছবিটা হ্যান্ডওভার করার সময় ভদ্রলোকের মুখটা স্মৃতিতে স্থায়ী করার জন্য কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে সায়র। দৃষ্টিটা সহ্য হল না লোকটার, সায়রের গাল আর চোখের কাছে নেমে এল চড়। বললেন, 'কী দেখছ কী! যাও, সোজা চলে যাও। একদম পিছনে ফিরে দেখবে না।'

আঘাতটা সায়রের শরীরে যতটা না লাগল, মনে লাগল বেশি।

পরের দিন বইমেলায় ঢোকার আগে সংলগ্ন থানায় এসেছে সায়র। চড় খাওয়ার অপমানে সারারাত ঘুমোতে পারেনি। পুলিশ অফিসারকে ছিনতাইয়ের ঘটনাটা জানাতে, উনি সবিস্ময়ে বললেন, 'সামান্য একটা ছবির জন্য বন্দুক দেখাল! তুমি তো ছবি আঁকো, পারবে লোকটার মুখ আঁকতে?'

'নিশ্চয়ই পারব,' বলে অফিসারের টেবিলের উপর আর্টপেপার রেখে লোকটার মুখটা এঁকে দিয়েছে সায়র। এরপর অফিসার বললেন, 'এবার ওই মহিলার ছবি আঁকো, যেটা ছিনতাই হয়েছে।'

ভদ্রমহিলার পোর্ট্রেট শেষ করে এনেছে সায়র, চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন অফিসার। বললেন, 'এ কার ছবি আঁকলে? দু—দিন আগে বাইপাশের ধারে এই মেয়েটির ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে। কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। সঙ্গে পার্স, মোবাইল কোনো কিছুই ছিল না। বডি এখন মর্গে।'

গলা শুকিয়ে গিয়েছে সায়রের। মহিলার ছবি হাতে তুলে নিয়ে অফিসার বলছেন, 'যমজ বোন ছবি আঁকিয়ে গিয়েছে বলা যাবে না। চিবুকের তলার দাগটা পড়ে গিয়ে হয়েছে। ডেডবডির মুখে দাগটা আছে। পড়ে গিয়ে দু—বোনের এক জায়গায় কাটবে না। লোকটা বইমেলায় আসবে মেয়েটি জানত। তাহলে কি অপরাধীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই...'

অফিসারের আর কোনো কথা কানে ঢোকে না সায়রের। একজন অশরীরী শরীর ধারণ করে তাকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিয়েছে। এতটুকু টের পায়নি সায়র! ভেবে এখন হাত—পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। আগেও কি এরকম ঘটেছে? পরেও যদি ঘটে, সায়র কীভাবে ঠাহর করবে মানুষটা সত্যিকারের, নাকি...

ভূতের কাছারি

রূপক চট্টরাজ

সেদিন ছিল শনিবার। দুপুর দুটোয় অফিস ছুটি। ছুটির পর সব্যসাচীবাবুর সঙ্গে বইমেলায় যাচ্ছিলাম। ধর্মতলা আসতেই দেখা হয়ে গেল বারিদবাবুর সঙ্গে। অপেক্ষা করছিলেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম— কী ব্যাপার দাঁড়িয়ে কেন এখানে?

উত্তরে বললেন, বইমেলায় যাব, কিন্তু রাস্তায় যা মিছিল। দেখুন, ট্রাম—বাস সব ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। কী করে যাই বলুন তো?

সব্যসাচীবাবু বলে উঠলেন, আরে আমরাও তো ওখানেই যাচ্ছি। চলুন হেঁটেই যাওয়া যাক। তিনজনে আছি, কতক্ষণ আর সময় লাগবে। মাইল দেড়েকের পথ হবে। গল্প করতে করতেই পৌঁছে যাব।

বেশ তাই হোক, বলে তিনজনে হাঁটতে শুরু করলাম।

শীতের শেষে রোদটা বেশ আরাম লাগছে। সামনের ধুধু মাঠ। দূরে বইমেলার টিনের চালাগুলো আবছা ভেসে উঠছে। একটু এগিয়ে যেতে সব্যসাচীবাবু বললেন, একটা ভূতের গল্প বলছি শুনুন। যদিও এটা ভূতের গল্পের পরিবেশ নয়, সময়টা কাটানোর জন্যই বলছি। এটা বেশ জমাটি গল্প। অবশ্য এ গল্পটা বাবার মুখে শোনা—

বেশ কিছুদিন আগের কথা। তখন আনুমানিক ১৯৪৬ সাল হবে। বাবা উল্টোডাঙার একটা বেসরকারি সংস্থার স্টোরস ইনচার্জ। অফিসের এক বন্ধুর পর পর তিনদিন অনুপস্থিতিতে ওঁর বাড়ি গেলেন খবর নিতে। গিয়ে শুনলেন ওঁর ছেলের ভীষণ অসুখ। থেকে থেকে শুধু মুখ দিয়ে রক্তবমি উঠছে। কোথাও কোনো আঘাত লাগেনি। ওর স্বাস্থ্যটাও বেশ ভালো অথচ কেন এমন হল জানি না। ডাক্তাররাও হিমশিম খাচ্ছেন রোগ ধরতে।

বাধ্য হয়ে গতকাল হাসপাতালে পাঠাতে হল ছেলেকে। কিন্তু কোনো সুরাহা হল না। এখানে রোগ ধরা পড়েনি। ছেলের একই অবস্থা।

বাবা একটু চিন্তা করে বন্ধুকে বললেন, আপনি কি তুকতাক বা ঝাড়ফুঁক বিশ্বাস করেন? যদি করেন তবে আপনাকে একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি। উনি পেশায় ওঝা। এসব ব্যাপারে ওঁর বেশ নামডাক আছে।

বন্ধুটি বাবার কথায় রাজি হয়ে সেই ওঝার কাছে গেলেন। ওঝা সব শুনে বললেন, এটা এমন কিছু নয়। তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। এখনই জপ করে দিচ্ছি। হাসপাতালে গিয়ে দেখুন সব ভালো হয়ে গেছে।

ঠিক তাই হল। বাবা আর বন্ধুটি একসঙ্গে হাসপাতালে এলেন, তারপর খবর নিয়ে জানলেন রক্তবমি বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কী হয়েছিল সেটা ডাক্তার এখনও বুঝে উঠতে পারেননি তাই ছেলেকে অবজারভেশনে রেখেছেন।

বন্ধুটি ও বাবা বাড়ি ফিরলেন। পরদিন সকালে ফের বন্ধুটি বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সেই ওঝার কাছে গেলেন ছেলের সুস্থ সংবাদ জানাতে এবং কিছু দক্ষিণা দিয়ে আসতে।

ওঝা হাসতে হাসতে বললেন, এসব আবার কেন? যদি কিছু দিতে ইচ্ছে করে তবে মাদারিপুরের জঙ্গলে গিয়ে দিয়ে আসুন। আপনাকে কিন্তু একা যেতে হবে। ক্যানিং রেল স্টেশনের থেকে তিন—চার মাইল দক্ষিণে একটা গাঁ আছে। ওটার নাম মাদারিপুর। গাঁ পেরিয়ে আরও দক্ষিণে গেলে একটা জঙ্গল দেখতে পাবেন। মাইল দুয়েক জঙ্গলের ভিতরে যাবেন। দেখবেন একটা ফাঁকা চালাঘর আছে। ওখানে গেলেই

দেখতে পাবেন একটা মস্ত পুকুর। আর তার বাঁদিকে একটা সরু পথ পূর্ব দিক বরাবর চলে গেছে। ওই পথ ধরে তিরিশ পা মতন এগোলেই দেখতে পাবেন বুড়ো গাব গাছ। গাছটার তলায় একটা গর্ত আছে। ওখানে গিয়ে একটা জ্যান্ত শোলমাছ আর একছড়া পাকা কলা ওই গর্তে রেখে দিয়ে আসুন। যদি ফিরতে সন্ধে হয়ে আসে তবে জঙ্গল ছেড়ে আসবেন না। ওই ফাঁকা চালাঘরে রাতে বিশ্রাম নেবেন। নইলে পথে বিপদ হবে। সকালের আলো ফুটলেই বাড়ি ফিরে আসবেন।

ওঝার কথামতো সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে বন্ধুটি পরদিন ভোরে রওনা হলেন। রাত কাটাবার মতো খাবার—দাবার পুঁটলি বেঁধে সঙ্গে নিয়েও গেলেন। তখন ওই পথে যাতায়াতের এতটা সুযোগ ছিল না। অনেকটা পথ হেঁটে নদী পেরিয়ে গিয়ে হাজির হলেন সেই জঙ্গলে।

কিছু দূর যাওয়ার পর সেই চালাঘরটা দেখতে পেলেন। দেখে একটু ধাতস্থ হলেন। তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। পোঁটলা—পুঁটলি ওই চালাঘরে রেখে পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে ওঝার কথামতো তিরিশ পা দূরে বুড়ো গাব গাছের তলার গর্তে জ্যান্ত শোলমাছ আর কলা পুঁতে দিয়ে এলেন। চালাঘরে ফিরে এলেন তারপরে।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে ভেবে বন্ধুটি সেই রাতটা ওই চালাঘরে বিশ্রাম নিলেন আহারাদি সেরে। সারাদিনের ক্লান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে বন্ধুটির ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলেন সামনেই ফাঁকা মাঠে একজন চেয়ারে বসে আছেন। বিশাল চেহারা। পিছনে ধুধু মাঠ। চারিদিকে আলো ঝলমল করছে। কোনো গাছপালার চিহ্ন সেখানে নেই। একটা অস্ফুট স্বর কানে ভেসে এল। দেখলেন চেয়ারে বসা লোকটির সামনে এসে কে একজন আবছা অশরীরী চেঁচিয়ে অপর একজনের নাম ধরে ডাকল। চেয়ারে বসা লোকটি আদেশ জারি করল। পরক্ষণেই আরেকটি লোক অন্য একজনকে ধরে নিয়ে এল।

চেয়ারে বসা লোকটি জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাকে শাস্তি দিল। দোষ স্বীকার করার পর ওর মুক্তি হল।

এইভাবে পাঁচ—ছয়জনকে মুক্তি দিল চেয়ারে বসা লোকটি। এবার বন্ধুটির ডাক এল। বন্ধুটি শুয়ে শুয়েই দেখলেন যে ঠিক তার মতো চেহারার একজন লোক ওই নামে এসে হাজির হল চেয়ারে বসা লোকটির সামনে। অত আলোতেও লোকটিকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল যেন নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এক নাম, এত মিল যেন ভাবাই যায় না।

চেয়ারে বসা লোকটি তাকে বলল, একবার যাচ্ছিলাম তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে। যখন যাচ্ছিলাম তখন তোমার ছেলে আমার গায়ে থুতু ফেলেছে। তাই অভিশাপ দিয়েছি যে ওর থেকে থেকেই রক্তবমি উঠবে। তুমি তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছ, আর আমার প্রিয় শোলমাছ ও কলা আহারের জন্য দিয়েছ, তাই তোমার ছেলে এখন থেকে মুক্তি পেল। ওর আর রক্তবমি হবে না। যাও, তুমি এখন বাড়ি যাও।

চমকে উঠলেন বন্ধুটি। ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলেন একি! এতক্ষণ তিনি নিজেকেই দেখছেন শুয়ে শুয়ে। কোনো ভূত—টুত নয়তো।

এদিকে সকাল হয়ে এসেছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে আরও ভাবলেন, নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলেন। এখন তিনি একা জঙ্গলের মধ্যেই পড়ে আছেন। তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

বাড়ি ফিরে এসে পরদিন ফের সেই ওঝার কাছে গেলেন। সব ঘটনাটা খুলে বললেন। ওঝা চেয়ারে বসা লোকটির চেহারার বর্ণনা শুনে বললেন, ঠিক আছে, আপনার আর ভয়ের কিছু কারণ নেই। আপনার ছেলে আরও সুস্থ হয়ে উঠবে। আপনি যে কাল রাতে ভূতের কাছারিতে গিয়েছিলেন। ওদের বিচার দেখে এসেছেন নিজের চোখে। চেয়ারে বসা লোকটি ওদের বিচারক। আর আপনার কোনো ভয়—ভাবনা নেই। যান, এখন বাড়ি ফিরে যান।

গল্পটা শুনে বারিদবাবু ও আমি অবাক হয়ে গেলাম। গল্পের টানে আমরা বইমেলার গেটের কাছে চলে এসেছি। টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকতে কিছু বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল— কোথাও লেখা 'সব ভূতুড়ে', কোথাও

বা 'ভূতেরা চাউমিন ভালোবাসে ।' আরও এক জায়গায় লেখা 'ভূতগুলো সব গেল কোথায়', এবং তার পাশেই 'সব ভূত এইখানে'... ইত্যাদি।

দেখা হবে মাঝরাতে

শুভমানস ঘোষ

সুপারভিউ টিভি কোম্পানির কলকাতা জোনের এজেন্ট হিসেবে গ্রামবাংলায় ঘুরে বেড়াতে হয় সুমনকে, চষে বেড়াতে হয় এক শহর থেকে অন্য শহর, এক জেলা থেকে অন্য জেলা। এইরকমই ঘুরতে ঘুরতে সে অনেক দিন পরে এসেছে পানিপাতিনিতে।

পানিপাতিনি বাসস্ট্যান্ডের কয়েক হাত তফাতে মা জগদম্বা লজে বছরকাবারি ঘর রাখা থাকে সুমনের, কোম্পানিই পেমেন্ট করে। কোম্পানির আরও অনেক এজেন্ট আছে। বছরভরই তাদের যাতায়াত চলে পানিপাতিনিতে।

জাতীয় সড়ককে মেরুদাঁড়ার মতো মাঝে রেখে গড়ে ওঠা ছোটো জনপদ পানিপাতিনি। ঠিক শহর নাহলেও ভিডিও পার্লার, ইন্টারনেট পার্লার, বিউটি পার্লার আর মোবাইল ফোন পরিষেবা পুরোপুরি ঢুকে গেছে পানিপাতিনিতে।

ক—দিন ধরে বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। হোটেলের কাউন্টারে গলায় মাফলার জড়িয়ে বসে ছিলেন হোটেলের মালিক শ্যামবাবু, সুমনকে দেখে খুশি হলেন, বললেন, আসুন সুমনভাই, আসুন। এবার অনেক দিন পরে যে!

শ্যামবাবুর বয়েস পঞ্চাশের আশেপাশে, গায়ের রং দু—পোঁচ কালো কম করে, মাথাখানা বিরাট, ফালা ফালা চোখমুখ, মুখভরতি দাড়ি—গোঁফ—দেখলেই মন আপনা—আপনি সম্ভ্রমে ভরে ওঠে। আজ আবার কপালে লাল টিপ লাগিয়েছেন। হোটেল ব্যবসার পাশাপাশি তিনি এখানে—সেখানে টুকটাক পূজা—আর্চাও করে থাকেন।

হুঁ, নিয়ার অ্যাবাউট এক বছর হবে। সুমন শ্যামবাবুকে নমস্কার করে জানতে চাইল, আপনারা কেমন আছেন শ্যামবাবু?

শ্যামবাবু চোখ বুজে নমস্কারের প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন, মা মহামায়ার আশীর্বাদে তা একরকম আছি। আপনার সব খবর ভালো তো ভাই?

সুমনের বয়েস বেশি নয়, চল্লিশের আশেপাশে। মাঝারি হাইট, গায়ের রং ফরসার দিকে, মুখ—চোখ ভালো। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ফাইন!

পানিপাতিনির কাজ একদিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সুমনের। পরের দিন আর বেরোল না, হোটেলে বসে ডিস্ট্রিবিউটরের ঘর থেকে কালেক্ট করে আনা তথ্যগুলো এক করে রিপোর্ট তৈরি করে ফেলল। তারপর সন্ধের পরে জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘুরতে।

পানিপাতিনি জায়গাটা বেশ মনোরম। লোকজন, গাড়ি—ঘোড়া, দোকানপাট থাকলেও গ্যাঞ্জাম নেই। এখানকার চমচমের খুব সুনাম আছে। একটা দোকানে বড়ো দেখে খান পাঁচেক চমচম গপাগপ গিলে মন খুশ হয়ে গেল সুমনের।

হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে চলে এল ন—দিঘার মোড়ে। এখান থেকে মিনিট পাঁচ ডাকাতে কালীবাড়ি, তারপর মিনিট দুই হাঁটলেই ছায়াচিত্র সিনেমাহল। পানিপাতিনিতে এলে ছায়াচিত্র হলে নাইট শো—এ একটা করে ছবি বাঁধা সুমনের। বাংলা—হিন্দি—ইংরেজি যখন যেমন হয়।

জীবনে ছবি অনেক দেখেছে সুমন, তার উপর এখন টিভির দৌলতে ঘরে বসেই রিমোট টিপে যত খুশি ছবি দেখা যায়, তাই ছবি দেখাটা তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল, টাইম পাস। বাড়তি হল, সিনেমাহলের মালিক রবিবাবুর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে আসা। টিভি আর সিনেমা নিজেরা ভাই ভাই না হলেও ভায়রাভাই তো বটেই। অতএব রবিবাবু বলতে গেলে তার লাইনেরই লোক।

কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে ছায়াচিত্র হলের সামনে পৌঁছে সুমন হতাশ হল। টিভির দাপটে সিনেমা ব্যবসার হাল দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে সে জানে, তার জন্য রবিবাবু তাকে খোঁচা মেরে কথাও শোনান, কিন্তু তাই বলে এই অবস্থা?

সার্চলাইট, ডে—লাইট দূরের কথা, টিমটিম করে একটা লো—ভোল্টেজের বাতি জ্বলছে। তাতে হলের গায়ে লাগানো ছবির পোস্টারটাও ঠিকমতো পড়া যাচ্ছে না। লোকজনও আশেপাশে বিশেষ চোখে পড়ছিল না।

কাউন্টারে মুখ পর্যন্ত চাদরে ঢেকে একজন বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। লোকটাকে চিনতে পারল না সুমন। গেটে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, সেও অপরিচিত। তার চেয়ে বড়ো কথা,গেটকিপারের পাশে রবিবাবু দাঁড়িয়ে থাকেন, কীরকম কী টিকিট বিক্রি হল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করেন, আজ নেই।

রবিবাবু কই? রবিবাবু? সুমন জিগ্যেস করল।

গেটকিপার মুখ তুলে তাকাল সুমনের দিকে। এরও আপাদমস্তক ঢাকা চাদরে। বেশ রোগা, তবে চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। পালটা প্রশ্ন করল, কোন রবিবাবু?

হাউসের মালিক রবিবাবু। রবিরঞ্জন দাস।

উনি তো আজ আসেননি।

আসেননি?

নাহ! উনি ব্যস্ত আছেন কাজে।

লোকটা মুখ ঘুরিয়ে নিল। শুধু ছবি হবে আজ, আড্ডাটা আর হবে না। ভারি রসিক মানুষ এই রবিবাবু, মুখ—চোখের নানান ভঙ্গি করে এক—একটা এমন মজার কথা বলেন হাসি চাপা দায়। ব্যবসার এই দুরবস্থার মধ্যে কী করে এত হাসি খুঁজে পান কে জানে।

মনটা দমে গেল সুমনের। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে সে এগিয়ে গেল ছবির ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে।

বাংলা বই চলছে। স্টিল ফোটোগ্রাফ দেখে স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছিল ভূতের বই। কিন্তু অসম্ভব বোকা বোকা নাম, 'দেখা হবে মাঝরাতে'। বাংলা—সিনেমার সাধে এই হাল! যাক গে, তার তো সময় কাটানো নিয়ে কথা।

সুমন এগিয়ে গেল টিকিটঘরের দিকে। ব্যালকনির একটা টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল হলে। গেটকিপার টিকিট ছিঁড়ে অর্ধেকটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, লাইটম্যান নেই, আপনি আপনার মতো জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ুন।

যাচ্চলে লাইটম্যান নেই। নাহ, এইভাবে বেশিদিন রবিবাবু টানতে পারবেন বলে মনে হয় না। যে কোনোদিন হাউসে তালা পড়বে!

দোতলার সিঁড়ির মুখে একটা জিরো পাওয়ার জ্বললেও ব্যালকনি পুরোপুরি অন্ধকার। অনেককাল ধরেই এখানে সুমনের যাতায়াত, তাই লাইটের স্যুইচ খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না তার। আলো জ্বালিয়ে পিছনের দিকে ভালো জায়গা দেখে বসে পড়ল সে। সারি সারি সিট ফাঁকা পড়ে আছে, একটা লোক নেই, দেখতে দেখতে গা—টা হঠাৎ কীরকম ছমছম করে উঠল তার।

মিনিট পনেরো কেটে গেল, ওয়ার্নিং বেল পড়ে গেল, ব্যালকনির গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে এল কয়েকজন লোক, তারা নিজেদের মতো জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল ছড়িয়ে—ছিটিয়ে। তাদের মধ্যে একজন

লুঙ্গিপরা লোকও দেখা যাচ্ছিল। সিটে বসে পা তুলে বেমালুম বিড়ি খেতে শুরু করল। ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটুকু কম্প্রোমাইজ না করলেই নয়।

দেখে গা জ্বলে যাচ্ছিল। কী আর করবে—সুমন চুপ করে রইল।

বই শুরু হয়ে গেল। গেট থেকে উপরে এসে ব্যালকনির লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে গেট টেনে চলে গেল গেটকিপার। কয়েকটা বোকা বোকা অ্যাডের পর পর্দায় রক্তপানরত হায়নার মুখ ভেসে উঠল। ব্যাকগ্রাউন্ডে শ্মশান, দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে। নানান সাইজের মড়ার মাথা সটাসট নাচতে নাচতে ফুটিয়ে তুলছে বইয়ের টাইটেল, 'দেখা হবে মাঝরাতে'।

বাহ, হেভি টেকনিক তো! নামটা যা—ই হোক, গল্পটা জমে যেতে পারে। সুমন পিঠ টান টান করে বসল।

গল্প শুরু হয়ে গেল। এক বয়স্কা ভদ্রমহিলার উপর ভূত ভর করেছে। ভদ্রমহিলার বাঁশির মতো সরু নাক, জোড়া ভুরু। বয়েস চলে গেলেও এখনও অসামান্য সুন্দরী। চোখ কপালে তুলে অপ্রকৃতিস্থের মতো তিনি সারা ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চিৎকার করে বলছেন, আমায় রক্ত দাও। আমি রক্ত খাব! বড্ড খিদে আমার! কতদিন না খেয়ে থাকব?

কে বলে বাংলা সিনেমার মান পড়ে গেছে। ভদ্রমহিলা দুর্দান্ত অ্যাক্টিং করছেন, এমন জীবন্ত যে রীতিমতো ভয় ভয় করে উঠল সুমনের। আচমকা সারা শরীর প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি দিয়ে উঠল ভদ্রমহিলার। আস্তে আস্তে চোখ দুটো নর্মাল হয়ে এল তাঁর, তারপর এদিকে—ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক যেন সুমনের চোখে এসে স্থির হয়ে গেল। ওরে বাবা রে, কী ভীষণ সে চোখের দৃষ্টি। সুমন সহ্য করতে পারল না, সরিয়ে নিল চোখ।

ভদ্রমহিলা খলখল করে হেসে উঠলেন, হাসতে হাসতে বললেন, কী রে আমায় রক্ত দিবি নে? আমার সব রক্ত চেটেপুটে খেয়েছিস, আমায় রক্ত দিবি নে?

সিনেমার ছবি কখনো কথা বলে দর্শকের সঙ্গে! মাথাটা কীরকম ভোঁ ভোঁ করে উঠল সুমনের। আর তার পরে সে চোখের সামনে যা দেখল, মাথাটাই খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল তার।

সুমন দেখল, ভদ্রমহিলা সিনেমাহলের পর্দা থেকে সটান বেরিয়ে পা—পা করে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছেন। হাত নামিয়ে স্পষ্ট তাকে লক্ষ করেই যেন বলছেন, দাঁড়া, আমি আসছি। তোর শরীরে অনেক রক্ত। গরম গরম, টাটকা টাটকা রক্ত। আআফ! উসসস!

ভদ্রমহিলা জিব চাটতে শুরু করলেন। শুধু কথাই বলে না, পর্দা থেকে ছবির মানুষ নেমেও আসে? নাহ, এতটা বাড়াবাড়ি কিছুতেই সম্ভব নয়। নির্ঘাত কিছু গোলমাল আছে এর মধ্যে। সিট থেকে তড়াক করে উঠে পড়ল সুমন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যালকনির দর্শকরা সকলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠল। সুমন চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল, দর্শক কই, পাঁচটা সিটে স্রেফ পাঁচটা কঙ্কাল বসে আছে।

নাহ, যথেষ্ট হয়েছে! মাথায় থাকুক আমার সিনেমা, মাথায় থাকুক টাইম পাস, আর্তনাদ করে সুমন হুড়মুড়িয়ে ব্যালকনির গেট ঠেলে ছুটল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। ছুটছে ছুটছে! তারপর আর কিছু মনে নেই তার।

দুই

কতক্ষণ ঠিক বলতে পারবে না, আস্তে আস্তে জ্ঞানটা ফিরে এল সুমনের। চোখ মেলে দেখল, সে শুয়ে আছে। তখনও বুকটা তার উঠছে পড়ছে। আতঙ্কে গায়ের লোমগুলো খাড়া খাড়া হয়ে আছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সে।

উঠবেন না সুমনভাই! উঠবেন না! ভারী গলায় কে যেন বলে উঠলেন, আর একটু শুয়ে থাকুন।

এই গলা সে চেনে। সুমন বাঁদিকে ঘাড়টা কাত করতেই দেখল, মা জগদম্বা লজের শ্যামবাবু। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা হালকা হয়ে এল তার। বলল, না না, ঠিক আছে। আমি কোথায় শ্যামবাবু?

শ্যামবাবু বললেন, মন্দিরে।

সুমনের মাথাটা পরিষ্কার হয়ে এল। তাকিয়ে দেখল, ঠিক তাই। ডাকাতে কালীবাড়ি মন্দিরের নাটমন্দির এটা। দূরে টিমটিম করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। তার সামনে চাদরে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একজন লোক।

এই লোকটা শ্যামবাবুর চেলা। একটু আগে এই পথ দিয়ে সুমন যখন আতঙ্কে পাগলের মতো ছুটছিল তখন সে—ই ছুটে গিয়ে তাকে ধরেছিল, তারপর মন্দির থেকে বেরিয়ে শ্যামবাবুও তার সঙ্গে হাত লাগান। শ্যামবাবু মন্দিরে তখন নিশীথ পূজায় বসেছিলেন। সুমন তারপরেই অজ্ঞান হয়ে যায়।

শ্যামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, সুমনভাই? এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন এই রাতবিরেতে? কে তাড়া করেছিল আপনাকে?

সুমন থরথর করে কেঁপে উঠল। শ্যামবাবু তাকে ভরসা দিয়ে বললেন, আপনি এখন মায়ের মন্দিরে, সম্পূর্ণ নির্ভয়ে সমস্ত খুলে বলুন।

আরও কিছুক্ষণ লাগল সুমনের নিজেকে সামলাতে। তারপর ভয়ে ভয়ে ঢোকা গিলতে গিলতে সমস্ত খুলে বলল। সব শুনে শ্যামবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, করেছেন কী! ছায়াচিত্র হল তো মাস ছয়েকের ওপর বন্ধ, আপনি গিয়েছিলেন সেখানে বায়োস্কোপ দেখতে? যাওয়ার আগে আমাকে বলবেন তো!

ছায়াচিত্র বন্ধ! কী বলছেন আপনি? সুমন চেঁচিয়ে উঠল।

সে খুব দুঃখজনক ঘটনা। শ্যামবাবু মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, জানেন তো সিনেমার ব্যবসার হাল—ছায়াচিত্র হলের মালিক রবিবাবু হাউস চালাতে গিয়ে ধারদেনায় পুরো ডুবে গিয়েছিলেন। মহাজনদের জ্বালায় পানিপাতিনি থেকেই পালান তিনি। শোকে—দুঃখে বিছানা নেন তাঁর স্ত্রী। পরে সুইসাইড করে মারা যান। এ তল্লাটে তাঁর মতো সুন্দরী আর একটি ছিল না। মরার পরও দেখতে গিয়ে চোখ ফেরাতে পারছিলুম না, বুঝলেন?

দাঁড়ান দাঁড়ান। সুমন হঠাৎ কীরকম উত্তেজিত হয়ে উঠল, ভদ্রমহিলার কি জোড়া ভুরু ছিল?

ঠিক ঠিক! শ্যামবাবু অবাক হলেন, আপনি কী করে জানলেন, সুমনভাই?

সুমন সিনেমার কথা বলল। শুনে শ্যামবাবুর চোখ গোল হয়ে গেল, কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম নিবেদন করে বললেন, জোর বাঁচান বেঁচেছেন আপনি। মা মহামায়াই আপনাকে রক্ষা করেছেন।

সুমন উঠে পড়ল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, রাত দশটা বেজে গেছে। হোটেলের সারাদিনের হিসেব বুঝে নিয়ে এই সময় রোজই মন্দিরে চলে আসেন শ্যামবাবু। নিশীথ পুজো সেরে এখান থেকেই নিজের বাড়ি চলে যান। কিন্তু আজ আর বাড়ি না ফিরে সুমনকে হোটেলে পৌঁছে দিতে চললেন। সুমনও না করল না, এখনও ভয়ে চমকে চমকে উঠছে বুকটা তার।

ন—দিঘা মোড়ের দিকে স্টার্ট করার আগে শ্যামবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন, আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে বললেন, ওই আপনার ছায়াচিত্র হল। দেখতে পাচ্ছেন কিছু?

সুমন ভয়ে ভয়ে তাকাল। এখন থেকে ছোটো একটা মাঠ পেরিয়ে তারপর ছায়াচিত্র সিনেমা হল। কিন্তু কোথায় হল? চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। শ্যামবাবু ঠিকই বলেছেন। মা মহামায়ার কৃপা ছাড়া আজ বেঁচে ফিরতে হত না তাকে।

হোটেলে ফিরে মুখে কিছু রুচল না সুমনের। বড়ো একঘটি জল খেয়ে শ্যামবাবুকে গুডনাইট জানিয়ে তাড়াতাড়ি লেপ টেনে শুয়ে পড়ল। রাতটা কাটিয়ে ভালোয় ভালোয় এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু সব হিসেব কি আর মানুষের ঠিকঠাক থাকে, না ঠিকঠাক হয়? মাঝরাতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল সুমনের। চোখ মেলে চেয়ে হাড় হিম হয়ে গেল তার। মশারি ঠেলে কালো একটা গোল অন্ধকার ঝুঁকে পড়েছে তার মুখের উপর। মাথায় উঠল ঘুম, লেপ ছুড়ে মশারি ছিঁড়ে নেমে পড়ল সে নীচে। চিৎকার করে বলল, কে কে?

চেঁচাবেন না, সুমনবাবু। অন্ধকারের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলেন, লাইটটা জ্বালান আগে।

সুমন ছুটে গিয়ে লাইটটা জ্বালিয়ে ভয়ে শিউরে উঠল। ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন রবিবাবু। ছায়াচিত্র হাউসের জলজ্যান্ত মালিক রবিবাবু! সেই মাঝারি হাইট, ফরসা রং, চোখে হাই পাওয়ার রিমলেস চশমা, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

এ কি আপনি? আপনি এখানে কী করে এলেন? সুমন বলল, আপনি আমার ঘরে ঢুকলেন কী করে, অ্যাঁ?

বলছি। রবিবাবু বললেন, কিন্তু তার আগে বলুন, পালিয়ে এলেই কি বাঁচা যায়, সুমনবাবু? আমার স্ত্রীর হাত থেকে বেঁচেছেন, কিন্তু এবার যে আমার টার্ন! তার জন্যই তো কীরকম দেখা হয়ে গেল আমাদের মাঝরাতে! হা হা হা!

রক্ত জল হয়ে গেল সুমনের। কাঁপতে শুরু করল গলা, আ—আ—আপনি—

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন,শ্যামবাবু আপনাকে রং ইনফরমেশন দিয়েছেন, সুমনবাবু। হাসতে হাসতে নিজের স্টাইলেই কথা বলে চললেন রবিবাবু, আমি বাড়ি থেকে পালাই—টালাইনি, বুঝলেন? আমিও আমার মিসেসের মতো সুইসাইডই করেছিলাম। নদীতে ডেডবডি ভেসে গিয়েছিল বলে কেউ ট্রেস করতে পারেনি আমাকে। হা হা হা!

সুমন কাঠ হয়ে গেল। একবার বেঁচে ফিরেছে, কিন্তু এবার বড়ো কঠিন চক্করে পড়েছে। মাথার চুলগুলো একটা একটা করে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল তার, আ—আ—আ—

কী আ আ করছেন তখন থেকে! গলা সাধছেন নাকি? হা হা হা।

সুমন চেয়ে রইল। হঠাৎ রবিবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন, গলা বদলে বললেন, শুনুন মশাই, আপনাকে একটু হেল্প করতে হবে।

আ—আ—মাকে?

রাইট। আপনার সঙ্গে একটু পুরোনো হিসেব চোকানোর আছে। এর জন্য আপনি পানিপাতিনিতে আসবেন বলে কবে থেকে হাঁ করে বসে আছি, জানেন?

হিসেব?

এই তো এতক্ষণে গোটা শব্দ ফুটেছে! রবিবাবু বলে চললেন, যত নষ্টের গোড়া আপনারাই, আপনাদের টিভি কোম্পানিই আমাদের পথে বসিয়েছে, আমাদের এতদিনের সাধের ব্যবসা ডকে তুলে দিয়েছে, শেষ করে দিয়েছে আমাদের। কিন্তু আমরা একা শুধু শেষ হব কেন চাঁদু, আপনাকেও আমাদের পার্টনার হতে হবে, বুঝলেন? ব্যস, হিসেব সমান সমান!

রবিবাবু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। সুমন চেয়ে রইল। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে হল, আর ভয় পাচ্ছে না সে। আসলে খুব বেশি ভয় পেলে মানুষের ভয়বোধটাই কীরকম অসাড় হয়ে যায়। সুমনেরও তাই হয়েছে।

কি সুমনবাবু, আমার প্রস্তাবটা পছন্দ হল না বুঝি? রবিবাবু বললেন, হাঁ করে কী দেখছেন বলুন তো আমার মুখের দিকে? আপনি আমার পার্টনার হলে দু—জনে মিলে আমার হাউসে বসে প্রাণভরে আড্ডা মারব, হ্যাঁ?

সুমন চেয়ে রইল।

আরে কী ভাবছেন, মশাই? কীসের ধ্যান করছেন?

আসলে মাথা থেকে সব ভয়, সব টেনশন বেরিয়ে গেলেন তখন আসল কথাটাই মনে পড়ে যায় মানুষের। সুমনেরও মনে পড়ল। মা মহামায়া। একবার না বলতেই বাঁচিয়েছ, আর একবার নয় বাঁচালে। মায়ের কাছে ছেলে কি এইটুকু আবদার করতে পারে না?

সুমনের চোখ জলে ভরে উঠল। সে মনপ্রাণ দিয়ে মাকে ডাকতে লাগল।

এসো গো গোপনে

প্রচেত গুপ্ত

ট্রেন এক ঘণ্টা বারো মিনিট লেট। ঢোকবার কথা আটটায়। ঢুকল ন—টা বারোয়। স্টেশনের বাইরে পা দিয়েই বৈদ্যনাথ চমকে উঠল।

ওটা কনক না? হ্যাঁ, কনকই তো। ওই তো বারবার কেচে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া সবুজ শাড়ি, রং চটা লাল ব্লাউজ। লম্বা বিনুনি পিঠ থেকে গড়িয়ে এক পাশে পড়েছে। বিনুনিতে কি লাল ফিতে বাঁধা? হতে পারে। স্কুল—কলেজের মেয়েদের মতো বিনুনিতে ফিতে বাঁধা কনকের একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস। প্রথম প্রথম বৈদ্যনাথ আপত্তি করত।

'এই বয়েসে কেউ চুলে ফিতে বাঁধে?'

কনক হেসে বলত, 'কী হয়েছে বাঁধলে? চুলে ফিতে, চোখে কাজল, গালে একটু পাউডার। তাও সস্তার। এই তো আমার সাজগোছের ছিরি। গরিবের বউ, এর বেশি তো মুরোদ নেই। আজকাল সব মেয়ে বিউটি পার্লারে যায়। আমি কি যাই? তোমাকে বলেছি, আমাকে টাকা দাও আমি সাজতে যাব? বলেছি তোমাকে?

এরপর আর কী বলবে বৈদ্যনাথ? সে চুপ করে যেত। সত্যি মেয়েটা নিজের শখ আহ্লাদের জন্য একটা পয়সাও খরচ করতে চায় না। ভালো একটা শাড়ি কেনে না। চটি কেনে না। একজোড়া ছোটো দুল, হাতের একটা বালা, গলায় একটা সরু চেন ছাড়া সোনাদানা বলতে কিছু নেই। তাও গত বছর মে মাসে হাতের বালাটা বাঁধা দিয়েছে। বদ্যিনাথের ব্যাবসায় টাকার দরকার। বদ্যিনাথ জানে, নিজের জন্য খরচ না করাটা কনকের একটা গুণ। সংসারের হাল ভালো নয়। ভালো নয় বললে কম বলা হয়। বেশ খারাপ। বদ্যিনাথের একরত্তি ব্যাবসা আজ ভালো তো কাল মন্দ। সবসময় টলমল। তারপরেও অনেক বাড়িতে বউয়েরা শুনতে চায় না। এটা ওটা আবদার করে। ঘ্যানঘানানি চলতেই থাকে। কনক কখনো এমন করেনি। বরং উলটে দু—পয়সা সাশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত থেকেছে। মেয়েটার আরও একটা ব্যাপার আছে। মোটে রাগতে পারে না। এটা গুণ না দোষ? মনে হয় দোষ। বউ না রাগলে বাড়ি কেমন ঝিমোনো মতো লাগে। স্বামী—স্ত্রীর ঝগড়া সংসারে সুলক্ষণ। ঝগড়া ছাড়া সংসার টেকে না।

হ্যাঁ, বিনুনিতে ফিতে আছে। সেই ফিতে আলোতে চকচক করছে। এত দূর থেকেও দেখতে পেল বদ্যিনাথ। বাজারের প্লাস্টিকের ব্যাগটা পায়ের কাছে রাখা। ছেঁড়া হাতলে দড়ি। কনকই বেঁধেছিল। নতুন ব্যাগ কিনবে কেন? যতদিন চালানো যায়। মুখ দেখা যাচ্ছে না কনকের। সে পিছন ফিরে আছে।

ধ্যুস। বদ্যিনাথ নিজেকে মনে মনে ধমক দিল। তোমার মাথাটা কি একেবারে গেছে বদ্যিনাথ? কনক কোথা থেকে আসবে?

স্টেশনের বাইরে সন্ধের পর বাজার বসে। স্টেশন বাজার। নামেই বাজার। গায়ে গতরে একটুখানি। হাতে গোনা কয়েকটা আনাজপাতি, ফলমূলের দোকান, একজন আলু পিঁয়াজ আনে। আগে মাছ—মাংসের ব্যাপার ছিল না। মাস কয়েক হল পানু মাছ নিয়ে বসছে। ছেলেটার পায়ে সমস্যা রয়েছে। খুঁড়িয়ে হাঁটে। তবে মুখে সবসময় হাসি। বদ্যিনাথ এই হাসির দিকে তাকায় না। দোকানির হাসি খদ্দেরের ফাঁসি। ঠকানোর কল। যাক, এইটুকুতেই বাজার শেষ। ওহ, শেষ না। ইদানিং এক কোণায় পানুর বুড়ি মা ফুল নিয়ে বসছে। পুজোর কুচো ফুল। ফুলের সঙ্গে বাড়িতে বানানো ধূপ। টুকটাক বিক্রি হয়।

আনাজপাতির দোকানের ওপর কনক ঝুঁকে পড়েছে।

বদ্যিনাথ নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। একটা একটা ভুল। পিছন থেকে দেখলে অনেক সময় একরকম হয়। এই ভুল সে আগেও করেছে। সকলেই করে। চেনা লোক ভেবে অচেনা কাউকে ডেকে ফেলে। তখন অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়। আর আজ ফাঁকা কামরা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হু হু হাওয়ায় চোখ দুটো বুজে এসেছিল। তো ভুল দেখার চান্স এককাঠি বেশি। ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বদ্যিনাথের বিশ্বাস তার 'ট্রেন ভাগ্য' সবসময়ই ভালো। চার বছর আগে এই ট্রেনেই কনকের সঙ্গে আলাপ। নরমাল আলাপ নয়, গায়ে পড়া আলাপ। ভাবলে আজও হাসি পায়। গাদাখানেক জিনিস নিয়ে হাওড়া থেকে উঠেছিল। হাতে দুটো ঢাউস ব্যাগ ও কাঁধে ঝুলি। আগের দুটোর গাড়ি ক্যানসেল হওয়ায় কামরায় ভিড় ছিল খুব। ঠাসাঠাসি অবস্থা। ওপরের রড ধরাও কঠিন। তার মধ্যেই ডায়ে—বাঁয়ে কোনোরকমে চেপেচুপে দাঁড়িয়েছিল বদ্যিনাথ। বুঝতে পারছিল, একটু ওদিক—ওদিক হলেই কেলেঙ্কারি ঘটবে। লোকের গায়ে পড়তে হবে। হলও তাই। হঠাৎই ট্রেনের সামান্য গা ঝাড়াতে ব্যালান্স হারাল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনে। আর পড়বি তো পড়, পড়ল একেবারে সামনে দাঁড়ানো মেয়েটার গায়ের ওপর। বদ্যিনাথ কুঁকড়ে গেল।

এইসব ক্ষেত্রে মেয়েরা রণমূর্তি ধারণ করে। ধমক, শাসানি, গালিগালাজে মুণ্ডুপাত করে। ভিড়, ঝাঁকুনি বাজে কথা, গায়ে পড়বার, মেয়েছেলের শরীর ছোঁবার ছুঁকছুকানি। বদ্যিনাথ গালি শোনবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হল। আর তখনই মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে শান্ত গলায় বলে, 'ও কিছু না। আমাকে একটা ব্যাগ দিন। অত জিনিস নিয়ে দাঁড়ানো যায়? দিন আমাকে।'

বদ্যিনাথ এতটাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে সত্যি সত্যি একটা ব্যাগ মেয়েটার দিকে এগিয়ে দেন। রোগাপাতলা, শ্যামলা তরুণী কচি কলাপাতা রঙের একটা শাড়ি পরেছিল। ঘাড়ের পাশ দিয়ে বিনুনি নেমে এসেছিল বুকের ওপর। বিনুনিতে লাল ফিতে বাঁধা।

এই মেয়েই কনক। চারমাস যেতে—না—যেতে বদ্যিনাথের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল।

এত দ্রুত বিয়ে হবার পিছনে কারণ দু—জনের শুধু গভীর ভালোবাসা নয়, কারণ কনকের বাড়িতে ঝামেলা। তার বিয়ে পাকা হয়ে গিয়েছিল। পাত্র প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক।

আড়বেলিয়ায় একতলা বাড়ি। কনকের বাবা একদিন নিজে গিয়ে সেই বাড়ি দেখে এলেন। বাড়িতে টিভি আছে, সাইকেল আছে। জানলায় জানলায় তারে বাঁধা ফুল ছাপ বেঁটে পর্দা। বাড়ির পিছনে কুয়ো। কুয়োর জল ঠান্ডা। বয়স বেশির দিকে হলেও পাত্র দেখতে সুন্দর। কনকের বাবা বাড়ি ফিরে এসে হবু জামাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

'পুরুষ মানুষ কেমন দেখতে আসল কথা নয়, আসল কথা তার পারসোনালিটি। এই ছেলের পারসোনালিটি অতি সুন্দর। সারাদিন ছিলাম, তাকে একবারের জন্যও হাসতে দেখলাম না। একেই বলে চরিত্র। লৌহ কঠিন চরিত্র। আমি মুগ্ধ। কনকের মা, বিয়ের দিন ঠিক করো।'

কনকের মা বিয়ের দিন ঠিক করলেন। কনক ঠিক করল, বাবার লৌহ কঠিন পাত্র নয়, সে বিয়ে করবে নার্ভাস টাইপ, হাসিখুশি, গোবেচারা বদ্যিনাথকে। টলমল রোজগারের বদ্যিনাথকে। যার নিজের বাড়ি নেই। কলকাতা থেকে দেড় ঘণ্টা দূরের মফসসলে দেড় কামরা ভাড়া নিয়ে থাকে। জানলা আছে, পর্দা নেই। কুয়ো আছে, তবে শুকনো, বাড়ির বাইরের টিউবওয়েল থেকে জল নিতে হয়। কনক বিয়ে করেও ফেলল। বাড়িতে লুকিয়ে কলকাতায় পালিয়ে রেজিস্ট্রি, মন্দিরে মালা বদল। অবশ্যম্ভাবী যে ঘটনা ঘটবার তাই হল। কনকের বাবা—মা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।

একে 'ট্রেন ভাগ্য' ছাড়া আর কী বলবে বদ্যিনাথ? নইলে এমন মিষ্টি মুখের চমৎকার মেয়ে তার বউ হয়?

আশ্চর্যের কথা, এই ট্রেনেই মানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বদ্যিনাথের। ঢলঢলে চেহারার মানা। কনকের থেকে কম করে পাঁচ—সাত বছরের বড়ো। লাস্ট ট্রেনের ফাঁকা কামরার এক কোণায় বসেছিল। বুকের

অগোছালো কাপড় ঠিক না করে বদ্যিনাথের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলেছিল, 'ভাগ্যিস আপনি উঠলেন। ফাঁকা কামরায় ভয় লাগে খুব।' নামবার আগে মানা কলকাতার ঠিকানা বলে।

'আসেন না একদিন। ঘরে একাই থাকি।'

গা ঝিমঝিম করে উঠেছিল বদ্যিনাথের। এটাও ট্রেন ভাগ্য কি না? যাইহোক, কনককে এখন দেখা মস্ত ভুল। বদ্যিনাথ বুঝতে পারছে, এই ভুলের কারণ আছে।

কাল রাতে ঘুম হয়নি তেমন। কলকাতায় মানার ঘরে থাকলে রাতে ঘুমোনোর জো নেই। মেয়েটা কায়দাকানুন জানে বটে! নতুন নতুন সব রং ঢঙ। পুরোনো, বাসি বলে কোনো ব্যাপারই নেই। আজ একরকম তো কাল আর একরকম। যখনই মানার কাছে রাতে থাকে, ঘুমোতে ঘুমোতে ভোর করে দেয়। কালও দিয়েছে। আজ ট্রেনে উঠে সিট পেয়ে ঘুম দিয়েছিল টেনে। অনেক সময় ঘুমের পর শরীরে সবকিছু ঠিকমতো কাজ করে না। টাল খায়। ঘুম আর জেগে থাকা হল দুটো আলাদা অবস্থা। একটা অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় যেতে গেলে টাল তো খেতেই হবে। এখন নিশ্চয়ই সেরকম কিছুই হয়েছে। নইলে কনককে কেন দেখবে?

তাকাব না ভেবেও সাইকেল স্ট্যান্ডের দিকে যেতে গিয়ে বদ্যিনাথ ফের তাকাল।

আনাজপাতির দোকানের সামনে কনক নীচু হয়ে আছে। মন দিয়ে কিছু বাছছে। বেছে সামনের ছোটো ঝুড়িতে রাখছে। দোকানের ওপর হলদে বালব। আলোয় তেমন জোর নেই। দোকানগুলো সব তক্তাপোষের ওপর। খুঁটির ঠেকনা দিয়ে মাথার ওপর প্লাস্টিক টানা। গোড়াতে প্লাস্টিক ছিল না। বৃষ্টি বাদলায় অসুবিধে হত। তারওপর মাথার ওপর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ রয়েছে। পাখিতে ময়লা ফেলে। খাবার জিনিসে ময়লা পড়লে মানুষ ঘেন্না পায়। তাই প্লাস্টিকের ব্যবস্থা। সেখান থেকে বালব ঝোলে। স্টেশন থেকে চুরি করা কারেন্ট। আলো জোরালো হয় না। ট্রেন থেকে নেমে কেউ কেউ এই বাজার করে। বদ্যিনাথের এই বাজার মোটে পছন্দ নয়। সে বলে, 'সব বাসি। সকালে মেন বাজারে বিক্রি না হওয়া মাল সব। সেগুলোই গছানোর তাল।'

কনক বলে, 'বাসি তো কী হয়েছে? সকালে যে আনাজপাতি বিক্রি হয়, সেগুলো সব টাটকা নাকি? বেশিরভাগই আগের দিনের পুরোনো। বেছে নিলেই হল।'

বদ্যিনাথ বিরক্ত হয়ে বলে, 'কত বাছবে! ওরা তার মধ্যেই চালিয়ে দেবে। হারামজাদাদের চেনো না।'

কনক বলে, 'খামোকা গাল দিচ্ছ কেন? তোমাকে তো জোর করে নিতে বলছে না। থলিতে ঢুকিয়েও দেয় না। নিজে দেখেশুনে নিলেই হয়।'

জিনিস যে ভালো নয়! কনকও জানে। তবে দাম কম। দরাদরি চলে। দোকানিরা যতটা পারে বেচেবুচে ঝাড়া হাতপায়ে বাড়ি ফিরতে চায়। যত রাতের দিকে এখানে আসা যায় তত সুবিধে। দাম কমে। অভাবের সংসারে সুবিধে হয়। এই সুযোগটাই নেয় কনক। বদ্যিনাথকে কতবার বলেছে, 'তুমি ন—টার গাড়িতে আসবে। আমি বাজারে থাকব। আমাকে নিয়ে ফিরবে।'

বদ্যিনাথ বিরক্ত হয়। একে তো বাজারটাই পছন্দ নয়, তারওপর কনক থাকলে বেশিরভাগ সময়েই সাইকেলে ওঠা যায় না। রাতে খানাখন্দের রাস্তায় ডবলক্যারি মুশকিলের। একবার টাল খেলে মুশকিল। বাধ্য হয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেলের বাজারের থলিটা ঝুলিয়ে দু—জনে মিলে হেঁটে ফিরতে হয়। কনক বকবক করে। বদ্যিনাথ চুপ করে থাকে।

মানা যেদিন তাকে বলেছিল, 'ডার্লিং, আমায় বিয়ে করবে কবে?' বদ্যিনাথ আকাশ থেকে পড়েছিল।

'কনক আছে তো।'

ছিটকে সরে গিয়েছিল মানা। উঠে বসে, খাটের ধারে চলে গিয়েছিল। তারপর বদ্যিনাথের দিকে পিছন ফিরে বসে বলেছিল, 'তাহলে কনককে নিয়ে থাকো। আমার কাছে আসো কেন? বাসি বউ যদি ভালো লাগে, আমাকে জ্বালাও কেন? আমি কি সস্তা?'

বদ্যিনাথ হাত রেখেছিল মানার কাঁধে। মানা হাত সরিয়ে, গলায় ঝাঁঝ নিয়ে বলেছিল, 'ঝামেলা কোরো না।'

বদ্যিনাথ কাতর গলায় বলেছিল, 'মানা বোঝবার চেষ্টা করো।'

মানা ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'কী বুঝব? তোমার বউয়ের কথা? আমি কেন বুঝতে যাব? তুমি আমাকে বোঝো? বউকে ঘরে রাখবে, আর আমি সারাজীবন বাজারে পড়ে থাকব? কেন আমার ঘর—সংসারের শখ আহ্লাদ নেই? রাত পেরোলে ক—টা পয়সা দাও বলে আমার শখ আহ্লাদ সব কিনে নিয়েছ নাকি? লাথি মারি তোমার পয়সার মুখে। বেটাছেলের অভাব আছে আমার?'

বদ্যিনাথ উঠে বসে। অস্থির গলায় বলে, 'শুধু পয়সা কেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি মানা।'

মানা রাগে গরগর করে বলে, 'মিথ্যে কথা বোলো না। বউটা বাসি হয়ে গেছে, তাই মাঝে মাঝে এসে...।'

বদ্যিনাথ চুপ করে থাকে। কথাটা মিথ্যে নয়। মানার সঙ্গে মেলামেশার পর থেকেই কনককে মাঝে মাঝে কেমন যেন পুরোনো মনে হয়। বিশেষ করে রাতে। মনে হয় সেই একই শরীর, একই ভঙ্গি, একই আদর। অথচ বিয়ের তো বেশি দিন হয়নি। মোটে চার বছর। না চার নয়, চার বছর এক মাস। গত মাসে কনক ফুল এনে ঘরে রেখেছিল। মুখ থেবড়া একটা ফুলদানি আছে বাড়িতে। কোণা ভাঙা। তাতে ফুল রাখতে কোনো অসুবিধে হয়নি কনকের। রাতে খেতে বসে বদ্যিনাথ বলেছিল, 'ব্যাপার কী? ফুল সাজিয়েছ দেখছি।'

কনক চোখ ঘুরিয়ে বলেছিল, 'কেমন লাগছে?'

বদ্যিনাথ বলেছিল, 'মন্দ না। আর ক—টা বেশি হলে ভালো হত।'

কনক বলল, 'বাপরে আরও? এই ক—টারই যা দাম।'

বদ্যিনাথ বলল, 'ফুল কেন বললে না?'

কনক বদ্যিনাথের পাতে ভাঁজ করে রুটি দিতে দিতে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'আজ আমাদের বিয়ের দিন না? তুমি ভুলে গেছ। চার বছরেই বাসি হয়ে গেলাম?'

সত্যি কি কনক বাসি হয়ে গিয়েছিল? নাকি মানাকে দেখার পর থেকে এমনটা মনে হয়েছিল বদ্যিনাথের? এক ধরনের জাল বিছিয়ে রাখে মানা। মাকড়সা পোকা ধরবার জন্য যেমন জাল বিছিয়ে রাখে। একবার আটকালে বেরনো যায় না। সেদিনও বদ্যিনাথের তাই মনে হচ্ছিল।

মানা রাগে ফোঁস ফোঁস করে বলেছিল, 'সত্যি যদি ভালোবাসতে তবে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলতে আমাকে। সঙ্গে একটা বেটাছেলে থাকলে সবদিক থেকে সুবিধে। অনেক জ্বালাতন থেকে বাঁচি। নিজের ইচ্ছেমতো চলতে পারি। তোমার মতো গোবেচারি হলে তো কথাই নেই।'

বদ্যিনাথ কপালের ঘাম মুছে বলল, 'কী করব মানা? কনক আছে যে।'

মানা বলে, 'কী করবে তুমি জানিয়ো।'

বদ্যিনাথ অসহায়ভাবে বলে, 'তুমি বলে দাও কী করব?'

মানা তীক্ষ্ন গলায় বলে, 'অনেক হয়েছে, আর না। এবার বউকে ছাড়তে হবে তোমায়।'

বদ্যিনাথ চমকে উঠে বলে 'ডিভোর্স? কনককে ডিভোর্স করতে বলছো?'

মানা একটু চুপ করে থাকে। স্থির চোখে তাকায়। এই চোখে যে কী হাতছানি আছে সে জানে কেবল বদ্যিনাথ। আবার মানা খাটে ফিরে আসে। ঝুঁকে পড়ে বদ্যিনাথের গলা জড়িয়ে ধরে দু—হাতে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে ওঠে। সে ফিসফিসানিতে আদর ছিল, তার থেকে বেশি ছিল হুমকি।

'বউকে ডিভোর্স করবে না মেরে ফেলবে সে তুমি জানো বদ্যিনাথ। তোমার ব্যাপার। আমার মাথাব্যথা নেই। মোদ্দা কথা কনককে তোমায় সরাতে হবে। আর না সরালে, আমিই যাব তার কাছে। সব বলব তাকে। তাকে গুছিয়েই বলব কেমন করে তুমি আমার কাছে আসো। এসে কেমন করে...সব। এবার তুমিই ঠিক করো বউকে ছাড়বে না মারবে।'

মেরে ফেলবে! কনককে খুন করবে? মানা এসব কী বলছে? এ কথা শোনাও পাপ। কনক তাকে ভালোবাসে। সেও কি ভালোবাসে না? অবশ্যই কনকের মতো মেয়ে হয়? সব দিয়ে বিশ্বাস করে স্বামীকে। যেটুকু আছে তাই দিয়ে, যা নেই তাই দিয়েও। নইলে ফিরে যাবার দরজা এত সহজে বন্ধ করতে পারে কেউ? কিন্তু বদ্যিনাথের তো আর উপায় নেই। মাকড়সার জালে পা জড়িয়ে ফেলেছে। মানা সব বলে দিলে কনক কী করবে? রেল লাইনে গলা দেবে? দিতেও পারে। কিন্তু সে মৃত্যুও তো সুখের হবে না। তাকে তো সব জেনে মরতে হবে। বদ্যিনাথের বিশ্বাসঘাতকতার সবটা জেনে মরতে হবে।

দু—হাত দিয়ে মুখ ঢাকে বদ্যিনাথ।

মানা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'এখন মুখ ঢাকলে কী হবে? যা কালি লাগবার লেগে গেছে। আর আমার ঘরে বসে থাকলে চলবে না তো বাপু। অন্য লোক আসবে। এবার বউয়ের কাছে ফিরে যাও গুটিগুটি।'

পায়ের কাছে রাখা বাজারের থলিটা হাতে তুলে কনক এবার মুখ ফেরাল। তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বদ্যিনাথ। সেই টলটলে মুখ। সেই কপালে ছোট্ট কালো টিপ। শান্ত দুটো চোখ। বদ্যিনাথের গা হাত পা ঝিমঝিম করে উঠল। পাশে দাঁড়ানো একটা রিকশর আড়ালে চট করে সরে গেল।

কনক! কনক কীভাবে এসেছে?

মানুষ বড়ো আজব। পাপ জানবার পরও কত পাপ কাজই না তাকে করতে হয়। মন চায় না, তারপরও করতে হয়। বোধহয় সেইসব সময়ে শরীরে পাপ ভর করে। শরীর তখন পাপ করে। নাকি অন্য কিছু? কে জানে। বদ্যিনাথের লেখাপড়া বেশি নয়। এত কিছু তার মাথায় ঢোকে না। সে অত বোঝে না। সে শুধু বলল, কনককে মরতে হবে। তার জন্য যেমন মরতে হবে, তার নিজের জন্যেও মরতে হবে।

কনক ফলের দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গণেশ ফল বেচে। নিশ্চয়ই ঠকাবে। পচা ধচা গছিয়ে দেবে। বদ্যিনাথ রিকশর আড়াল থেকে খানিকটা বেরিয়ে এল। কনক ফল কিনল। বাপরে, মেয়েটা বেশ খরচা করছে তো! আচ্ছা কনকের মতো দেখতে কেউ নয় তো? হতেই পারে। একটা মানুষের মতো দেখতে আর একটা মানুষ তো থাকেই। কে আসল, কে নকল গুলিয়ে যায়। যায় না?

বউকে মারতে বেশি বেগ পেতে হয়নি বদ্যিনাথের। বেশি ভাবনাচিন্তাও করেনি। করবে কেন? সে তো আর খুনি নয়। খুনিরা সাত পাঁচ ভাবে। এক শনিবার ভোরে মর মর বাবাকে দেখতে চার বছর পর বাপের বাড়িতে গেল কনক। দু—ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল কাঁদতে কাঁদতে। বাবা দেখা তো করেইনি, ঘরে ঢুকতে পর্যন্ত দেয়নি। বদ্যিনাথ দেরি করেনি। বিষ কেনাই ছিল। নিজের খাওয়া হলে কনকের খাবারে মিশিয়ে দিল। কনক এখন খাবে না। তার মন খারাপ। খাবার ঢাকা দিয়ে কলকাতার গাড়ি ধরতে বেরিয়ে পড়ল বদ্যিনাথ। বেচারি মেয়ে। বাবা—মায়ের কাছ থেকে খুব ধাক্কা পেয়েছে। রাতে বাড়ি ফিরে, পাড়ার লোক ডেকে দরজা ভাঙতে হয়েছিল বদ্যিনাথকে। দুঃখে, অপমানে কনক যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আহারে! পুলিশ এলে বিষের শিশি হাতে তুলে দিল বদ্যিনাথ। শ্মশানে যাওয়ার সময় পাড়ার মেয়েরা কনককে সবুজ শাড়ি, লাল ব্লাউজ পরিয়েছিল। মাথায় একটা বিনুনিও বেঁধে দিয়েছিল। সেখানে লাল ফিতে। ঠিক আজকের মতো।

কনকের মতো দেখতে মেয়েটি এবার পানুর মাছের দোকানে দাঁড়িয়েছে। বদ্যিনাথ রাস্তায় নেমে এল। হারামজাদা পানু এবার নির্ঘাত বাসি মাছ ধরাবে।

মানার কাছে গিয়ে প্রথম চোটে খুব খানিকটা কেঁদেছিল বদ্যিনাথ। মানা বলেছিল 'ঢঙ। বউ সুইসাইড করে, আর ধেড়ে বুড়ো কাঁদে। যত্তসব ন্যাকামি। ন্যাকা পুরুষ দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

সুইসাইডের সময় পেয়ারের বউ তোমাকে মনে রেখেছিল? তবে ভালোই হয়েছে। তুমি এখন থেকে আমার।'

কাল শেষ রাতে মানা বিয়ের কথা তুললে বদ্যিনাথ বলে, 'দাঁড়াও এখন বিয়ে করলে সবাই সন্দেহ করবে। ক—টাদিন যেতে দাও।'

মানা ভুরু কুঁচকে বলে, 'কীসের সন্দেহ করবে?'

মানা ধড়ফড় করে উঠে বসে। গায়ের কাপড় সামলে চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, 'অ্যাই তুমি বউকে খুন করেছ নাকি মাইরি? উরি বাবা!'

বদ্যিনাথ ঠান্ডা গলায় বলে, 'হ্যাঁ।' তারপর মুচকি হেসে পাশ ফেরে।

সারাদিন ব্যবসার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছে বদ্যিনাথ। তিন মাস হয়ে গেল কনক নেই। এখনও অভ্যেস হয়নি। বাড়ি ফিরে একা লাগে। দুটো নাকে মুখে গুঁজে শুয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে বাসি বউয়ের জন্য মাঝে মাঝে ভুল করে হাত বাড়ায়।

আজও বদ্যিনাথের 'ট্রেন ভাগ্য' ভালো ছিল। গাড়ি ফাঁকা। তারপরেও দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল বদ্যিনাথ। হু হু করে গাড়ি ছুটছিল। ঝড়ের মতো বাতাস এসে লাগছিল চোখে মুখে।

কনকের মতো দেখতে মেয়েটি এখন বুড়ির সামনে। নিশ্চয়ই শুকনো বাসি ফুলগুলো কিনবে। ধূপকাঠিও কি নেবে? মেয়েটি বুড়ির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

বাজার ফাঁকা হয়ে আসছে। দোকান গোটানো শুরু হয়েছে। এবার আলো নিভবে।

বদ্যিনাথ আর পারল না। রাস্তায় নেমে কনকের মতো দেখতে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

বদ্যিনাথ আর কনক এখন পাশাপাশি হাঁটছে। বাড়ি ফিরছে দু—জনে। বদ্যিনাথ স্টেশনের স্ট্যান্ড থেকে সাইকেল নিয়েছে।

সাইকেলের হাতলে বাজারের ব্যাগ। ব্যাগের ছেঁড়া হাতল দড়ি দিয়ে বাঁধা। রাস্তা শুনশান। এত রাতে কে থাকবে?

কনক বলল, 'তোমার জন্য রোজ অপেক্ষা করি। তুমি ফিরলে একসঙ্গে বাড়ি যাব বলে। তুমি দেরি করো। আমাকে একা ফিরতে হয়।'

বদ্যিনাথ লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, 'দেরি হয়ে যায় কনক। আমারও আজকাল খুব একা লাগে। আর দেরি হবে না। আমি ব্যবস্থা করেছি।'

কনক মিথ্যে রাগ দেখিয়ে বলল, 'মনে থাকে যেন। নইলে আমি সারারাত তোমার জন্য স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করব।'

বদ্যিনাথ বলল, 'আর বাসি পচা জিনিস কিনবে। তাই তো?'

কনক বলল, 'আর কী করব? গরিব বরের সংসার খরচ বাঁচাতে হবে না?'

বদ্যিনাথ হেসে বলল, 'আজও আমি আগে আসতাম জানো কনক। গাড়ি লেট করল। হতচ্ছাড়া কোন একটা লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। হাত ফসকে পড়েছে। পড়েছে না নিজেই ঝাঁপ দিয়েছে কে জানে। হয়তো মরবার ইচ্ছে জেগেছিল। ব্যস গাড়ি গেল আটকে। সেই লোককে তুলে হাসপাতালে পাঠিয়ে তবে গাড়ি ছাড়ল। লোকটা মরে যাবে। অত জোরে ট্রেন থেকে পড়েছে...তারওপর পোস্টে ধাক্কা।'

কনক বলল, 'ইস মাগো। তুমি কিন্তু দরজায় দাঁড়াবে না একদম।'

বদ্যিনাথ চাপা গলায় হাসল।

কনক বলল, 'এই জানো একটা ভালো খবর আছে।'

বদ্যিনাথ বউয়ের কাছ ঘেঁষে এসে বলল, 'কী খবর।'

কনক হাত বাড়িয়ে বরের কনুই ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'বলব না।'

চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে শুনশান পথঘাট, ভেসে যাচ্ছে লোকালয়। সেই আলো রহস্যময়। রহস্যময় আলোতে বদ্যিনাথ আর কনককে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, তারা কুয়াশা মেখে ধীর পায়ে হাঁটছে। আহারে, বড়ো সুন্দর লাগছে!

একটু আগে ট্রেন থেকে পড়া লোকটার পরিচয় জানতে পেরেছে হাসপাতাল। মরা লোকটার পকেটে কাগজের টুকরো পাওয়া গেছে। তাতে লেখা বদ্যিনাথ। বদ্যিনাথ সামন্ত।

গাঁ—এর নাম ছমছমপুর

গৌর বৈরাগী

আজ সকালেই তুমুল একচোট ঝগড়া করল আদুরি। ঝগড়া অবশ্য একে বলা যায় না। গালমন্দ, শাপশাপান্ত যা হল সবই অবশ্য এক তরফা। আদুরি বলছে আর ওদিকে ছেলেটা শুয়ে শুয়ে শুনছে। এসব দেখে আজ সত্যি সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে হল তার।

ছমছমপুরের পাটালি দাস ছেলেটা রামকুঁড়ে। বয়েস চব্বিশ পার হতে চলল এদিকে কাজকম্মের কোনো ধান্ধাই করে না। বিধবা মা কতরকম কাজই খুঁজে এনে দিল। হরি মুদির দোকানে ফর্দ ধরে ধরে মাল দেবার কাজ। তো সে—কাজ পোষাল না। কেন? না বড্ড ছোটাছুটি করতে হয়। তখন নিতাই—এর সাইকেল সারাই—এর দোকানের কাজ এনে দিল আদুরি। কিন্তু দু—দিন বাদে সে—কাজও ছেড়ে দিল পাটালি। চাকায় হাওয়া দিতে গেলে বড়ো হ্যাঁচকা দিতে হয়। অত পরিশ্রম সইবে কেন তার। তখন খবরের কাগজ কেটে ঠোঙা তৈরির কাজ বাড়িতেই নিয়ে এল মা। এ কাজে ছোটাছুটি নেই। হ্যাঁচকা দেওয়াও নেই। বসে বসে কাগজ কাটো আর আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে ঠোঙা তৈরি করো, ব্যস।

কিন্তু এ কাজটাও হল না। দেখা গেল, কটা কাগজ ডাঁই করে ফেলে রেখে পাশে শুয়ে ভোঁস ভঁসিয়ে ঘুমোচ্ছে পাটালি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো ঠোঙা তৈরি করা যায় না, বসতে হবে। আর কে না জোনে যারা বেহদ্দ কুঁড়ে তারা সুযোগ পেলে বসতে চায়, বসতে পেলে শুতে চায় আর শুতে পেলে ঘুমোতে চায়। অতএব একাজও বাদ পড়ল। তাই গালমন্দ করে পাড়া মাথায় করল আজ। তারপর দুর ছাই বলে বেরিয়ে পড়ল আদুরি।

কিন্তু যাবে আর কোথায়। যতই হোক সে তো মা। পাটালিকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে না—পারলে সারাজীবন করবেটা কী? এদিকে ছেলেটার খুব বদনাম হয়ে গেছে। যার কাছেই যায় সে বলে, তোমার ছেলে তো একটাই কাজ জানে আদুরি। হয় বসা না—হয় ঘুমোনো। ও দিয়ে আমার তো চলবে না। ওই একই কথা বলল, বাজারওলা লালু। হাটে গুড়ের আড়ৎ শৈলেন খামারুর। মানুষটা ভালো। অপরের দুঃখ মন দিয়ে শোনেন। তিনি শুনেটুনে বললেন। আমার তো সব হিসেবের কাজ আদুরি। এদিকে তো তোমার ছেলে পাঁচ কেলাস অবধি পড়েছে। ও দিয়ে তো আমার কাজ হবে না।

হবে না?

না, আমার কাজ হবে না। তবে অন্য একটা কাজ আছে।

কী কাজ জ্যাঠামশাই?

শৈলেন খামারু হাসলেন। লোকে বলে, যার নেই কোনো কাজ, বসে বসে পালা ভাঁজ।

তার মানে কী জ্যাঠামশাই?

মানে হল, যাত্রাপালা। আমাদের এই ছমছমপুরে যাত্রাপালা এসেছে দেখোনি?

দেখেনি, তবে শুনেছে আদুরি। কী এক নাট্যসমাজ তিন রাত্তিরে তিনটে পালা করবে এখানে। মাইকে মাইকে বলে বেড়াচ্ছে। ওদিকে তো মন দিলে চলে না তার। কিন্তু সেখানে কী করবে আমার পাটালি?

অ্যাকটো করবে, অ্যাকটো। হো হো করে আবার হাসলেন শৈলেন খামারু। বলা যায় না কাজটা হয়তো তোমার পাটালির মনে ধরে গেল।

আদুরিরও মনে ধরল কথাটা। কী থেকে যে কী হয় কেউ জানে না। তাই সে হন হন করে হাঁটতে লাগল। ওই তো পালপাড়ার মাঠ। চট দিয়ে ঘিরে বিশাল ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। মাইকে কে যেন তারস্বরে চিৎকার করছে।

'আসুন....আসুন...টিকিট কাটুন। আজকের পালা 'ভূত বাংলো'। টিকিট পাঁচ টাকা আর দশ টাকা।'

মাইক শুনেই এগিয়ে গেল আদুরি। টেবিল পেতে দুটো ছোকরা বসে আছে। সে যেতেই একজন ছোকরা মাইক নিভিয়ে বলল, ক—টা দোব?

আদুরি ভয়ে ভয়ে বলল, কী জিনিস দেবে বাবা?

টিকিট গো টিকিট, আজ ভালো পালা আছে।

কিন্তু আমি তো টিকিট কিনতে আসিনি?

একটা ছোকরা ধমকে উঠল। তাহলে কী করতে এসেছ?

পালায় যদি কোনো অ্যাকটো পাওয়া যায় তাই জানতে এয়েচি।

কথা শুনে রাগের বদলে হো হো করে হাসল দুজন ছোকরা। অ্যাকটো করার খোঁজ নিতে এসেছ। এদিকে পালাই তো বন্ধ হয়ে যাবে শুনছি।

বন্ধ হবে?

হ্যাঁ। কাল কত বিক্রি হয়েছে জানো? মোটে সাতশো আশি টাকা।

যাও যাও সরো এখান থেকে।

কথা শুনে সরে আসে আদুরি। ভারী দুঃখ হয় তার। নাঃ এভাবে বেঁচে থাকার আর মানে হয় না।

২

বসে বসে দুঃখের কথা ভাবছিলেন ভবতারিণী নাট্যসমাজের ম্যানেজার নিবারণ হাজরা। নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে এই নির্জন জায়গাটা চোখে পড়ল তার। কাছে—পিঠে একটাও লোক নেই। চারপাশে ক—টা বাঁশঝাড়। মাঝখানে বেশ বড়ো একটা পুকুর। এতবড়ো পুকুর, টলটলে জল অথচ কোনো ঘাট নেই। তার মানে এটা কেউ ব্যবহার করে না। ভালোই হয়েছে, এমন নির্জন জায়গাতেই তো নিজের মনে একা একা দুঃখের কথা ভাবা যায়। দুঃখ বলে দুঃখ, কী দিনকালই এল। লোকে আর যাত্রামুখো হচ্ছে না। সবাই ঘরে বসে টিভি দেখছে। এখন গ্রামগঞ্জেও ঘরে ঘরে টিভি। ঘরের বাইরে এসে পালা দেখতে বয়ে গেছে তাদের। এই ছমছমপুরে এসে ভেবেছিলেন কিছু দর্শক পাওয়া যাবে। দু—চার টাকা ঘরে আসবে। কিন্তু কোথায় কী। তিন নাইটে তিনটে পালা। ফার্স্ট নাইট—গণেশ কেন বেকার? সেকেন্ড নাইট—ভূত বাংলো আর শেষে মরণ কামড়।

পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে ফেলা হয়েছে ছমছমপুর। হাটতলা, মনসাতলা, স্কুলপাড়া, পিরের মাজার। তার ওপর দু—দিন ধরে ভ্যানে মাইক লাগিয়ে এনতার প্রচার হয়েছে। অথচ লাভ কী হল? কাল রাতে 'গণেশ কেন বেকার?' পালায় যা বিক্রি তাতে খাইখরচাটাও উঠবে না। নাঃ এভাবে চলে না। ভবতারিণী নাট্যসমাজকে উঠিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এমন যখন ভাবছেন তখন পুকুরের আঘাটা বেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল একজন। বিধবা মানুষ। পরনে একটা নোংরা শাড়ি। মাথার চুলে জট। তার দিকে তাকিয়ে বলল, কী ভাবছেন আজ্ঞে?

মনখারাপে নির্জনে বসে একটু ভাববেন তার উপায় নেই। তাই রাগ হয়ে গেল নিবারণ হাজরার। মেয়েলোকটার আসপদ্দা তো কম নয়, কী ভাবছি তাকে বলতে হবে কেন? তাই কড়াগলায় বললেন, কে হে তুমি?

আজ্ঞে আমি আদুরি, এখেনেই বাস।

তা বেশ, তা কী ভাবছি সে—কথা তোমাকে বলব কেন?

না না আমি সে—কথা বলিনি। আদুরি জিব কাটল। আসলে জায়গাটা তো খারাপ।

খারাপ?

হ্যাঁ খারাপ। এই যে পুকুরটা এটার নাম বউডোবা পুকুর। মাঝে মাঝেই বউ—ঝি এখানে ডুবে মরে। ব্যাটাছেলেও ডোবেনি তা নয়। আসলে পানো বলে পুকুরটা ডাকে তাই এর ধারেকাছে কেউ আসে না।

কথা শুনে বেশ মজা পেলেন নিবারণ হাজরা। গ্রামগঞ্জে এরকম কত যে ভূত ছড়ানো আছে। তার অবশ্য কোনো ভূতের ভয় নেই। তাই অল্প হাসলেন। বললেন, তাহলে তুমি এসেছ কী করতে?

আজ্ঞে আমিও ডুবতে এয়েছিনু। কিন্তু পারলুম না।

কেন পারলে না?

ওই ভূতটার কথা ভেবে। আদুরি খুব দুঃখের গলায় বলল, বাড়িতে একটা জ্যান্ত ভূত রেখে কী করে জলে ডুবি বলুন?

'জ্যান্ত ভূত' কথাটা বেশ মনে ধরে গেল নিবারণ হাজরার। ব্যবসায়ী মানুষের চোখ—কান সবসময় খোলা রাখতে হয়। কখন কী কাজে লাগে কে জানে। এই যেমন এখন 'জ্যান্ত ভূত' কথাটা মনে ধরে গেল। বললেন, বাড়িতে কী করে তোমার ভূত?

শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোয়। টানা দু—দিন না—খেয়েও শুধু ঘুমোবে। সে আর বলবেননি আজ্ঞে। আপনি বলুন, এরপর ওকে কেউ কাজ দেবে?

যদি দেয়, নিবারণ হাজরা মিটি মিটি হাসলেন। আমি যদি ওকে কাজ দিই?

আপনি দেবেন? এত অবাক জীবনে হয়নি আদুরি। সে বলল, কী কাজ দেবেন?

নিবারণ হাজরা বললেন, ঘুমোবার কাজ।

৩

ভবতারিণী নাট্যসমাজের ম্যানেজার খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরলেন সুযোগটা। এটাই হয়তো শেষ সুযোগ। অনেক আশা নিয়ে 'ভূত বাংলো' পালাটা লিখেছিলেন। গল্পে রহস্য আছে। রোমাঞ্চ আছে। মোটামুটি অভিনয়ও ঠিক ঠিক হচ্ছে। কিন্তু 'ভূত বাংলো'—তে একটা ভূতও আমদানি করা যায়নি। আর ভূত ছাড়া ভয়ই বা লোকে পাবে কেন।

নাটকটা শুরু হচ্ছে বনের ভেতর একটা পোড়োবাড়িতে। এক ঝড়ের রাতে হিরো—হিরোইন সেখানে আশ্রয় নেবে। প্রথম দৃশ্যে বাঁশের ফ্রেমের ওপর থার্মোকলের ভাঙা পাঁচিল দেখানো হয়েছে। পাশে ভাঙা লোহার গেট। হিরোইনের তেষ্টা পেয়েছে খুব। জলের খোঁজে দুজনেই ভেতরে ঢুকবে তখন।

তখন একটানা ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। টেপ করে রাখা শেয়ালের হুক্কাহুয়া শোনা যাচ্ছে আর তার সঙ্গে নিরাপদ দলুই—এর ভয় ধরানো মিউজিক। কিন্তু এতসব করেও তেমন ভয় পাওয়ানো যায় না দর্শকদের। মানুষ আজকাল ভয় পেতেও ভুলে গেছে। একমাত্র যদি তেমন এক জ্যান্ত ভূত দেখানো যেত।

তাই আদুরির কথায় সোজা ওর বাড়ি চলে গেলেন নিবারণ হাজরা। আদুরিই ডাকল, পাটালি পাটালি বলে। ছেলে সামনে এসে দাঁড়াতে বলল, এই আমার ভূত আজ্ঞে।

নিবারণ হাজরা দেখছিলেন, আহা, খাসা চেহারা ছেলেটার। যেমন যেমন চেয়েছিলেন এ যেন তার চেয়ে বেশি পাওয়া। যেমন গায়ের রং তেমনি রোগা রিংঠিঙে। গায়ের রং যা তাতে আবলুস কাঠ হার মানে। বুকের খাঁচায় ফুটে ওঠা হাড় ক—খানা গুনে ফেলা যায়। হবে, হবে। বেশ খুশির গলায় বললেন। আমাদের যাত্রাপালায় একটা ভূত দরকার। তোমাকে যদি ভূতের পার্টটা দিই পারবে তো হে?

ভাবনার জন্যে যেন কিছু সময় নিল পাটালি। তারপর সব বুঝেশুনে ভয়ে ভয়ে বলল, আমি কিন্তু বেশি নাচন—কোদন পারব না।

কথা শুনে হো হো করে হেসেছিলেন নিবারণ হাজরা। তোমাকে কিছু করতে হবে না। চুপচাপ শুয়ে থাকলেই কাজ হয়ে যাবে আমাদের। এরপর আর বেশি কথা বাড়াতে চাননি তিনি। পকেট থেকে একটা

পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে আদুরির হাতে দিয়ে বলেছিলেন। পার্ট ভালো হলে আরও পাবে। এখন আমি চললুম।

শুধু একা নন, সঙ্গে পাটালিকেও নিলেন তিনি। ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলিয়ে শিখিয়ে—পড়িয়ে দিতে হবে। আজ রাতে 'ভূত বাংলো' পালা।

ডিরেক্টর নবনী অধিকারী তখন গালে হাত দিয়ে বসেছিল। সকালে জলখাবার হয়েছিল মুড়ি বেগুনি। খুবই মুখরোচক খাবার। অথচ মুখেই রুচছে না। বেলা বারোটা বাজতে চলল। ওদিকে খবর এল দুশো টিকিটও বিক্রি হয়নি।

নিবারণ হাজরা বললেন, এক কাজ করলে হয় না অধিকারী মশাই?

কী কাজ?

ফার্স্ট সিনেই যদি একটা ভূত এনে ফেলা যায়?

ফার্স্ট সিনে?

হ্যাঁ। হিরো—হিরোইন স্টেজে অ্যাপিয়ার করার আগেই যদি ভূত বাংলোর পাঁচিল, মানে বাঁশের মাচায় যদি একটা ভূতকে শুইয়ে রাখা যায়।

তা যাবে না কেন, ডিরেক্টর ফস করে বড়ো একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তবে তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। লোকে আজকাল ভয় পেতে ভুলে গেছে।

সত্যি ভূত হলেও?

সত্যি ভূত...?

তখন নিবারণ হাজরা পাটালি দাসকে দেখালেন। হাড়—পাঁজরা বার হওয়া কালো—কুলো পাটালি এবার বড়োসড়ো একখানা হাসি হেসে উঠল। কালো মুখের ভেতর অমন ঝকঝকে সাদা একসারি দাঁত। দিনের বেলাতেই যেন চমকে গেল নবনী অধিকারী। তারপরেই ছেলেটাকে নিয়ে কাজে নামতে হল। নতুন ছেলে। শেখাতে—পড়াতে টাইম লাগল।

টাইম অবশ্য বেশি লাগার কথা নয়। লাগলও না। শুধু তো শুয়ে থাকতে হবে। মুখ দিয়ে একটা কথাও বার করতে হবে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সড়োগড়ো হয়ে গেল পাটালি।

নিবারণ হাজরা বললেন, কী মনে হচ্ছে পাটালি?

পাটালি হেসে বলল, আজ্ঞে এ তো খুব সহজ অ্যাকটো দেকচি।

৪

আটটায় পালা শুরু হলে সন্ধে ছ—টা থেকে তোড়জোড় শুরু হয়। ওদিকে স্টেজ সাজানো আছে। মেকআপ আছে। মেকআপ ম্যান শম্ভু পাল তার বাক্স—প্যাঁটরা সাজিয়ে বসেছে। তখন নবনী অধিকারী বলল, অ শম্ভু, এই হল পাটালি। এরই ভূতের মেকআপ হবে।

শম্ভু অবাকময় তাকিয়েছিল। এমন লোক বোধহয় সে জীবনে দেখেনি। বলল, এ তো মেকআপ নিয়েই এসেছে অধিকারীবাবু।

নবনী অধিকারী হাসলেন। ঠিক লোককেই বাছা হয়েছে তাহলে, তুমি শুধু টাচটা দিয়ে দাও।

শম্ভু পাল তুলিতে অ্যালুমিনিয়াম পেন্ট দিয়ে বুকের ক—খানা হাড়ের ওপর একবার করে বুলিয়ে দিল। চোখের চারপাশেও দুটো গোল এঁকে দিল। পাটালি ধাঁ করে বদলে গেল ভূতে।

ডিরেক্টর এগিয়ে এল। বলল, পাটালি তোমার ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স। এখন একধারে গিয়ে বসো। থার্ড বেল পড়ে গেলেই স্টেজ অন্ধকার হয়ে যাবে। তারপর যেমন যেমন বলেছি, চুপি চুপি গিয়ে বাঁশের মাচায় শুয়ে পড়বে। ব্যস, তোমার পার্ট শেষ। মনে আছে?

আজ্ঞে সব মনে আছে। বড়ো একটা ঘাড় নাড়ল পাটালি। এখন আমি বসছি।

পালা শুরুর মুখটায় খুব হুটোপাটি হয়। অন্য কোনো দিকে তাকাবার সময় হয় না। আজ কিন্তু নিবারণ হাজরার অন্যদিকে মন নেই। খবর পাচ্ছেন, টিকিট বিক্রি ভালো নয়। মেরে কেটে হাজার দেড়েক টাকা। আশা ছিল অন্যরকম কিছু হবে। সকালেই মাইক নামিয়ে প্রচার করিয়েছেন। 'ভূত বাংলো'—য় আজ জ্যান্ত ভূত আনা হচ্ছে। যাত্রাজগতে এই প্রথম। জ্যান্ত ভূত দেখার এমন সুযোগ আর হাতছাড়া করবেন না।

নাঃ, এত করেও ঠিক জমল না। রাত প্রায় আটটা বাজতে চলল। ফার্স্ট বেল পড়ব পড়ব। নিবারণ হাজরা দেখলেন দর্শকাসনের চার আনা ভরতি হয়েছে মোটে। ছেলে কোলে কিছু বউ—ঝি এসেছে। কিছু ছোকরা গুলতানি করছে। আর বাবা—কাকারা যাদের অনেক রাত অবদি এমনিতে ঘুম হয় না তারা এসেছে রাত কাটাতে।

এমন চিন্তার ভেতরেই ফার্স্ট বেল পড়ে গেল। আজ খুব ঘর—বার করছেন। ছেলেটা পারবে তো? না ডুবিয়ে দেবে? বড়ো একটা ঝুঁকি নেওয়া হয়ে গেল। ঝমঝম করে কনসার্ট বাজছে। একবার তাড়াতাড়ি টিকিট কাউন্টার থেকে ঘুরে এলেন নিবারণ হাজরা। কাউন্টারের সামনেটা শূন্য খাঁ খাঁ। নাঃ, প্রচারেও কোনো কাজ হয়নি। লোকের এতেও আর বিশ্বাস নেই। ফিরে আসতে আসতেই থার্ড বেলও পড়ে গেল।

স্টেজ অন্ধকার। কনসার্ট থেমে গেছে। টেপে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। এরপরেই শিয়ালের ডাক শোনা যাবে। পরিবেশ তৈরি। অন্ধকারে নিবারণ হাজরা ডিরেক্টর নবনী অধিকারীর গলা পেলেন। চাপা গলায় ডিরেক্টর বলছে, ছেলেটা গেল কোথায়?

কে একজন বলল, কোন ছেলেটা?

ডিরেক্টর ধমক দিয়ে বললেন, ভূত। ভূত কোথায়?

ওই তো স্টেজে উঠছে সে।

অন্ধকারেও দেখা গেল। স্টেজে উঠে পাটালি দাস বাঁশের মাচায় গিয়ে শুয়ে পড়ছে। চাপা গলায় ডিরেক্টর বলল, ডিমার।

সঙ্গে সঙ্গে আবছা হলুদ আলোটা জ্বলে উঠল। ফোকাসটা ভাঙা ভাঙা পাঁচিলের ওপর। ওই তো পাটালি শুয়ে আছে। আশ্চর্য পাটালি না ভূত? কে বলবে ও ভূত নয়। ওরকম মানুষের চেহারা হয় নাকি। বলে না—দিলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। মেকআপ ম্যান শম্ভু পালের হাতযশ আছে বলতে হবে।

চারপাশ থমথম করছে অন্ধকারে। দর্শকদের মুখে একটাও কথা নেই। একটা কী হয় কী হয় ভাব। এর মধ্যে হিরো—হিরোইন স্টেজে এসে গেছে। তাদের চোখে—মুখে ভয় আর আতঙ্ক। যদিও ভূতের দিকে তাদের চোখ পড়ার কথা নয়। বনের মধ্যে এক ভাঙা ভূত বাংলোই ভয় ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট। ভয়ের গলায় এবার ডায়ালগ শুরু করবে হিরোইন।

কিন্তু তাদের কিছু বলার আগেই একটা ঘটনা ঘটল। পাটালি দাস শোয়া থেকে আধখানা শরীর তুলল। এরকম তো হওয়ার নয়। কিন্তু যা নয় তাই হল এখন। পুরো উঠে বসল ছেলেটা। শুধু বসাই নয়, মুখ হাঁ করে ধবধবে সাদা দাঁত দিয়ে ভয়ংকর একটা হাসি হেসে উঠল সে। সেই ভয়ার্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকারে।

খিল খিল। খিল খিল। খিল খিল।

সাতঘাটের জল খাওয়া নিবারণ হাজরার বুক গেল কেঁপে।

মিউজিক পার্টি সেতারের ওপর ছড় টানতে ভুলে গেল। হিরোইনের শুধু ভয় পাবার কথা। কিন্তু ভয়ের বদলে সে ঠক ঠক করে কেঁপে উঠল। বউ—ঝিদের কোলে যেসব বাচ্চাদের ঘুম আসব আসব হচ্ছিল তারা চিল্লে কান্না জুড়ে দিল। দর্শকরাও যেন হতবাক। হাসি শেষ করে ভূত শুয়ে পড়তেই ক্ল্যাপ—ক্ল্যাপ—ক্ল্যাপ। হাততালি যেন থামতেই চায় না।

যাত্রাপালায় একটা কথা আছে। শুরুটা যদি ঠিকঠাক উতরে যায় তাহলে সে পালা জমে যাবেই। নাম ছড়াবে লোকের মুখে মুখে। ভালো বায়না হবে। ম্যানেজার নিবারণ হাজরা ভাবলেন, ওই নতুন ছোকরাকে

খাওয়াপরা বাদে দু—হাজার টাকা মাইনে দেবেন।

কিন্তু তার আফশোস হল এমন জিনিস হাজার হাজার দর্শকদের দেখাতে পারলেন। তিনি এতদিন যে যাত্রাপালায় আছেন তা তো শুধু টাকা কামাবার জন্যে নয়। যাত্রা শেষ হলে দর্শকদের চোখ—মুখের আনন্দ উচ্ছ্বাসটিও তিনি দেখে আনন্দ পান। আজও তাই তিনি গেটে দাঁড়িয়েছিলেন। আর তখনই অঘটনটা ঘটল। দর্শকরা বাড়ি ফেরার বদলে তাকে ঘিরে হইচই লাগিয়ে দিল।

কী ব্যাপার?

না 'ভূত বাংলো' পালাটাই আর একবার শো করতে হবে।

নিবারণ হাজরা বললেন, তা কী করে হয়। সব ঠিক হয়ে আছে। পোস্টার পড়ে গেছে। কিছু টিকিটও বিক্রি হয়েছে 'মরণ কামড়'—এর।

রাখুন মশাই আপনার 'মরণ কামড়', ওসব আপনার আর চলবে না। আমরা 'ভূত বাংলো'—র জ্যান্ত ভূতই দেখতে চাই আবার।

রাত বারোটায় চারদিক সরগরম। 'ভূত বাংলো' নিয়ে আবদার। এমন অবস্থায় কোনোদিন পড়েননি নিবারণ হাজরা। ভবতারিণী নাট্যসমাজের ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম। এই রাতে এত লোকই বা কোথা থেকে। শেষমেস তারা কথা আদায় করে চেলে গেল।

৫

পরদিন ছমছমপুর সরগরম। ভূতের এখনও এত ডিমান্ড। ভূতের ভূমিকায় অভিনয় করা পাটালি দাসের কথাই হচ্ছিল। ছেলেটার ভেতরে এত এলেম ছিল জানতে পারেনি কেউ।

ম্যানেজার নিবারণ হাজরাও পাকা লোক। দর্শকের উত্তেজনা আগেই টের পেয়েছেন। সেটাকেই উসকে দিতে মাইক দিয়ে প্রচার শুরু হয়ে গেল পরদিন সকাল থেকেই।

'...দর্শকদের বিশেষ অনুরোধে ভবতারিণী নাট্যসমাজের 'ভূত বাংলো' পালাটি আজ রাতেও অভিনীত হইবে। দশ বছরের কম কোনো শিশু কিংবা হার্টের অসুখ আছে তেমন মানুষদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে...'

ব্যস আগুনে যেন ঘি পড়ল, টিকিট ছিল পাঁচ হাজার। বেলা বারোটার মধ্যে সব শেষ। ডেকরেটরকে বলে এক্সট্রা চট পাতানো হল। তাতে আরও হাজার দুয়েক দর্শক আঁটতে পারে।

সন্ধে ছ—টা বাজতে—না—বাজতেই হই হই কাণ্ড। পাল পাড়ার মাঠের যাত্রা উপলক্ষ্যে একটি তেলেভাজার দোকান টিমটিম করে চলছিল। সেটা বেড়ে হল চারটে। বাদাম ভাজার দোকান দুটো। একটা উনুনে কড়ায় তেল চেপেছে। তেলে পাঁপড় ছাড়তে যা দেরি। হু হু করে বিক্রি হচ্ছে পাঁপড়। ওদিকে কোথা থেকে খবর পেয়ে কে জানে দুটো ফুচকাওয়ালাও শো—কেস ভরতি ফুচকা নিয়ে হাজির। আটটায় শো শুরু হবে। তার আগেই প্রায় সব মাল শেষ।

বলতে বলতে ফার্স্ট বেল পড়ে গেল। কনসার্টও শুরু হয়ে গেল। ওদিকে গেটের পর্দা সরিয়ে দর্শক ঢুকছে তো ঢুকছেই। স্টেজম্যান একবার স্টেজ দেখে গেল। লাইটম্যান লাইট চেক করছে। পাশে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছেন নিবারণ হাজরা। নয় নয় করে পঁচিশ বছর পালা করছেন তিনি। একসঙ্গে এত দর্শক কোনোদিন দেখা যায়নি। এত ভিড় দেখে মাথাই ঘুরে গেছল তার। কখন সময় গড়িয়ে গেছে, থার্ড বেল পড়তে খেয়াল হল।

স্টেজ অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকা শুরু হয়ে গেছে। টেপে এবার শেয়ালের ডাকও শোনা যাবে। এখন চাপা গলায় নবনী অধিকারীর নাম ধরে ডাকতে গেল। কিন্তু কাজের সময় নামটাই মনে আসছে না। তাই বুঝি চাপা গলায় ডিরেক্টর বলল। ভূত কোথায় ভূত?

অন্ধকারে বোধ হয় পাশেই দাঁড়িয়েছিল পাটালি। সে একটু বিরক্ত না—হয়ে বলল, এই তো স্যার। আমি।

যাও যাও, স্টেজে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

সে বাঁশের মাচায় গিয়ে শুতেই ডিরেক্টর লাইটম্যানকে নির্দেশ দিল, ডিমার।

বলার সঙ্গে সঙ্গে আবছা আলোটা জ্বলে উঠল। ওই তো পাটালি দাস শুয়ে আছে। এখন দেখলে কে বলবে ও আসলে একটা মানুষ। এবার স্টেজে অ্যাপিয়ার করছে হিরো আর হিরোইন। সব বলা—কওয়া আছে। বলা না—থাকলেও সবই তো মুখস্থ থাকার কথা। ওই তো ঘাড় তুলে আধশোয়া হচ্ছে পাটালি। ভূত বাংলোর ভূত জেগে উঠছে বুঝি। চারপাশে কোনো শব্দ নেই। এত যে দর্শক কেউ টুঁ শব্দটি করছে না।

ঠিক তখনই খিল খিল খিল খিল শব্দে ভয়ংকর হাসিটা হেসে উঠল পাটালি। ভয়ে বুকের রক্ত জল হয়ে যাবার কথা। ভাগ্যিস জানা ছিল যে ওটা ভূত নয়, মানুষ।

নিবারণ হাজরা দেখলেন হিরোইন কালকের মতো আর চমকে ওঠেনি। শুধু ভয়টাই মুখে লেপটে যাচ্ছে। ওটাই তো দরকার। ওই ভয় নিয়েই পরের ডায়ালগ, 'আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে' কথাটা বলবে।

হিসেবমতো সব ঠিক ঠিক চলছে। ডায়ালগটা বলা শেষ হয়েছে কি হয়নি তখনই কে যেন অন্ধকার থেকে বলল, তেষ্টা পেয়েছে বুঝি?

কে বলল কথাটা? এটা তো ডায়ালগে ছিল না। আবছা আলোয় দেখা গেল শুয়ে পড়ার বদলে পাটালি দাস উবু হয়ে বসেছে। শুধু বসাই নয়, নতুন ডায়ালগটা তার মুখ থেকেই বেরিয়েছে বোঝা গেল।

তেষ্টা পেয়েছে বুঝি, বেশ বেশ। বলতে বলতে শূন্যে হাতটা তুলল পাটালি। আর কী আশ্চর্য, অন্ধকারে শূন্য থেকে তার হাতে চলে এল এক গেলাস জল। শুধু আনাই নয়, এবার হাতে ধরা জলের গ্লাসটি বাড়িয়ে দিল হিরোইনের দিকে।

এসব কী হচ্ছে? অভিনয় করার সময় কেউ ডায়ালগ ভুল বললে অন্য সহঅভিনেতা তা ম্যানেজ করে নেয়। কিন্তু এখানে তেমন কিছু করার কথা মনেই আসছে না। ওদিকে পাটালির হাতে ধরা এক গেলাস জল। তেষ্টা মেটাবার জন্য সেই জল হাত বাড়িয়ে নেবার কথা হিরোইনের। তো সে যখন এগিয়ে আসছে না। তখন তেষ্টার জল তার দিকেই এগিয়ে যাবার কথা। হলও তাই।

নাও ধরো। বলে হাত বাড়িয়ে ধরল পাটালি দাস। হাতটা তার বাড়ছে... আরও বাড়ছে... লম্বা হচ্ছে... বাড়তে বাড়তে সেটা এবার গিয়ে পৌঁছাল দশ হাত দূরে হিরোইনের মুখের সামনে।

এর পরেও আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়! ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে স্টেজের ওপর পড়ে গেল হিরোইন। তেমনটা দেখেই আবার সেই আগের হাসিটা হাসল পাটালি। আর তারপর কাজ শেষ হয়েছে দেখে সে শুয়ে পড়ল।

এমন কাণ্ডে হাততালি পড়বে সে তো জানা কথা। সে হাততালি যেন থামতেই চায় না। নিবারণ হাজরাও চোখের সামনে এসব দেখলেন। যাত্রাপালা নয়, যেন ম্যাজিক দেখলেন। দর্শকরা না—বুঝুক, তিনি তো বুঝবেন। কিন্তু তিনিও বুঝতে পারছেন না। অন্ধকারে জল ভরতি একটা গেলাস পাটালি দাসের হাতে এল কী করে? দু—ফুট মাপের একটা হাত বাড়তে বাড়তে দশ ফুট দূরে পৌঁছলোই বা কী করে?

কিন্তু এসব ভাবার তখন সময় কোথা? পালা জমিয়ে দিয়েছে পাটালি। এবার শুধু দেখে যাওয়া। রাত বারোটায় শেষ হল যখন তখন চারপাশে লোকে লোকারণ্য। গ্রামের মুরুব্বি বিশাল দত্ত স্টেজে উঠে ঘোষণা করলেন, হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেবেন পাটালি দাসকে। আহা ভূতের ভূমিকায় যা ফাটাফাটি অভিনয় করেছে ছেলেটা।

তখনই খোঁজ পড়ল পাটালির। খোঁজ খোঁজ। কোথায় গেল সে? সে কোথাও নেই। তার বদলে পাওয়া গেল পাটালির মাকে।

কোথায় তোমার পাটালি আদুরি?

সে তো আমিই জানতে এয়েচি আজ্ঞে। অবাক গলায় নিবারণ হাজরাকে বলল, সেই সে আপনার সঙ্গে বাড়ি ছাড়ল তারপর দু—দিন তো তার পাত্তাই নেই। লোকের মুখে খপর পেলুম ছেলেটা আজও নাকি ভূত সেজে পালায় নেবেছে।

দু—দিন ফেরেনি? ভারি অবাক হলেন নিবারণ হাজরা। ছেলেটা মাঝখানে বেপাত্তা হয়ে গেল কী করে?

এমন যখন ভাবছেন তখনই খোঁজ পাওয়া গেল। ডেকরেটরের লোকেরা চট খুলছিল। তারাই গ্রিনরুম থেকে চিৎকার করল, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে।

নিবারণ হাজরা গ্রিনরুমে ঢুকে দেখলেন, চটের থলে জড়িয়ে—মড়িয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে পাটালি। ওদিকে স্টেজ থেকে মাইকে ডাকা হচ্ছে পাটালি দাস। পাটালি দাস তুমি যেখানেই থাকো চলে এসো।

নিবারণ হাজরা গলা তুলে বললেন, অ্যাই ওঠ, ওঠ।

অমন ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল পাটালি। দু—হাতে ভালো করে চোখ ডোলে নিয়ে বলল, এবার বুঝি এসটেজে যেতে হবে?

সবাই যেন আকাশ থেকে পড়ল। স্টেজে যাবি মানে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। পাটালি লজ্জায় জিব কাটল। গায়ে রং টং মাখানো হতে আমি এখেনে বসলুম। বসার পর মনে হল একটু শুই। শুতেই তো ঘুম এসে বসল চোখে। সেই ঘুম ভাঙল এখন। আমার কি দেরি হয়ে গেল নাকি?

তার মানে? চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালেন নিবারণ হাজরা। তার মানে দুটো দিন তুই পড়ে পড়ে এখানে ঘুমিয়েছিস?

উত্তর দিল আদুরি। বলল, তাই—ই তাই। একবার ঘুমুলে দু—দিনের আগে ওর ঘুম ভাঙে না।

তাহলে ভূতের ভূমিকায় দু—দিন প্লে করল কে?

সবাই যখন এ ওর মুখ চাওয়া—চাওয়ি করছে তখন এগিয়ে এল পঞ্চায়েত সদস্য গুলু মাইতি। একগাল হাসি নিয়ে বলল, আপনারা আসল কথাটাই ভুলে গেলেন দেখছি।

আসল কথা?

আসল কথা হল, এ গাঁ—টার নাম ছমছমপুর।

ডবল রোল

উল্লাস মল্লিক

নাড়ু ওঝার সময়টা এখন বেশ যাচ্ছে। মানে, পসার একেবারে জমজমাট। রুগির ঠেলায় নাওয়া—খাওয়ার সময় নেই। হারু ওঝা মরে গিয়ে তর্ক চলছে। ক—দিন আগেও একরত্তি কদর ছিল না তার। যা কিছু নামডাক তখন ওই হারু ওঝার। ভূতে ধরা কেস মানেই হারু ওঝা। এমনও না কি হয়েছে, কল পেয়ে হারু দেখে রুগি ফিট। মানে, হারুকে কল দেওয়া হয়েছে শুনেই ভূত পগার পার। ভূতের ভয় পেলে লোকে তখন 'রাম—রাম' না বলে 'হারু—হারু' বলত। তাতে কাজও হত বেশি।

এই যখন অবস্থা, লোকে আসবে কেন নাড়ুর কাছে। আসতও না বড়ো একটা। শুধু যে কেসগুলো হারু রেফার করত, সেগুলো পেত নাড়ু। হারু হয়তো বলল 'আজ আর আমি পেরে উঠব না বাপু, দুটো ব্রহ্মদত্তি আর মামদোর কেস আছে; তোমরা যা বলছ লক্ষণ শুনে তো মনে হচ্ছে মেছো—পেতনি ধরেছে—সামান্য ব্যাপার—তোমরা বরং নাড়ুর কাছে যাও, গিয়ে বলো, আমি পাঠিয়েছি ওই যা করার করে দেবে।'

সে এক দিন গেছে নাড়ুর। না খেতে পেয়ে নিজেই মরে ভূত হবার অবস্থা। মাঝে মাঝে মনে হত, ওঝাগিরি ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রফেশনে চলে যাবে; দুটো খেয়ে—পরে বাঁচবে যা হোক।

ঠিক তখনই ভাগ্যের চাকাটা তার বাঁই করে ঘুরে গেল হঠাৎ। দেহ রাখলেন হারু ওঝা। মানুষজন বলা কওয়া করল, 'এবার ভূতেদের জ্বালায় না দেশান্তরি হতে হয়; বাঁচাবার মতো কেউ তো আর রইল না আমাদের; নাড়ু ওঝার কি আর ক্যালি আছে!'

একদিন হল কী, মিত্তিরদের বড়ো বউটাকে ধরল ভূতে। মিত্তিররা বড়োলোক মানুষ, তারা খরচ—খরচা করে ভিন গাঁ থেকে বাঘা—বাঘা ওঝা আনা করাল। কিন্তু হলে কী হবে—সবকটা ফেল। বউটার একেবারে যায় যায় দশা। শেষে কে একজন যুক্তি দিল, নাড়ুকে ডাকা করানো যাক একবার। হাজার হোক, ঘরের লোক; হারুর সঙ্গে একই গাঁয়ে এতদিনের বাস; বলা যায় না, দু—একটা বিদ্যে শিখেও থাকতে পারে; ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করলে ফেল করা ছেলেরও কিছু উন্নতি হয়।

ডাক পেলেন নাড়ু ওঝা। গিয়ে লক্ষণ দেখে বুঝলেন, আশ—শ্যাওড়া গাছের পেতনি ধরেছে। দাওয়াইটা জানা ছিল তাঁর। সরষে আর শুকনো লঙ্কা বেলকাঠে পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলেন খুব কষে। তারপর কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড থেকে কিছুটা আওড়াতেই পেতনি হাওয়া।

ব্যস; তারপর থেকে আর রুগির অভাব হয়নি নাড়ুর। সুনাম সুখ্যাতি একেবারে হইহই করে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

রাতে খাওয়া—দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করছিলেন নাড়ু। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে। শ্যামপুরে একটা কেস ছিল আজ। জটিল কেস। নচ্ছার একটা স্কন্ধকাটা ধরেছিল বাড়ির কর্তাকে। স্কন্ধকাটা ধরলে বেশ চিন্তার ব্যাপার। স্কন্ধকাটা ভূতের মুণ্ডু থাকে না বলে, নাক—কানের বালাই নেই। তাই লঙ্কা পোড়া বা সর্ষে পোড়ার গন্ধ দিয়ে লাভ হয় না। রামায়ণ পাঠ করলেও ফল মেলে না। কানই নেই তো শুনবে কোথা দিয়ে। এখানে চাই বিছুটি দাওয়াই। মড়ার খুলিতে মন্ত্রপূত গঙ্গাজল নিয়ে রামতুলসী গাছের পাতা দিয়ে ছেটাতেই কাজ হল। দক্ষিণা মিলেছে ভালোই। হুঁকো টানতে—টানতে নাড়ু ভাবছিলেন, এবার বাড়ির চারদিকে উঁচু পাঁচিল তুলতে হবে। চোরের উৎপাত বড়ো বাড়ছে। নাড়ু ওঝা ভূতের যম হলে কী হবে, চোর জব্দ করার মন্ত্র তাঁর জানা নেই।

হঠাৎ জানলার কাছে একটু খুটখাট শব্দ হল যে। নাড়ু সচকিত হলে। চোর—টোর মনে হচ্ছে। কিন্তু তারপরেই গন্ধটা পেলেন। সেই চেনা গন্ধ। মনে একটু সন্দেহ তাঁর। এখানে তো গন্ধ পাবার কথা নয়। ভালো করে একবার নাকটা টানলেন তিনি। হ্যাঁ, নির্ঘাত মনে হচ্ছে। তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা ভুল হবার নয়। হাতের হুঁকোটা রেখে উঠে দাঁড়ালেন নাড়ু। তিনি হলেন গিয়ে ভূতের জল্লাদ, আর তাঁর ঘরেই কি না ভূত! ব্যাটাকে ধরে কষে শিক্ষা দিতে হবে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ব্যাগ থেকে করোটি মালাটা বের করতে গেলেন। কিন্তু আগেই অন্ধকার কোণ থেকে খুব মৃদু গলায় কে যেন বলে উঠল, 'থাক, থাক, শোনো কথা আছে।'

নাড়ু হুঙ্কার দিলেন, 'কে তুই?'

'আরে আমি গো....।'

'আমিটা কে?'

'আমি যে হারু ওঝা, গন্ধ শুঁকে তো তোমার বোঝা উচিত ছিল, কিছু মনে কোরো না বাপু, তোমার শিক্ষেদিক্ষের এখনও কিছু খামতি আছে...ভূতের শুধু গন্ধ পেলেই হবে না, কে ভূত তাও ধরে ফেলতে হবে। তুমি বাপু ভূতেশ নন্দীর লেখা 'গুহ্যক শাস্ত্রের' ৭ম খণ্ডটা একবার ঝালিয়ে নিয়ো, সব দেওয়া আছে ওখানে।'

মনে মনে একটু লজ্জা পান নাড়ু। বলেন, 'আসলে অনেকদিন আগে পড়া তো...সব ঠিকঠাক স্মরণে নেই। তা, আপনি হঠাৎ করে আমার কাছে...?'

'খুব দরকার ছিল বাপু।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না।' একটু ব্যস্ত গলায় নাড়ু বলে ওঠেন, 'কী করতে হবে আপনার জন্যে?'

'এখানে আমি বড়ো অশান্তিতে আছি গো।'

'কেন কেন; অশান্তি কেন!'

'মনুষ্য জন্মের কর্মফল।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারু বলে, 'তুমি তো ভালোই জানো, মানুষ থাকতে বিস্তর ভূতকে জব্দ করেছি আমি, এই গোটা তল্লাটে একেবারে ভূতের মহামারি লাগিয়ে দিয়েছিলুম, এখন সেই রাগে সব ব্যাটা আমার ওপর শোধ তুলছে, একেবারে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না আমায়...।'

খুব অবাক হয়ে নাড়ু বলেন, 'সে আবার কেমন কথা।'

'তবে আর বলছি কী।' হারু বলে, 'ঘুরতে ফিরতে অত্যেচার। কেউ হয়তো খুলিতে খটাং করে একটা গাঁট্টা মেরে গেল, কেউ হয়তো হাঁটু থেকে একটা ঠ্যাঙ খুলে নিয়ে দিল ছুট, এই তো দ্যাখো না, আজ সন্ধেবেলা, তালগাছে বসে একা—একা হাওয়া খাচ্ছিলুম, অমনি একদল চ্যাংড়া ভূত পেছন থেকে আমার মুণ্ডুটা হ্যাঁচকা টানে খুলে নিয়ে ফুটবল খেলতে লাগল। দ্যাখো, খুলিতে ক—জায়গায় চিড় খেয়ে গেছে...দ্যাখো, দ্যাখো, হাত বুলিয়ে দ্যাখো...।'

নাড়ু বলেন, 'থাক, থাক, বুঝতে পেরেছি।'

'ছোকরাগুলোর বাপ—মার কাছে নালিশ করলুম, কোনো লাভ হল না; বরং হিহি করে হাসতে লাগল; বুঝলুম তাদের আশকারাতেই করছে এসব...। এখন তুমি বাপু আমাকে একটু আশ্রয় দাও...।'

'আমি!' খুব অবাক গলায় বলেন নাড়ু।

'হ্যাঁ; তোমার এখন বেশ নামডাক; তোমার নামে আমাদের ওখানে বেশ ভয়ও পায় সবাই; তোমার কাছে থাকলে কেউ আর জ্বালাতনের সাহস পাবে না। এই দ্যাখো না, আসছি যখন, একদল ফেউয়ের মতো পেছনে লেগেছিল; কিন্তু যেই তোমার বাড়ির দিকে এলুম। অমনি সবার সেকী দৌড়...। আমি বাপু তোমার এখানেই থাকব, তুমি না কোরো না, তোমার কাজকম্মও করে দেব'খন।'

নাড়ু বলেন, 'কাজকম্মটা কথা নয়; আপনি হলেন গিয়ে গুরুদেব মানুষ, মানে, ইয়ে আর কী গুরুদেব ভূত আপনি থাকবেন—এ তো ভাগ্যের কথা, থাকুন যতদিন খুশি।'

হারু বলে, 'আশীর্বাদ করি বাবা, অনেক বড়ো হও, আমাকেও ছাপিয়ে যাও; তোমার নামের আমার জাতভাইয়ের যেন দাঁতকপাটি যায়।'

অভাবের দরুন বয়েসকালে সংসার—ধর্ম করা হয়নি নাড়ুর। যখন সুদিন ফিরেছে, তখন বয়েস গড়িয়ে গেছে অনেকটা। তাই বিয়ে—শাদির চিন্তা আর মাথায় আনেননি। একাই থাকেন। তা একা একলা মানুষের সংসার যেমন হয়, তাঁরটাও তেমন। একটু ছিরি—ছাঁদের অভাব। বাড়ির চারপাশে আগাছার জঙ্গল, ঘরের মেঝেতে একপুরু ধুলো, বিছানা লণ্ডভণ্ড, মশারি হয়তো টাঙানোই আছে সারাদিন। কয়েকদিন পর দেখা গেল, বাড়ির শ্রী ফিরছে যেন। আগাছা সাফ, টানটান বিছানা, তকতক করছে ঘরের মেঝে, সিলিং—এ এতটুকু ঝুলময়লা নেই।

আরও অবাক—অবাক কাণ্ড ঘটল তারপর। নাড়ু জাবদাপাতায় দত্তদের বাড়ি গেছেন কলে। গিয়ে দেখেন, ব্যাগটাই আনা হয়নি। অথচ ব্যাগেই আছে ভূত তাড়ানোর সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, জড়িবুটি। কী হবে এখন? আবার তাহলে বাড়ি যেতে হয় নাড়ুকে। সে তো অনেকটা পথ। এদিকে দত্তদের ছোটোমেয়ে, যাকে ভূতে ধরেছে, তার খুব করুণ দশা। কী যেন একটু চিন্তা করলেন নাড়ু। তারপর একা একা দত্তবাড়ির ছাদে উঠে গেলেন। নেমে এলেন একটু পরেই; হাতে সেই ব্যাগ।

আর একদিন টগরপুরে চাটুজ্জেদের বাড়ি যাচ্ছেন কলে। পথে মস্ত কালা—নদী। বর্ষার দিন, টইটম্বুর জল। একমাত্র বাঁশের সাঁকোটা ভেঙে গেছে আগের দিন রাতে। হঠাৎ দেখা গেল, নাড়ু হাজির। জামাকাপড় একেবারে খটখটে শুকনো। সবার প্রশ্ন, 'কী করে এলেন ওঝা মশাই, আমরা তো আপনার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলুম...।'

কিছু বললেন না... নাড়ু। মুচকি হাসলেন শুধু।

এসব কাহিনি যত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তত নামযশ বাড়লে নাড়ু ওঝার। কিন্তু দিনে দিনে তাঁরও বয়েস হল। এখন কলে যাবার মতো শরীরে তাকত নেই। রুগি মাফ চেয়ে ফিরিয়ে দেন।

একদিন হঠাৎ হারু ওঝার ভূত বলল, 'এটা কি ঠিক কাজ হচ্ছে?'

নাড়ু অবাক হয়ে বললেন, 'কীসের কী কাজ?'

'এই যে, লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিচ্ছ; ভূতে ধরা মানুষ হল গিয়ে তোমার লক্ষ্মী।'

নাড়ু বলেন, 'তা শরীরে আর না কুলোলে কী করি বলুন...?'

'যদি কিছু মনে না করো, তো একটা কথা বলি।'

'বলুন, বলুন, কী কথা।'

'বলি কী, ভূত তাড়ানোর প্যাঁচ—পয়জার সবই তো আমার জানা; মন্ত্রতন্ত্রও দিব্যি স্মরণে আছে এখনও। তাই বলি কী, তোমার চেহারা ধারণ করে কাজটা তো আমিই করে দিতে পারি। তোমার দুটো পয়সা হয়, আর পাঁচটা লোকের উপকারও হয়।'

একটু ভেবে নাড়ু বলেন, 'তা বলছেন যখন, আর আপত্তি করি কেন!'

তারপর থেকে দেখা গেল, নাড়ু ওঝা কাউকে ফেরাচ্ছেন না। ডাক দিলেই হাজির কিছুক্ষণের মধ্যে। আর বুড়ো বয়েসে কাজকর্মের ওস্তাদি যেন আরও বেড়েছে। মানুষটা ঝড়ের গতিতে হাজির হয়, চোখের পলকে কাজ সাঙ্গ করে ফেলে। কেমন যেন পলকা—পলকা ছায়া—ছায়া ভাব শরীরে।

লোকে বলাবলি করে, 'ভূত ঘেঁটে—ঘেঁটে মানুষটাও যেন ভূত হয়ে গেছে।' বলে আর কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম ঠুকে নেয় একটা।

সেই ছবি

সিজার বাগচী

বাজ পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় অর্কর। অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এবার জোরে—জোরে বাজ পড়ছে।

ঘুম ভাঙার পর অন্ধকারে চোখ মেলে দু—এক মুহূর্ত অর্ক বুঝতে পারে না ও কোথায় শুয়ে। তারপর ওর খেয়াল হল, দিনদুয়েক আগে বাবার অফিস কোয়ার্টার ছেড়ে ওরা নতুন বাড়িতে উঠে এসেছে। এই বাড়িতে এসে অর্ক আলাদা ঘর পেয়েছে। কোয়ার্টারে দাদা আর ও একটাই ঘর ভাগাভাগি করে থাকত। যেহেতু তিন বছরের বড়ো, তাই ঘর সাজানোর ব্যাপারে ও খবরদারি করত। নিজের ইচ্ছেমতো দেওয়ালে পোস্টার সাঁটত। সাউন্ড সিস্টেমে নিজের পছন্দের গান বাজাত। সারা ঘর নিজের জামাকাপড়, বইখাতা ছড়িয়ে রাখত। অর্ক একেবারে পাত্তা পেত না।

নতুন বাড়িতে অর্কর বড়ো ঘর হয়েছে। ঘরের পাশেই বাগান। জানলা খুললেই বাগানের পেয়ারা গাছ, নারকেল গাছ দেখা যায়। দিনের বেলা প্রচুর পাখি আসে বাগানে। এখানে আসার আগে এত পাখি দেখেনি অর্ক। সেই পাখিদের কিচিরমিচিরে ওর ঘরটাও যেন ঝলমল করতে থাকে।

কিন্তু এখন এই রাতে এতবড়ো ঘরে একা জেগে উঠে অল্প—অল্প ভয়ই করে অর্কর। ছেলেবেলা থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ও কোনোদিন একা ঘরে থাকেনি। এই প্রথম। অর্কর খুব ইচ্ছে করছিল, ছুটে বাবা—মায়ের ঘরে চলে যায়। পাছে কাল সকালে দাদা এই নিয়ে হাসাহাসি করে, তাই নিজের ভয়কেই সামলানোর চেষ্টা করে ও।

ধীরে ধীরে অর্ক বিছানায় উঠে বসে। কাচের জানালায় মাঝে মাঝেই আলো এসে পড়ছে। তারপর গুমগুম করে বাজ পড়ার আওয়াজ। অর্ক একবার জানলা দিয়ে তাকায়। আর তখনই ওর চোখ পড়ে জানলার পাশে টাঙানো বড়ো ছবিটায়। নতুন বাড়ি কেনার পরই এ ঘরে ঢুকে ওরা ছবিটা দেখেছিল। বাড়ির আগের মালিক নিজের সব জিনিসপত্র নিয়ে গেলেও, ছবিটা নেয়নি। ছবিটা এই ঘরেরই দৃশ্য। অর্ক যেরকম খাটে শুয়েছে, প্রায় ওইরকম খাট রয়েছে ছবিতে। তবে অর্কর জামাকাপড়ের আলমারি, লেখাপড়ার টেবিল অবশ্য ছবিতে নেই। ছবিতে খাট ছাড়া আছে একটা ছেলে। কিন্তু ছেলেটির চেহারা এমনভাবে আঁকা যে, মুখ দেখা যাচ্ছে না।

ঘর গোছানোর সময় মা জানতে চেয়েছিলেন, 'এই ছবি নিয়ে কী করব?'

বাবা আলগোছে একবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'থাক না। কেউ এঁকেছে—টেকেছে। খারাপ কী?'

অর্কও ছবিটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। অথচ এখন ছবিটার দিকে তাকিয়ে ওর মাথার ভিতরেও বিদ্যুৎ চমকাল। ছবিটা আর নিছক ছবি নেই। ওটা যেন এই ঘরেরই মতো একটা ঘর। আর সেই ঘর থেকে ছেলেটি ওর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

অর্ক বিছানা আঁকড়ে ধরে। একটা শিরশিরে অনুভূতি কেন্নোর মতো ওর সারা শরীরে হেঁটে বেড়ায়।

ছেলেটি এবার বলে, 'আরে ভয় পেয়ে গেলে যে! আমি তো তোমায় ডাকতে এসেছি।'

'ডা—ডাকতে?' অর্ক কোনোমতে বলে।

'হুম। আমার এই ঘরে।'

অর্ক ভয়ে—ভয়ে বলে, 'ওটা তোমার ঘর মানে? ওটা তো ছবি!'

'তোমার কাছে ছবি। আমার কাছে ঘর। এই যেমন ধর আয়না। তুমি তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াও। কিন্তু জান কি যেটা প্রতিবিম্ব ভাবছ, তা আসলে অন্য এক জগৎ?'

'জগৎ?' অর্ক থতমত খেয়ে বলে।

'হ্যাঁ। এক—এক বিশেষ দিনে সেই জগতের দরজা খোলে। এই যেমন আজ আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি। কাল সকাল হলে কি আর তা সম্ভব হবে? তখন তো আবার আমি ছবি হয়ে যাব। তুমি আসবে আমার ঘরে?'

অর্ক ফ্যালফ্যাল করে ছেলেটির দিকে তাকায়। এমন অদ্ভুত কাণ্ড ও কখনো দেখেনি। এটা কি স্বপ্ন? কিন্তু ছেলেটার জ্বলজ্বলে চাউনি, হাসি, সবই ওর সামনে ঘটছে। বাইরের ঝড়—বৃষ্টির শব্দও দিব্যি শুনতে পাচ্ছে ও।

বাবা—মাকে ডাকার কথা অর্কর মাথায় এল। সেই সঙ্গে দাদার মুখও মনে পড়ল। অর্ক ঠিক করল, আগে ও নিজে ব্যাপারটা বুঝবে। এরপর দরকার হলে বাবা—মাকে ডাকবে। সেইমতো ও বিছানা ছেড়ে নামল। এমন সময় কাছেই কোথাও জোরে বাজ পড়ল। সেই আওয়াজে কাঁপুনি লাগে অর্কর মনে। ও একবার জানলার দিকে দেখে আর একবার ছবিটার দিকে। ছেলেটি হাসতে হাসতে ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। সেই ডাকে এমন কিছু ছিল যে, অর্ক তা এড়াতে পারে না।

অর্ক পায়ে—পায়ে এগিয়ে যায় ছবিটার কাছে। ছেলেটি ছবির ভিতর থেকে হাত বের করে। বলে, 'এসো।'

অর্ক ছবির ফ্রেমে এক পা দিয়ে ছেলেটির হাত ধরে। আর তারপরই ও আবার চমকায়। ছেলেটির হাত কনকনে ঠান্ডা। তবে অর্ক হাত ধরতেই ছেলেটি এক টানে ওকে ছবির ভিতর ঢুকিয়ে নেয়।

ছবির ভিতর পা দিয়ে অর্কর ভারি শীত—শীত করতে লাগল। জায়গাটা খুব ঠান্ডা। আর এক আশ্চর্য রকমের নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে এখানে। ঘরের দেওয়াল, আসবাব সব যেন ভাসছে। ছেলেটির মুখের দিকে অর্ক ভালোভাবে তাকায়। এবার ছেলেটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফরসা, কোঁকড়ানো চুল। ছেলেটি বোধ হয় ওরই বয়সি। শুধু ছেলেটির চোখ আর হাসিটা ভারি ছমছমে।

অর্ক জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কী?'

'আমার নাম?' ছেলেটি হি হি করে হাসে। বলে, 'আমার নাম ছবি।'

'তুমি ছবিতে কতদিন আছ?'

'তা প্রায় সাত—আট বছর।'

অর্ক জানতে চায়, 'তার আগে?'

'এই বাড়িতে থাকতাম। তুমি শোনোনি, এই বাড়িতে আগে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের ছেলেটি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা থানা—পুলিশ করেছিলেন, সব জায়গায় তন্ন—তন্ন করে খুঁজেছিলেন, শুধু ছবিটা দেখেননি।'

'তুমি—তুমি ছবিতে ঢুকে পড়েছিলে?' অর্ক প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

ছেলেটি মাথা নাড়ে। বলে, 'হ্যাঁ। এই যেভাবে তুমি ঢুকে পড়লে।'

অর্ককে পরদিন সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওর বাবা—মা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেওয়া থেকে পুলিশে রিপোর্ট করা, সবই করেছেন। কিন্তু অর্কর হদিশ মেলেনি। তবে দাদার একবার সন্দেহ হয়েছিল ছবিটা নিয়ে। ছবিটা দেখিয়ে ও একবার বাবাকে বলেছিল, 'আচ্ছা, আমরা যখন এলাম তখন এই ছবিতে একটা ছেলে ছিল না? এখন দেখছি দুটো...'

বাবা কোনো জবাব দেওয়ার আগে মা ধমকে ওঠেন, 'বোকার মতো কথা বলিস না।'

তবু দাদার সন্দেহ যায় না। ছবির সামনে ও দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দুটো ছেলের কোনোটারই মুখ দেখার উপায় নেই। তবু একটা ছেলেকে পিছন থেকে অর্কর মতো লাগে।

দাদা নিজের ঘর বদল করে অর্কর ঘরে আসে। ছবিটার উপর নজর রাখা দরকার...।

দিনেমার বাংলোর নর্তকী

সসীমকুমার বাঁড়ে

নিশানঘাটে দিনেমার বাংলো বাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকে একা নিস্তব্ধ—নিঝুম। পাইক পেয়াদা গোমস্তার হাঁকডাক নেই। কর্মব্যস্ততা নেই। থাকার কথাও নয়। যুগটাই যে নেই। বাড়িটার বিবর্ণ খোলসের মধ্যে গুটিকয় কর্মচারী কাজটুকু সেরেই আক্রান্ত হয়ে যায় বুঁদ নেশায়। বসে বসে ঝিমোয় আর জাবর কাটে, না দেখা সময়ের। বাংলোটা হঠাৎ জেগে উঠল সেদিন বিকালে। লালবাতির বিদেশি মডেলের গাড়ি থেকে নেমে এলেন নতুন মহকুমা শাসক মিস অলকানন্দা। তেইশ—চব্বিশ বছরের মহিলা এসডিও—কে দেখে সাময়িক জড়তা কাটিয়ে হাউস—গার্ড স্বপন হাঁকডাক শুরু করল—গোপালদা, দিলীপ শিগগির এসো, ম্যাডাম এসে গেছেন। মালপত্র নামাতে হবে। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী বিপুল এল, অন্য হাউজ—গার্ড গোপাল এল। আপ্তসহায়ক 'গুড ইভনিং ম্যাডাম', বলে ঘরে ঢুকে গেল। বিপুল তর্জনী তুলে নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে গেল—ব্রিফকেসটা নাও, স্বপনদা। আহা, আহা, মাসিমাকে ধর। দেখ, মাসিমার যেন সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট না হয়। গোপাল গাড়ি বারান্দা থেকে ওঠার রাস্তা প্রায় আগলে দাঁড়িয়ে রইল। স্থির নিশ্চল দেহে পলকহীন চোখ। গা ঘেঁষে যেতে গিয়ে অলকানন্দার মনে হল একটা রক্তশূন্য মানুষের হিম বাতাস লাগল তার গায়ে।

বাংলোটা উত্তরমুখো। পশ্চিমে সিঁড়ি। সামনে হাঁটছে অলকানন্দা। মাঝে বিধবা মা, পিছনে লাগেজ হাতে স্বপন। সিঁড়িটা দেখেই মন ভরে গেল অলকানন্দার। পুরোনো কাঠের সিঁড়িতে লাল কার্পেট পাতা। আলোটা সব জায়গায় সমানভাবে পড়েনি। খানিকটা আলো—আঁধারি। সিঁড়িতে পা দিতেই তার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল। মনে হল কে যেন পা—টা দুলিয়ে দিল। প্রতিটা সিঁড়ির ধাপ যেন এক—একটা কাঠের মঞ্চ। পায়ের মধ্যে নাচের তাল। পা যেন কয়েক পা না নেচে থাকতে পারছে না আর। ভুল হচ্ছে না তো। পিছনে মা একটু কুঁজো হয়ে হাঁটলেও দিব্যি উঠছে। সদ্য একটা মহকুমার দায়িত্বভার নেওয়ার ভারে কি ভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছে? সে চেপে গেল ব্যাপারটা।

—ওয়া! দেখ মা, কী সুন্দর বারান্দাটা। অলকানন্দা সিঁড়ি থেকে মায়ের হাত ধরে প্রায় ছুটতে যায়।

—দাঁড়া দাঁড়া, আমার হাঁটুতে হাঁটুতে খিল ধরে গেল। বাব্বা, তিনতলার সমান দোতলা। এতগুলো সিঁড়ি এই কোমর নিয়ে, দম বেরিয়ে গেল। অলকার মা বারান্দায় পাতা সোফায় বসে হাঁপাতে লাগল। অলকা দু—দিকে জোড়া গোল স্তম্ভের মাঝখানে কাঠের রেলিং ধরে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। সামনে লন, লনের ফুলের বাগান অবিন্যস্ত। পাঁচিলের ওপাশে রাস্তায় অনিয়মিত যান চলাচল। নদীর ওপারে ব্যারাকপুরে জ্বলে উঠেছে তীর বরাবর একসার নিয়নের আলো। কড়িবর্গার দালান বাড়িটার বারান্দায় টালির ছাউনির নীচে দাঁড়িয়ে অলকার মনে বিষণ্ণবোধ এল। সামান্য মাইনের চাকরিতে বাবার জীবন কেটেছে উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি ভাড়াবাড়িতে। আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত, তাকে বলত অলকা—দেখ বাবা, তোমার নন্দার বাংলোটা কেমন প্রাসাদের মতো। পিছনে ঘুরে মা—র দিকে তাকাল সে। মা—কেও কেমন আনমনা মনে হল। মা—ও কি বাবার কথা ভাবছে? কিন্তু মাকে কী করে বোঝাবে সে, বাবার আয়ু বড়োই ছোটো ছিল। তার দারিদ্র্য ছিল সম্রাটের মতো, জীবনের সীমা ছিল প্রগাঢ় মতো। বারান্দার আলোটা জোরালো নয়। সোফায় আধশোয়া মাকে তার মনে হল বৃদ্ধা শ্বেতপরির মতো। সাদা চুল, সাদা শাড়িতে মায়ের ঝুলে পড়া ফরসা মুখে আশ্চর্য সুন্দর একটা রূপ এসেছে। মা—র মুখ দেখতে দেখতে অলকার খেয়াল হল গ্যালারির মতো নদীমুখ করে পাতা সোফা, চেয়ার, ইজিচেয়ার মিলিয়ে মোট ছয়টা। ছয় ভাবতেই কল্পনার একটা স্রোত বয়ে গেল—ছয়

ছয় ছয়। অমঙ্গল? বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল—কারা বসে এতগুলো যুগ সাক্ষী পুরোনো চেয়ার—টেবিলে এই শূন্য বারান্দায়?

রবিবার সকালে স্বপন দোতলায় উঠে দরজা থেকে ডেকে বলল—ম্যাডাম, তিন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

অলকানন্দা বারান্দায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—কোথা থেকে এসেছেন, বলেছেন কিছু? স্বপন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল—ক্ষেত্রমোহন কৃষি...কৃষি...। কী যে বলল পুরো কথাটা ঠিক মনে পড়ছে না, ম্যাডাম।

—ঠিক আছে, ওঁদের বসতে বল। আমি যাচ্ছি।

একতলায় বাংলো চেম্বারে তিনজন প্রবীণ নাগরিক এসডিও সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছিল। অলকানন্দা চেম্বারে ঢুকতেই তিনজন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। তিনজনেরই মাথার চুল কদমফুল। তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নিজের পরিচয় দিয়ে অন্যদের পরিচয় করিয়ে দিল। সে বলল—ম্যাডাম, আমরা ক্ষেত্রমোহন শা মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে এসেছি। আমরা শুধু পূজা—আর্চাই করি না, কৃষি উন্নয়নেও ক্ষেত্রমোহন শা—র ব্যাপক অবদান ছিল। সেই ট্রাডিশন এখনও চলছে। কিন্তু আমরা এসেছি একেবারে অন্য একটা বিষয় নিয়ে। আপনি এই মহকুমার প্রথম মহিলা শাসক। আমাদের সংগঠনের প্রথম সভায় শ্রীরামপুরের প্রথম মহকুমা শাসক মি. জে. উয়িন্ডোর গিয়েছিলেন। আপনি আর একটা ইতিহাসের অংশীদার হলেন। একে স্মরণীয় করতে আমরা আপনাকে সংবর্ধনা দিতে চাই। এত বছরে মহকুমা প্রশাসনে আপনার আগমন একটা বিরল ঘটনা।

অলকানন্দার রিভলভিং চেয়ার বিপরীত দিকে ঘুরে গেল। এতদিন খুঁটিয়ে পড়া হয়নি এসডিও—দের নামের তালিকাটা। সত্যিই তো প্রথম মহকুমা শাসক মি. জে. উয়িন্ডোর। আইসিএস ১৮৯৭। লম্বা লাইনের তালিকা। একদমে পড়ে ফেলল তার সামনে থাকা দেশি—বিদেশি সাহেব—সুবোদের নাম, সাল, তারিখ। সব শেষে সদ্য লেখা অলকানন্দার নাম। তার নামের আগে একটা মিস লেগেছে। প্রথম মহিলা এসডিও। এ যেন হোয়াইট হাউসে প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রবেশের মতোই বিরল ঘটনা। এক লম্ফে ইতিহাসের চরিত্র হয়ে যাওয়া ভাবতেই চোখের সামনে ভিড় করল শ্রীরামপুরের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ। কে সোয়েটম্যান, কে ওলি বি, কে যে পঞ্চানন কর্মকার। টাক মাথার ভদ্রলোককে উইলিয়াম কেরি হিসাবে চিনতে একটুও অসুবিধা হল না। শ্রীরামপুরের অলিতে—গলিতে যেন বাংলা মুদ্রণ যন্ত্রের শব্দ—টরে টক, টরে টক ধ্বনিতে—প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এত খাটো করে ধুতি পরা বাবুদের মধ্যে কে যে পঞ্চানন কর্মকার? বাঙালির আত্মবিস্মৃতি তাকেও গ্রাস করে নিল। শুধু জেগে আছে কেরি আর মিশনারি—ত্রয়ীর জীর্ণ ধূসর কবর।

পুবদিকের কাঠের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে জারিত হচ্ছিল অলকানন্দা। পায়ের নীচে যুগের ঘষায় ক্ষয়ে যাওয়া কাঠ। সামনে বিশাল বাংলো বাগানের জংলি পোকাদের চির চির, ক্রির ক্রির বিচিত্র সুরে অভিসার গান। পাঁচিলের ওপাশে চেসার্স হোমের প্রতিবন্ধী অনাথজনেরা সিস্টার লিন্ডার আদরে ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। গা—লাগা পাশের বাড়িটা ম্যাকডাওয়েল কোম্পানির। নেশা কারবারিরা রাত জেগে বাতাসে ভাসিয়ে নিচ্ছে বোতলে রঙিন পানীয় ভরার শব্দ। টুং টাং। অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বুঁদ হয়ে যাচ্ছে অলকানন্দা। ইতিহাস নেশা। কোনো ডেনিস গভর্নর বানিয়েছিল নিশানঘাটের বাণিজ্য কুঠি। গথিক স্থাপত্যের বাড়িটায় লাল মেঝের উপর পা রাখলেই মনে হয় মুছে যাবে পদচিহ্ন। মৃত কত কত লোকের হেঁটে যাওয়া পায়ের ছাপ। কখনো কি তাদের আত্মা ফিরে আসে স্মৃতি ঝালিয়ে নিতে? বেডরুমে মা একা শুয়েছিল। সে সেখান থেকে ডাকে—নন্দা। অলংকার সাড়া দিতে ইচ্ছা হয় না। মা কালের গানের মতো ডেকে চলে—নন্দা। নন্দা। নন্দা... ঘরে আসতে গিয়ে অলকানন্দার মনে হল কে যেন পা দুটো নাচিয়ে দিল—তা তা থৈ থৈ। কেন যে এমন অনুভূতি হয়।

অলকার চোখে ঘুমে নেই। মাথার মধ্যে ফেড্রিকনগরের পতনের ছবিটা কিছুতেই সরছে না। ১৮৪৫ সাল। দিনেমার বণিকরা ইংরেজ বণিকদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে দেশে। আর ভেঙে পড়ছে সব বাড়িঘর। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শ্রীরামপুরের হাঁসফাস। অলকা পাশ ফিরে শোয়। মা ঘুমোচ্ছে। ডিম লাইটে সাদা চুল আর সাদা শাড়িতে মাকে কেমন শুইয়ে থাকা মূর্তি মনে হল তার। মা, তার একমাত্র প্রিয়জন, তাকে কিনা পাথরের মূর্তি মনে হল? মন জুড়ে বসল দুঃখ—জড়তা। ইচ্ছা হল মাকে ঝাঁকিয়ে দিতে—না মা, তুমি কিছুতেই মূর্তি বা পরি হতে পার না। তখন তার কান খাড়া হয়ে গেল। নিস্তব্ধ বাংলোয় রাতদুপুরে জল পড়ার শব্দ। খানিকটা সময় বাদে বাদে শব্দটা। ছ্যার ছ্যার। ভেসে আসছে শব্দ। দূরে না কাছে বোঝা গেল না। আকাশে তো মেঘ ছিল না। খইয়ের মতো তারা বিছানো আকাশ দেখেছে সে একটু আগে। তবে কি ট্রাঙ্ক উপচে পড়া জল? বিছানা থেকে নেমে অলকা কলিং বেল টিপল। দরজা খুলে বারান্দায় আসতেই চমকে উঠল সে। হাউসগার্ড গোপাল দাঁড়িয়ে—স্থির নিশ্চল। আবছা আলোতেও বোঝা গেল গোপালের রক্তশূন্য শীতল চোখে পলক নেই। অলকার মাথায় এল না এত তাড়াতাড়ি দোতলায় এল কী করে সে। মায় পায়ের শব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অলকা বলল—এত রাতে পাম্প চলছে কেন? জল পড়ে যাচ্ছে। শিগগির বন্ধ কর। গোপাল কোনো কথা বলল না। নিঃশব্দে ডুবে গেল সিঁড়ির অন্ধকারে। ছয়—ছয়টা শূন্য চেয়ার—সোফার মধ্যে অলকার নিজেকে বড়ো একা মনে হল। ইজিচেয়ারটায় কোনো অদৃশ্য মানুষ বসে নেই তো? স্পষ্ট যেন একটা নিশ্বাস লাগল তার ঘাড়ে। অলকানন্দার গা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সে তড়িৎগতিতে দরজা বন্ধ করে মায়ের পাশে শুয়ে পড়ল। অলকা ছোটোবেলা থেকে অনুভব করেছে মশারির মধ্যে ঢুকলে একটা বাড়তি নিরাপত্তা বোধ জন্মায়। আজও ব্যতিক্রম হল না। কিন্তু ঘুম এল না চোখে। রোজকার মতো শ্মশানযাত্রীদের একটা গাড়ি চলে গেল পিছনের রাস্তা দিয়ে। এই এক সমস্যা, যাদের বাড়ি শ্মশান পথের পাশে তারা প্রতি রাতে একাধিকবার ঢুকে যায় মৃত্যুর আবর্ত ছায়ায়। অলকা হিসাব করে দেখেছে পিছনের রাস্তা দিয়ে প্রতি রাতে গড়ে প্রায় তিনটে করে বডি যায়। বাংলোর বাগানে স্থির হয়ে ঝুলে থাকে কান্না—ভেজা বাতাস অনেকক্ষণ। আজকাল হরি বোলের রকমফের শুনেই অলকা বুঝতে পারে কোন মৃত্যুতে খুশি হয়েছে পরিজনেরা। আর কোন মৃত্যুতে ভেঙেছে বেবাক হৃদয়। এখনও তার কানের গভীরে গেঁথে আছে—হরিবোল, হরিবোল। হরিবোল, হরি—বো—ও—ল—ল। অসহায় আত্মসমর্পণের কান্না গ্রাস করে ফেলল দিনেমার বাংলোর পাঁজর।

ফুরফুরে আকাশ। গঙ্গার উপর ঝুলে রয়েছে নীল পেঁজা পেঁজা ঘন মেঘ। অলকানন্দার মধ্যে একটা মুগ্ধভাব। যা ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় কী একটা সেলাই করছিল। মাকে জড়িয়ে ধরে বলল—রাখো তো ওসব। সারাজীবন কি সেলাই করেই কাটাবে? দেখো মা আকাশে কেমন মন জুড়ানো মেঘ।

—হ্যাঁ, আপিসে অমন গম্ভীর গম্ভীর মুখ করে থাকিস কি করে?

—থাকতে হয় মা, থাকতে হয়, নইলে কেউ মানবে না। এমনিতে সবাই বলে বাচ্চা মেয়ে। আমার রাগ হয়। সামনে অবশ্য বলার সাহস পায় না।

মা ফিক করে হেসে বলল। বলল—ওরা বোধহয় ঠিকই বলে, নইলে ফেলে আসা জীবন কেউ ভুলতে চায়! তোর ফ্রক সেলাই করতে করতে তোকে বড়ো করেছি। এখনও রানসেলাই দিতে গিয়ে দেখি ছোট্ট মেয়েটা কেমন বড়ো হয়ে যাচ্ছে। ফ্রক পরা মেয়েটা এখন এসডিও। কিন্তু তোকে আমার ছোট্ট মেয়েটিই মনে হয়। আর ওই আকাশের কথা বলছিস, ওটা শরতের আকাশ। এ সময় ওরকম পুজো—পুজো ভাব হয়। সামনের মঙ্গলবার মহালয়া তা খেয়াল আছে?

—ও মা, বল কী! কাজের চাপে বুঝতেই পারিনি কখন পুজো এসে গেল।

—একটা কাজ করবি, মা?

—বল।

—মহালয়ার দিন সকালে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে অর্পণ তর্পণ করবি।

—না, তুমি দেখছি কিচ্ছু জানো না মা। স্ত্রীলোক আর শুদ্দুরদের গায়ত্রী মন্ত্র, তর্পণের মন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকার নেই। বামনাই মতে সব মেয়েরাই শূদ্র। তা হলে কি করে হবে, মা?

—তোর ওই বামনই মতে কোনো ঘরের বউকে ট্যাক্সি চালানোর অধিকার দিয়েছে। তিনি তো আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে একা চলে গেলেন। তারপর তোর জন্য আমি কী না করেছি। কে বামুন, কে শূদ্র, কে মুসলমান সব পুরুষের সঙ্গে সমান তালে ট্যাক্সি চালিয়েছি দিনের পর দিন। গিলেছি কত ব্যথা। কোনো সংস্কার আমাকে আটকাতে পেরেছে? আর তুই বাবার আত্মার তৃপ্তির জন্য একটু জল দিতে পারবি না?

পৃথিবীর সব প্রতিযোগিতায় জিতলেও মা—র কাছে হারতেই ভালো লাগে অলকানন্দার। মা—র কাঁধে মাথা রেখে সে বলল—দেখ মা, তোমার মেয়ে এটাও পারবে। তার মনের মধ্যে বাবার চন্দনের ফোঁটা দেওয়া ছবিটা ভেসে ওঠে—তোমার নন্দা তৃপ্তির একটু জল দিতে পারবে না বাবাকে? মা—মেয়ের চোখের কোণ ভিজল। কেউ দেখল না।

গঙ্গার নরম জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে আসছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর—যা দেবী সর্বভূতেষু...। তাই শুনে অলিগলি আর ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দারা কাতারে কাতারে চলে এল গঙ্গাতীরে। আকাশ খানিকটা ফরসা হতেই অলকাও দোতলা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেল। পায়ের মধ্যে সেই অনুভূতি—কে যেন দু—এক পা নাচিয়ে দিল। নাচো, নাচো। সে দ্রুত পায়ে নেমে এল একতলায়। সিকিউরিটি গার্ড আগেই এসে গেছে।

আদুল গায়ে খাটো করে ধুতি পরা মাঝবয়সি লোকজনই বেশি। ন্যাদোস ন্যাদোস চেহারার কেউ কেউ দিব্যি গামছা পরে চালিয়ে যাচ্ছে তর্পণ। ভিজে জ্যাবজ্যাবে ধুতি—গামছা গায়ে বসে গেছে। লেপ্টে বসা সবেধন কাপড়ে পুরুষাঙ্গ সুস্পষ্ট নধর। অলকা লজ্জা পায়। মাথা নীচু করে মহিলা—চানঘাটের দিকে গেল সে। সেখানেও দু—চারটে পুরুষ প্রায় উদোম। সিকিউরিটি গার্ড তাড়া করে সরিয়ে দিল তাদের। গঙ্গার নোংরা জলে প্রথমে পা দিতে ইতস্তত করছিল অলকা। পরে পা দিতেই একটা চোরা স্রোত তাকে টেনে নিয়ে গেল কোমর জলে। তার শরীর জুড়ে টান। অনেকগুলো জলরেখা ঢেউয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে হারিয়ে গেল জলে। অলকা আঁজলা ভরে জল নিয়ে প্রায় গানের সুরে আহ্বান করল—

'যে চ হই পিতরো যে চ নেহ
জাংশ্চ বিদ্ম যা উ চন ন প্রবিদ্ধ।'

যাদের আমি চিনি, যাদের আমি চিনি না, স্বদেশি—বিদেশি যেই হোন না কেন, হে আমার পূর্বপুরুষগণ, মাতৃগণ, আমাদের আনন্দ দিনে আপনাদের আসতে আজ্ঞা হোক। অলকার মনে হল ফেড্রিকনগরের চলে যাওয়া প্রাণ—পুরুষদেরও ডাকা যেতে পারে—হে ফেড্রিকনগরের শাসকগণ, হে সাধুগণ, আপনারাও আসুন। স্বর্গ অথবা নরকে অধিষ্ঠিত সারা বসুন্ধরার আত্মীয়—অনাত্মীয় পূর্বপুরুষগণ উৎসবে অংশীদার হোন।

বাবার কথা মনে পড়তেই বাকি সব মন্ত্র, সব কথা ভুলে গেল অলকা। শরীরের মধ্যে একটা তিরতির স্রোতানুভূতির টান বয়ে যেতে লাগল। করাঞ্জলির জল যে কখন গঙ্গায় গড়িয়ে পড়ল খেয়াল নেই তার। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলে ভিজে গেল গঙ্গা। অলকানন্দা নদী হয়ে গেল।

তক্ষকটা ডেকে যায় সারাক্ষণ—তকতক। তকতক। বাংলোর পিছনে বাগানের মধ্যে ছিল গেস্ট হাউস। বর্তমানে গেস্ট হাউসের কঙ্কাল হানাবাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। আউট হাউসগুলোরও তথৈবচ অবস্থা। স্বপন একদিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল নতুন ম্যাডামকে বাংলোবাড়ির বিবর্ণ খোলস। বলছিল—রাজাও নেই, রাজত্বও নেই। এখন তো ম্যাডাম, আপনাদের শুধু আমলাই ভাবে লোকজন। পুষতেও চায় না কেউ। তক্ষকটা বোধহয় থাকে গেস্ট হাউসের পাঁজরে। অলকানন্দার মাথার মধ্যে ডাকতে থাকে—তক তক। তক তক। বাংলোর ছত্রিশ ইঞ্চি মোটা চুন—সুরকির দেওয়ালের ভিতর থেকে একনাগাড়ে আওয়াজ হয়—তক তক। ঘুমের ঘোরে মাথার কোষগুলো নড়ে—তক তক। পাতলা মসলিন হয়ে যায় ঘুম। মসলিন ওড়নায় ভাসে অলকা। খুলে যায় এক—একটি হাওয়া—দরজা। বারান্দায় কোজাগরী রাত পেরনো আলো ঠিকরে পড়েছে খানিকটা। অলকানন্দার নিজের চোখকে অবিশ্বাস্য মনে হয়—ঘোমটা মূর্তির মতো কারা বসে আছে

মাথা নীচু করে। ছয় ছয় ছয়। না, আরও বেশি। গোটা একটা গ্যালারি জুড়ে বসে আছে আবছা আলোর মূর্তি মানুষেরা। তবে কি অলকানন্দা ভুল শুনল? সমস্বরে কারা বলল—ইয়োর হাইনেস। সোলস, দাউ ইনভাইটেড। অলকা চমকে উঠল—কাদের আত্মা? আত্মা—মানুষেরা ছিল কোথায়? চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে দেশি—বিদেশি ফেলে আসা যুগের মানুষজন। কিন্তু কে যে হান্না মার্সম্যান, কে যে পঞ্চাননবাবু, সূত্রধর কৃষ্ণপাল বা অলি বি বোঝা দায় এত ভিড়ে। তবু অলকানন্দার বুঝতে অসুবিধা হয় না এরা সকলে ছিল ফেড্রিকনগরের বাসিন্দা একদিন। এতদিন পরে কেন এল এখানে? হঠাৎ অলকানন্দার ভাবার আচ্ছাদন খুলে যায়—হ্যাঁ, সত্যিই তো, ভুবনলোকের বাসিন্দাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তর্পণে। হায়, হায়, তাদের তৃপ্তির জল দিতে ভুলে গেছে সে। বলা হয়নি মন্ত্রে শেষ পঙক্তি শ্লোক। অলকানন্দা ভাবতে ভাবতে উদ্ধার করে—তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতা মহোদয়ঃ। ...তোমরা আমার হৃদয়ের নৈবেদ্যে পরিতৃপ্ত হও। আবার অলকানন্দার মনে হল কারা যেন সমস্বরে বলল—সাধু। সাধু। সামনের চেয়ার—সোফা যেমন ছিল তেমনি ফাঁকা। মিলিয়ে গেল সব আত্মা—মানুষ। কিন্তু কোনার দিকে আঁধার—আলোয় কারা বসে এখনও। অচেনা হলেও বুঝতে অসুবিধা হল না, বাবা—মেয়ে। রোমান চেহারা। মূর্তি মেয়ের রূপে তাক লেগে গেল অলকানন্দার। বাইশ—তেইশ বছরের যুবতীস্বরে ছায়াসুন্দরী বলল—ইয়োর হাইনেস। আই অ্যাম ক্লারা ব্রাউন। বাবা মি. ব্রাউন নতমুখে বসে রইল সোফায়। মুখে বেদনার গভীর ক্ষত। মসলিনে ভেসে ভেসে অলকানন্দা ভাবল—আহা, কেন হয় না অমন রূপ। ভাবতে ভাবতে অলকানন্দা মিশে গেল ক্লারা ব্রাউনের শরীরে। নাক হল টিকালো। চোখ হল চোখা। অলকার পা নেচে উঠল—তা তা, থৈ থৈ তা...। হাতে মুদ্রা। সারা শরীরে নেচে উঠল মন্দিরে মন্দিরে দেবীদের মতো। ক্লারা ব্রাউনের নাচ আর স্বর মিলে শরীরে ফুটে উঠল কবিতা—আই হ্যাড বিন টু দিস বাংলো লং এগো। আমরা এই বাংলোতে অনেক আগে থাকতাম। গঙ্গাকে ভালোবাসতাম। নাচের সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। নাচের গুরু, নাচ আর আমি ছিলাম একটিমাত্র সত্তা। নাচের তালে তালে আমার খোঁপার জুঁই ফুল খসে পড়ত লাল মেঝেয়, সিঁড়িতে। আমি ভালো নাচলে আমার নাচের গুরুর গৌরসুন্দর শরীরে ভেসে উঠত মুগ্ধ বসন্ত। কুড়িয়ে নিত খসে পড়া খোঁপার জুঁই ফুল। বাট মাই ফাদার অবজেকটিভ এগেনস্ট দি ইন্ডিয়ান ডান্স। বাবার আভিজাত্যে বেধেছিল। ফর দি সেক অফ ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল ডান্স আমি জীবনকে বাজি রেখেছিলাম। বাবা নেটিভ গোমস্তাদের সাহায্যে আমায় গুম করে দিল।

অলকানন্দা উৎসমুখে উচ্ছল ঝরনার মতো নেচে যাচ্ছে। তার গলার ক্লারা ব্রাউনের স্বর আবার বলে উঠল—ইয়োর হাইনেস। আপনি হয়তো ভাবছেন তর্পণ জলে সবাই তৃপ্ত হল কিন্তু আমি কেন ফিরলাম না। আসলে আমার তৃপ্তি নাচে। এতগুলো বছর নাচতে চেয়েছি এই বাড়ির কাঠ—পাথরের কণায় কণায়, পারিনি। শুধুই জড়তায় আটকে যেত আমার পা। আজ যখন আপনাকে আধার করলাম, আমার সমস্ত সত্তা নেচে উঠল। মাই সোল ফিলস নাউ স্যাটিসফায়েড। আমি তৃপ্ত। নাচতে নাচতে লাল মেঝে ছেড়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে অলকানন্দ। ঝড়ো বাতাসে খসে যাচ্ছে শরীর থেকে এক—একটি মসলিন ওড়না। পালক ছাড়া পাখির মতো তার ভারী শরীর নেমে আসছে পৃথিবীর কাছাকাছি।

চড়া রোদের আভায় চোখ খুলে দেখল—ইজিচেয়ারে বসে আছে সে। একটু আগেও রাতে ডুবে ছিল সামনের নদীটা। এখন জোয়ার জলে ভেসে যাচ্ছে দু—কূল আর অলকার ভাবনার বিস্তার। তবু অলকানন্দা ভাবল—নাই বা হলে সত্যি। তবু সখী, প্রতিরাতে এসো তোমার ঘরে।

ভূতুড়ে বিজ্ঞাপন

কল্যাণ মৈত্র

কলকাতার খুব বড়ো একটি বাংলা কাগজের সাতের পাতায় নীচের দিকে বেরিয়েছিল বিজ্ঞাপনটা। বয়ানটাও ছিল চমৎকার। তবে সাতের পাতায় হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের টুকরো টুকরো বিজ্ঞাপনের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল।

ভূত গবেষণা কেন্দ্র
গবেষক, লেখক, আর্টিস্ট, ভ্যাগাবন্ড, বেকার (পুরুষ ও মহিলা) চাই। ফ্রিলান্স ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, মেকাপম্যান যোগাযোগ করুন। ৯৮৩০০১০০০

পচাদা খেয়াল করেছিল প্রথম। হারানের সেলুনে কাগজ পড়তে গিয়ে। তারপর একপ্রকার ছুটতে ছুটতে ঘর্মাক্ত অবস্থায় হাজির হল ক্লাবে।

রবিবার। সাতসকালে চাঁদের হাট বসেছে। পচাদাকে ছুটে আসতে দেখে ভজা ক্যারামবোর্ডে স্ট্রাইকারটা কোনোরকমে হিট করেই উঠে দাঁড়ায়, আরে পচাদা যে, কি ব্যাপার? বিপদ নাকি?

হোয়্যার ইজ ব্রজ, কল হিম। আই ওয়ান্ট হিম ইমিডিয়েটলি—পচাদা উত্তেজিত। ব্রজ এই মুহূর্তে নেই। তিনু, পিন্টু ছুট দিল।

ভজা বলল, পচাদা, সকাল সকাল পণ্ডিতকে কি দরকার? কোনো খাস খবর, টিউশনি আছে? ভজার কৌতূহলের সীমা নেই। একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছে।

পচাদা বরং স্বভাববিরুদ্ধভাবে আজ বেশি গম্ভীর। বলে, একটা রেড ডটপেন দে।

টেবিলের উপর পচাদা কাগজটা মেলে ধরে। তারপর লালকালিতে মার্ক করল বিজ্ঞাপনটা। ভজাও মার্ক করছে পচাদাকে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল তিনু, পিন্টু হন্তদন্ত হয়ে ব্রজকে নিয়ে আসছে। ঠিক যেন পুলিশে চোর ধরেছে।

বিজ্ঞাপনটা পড়।

ভজা পড়ে বলল, তা না হয় হল। কিন্তু ঠিকানা কই?

তুই একটা গাধা। ঠিকানাটা ওতেই আছে। তোকে কি ক্যাওড়াতলা বা নিমতলায় ইন্টারভিউ নিতে ডাকবে?

নীচের সংখ্যাগুলো আসলে মোবাইল নাম্বার—ব্রজ কথাটা শেষ করতে পারলে না।

দ্যাটস রাইট। দশটা সংখ্যা। ওখানে যোগাযোগ করতে হবে।

ব্রজ বুঝতে পারছে না ওই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। ভূত গবেষণা কেন্দ্রের কি উপকারে সে লাগতে পারে, বিজ্ঞাপনে যা যা চাওয়া হয়েছে তার কোনোটাই সে নয়। লেখা—টেখার একটু অভ্যাস আছে যা এই মাত্র।

ভজা বলল, ইনটারেস্টিং কেস। ভূত নিয়ে গবেষণা। আগে তেমন শুনিনি। ঘোস্ট রিসার্চ সেন্টার। অভিনব।

পচাদা হঠাৎ হঠাৎ চটে যায়। চেঁচিয়ে বলল, শাট আপ। কাজের সময় আজেবাজে কথা পছন্দ করি না। দেখছিস একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ডিল করছি। পেটে এখনও দানাপানি পড়েনি।

এবার ভজা বলল, তিনু, মেজদার দোকানে আটটা হাফ বলে আয়। সঙ্গে নোনতা। না, পচাদার জন্য ফুল। আমাদের হাফ, লিকার। আমার অ্যাকাউন্টে।

পচাদা একটা সংশোধনী দিল, আমার জন্য তার আগে চারটে লাল—লাল জিলিপি—বড্ড খিদে পেয়েছে রে—

সকলে আবার বিজ্ঞাপনটা নিয়ে পড়ল।

ব্রজ তুই যাবি। তুই লেখকও বটে, আবার ভূত—টুত নিয়ে তোর পড়াশোনাও আছে। আমার মনে হয় তোর থেকে ভালো ক্যানডিডেট আর হয় না। যোগাযোগ কর। চাকরিটা হয়ে যাবে, বসে থাকার চেয়ে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকা ভালো। ভালো না লাগলে ছেড়ে দিতে কতক্ষণ।

ব্রজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বাড়িতে লুচি—পায়েস হচ্ছিল, তা ছেড়ে এখানে—পচাদার পাল্লায়! আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিল।

ভজা অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার সে বলল, পচাদা, 'ভ্যাগাবন্ড চাই'—তা না হয় হল—ওরা ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান নিতে চাইছে কেন?

ছবি—টবি করবে বোধহয়।

ইতিমধ্যে আরও দশ—বারোজন জুটে গেছে। ভিড় জমছে। তিনু জিলিপির ঠোঙা থেকে রস চাটতে চাটতে বলল, সেই সত্যজিৎ রায় ছবি করেছিলেন—গুপী গাইন বাঘা বাইন—তারপর ভূতের আর ভালো ছবি হল কই।

তিনু বলল, এটা মনে হচ্ছে লাইভ হবে। মানে টাটকা ভূতের ছবি।

ভজা বলল, আমার ঠাকুরদা দু—চারটে ছবিতে কাজ করেছিলেন। বাড়িতে একটা ছবির পরিবেশ ছিল, আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না হোক, বংশপরম্পরা থেকে বলতে পারি—কী হতে চলছে।

কী যেন ভাবছে পচাদা। ব্রজ চুপচাপ। ভজা বলে চলেছে, তিনুর কাঁধে তার হাত, যেমন ধর একটা পুরোনো রাজবাড়ি দুশো বছরের বেশি—বাঁশঝাড়, ভাঙা ঘাট। পুরোনো আসবাবপত্র, মাকড়সার জাল, ঝুল—স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ—ভূত—ভূত গন্ধ, শ্যাওড়া গাছ—এই ধরনের একটা সেট—নকল বা বানানো নয়, আসল। ক্যামেরাম্যান গোপন জায়গা থেকে শট নিচ্ছে—ভূতের কাহিনি—জ্যান্ত ভূত নড়ছে—চড়ছে। তারপর সেটা সিনেমা হলে, দূরদর্শনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে দেখানো হচ্ছে। একটা সিরিয়াল হলে সোনায় সোহাগা। ভাবতে পারছিস কি থ্রিলিং হবে ব্যাপারটা। যে বা যারা বিজ্ঞাপন দিয়েছে তারা সত্যিই বুদ্ধিমান। ব্যাপারটা নামাতে পারলে যা মুনাফা হবে, যা পপুলারিটি পাবে তা ভাবতে পারছি না। ইংরিজিতে সাব—টাইটেল দিয়ে 'কান' চলচ্চিত্র উৎসবে আসল ভূতের ছবি দেখানো। ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার—একে একে সব হয়ে যাবে। স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে ভজার চোখ। যেন সে—ই ছবির প্রযোজক—পরিচালক।

পচাদা বলল, ব্রজ, তুই তোর ভূতের গল্পগুলোও নিয়ে যাস। রিসার্চের কাজে লাগবে। তৈরি ইন্টারভিউয়ের জন্য। আমি দেখি মোবাইলে যোগাযোগ করতে পারি। লেট আস গেট ক্র্যাকিং—যে যার বাড়ি চলে যাও। 'সন্ধে সাত ঘটিকায় পুনরায় হাজিরা।'

মুড ভালো থাকলে পচাদা ইংরেজি এবং সাধু বাংলায় কথা বলে।

পচাদা চলে গেল।

ভজার হাতে এবার লিডারশিপ। কেউই আর বাড়ি যাবার নাম করে না।

ব্রজর দিকে তাকিয়ে ভজা বলল, তোর ইন্টারভিউ হবে এখনই—মহড়া দে। একটু ঝালিয়ে নে। এই যেমন ধর গিয়ে—গুপি ও বাঘার আসল নাম কী ছিল?

তিনু বলল, গুপী গাইন, বাঘা বাইন।

রাসকেল। কিছু জানো না। কানু কাইনের ছেলে গুপী কাইন, পরে গুপী গায়েন—সে গান গাইতে পারত। আর পাঁচু পাইনের ছেলে বাঘা। সে ঢোলক বাজাত, তার নাম হল বাঘা বায়েন। গল্পটা উপেন্দ্রকিশোরের।

এইভাবে চলতে লাগল ব্রজর ওপর দ্বিপ্রাহরিক প্রহার। সকলেই নিজ নিজ বিদ্যে ফলাতে ব্যস্ত।

তিনু বলল, ভূতের ছায়াছবি করার মতলবটা কার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বের হল সেটাও জানার বিষয়। যেই হোক, লোকটা গ্রেট। বাণিজ্য ভালো বোঝে। যা খাবে না বাজারে!

ভজা তিনুকে সেখানেই থামাতে বলল, এই তুই, তুই বল দেখি রবীন্দ্রনাথের একটা ভূতের গল্পের নাম—

তিনু বলল, মণিহার।

ইডিয়েট। অনেকটা কাছাকাছি বলেছিল তাই তোকে ছেড়ে দিলাম। রেগেমেগে ভজা বলল।

ব্রজ বলল, ওটা 'মণিহারা' হবে।

ব্যাপারটা বেশ জমে উঠেছে। নানারকম গল্পের সঙ্গে চলেছে প্রশ্ন—উত্তর পর্বও। পচাদা ব্রজকে সিলেক্ট করেছে। বাংলা সাহিত্যের ছেলে ব্রজ। এই পরিস্থিতিতে সে কিছুটা বেমানান। কিন্তু উপায় নেই।

পিন্টু এতক্ষণ তেমন কোনো কথা বলেনি। সে ফুট কাটল, ভূতের দফা গয়া। এসবই ভূতের ভবিষ্যৎ বাঁচানোর চেষ্টা। বিদেশ থেকে এবার ভূত—প্রেত রপ্তানিও করা হবে দেখে নিয়ো। বিজ্ঞাপনটা দেখে মনে হচ্ছে পেছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে। ভূত—টুত বলে আমাদের খেপিয়ে তোলার চেষ্টা। এমনিতেই বাঙালি এইসব ভূত—প্রেত ভালোবাসে। ভয়ও পায় আবার বিশ্বাসও করে না। বাংলাদেশে ভূতের আকাল পড়েছে। কোথায় ভূত। রাতের অন্ধকার নেই। গলির মোড়ে মোড়ে আলো। বনবাদাড়ে বাঁশঝাড় নেই। খোলা মাঠ নেই। জলাভূমি শেষ হয়ে যাচ্ছে। পুরোনো বাড়ি প্রোমোটাররা খেয়ে ফেলছে। ভূতগুলো আর যায় কোথায়, তবে যদি ছবি—টবিতে সুযোগ পায়। ওদের দর বাড়ে। বড় কষ্টে আছে বেচারিরা।

পচাদা সন্ধের আসরে আসতে পারেনি। খবর পাঠিয়েছে, সামনের শনিবার পাথুরেঘাটায় ব্রজকে যেতে হবে। দুটোর সময়। সে যেন তৈরি থাকে।

শনিবার বারবেলায়! ব্রজ কিঞ্চিৎ ভয় পেল। ভজা বলল, ভালো তো ইন্টারভিউটা জমবে।

কয়েকশো লোকের কালো মাথার ভিড়ে ব্রজেন রায় ওরফে চড়কডাঙার ব্রজ আজ আর হারিয়ে যায়নি। এই মুহূর্তে তার কোনো টেনশন নেই। অনেক কষ্টে বাড়িটা খুঁজে পেয়েছে সে। গলির এক কোণে পুরোনো সেকেলে বাড়ি। জীর্ণ, পরিত্যক্ত। ভেতরটা কেমন ভ্যাপসা, গুমোট।

দরজার বাইরে লাল আলো জ্বলছে। ইন্টারভিউ চলছে বোধহয়। সে ভাবল। একটি লোক অনেকক্ষণ বাদে বেরিয়ে এসে বলল, এখানে অপেক্ষা করুন। সময় হলেই ডাকা হবে।

কাল রাতেও ব্রজেন ভেবেছিল আসবে না। কিন্তু গোলমাল পাকালো ওই পিন্টু। চড়কডাঙার মোড়ে হারুদের বাড়ির লেট নাইট আড্ডায় বসার পর থেকে তার সব কিছু গোলমাল পাকিয়ে গেল। শুভানুধ্যয়ীর ভঙ্গিতে বলল, শোন ব্রজ, তুই একটা অভিজ্ঞ লোক। কালকের ইন্টারভিউটা তুই দিয়ে আয়। আর কিছু না হোক তোর রেকর্ডটা হয়ে যাবে। এক হাজার বার ইন্টারভিউ দেওয়া মুখের কথা! অন্য দেশের সরকার হলে লজ্জায় তোকে চাকরি দিত। বলা কি যায় 'গিনিস বুক'—এ তোর নামও উঠতে পারে।

ব্রজেনের ডাক আর আসে না। উসখুস করছে সে। উঠে চলে যেতেও পারছে না। দিনকাল যা পড়েছে সামান্য চাকরির জন্য পিএইচ ডি ডিগ্রিধারীও এসে হাজির হয়। এবারটায় তেমন ভিড় নেই। পচাদার প্রতি সে মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

এবার আলো নিভল। একমাথা টাক, সাদা উর্দি পরা একজন দারোয়ান ব্রজেনকে ইশারায় ডাকল। সবই কেমন নিঃশব্দে হচ্ছে। থমথমে ভাব। নিস্তব্ধ চারপাশ। বাইরে জামগাছের ওপর কতকগুলো কাক ঝগড়া করছে। একটা কালো বেড়াল ব্রজেনকে দেখে যেন কী ভাবল, তারপর সেও চলে গেল তিনতলার সিঁড়ির দিকে। এই ভরদুপুরেও বাড়ির ভেতরটা কেমন মৃদু আলো আর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। প্রথম দিকে ব্রজর এতটা খেয়াল হয়নি। দেওয়ালে বড়ো বড়ো টিকটিকি ছুটোছুটি করছে। বাড়িটা সত্যিই ঠিক ভূতের বাড়ির মতো।

আসুন স্যার এই দিকে। দরজাটা ঠেলুন।

দরজা ঠেলে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে ব্রজেন একটু দেখে নিল। না, কেউ তাকে আসতে অনুরোধ করল না। ঢুকেই পড়ল সে। ঘরের কোণে একটা আলো জ্বলছে। স্যাঁতসেঁতে চারপাশ। চল্লিশ ইঞ্চির দেয়াল। ঘরের মাঝখানে একটা বড়ো টেবিল। তার ওপর একটা ফোন। কালো রঙের। ফোনের রিসিভারটা শূন্যে ঝুলছে।

টেবিলের কাছেই একটা চেয়ার। ব্রজেন ঠায় দাঁড়িয়ে। ওপ্রান্তে একজন বসে। বেঢপ মোটা। ঘাড়ে গর্দানে। মনে হচ্ছে মাথাটা কেটে কেউ যেন বুকের ওপরে বসিয়ে দিয়েছে। তার গায়ের রং কয়লার মতো কালো। শ্বেতবস্ত্র দাঁতের ফাঁকে হাসির ঝিলিক। ব্রজেনের দিকে চাইলেন তিনি। কে যেন তার কানে কানে বলল, ইনি গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টার, ওমপ্রকাশ তামাকুওয়ালা। ব্রজেন জোড় হাতে বাঙালি কায়দায় নমস্কার জানাল। ওমপ্রকাশ বসতে বললেন।

এবার তার চোখ পড়ল আরেক জনের ওপর—শিবেন বিশ্বাস। একসময় তার প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। নামকরা ঔপন্যাসিক ছিলেন।

শিবেনবাবু পান চিবুতে চিবুতে বললেন, আজও চাকরি পাসনি। তোকে তখনই বলেছিলাম কিস্যু হবে না। কী হল অত পড়াশোনা করে।

ব্রজেনের মনে পড়ে গেল 'রামেরা তিন ভাই' ট্রানস্লেশন না পারার জন্য শিবেনবাবু একবার তাকে রামদাওয়াই দিয়েছিলেন।

তামাকুওয়ালা বললেন, উনি আমাদের লেখক। নামজাদা স্ক্রিপটরাইটার। চেনেন নিশ্চয়ই। ভূতের কাহিনি নিয়ে আমরা যে ছবি আর সিরিয়াল করব উনি তার চিত্রনাট্য লিখবেন। আমাদের একজন কপিরাইটার মানে লেখকই ধরুন, আর তথ্য অনুসন্ধানের লোক চাই। আপনি রাজি থাকলে বলুন। কত মাইনে চান তাও বলুন। প্রথমে আমরা কুড়ি—পঁচিশ জনের একটা ইউনিট করে এ বাড়িতেই কাজ চালাব। শুটিং—টুটিং সব এখানেই হবে। নায়ক—নায়িকাদের খোঁজখবর চলছে, বুঝলেন না। মানুষ দিয়ে তো আর ভূতের অভিনয় করানো চলে না। আমরা সত্যি ভূতেদের নিয়ে কিছু করতে চাই। তাদের দিয়েই অভিনয় করাব। আমাদের কনসেপটা আলাদা। মানুষ দিয়ে ভূতের ছবি বোগাস। ভূতের ছবিতে ভূতেরাই অভিনয় করবে। আপনি টাইটানিক দেখেছেন? না দেখলে আমাদের স্টুডিয়োতে দেখে নেবেন। ওইরকম কায়দায় আমরাও একটা সেনসেটিভ ছবি করব। মানে প্ল্যানিংটা তাই—ই।

...আপনি জানতে চাইছেন তাহলে আপনাকে দরকার কেন? তাইতো? আমরা আপনাকে দিয়ে গবেষণার কাজটা, তথ্য অনুসন্ধানের কাজটা করাতে চাই। আপনি পয়সা পাবেন। আপনার বায়োডাটা যা দেখলাম তাতে আপনি ওই কাজ পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। এবার ভেবে দেখুন কী করবেন। আমরা যে দু—চারজন জ্যান্ত মানুষ নেব তাদেরকে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। আমাদের কাজটা শুরু হবে রাতের বেলা।

...ছবি রিলিজ করলে টাকাপয়সা মিটিয়ে ছুটি করে দেব।

...হ্যাঁ, আর একটা কথা। বাইরের কিছু কাজ আপনাকে করে দিতে হবে। সঙ্গে একজন অ্যাসিস্টেন্ট পাবেন। তিনি অবশ্য আমাদের লোক।

ব্রজেনের মনে পড়ল, শিবেনবাবু বছর দশেক আগে দার্জিলিং—এ পাহাড়ের ধসে প্রাণ হারিয়েছিলেন। কাগজে সে খবর ছাপাও হয়েছিল। তিনি ভূত হয়েও তাঁর সেই নেশা ছাড়তে পারেননি। আশ্চর্য! ব্রজেনের হাত—পা ক্রমশ ঠান্ডা হতে থাকে। সে ঘামতে শুরু করেছে। ভয়ে সে কাঠ হয়ে গেছে।

এরপর শিবেনবাবু বললেন, ওর আর কি। বেকার। কাজ নেই। থাকুক আমার সঙ্গে। ভালো টাকা পাবে। ওর লেখা—টেখার রোগ আছে। অভিজ্ঞতা হলে পরে কাজে দেবে।

রাতে কাজ যথারীতি শুরু হল। প্রথম পর্ব—ভূতের জন্ম। পুরাকালের ভূত। পর্বের নামকরণ তখনও হয়নি। ওমপ্রকাশ বললেন, এটা হচ্ছে মহড়া। আসল শুটিং আর কিছুদিন পরে হবে। আজ রাতটা আপনি

দেখুন। আরও অনেকে এসে পড়ল বলে। আমরা যতদিন না ক্যামেরাম্যান পাচ্ছি ততদিন এদিকের কাজটা চলুক।

এবার খেয়াল হল ব্রজেনের। তার চোখ দুটো বন্ধ। চোখে হাত দিয়ে সে দেখল—হ্যাঁ তাই। তাহলে সে দেখছে কি করে?

চড়কডাঙার মোড়ে পুলিশের গাড়ি। ব্রজেনের বাবা—মা—দিদি কাঁদছে।

পাথুরেঘাটার একটি বাড়িতে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গেছে।

হঠাৎ বাইরে পচাদার গলা। মাসিমা, ও মাসিমা! জানলার বাইরে থেকে ডাকছে সে। —ব্রজ ফিরেছে? ওর না আজ কলকাতায় যাবার কথা ছিল। ইন্টারভিউ....

ও তো বাড়িতেই। সেই দুপুর থেকে ঘুমোচ্ছে। দেখ না সন্ধে হয়ে এল। এ ছেলের যে কি হবে!! বড্ড ঘুমকাতুরে।

আধো ঘুমের ভেতর ব্রজ পচাদার গলা শুনতে পেল। এতক্ষণ তা হলে সে কী দেখল? উঃ কি ভয়ই সে পেয়েছিল!

ব্রজ ওপাশ ফিরে ফের ঘুমোতে চেষ্টা করল। আজ সে পচাদার মুখোমুখি কিছুতেই হবে না।

একটু কাঁচা মাছ পেলেই সব ঠিক হয়ে যেত। এই এক মুশকিল এদের নিয়ে। যত খিদে পাবে তত তাদের ওজন বাড়বে

দাদামশায়ের বন্ধু

হিমানীশ গোস্বামী

মামাবাড়ি থেকে চিঠি এল—মেজোমামা আসছেন, আমরা যেন অন্তত সাতদিনের জন্য কালকেপুর যাই। আসল নাম কালিকাপুর কিন্তু সকলেই বলত কালকেপুর! কালকেপুর—অর্থাৎ কিনা আমাদের মামাবাড়ির গ্রাম। ছোটো নদী চন্দনা, তার ধারে চমৎকার ছোটো গ্রামটি। আমাদের রতনদিয়া গ্রাম থেকে কালকেপুর গ্রাম কিন্তু খুবই কাছে। হাঁটা পথে সাড়ে তিন মাইল। আমরা হেঁটেই যেতাম—নইলে ট্রেনও ছিল, আবার ওই চন্দনা নদী দিয়ে নৌকায় চড়েও যাওয়া যেত। মেজোমামা থাকেন কটকে, বছরে শীতকালে একবার আসেন—সঙ্গে নিয়ে আসেন অজস্র গল্প, তাঁর বন্দুক এবং প্রচুর গুলি। আরও আনেন কলকাতার সেরা সেরা সব বড়োদিনের খাবার—কেক, পেসট্রি—এইসব। তা ছাড়া বাড়িতেই কতরকম মাছ পাওয়া যেত, নদী থেকে ধরা টাটকা মাছের রাশি। অনেক সময় অত মাছ খেতে খেতে অরুচি ধরে যেত। এরপরও রোজ নতুন পিঠে তৈরি হত—সরা পিঠে, বকুল পিঠে, চন্দ্রকাঠ—তার ওপর মেজোমামার শিকার করে আনা পাখির মাংস। জলে—চরা পাখি ছোটো স্নাইপ থেকে শুরু করে বড়ো পাখি গগনভেরী। চল্লিশ বছর আগে দেশে এখনকার মতো জঙ্গল কমে যায়নি—পাখি তো ছিলই প্রচুর, তা ছাড়া আমাদের গ্রামের আশেপাশে বাঘও এসে পড়ত শীতকালে কখনোসখনো।

কিন্তু মামাবাড়ির চিঠি পড়ে আমরা সেবার যতখানি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম ততখানি না হলেও চলত। সেবার সবই কেমন যেন উলটোপালটা ঘটে গেল, অবিশ্বাস্য সব ঘটনা। এখনও সবটা যেন ঠিকমতো বিশ্বাস হয় না। এটাও ঠিক—সব কথা গুছিয়ে বলতেও পারি না। অনেকদিন আগে যা ঘটেছে তার সবটা মনে নেই—আবার যে সব ঘটনা ঘটেনি—কেউ কেউ সে কথা বলায় সেগুলো যেন ঘটেছিল বলেই মনে হয়। যাই হোক, আমরা একটা কথা আগেই জানতাম, সেটা হল দাদামশাই সেই যে পুজোর পর দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তারপর থেকে দু—মাসের উপর হয়ে গেল তিনি ফেরেননি। প্রথম সপ্তাহে তাঁর দুটো চিঠি এসেছিল। একটা এসেছিল বেনারস থেকে। তিনি লিখেছিলেন—জায়গা যত ভালো বলে লোকে বলে তত ভালো নয়, তবে এত ভালো বেগুন তিনি কখনো দেখেননি। তারপর এক পাতা ধরে ওই বেগুনের বর্ণনা ছিল। এর পরের চিঠি এসেছিল কাশ্মীর থেকে। তিনি লিখেছিলেন—চমৎকার জায়গা, তবে বেগুনের অভাব খুব বোধ করছেন। তারপর বেগুন না থাকায় তাঁর কীরকম কষ্ট হচ্ছে, সেটা জানিয়েছিলেন দু—পাতা ধরে। ওই চিঠির শেষে লিখেছিলেন, এবার যাওয়ার সময় বেনারস থেকে দু—ঝুড়ি বেগুন আর এক প্যাকেট বীচি নিয়ে যাব।

ব্যস, তারপর দু—মাস আর খবর নেই। তারপরও বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। বাড়ির লোকেরা সাধারণত দাদামশায়ের জন্য চিন্তা তেমন করে না। খেয়ালি মানুষ—কোথাও হয়তো কিছু শিখছেন। হয়তো রাজস্থানে বসে হাতির দাঁতের কাজ শিখছেন, কিংবা মোরাদাবাদে পেতলের কাজ। একবার তো মাদ্রাজে গিয়ে ছবি আঁকা শিখে এসেছিলেন তিনি। তা ছাড়া, শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবিতা লেখা শেখা যায় কিনা তা জানতে চেয়ে চিঠিও দিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। সে চিঠির উত্তর এসেছিল কিনা—তা আমরা জানি না। বোধহয় আসেনি, এলে নিশ্চয় আমরা জানতে পারতাম। যাই হোক বাড়ির লোকেরা যখন দুশ্চিন্তা শুরু করেছে এমন সময় একটা চিঠি এল তাঁর কাছ থেকে, তাতে তিনি জানিয়েছেন তাঁর আসার তারিখ। বেনারস থেকে তিনি লিখেছেন—এখানে বেগুনের জন্য এসেছিলাম, কিন্তু বেগুন কেনা সম্ভব হয়নি।

হরিদাস বেগুন খায় না। বেগুনের নাম শুনলে তেলে—বেগুনে জ্বলে ওঠে। তা ছাড়া, কেবল খায় না তা নয়, বেগুনের গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। তারপর যেন নেহাত না লিখলেই নয় এমনভাবে লিখেছেন, হরিদাস আমার বন্ধু। হরিদাস সাধু। ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল আসামে—বছর পনেরো আগে। সে আমার সঙ্গে যাবে—এখন থেকে সে কালকেপুরেই থাকবে। ওর জন্য রোজ এক সের করে মাছ লাগবে—যেকোনো ধরনের মাছ হলেই চলবে। ছোটো কাঁচা মাছই ওর পছন্দ।

তারপর লিখেছেন, স্টেশনে যেন জনা দশেক লোক থাকে—আমার সঙ্গে একটা কাঠের বড়ো বাক্স থাকবে।

ঠিক সেই তারিখের আগের দিনই আমরা কালকেপুর পৌঁছলাম। দেখলাম মেজোমামা এসেছেন, খাবারদাবারও প্রচুর—কিন্তু বাড়িতে তেমন আনন্দের আবহাওয়াটাই নেই। মেজোমামা বাইরের ঘরে বসে চমৎকার গন্ধওয়ালা তেল দিয়ে বন্দুক পরিষ্কার করছেন দেখলাম। আমাদের দেখে বললেন,—আয় আয়, বোস। তারপর দু—মিনিট চুপচাপ থাকার পর বললেন, —যা ভেতরে যা। ভেতরে গিয়েও দেখি, বাড়ির মধ্যে কেমন যেন একটা অশান্ত ভাব। ছোটোমামাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ির সবাই এমন গম্ভীর হয়ে রয়েছে কেন রে? ছোটোমামা বলল, মন্দিরের ওখানে গিয়ে বলব, এখানে নয়। ছোটোমামা মন্দিরের সিঁড়িতে বসে সব কথা বলল। সেই চিঠির কথা পর্যন্ত বলে চুপ করল। আমি বললাম,—তাতে আর কী হয়েছে, জন দশেক লোক নিয়ে স্টেশনে গেলেই চুকে যায়। তখন ছোটোমামা যা বলল তাতে আমার একেবারে মাথা ঘুরে উঠল। ছোটোমামা বলল, চিঠিটায় একটা খটকা আছে বুঝতে পেরেছিস?

—খটকা?—আমি প্রশ্ন করলাম।

ছোটোমামা বলল,—চিঠিটা পড়ে তোর কোনোরকম অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হয়নি?

আমি বললাম, কই না তো? দাদু বন্ধু নিয়ে আসছেন। এটার মধ্যে খটকা কিছু তো লাগছে না। তবে একটা বড়ো বাক্স আনছেন দাদু, সেটাতে একটু খটকা লাগছে!

—ঠিক ধরেছিস। আর কিছু?

—আরও খটকা লাগার কিছু আছে নাকি ওতে?

—তুই একটা বোকা। —ছোটোমামা বলল।

—না আমি বোকা নই। —আমি দৃঢ়ভাবে বললাম,—আমি বোকা হব কেন? এবারে অঙ্কে একশো—র মধ্যে তো আশির ওপরে পেয়েছি, বাংলায় পেয়েছি সত্তরের কাছাকাছি—সেও একশো—র মধ্যে।

ছোটোমামা বলল,—আরে সে কথা নয়। ওই চিঠির মধ্যে আরও একটা মুশকিলের ব্যাপার আছে—তোর মাথায় ঢুকছে না তো? আচ্ছা, তাহলে বলেই দিই। ওই যে চিঠিতে আছে না, বাবার বন্ধু মাছ খাবেন রোজ এক সের করে?

আমি বললাম,—তা মাছ কি এমন খারাপ বস্তু কিছু? আর এক সের মাছ আমিও খেতে পারি।

ছোটোমামা বলল,—কাঁচা?

আমার তখন ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল। তাই তো—দাদুর বন্ধুর জন্য কাঁচা মাছ লাগবে, রোজ এক সের করে! হ্যাঁ, তাই কথাটা দুশ্চিন্তারই বটে। দাদুর বন্ধু হরিদাস সাধু। তিনি খাবেন কাঁচা মাছ। ভাবনারই বটে!

কিন্তু তারপর ছোটোমামা যা বলল, তাতে আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল, হাত—পা জমে গেল ভয়ে।

ছোটোমামা বলল,—বাবার বন্ধু হরিদাস কাকা গত মাসে মারা গেছেন বেনারসে জলে ডুবে।

—অ্যাঁ!—আমার আর কথা সরে না। ওই অ্যাঁ বলেই চুপ মেরে যাই। তারপর অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ পর আমার মুখ দিয়ে মাত্র একটা বাক্য বেরোয়,—সর্বনাশ!

—ঠিক তাই।—ছোটোমামা বলল,—দারুণ সর্বনাশ। বাবার বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। তাঁর ছবিও ছাপা হয়েছিল। বড়ো সরকারি চাকরি করতেন তিনি আবগারি বিভাগে। বদলির

চাকরি—কখনো থাকতেন হুগলি, কখনো বা বিহারের পূর্ণিয়ায়, কখনো বা নাসিকে। বিরাট চেহারা ছিল তাঁর। ছ—ফুটের ওপর লম্বা ছিলেন, আর বেশ মোটাও। ভীমের মতো গোঁফও ছিল।

আমার ভয় করছে রে ছোটোমামা!—আমি কাঁপতে কাঁপতে বললাম।

—তোর দোষ কি! বড়দা পর্যন্ত ভাবছে, সকলে মিলে বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গেলে কেমন হয়। তবে মেজদা বলছে—অনেক বাঘ ভালুক শিকার করেছি, এবারে একটা ভূতকে অন্তত দুটো বুলেট মেরে দেখব ফলাফল কেমন দাঁড়ায়। বাড়ির আর সবাই সর্বদাই ঠকঠক করে কাঁপছে।

আমি বললাম,—তা শীত পড়েছে বটে খুব। কাঁপতে আমারও ইচ্ছে হচ্ছে রে ছোটোমামা!

ছোটোমামা বলল,—শীতে, না ভয়ে?

আমি বললাম,—কী?

ছোটোমামা বলল,—সহজ প্রশ্ন! ভয়ে কাঁপতে ইচ্ছে করছে, না শীতে?

আমি বললাম—শীতে। শীতেই কাঁপতে ইচ্ছে করছে।—তারপর একটু থেমে বললাম, —না, ভয়েই কাঁপতে ইচ্ছে করছে। তবে, বলতে ইচ্ছে করছে শীতে কাঁপতে ইচ্ছে করছে।

ছোটোমামা বলল,—ব্যাপার খুব সাংঘাতিক। মেজদার দৃঢ় বিশ্বাস, হরিদাস কাকার জলে ডুবে একেবারে সরাসরি গঙ্গাপ্রাপ্তি হলেও তাঁর আত্মা অতৃপ্ত থেকে গেছে, সদগতি হয়নি। অর্থাৎ কিনা তাঁর বাড়ির কেউ বোধহয় ঠিকমতো শ্রাদ্ধশান্তি করেনি—বা গয়ায় পিণ্ডি দেয়নি।

আমি বললাম,—হ্যাঁ রে ছোটোমামা, গয়ায় পিণ্ডি দিলে কী হয়? ছোটোমামা উদাসভাবে বলল,—কিছু পৈতেধারী অসংস্কৃত—মনস্ক ব্যক্তির মুনাফা হয়। আর কী হবে?

আমি বললাম,—কথাটার মানে বুঝিয়ে বলবি একটু?

ছোটোমামা বলল,—লোক মারা গেলে তার আত্মা অশান্ত হয়। পৃথিবীর মায়া কাটাতে না পেরে পৃথিবীর হাওয়ায় থেকে যায়, আর তার পুরোনো পরিবেশে ফিরে ফিরে আসে।

মানে ভয় দেখায়?

ছোটোমামা বলল,—কে বলল ভয় দেখায়? অশান্ত আত্মা অশান্তিতে ভোগে, ছটফট করে, হয়তো দু—একটা কাচের গেলাস ভাঙে, বা বই ছোড়ে। কিন্তু কাউকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে করে বলে কেউ কোনো প্রমাণ এ যাবৎ দেখাতে পারেনি।

আমি বললাম,—এত সব কথা তুই জানলি কেমন করে?

ছোটোমামা বলল,—আমি রাঙাদার কাছে শুনেছি। রাঙাদা তো কলকাতার কলেজে পড়ে, সে অনেক কিছু জানে।

আমি বললাম, শোন ছোটোমামা, আজ বিকেল বেলায় আমরা দুজনে সোজা চলে যাই রতনদিয়া। সাড়ে তিন মাইল পথ, ঘণ্টা দেড়েক হাঁটলেই পৌঁছে যাব।

—কেন?

আমি বললাম,—কী হবে ঝামেলার মধ্যে থেকে। ভূতুড়ে কাণ্ড আমার একেবারেই বরদাস্ত হয় না।

ছোটোমামা এ কথায় বলল, তুই একটা কাপুরুষ।

আমি বললাম,—ঠিক বলেছিস। আমি কাপুরুষ। তুই না যাস, আমি একাই যাব।

ছোটোমামা বলল,—এতবড়ো একটা অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ ছেড়ে দিবি?

আমি ম্লান হাসলাম।

ছোটোমামা বলল,—তুই সেবার বললি না, আফ্রিকায় গিয়ে হাতি গন্ডার শিকার করবি?

আমি বললাম, নিশ্চয়—আফ্রিকায় গিয়ে আমি হাতি গন্ডার শিকার তো করবই। কিন্তু ভূত? না বাবা, ওতে আমাকে পাবে না।

ছোটোমামা বলল,—ঠিক আছে, তুই চলে যা। তারপর আমরা যখন হরিদাস কাকার সঙ্গে কথা বলব, পরকালের কথা জেনে নেব, তখন বলিস না—ইস, ইস তোরা লাকি! জানিস তো, হরিদাস কাকা গল্প বলেন চমৎকার!

—কিন্তু ভূত তো উনি। যখন বেঁচে ছিলেন তখন হয়তো চমৎকার গল্প বলতেন, কিন্তু এখন ভূত হয়ে কীরকম গল্প বলবেন কে জানে?

ছোটোমামা বলল,—আমার মনে হয় তিনি বলবেন অদ্ভুত গল্প! বলে ছোটোমামা হি হি করে হাসতে লাগল। আর আমার গায়ে কীরকম শিহরণ খেলে গেল। এরপর হয়তো কাঁপতে শুরু করতাম প্রবল বেগে, কিন্তু ঠিক সেই সময় বড়োমামার ডাক শুনতে পেলাম— ওরে তোরা খাবি আয়, কোথায় গেলি?

চানও করা হয়নি। অন্য কোনোদিন হলে চান না করলে মামাবাড়িতে খাওয়া শক্ত ছিল। কিন্তু সেদিন কেউ খেয়ালই করল না।

খাওয়াটাও একেবারে নমো নমো করে সারা হল। বড়ো বড়ো গলদা চিংড়ির মালাই, সরু চালের ঘি—ভাত আর পুকুর থেকে ধরা বড়ো বড়ো কই মাছের সরষের বাটা দেওয়া ঝোল থাকলেও, মনটা কীরকম উদাস হয়েই রইল। খাওয়ার দিকে নজরই দিতে পারলাম না।

তারপর রাত্রেও ঘুম এল না। আমি আর ছোটোমামা এক খাটে শুয়েছিলাম লেপ গায়ে দিয়ে। সে রাত্তিরটা ছিল খুবই ঠান্ডা। অথচ কয়েক মিনিট পরেই মনে হল খুব যেন গরম লাগছে, আর গা—টাও ঘেমে যাচ্ছে। মনটাকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি না। বিকেলবেলা বাড়িতে চলে গেলেই আজ ভালো হত—কিন্তু একা ফিরবার কথা ভাবতেই কীরকম ভয় করছিল আমার। আর ছোটোমামাও এমন দুষ্টু যে, সে আমার সঙ্গে যেতেই রাজি হল না। সে বলল,—ভীরু, তুই একাই যা—না। —বলে কীরকম ইয়ারকির ভঙ্গিতে হেসেছিল। অথচ এটাও তো ঠিক যে ছোটোমামাও দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল! কিন্তু সে দুষ্টুমি করে, বোধহয় আমার ভয় পাওয়া দেখে মজা পাওয়ার জন্যই, আমার সঙ্গে গেল না।

পরদিন ট্রেন রাত দশটায়। আমরা একদল গিয়েছি পাংশা স্টেশনে। যদিও আমাদের স্টেশনে যাওয়ার ব্যাপারে পই পই করে বারণ করা হয়েছিল। আর ভয় পেলেও, আমিও কৌতূহলের জন্যই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।

স্টেশনে ট্রেন ঠিক সময়ে থামতেই দাদামশাই নেমে পড়লেন ট্রেন থেকে। তারপর ছুটতে লাগলেন ট্রেনের শেষ দিকে। সেখানে একটা মালগাড়ি থেকে নামানো হল বিরাট একটা কাঠের বাক্স। সঙ্গে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। দাদামশাই বললেন,—এই বাক্সটা যেন যত্ন করে নিয়ে যাওয়া হয়।

অবশ্য নিয়ে যাওয়ার কোনো ভাবনা ছিল না, কেননা বড়োমামা এবং মেজোমামা দশজন লোক এ জন্য সংগ্রহ করেই রেখেছিলেন। তারা বড়ো কয়েকটা বাঁশ এনেছিল সঙ্গে। সেই বাঁশগুলি পাশাপাশি আর কয়েকটা ছোটো বাঁশ আড়াআড়ি রেখে, দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধতেই সেটা বেশ শক্ত মাচার মতো হল, তার ওপর সকলে মিলে ধরাধরি করে বাক্সটিকে বসানো হল। ওই বাক্সটিকে আনার জন্য যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারা তো আর জানে না ওই বাক্সে কী আছে, তারা জানলে আর তাদের দিয়ে ওই বাক্স টানানো যেত না। যাই হোক, বাক্স নিয়ে আমরা নির্বিঘ্নেই রওনা দিলাম। কেবল দেখলাম, মেজোমামা বন্দুকে গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নিল। আর বড়ো মামা দাদামশাই—এর সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কী বলল, সেটা ভালো করে বোঝা গেল না অবশ্য। তারপর আমরা প্রায় জনা কুড়ি লোক বাড়ির দিকে রওনা হলাম। দুজন দুটো লণ্ঠন নিয়ে সামনে সামনে চলল পথ দেখিয়ে। তারপর বাক্সটিকে বাঁশের মাচার ওপর রাখা—সেই অবস্থায় জনা দশেক বয়ে নিয়ে চলেছে, যেন বিসর্জনের জন্য প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাক্সের কাছেই দাদামশাই রয়েছেন। তার পেছনে আবার দুজনের হাতে লণ্ঠন। মেজোমামা বন্দুক হাতে চলেছে লণ্ঠনধারীদের ঠিক পেছন পেছন, আর বাকিরা সব পেছন পেছন চলেছি। কেবল আমার হাতে রয়েছে একটা বড়ো টর্চ, সেটা আমাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু জ্বালাবার জন্য নয়, কেবল বইবার জন্যে।

রাত্তিরটা বেশ অন্ধকার। অমাবস্যাই মনে হয়। তবে পরিষ্কার আকাশ। তা থেকে কোটি কোটি নক্ষত্রের ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে। তাতে সবটা একেবারে অন্ধকার ঢেকে যায়নি। শীত। মনে উত্তেজনা। আমরা ব্যাপারটা জানি বলে ভয় ভয় করছে। ঠান্ডায় আর ভয়ে কাঁপছি। মিনিট কয়েক এইভাবে চলেছি। হঠাৎ সামনে দাদামশাই—এর আওয়াজ পেলাম,—কই, সঙ্গে মাছ—টাছ আনিসনি কিছু?

—মাছ?—বড়োমামা বললেন,—মাছ আনব কেন?

দাদামশায় বললেন,—হরিদাসের খিদে পেয়েছে। এখুনি মাছ দরকার!

যারা কাঠের বাক্সটা বইছিল তারা এ কথায় কেমন হকচকিয়ে গেল। তা ছাড়া হরিদাসকাকার কথাও হয়তো তাদের কানে গিয়েছিল। তারা বাক্সটিকে মাটিতে নামিয়ে বলল,—এর মধ্যে কী আছে? আর আপনি কার সঙ্গে কথা কইছেন? বাক্সটা এত ভারী বা কেন? ভেতরে কে আছে?

বুঝলাম, বেয়ারাদের মনেও সন্দেহ এবং ভয় দুই—ই ঢুকেছে।

দাদামশাই বললেন,—ও কিছু না। তোরা চল, তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালা।

লোকেরা বেশ ভয়ে ভয়েই আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু এক মিনিট যেতে না যেতেই তারা আবার বাক্স নামিয়ে বলল,—উঃ কী ভারী! ক্রমশই যেন বাক্সটা বেশি ভারী হয়ে উঠেছে!

মেজোমামা বলল, ওটা কেবল তোদের মনের ভুল। ক্লান্ত হয়ে পড়ছিস কিনা, তাই আরও ভারী ঠেকছে। নে তোল, তাড়াতাড়ি পা চালা।

আবার তারা বাক্সটিকে নিয়ে চলতে শুরু করল। কিন্তু এবারে কয়েক সেকেন্ড চলতেই তারা বাক্সটিকে আবার নামিয়ে ফেলল।

দাদামশাই চুপি চুপি মেজোমামাকে বললেন,—মাছ। একটু কাঁচা পেলেই ঠিক হয়ে যেত। এই এক মুশকিল এদের নিয়ে, যত খিদে পাবে তত তাদের ওজন বাড়বে। কিছু মাছ আমার সঙ্গে আনা উচিত ছিল। ট্রেন লেট করল, নইলে এতক্ষণ বাড়িতেই পৌঁছে যেতাম।

এরপর আর বেয়ারারা বাক্সটিকে অনেক চেষ্টা করেও তুলতে পারল না। দাদামশাই বললেন,—একটু মাছ কেউ জোগাড় করতে পার না তোমরা? কাঁচা মাছ?

বেয়ারারা কিন্তু ইতিমধ্যে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে, একটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার চলছে যা তাদের মাথায় ঢুকছে না ঠিকমতো। আবার এই অস্বাভাবিক অবস্থা, কাঁচা মাছের খোঁজ—দাদামশায়ের বাক্সের সঙ্গে কথাবার্তা বলায়, ওরা যেন কিছু আঁচও করছে।

তারা বুঝতে পারছে, তারা যে মাল বহন করে নিয়ে চলেছে তাতে নির্জীব কেউ নেই, আবার এটাও বুঝতে পারছে, তার মধ্যে সজীবও কারুর থাকার কথা নয়। বাক্স কখনো এত ভারী হয়? বিশেষ করে যে বাক্স তারা কয়েক মিনিট আগেই অনায়াসে বয়ে আনতে পারছিল, সে বাক্স হঠাৎ এমন আচমকা ভারী হয় কেমন করে?

বেয়ারাদের যে প্রধান, সে বলল,—বাবু আমাদের রেহাই দিন। এ মাল বইবার সাধ্যি আমাদের নেই।

দাদামশাই হুংকার দিয়ে বললেন—তোদের গায়ে জোর নেই,—অ্যাঁ, একদম জোর নেই? দাঁড়া, আমি তোদের সঙ্গে কাঁধ দিচ্ছি, আয় ধর সব।

সকলে মিলে চেষ্টা করল আবার। মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি মাত্র উঠল বাক্সটা—কিন্তু তারপরই ফেলে দিতে হল। একজন বেয়ারা বলল,—উই বাপ! এর মধ্যে লুহার হাতি ঢুকছে!—লুহার হাতি ঢুকছে! অর্থাৎ কিনা লোহার হাতি ঢুকেছে। কথাটা শুনে ভয়ের মধ্যেও আমাদের কীরকম হাসি পেয়ে গেল।

মেজোমামা বলল, এবারে সকলে মিলে চেষ্টা করা যাক। তখন বেয়ারা দশ জন ছাড়াও, বাকি সবাই চেষ্টা করলাম ওঠাতে। এবারে অবশ্য ওঠানো গেল এবং আমরা এবারে খুব তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম। এবার যেন আমরা উড়ে চলেছি, মুহূর্তে পার হয়ে যাচ্ছি অনেকটা পথ। এইভাবে বোধহয় দু—মিনিট কিংবা তিন

মিনিট গেল—এবারে এসে পড়লাম চন্দনা নদীর কাছে। আর বেশিদূর নয়। চন্দনা নদী পার হলেই আমাদের গন্তব্য স্থান।

নদীর ধারে আমরা বাক্সটিকে নামালাম। রেল—ব্রিজের ওপর দিয়ে নদী পার হব—এ নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, তখন একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ মাচার ওপরকার বাক্সটা গড়াতে লাগল নিজে নিজেই! আর সেটা প্রচণ্ড আওয়াজ করে গিয়ে পড়ল চন্দনা নদীর জলে। আবছা অন্ধকারেও জলোচ্ছ্বাস দেখা আর একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল বাক্সটা। আমি টর্চটা জ্বেলে দেখলাম, বাক্সটির চিহ্ন মাত্রও দেখা যাচ্ছে না। একেবারেই জলে তলিয়ে গেল?

কিন্তু আমরা দেখলাম, যে মাচার ওপর বাক্সটা রাখা ছিল সে মাচাটা বেশ শক্ত সমতল জমির ওপর রয়েছে। আরও একটা জিনিস দেখে আমরা অবাক হলাম, সেটা হল মাচার সঙ্গে যে দড়ি দিয়ে বাক্সটা বাঁধা ছিল, সে দড়িটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে রয়েছে—যেন একটা প্রকাণ্ড শক্তিশালী রাক্ষস তার ধারালো দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে রেখেছে।

দাদামশাই দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তারপর অনেকক্ষণ পর বললেন,—হরিদাসটা বড়োই অধৈর্য! বোধহয় নদীতে মাছ দেখে তার আর তর সয়নি! যাক, কী আর করা যাবে? সব বাড়ি চল, কাল এসে খুঁজেটুজে দেখা যাবে বাক্সটা।

সে রাত্তিরে আমরা বাড়িতে ফিরলাম বটে, কিন্তু সমস্ত রাত একেবারেই ঘুম এল না। পরদিন ভোর হতে না হতেই আমরা সব নদীর ধারে গেলাম। দাদামশাই দু—চারজন পাকা সাঁতারুকে জলে নামালেন ওই ঠান্ডার মধ্যেই, কিন্তু তারা অনেক খুঁজেও বাক্সটাকে পেল না।

বড়োমামা বলল,—বাঁচা গেল।

মেজোমামা বলল, —বাঁচা গেল।

আর আমরা? আমরাও সকলে তাই বললাম।

কিন্তু দাদামশাই বললেন,—মাছের লোভে হরিদাস জলে ডুবে ম'লো।

কিন্তু তা কি সম্ভব? হরিদাস তো আগেই মারা গেছে। কেউ কেউ কি দ্বিতীয়বার মরে? আর যদি বাক্সে হরিদাসের ভূতই ছিল, তাহলে ভূতের আবার মৃত্যু কি সম্ভব?

কে জানে! তবে আমরা এরপর আর চন্দনা নদীতে চান করতে যাইনি। যদি,—মানে, ধর হরিদাসকাকা যদি—যাক সব কথা স্পষ্ট করে বলা যায় না, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কী বলতে চাই? এ গল্প এতদিন বলিনি কেন, সেটা আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, এতদিন কথাটা মনে করতেই ভয় হত। তবে সেদিন ছোটোমামার সঙ্গে দেখা—এখন ছোটোমামারও আমার মতোই অনেক বয়েস। ছোটোমামাকে বললাম,—এখনও ওই কথা মনে পড়লে ভয় হয়।

ছোটোমামা বলল,—আর ভয় নেই রে! কতদিন হয়ে গেল না? তারপর জায়গাটা তো আর ভারতবর্ষে নেই, কবে পাকিস্তান হয়ে গিয়েছে, তারপর হল বাংলাদেশ। হরিদাসকাকাকে আসতে হলে চেক—পোস্ট পার হয়ে আসতে হবে না? সে বড়ো হাঙ্গামা। তা ছাড়া, উনি ঠিকানাও জানেন না তো!

ছোটোমামার ওই ভরসা পেয়েই আমি আজ লিখতে পারলাম।

আলো—আঁধারির গল্প

সুবর্ণ বসু

শ্যামবাজার বলতেই আজকাল তোমরা বোঝো, আলো ঝলমলে পাঁচমাথার মোড় আর টানটান ল্যাজওয়ালা একখানা ঘোড়ার পিঠে বসা নেতাজির স্ট্যাচু। কিন্তু যে শ্যামবাজারে আমার জন্ম, যে শ্যামবাজারে আমার ছোটবেলাসহ জীবনের প্রথম বিশবছর কাটানো, সেই শ্যামবাজার এরকম ছিল না। সে শ্যামবাজার আজ থেকে আরও সিকিশতক পুরনো। সেই শ্যামবাজারে পাঁচমাথার মোড় থেকে আর জি কর হাসপাতালের দিকে মুখ করে মিনিটদুয়েক হেঁটে এলেই শোনা যেত ভারি অদ্ভুত এক বাজনা। একটি রোগামতো কালো লোক চার্টার্ড ব্যাঙ্কের সামনের সিঁড়িতে বসে বিক্রি করত নানারকম পোকামাকড়ের ওষুধ আর হাতে একটা গোলাকার ডাবলি নিয়ে বাজাত অদ্ভুত সুর। সেই বাজনাই ছিল তার পথচারীদের আকৃষ্ট করার কৌশল। সেখান থেকে বাঁদিকে ঘুরে গেলেই পড়ত ভবনাথ সেন স্ট্রিট, পাল স্ট্রিট, বল্লভ স্ট্রিট নামের সরু—সরু আধো—আলো আধো—অন্ধকার রাস্তা। রাস্তাগুলোর দু—ধারে ছিল পুরনো—পুরনো সব বাড়ি।

প্রায়ান্ধকার বল্লভ স্ট্রিটের শেষ মাথায়, যেখানে রাস্তার আলোটা তেরচাভাবে এসে এক—আধখানা বাড়ির উপর আলো ফেলত, সেখানেই ছিল আমাদের বাড়ি। বাড়ির বারান্দা থেকে দেখা যেত উলটোদিকেই রয়েছে ভগ্নপ্রায় প্রাসাদের মতো বিশাল বল্লভবাড়ি। বল্লভদের নামেই রাস্তার নাম। কলকাতার আদিযুগের বিশাল ধনী বল্লভরা সেখানে আর কেউ থাকত না সেভাবে। বেশি অংশেই বাড়িটা পোড়ো, কোনো কোনো অংশ গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হত। বাড়ির সামনের ঝোপঝাড় পেরিয়ে আমাদের বাড়ির ঠিক মুখোমুখিই ছিল পঞ্চানন মজুমদারের কাঠগোলা। সন্ধের পর কালো কাঠের তৈরি বিশাল কাঠগোলাটাও কেমন ভৌতিক চেহারা নিত। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখতে পেতাম বল্লভ স্ট্রিটের সামনের রাস্তাটা পেরোলেই বয়ে যাচ্ছে বিশাল খাল, তার পাড়ে গিজগিজে বস্তি। ময়লা, ছেঁড়া জামাকাপড় পরা কালো—কালো বাচ্চা ছেলেপুলেরা খেলে বেড়াত সারাদিন। তাদের পরিবারের পুরুষরা কেউ বাজারে মাছ বেচে, কেউ ঠেলা বা সাইকেল ভ্যান চালায়, কেউ বা জোগাড়ের কাজ করে। পরিবারের মেয়েরা ঠিকে ঝির কাজ করে বাড়ি—বাড়ি। মোটামুটি এই ছিল আমাদের সেই সময়ের পাড়ার চেহারা।

দু—যুগেরও বেশি আগের সেই সময়টা আলাদা ছিল অনেকটাই। তখন লোডশেডিং হত প্রায়ই, কেবল ফল্ট হলে তো অনেক সময় সারারাতও কেটেছে আলো—পাখাহীন। লোডশেডিং হলে আমাদের পাড়া হয়ে উঠত আরও রহস্যময়। সামনের দিকের দেড়খানা বাড়ির উপর এসে পড়া তেরচা সোডিয়ামের আলো বাদ দিলে বাকি পাড়া ডুবে যেত নিঝুম অন্ধকারে।

বাড়ির মধ্যে লোডশেডিং হলেই বেরোত কাচ ঢাকা কেরোসিনের লম্ফ আর মোমবাতি। বড়ো ঘরে আর দাওয়ায় জ্বলত দুটো বড়ো লম্ফ, বাকি সব ঘরে মোমবাতি। সেই আলো—আঁধারিতে ঠাম্মার খাটে চাদরমুড়ি দিয়ে ঝুব্বুস হয়ে বসে ভূতের গল্প শুনতাম আমি, আমার দাদা, দিদিভাই। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা ছিল, কেউ যাওয়া—আসা করুক—না—করুক, সিঁড়িতেও দেওয়া হত ছোট্ট একটা লম্ফ। আমরা ছোটোরা কারণ জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যাওয়া হত। বুঝতাম সিঁড়িতে কিছু রহস্য আছে। ছুটির দুপুরগুলোয় সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি আর আমার দাদা সিঁড়িতে খেলতাম, কিন্তু বিশেষ করে শনি—মঙ্গল বারেই আমাদের দুপুরে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। সিঁড়িতে খেলতে দেওয়া হত না। ঠাম্মা ছিলেন খুব চাপা স্বভাবের, প্রচণ্ড ধার্মিক, কড়া ধাতের মানুষ। অনেকদিন জিজ্ঞেস করায় একদিন গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'সিঁড়িতে অন্ধকারে একটা

বাচ্চা ছেলে খেলা করত, কেউ কাছে গেলেই বাতাসে মিলিয়ে যেত। রোজা ডেকে তাকে বেঁধে রাখতে হয়েছে... তবু ওই সিঁড়িতে শনি—মঙ্গলবার কেউ পড়ে গেলেই তার জ্বর আসে, সহজে ছাড়তে চায় না...' আমরা আর ও বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করিনি।

তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। আমাদের বাড়িতে কাজ করত মলিনা বলে একটি মাঝবয়সি বউ। আমাদের পাড়ার আরও দু—পাঁচটা বাড়িতে কাজ করত ও। থাকত খালধারের ঝুপড়িতে। আমরা বলতাম মলিনাদি। তাকে নিয়েই আমাদের পাড়া উত্তাল হয়ে উঠল সেবার। ওর সমস্যাটা শুরু হয়েছিল অম্বলের ব্যথা আর বুকজ্বালা দিয়ে। আমাদের বাড়ি তিনদিন কাজে এল না ও। ঠাম্মা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্য বউ—ঝিদের থেকে মলিনার খোঁজ নিল। জানা গেল মলিনার বুকে অম্বলের জ্বালা আর কমছে না। ওর বর আর জি করের আউটডোরে নিয়ে গিয়ে মলিনাকে ভালো ডাক্তার দেখিয়ে, বহু ওষুধ খাইয়েছে, কোনো কাজ হচ্ছে না। ঠাম্মা সব শুনলেন। তারপর মলিনা কাজ করতে এল। তখন ঠাম্মা বাইরের ঘরে বসেছিলেন। আমরা এদিক—ওদিক খেলছিলাম... দেখলাম মলিনাদি কেমন চোরের মতো ঢুকল। ঠাম্মা ওর শরীরস্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন। মলিনাদি মাটির দিকে তাকিয়ে সব উত্তর দিচ্ছিল আর বেশ ছটফট করছিল, যেন ঠাম্মার সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। ঠাম্মা খুব তীক্ষ্ন চোখে দেখছিলেন মলিনাদিকে। সারাদিনই যেন ওর হাবভাব আমাদের কেমন চোখে লাগছিল। বাসন মাজতে—মাজতে সেদিন আবার ভাঙা—ভাঙা গলায় গানও গাইছিল মলিনাদি। আগে কখনো মলিনাদিকে আমরা গান গাইতে শুনিনি। সেদিন সন্ধেবেলায় সেজোজেঠু বাজার করে টাটকা তেলাপিয়া মাছ এনে একটা বড়ো কাঁসিতে ঢেলে রেখে রান্নাঘরের বাইরের কলে বসে ধুচ্ছিল। রাত্তিরে রান্না হবে। রান্নাঘরের ভিতরে মাজা বাসন জল ঝরিয়ে তাকে গুছিয়ে রাখছিল মলিনাদি। মাছগুলো ধুয়ে ছাড়ানোর জন্য জেঠু বঁটি আনতে উঠেছিল। বঁটি নিয়ে এসেই চিৎকার, 'এ কী ষোলোটা মাছ ছিল, দুটো কমে গেল কী করে?' মলিনাদি অমনই পাশ থেকে 'ওই হুলো বেড়ালটা এখান দিয়ে ছাদের দিকে উঠেছিল সেজদা...' বলেই দৌড়ে ছাদে উঠে গেল।

আমরা সবাই এসে জড়ো হলাম ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখে। খানিক পরে দুটো মাছের দেহের মাঝখানের কাঁটা হাতে নিয়ে নেমে এসে বলল, 'হুলোটা খেয়ে গেছে সেজদাবাবু...'

সবার পিছনে যে ঠাম্মা এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ খেয়াল করেনি। খেয়াল হল তাঁর গলা শুনে।

'এইটুকু সময়ের মধ্যে দুটো মাছ খেয়ে ফেলল! আর তুইই বা কাঁটাদুটো হাতে করে আনলি কেন? তোর মুখে কী লেগে রে মলিনা?' ঠাম্মার গলা রীতিমতো থমথমে। মলিনাদি চট করে মুখ লুকিয়ে সরসর করে আমাদের পাশ দিয়ে নেমে চলে গেল।

'তোর বুকের জ্বালা কমেছে... হ্যাঁ রে মলিনা?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঠাম্মা। চলে যেতে—যেতেই মলিনা বলল, 'না... আছে একটু...'

'ও জ্বালা আর কমবেও না... হ্যাঁ রে... তোরা কেউ মলিনার বরকে চিনিস? একবার ডাকিস তো... বলবি আমি ডেকেছি...' বলতে—বলতে ঘরে ঢুকে গেলেন ঠাম্মা। ততক্ষণে মলিনা চলে গেছে।

মলিনাদির বরের নাম ফটিক। সে পরদিন সকালেই এসে দেখা করে ঠাম্মার সঙ্গে। ঠাম্মা বলে, 'ফটিক, তোর বউয়ের বুকের জ্বালাটার কী খবর?'

'কমেনি আজ্ঞে... আজ তিনদিন হাসপাতালের ওষুধ খেল, কাজ হয়নি, হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলেছে বিকেলবেলা নিয়ে যেতে, না কমলে ইঞ্জেকশন দেবে...'

'আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে ফটিক, বিকেলে হাসপাতালে নিয়ে যাস, কিন্তু তারপর বাগবাজারের রেললাইনের ধারের হারুকে চিনিস? বাজারে মাছ বেচে? ওর বউ মতিকে আমার নাম করে একবার ডেকে আনতে পারবি? তোর বউটার হাওয়া—বাতাস লেগেছে মনে হচ্ছে।'

'পারব বড়মা।'

'তোর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে মলিনাকে বলার দরকার নেই।'

'আচ্ছা...'

সেদিন হাসপাতাল থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যাওয়ায় হারু মাছওয়ালার বউকে আর ডাকতে যাওয়া হল না ফটিকের। তবে পরদিন ঠিকই কাজ করতে এল মলিনা। সারাদিন কাজকম্ম করল। সন্ধে নামার পর আমি খেলে ফিরে একটা নতুন রবারের বল নিয়ে ড্রপ খাওয়াচ্ছিলাম। ঠাম্মা ঘরে ঘরে ধূপ দেখাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই ধমকে বললেন, 'অ্যাই! ভরসন্ধেয় খেলে বেড়াচ্ছিস কেন? পড়াশোনা নেই?'

'এই তো ঠাম্মা যাচ্ছি...' বলেই বলটা পকেটে পুরে ফেললাম আমি।

'দাঁড়া... অমাবস্যা পড়ে গেছে... জেঠিমার ঘরে বোস, একা ঘুরিস না।

আমি মেজোজেঠিমার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। মেজোজেঠিমা কী একটা বই পড়ছিলেন। বললেন, 'আয় বোস...'

সারা বিকেল সাঁতার কেটে, খেলে এসে আমার খুব ক্লান্তি লাগছিল। আমি মেজোজেঠিমার ঘরে ঢোকার আগেই কলতলায় গিয়ে হাতে—মুখে জল দিয়ে এলুম। তারপর শুয়ে পড়লাম মেজোজেঠিমার খাটে। ভরসন্ধেয় শুতে দেখলে ঠাম্মা ফের বকত। কিন্তু এ ঘরে ধূপ দেখানো হয়ে গেছে। চট করে আর আসবে না। আশপাশের বাড়িতে শাঁখ বাজছে। ধূপ—ধুনোর মিষ্টি গন্ধে চোখ জুড়ে এল আমার।

সেই আধো তন্দ্রার মধ্যেই যে কখন একটা অন্যরকমের কড়া অথচ মিষ্টি গন্ধ আমাকে ঘুম থেকে আচ্ছন্নতার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল টেরই পেলাম না। তন্দ্রা ভাঙল ঠাম্মার বাজখাঁই চিৎকারে, 'অ্যা—আ—ই অলুক্ষুণে মেয়েছেলে... সরে যা বলছি...'

ধড়মড় করে উঠে দেখি খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আমার ওপর মুখ ঝুঁকিয়ে রয়েছে মলিনাদি। মুখে অদ্ভুত এক হাসি, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, ঠোঁটের কষে লালা। আমি আঁতকে উঠলাম। যেন চেনা মলিনাদির মুখ এটা নয়। এ যেন অন্য কেউ।

ঠাম্মা ততক্ষণে ঘরে ঢুকে এসে খপ করে চুলের মুঠি ধরেছে মলিনাদির, 'বেরো বলছি, বেরো... সর্বনাশ করবার তাল বের করছি আটকুঁড়ির বেটির...'

মলিনাদি চুল সামলাতে—সামলাতে ঘর থেকে বেরিয়ে দে ছুট। ঠাম্মা বারান্দায় চিৎকার করতে লাগল, 'ওরে কে আছিস, এখুনি ফটিক হারামজাদাকে বাগবাজারে পাঠা... নইলে আর রক্ষে নেই...'

আমাকে একা রেখে যাওয়ার জন্য মুণ্ডুপাত হল মেজোজেঠিমার। মেজোজেঠিমা আমতা—আমতা করে বললেন, 'বড়দি ডাকল শুনলাম, বড়দির ঘরে গিয়ে শুনি কেউ ডাকেনি, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেই এই কাণ্ড...'

ঠাম্মা গজগজ করতে লাগলেন।

ঘণ্টাখানেক পরই ফটিকের চিৎকার শুনে ফের বারান্দায় গেল ঠাম্মা, 'ও বড়মা, মলিনাকে সামলানো যাচ্ছে নে, গান গাইছে, গাছে উঠছে, আরও কী—কী সব করছে... আমি বাগবাজারে চললুম...'

খানিক পরেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছিল আমার। ঠাম্মা আমার মাথায় হাত রেখে বসেছিল অনেকক্ষণ। ঠাম্মার ধবধবে কাচা কাপড়ের গন্ধ, জর্দাপানের গন্ধ, হাতের ধূপধুনো, ফুল—বেলপাতার গন্ধ নিতে—নিতে ফের ঘুম এসে গেল আমার। স্বপ্নে দেখলাম বিরাট এক কালো নিথর ঠান্ডা দিঘি। আমার সমস্ত উত্তাপ যেন নেমে যেতে লাগল ঘুমের মধ্যেই।

পরদিন ভোরে উঠে দেখি জ্বর নেই। শুনলাম কাল রাতে আমার কাছে গোটা বাড়ির লোকজনকে বসিয়ে রেখে ফটিক আর সেই হারু মেছোর বউকে নিয়ে ঠাম্মা গেছিল মলিনাদিদের ঝুপড়িতে। সেই গল্প বাড়ির—পাড়ার সকলের মুখে—মুখে...

সেইসময় মলিনাদির ঘরে মলিনাদি ঘুমিয়ে ছিল। বাগবাজারের মতি এবং ফটিককে নিয়ে ঠাম্মা ঢুকতেও কোনো পরিবর্তন হল না মলিনাদির। মতি বলল, 'কিছু বুঝতে পারছি না তো, ও তো শান্তই আছে বেশ...'

ঠাম্মা বলল, 'তোমাকে দেখে ও ভান করছে... একবার ওর গায়ে হাত দাও না বউ!'

মতি ঘুমন্ত মলিনাদির দিকে হাত বাড়িয়েছে সবে, এমন সময় এক বিকট জান্তব চিৎকার করে উঠে বসে মলিনাদি। হাঁ করে কামড়াতে আসে মতিকে।

চমকে পিছিয়ে এসে মতি, তারপর বলে, 'বুঝেছি.... আমাকে একটু জল এনে দাও তো কেউ।'

তারপর সেই জল পড়ে পড়ে ছিটিয়ে দেয় মতি আর আর্তনাদ করতে শুরু করে মলিনাদি। মতি জিজ্ঞেস করে, 'কে তুই?'

'আমার নাম দিয়েছ তোমরা যে নাম বলব? আমার নাম নেই!' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে মলিনাদি। মতি অবাক হয়ে যায়। তারপর কী ভেবে ফটিককে বলে, 'নাম রাখার আগে কোনো বাচ্চা মারা গেছে কিছুদিনের মধ্যে তোমাদের আশপাশে?'

জানা গেল, কয়েক ঝুপড়ি পরেই নমিতা নামে একজন মৃত বাচ্চা প্রসব করেছিল। নমিতার শরীরের অবস্থাও খুব খারাপ হওয়ায় বাচ্চাটিকে না ভাসিয়েই নমিতাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মৃত শিশুটিকে রাতে কাপড় জড়িয়ে কোনো এক গাছের তলায় রাখা হয়েছিল দিনের আলো ফোটার অপেক্ষায়। ঘটনাচক্রে খালধারের ঢাল বরাবর যে গাছের তলায় শিশুটিকে রাখা হয়েছিল, সেই গাছটির পাশেই মলিনা প্রাকৃতিক কর্ম সারে। তারপর থেকেই বিপত্তি।

মতি আর কিছু করে না। বলে, 'আজ ওকে চোখে—চোখে রাখো, অমাবস্যা থাকতে আমি কিছু করব না। তা ছাড়া আমার বাড়িতেও ছেলেপুলে আছে, বাড়ি বেঁধে আসা হয়নি। আমি কাল আসব। আজ কেউ একে চোখের আড়াল কোরো না। রাত্তিরে বাইরে যাওয়ার দরকার হলেও সঙ্গে যেন কেউ থাকে, সকলে সজাগ থেকো...'

সে রাতে আর কিছু হল না। সারা সকাল আমাদের পাড়ায় একটা আলোচনা, কী হবে সন্ধেবেলা? সারাদিন আমরা উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটালাম। সে বড়ো আলোছায়ার সময়। এখন চারদিকে এত বেশি আলো যে, ছায়ারা কোথায় হারিয়ে গেছে। ভারসাম্যের অভাব বড্ড। ছায়া নেই বলে রহস্যও নেই। রহস্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসটাও যেন ফিকে হয়ে আসছে আস্তে—আস্তে। আমরা ভুলে গেছি, সজাগ থাকার জন্য মাঝে মাঝে অন্ধকারটুকুরও বড্ড দরকার হয়।

সেদিন দিনের বেলা থেকেই পাড়ার পরিবেশ থমথমে। গড়িয়ে—গড়িয়ে দিনটা কাটার পরই যেন হঠাৎ সন্ধে নামল ঝুপ করে। যথাসময়ে দেখলাম ফটিক আর গুণিনবউ মতি আমাদের পাড়া দিয়ে যাচ্ছে মলিনাদির ঝুপড়ির দিকে। বেশ ছোটোখাটো ভিড় জমে গেছে চারদিকে। মতি ধমকে সবাইকে সরে যেতে বলল। তারপর ওদের ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। ঠাম্মাও আমাদের সবাইকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিল। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মলিনাদির কান—ফাটানো চিৎকার ভেসে এসে রক্ত জল করে দিচ্ছিল আমাদের। আমি ভয়ে জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম ঠাম্মাকে। মনে হয়েছিল ফের জ্বর এসে যাবে।

পরদিন লোকের মুখে শুনলাম মতির মন্তর আর সর্ষেপড়ায় ভূত পালিয়েছে। ঘণ্টাখানেকের প্রবল দড়িটানাটানির শেষে হার মানে মলিনাদি। জলভরতি কাঁসার ঘটি দাঁতে করে রাস্তা পার হয়েই নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। মতি বলেছে, আর ভয় নেই।

কতবছর হয়ে গেল তারপর। শ্যামবাজারের বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে এলাম পূর্ব কলকাতায়। আজও যেন চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই সেই আলো—আঁধারি সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে যাচ্ছে মলিনাদি, নির্জনতার সুযোগে ঝুঁকে পড়ছে ঘুমন্ত আমার মুখের ওপর, ঠাম্মার চিৎকারে আঁতকে জেগে উঠছি আমি। ভাবি, ঠাম্মা না থাকলে কী হত সেদিন! মলিনাদির বুকের জ্বালা কমত না কোনোদিন, বড়ো কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে

পারত আমাদেরও। ধবধবে সাদা থান পরা ঠাম্মার ছবি চোখে ভেসে উঠলেই মনে হয় ঠাম্মার শরীর ছিল আলো দিয়ে গড়া, তিনি অন্ধকার থেকে আমাদের বাঁচাতে পারতেন। এখন সেরকম আলোর মানুষ আর নেই। চোখ—ধাঁধানো বহু কৃত্রিম আলোর জৌলুসে সমস্ত রহস্য নিয়ে হারিয়ে গেছে আমার সেই আলো—আঁধারির ছোটোবেলা।

ভূতবাবার মেলায়

জয়দীপ চক্রবর্তী

বারুইপুর থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর ডাবল লাইন পাতার কাজ শুরু হয়েছে বটে, তবু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে—কাজ শেষ হচ্ছে এই পথে যাতায়াতের মেহনতি ও সমস্যার অন্ত নেই। সিঙ্গল লাইন বলে মাঝে মাঝেই ক্রসিং—এর জন্যে হাপিত্যেশ করে অপেক্ষায় থাকতে হয় অসহায়ের মতোই। তা ছাড়া কোনো কারণে একটা ট্রেন মিস হয়ে গেলেই বসে থাকো ঝাড়া একটি ঘণ্টা।

মাঝখানে আর ট্রেন নেই। এমনকী সড়ক পথেও যে কলকাতার দিকে ফিরে আসবে সে সুযোগও নেই বললেই চলে। আমি অভিজিৎকে পই পই করে বলেছিলাম মথুরাপুর স্টেশন থেকে অন্তত ছ—টার ট্রেনটা ধরার চেষ্টা করতে। তা ছ—টার ট্রেনটা তো ধরা গেলই না, এমনকী সাতটার ট্রেনটাও ছেড়ে গেল একটুর জন্যে। অবশ্য অভিজিৎকেই বা দোষ দিই কী করে! দীর্ঘদিন পরে এসেছে দেশের বাড়িতে, নিজের গ্রামে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা সহজে ছাড়বে ক্যানো? অগত্যা উঠছি উঠব করতে করতে বিকেল গড়িয়ে গেল। তারপর কাশীনগর থেকে মথুরাপুর স্টেশনও কম রাস্তা নয়। অবশেষে মথুরাপুর থেকে যখন শিয়ালদহগামী ট্রেনে চেপে বসলাম তখন হাতঘড়িতে আটটা বেজে পাঁচ। এ সময়ে কলকাতার দিকে যাবার গাড়িতে ভিড়—ভাড়াক্কা থাকে না। যত ভিড় সব ফিরতি ট্রেনে। আমাদের কামরাতেও তাই হাতেগোনা কয়েকজনই মাত্র যাত্রী। জানলা—টানলা দেখে জুত করে বসে অভিজিৎ বলল, 'এমন কিছু রাত্তির হয়নি কী বলিস?' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে আমি বললাম, 'ঠিকই। তবে এসব দিকে ট্রেনের গণ্ডগোল হলে ফেরার বিকল্প পথ নেই বলেই চিন্তা হয়—'

'যাকগে! এই তো ফাঁকা গাড়ি পেয়ে গেলাম। দশটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব সব ঠিকঠাক চললে—'

আমি লম্বা করে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলাম মাথার ওপর দু—হাত তুলে! তারপর আলসে গলায় বললাম, 'সব ঠিকঠাক চললে—'

অভিজিৎ হাসল। বলল, 'বাদ দে। বল আমার গ্রামের বাড়ি তোর ক্যামন লাগল?'

'খুব ভালো। ইনফ্যাক্ট যেকোনো গ্রাম দেখতেই খুব ভালো লাগে আমার। পুকুরঘাট, মাঠ, চাষের জমি, খোড়ো চালের মাটির বাড়ি—ফ্যানটাসটিক, মনে হয় যেন হাতে আঁকা কোনো ছবি—' আমি বললাম।

'কিন্তু সন্ধেবেলা যখন নিকষ অন্ধকার সব ল্যান্ডস্কেপ ঢেকে দেবে—বিজলি বাতি জ্বলবে না—শেয়াল ডাকবে বাঁশবনের আড়াল থেকে?'

'তখন জোনাক জ্বলবে থোকায় থোকায়। বাঁশবাগানের মাথার ওপর পেতলের থালার মতন মস্ত চাঁদ উঠবে আকাশ আলো করে—' বেশ কাব্য করে বললাম আমি।

'কিন্তু ধর যদি চাঁদটাঁদ না—উঠে বাঁশবাগানের আড়াল—আবডাল থেকে উঁকি—ঝুঁকি মারতে শুরু করে তেনাদের কেউ কেউ?'

'তেনাদের কেউ কেউ মানে?' অবাক গলায় জিজ্ঞেস করি আমি।

'তেনাদের কথা জানিস না?'

'উঁহু—'

'এই রাতে নাম নেব?' মুচকি হেসে বলল অভিজিৎ, 'আমাদের গ্রামে অন্ধকার নামলে কেউ তাদের নাম করে না। তাও আজকে আবার শনিবার—'

'ভূতের কথা বলছিস—' হা হা করে হেসে উঠি আমি, 'তুই আবার আজকাল ভূতবিশ্বাসী হয়ে উঠছিস নাকি?'

'আমি বিশ্বাসী না—অবিশ্বাসী সেইটা আজ পর্যন্ত ভালো করে বোঝাই হল না। তবে ছোটোবেলায় ভূতের ভয় পেতাম খুব—'

আলোচনা ক্রমশ জমে উঠল। অভিজিতের গ্রামে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা ভূত—প্রেতের মুখোমুখি হয়েছেন বিভিন্ন ভাবে, সেই সব অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উঠে আসতে লাগল এক এক করে। রাতের ট্রেন একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে হুড়মুড় করে। লোকজনের ওঠানামা বড়ো একটা নেই। অতএব গল্পের পরিবেশও জমজমাট। অভিজিৎ জমিয়েও দিয়েছে খুব। হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বাইরে আবছা আলোয় মোড়া একটা নির্জন রেলস্টেশন। জানলা দিয়ে বাইরে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নিয়ে অভিজিৎ বলল, 'কৃষ্ণমোহন হল্ট। আর একটা স্টেশনের পরেই বারুইপুর।'

আমি আশ্বস্ত হয়ে বললাম, 'যাক তাহলে তো এসেই পড়লাম প্রায়। আধঘণ্টার মধ্যেই সোনারপুরে নেমে পড়া যাবে।'

অভিজিৎও মাথা নাড়ল। আমি ওঁর হাঁটুতে চাপড় মেরে বললাম, 'সবই ভালো লাগল তোর দেশের বাড়ি বেড়াতে এসে। শুধু একটাই অপূর্ণতা রয়ে গেল—'

'কী?' অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল।

'গ্রামে—গঞ্জে কাটালাম সারাদিন, একটা ভূতটুত যদি চোখে পড়ত তো ষোলোকলা পূর্ণ হয়ে যেত। ছোটোবেলা থেকে কত গল্প শুনলাম, অথচ আজ পর্যন্ত তাঁদের একজনের সঙ্গেও দেখা করার সৌভাগ্য হল না। খুব আশা ছিল এবারে তোদের গ্রামে গিয়ে অন্তত—'

'আহা তা থাকলে কতক্ষণ বলো? অন্তত দু—একটা রাত তো কাটাতে হবে—' আমার কথার মাঝখানেই প্রতিবাদ করে উঠে অভিজিৎ।

আমি হেসে বললাম, 'রাত না—কাটাই দুপুর তো কাটালাম। সেই ছড়াটা মনে নেই, ঠিক দুপুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা—'

অভিজিৎ আমার কথার উত্তর দিল না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার বল তো, ট্রেনটা তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল দাঁড়িয়ে আছে। ছাড়ছে না ক্যানো। এখানে এ সময়ে তো সিগন্যালের সমস্যা হওয়ার কথা নয়—'

কথার মধ্যে খেয়ালই করিনি এতক্ষণ। অভিজিতের কথার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ট্রেনটা কৃষ্ণমোহন হল্ট স্টেশনেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে।

'কী ব্যাপার বল তো, ট্রেনটা ছাড়ছে না ক্যানো?' একরাশ বিরক্তির সঙ্গে বলি আমি।

'ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে—' অভিজিৎ নয়, আমাদের উলটোদিকের জানলার পাশে বসা একটা লোক বলে উঠল মিহি গলায়। আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে কখন যে লোকটা কামরায় উঠে নিঃশব্দে বসে পড়েছে ওদিকে খেয়ালই করিনি। লোকটা আবার বলল, 'ট্রেন কখন ছাড়বে তার ঠিকঠিকানা নেই আর—'

'ক্যানো বলুন দেখি—' চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করি আমি।

'কাটা পড়েছে।'

'সে কি—এই ট্রেনে?'

'উঁহু, আগের ট্রেনে—'

'কোথায়?'

'কৃষ্ণমোহন আর শাসন স্টেশনের মাঝখানে—'

'তারপর?'

'তারপর আর কী—বিস্তির লোক জুটেছে। হইচই চলছে। বডি না—সরলে ট্রেন চলবে না—'

'কী করে কাটা পড়ল?'

লোকটা এ প্রশ্নে জুলজুল করে আমাদের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর আবার বলতে লাগল, 'কী করে বলি বলুন! অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে, আবার সুইসাইডও হতে পারে! আসলে জায়গাটা তো সরেস। মৃত্যু এখানে মানুষকে আয় আয় করে ডাকে সর্বক্ষণ—'

'মানে?' চোখ গোল গোল করে জিজ্ঞেস করে উঠল অভিজিৎ।

'আশ্চর্য ব্যাপার মশাই,' লোকটা বলে চলল, খুন—দুর্ঘটনা—আত্মহত্যা মিশিয়ে ফি—বছর দু—তিনটে লোক অন্তত এখানে কাটা পড়বেই।'

'বলেন কী?'

'তা না—হলে আর বলছি কী। জায়গাটা একেবারে বিষিয়ে আছে মশাই— বাতাস ভারি হয়ে আছে সর্বক্ষণ—'

'বুঝলাম না ঠিক—'

'বুঝলেন না?'

'উঁহু।' দু—দিকে মাথা নাড়লাম আমি।

'অশরীরী আত্মাদের একেবারে আখড়া হয়ে আছে জায়গাটা—'

'বলেন কী?' অবাক হয়ে গিয়ে বলে অভিজিৎ।

'এলকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যেত। নেহাত ভূতবাবা চোখ রাখছেন সর্বক্ষণ—'

'ভূতবাবাটি আবার কে? কোনো বাবাজি—টাবাজি নাকি?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করি আমি।

'আজ্ঞে না, উনি আসলে শিব। ভূতেদের জয় করেছেন বলে এখানে উনি ভূতনাথ। গ্রামের লোক ভালোবেসে ভূতবাবা বলে ডাকে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু এগোলেই তো ওনার মন্দির—'

'আপনি এতসব জানলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করে অভিজিৎ।

'আমি তো এখানেই থাকি। অধমের নাম নিবারণ দাস।'

ভূতবাবার ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল আমার। আমি বললাম, 'ভূতবাবার ব্যাপারে কী যেন বলছিলেন—'

নিবারণ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কামরার ভেতরটায় ক্যামন বদ্ধ বদ্ধ ভাব একটা। চলুন প্ল্যাটফর্মে নেমে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করা যাক—'

অভিজিৎ কিন্তু কিন্তু করছিল। আমি বললাম, 'নামা যাকই না। সিগন্যাল সবুজ হলে উঠে পড়লেই হল—'

নিবারণ আবারও বলল, 'ট্রেন এখন ছাড়বে না—'

আমরা কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম।

নিবারণ আবার বলতে শুরু করল, এই মন্দির প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো। আর বাবাও খুব জাগ্রত। মন্দিরের সামনে মস্ত শ্যাওড়া গাছটায় এখনও দূর—দূরান্ত থেকে লোক এসে ঢিল বেঁধে মানত করে। আর বাবাও তাদের ভূতপ্রেতের হাত থেকে রক্ষা করেন।

অভিজিৎ খুব মন দিয়ে শুনছিল সব। নিবারণ থামতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'ভূত—প্রেত কি সত্যিই এ অঞ্চলে আছে বলে মনে হয় আপনার?'

'আমার মনে হওয়াটা তো বড়ো কথা নয় বাবু,' নিবারণ হাসল, এখানকার প্রায় সব মানুষজনই বিশ্বাস করেন যে তেনারা আছেন—'

'মাঝেমধ্যে দেখা যায় তাঁদের?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তা যায় বই কী বাবু। কতলোকই তো তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ পায়।

তবে ভূতবাবার কৃপায় এঁরা খুবই শান্ত আর নির্বিবাদী। মানুষের ক্ষতি চিন্তা করেন না কখনো—'

'একদিন তাহলে তো দেখতে এলে হয়—আমি হালকাভাবে বললাম।

'আজ যাবেন?' নিবারণ উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

'আজ?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বলে উঠলাম আমি।

'আজ এখানে ভূতবাবার মেলা বসেছে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে—আবডালে মৃদু আলোর লণ্ঠন জ্বালিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা—' নিবারণ বলতে শুরু করল।

'এই রাত্তিরবেলা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে অভিজিৎ।

'আজ্ঞে রাতেরই মেলা এটা,' নিবারণ বলে, 'শুনেছি মানুষের দেহ ধরে তেনারাও নাকি আসেন এ মেলায়। দোকানি সেজে দোকান দেন, কখনো ক্রেতা সাজেন—'

'যাঃ—' নিবারণের কথার মাঝখানেই অবিশ্বাসী কণ্ঠে বলে উঠি আমি।

'চলুন না, যাবেন? এই কাছেই তো—ওখান থেকে বারুইপুর যাওয়ার ভ্যানট্যানও পেয়ে যেতে পারেন। আপনাদের বাড়ি ফেরার সুবিধা হয়ে যাবে। ট্রেনের ওপর তো আর ভরসা নেই, কখন চলে না—চলে—' নিবারণ উৎসাহের সঙ্গে বলে। অভিজিতের এ প্রস্তাবে একেবারেই সায় ছিল না। একে রাত বাড়ছে, তা ছাড়া একদম অচেনা একটা লোকের সঙ্গে এরকম হুট করে—আমার কিন্তু ক্যামন যেন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়ে বসল। প্রায় জোরই করে বসলাম অভিজিতের ওপর। ওকে বোঝালাম যে দশ—বিশ মিনিট মেলায় ঘুরে সত্যিই যদি বারুইপুর দিয়ে বাড়ি ফিরি তাহলে অসুবিধা হবার কথা নয়। সময়ও খুব বেশি নষ্ট হবে বলে মনে হয় না। অভিজিত নিমরাজি হয়ে হাঁটতে শুরু করল আমাদের সঙ্গে।

মেলাটা অদ্ভুত। বিজলি বাতি নেই, লোকজনের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি নেই। সব ক্যামন যেন নিস্তব্ধ নিঃঝুম। ঝুপসি অন্ধকারে জংলি ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে দু—চারটে দোকান। দোকানের আলো এত কম যে দোকানির মুখ পর্যন্ত দেখা যায় না ভালো করে। দু—চারজন মাত্র খরিদ্দার থমথমে গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ দোকান থেকে ও দোকানে। এমন ফিসফিস করে কথা বলছে সবাই যে পাশে দাঁড়িয়েও ভালো করে শোনা যাবে কিনা সন্দেহ।

একটা অদ্ভুত ঠান্ডা বাতাস এসে লাগছে আমাদের গায়ে। সেই হাওয়ায় শিরশির করে উঠছে গা। দোকানিরা অদ্ভুত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সে তাকানোয় কোনো আহ্বান নেই। ক্যানো কে জানে ভয়ানক অস্বস্তি হতে লাগল আমার। বুঝতে পারলাম বেশ ভয় পেয়ে গেছি আমি। অভিজিৎও আমার হাত ধরে আলতো টান দিল। চাপা গলায় বলল, 'গতিক ভালো ঠেকছে নারে একটুও। চল পালাই।'

নিবারণ একটু তফাতে ছিল। আমাদের দিকে ফিরল হঠাৎ। হাসল ফিকফিক করে। জিজ্ঞেস করল, 'ভয় পেলেন নাকি?'

আমার অস্বস্তি বাড়ল। নিবারণ আমাদের মনের কথা টের পেল কী করে! আমরা কোনো উত্তর দেবার আগেই একটা বুড়োমতো রোগা লোক এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। আমাদের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে তাকাল নিবারণের দিকে। দাঁত বের করে হাসল খানিক। তারপর নিবারণের থুতনি ধরে আদর করে বলল, 'আজই আসা হল মনে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ছোট্ট জবাব দিল নিবারণ।

অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না কিছুই। তবু আমার ক্যানো যেন মনে হচ্ছে এখন ঝোপঝাড়ের আশেপাশে বসে থাকা দোকানিরা যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। তাদের চোখ, তাদের চাউনি, তাদের মাথা কিংবা বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যে যেন ভয়ানক রকমের একটা অসংগতি। এই অদ্ভুত গা—ছমছমে অন্ধকারে এরা সবাই প্রাণপণে কিছু একটা যেন ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে আমাদের কাছে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হল। মুহূর্তে ইঙ্গিত এল মস্তিষ্ক থেকে। অভিজিতের হাত ধরে সোজা দৌড়াতে শুরু করলাম রাস্তার দিকে। নিবারণ ডাক দিলে পিছন থেকে। সে ডাক কানে তুললাম না আমরা। বাতাসের মতো মিহি গলায় কারা যেন কলরব তুলল, 'কিছু কিনে যাও, কিছু কিনে যাও—'

পিছন ফিরে সে কলরবের উৎস খোঁজারও সাহস হল না আমাদের। একছুটে বড়োরাস্তায় উঠে ভাগ্যজোরে একটা রিকশাভ্যান পেয়েছিলাম তাই রক্ষে। ভ্যানচালক মাধব দাস ঝড়ের গতিতে এনে দিল বারুইপুরে। ওখান থেকে বাড়ি ফেরার গাড়ি পেতে অসুবিধা হয়নি আর।

পরদিন ঘুম ভাঙতে দেরিই হয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখলাম আটটা মিসডকল হয়েছে অভিজিতের ফোন থেকে। ওকে ফোন করাতে খুব উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাগজটা দেখেছিস?'

বললাম 'ক্যানো?'

ফোনের ওপার থেকে অভিজিৎ বলল, 'দৈনিক বাংলার ছয়ের পাতার বাঁদিকে নীচের দিকে একটা ছোট্ট খবর আছে পড়—'

চায়ের টেবিলের ওপর কাগজটা পড়েছিল। তুলে নিয়ে দেখলাম লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় কৃষ্ণমোহন হল্ট ও শাসন স্টেশনের মাঝে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর খবর। মৃতের নাম নিবারণ চন্দ্র দাস। আশ্চর্যের ব্যাপার, আড়াই বছর আগে ওখানেই ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছিল নিবারণের রিকশাভ্যান চালক দাদা মাধবচন্দ্র দাস।

বিদিশার প্রেমিক

সুস্মেলী দত্ত

এক—আধটা সরলরেখায় বুটি বুটি বিন্দু... ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর তারপর আরও ক্ষুদ্র... এর ভেতরে ছোট্ট একটা গহ্বর, তার ভেতরে আর একটা... আর একটা... বিদিশা এখানেই যেন তলিয়ে যেতে থাকে... তলিয়ে যায়... তলিয়ে যায় ক্রমশ... তারপর ছোট্ট পরমাণু কণার মতো ওর দ্রবীভূত এই শরীরটা আছাড়িপিছাড়ি করতে করতে কখন যে শান্ত স্থির, নিস্পন্দ— আধবোজা চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসে ওর।

আচ্ছা, মরণঘুম নয় কেন? ও নিজে নয় যেন, ওর ভেতর থেকে আর একটা বিদিশা নামের প্রচ্ছায়া ক্রমাগত এই প্রশ্নই তুলে জ্বালাতন করে যাচ্ছে দিনরাত্তির...

দু—চার সপ্তাহ হল বিদিশার এই চরম অস্থিরতা, ছটফটানি লক্ষণীয়। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডা. নন্দী দিন দুয়েক আগেই ওই ব্যাপারে বারবার সাবধান করেছিলেন বিদিশার স্বামী সৌগতকে। ঘুমের ভান করে বিদিশা শুয়েছিল ওর বেডরুমে আর ভালোমানুষের মতো সব শুনছিল... স—ব। ডাক্তার নন্দীর সঙ্গে সৌগতর কথোপকথনের ইতিবৃত্ত তো সেদিন রেকর্ড হয়ে গেছে ওর মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

হিস্টিরিয়া নামক একটা মানসিক অসুস্থতা ছিল বিদিশার মায়ের, ওর দিদিমারও নাকি... এই হিসেবে রোগটা ওর জন্মগত। ইদানীং আবার সিজোফ্রেনিয়ারও কীসব ভয়ানক লক্ষণ ওর মধ্যে ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছে। যেমন ইতিমধ্যেই বিদিশার কথামতো, ও নাকি ওর মৃত বাবা—মাকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে প্রায়শই, এমনকী সময়ও কাটাচ্ছে, কথাবার্তাও বলছে বিস্তর। ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে হ্যালুসিনেশন।

সৌগত তো এসব শুনে ভীষণ রকম টেনসড... কিন্তু বিদিশা মনে মনে হেসেছে আর বলেছে, হুঁ হুঁ বাবা, তোমরা আমাকে যতই পাগল বলো আর যাই বলো, আমি কিন্তু যা,তাই থাকব সারা জীবন! হতে পারি আমি অন্যদের থেকে সামান্য আলাদা... কিন্তু সকলকেই যে পৃথিবীতে একরকম হতে হবে, কে এমন মাথার দিব্যি দিয়েছে? এই তো সেদিন 'তিনি' মানে বিদিশার নতুন প্রেমিকটির সঙ্গে এসব নিয়েই আলোচনা চলছিল।

খুব বেশিদিনের আলাপ নয়, তাই বিদিশা এখনও 'আপনি থেকে তুমি'—তে নামতে পারেনি। চিলেকোঠার ওই ঘরটার মধ্যে বেশ অনেকটা সময় কীভাবে যেন কেটে যায় ওদের... গল্পসল্প, আলাপ—আলোচনা, আড্ডা, আদর আহ্লাদ সব কিছুই, তবুও যেন সম্পর্কটা এখনও অবধি 'আপনি'—তেই আটকে আছে। মনে মনে আজকাল একটা গর্বও অনুভব করে বিদিশা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে নয়, ওর প্রেম রীতিমতো মানুষের ঊর্ধ্বে ওঠা প্রেতাত্মার সঙ্গে... এটাই বা কম কথা কী।

বিদিশার মনে পড়ে, ও যখন বেশ ছোট্টটি, বোধহয় বছর সাতেক কী আটেকের, সে সময়ই হঠাৎ ওর মা—কে নাকি ব্রহ্মদত্যি ধরল। এর আগে দু—তিনবার ব্রহ্মদত্যি নামক বস্তুটার কথা ভূতের গল্পের বইয়ে পড়েছে বটে কিন্তু লোকটা যে আসলে কে, তা জানতে পারল মা—কে ভূতে ধরার পরেই। রাঙা পিসির মুখে শুনেছে, যেসব ব্রাহ্মণ পইতে হবার পর অকালে মারা যায়, তারা নাকি ব্রহ্মদত্যি হয়ে যায়। যেহেতু এদের জাগতিক আশা—আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না, এরা নাকি তক্কে তক্কে থাকে কোনো সুন্দরী বিবাহিতা নারীর সঙ্গে সহবাস করার সুযোগের অপেক্ষায়। স্বামী—স্ত্রীর মতো বেশ কিছুদিন সহবাস করতে পারলেই নাকি কেল্লা ফতে। ওদের আত্মার চির মুক্তিলাভ ঘটবে। তবে 'কয়েক দিন'—টা কয়েক বছরও হতে পারে, আবার কয়েক যুগ হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিদিশার মা নাকি ব্রাহ্মণ ভূতের কবলে ছিল প্রায় চোদ্দো

বছর। এই চোদ্দো বছর বিদিশা মায়ের কাছে ঘেঁষতে পর্যন্ত পারেনি। প্রথম প্রথম ভীষণ অভিমান হত মায়ের ওপর কিন্তু তারপর সবই গা—সওয়া হয়ে গেছে। বোধহয় যৌথ পরিবারে ঠাকুরমা, পিসি, কাকি, ফুলজেঠি...এরকম অনেকের সঙ্গে ওকে মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। এইভাবে আট বছরের সেই ছোট্ট খুকিটি যে কখন বাইশ বছরের যুবতীতে পরিণত হল, তা কেউ—ই জানে না। এমনকী বিদিশা নিজেও এখনও ভেবে উঠতে পারে না ওর শৈশব, কৈশোর আর ভরা যৌবনের সন্ধিক্ষণটা কীভাবে কেটেছিল। তারপর হঠাৎ মায়ের আত্মহত্যা, বাবার অ্যাকসিডেন্ট... এরকম ঘটনাই পরপর ঘটেছে ওর জীবনে।

সবে তখন ও পাস গ্র্যাজুয়েশনের গন্ডি পার হয়েছে, সামনে অনার্স—এর প্রস্তুতি। পরপর দুটো ঘটনায় পড়াশোনা দূরে থাক, মন রীতিমতো বিধ্বস্ত। সেই সময়ই বাড়ির শুভানুধ্যায়ীদের অস্বাভাবিক তৎপরতায় বিনা নোটিসে মাত্র দিন দশেকের কথায় ওকে গছিয়ে দেওয়া হল সৌগত নামক এক সহজ সরল সাধারণ ছেলের কাস্টডিতে। ছেলে শান্ত স্বভাবের, ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি করে এইমাত্র। এর বেশি বিদিশা বিশেষ কিছু ওর সম্বন্ধে জানতে পারেনি। এমনকী ছবি ছাড়া চোখের দেখারও অনুমতি মেলেনি ঠাকুরমার আদেশে। বিদিশা তখন অসহায়, অনাথ। বাড়ির লোকের পছন্দের হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল ওদের দাম্পত্যকে। সৌগত মানুষটা খারাপ নয়, কিন্তু বিদিশার বিশেষ অপছন্দের জায়গা ছিল ওদের বাড়ির পরিবেশ। আধা মফস্সলি এলাকায় দোকানপাট থেকে রাস্তাঘাট সব কিছুই অনুন্নত। এমনকী বাড়ির আশেপাশের লোকজনেরাও যেন কীরকম গ্রাম্য স্বভাবের। সৌগতর বাবা নেই, অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। মা আর ছেলের ছোট্ট সংসার। তবে বাড়িতে এসি নেই, রেফ্রিজারেটর নেই, হোম থিয়েটার নেই... এরকম অনেক অভাব। ওদের বাড়ির সদস্যেরা ভেবেছিলেন যে এমন বাপ—মায়ের মেয়ে যতই ডানাকাটা সুন্দরী হোক না কেন, বিয়ে দেবার পরে দায়মুক্ত হতেই ওরা বিদিশাকে ঠেলে দেয় এই অতল গহ্বরে। এই অতল গহ্বরের স্বপ্ন ও বিয়ের পর থেকে প্রায়শই দেখত। প্রথম প্রথম স্বামীর সঙ্গে ওর অনুভূতিগুলো ও শেয়ার করতে চাইত কিন্তু সারাদিন খাটুনির পর ট্রেন জার্নি করে বাড়ি এসে সৌগত—র এসব ভালো লাগত না শুনতে। ওর প্রধান আকর্ষণ ছিল বিদিশার শরীর, সেটাই নাড়াচাড়া করতে করতে তলিয়ে যেত ঘুমের অতলে। আর বিদিশা জানলার গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে কত রাত যে কাটাত অনিদ্রায়, তার হিসেবনিকেশ নেই। সকাল হতে—না—হতেই যত রাগ পড়ত ওই বুড়ি শাশুড়ির ওপর। মনে হত, ওই মানুষটাই বুঝি বিদিশার জন্মশত্রু... বুড়িটা মারা যাবার আগের দিন পর্যন্ত ওঁকে কী মুখই না করেছে বিদিশা। অথচ শান্তশিষ্ট মানুষটি সেদিন পর্যন্ত টুঁ শব্দটি করেনি, চুপচাপ সয়ে গেছেন দেমাকী বড়োলোক বউমার অত্যাচার। পাখি আর সোমের নয়নের মণি ছিলেন উনি। দুই নাতি—নাতনিকে যে কীভাবে আগলে রেখেছিলেন এতদিন! ওরাও তো ঠাকুমা আর বাবা বলতে অজ্ঞান। মা তো ছোটোবেলা থেকেই দূরের মানুষ। এটাও বিদিশার রাগের কারণ। ওর মনে হয়, এসবই যেন বিরাট এক ষড়যন্ত্র। একটা চক্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ও, যার থেকে বেরোবার উপায় নেই।

সত্যিই বিদিশার মধ্যে এতটাই খামতি? মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, বউমা হিসেবে ও কি অসফল? একেক সময় একলা থাকলেই এসব ভাবনাগুলো ভিড় করে আসে মনের মধ্যে কিন্তু পরক্ষণেই নিজের মন থেকে এসব ঝেড়ে ফেলে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা তাকে নিয়ে। হোক না পরকীয়া, এ তো বিদিশার এখন বেঁচে থাকার একমাত্র রসদ বটে। ছেলেমেয়েদের ঠাকুমা মারা যাবার পর একরকম জোর করেই সৌগত কলকাতা থেকে ও অনেক দূরে কোথাও একটা বোর্ডিং—এ পড়াশুনোর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে ছেলেমেয়েকে আর নিজেও তো আদ্দেকদিন বাড়ি ফেরে না রাতে। কিন্তু বিদিশা কী নিয়ে থাকবে সারাদিন? সৌগতকে প্রশ্ন করলে বলে, আজ এই আছে, কাল ওই আছে। বাইশ বছরের পুরনো বউকে কতবার মিথ্যে অজুহাত দিয়ে কোথায় কোথায় যেন ঘুরতে চলে যায়। আর বিদিশা? সেই বিয়ের পরদিন থেকেই রাতে জানলার গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে আকাশ দেখার প্রবণতা তার আজও তো তেমনি আছে, কিছুই বদলায়নি। না, না, ভুল ভাবছে

সে। একটু—আধটু অদলবদল হয়েছে বই কী, যেমন সন্ধে ছ—টা বাজলেই ওর চিলেকোঠার ওই ছোট্ট ঘরটায় চলে যাওয়া। তারপর সারারাত সেখানে কাটিয়ে সকালবেলা নীচে আসা... সাতটা নাগাদ।

বিয়ের পর থেকেই। এই চিলেকোঠার ছোট্ট ঘরটি বিদিশাকে বড়ো টানত। কারণে অকারণে ওখানে বসে থাকত প্রায়শই। ঘরে না আছে পাখা না আছে আলো... রাতের বেলায় তো ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। একটা মাত্র চৌকি তাইতে একটা আধময়লা চাদর, আর পাখির ছেলেবেলার ছোট্ট তুলোর বালিশ। বিদিশা নিজে হাতেই এখন রোজ ঘরটা পরিষ্কার করে আর 'উনি' আসার আগে টানটান করে পেতে দেয় ফুলকাটা চাদর। একপাশে মেঝেতে রাখা শাশুড়ির বিয়েতে পাওয়া পুরনো টিনের ট্রাঙ্কটার ওপরে বিদিশার নতুন সংসারের টুকিটাকি। যেমন, পাউডার, চিরুনি, হাত আয়না, কসমেটিক, তোয়ালে আর নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী। বিদিশার উনি নাকি ভীষণ সাজগোজ করা পছন্দ করেন, তাই বিদিশা সব সময়েই আজকাল সেজেগুজে থাকে। সৌগত তো প্রায়দিনই বাড়ির বাইরে থাকে, ঠিক কাজের লোক সকালে কাজ করে যাবার পর দুপুর থেকে রাত্তির অবধি বিদিশার নিশ্ছিদ্র অবসর।

আজ নাকি ওঁর ইচ্ছে, ওদের ফুলশয্যা হবে। ওঁর কথামতো বিদিশাও সেজেছে কনে বউ—এর মতো। আজ থেকে বাইশ বছর আগে সৌগত—র সঙ্গে ওর দাম্পত্যের শুরুটা কীভাবে হয়েছিল? ভাবতে চেষ্টা করে বিদিশা। না, অনেক করেও মনে করতে পারল না। আর সত্যি বলতে কী, ও আর কিছুই আজ মনে করতে রাজি নয়। ও শুধু আজ নিজেদের কথা ভাবতে চায়... নিজেদের ভবিষ্যতের কথা, ভালোবাসার কথা।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে ছ—টা বাজল। যথারীতি সৌগত ওষুধটা খাওয়ার কথা ফোন করে মনে করিয়ে দিয়েছে। খুব কেয়ারিং বটে... মনে মনে হাসল বিদিশা। 'উনি' বলেছেন ওষুধ একদম না খেতে ... বিদিশা আজ একটা নয়, পুরো শিশিটাই জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল আবর্জনায়। মনে মনে আজ বেশ গর্ব অনুভব করছে বিদিশা। হ্যাঁ আজই তো সে শরীর মন সবটুকু সমর্পণ করবে 'তাঁর' কাছে। ব্রহ্মদত্যি বলে কথা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহবাস তো কোন ছার। বিদিশার বাবা মা—ও কাল রাতে ওদের এই ভাবনার স্বীকৃতি দিয়েছে। মুহূর্তে বিদিশার বুকের ভিতরটা যেন কীরকম গুড়গুড় করে উঠল। কিন্তু ওর বাবা—মা বা প্রেমিক সকলেই তো ক্ষণিকের অতিথি। ভোরের আলো ফুটতে—না—ফুটতেই তো যে যার মতো। এই ফুলশয্যার পরিণামই বা কী? কেই—ই বা হিড়হিড় করে টানতে টানতে ওকে সর্বসমক্ষে সমাজের সামনে নিয়ে যাবে আর চেঁচিয়ে বলবে যে, আমি বিদিশাকে ভালোবাসি, ওর সঙ্গে আমার ফুলশয্যা হয়েছে?

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে ওর। বাস্তবে যদি এটাই সম্ভব হত, তাই—ই হত। ওই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, যারা সৌগত—র স্ত্রী—ভাগ্য নিয়ে হা—হুতাশ করে আর মিথ্যে সমবেদনা দেখায়, আড়ালে বিদিশাকে ছুঁতে পাওয়া নিয়ে হাসাহাসি করে বা কটূক্তি করে, তাদের উপযুক্ত জবাব দিতে পারত ও।

এসব নিয়েই আজ কথা বলতে হবে 'ওঁর' সঙ্গে। চিলেকোঠায় টিনের ট্রাঙ্কের ওপর রাখা হাত—আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল বিদিশা। কে বলবে, সে এখন চল্লিশোর্ধ্ব দিব্যি সুন্দরী... শুধু উলটোপালটা কিছু ওষুধ খাবার জন্য চোখটা গর্তে ঢুকে গেছে। আর তার চারপাশ ঘিরে কালো ছায়া। চেহারাটাও বেশ জম্পেশ তবে পেটটা যেন অস্বাভাবিক বড়ো হয়ে গেছে।

এইমাত্র 'উনি' আসবেন, ভাবতে ভাবতে চোখদুটো ভিজে উঠল, জিভটা শুকিয়ে এল... এ সবই তো সহবাসের পূর্বলক্ষণ। তবে কি আজই? ...

আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাল, সঙ্গে বাজের শব্দ... থতমত কনে বউ—এর হাত থেকে আয়নাটা মাটিতে পড়ে চুরমার। দমকা হাওয়ায় এক অদ্ভুত শিহরন। কী যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি বিদিশাকে ঘরে টিকতে দিল না, ও বেরিয়ে এল চিলেকোঠার ঘর থেকে ছাদে... ওপরে আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে যেন নববধূকে আশীর্বাদ করতে লাগল।

কোথায় আপনি? কোথায় তুমি? এসো ... আমাকে গ্রহণ করো...। তুমুল বর্ষণে সেই ডাক প্রতিধ্বনিত হল আকাশে বাতাসে... বহুদূর.. দূরান্ত পর্যন্ত।

মহাকালের অমোঘ নিয়মে, সেই মেয়েরাই ভিজতে পারে যারা সম্পূর্ণ হয়, যারা সম্পূর্ণ হতে চলেছে।

জোছনার আড়ালে

অমিতকুমার বিশ্বাস

কিডা? কিডা ওইহানে?

না—তো, কেউ নেই!

মনের ভুল? হতেই পারে। এরকম তো আকছারই হয়। এই গদ্যগ্রামের সুবিশাল বাঁশবনে এমন তো মনে হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ করে সন্ধের পর—পর।

ঝিঁঝির তীব্র থেকে তীব্রতর ক্রন্দনে ফালাফাল হতে থাকে বাঁশবনে চুঁইয়ে পড়া জোছনার নীল শরীর। আলো—আঁধারির ছায়াছবি নির্জন বনপ্রান্তরে। হাতে টর্চও নেই আজ, থাকলে প্রশ্নের উত্তর ঠিক পেয়ে যেত মাধো।

মাধো, এ—পাড়াগাঁয়েরই ছেলে। রূপমতীর ওপর বাঁশের সাঁকো পার হলেই এই বিস্তীর্ণ বাঁশবন, ওপাশে ওঁদের বাড়ি।

গাঁয়ের নাম মালিপোতা। সেই সকালবেলা কাজে বেরোয় আর ফেরে সন্ধে পার হলে। দু—একদিন বেশ রাতও হয়। বাবা—মা মাঝে মাঝেই বকাবকি করেন, এট্টু আগে ফিরতি পারিস নে?

মাধো রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে। মালিপোতা থেকে মতীগড়ে যায় সাইকেল চেপে, পাঁচ—ছ মাইল ঠেঙিয়ে। পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে গাঁয়ের সুবোধ ছেলে ছোটে, রোজ।

বয়স এই আঠারো কিংবা উনিশ। এই বাঁশেদের ঘন রাজত্ব তাঁকে পার হতেই হয়। দিনের বেলাতেই কেমন গা ছমছম করে, আর রাতের বেলা তো কোনো কথাই নেই। বিশেষ করে জোছনা রাতে এই ছমছম ভাবটা ক্রমশ বেড়ে যায় যেন।

বাবার কথায় সে কেবল হাসে। বিরক্ত হন তাঁরা, রেগেও যান হয়তো।

দুই

তিলির মাঠে অলিম্পিক সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। হেমন্তের শুরুতে বাঘ, সিংহ, হাতি, ভালুক, জলহস্তী ইত্যাদি আরও নানান ধরনের পশুপাখি নিয়ে ঝোলাগুড় আর পিঠেপায়েসের মতো বেশ জমে উঠেছে জায়গাটা। কচিকাঁচাদের ভিড় খুব, কৌতূহলও। ভিড় কম নেই বড়োদেরও। রীতিমতো উৎসব পড়ে গেছে। তাঁবুর বাইরে সে এক বিশাল মেলা যেন। জেনারেটার চালিয়ে আলোয় আলোয় শরতের প্রতিমার মতো ঝলমল করছে বিদ্যুৎহীন জনপদ। সারাবছর রোদ—ঝড়—বৃষ্টি—ধুলোয় মলিন গ্রামের বধূটি আজ হঠাৎ—ই যেন রূপসী হয়ে উঠেছে।

সার্কাস এখানে এই প্রথম। মতীগড়ে প্রতি বছর না হলেও, মাঝে মাঝেই আসে। এ—মাসটা পুরো কাটিয়ে দলটি ফিরে যাবে কলকাতা।

তিলির মাঠ মাত্র তেরো মিনিটের সাইকেল—পথ পালিপোতা থেকে, সেখানেই সার্কাস। মাধোর খুব ইচ্ছে সেখানে যাবে, সঙ্গে লতিফও। ওঁরা কখনো বাঘ কিংবা সিংহ দেখেনি নিজের চোখে। এবারে সে সুযোগ এল তবে অবশেষে। কথা হল আগামী মঙ্গলবার দু—জনে কাজ থেকে ফিরে এসে সরাসরি মাঠে চলে যাবে নাইট শো—তে।

লতিফ তাঁর সঙ্গেই কাজ করত। মাঝে মাঝেই একটা কথা লতিফ বলত, যা মাধোর কাছে কিছুটা হলেও রহস্যময় ঠেকেছিল,

—হুনকাবড়া, হুনকাবড়া!

লতিফ নাকি বাঁশবনে হুনকাবড়া—কে দেখেছে!

—হেইডা কী?

—জিন!

—জিন?

—হ!

তিন

বোলিদাপুকুর থেকে ভোরে খবর আসে মাধোর ছোটদাদু খুব অসুস্থ। জায়গাটা তো এখান থেকে চোদ্দো—পনেরো মাইল তো হবেই। এখন বাস পাওয়া যাবে না, তাই সাইকেল নিয়েই হন্তদন্ত হয়ে মাধো ছোটে সেখানে। বাবা—মা বেলা হলে বাসে রওনা দেবেন।

মাধোর কাছে ছোটদাদু মানেই এক রোমাঞ্চকর শৈশব। মামাবাড়িতে সে সবথেকে আদর পেয়ে এসেছে এই মানুষটির কাছ থেকেই। মাটির ঘরে থাকা নিঃসন্তান এই মাটির মানুষটি মাধো ও তাঁর মামাতো ভাই পুটলু—কে গোরুর গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে গেছেন চুন্নিখালের বিলে। বিলের এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে চুন্নিখাল। খালটি কিছু দূর গিয়ে মিশেছে রূপমতীর সঙ্গে।

ছোটদাদুর কথায় তাঁদের শৈশবে নাকি চুন্নিখালে খুব শাঁকচুন্নির উৎপাত ছিল। সন্ধ্যার পর খাল থেকে শাঁকচুন্নি উঠে এসে উঁচু কোনো গাছে উঠে উঁকি দিত গৃহস্থের বাড়ি। আর কোনো নববধূকে খোলা চুলে দেখলেই চুল বেয়ে প্রায়ই উঠে আসত বধূটির ঘরে। কিছুদিন সংসারে থাকার পর নানাভাবে ক্ষতি করত সেই পরিবারকে। শেষে শাঁকচুন্নির উৎপাতে বিরক্ত হয়ে পাঁচগাঁয়ের ওঝারা মিলে তাকে গ্রাম থেকে দূরে খালের পাশের শতাব্দী প্রাচীন বটগাছের সঙ্গে মন্ত্রবলে বেঁধে রাখে। সেই থেকে খালের নাম চুন্নিখাল।

বটগাছটা এখনও আছে, দাদুর জমির পাশেই। আকাশের শাখাপ্রশাখা থেকে খসে পড়া অজস্র জারুল ফুলের নীচে দাঁড়িয়ে, শুকিয়ে আসা চুন্নিখালের পাশে দাঁড়িয়ে, বিপুল বিল আর ধানখেতের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত প্রকাণ্ড অপদেবতার মতো বিকেলের সকল রোদ্দুর শুষে নিচ্ছে যেন প্রাচীন বৃক্ষরাজ। তার ঝুলন্ত শেকড়েই হয়তো সেইসব ওঝাদের মন্ত্র লেগে আছে আজও। আজও হয়তো শাঁকচুন্নির হাত—পা সমস্ত শরীর বাঁধা ওই মন্ত্রেই। শিশু মাধো দূরে দাঁড়িয়ে ভাবে আর চোখ বড়ো বড়ো করে হাত নেড়ে তাঁর থেকে কিছু ছোটো পুটলু—কে সাবধান করত, যেন আর কয় পা ওদিকে রাখলেই শাঁখচুন্নির বিষনজরে পড়তে হবে।

সদ্য জমিতে কেটে রাখা পাকা ধান গোরুগাড়িতে বোঝাই করে তার উপর দু—জনকে চড়িয়ে দিয়েছেন ছোটদাদু, আর নিজে গাড়োয়ানের জায়গায় বসে পাঁচন হাতে সারাটা আঁকাবাঁকা পথ চলতে চলতে শুনিয়েছেন এই খালবিলের কত কত আজবসা কিস্যা। দাদুর ছোটোবেলার গল্প। জিন—পরি—ভূতপেতনির গল্প। জলজঙ্গলে ঘেরা এই বিল যেন একসময় ছিল এইসব অশরীরীদের সাম্রাজ্য। ধানের বিশাল গোছার ওপর চড়ে খরখরে শুকনো জমির ওপর গোরুর গাড়ির চাকায় তৈরি হওয়া স্বল্প জীবনের মতো অল্প দিনের রেখাপথ দিয়ে আসবার সময় গাড়িটির তালে তালে তাঁরাও দুলত বেশ, মাঝে মাঝে ভয়ও পেত, এই বুঝি বটগাছ থেকে ছাড়া পেয়ে শাঁকচুন্নি তাঁদের ঘাড়ে চেপে বসে! ভয়ে একজন আর—একজনের হাত চেপে ধরত অজান্তে, তবু গল্পের প্রতি তাঁদের কৌতূহল একটুও কমত তা না যেন। ছোটদাদু বলেই চলতেন, মাঠের মধ্যে গোরুগাড়ির চাকার মতো আঁকাবাঁকা সুরে, রহস্য করে, তোদের ভয় নাই ভাই, শাঁকচুন্নি কহনও পুলাপানরে ধরে নাই।

দাদু দু—একদিনের মধ্যে সুস্থ হতেই ঘরে ফেরে মাধো।

চার

লতিফ সেদিন একাই কাজে যায়। ফেরে বেশ রাতে। ছাদ—ঢালাই ছিল। ঢালাইয়ের পর খুব খাওয়াল বাড়িওয়ালা। ছাদ দিলে গৃহস্থেরা এমন খাওয়ায় এ—দেশে। তাই রাত।

ফেরার সময় নাকি রূপমতীর দিকে কাউকে হেঁটে আসতে দেখেছে লতিফ। হাঁটতে হাঁটতে লোকটা নেমে গেল বুক জলে!

—মাছ চোর?

—আরে না। আমি চিনিনি বুঝি! ওডা ছিল হুনকাবড়া। আব্বার মুখি শুনিচি। চান্দের আলোয় পষ্ট দ্যাকলাম বুক জলে নেমি গেলো!

—ধুত্তোর! গাঞ্জা খাইচিলিস?

—আরে না! আল্লাহ কসম।

এর ক—দিন পর লতিফের ধুম জ্বর। ভয়ে? হতেই পারে।

জ্বর একটু কমলেই সে আবার ছুটল কাজে। মাধোও গেল। আর চলার পথে তাঁর কথার বিষয় একটাই, হুনকাবড়া। এই অবস্থায় কাজে যেতে বারণ করল মাধো, কিন্তু বসে থাকলে অভাব যে বাঘের ভয়ে জিরাফ—মায়ের মতো সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানের পেছনে লাথি মারে কষে!

অসুস্থ বলেই লতিফকে সেদিন নীচের কাজ দেওয়া হয়েছিল। নীচের কাজটা ছিল একটু কম খাটুনির। কিন্তু দুপুরের টিফিন সারার পর হঠাৎ লতিফকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না দেখে সব্বাই এদিক—ওদিক খুঁজতে লাগল। কেউ একজন বলল, তাঁকে রাস্তার পাশে শিরীষ গাছটার নীচে বসে একা—একা হাসতে দেখেছে। তারপর হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে সে। তাঁকে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করতেই দৌড়ে পালিয়ে যায়!

কিন্তু কোথায়?

ঠিক সেই মুহূর্তে নতুন ছাদ থেকে দুম করে নীচে কিছু একটা পড়ার শব্দ!

সবাই সেদিকে ছোটে।

লতিফ!

রক্তাক্ত!

মিস্ত্রিদের রিকশাভ্যানে হাসপাতালে নিয়ে যেতে—না—যেতেই প্রশ্বাস থেমে গেল চিরতরে। দুপ করে মাটির প্রদীপ নিভে গেল মৃদু হাওয়ায়। নিভে যাওয়া প্রদীপের রক্তলেপা মাথাটা মাধোর কোলে। মুখে শেষবারের মতো একটাই অস্পষ্ট আওয়াজ, হুং—ক্যা—ব...!

কেউ না বুঝলেও মাধো বুঝেছিল লতিফের অসমাপ্ত কথাটা!

কথাটা আজও মাধোর কানে বেজে চলেছে। সেদিন রাতেই দুই বন্ধুর সার্কাসে যাবার কথা ছিল। জীবন—মরণের ট্রাপিজ ছেড়ে প্রিয়জনেদের দেশ ছেড়ে সে এখন অনন্ত মৃত্যুর দেশে মৃতদের সঙ্গে অন্য ট্রাপিজে মেতে উঠেছে হয়তো! এক বৈশাখী দমকা হাওয়ায় সুবিশাল আমগাছটা ফুলো আমসহ ভেঙে পড়ে অনিশ্চিত জীবনের উঠোনে! খই ভাজার ঝাঁঝরি থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়া খইয়ের মতো অলক্ষ্যে হারিয়ে যায় লতিফের জীবনপাখি।

ঘটনা বা দুর্ঘটনাটিকে অনেকেই আত্মহত্যা বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু একমাত্র মাধো জানে এ নিছক আত্মহত্যা নয়।

লতিফ চলে যাবার পর মাধোর ভিতরে কিছু পরিবর্তন এসেছে। সে আর আগের মতো রাত করে ফেরে না। সন্ধের আগেই যে করেই হোক ঢুকে যায় ঘরে।

কিন্তু আজ সেতুর মুখে অবনিমাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই চারিদিক কেমন ঘোর হয়ে আসে। আর ফেরার সময় বাঁশবনের আলো—আঁধারির মধ্যে কাকে যেন নদীর দিকে হাঁটতে দেখে মাধোর বুকটা ধড়াস করে ওঠে!

তবে কি...

পাঁচ

পরদিন খুব সকালে উঠেছিল মাধো। কাজে বের হবার আগে সে মালোপাড়ায় এক চক্কর দিয়ে আসে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় দিনুর। দিনু তাঁর পুরোনো বন্ধু। দিনুর বাবা এক সময়ের বড়ো শিকারি। কথায়—কথায় লতিফের প্রসঙ্গ ওঠে। ওঠে হুনকাবড়ার প্রসঙ্গটাও। হুনকাবড়ার কথাটা শুনতেই চমকে ওঠে দিনু, কারণ সে হুনকাবড়ার কথা শুনেছে তাঁর দাদুদের মুখে। দাদুদের সময়ের কেউ কেউ নাকি দেখেছিল। তবে দাদুরা কিংবা তাঁর বাবা, এমনকী সে নিজে কখনো দেখেনি। এখানেই নাকি ঘুরে বেড়ায় এই প্রেতাত্মা। একবার কাউকে দেখা দিলেই ভবলীলা ঘনিয়ে আসে তারা! এমনই তো কথা প্রচলিত এখানে।

দিনুর কথাটা শুনে আঁতকে উঠল মাধো। সে তাহলে কাল রাতে কাকে দেখল? লতিফও কি সেদিন রাতে কিছু দেখেছিল...? তবে কি তাঁরও ভবলীলা ঘনিয়ে এল? বুকের মধ্যে প্রচণ্ড জোরে কী এক ভীষণ বিস্ফোরণ হয়। কীসের...? আর দাঁড়ায় না সেখানে। সোজা বাড়ি ফিরে কাজে ছোটে। সারাটা পথ দুশ্চিন্তার শেকড়বাকড় তাঁকে চেপে ধরে চুন্নিখালের প্রাচীন বটের মতো। ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত শাঁকচুন্নি ছাড়া পেয়ে তাঁকে যেন মাকড়সার মতো জালে বেঁধে খিলখিল করে হাসছে অবিরাম! শুধু সান্ত্বনার মতো ছোটদাদুর কথাটা কানে বাজে, তোদের ভয় নাই ভাই, শাঁকচুন্নি কহনও পুলাপানরে ধরে নাই।

কিন্তু এ তো শাঁকচুন্নি নয়, হুনকাবড়া!

কাজ থেকে বিকেলেই ফেরে সেদিন। বিকেলের রুগণ রোদ্দুরের নীচে বাঁশপাতা—অন্ধকারে দুটো পলাতক শেয়াল ছাড়া তেমন কিছু পড়ে না তাঁর চোখে। ঝিঁঝি ও শেয়াল ডাকে, কাছে—দূরে, আতঙ্কের আবহ ছড়িয়ে। আর আছে রূপমতীর অসংখ্য ব্যাঙেদের ডাক। রোদ্দুরের তেজ কমে এলেই তারা আসর বসায় সারাটা বছর।

এভাবে কয়েকটা দিন কেটে যায়। জীবনের ইরেজার মুছে দেয় মৃতদের! লতিফও মুছে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। এখন তাই মাঝে—মাঝে রাতেও ফেরে মাধো।

ছয়

হঠাৎ খবর রটে যায় মালিপোতায় বাঘ ঢুকেছে। এমনিতে হুনকাবড়ার ভয়ে লোকজনের গা হিম করা অবস্থা। তাঁরা কেউ রাতে নাম নিতে চায় না। নাম নিলেই নাকি সে পিছু ধায়। শেষমেষ পরিণতি ভয়াবহ!

বাঘের খবরে রাতের ঘুম যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও ছুটে পালিয়ে গেল গাঁয়ের লোকজনের। রশিদ আলি, ডালু মণ্ডলের মতো দু—একজন দূর থেকে বাঘটিকে নীলকুঠির দিকে হেঁটে যেতে দেখেছে দুপুরের দিকে। গর্জনও শুনেছে কেউ কেউ। গ্রামের দু—একটি ছাগল নিয়ে গেছে বলেও মোড়লের কাছে অভিযোগ করেছে ইদ্রিশ মণ্ডল। বাঘের পায়ের ছাপও দেখা গেছে রূপমতীর তীরে।

গ্রামে একটা থমথমে পরিবেশ। বাঘের খোঁজ চলল। গ্রামের লোকজন দা—কাঁচি—শাবল—বল্লম—মশাল—লাঠিসোঁটা নিয়ে দলবেঁধে চিরুনি—তল্লাশি চালিয়েও বাঘের টিকি খুঁজে পেল না।

সবাই যে—যার কাজে গেল। কিন্তু রয়ে গেল আতঙ্ক। একদিকে হুনকাবড়া আর অন্যদিকে বাঘ। তাই মাধো—কে এখন সকাল—সকাল খুব সাবধানে ফিরতে হয়। পারলে সঙ্গী নিয়ে। সেতুর মুখে অপেক্ষা করতে হয় কেউ ওইপথে যাবে কিনা।

সেদিন আবার রাত হল মাধোর। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কাউকে না—পেয়ে রাম নাম করতে করতে ফিরছে সে। হঠাৎ বাঁশবনে জোছনার আড়ালে কাউকে দেখতে পেল সে।

...কিডা? কিডা ওইহানে?

লোকটা পালাচ্ছে। মাধো পিছু নিল। চোর না—তো? লোকটা নীলকুঠির কাছে এসেই হারিয়ে গেল। মাধো নীলকুঠির সামনে এসে একা দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একটা বাঘের গর্জন। সম্বিৎ ফিরল তাঁর।

গর্জনটা নীলকুঠি থেকে?

না তাঁর মনেই বেজে উঠল?

কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে। মনে হল পেছনের ঝোপ থেকে আসছে। মাধো দিকবিদিক শূন্য হয়ে দৌড়ে ঢুকল নীলকুঠিতে। ফাঁকা ঘর। ভাঙা ছাদ থেকে চাঁদের আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। একটা বিশালাকার সাপ হেঁটে যাচ্ছে মেঝে বরাবর। সেদিকে নজর যেতেই কেঁপে উঠল মাধো। না না, সাপ না, দড়ি, মোটা দড়ি পড়ে আছে বোধহয়, নইলে তাঁকে গিলে খেত নির্ঘাত!

হঠাৎ দুটো আগুন—চোখ মাধোর সামনে, ক্রমশ এগিয়ে আসছে...

পা—দুটো বরফের মতো শীতল আর নিশ্চল যেন, কোনো সাড় নেই! খুব চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে, কান্না করতেও, মৃত্যুর মুখ দেখে যেমনটা মানুষ শেষবার কেঁদে ওঠে অসহায় শিশুর মতো! কিন্তু চিৎকার বা কান্না সব যেন থমকে আছে কণ্ঠে।

হঠাৎ—ই যেন পায়ে রক্তস্রোত অনুভব করে মাধো। আর এখানে একমুহূর্ত নয়। পিছন দিকে ছোটে। আমবন, বাঁশবন পার হয়ে ছুটছে সে পাগলের মতো। জীবন ছুটছে হাতে মাটির প্রদীপ নিয়ে! পালা পালা মাধো...! পিছু নিয়েছে মৃত্যুদানব, এক্ষুনি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেবে আলো।

সামনে চেনা কাউকে দেখতে পেয়ে ধড়ে প্রাণ আসে মাধোর। ডাকে। কিন্তু কে সে? দিনু? রশিদ? না লতিফ?

লতিফ? লতিফ কেন?

লোকটা উত্তর না দিয়ে ইছামতীর দিকে এগোতে থাকে ক্রমশ। সেও পেছন পেছন ছোটে, নিজের অজান্তেই। নদীর জলে নেমে যায় লোকটা, মাধোও, এক ঘন ঘোরের মধ্যে!

লোকটা বুক জলে। মাধোও হাঁটুজল ছাড়িয়েছে। লোকটা আস্তে আস্তে ডুবে গেল রূপমতীর জলে। আর মাধো...

পেছন থেকে আচমকা কেউ একজন হ্যাঁচকা টান দেয়, আর অমনি মুখ থুবড়ে পাড়ের কাদায় এসে পড়ে মাধো। মাটিতে মুখ গুঁজে গোঙাতে থাকে, অ অ অ অ অ ও ও ও ও...। লালা পড়ে গাল বেয়ে।

সাত

সকালে পুলিশ আর বনদপ্তরের লোকজন ঘোরাফেরা করছে বাঁশবনে। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ।

মাধোর জ্ঞান ফেরে। দিনু বন্দুক হাতে পাশে বসে। বাঘের তল্লাশি চলছে। বাবার বন্দুক হাতে নিয়ে দিনু রাতে বেরিয়েছিল, তাই রক্ষে। রক্ষে বাঘের মুখ থেকেও।

নীলকুঠি ঘিরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কোথায় বাঘ?

কোথাও নেই।

নেই নেই নেই!

আছে কেবল একরাশ আতঙ্ক, হুনকাবড়া আর বাঘের ভ্যাবসা গন্ধ!

ওপাশে

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ বিকেলের আকাশে জমে ওঠা স্লেট রঙের খণ্ড খণ্ড মেঘ চিরে বিদ্যুতের সরু রেখা আড়াআড়ি ঝলসে গেল। হঠাৎই এক অতীন্দ্রিয় ইশারায় শরীর—মনে রোমাঞ্চ খেলে গেল।

এই মেঘ, এই বিদ্যুৎ ছিল আমার ছেলেবেলায়। জ্ঞান হবার পরের কোনো বিকেলে আমি দেখেছিলাম ওই বিদ্যুৎশিখা। আর সেই বিকেলেই আমার ভিতর গর্ভ নিল এক রহস্যময় কৌতূহল।

অলৌকিকতার প্রতি তীব্র অনুসন্ধিৎসা জড়িয়ে আছে আমার ছেলেবেলার দিনগুলোয়। সেদিনের ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশার মতো গাঢ় মেঘ, সেই আঁকাবাঁকা রেখায় ঠিকরে ওঠা নীল বিদ্যুৎ, আমার সমগ্র জীবনকে অমোঘ নিয়তির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

সেদিনের অলৌকিক শিহরন বালক বয়সে মাঝে মাঝেই টের পেতাম। আচমকা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। আর অন্যরকম হাতছানি।

সেই বয়সে আমি ছিলাম নির্জন, লাজুক, আনমনা একটি ছেলে। আমার কোনো বন্ধু ছিল না। কেউ আমার সঙ্গে মিশতেও চাইত না। এক ঘোলাটে অন্যমনস্ক ঘোরের মধ্যেই আমি স্কুলে যেতাম, পড়তে বসতাম অথবা জীবনের স্বাভাবিক কাজগুলো করার চেষ্টা করতাম।

মনে পড়ে, হা হা দুপুরে স্কুলবাড়ির সেই অন্ধ ঘর, চোখের সামনে হিজিবিজি আঁকা ঝাপসা ব্ল্যাকবোর্ড; ক্লাসরুমের জানলা দিয়ে বেলা—বয়ে—যাওয়া গুঁড়ো গুঁড়ো রোদ্দুর মেঝেয় ছিটিয়ে রয়েছে।

অনিলবাবু ভরাট গম্ভীর স্বরে পড়াচ্ছেন, সমস্ত ঘরে আলো—আঁধারি, আর আমি খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন জানলার বাইরে হারিয়ে গেছি। কোনো অচেনা আকর্ষণে পাগলের মতো উড়ে চলেছি।

সে বয়সে আমি বাবা—মা ও অন্যান্য চেনা—পরিজনের কাছে সবসময় গল্প শুনতে চাইতাম। নানারকম অলৌকিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতার গল্প।

আর শুনতে শুনতে নিজেকে সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে ফেলে দিতাম। ভাবতাম এই অভিজ্ঞতাগুলো যদি আমার জীবনে হয়! তারপর মনে মনে হিসেব কষতাম, তখন আমি কী করব! এবং শুরু হত অসহায় প্রতীক্ষা! অজানা কিছু হবার!

এভাবেই এক রহস্যময় তাড়না ভিতরে লালন করে একসময় আমি কৈশোরে পৌঁছলাম। কৈশোরের দিনগুলো ছিল আরও বেদনাময়। কখনো কখনো উন্মাদের মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কিসের এক অদ্ভুত যন্ত্রণা হত।

বিকেলের নরম আলো গায়ে মেখে খেয়াঘাটে গিয়ে বসে থাকতাম। নৌকোগুলো একে একে ছেড়ে যেত। ঘাট থেকে ছেড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ছোটো হতে হতে একসময় গঙ্গার বুকে মিলিয়ে যেত। যতক্ষণ দৃশ্যমান থাকত ঝাপসা অন্ধকার জলে দুলত তার বাঁকাচোরা অদ্ভুত ছায়া।

কোনো একটা নৌকো চলে যাবার পরে আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করতাম ওপার থেকে আবার ফিরে আসার। মনের মধ্যে অচেনা বিস্ময় জাগত। মনে হত সবটাই পারাপারের খেলা।

সেই নিঃসঙ্গ কৈশোরে নানারকম শিরশিরে অনুভূতি হত।

সন্ধের পর একা ঘরে বসে পড়াশুনো করতাম।

ঘরের ভিতর টিউবের ফ্যাকাশে আলো, দরজার বাইরে প্যাসেজটা গাঢ় অন্ধকার, দরজার পর্দাটা অল্প অল্প দুলছে। হঠাৎ আমার কেমন গা—ছমছম করে উঠত। মনে হত, দরজার বাইরে ওই অন্ধকার অংশে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে কাঁপা হাতে পর্দা সরালেই, একটা দ্রুত অপস্রিয়মাণ ছায়া দেখতে পাব।

কখনো রাতে শুয়ে রয়েছি, হঠাৎই শরীরের সমস্ত চেতনা জড়ো হয়ে লাফিয়ে শিয়রের দিকে চলে গেল। আমি প্রবল ইন্দ্রিয়ময় হয়ে উঠলাম। মনে হতে লাগল, নির্ঘাত আমার মাথার পিছনে মশারির আড়ালে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঘাড় ঘোরালেই তাকে দেখতে পাব। বুক ধকধক করত। আমি নিশ্চিত হয়ে যেতাম, কেউ রয়েছে।

কিন্তু না! স্বাভাবিকভাবেই কিছু দেখতে পেতাম না।

শুধুই পর্দার আড়ালের শূন্য মায়া আর অন্ধকার মশারির ফাঁকা অবস্থিতি। আমি হতাশ হয়ে পড়তাম। শুধু ক্ষণে ক্ষণে গা ছমছম করত। কৌতূহলের পারদ চড়চড় করে বেড়ে উঠত।

আগ্রাসী কৌতূহল এবং হতাশা একসঙ্গে মিশে মনের ভিতরে প্রবল যন্ত্রণা হত। ধীরে ধীরে আমার বেঁচে থাকার অর্থ পালটে যাচ্ছিল। অসহনীয় এক যন্ত্রণা আমার অজ্ঞাতসারেই আমাকে আমূল বদলে দিতে লাগল। এইভাবেই আমি পা দিয়েছিলাম প্রথম যৌবনে। আর তখনই নিয়তি নির্দিষ্ট এক ঘটনা আমাকে যেন আয়ুর অন্তিমে এনে দাঁড় করাল।

আমার পাশের বাড়িতে একটি মেয়ে থাকত। বছর চব্বিশ—পঁচিশের। কালো হলেও, বেশ সুশ্রী চেহারা। একদিন সেই মেয়েটি আমার বাড়ির পেছনদিকের জংলা বাগানে বুড়ো অশ্বত্থগাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা করল।

কী করে সে অত উঁচু ডালে ফাঁস বেঁধেছিল, তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না।

এই অশুভ ঘটনাটা আমার মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। আমি মাঝে মাজেই আমাদের বিশাল পুরোনো দোতলা বাড়িটার পেছনের জানলায় এসে দাঁড়াতাম। ওখান থেকে অশুভ ইঙ্গিতবাহী গাছটাকে দেখা যেত।

একদিন সন্ধের ঠিক আগে আমি জানলার সামনে দাঁড়ালাম। জানলার বাইরে ক্রমশ মুছে যাওয়া বিকেলের রং। বাগানের সীমান্তে ঝোপ—আগাছার ভিতর ঝাঁকড়া মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রৌঢ় গাছটা। ভীষণ জীবন্ত অথচ স্থবির! তার ঝুপসি ডালপালায় সদ্য জমে ওঠা থিকথিকে অন্ধকার।

অন্ধকারের সেই ঘন মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভিতর থেকে এক অলীক বোধ উঠে এল।

আমার মনে হতে লাগল, আমার আশেপাশেই একটা অন্য পৃথিবী রয়েছে। এই আলো—রোদ—হাওয়ার আড়ালেই স্থির রয়েছে সেই অন্য জগৎ। আমাদের নিশ্বাস নেওয়া এই বাতাসের সঙ্গেই হয়তো মিশে আছে।

জায়গাটা হয়তো নিরালম্ব, স্যাঁতসেঁতে আর ছায়াময়।

আমার মনে হল, আমাদের এই রোদ—বৃষ্টি—বাতাসের পৃথিবীর ভিতরে কোথাও একটা নিরাকার শূন্য দরজা আছে। সেই গোপন দরজা দিয়ে অন্য কোনো জগতে প্রবেশ করা যায়।

আমার বিশ্বাস হল, দরজাটা আমার আশেপাশেই কোথাও আছে। অথচ আমি চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি না।

বুকের মধ্যে এই বোধ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রায় পাগলের মতো হয়ে উঠলাম। অপার্থিব চিন্তাগুলো ভারী পাথরের মতো চেপে মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন ও নিষ্ক্রিয় করে দিল। আমি কিছুতেই স্বাভাবিক থাকতে পারছিলাম না।

এই বিচিত্র অনুভূতির পর আমি তিন—চার দিন ঘুমোতে পারিনি। এক অজানা কষ্ট হৃৎপিণ্ড পিষে দিচ্ছিল।

শেষপর্যন্ত আর থাকতে পারলাম না। আগেই বলেছি, আমার কোনো বন্ধু ছিল না। এই যুবক বয়সে আমার দূরের বা কাছের একমাত্র বন্ধু ছিল শোভন।

শেষ শীতের এক নিঝুম সন্ধেয় আমি দ্বিধাগ্রস্তভাবে শোভনকে বলে ফেললাম আমার অদ্ভুত ভাবনার কথা। ভেবেছিলাম, ও প্রলাপ মনে করে ব্যঙ্গ করবে।

কিন্তু না! ও শুনে একটু থমকে গেল। খানিকক্ষণ কিছু চিন্তা করল। তারপর থেমে থেমে নির্লিপ্ত অথচ গভীরভাবে বলতে লাগল, 'তুই বোধ হয় ঠিকই ভেবেছিস। বহুদিন আগে প্যারাসাইকোলজির ওপর লেখা একটা বই পড়েছিলাম। সেখানে মানুষের মনের অস্বাভাবিক ক্ষমতার কথা বলা ছিল। মেডিটেশন অর্থাৎ ধ্যানের সাহায্যে মনকে অস্বাভাবিক সূক্ষ্ম ও গতিশীল করে তোলা যায়। মনের প্রসারতা অসম্ভব বেড়ে যায়। স্মৃতিবাহী চেতনার উন্মেষ ঘটে। তখন সেই মনের মাধ্যমে মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে পেতে পারে। এমনকী সেই মনের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃতিক লোকেও যাতায়াত করা সম্ভব।'

ও চুপ করে গেল। একটু দম নিল। সম্ভবত দীর্ঘশ্বাসও ফেলল। তারপর কয়েক সেকেন্ড পরে আবার বলল, 'তা তোর যখন অ্যাতো কৌতূহল, তুই একবার চেষ্টা করে দ্যাখ না'...

শোভন চলে গেল। কিন্তু যাবার আগে সেই ভৌতিক চিন্তার পাথরটা মাথায় শক্ত করে গেঁথে দিয়ে গেল।

আমি আর কিছু ভাবতে পারলাম না। সেই রাত্রেই খাওয়া—দাওয়ার পর ধ্যানে বসে গেলাম। মাঝে মাঝেই নিজের ওপরে ক্ষোভ এবং হাসি আসছিল। একে অপরের মুখে শোনা কথা, তারপর এসবের কোনো স্পষ্ট প্রক্রিয়া জানি না। আমি কি অন্ধকারে বাঘ শিকার করতে চলেছি! এসব বিষয় কি আন্দাজে হাতড়ানো যায়। নিজের ছেলেমানুষিতে আমি নিজেই লজ্জা পেতে লাগলাম।

তবু আমি বসে ছিলাম। ঘরের দরজা—জানলা আঁট করে বন্ধ করে, টিউব—বাতি নিভিয়ে, জিরো পাওয়ারের একটা চাপা নীল আলো জ্বেলে দিলাম।

সমস্ত ঘরে এখন অদ্ভুত ফ্যাকাশে নীলাভ অন্ধকার। আমি বিছানার ওপর শিরদাঁড়া সোজা করে ধ্যানের আসনে বসলাম। দুই চোখ বন্ধ করে মনকে একটা কাল্পনিক আলোকবিন্দুতে স্থির করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

প্রথম দিন বিক্ষিপ্ত—অশান্তভাবে বোধহয় ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করেছিলাম। আমি কিন্তু চেষ্টা ছাড়লাম না। প্রতিদিন রাত্রে ধ্যানে বসতাম। সমস্ত মানসিক শক্তি একত্র করে চেষ্টা করতাম বিন্দুর মধ্যে স্থির হয়ে যেতে।

এইভাবে কয়েকদিন চেষ্টা করার পর মন ক্রমে শান্ত হয়ে এল। একসময় আমি লক্ষ করলাম, মনটাকে বাধ্য ঘুড়ির মতো যে—কোনো চিন্তায় ছুড়ে দিয়েই আবার টেনে আনতে পারছি।

বুঝতে পারলাম, আর কিছু না হোক, আমি ধ্যানের মাধ্যমে নিজের মনকে কন্ট্রোল করতে পারছি। এবার আমি ধ্যানে বসে বিন্দুতে স্থিত হবার পরে মনকে শূন্যে যতদূর পারি এলোমেলো ছুড়ে দিতে লাগলাম। ডুবন্ত মানুষ যেমন অসহায়ভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চায়, অনেকটা তেমনভাবে মনকে হাওয়ায় ভাসিয়ে আমি যেখানে—সেখানে নিয়ে যেতে লাগলাম। দিকচিহ্নহীন হয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরের শূন্যতাকে ছুঁতে চাইতাম। মনকে পাক দিয়ে দিয়ে নানানভাবে শূন্যে ছেড়ে দিতাম। মনের সঙ্গে তখন এ এক অদ্ভুত খেলা।

এই পদ্ধতিতে বেশ কিছুদিন অন্ধ প্রয়াসের পরে, একদিন সকালে অনুভব করলাম আমার মন আশ্চর্যরকম শান্ত কিন্তু অসম্ভব গতিশীল হয়ে গেছে। মন যেন সর্বদা চলন্ত ট্রেনের কামরার মতো স্থির থেকেও মৃদু মৃদু দুলছে।

আর সেইদিন রাতেই এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা হল। রোজকার মতো ধ্যানে বসে মনকে শূন্যে ভাসিয়ে আঁকুপাঁকু হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম। ধ্যানে সময়জ্ঞান থাকে না। চোখের পাতাও বন্ধ থাকে।

তাও আন্দাজ বিশ—পঁচিশ মিনিট পরে, মনের ভিতর খানিকটা দূরে একটা কালো ফুটকির মতো চোখে পড়ল। এ আমার সেই কল্পিত আলোকবিন্দু নয়। এই বিন্দুর স্পষ্ট উপস্থিতি রয়েছে। মনের ভিতরের অন্ধকারের চেয়েও আরও অন্ধকার এই বিন্দুটা। অল্প অল্প নড়ছে বলেও মনে হল।

ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই, বিন্দুটা সাঁ—সাঁ করে পতঙ্গের মতো আমার দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। খুব দ্রুত আমার কপালের কাছে এগিয়ে আসতেই বুঝতে পারলাম সেটা বিন্দু নয়, একটা বড়োসড়ো কালো গোলক, বা, বলা ভালো, কালচে অন্ধকার বৃত্ত।

আমি বিচলিত হয়ে উঠে চোখ খোলার আগেই সেটা আমার কপালের ভিতর দিয়ে ঢুকে শরীরের নীচের দিকে নেমে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষের মতো থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। মাথার ভিতরকার স্নায়ুতন্ত্রে অসহনীয় বিক্ষেপ। মনে হতে লাগল, আমার সমস্ত স্নায়ুকে কেউ যেন আঙুলে পাকিয়ে চুল ছেঁড়ার মতো ছিঁড়ছে। সারা শরীরে অশান্ত সমুদ্রের উথালপাথাল। ওই আধো—অচেতন অবস্থাতেই মনে হল, আমার হাত—পাগুলো যেন কোনো অর্কিডের শাখাপ্রশাখা হয়ে গেছে। সমস্ত গায়ে কাঁটা—বেঁধা জ্বালা।

ভোরের দিকে জ্ঞান ফিরতে মৃগী রোগীর মতো বিছানায় উঠে বসলাম। সারা মাথায় আগুনের জ্বলন, বুকের গভীরে ছলছলিয়ে উঠছে, ভয়, আর চেতনায় গতরাত্রের বিভীষিকা।

সেদিনই দুপুরের পরে কিন্তু শারীরিক—স্নায়বিক কষ্টগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। তবু এক দুঃসহ আতঙ্কে আমি আর ধ্যানে বসতাম না। মনকে এসব ভূতুড়ে চিন্তার আঠা ছাড়িয়ে অন্য দিকে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে সেই কালরাত্রির ক্ষত মন থেকে প্রায় মুছে গেলেও, সবকিছু পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারল না। কোথাও একটা অজানা অসংগতি থেকে গেল।

তখনও জানি না, হাইওয়ে ধরে হাওয়ার সঙ্গে ছুটতে ছুটতে সহসা একটা বাঁকের সামনে এসে পড়লে লরি যেমন থমকে যায়...আমার জীবনটাও তেমনি এক অদেখা বাঁকের মুখে এসে থেমে গেছে।

ওই যে বললাম, কোথাও কিছু একটা রয়ে গেল! আমি হঠাৎ হঠাৎ ভয় পেতে শুরু করলাম। শিউরে শিউরে উঠতাম। গায়ে রোঁয়া দিয়ে উঠত। এ সেই ছেলেবেলার গা—ছমছমে অনুভূতি নয়, তার চেয়েও অনেক অ—নে—ক তীব্র। মনে হত সমগ্র অস্তিত্বই যেন ভয়ের তাড়সে ঘুলিয়ে উঠছে। আচমকা ইন্দ্রিয়গুলো তীকষ্ন ও সতর্ক হয়ে যেত। যেন এখনই কিছু ঘটবে। আমি অসম্ভব স্পর্শকাতর হয়ে উঠছিলাম।

একেকদিন রাতে শোয়ার পর মনে হত, আমার প্রকাণ্ড বাড়ির সমস্ত অংশ, আনাচকানাচ থেকে অগুন্তি ছায়া—ছায়া অন্ধকার মানুষ বিছানার চারপাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

তারা যেন আকুল চেষ্টায় আমাকে ছুঁতে চাইছে। জাগিয়ে দিতে চাইছে। অথচ পারছে না।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে সন্ত্রস্তভাবে শুয়ে থাকতাম। তারপর এক লাফে উঠে গিয়ে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিতাম। বাকি রাতটুকু আর ঘুম হত না।

এইরকম অস্বস্তিকর যাপনের মধ্যেই একদিন একটা তুচ্ছ ব্যাপার ঘটে গেল।

আমাদের ওয়াশ বেসিনটা লাগানো আছে বাথরুমের ঠিক ডানপাশের দেওয়ালে। সেদিন সন্ধে নাগাদ বাথরুমের দরজার কাছে এসে দেখি, বেসিনের কলটা খোলা রয়েছে। একটানা জল বেরিয়ে বেসিনের গর্তে পড়ছে।

আমি কলের মাথাটা ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিলাম। তারপর বাথরুম সেরে ভিতরের ঘরে চলে গিয়েছি।

রাতের খাওয়া সেরে হাত—মুখ ধোবার জন্য বেসিনের সামনে ফের আসতেই দেখি, কলটা আবার খোলা রয়েছে। আমি প্রথমেই কলটা বন্ধ করে দিলাম।

এসব তুচ্ছ ব্যাপারগুলো মানুষ মনের ভুল মনে করে ভুলে যায়। আমি কিন্তু উড়িয়ে না দিয়ে বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। এবং দৃঢ় সিদ্ধান্তে এলাম, যে এক্ষেত্রে আমার মন কখনোই ভুল করেনি। আমি নিশ্চিত কলটা আগে বন্ধ করে গেছি। তৎসত্ত্বেও সেটা খুলে গেছে!

এমনকী পরের দিন সকালে বাথরুমে যাবার সময়ও দেখি এক ব্যাপার। বেসিনের কল সেই খোলা রয়েছে। তার মুখ বেয়ে লম্বা মোটা ধারায় নির্বোধের মতো গড়িয়ে পড়ছে জল।

খুবই নগণ্য ঘটনা। কিন্তু আমার মনের দেওয়ালে তা গূঢ় ছোপের মতো লেগে রইল।

এরপর আরও কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেল একইরকম নীরব অস্বস্তির মধ্যে। মনের গভীরে সেই সামান্য রেশ রয়ে গেছে, তখনই এক দুপুরবেলা....।

ডাইনিং—টেবিলে খাবারের প্লেট, জলের গেলাস সব সাজানো। অন্যমনস্কভাবে দুপুরের খাওয়া সারছিলাম। খাওয়া তখন শেষের দিকে। চেয়ারে বসে জলের গ্লাসটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই মুহূর্তের মধ্যে, আমার চোখে সামনে, গ্লাসটা আমার হাতের নাগাল থেকে সরসর করে সরে কিছুটা দূরে টেবিলের প্রায় শেষপ্রান্তে গিয়ে থামল।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সমস্ত শিরা—স্নায়ু ফেটে শরীরের ভেতর জড়িয়ে যাচ্ছিল। বরফ জমা ত্রাস। আমার চেতনায় চেনা—চেনা অথচ অস্পষ্ট একটা আশঙ্কা বেজে উঠল। অকস্মাৎ কুয়াশার মতো ফেনিয়ে উঠল বিশ্বাস।

আমার মনে হল, ওপাশে যাবার সেই অদৃশ্য গোপন দরজা কখন যেন খুলে গেছে। আমি জানতে পারিনি। আর খোলা দরজার ভিতর দিয়ে দুই পৃথিবী একাকার হয়ে গেছে। আমি নিজের অজান্তেই লৌকিক জগতের আড়ালের অলৌকিকতায় প্রবেশ করেছি।

এই বোধ জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল ভয়ের মধ্যেও এক নিষ্ঠুর আনন্দ অনুভব করলাম।

এরপরে ঠিক কতগুলো দিন কেটে গেল, তা আর সঠিক মনে নেই। তবে আমার সমস্ত পাজলটাই পিকচার পাজলের ঘুঁটির মতো এলোমেলো হয়ে গেল।

আমার মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলোই ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল। আমি দিন দিন বোধশূন্য ও জড় হয়ে উঠতে লাগলাম। তেমন করে ভয়ও আর পেতাম না।

এরপর একদিন যা হল, তাকে বলা যায়, আমার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ নাটকীয় ঘটনাচিত্রের ওপর চূড়ান্ত তুলির টান।

সেদিনটা বৈশাখের মাঝামাঝি। সন্ধের আকাশে মেঘ জমলেও শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি। তাই বুকচাপা গুমোট।

রাত্রির মাঝ বরাবর মাথায় আলতো যন্ত্রণার মধ্যে আচমকা ঘুম ভেঙে যেতেই, শুনতে পেলাম পাশের ঘরে খটখট...খটখট...খটখট ...একটানা অদ্ভুত একটা শব্দ। চাপা অথচ স্পষ্ট।

সামান্য পরেই বুঝতে পারলাম, শব্দটা স্থির নয়। সেটা ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সরে সরে যাচ্ছে এবং ক্রমশ জায়গা বদল করছে।

তীব্র রহস্যময় কৌতূহলে আচ্ছন্নভাবে আমি নিঃশব্দে পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজায় উঁকি দিয়েই চিনতে পারলাম বিচিত্র শব্দের উৎসটিকে।

পুরোনো কাঠের দেওয়াল আলমারিটা জীবন্ত প্রাণীর মতো সমস্ত ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার কাঠের চারটে পা অসমানভাবে মেঝের সঙ্গে ঠুকে শব্দ উঠছে খটখট...খটখট...।

না, ভয় পাইনি। শুধু নেশাগ্রস্তের মতো শরীরটাকে কোনোমতে টানতে টানতে নিজের ঘরে বিছানায় এনে ছুড়ে দিয়েছি।

গড়িয়ে গিয়েছি চেতনাহীনতার অতল অনন্ত খাদের গহনে...।

এখন আমি এক অন্য পৃথিবীতে দিন কাটাচ্ছি। না, দিন না, সময়। কিংবা হয়তো সময়ও না। কেননা, এখানে সময়ের কোনো বোধই নেই। কখনো শুধুই দিন। নিরন্তর রোদ, আলো। কখনো একঘেয়ে নির্দয় রাত্রি। মৃত্যুকূপের ঠাসবুনোট অন্ধকার।

আমি যেখানে রয়েছি, সেখানের কোনো কিছুই ঠিক আমাদের পৃথিবীর নিয়মে বাঁধা নয়। অথচ জায়গাটা পুরোপুরি লৌকিক পৃথিবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এখানের কিছুই পার্থিব রীতি অনুযায়ী হয় না। আমি শুধু শুয়ে থাকি। ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানটা একটু একটু করে নীচে নামতে নামতে মাথার খুব কাছে চলে আসে। কখনো ঘরের দেওয়ালগুলো ভরে যায় অদ্ভুত সব কালো কালো মাকড়সায়। আবার মিলিয়ে যায়.....। আসবাবপত্রগুলো ইচ্ছেমতো এদিক—ওদিক নেচে বেড়ায়...।

এখানে ব্রণ—ওঠা দেওয়ালের বিবর্ণ আত্মায় পাপের মতো থোকা থোকা ঝুল জমে। সমস্ত ঘরের দেহে অসম্ভব পুরু ধুলোর পোঁচ। বাতাসের স্তরে স্তরে ভেসে বেড়ায় গাঢ় ধুলোর বিষ।

খিদে তেষ্টা ঘুম কিছুই আসে না।

আজকাল আমার ভিতর থেকে সরু হিলহিলে এক 'আমি' উঠে বসে; কিচেনে গিয়ে গ্যাসের নব ঘোরায়, চা তৈরি করে। বন্ধ বাথরুমে স্নান করতে করতে হেঁড়ে গলায় গান ধরে। কখনো ভরপেট খাওয়ার শেষে শব্দ করে ঢেঁকুর তোলে....

আমি একটা ঠান্ডা, সাদা মর্গের মতো বিছানায় শুয়ে থাকি।

অতৃপ্ত আত্মা

তাপস কুমার দে

লেখক দীপ প্রকাশনের কর্মরত ক্যাশিয়ার

আজ থেকেপ্রায় বছরকুড়ি আগের দুর্যোগপূর্ণ রাতের একটি ঘটনা। যা আমার স্মৃতিকে আজও নাড়া দেয়। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন চলাচল বিঘ্ন থাকায় সেদিন আমি শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে নৈহাটি স্টেশনে আসি। জনবহুল স্টেশন—গিজগিজ করছে লোক। স্টেশনের নাম নৈহাটি। তখন রাত প্রায় আটটা চল্লিশ হবে। ব্যান্ডেল যাব, ঠিক দু—তিন মিনিট আগে নৈহাটি—ব্যান্ডেল লোকালটা বেরিয়ে গেছে। ব্যান্ডেলে যেতে পরবর্তী লোকাল ধরার জন্য এখনও আমাকে দীর্ঘ দেড়ঘণ্টা যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

ঠিক রাত নটা দশ—পনেরো হবে, গরমকাল—বৈশাখ মাস। দূর থেকে একটা সোঁ...সোঁ... শব্দ শুনতে পাচ্ছি। প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি কীসের শব্দ। এলোপাথাড়ি দমকা হাওয়ায় আমার মাথার টুপিটা উড়ে লাইনে চলে গেল। আর তুললাম না, বা তোলার সময়ও পেলাম না। হাওয়ার টানে টুপিটা প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে চোখের নিমেষে কোথায় যে উড়ে চলে গেল ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। হাওয়ার দাপটে যে যার শরীর বাঁচাতে ব্যস্ত। দোকানদাররা অর্ধেক করে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। আমি একটা দোকানের দেওয়ালে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার রোগাপাতলা চেহারায় দোকানের দেওয়ালে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। স্টেশন চত্বর ঘুটঘুটে অন্ধকার। দোকানদাররা ইমার্জেন্সি লাইট জ্বালাতে ব্যস্ত হল। আমি দোকানের দেওয়ালের গায়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে ঝড়ের ঝাপটা খেতে লাগলাম।

কালবৈশাখীর চরম খামখেয়ালিপনার চল্লিশ—পঞ্চাশ মিনিটের দাপটে ট্রেনলাইনের বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে গেল। অনেক জায়গায় গাছ উপড়ে গেছে, লাইনে গাছ পড়ে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ।

রাত প্রায় ২টোয় প্লাটফর্ম ফাঁকা শুনশান। যে যেমনভাবে পেরেছে আস্তে আস্তে চলে গেছে। আমার কোনো উপায় নেই, পরিচিতের মধ্যে কেউ ধারে—কাছে থাকে না। কোনো আত্মীয়ের বাড়ি নেই, তাই প্লাটফর্মেরই চেয়ারে বসে আছি। এমন সময় কারেন্ট আসায় প্লাটফর্ম আলো ঝলমল হয়ে উঠল। শুধু দেখলাম এক দম্পতি প্লাটফর্মের শেষের দিকে একটা বেঞ্চে বসে আছে। আমার মতোই তারা বোধহয় হতভাগ্য, তাদের হয়তো কাছেপিঠে কোনো আত্মীয়স্বজনও নেই, তাই প্লাটফর্মেই বসে ছিল।

প্রায় রাত তিনটে নাগাদ একটা EMU কোচ এল— নৈহাটি—ব্যান্ডেল লোকাল। অবসন্ন হয়ে আমি একমাথা চিন্তা নিয়ে একা ট্রেনে উঠলাম। কম্পার্টমেন্টে আর কেউ নেই। আমি শুধু একা। দেখে শুনে চারদিকে তাকিয়ে এক কোণায় বসলাম। বেশ কিছুক্ষণ বাদে সেই দম্পতি এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আমার কম্পার্টমেন্টে উঠেই দু—জনে চেয়ারে না বসেই আমায় জিজ্ঞাসা করল 'দাদা, এটা ব্যান্ডেল যাবার ট্রেন তো...?' আমিও ঠিক জানি না ট্রেনটা নৈহাটি—ব্যান্ডেল লোকাল কিনা। না জেনেই বলে ফেললাম —'আমি ঠিক জানি না...উঠে বসে আছি...কি ট্রেন করবে এখনও অ্যানাউন্সমেন্ট হয়নি।'

একটা কম্পার্টমেন্টে মোট তিনটি প্রাণী—এদিক ওদিক জানলা দিয়ে তাকাচ্ছি কেউ আমার কম্পার্টমেন্টে উঠছে কিনা।

এই সময় অ্যানাউন্সমেন্ট হল—ব্যান্ডেল—নৈহাটি ফার্স্ট লোকাল রাত তিনটে চল্লিশ মিনিটে দু—নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে। মনে মনে চিন্তা করলাম যাক তা হলে ট্রেনের গেরো কাটল, আর ন—দশ মিনিট বাদেই ছাড়বে।

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল, সেই দম্পতিটি চেয়ারে বসছে না, গেটের সামনে দু—জনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে ট্রেনে উঠবার সময় ওই একবারই কথা হয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যেও যতক্ষণ ছিল কথা বলতে শুনিনি।

গরিফা স্টেশন ছেড়ে ট্রেনটা যখন ঠিক হুগলি ব্রিজের মাঝখানে এসেছে তখন হঠাৎ তাকিয়ে দেখি ওই দম্পতির কেউ নেই। একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম বাঁচাও...বাঁচাও। এখন আমি এই কম্পার্টমেন্টে একা। পুরো ট্রেনটিতে বোধহয় জনাদশেক লোক হবে। আমি ভাবছি ওই ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা হঠাৎ কোথায় গেলেন...আমি ভুল দেখছি না তো! এলোপাথাড়ি চিন্তা এল মাথায়। খুব ভয় পেয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তারপর আবার ভাবছি গরিফার স্টেশনে ওরা নেমে যায়নি তো! আমার চোখের ভুলও হতে পারে, ওরা বোধহয় নেমে গেছে আমি ঠিক খেয়াল করিনি। একটু বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলাম, চারটে দশ নাগাদ ট্রেন ব্যান্ডেল স্টেশনে এসে থামল। আমি ভীত—সন্ত্রস্ত হয়ে চিন্তা করতে করতে ট্রেন থেকে নামলাম। চারটে পঞ্চাশ মিনিটে আমার ফার্স্ট ট্রেন ব্যান্ডেল থেকে ছাড়বে, এখনও প্রায় আধঘণ্টা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। একটা চায়ের স্টল—এর কাছে এসে এক ভাঁড় চা নিয়ে একটা বেঞ্চে এসে বসলাম। সকালের প্যাসেঞ্জারের লোকজন, তারা সব চা—বিস্কুট খাচ্ছে। তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে গতকাল রাত্রির ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিলাম এবং যা দেখেছি তাও বললাম। একজন স্টলঅলা ও দু—একজন প্যাসেঞ্জার একটু মুচকি হেসে বলল, 'দাদা প্রাণে বেঁচে গেছেন— ওরা মানুষ নয়...অপদেবতা!'

আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে ওরা ওই নৈহাটি লোকাল থেকে হুগলি ব্রিজে গঙ্গায় ঝাঁপ মেরে আত্মহত্যা করেছিল। তাই প্রতিদিন নৈহাটি—ব্যান্ডেল লাস্ট ট্রেনে ওই দম্পতির অশরীরী আত্মা ওই বগিতে মানুষের রূপ ধরে উঠে। এবং হুগলি ব্রিজ এলেই ঝাঁপ মারে ও বাঁচাও...বাঁচাও বলে চিৎকার করে। যারা জানে তারা নৈহাটি—ব্যান্ডেল লাস্ট ট্রেনের ওই কামরায় কেউ ওঠে না। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে এরকমই চলে আসছে বলে অনেকের ধারণা।